ইহুদি, ক্রিশ্চান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের স্রষ্টা সন্ধানের ৪,০০০ বছরের ইতিহাস

# স্রষ্টার ইতিবৃত্ত

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ । শওকত হোসেন

‘প্রচুর পড়াশোনা করেছেন ক্যারেন আর্মস্ট্রং, কিছুই বাদ যায়নি। আমাদের অতীতের ঈশ্বর সম্পর্কে একটি গ্রন্থে প্রাপ্তব্য নিরেট ধারণা দিয়েছেন ..... অসাধারণ পাঠযোগ্য এবং অবশ্য পাঠ্য।’

অ্যান্টনি বার্গেস, *দ্য অবজার্ভার।*

‘ইতিহাসের বৃহত্তম বুনোহাঁসের পিছু ধাওয়া করার সবচেয়ে চমকপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ গবেষণা – ঈশ্বরের সন্ধান। ক্যারেন আর্মস্ট্রং একটি প্রতিভা।’

এ.এন. উইলসন।

‘অসাধারণ সাবলীল, চমদপ্রদ পাঠযোগ্য বই। ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের রয়েছে চোখ ধাঁধানো ক্ষমতা: যে কোনও জটিল বিষয় বেছে নিয়ে বিষয় অতিসরলীকরণ ছাড়াই বিশ্লেষণ করতে পারেন।”

সিস্টার ওয়েন্ডি বেকেট, *দ্য সান্ডে টাইমস্।*

‘জানা বিষয়কেই টাটকা করে তোলেন তিনি। অজানা বিষয় স্পষ্ট করিয়ে দেন... “আকাঙ্ক্ষা’, বলেছেন অগাস্তিন, ‘হৃদয়কে গভীর করে।” এই সুরটিই ছড়িয়ে আছে এই সাবলীল গ্রন্থজুড়ে আর শেষও হয়েছে এমনি আশাবাদে।

ররার্ট রানসি সাবেক আর্চবিশপ
অভ ক্যান্টারবারি

‘বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে ব্যাপক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। বিয়য়বস্তু পর্যালোচনার মনোমুগ্ধকর কৌশল।’

–র‍্যাবাই জুলিয়া নিউবার্জার

ISBN 984 70117 0163 9

# স্রষ্টার ইতিবৃত্ত

# স্রষ্টার ইতিবৃত্ত

ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের স্রষ্টা সন্ধানের ৪,০০০ বছরের ইতিহাস

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ: শওকত হোসেন

রোদেলা প্রকাশনী

অনুবাদকের উৎসর্গ:

আয়েশা তাসনিম আলী

–বাবা

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| অনুবাদকের কথা | ৯ |
| মানচিত্র | ১০ |
| সূচনা | ১৯ |
| উদ্ভব... | ২৯ |
| এক ঈশ্বর | ৭৩ |
| জেন্টাইলদের প্রতি আলো | ১২১ |
| ট্রিনিটি: ক্রিশ্চানদের ঈশ্বর | ১৫৪ |
| একত্ব: ইসলামের ঈশ্বর | ১৮৪ |
| দার্শনিকদের ঈশ্বর | ২২৯ |
| অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর | ২৭৫ |
| সংস্কারকদের ঈশ্বর | ৩৩২ |
| আলোকন | ৩৭৪ |
| ঈশ্বরের প্রয়াণ? | ৪৩৬ |
| ঈশ্বরের কি ভবিষ্যৎ আছে? | ৪৭৩ |
| নির্ঘণ্ট | ৫০০ |
| তথ্যসূত্র | ৫০৯ |

# অনুবাদকের কথা

ক্যারেন আর্মস্ট্র-এর *আ হিস্ট্রি অভ গড* বইটির বিষয়বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল তেমনি এর আলোচনার শাখা প্রশাখাও ছড়িয়েছে নানা দিকে: ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কার, মনস্তত্ত্ব, ইত্যাদি। লেখক সুগভীর গবেষণা লব্ধ জ্ঞান হতে তুলে এনেছেন দৃষ্টি উন্মোচক নানা তথ্য। আবিষ্কৃত তথ্য সাজিয়ে তিনি একেশ্বরবাদী ধর্মে স্রষ্টার স্বরূপ সন্ধান করেছেন। আমি আশা করি বইটি বৃহত্তর পাঠক সমাজ, যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে ভাবেন তাদের ব্যাপক উপকারে আসবে। লেখক তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট করার স্বার্থে কোরান ও বাইবেল হতে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোরানের আয়াতসমূহের অনুবাদ ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *পবিত্র কুরআনুল করীম* হতে নেওয়া; পবিত্র বাইবেলের সংশ্লিষ্ট পঙক্তির অনুবাদ বাংলাদেশ বাইবেল সোসায়েটি কর্তৃক প্রকাশিত *পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নতুন নিয়ম* থেকে উদ্ধৃত। কোরান ও বাইবেলের অনুবাদের ক্ষেত্রে যেখানে আয়াত সংখ্যা মেলেনি সেখানে প্রথম বন্ধনীর মাঝে বাংলা অনুবাদের আয়াত সংখ্যা আলাদাভাবে তুলে দিয়েছি।

গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় বিষয় যেহেতু স্রষ্টা, গোটা বইতে তাই সামঞ্জস্য রাখার স্বার্থে *গড* এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে *ঈশ্বর* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

মূলগ্রন্থে না থাকলেও মহানবী মুহাম্মদ-এর নামের পর (স) ব্যবহার করা হয়েছে; এরপরও পাঠকদের কাছে অনুরোধ, অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের সহচরদের নামের শেষে যথাযথভাবে তাঁরা যেন (আ), (রা), ইত্যাদি পাঠ করেন।

যে কোনও অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্যে পরম করুণাময়ের ক্ষমা প্রার্থনা করি। আশা করি গ্রন্থটি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবার উপকারে আসবে এবং সেটা হলেই আমি আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

শওকত হোসেন

মালিবাগ, ঢাকা।

e-mail:saokot_nccbd@yahoo.com

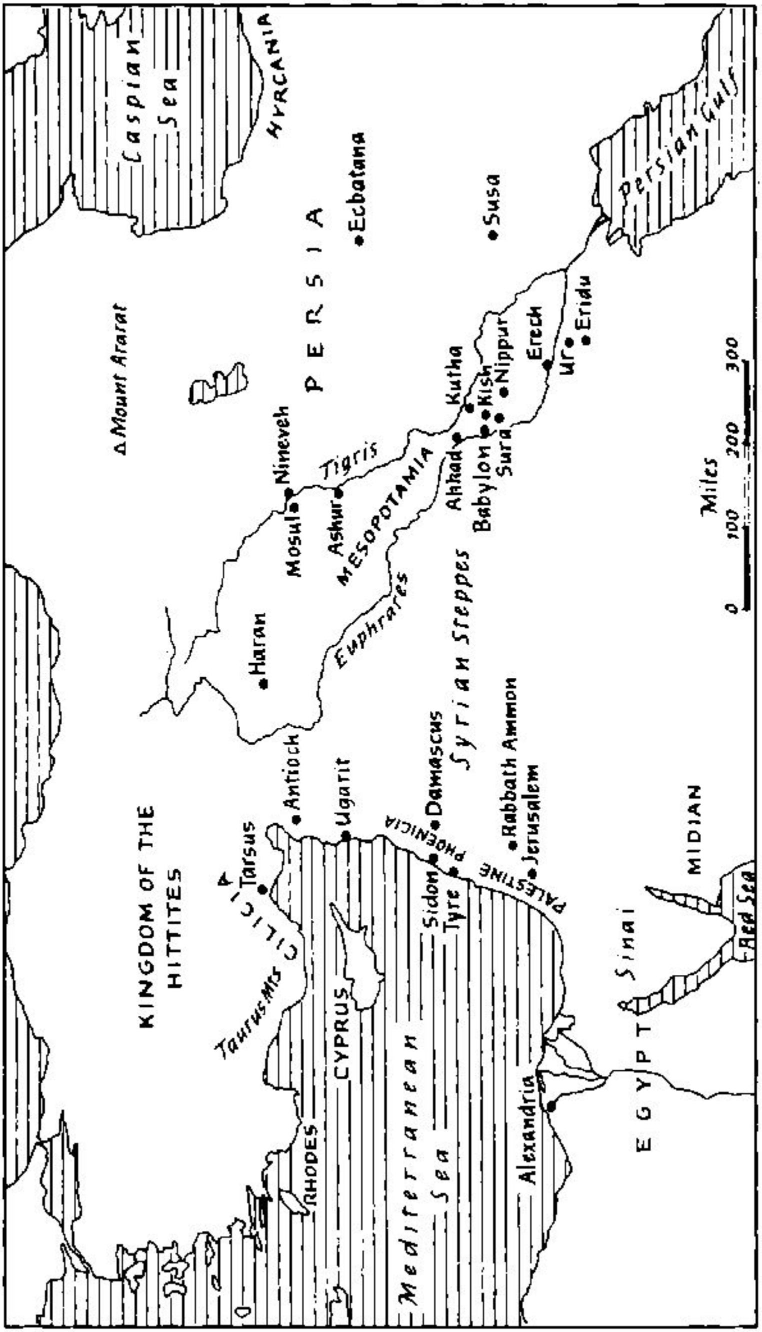


The Ancient Middle East

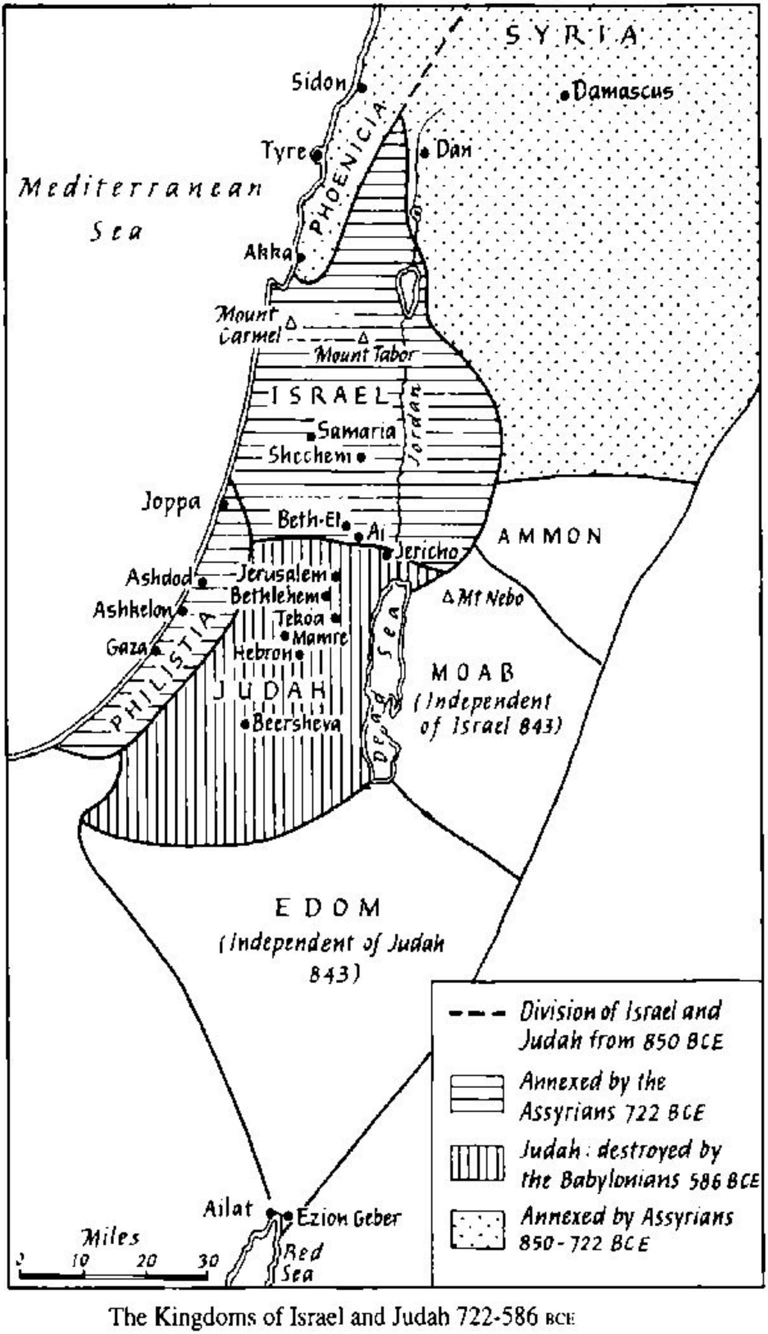


The Kingdoms of Israel and Judah 722-586 BCE

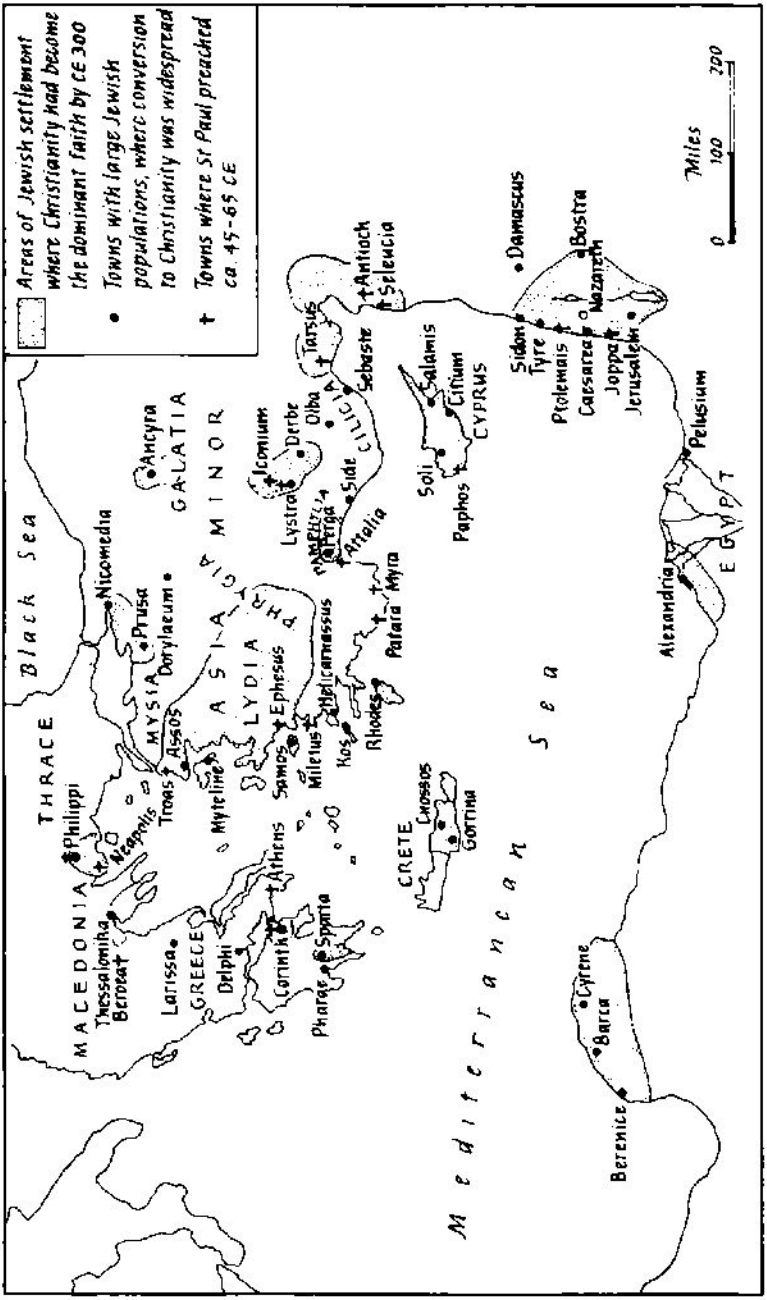


Cristianity and Judaism 50-300 CE

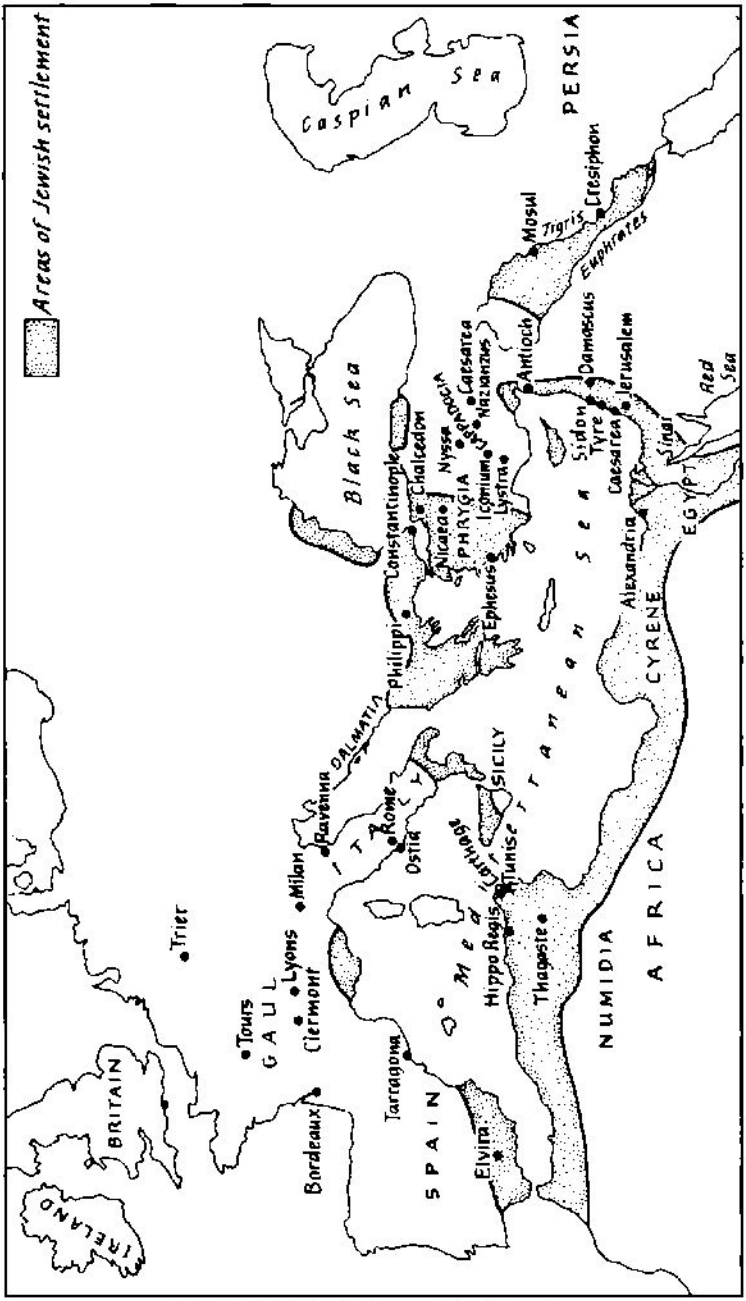


The World of the Fathers of the Church

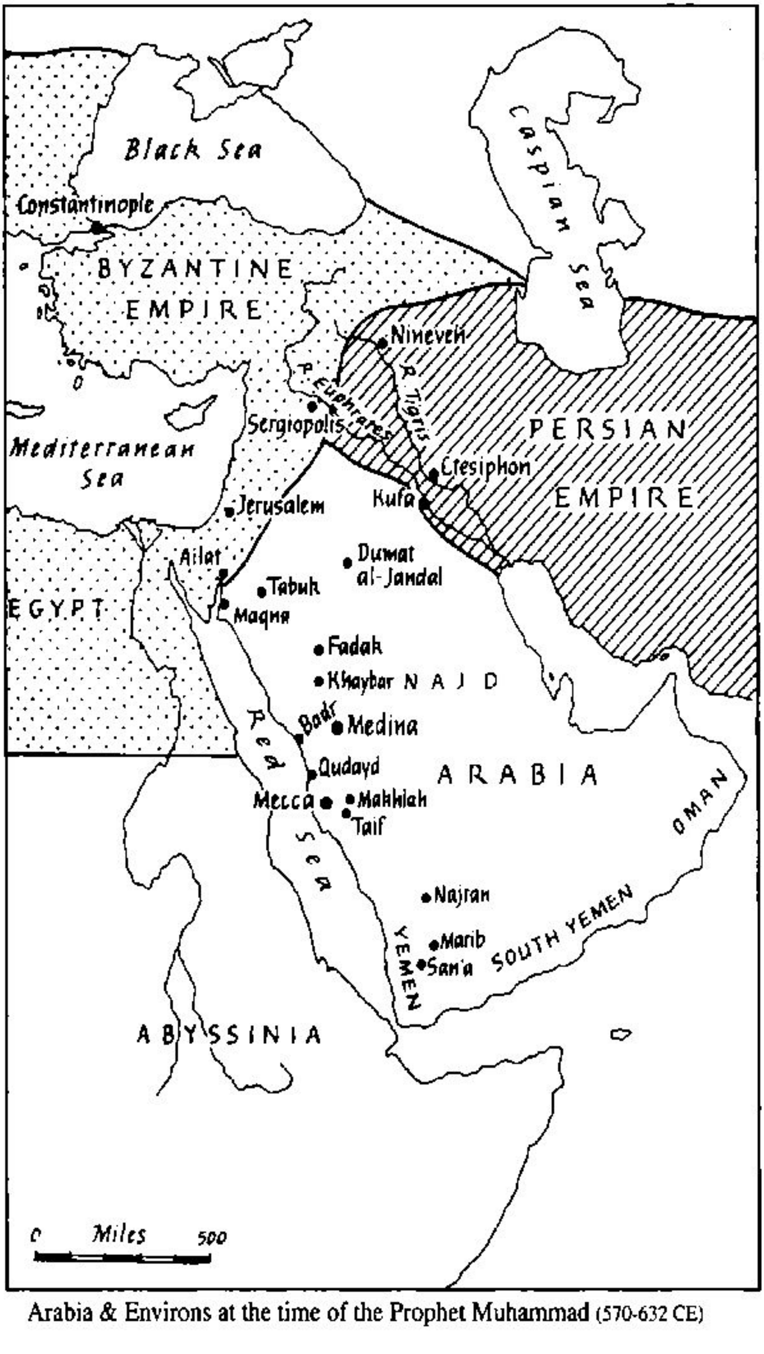


Arabia & Environs at the time of the Prophet Muhammad (570-632 CE)

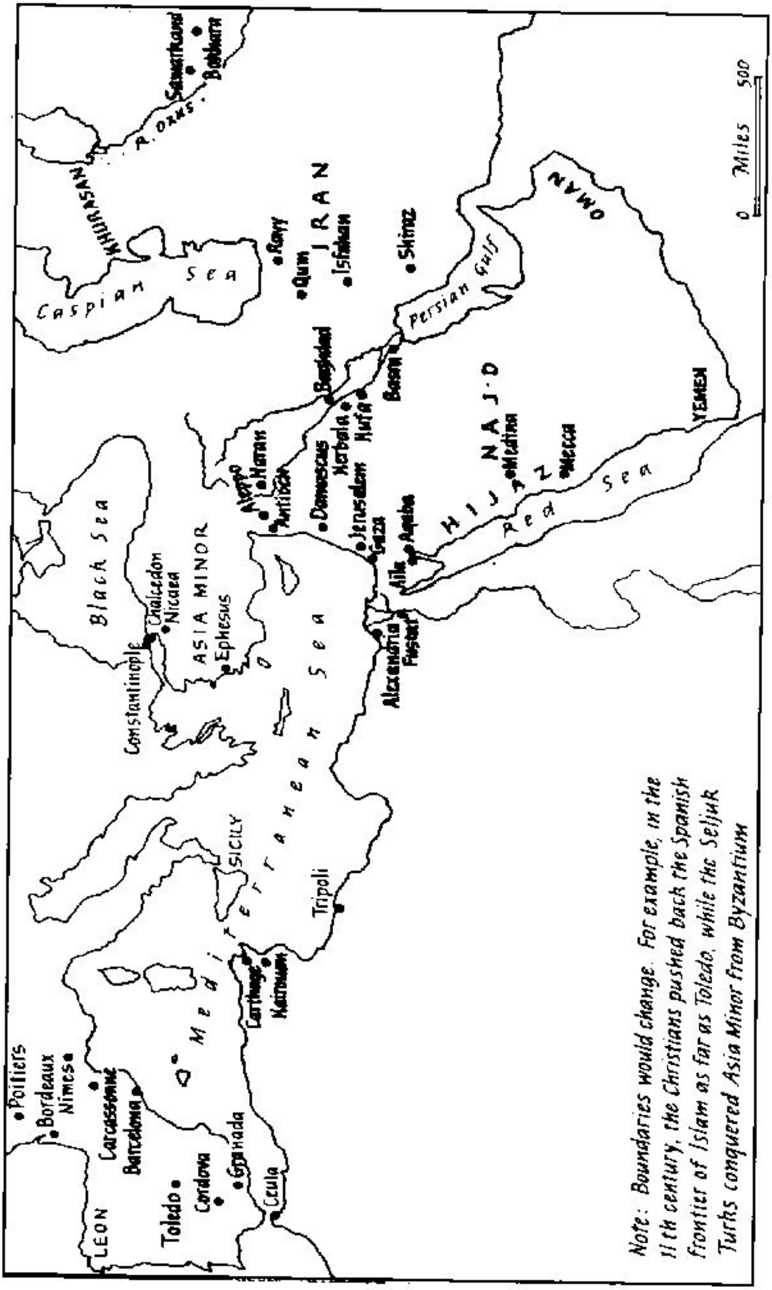


The Islamic Empire by 750

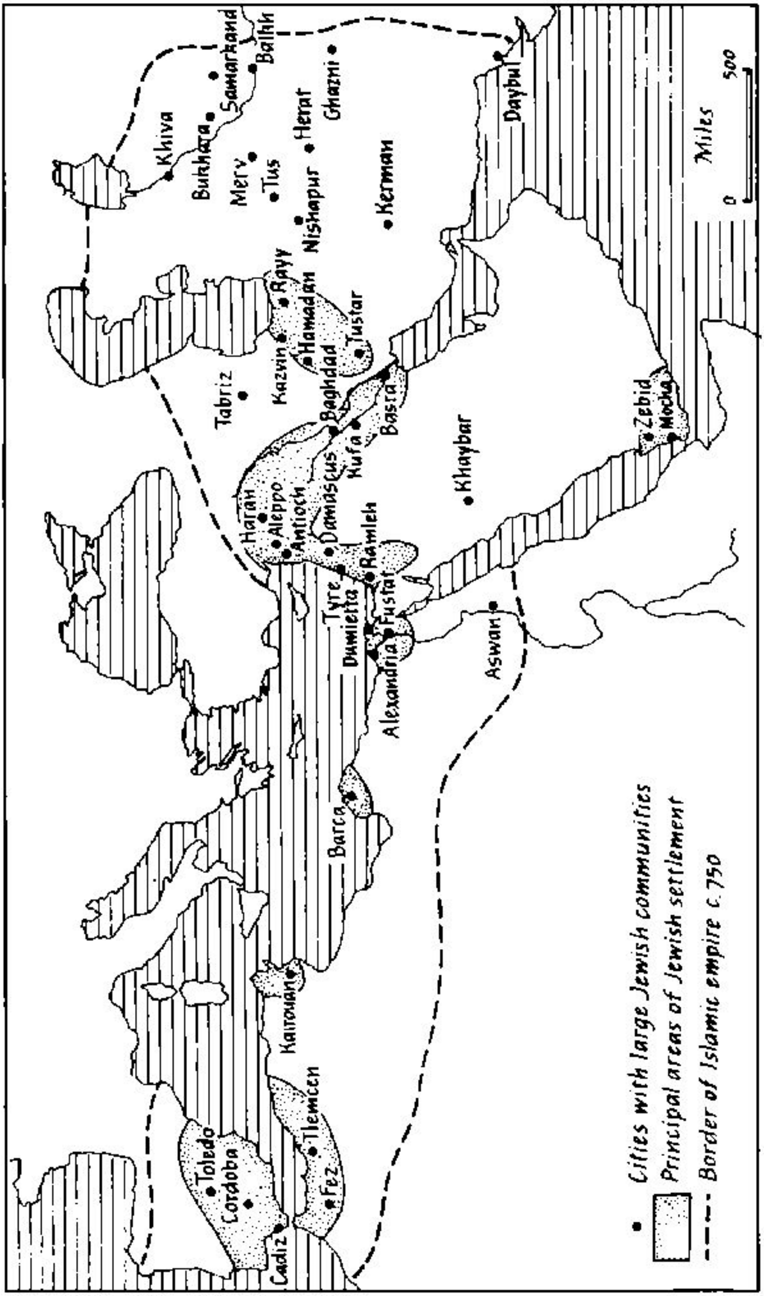


The Jews of Islam c. 750

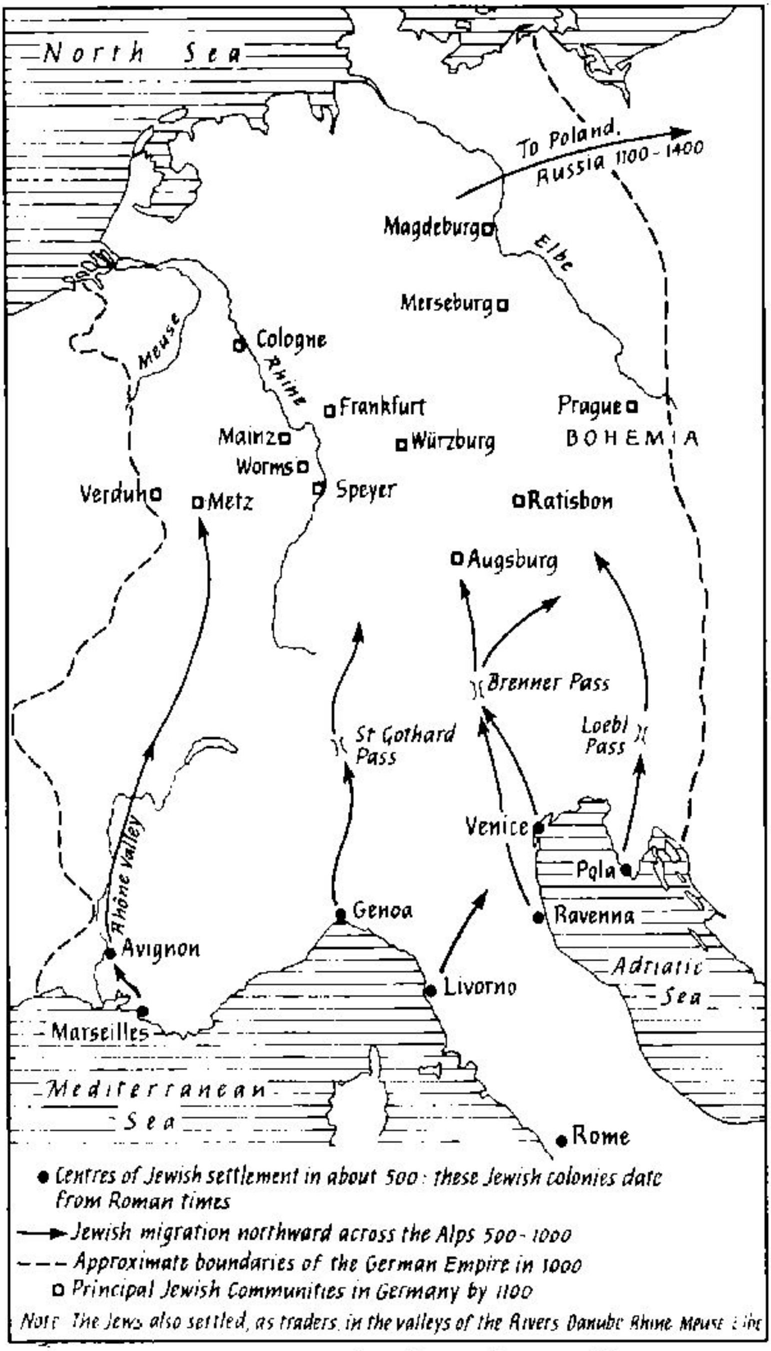


The Jews Settle in Eastern France and Germany

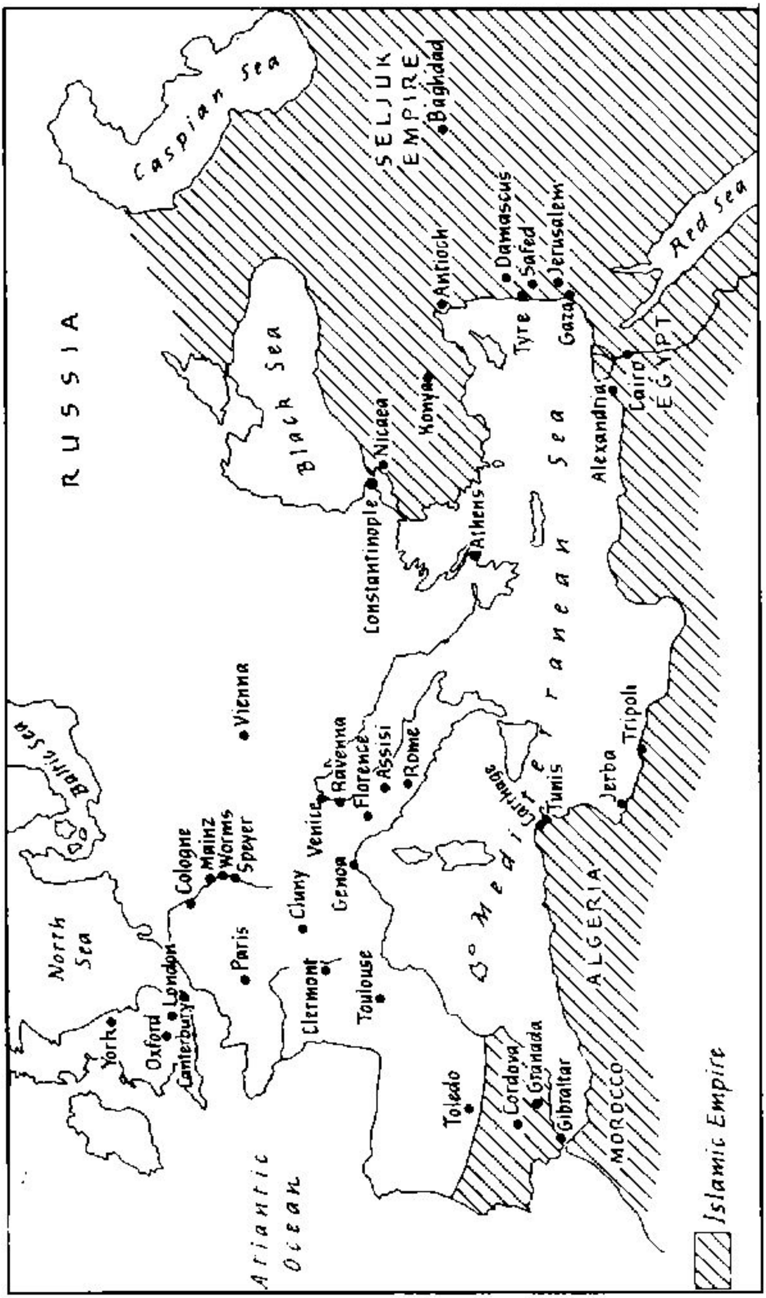


The New Christian West during the Middle Ages

# সূচনা

ছোটবেলায় বেশ কিছু ধর্মীয় বিষয়ে জোরাল বিশ্বাস ছিল আমার, কিন্তু ঈশ্বরে তেমন একটা আস্থাশীল ছিলাম না। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে *বিশ্বাসের* সঙ্গে সেগুলোর ওপর নির্ভর করার *আস্থাশীলতার* পার্থক্য আছে। আমি অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতাম, এ ছাড়া ইউক্যারিস্টে ঈশ্বরের প্রকৃত উপস্থিতি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নিরাময় প্রদানের ক্ষমতা, শাস্তিভোগের আশঙ্কা ও প্রায়শ্চিত্তের (Purgatory) বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতায়ও বিশ্বাস ছিল। অবশ্য এ কথা বলতে পারব না যে পরম সত্তা সম্পর্কিত এইসব ধর্মীয় মতামতে বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীতে জীবন চমৎকার বা সুবিধাজনক বলে আমার মনে আস্থা জন্মেছিল। আমার ছোটবেলার রোমান ক্যাথলিসিজম বরং ভীতিকর এক বিশ্বাস ছিল। *পোর্ট্রেট অভ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়ং ম্যান*-এ জেমস জয়েস অত্যন্ত সঠিকভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন: নরকের অগ্নিকুণ্ডের বিবরণ শুনেছি আমি। আসলে নরক যেন আমার কাছে ঈশ্বরের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব মনে হয়েছে, কারণ তা ছিল এমন কিছু কল্পনায় আমি যাকে বুঝতে পারতাম। অন্যদিকে ঈশ্বর যেন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কোনও সত্তা ছিলেন, বর্ণনায় নয় বুদ্ধিবৃত্তিক বিমূর্ততায় তাঁর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আমার বয়স যখন আট বছর, 'ঈশ্বর কি?' প্রশ্নের নিশ্ছিদ্র জবাব মুখস্থ করতে হয়েছিল আমাকে: 'ঈশ্বর হচ্ছেন পরম আত্মা, যার কোনও অংশীদার নেই এবং যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ।' এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, এ জবাব আমার কাছে খুব একটা অর্থপূর্ণ মনে হয়নি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ জবাব এখনও আমাকে শীতল করে দেয়। একে সবসময়ই এককভাবে বিরস, অতিরঞ্জিত এবং উদ্ধত সংজ্ঞা মনে হয়েছে। অবশ্য এই বইটি লেখা শুরু করার পর থেকে জবাবটিকে সঠিক নয় বলেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারি যে, ধর্মে আতঙ্কের চেয়েও বেশি কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। আমি সাধুসন্ত, ভাববাদী কবিদের জীবনী, টি.এস.

AMARBOI.COM

এলিয়ট ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের মোটামুটি সরল রচনা পাঠ করেছি। শাস্ত্রের সৌন্দর্যে আলোড়িত হতে শুরু করেছিলাম বটে, যদিও ঈশ্বর দূরেই রয়ে গেছেন। আমার মনে হয়েছিল তাঁর কাছে পৌঁছানো সম্ভব এবং তাঁর দর্শন সমগ্র সৃষ্ট বাস্তবতাকে ছাঁপিয়ে যাবে। সে জন্যেই আমি ধর্মীয় সংগঠনে যোগ দিই, তরুণ শিক্ষানবীশ নান হিসাবে ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারি। অ্যাপোলোজেটিক্স, ঐশী গ্রন্থ, ধর্ম তত্ত্ব ও গির্জার ইতিহাসে নিজেকে নিয়োজিত করি। মঠের জীবনাচারের ইতিহাস খুঁড়ে বেড়াই ও আমার নিজস্ব বৃত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করি, যা আমাদের সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করতে হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এগুলোর কোনওটাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হয়নি। সব গুরুত্ব যেন গৌণ বিষয়ের ওপর আরোপ করা হয়েছে, ধর্মের বিভিন্ন প্রান্তিক বিষয়াদি মনোযোগ পেয়েছে বেশি। আমি প্রার্থনায় মনোনিবেশ করেছি, ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে মনের ওপর জোর খাটিয়েছি, কিন্তু তিনি আমার নিয়মনীতি ভঙ্গের দর্শক হিসাবে কঠোর প্রভুই রয়ে গেছেন কিংবা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত থেকেছেন। আমি যতই সাধু সন্ন্যাসীদের পরমানন্দ (rapture) সম্পর্কে জানতে পেরেছি ততই ব্যর্থতার অনুভূতি জেগেছে আমার মনে। বিষাদের সঙ্গে আবিষ্কার করেছি, আমার সামান্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কোনওভাবে আমার আপন অনুভূতি ও কল্পনার ওপর চাপ প্রয়োগের ফলে আমারই নিজস্ব মস্তিষ্কসঞ্জাত। কখনও কখনও ভক্তির অনুভূতিটুকু ছিল গ্রেগোরিয়ান চ্যান্ট বা শাস্ত্রের সৌন্দর্যের প্রতি সহজাত সাড়া, কিন্তু আমার সত্তার অতীত কোনও সূত্র থেকে আমার মাঝে কোনও কিছু আসলে *ঘটেনি*। পয়গম্বর বা অতিন্দ্রীয়বাদীদের বর্ণনার ঈশ্বরের দেখা কখনও পাইনি আমি। জেসাস ক্রাইস্টকে, যার কথা ঈশ্বরের চেয়ে বেশি আলোচনা করে থাকি আমরা, একেবারেই ঐতিহাসিক চরিত্র মনে হয়েছে, প্রাচীন ইতিহাসে যিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। আমার মনে চার্চের কোনও কোনও মতবাদের ব্যাপারেও গভীর সন্দেহ জাগতে শুরু করে। মানুষ জেসাস যে ঈশ্বরের অবতার এটা নিশ্চিত করে বলতে পারে কে, আর এমন একটা বিশ্বাসের অর্থই বা কী? নিউ টেস্টামেন্ট কি আসলেই ব্যাপক ও দারুণভাবে পরস্পরবিরোধী ট্রেনিটি মতবাদ শিক্ষা দিয়েছে, নাকি ধর্মের অপরাপর বিভিন্ন বিষয়ের মতো এটাও জেরুজালেমে ক্রাইস্টের মৃত্যুর শত শত বছর পর ধর্মতাত্ত্বিকদের কল্পনাপ্রসূত বিষয়।

এরপর দুঃখের সঙ্গে ধর্মীয় জীবন ত্যাগ করি আমি; ব্যর্থতা ও অপূর্ণতার ভার হতে মুক্ত হবার পর ঈশ্বরে আমার বিশ্বাসও নীরবে বিদায় নিয়েছে বলে মনে হয়েছে। আমার জীবনে কখনও জোরাল প্রভাব রাখতে পারেননি তিনি, যদিও তাঁকে দিয়ে সেটা করানোর যথাসাধ্য প্রয়াস ছিল আমার। এখন তাঁর ব্যাপারে আর নিজেকে অপরাধী বা উদ্বিগ্ন মনে না হওয়ায়, এতই দূরে সরে গেলেন যে অস্তিত্ব নেইই বলা চলে। অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে আমার আগ্রহ বা

AMARBOI.COM

কৌতূহল অব্যাহত রয়ে গেছে। ক্রিশ্চানিটির গোড়ার দিকের ইতিহাস ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতির ওপর বেশ কয়েকটা টেলিভিশন অনুষ্ঠান করেছি আমি। ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে যতই জেনেছি ততই আমার পুরোনো কিছু সন্দেহ যৌক্তিক প্রতীয়মান হতে শুরু করেছে। ছোটবেলায় বিনা প্রশ্নে যেসব মতবাদ মেনে নিয়েছিলাম সেগুলো আসলেই দীর্ঘ সময় জুড়ে মানুষেরই গড়ে তোলা। বিজ্ঞান যেন স্রষ্টা ঈশ্বরকে বাতিল করে দিয়েছে; বাইবেলিয় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন জেসাস কখনও নিজেকে স্বর্গীয় সত্তা দাবি করেননি। একজন এপিলেপটিক হিসাবে আমার কিছু কিছু দৃষ্টিবিভ্রমের অভিজ্ঞতা ছিল সেগুলো স্রেফ স্নায়বিক দুর্বলতার ফল বলে জানতাম আমি: তবে কি সাধু-সন্ন্যাসীদের দিব্যদৃষ্টি ও পরমানন্দের অনুভূতিও কেবল তাদের মানসিক আলোড়নের প্রকাশ? ঈশ্বর যেন ক্রমবর্ধমান হারে স্থানচ্যুত হয়ে গেছেন বলে মনে হয়েছে, মানবজাতি যাঁকে অতিক্রম করে এসেছে।

নান হিসাবে আমার দীর্ঘ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ঈশ্বর সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে অস্বাভাবিক মনে করি না। ঈশ্বর সম্পর্কে আমার ধারণাগুলো গড়ে উঠেছিল ছোটবেলায়, অন্যান্য বিষয়ে আমার ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। আমি ফাদার ক্রিসমাসের ছোটবেলার সহজ ধারণাকে পরিমার্জনা করেছি, মানুষের দ্বিধা সংশয় সম্পর্কে আরও পরিপূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করতে পেরেছি কিন্ডারগার্টেনে যেটা সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর সম্পর্কে আমার পুরোনো ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তিত বা বিকশিত হতে পারেনি। আমার মতো বিচিত্র ধর্মীয় পটভূমি নেই যাদের তারাও হয়তো আবিষ্কার করবেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছোটবেলায় গড়ে ওঠা। সেদিনগুলোর পরে আমরা ছোটবেলার সবকিছু ফেলে এসেছি ও আমাদের শিশু বয়সের স্রষ্টাকেও বাদ দিয়েছি।

কিন্তু তারপর ধর্মের ইতিহাস নিয়ে আমার গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, মানুষ আসলে আধ্যাত্মিক প্রাণী। প্রকৃতপক্ষেই *হোমো সেপিয়েন্স*রা আসলে *হোমো রিলিজিয়াস* বলে তর্ক করার যথেষ্ট অবকাশও রয়েছে। নারী ও পুরুষ মোটামুটিভাবে মানুষ হয়ে ওঠার পর পরই দেব-দেবীর উপাসনা শুরু করেছিল; শিল্পকলার মতোই একই সময়ে তারা ধর্মকে সৃষ্টি করেছে। এটা যে কেবল ক্ষমতাশালী শক্তিকে প্রসন্ন করার জন্য ছিল তা নয়; এইসব আদি বিশ্বাস এই সুন্দর অথচ ভীতি জাগানো জগৎ নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। শরীর যে দুঃখ কষ্টের তা সত্ত্বেও জীবনের একটা অর্থ অনুসন্ধানে শিল্পের মতো ধর্মও একটি প্রয়াস। অন্য যে কোনও মানবীয় কর্মকাণ্ডের মতো ধর্মকেও অপব্যবহার করা যায়, আর আমরা যেন সেটাই সব সময় করে এসেছি। কুচক্রী রাজরাজরা ও পুরোহিতগণ আদিম সেক্যুলার স্বভাবের ওপর এটা

চাপিয়ে দেননি, বরং এটা মানুষেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বর্তমান সেক্যুলারিজম একেবারেই নতুন এক নিরীক্ষা, মানব ইতিহাসে যার নজীর নেই। এর পরিণতি দেখার জন্যে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। এ কথা সত্য যে, আমাদের পশ্চিমা উদার মানবতাবাদ শিল্পকলা বা কবিতার উপলব্ধির মতো আপনাআপনি আমাদের কাছে আসেনি, এর পরিচর্যা করতে হয়েছে। খোদ মানবতাবাদ ঈশ্বরবিহীন ধর্ম–সকল ধর্ম যে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে তা অবশ্য নয়। আমাদের নৈতিক সেক্যুলার আদর্শের মনকে পরিচালিত করার নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে যা মানুষকে মানব জীবনের পরম অর্থ সন্ধানে সাহায্য করে। এক সময় যা প্রথাগত ধর্মগুলোর কাজ ছিল।

তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত একেশ্বরবাদী ধর্ম ইহুদিবাদ, খৃস্টধর্ম ও ইসলামে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা এবং অভিজ্ঞতার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করার সময় আমি ভেবেছিলাম ঈশ্বরকে কেবল মানুষের প্রয়োজন ও ইচ্ছার সাধারণ এক প্রকাশ হিসাবে আবিষ্কার করব। আমার ধারণা ছিল যে 'তিনি' সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে এর আতঙ্ক ও আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছেন। আমার অনুমান একেবারে অমূলক প্রতীয়মান হয়নি, তবে আমার কিছু কিছু আবিষ্কারে দারুণ বিস্মিত হয়েছি। আমার মনে হয়েছে তিরিশ বছর আগে যখন ধর্মীয় জীবন শুরু করতে যাচ্ছিলাম তখন এসব জানতে পারলে তিনটি একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে মহাশূন্য থেকে ঈশ্বরের অবতরণের অপেক্ষায় না থেকে নিজের জন্যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একটা ধারণা সৃষ্টি করে নেওয়া উচিত—একথা শোনার তীব্র উদ্বেগ থেকে রক্ষা পেতাম। অন্যান্য র‍্যাবাই, যাজক ও সুফীগণ আমাকে ঈশ্বরকে কোনও অর্থে 'মহাশূন্যের বাস্তবতা' মনে করার জন্যে তিরস্কার করতেন। আমাকে যৌক্তিক চিন্তার সাধারণ প্রক্রিয়ায় আবিষ্কৃত হওয়ার মতো বাস্তব বিষয় হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা লাভের প্রত্যাশা না করতে সতর্ক করে দিতেন তাঁরা। আমাকে বলতেন, এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ঈশ্বর সৃজনশীল কল্পনার সৃষ্টি, আমার কাছে অনুপ্রেরণাদায়ী মনে হওয়া কবিতা ও সঙ্গীতের মতো। অত্যন্ত সম্মানিত কিছু একেশ্বরবাদী হয়তো শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে আমাকে বলতেন, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই-এবং তারপরেও 'তিনি' এই বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা।

এই বইটি সময় ও পরিবর্তনের অতীত স্বয়ং ঈশ্বরের বর্ণনাতীত বাস্তবতার ইতিহাস হবে না, বরং আব্রাহামের কাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত নারী ও পুরুষ যেভাবে তাঁকে কল্পনা করেছে, এটা তারই ইতিহাস। ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণার একটি ইতিহাস আছে, কিন্তু কালের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে একে ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর কাছে তা বরাবরই পরিবর্তিত অর্থ বহন

AMARBOI.COM

করেছে। কোনও এক প্রজন্মে এক দল মানুষের সৃষ্ট ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা অন্য এক দল মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি' কথাটার বাস্তব কোনও অর্থ নেই, কিন্তু যখন কোনও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মুখে বিশেষ প্রেক্ষাপটে উচ্চারিত হয় তখনই অন্য যে কোনও বাক্য বা কথার মতো ঐ প্রেক্ষাপটে তা অর্থ প্রকাশ করে থাকে। ফলে 'ঈশ্বর' শব্দের মাঝে কোনও একক অন্তর্নিহিত অপরিবর্তনীয় ধারণা নেই, বরং শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে যেগুলো আবার পরস্পর বিরোধী এবং এমনকি একটা অপরটিকে বাতিলও করে। ঈশ্বরের ধারণায় এই পরিবর্তনশীলতা না থাকলে অন্যতম মহান মানবীয় ধারণা হবার জন্যে তা টিকে থাকত না। যখনই ঈশ্বর সম্পর্কিত একটি ধারণা অর্থ হারিয়েছে বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, নীরবে সেটাকে বর্জন করে এক নতুন ধারণাকে সেখানে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। একজন মৌলবাদী একথা প্রত্যাখ্যান করবে, কেননা মৌলবাদ ইতিহাস বিরোধী: এটা বিশ্বাস করে যে আব্রাহাম, মোজেস ও পরবর্তীকালের পয়গম্বরগণ আজকের দিনের মানুষের মতোই তাঁদের ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের তিনটি ধর্মের দিকে তাকালে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে 'ঈশ্বরে'র কোনও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা নেই: প্রত্যেক প্রজন্মকেই তার জন্যে কার্যকর ঈশ্বরের ইমেজ নির্মাণ করে নিতে হয়। নাস্তিক্যবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' কথাটা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অর্থ প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সময়ে 'নাস্তিক' হিসাবে আখ্যায়িত ব্যক্তিরা অলৌকিকতার বিশেষ একটি ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে। আজকের নাস্তিকদের প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বরই কি প্যাট্রিয়ার্কদের ঈশ্বর, পয়গম্বরদের ঈশ্বর, দার্শনিকদের ঈশ্বর, অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর কিংবা অষ্টাদশ শতকের ডেইস্টদের ঈশ্বর? এইসব উপাস্যই ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমগণ কর্তৃক তাদের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাইবেল এবং কোরানের ঈশ্বর হিসাবে উপাসিত হয়েছেন। আমরা দেখব, তাঁরা একে অপরজন থেকে একেবারে আলাদা। নাস্তিক্যবাদ প্রায়শঃ পরিবর্তনশীল একটা অবস্থা ছিল: এভাবে ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা তাদের সমসাময়িক পৌত্তলিক প্রতিপক্ষ কর্তৃক নাস্তিক আখ্যায়িত হয়েছে, কেননা তারা অলৌকিকত্ব ও পরম সত্তা সম্পর্ক এক বিপ্লবাত্মক ধারণা অবলম্বন করেছিল। আধুনিক নাস্তিক্যবাদ কি একইভাবে আমাদের সময়ের সমস্যাদির প্রেক্ষিতে অপর্যাপ্ত 'ঈশ্বরে'র প্রতি আনাস্থা?

অন্য জগতের কথা বললেও ধর্ম দারুণভাবে বাস্তবসম্মত। আমরা দেখব যে, ঈশ্বর সম্পর্কিত কোনও বিশেষ ধারণা যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে যাথাযথ হওয়ার চেয়ে বরং এর *কার্যকারিতাই* অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর

AMARBOI.COM

কার্যকারিতা ব্যাহত হলেই তা বদলে যাবে–কখনও কখনও যা তীব্রভাবে ভিন্নতর। আমাদের পূর্ববর্তী একেশ্বরবাদীরা এতে এতটুকু বিচলিত হয়নি, কেননা তারা স্পষ্ট করেই জানত যে, ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণা স্থির বা অপরিবর্তনীয় নয়, বরং সাময়িক। এগুলো ছিল পুরোপুরি মানুষের সৃষ্টি–অন্য কিছু হতে পারে না–বরং এগুলো যে বর্ণনাতীত সত্তাকে প্রতীকায়িত করে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেউ কেউ এই অত্যাবশ্যকীয় পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্ধত পন্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। মধ্যযুগীয় জনৈক সাধু এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, ভুলক্রমে এই পরম সত্তা 'ঈশ্বর' বাইবেলে উল্লেখিতই হননি। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে নারী-পুরুষ জাগতিক বিশ্বের অতীত আত্মার একটা মাত্রা যেন প্রত্যক্ষ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এটা মানব মনের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, তারা বোধের অতীত এই রকম একটা ধারণাকে ধারণ করতে পারে। আমরা একে যেভাবেই ব্যাখ্যা করতে চাই না কেন মানুষের দুর্জ্ঞেয়র এই অভিজ্ঞতা জীবনেরই বাস্তবতা রয়ে গেছে। সবাই একে অলৌকিক বলে মেনে নেবে তা নয়: আমরা যেমন দেখব, বৌদ্ধরা তাদের দর্শন ও অন্তর্দৃষ্টি অতিপ্রাকৃত উৎস হতে গৃহীত বলে স্বীকার করে না; তারা একে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হিসাবে দেখে। অবশ্য প্রধান সকল ধর্ম স্বীকার করবে যে, এই দুর্জ্ঞেয়কে স্বাভাবিক ধারণাগত ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। একেশ্বরবাদীরা এই দুর্জ্ঞেয়কে 'ঈশ্বর' আখ্যা দিয়েছে, কিন্তু এর চারপাশে জরুরি কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইহুদিদের বেলায় ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ, মুসলিমরা অলৌকিককে দর্শনীয় প্রতিমায় উপস্থাপিত করতে পারবে না। এই বিধান মনে করিয়ে দেয়, যে সত্তাকে আমরা 'ঈশ্বর' আখ্যায়িত করি তা সকল মানবীয় অভিব্যক্তির অতীত।

AMARBOI.COM

এটা প্রচলিত ধারার ইতিহাস হবে না, যেহেতু ঈশ্বরের ধারণা কোনও বিশেষ কালে সৃষ্টি হয়ে একরৈখিকভাবে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেনি। বৈজ্ঞানিক ধারণা ওভাবে অগ্রসর হয়, কিন্তু শিল্পকলা বা ধর্মের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে না। প্রেমের কবিতায় যেমন অল্প সংখ্যক থিম রয়েছে ঠিক সেরকমই মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিম বিশ্বাসে বিস্ময়কর মিল লক্ষ করব। যদিও ইহুদি ও মুসলিমরা ক্রিশ্চানদের ট্রিনিটি ও ইনকারনেশনের ধারণাকে প্রায় ব্লাসফেমাস বিবেচনা করে, কিন্তু এইসব বিতর্কিত ধর্মতত্ত্বের নিজস্ব ধরনও সৃষ্টি করেছে তারা। এইসব সর্বজনীন ধারণার প্রত্যেকটি একটি অপরটির চেয়ে সামান্য ভিন্নতার অধিকারী, যা 'ঈশ্বরে'র অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষের সৃজনশীলতা ও মেধার পরিচয় প্রকাশ করে।

বিষয়বস্তু যেহেতু ব্যাপক, আমি তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের উপাস্য একক ঈশ্বরে নিজেকে সীমিত রেখেছি, যদিও ক্ষেত্র বিশেষে পৌত্তলিক, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধারণাসমূহও আলোচনা করেছি যাতে পরম সত্তা সম্পর্কিত একেশ্বরবাদী যুক্তিসমূহ আরও স্পষ্ট করা যায়। বিভিন্ন ধর্মে একেবারে স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠা ঈশ্বরের ধারণা আশ্চর্যরকমভাবে সমরূপ বলে মনে হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের উপসংহার যাই হোক না কেন, এই ধারণার ইতিবৃত্ত আমাদেরকে অবশ্যই মানুষের মনোজগত এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেবে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য সমাজের সেক্যুলার ধারা সত্ত্বেও ঈশ্বরের ধারণা আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে শতকরা নিরানব্বই ভাগ আমেরিকান জানিয়েছে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে: প্রশ্ন হচ্ছে অসংখ্য ঈশ্বরের মাঝে কোনজনের প্রভুত্ব স্বীকার করে তারা?

ধর্মতত্ত্ব প্রায়শঃই বিমূর্ত ও একঘেয়ে মনে হয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইতিহাস আবেগময় এবং প্রবলভাবে টানে। পরম বা চরম সত্তার অন্যান্য ধারণার বিপরীতে মূলত যন্ত্রণাদায়ক সংগ্রাম ও চাপের মধ্যে দিয়ে একে লালন করা হয়েছে। ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ শরীরের অস্থিসন্ধি মুচড়ে দেওয়া দৈহিক যন্ত্রণার  ভেতর দিয়ে তাঁদের ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন যা তাঁদের ক্রোধ ও আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। যে সত্তাকে তারা ঈশ্বর হিসাবে আখ্যায়িত করে একেশ্বরবাদীরা এক চরম অবস্থায় তাঁর অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে: আমরা পর্বতচূড়া, অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা, ক্রুসিফিকশন ও ত্রাসের কথা পাঠ করব। ঈশ্বর সংক্রান্ত পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা যেন বিশেষভাবে পীড়াদায়ক। এই সহজাত যাতনার কারণ কী? অন্য একেশ্বরবাদীরা আলো ও আকৃতির পরিবর্তনের কথা বলেছে। যে সত্তার অভিজ্ঞতা তারা লাভ করে তার বিবরণ দিতে গিয়ে অর্থডক্স ধর্মতত্ত্বের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া সাহসিকতাপূর্ণ কল্পনার আশ্রয় নেয়। সাম্প্রতিককালে মিথলজি নিয়ে নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। একে ধর্মীয় সত্যের অধিকতর অভিব্যক্তির এক ব্যাপক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। প্রয়াত আমেরিকান পণ্ডিত জোসেফ ক্যাম্পবেলের রচনাবলী আজকাল দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষের চিরকালীন মিথলজি নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি, প্রথাগত সমাজে এখনও প্রচলিত কিংবদন্তীসমূহের সঙ্গে সেগুলোর যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রায়শঃ ধারণা করা হয় যে, তিনটি ঈশ্বর-ধর্ম বুঝি মিথলজি ও কাব্যিক প্রতীকধর্মীতা মুক্ত। কিন্তু একেশ্বরবাদীরা আদিতে তাদের পৌত্তলিক প্রতিবেশীদের মিথ প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তীকালে সেগুলো আবার তাদের অজান্তেই তাদের মাঝে ফিরে এসেছে। যেমন, অতিন্দ্রীয়বাদীরা ঈশ্বরকে



AMARBOI.COM

নারী রূপে প্রত্যক্ষ করেছে। অন্যরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈশ্বরের লিঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং স্বর্গীয় সত্তায় নারীসুলভ উপাদান যোগ করেছে।

এটা আমাকে এক কঠিন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। কারণ এই ঈশ্বরের শুরু হয়েছিল পুরুষ দেবতা হিসাবে, একেশ্বরবাদীরা সাধারণত তাঁকে 'পুরুষবাচক সে' হিসাবে উল্লেখ করে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নারীবাদীরা বোধগম্যভাবেই এর প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছে। আমি যেহেতু ঈশ্বরকে 'পুরুষবাচক সে' হিসাবে বিবেচনাকারী মানুষের চিন্তা, ভাবনা ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করব, তাই যদিও 'এটা' বলাই যথোপযুক্ত শব্দ হতো, তবু আমি প্রথাগত পুরুষবাচক সর্বনামই ব্যবহার করব। এটা উল্লেখ করা বোধ হয় সমীচিন হবে যে, বিশেষ করে ইংরেজিতে ঈশ্বরের আলোচনায় পুরুষবাচক সম্বোধন ব্যবহার কষ্টকর। অবশ্য হিব্রু, আরবী ও ফরাসি ভাষায় ব্যাকরণগত লিঙ্গ ধর্মীয় আলোচনায় লিঙ্গিয় পাল্টা যুক্তি ও ডায়ালেকটিক এর সুযোগ সৃষ্টি করে যা এক ধরনের ভারসাম্য যোগায়, ইংরেজিতে যার অভাব রয়েছে। এভাবে আরবী *আল্লাহ* (ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম) ব্যাকরণগতভাবে পুরুষবাচক, কিন্তু ঈশ্বরের অলৌকিক এবং দুর্জ্ঞেয় সত্তাবোধক শব্দটি–*আল-ধাত*–নারীবাচক।

ঈশ্বর সম্পর্কিত সকল আলোচনা অসম্ভব সমস্যায় আবর্তিত। কিন্তু একেশ্বরবাদীরা ভাষার ব্যাপারে অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করার পাশাপাশি একই সময়ে দুর্জ্ঞেয় সত্তার প্রকাশে ভাষার ক্ষমতাহীনতাও মেনে নেয়। ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের ঈশ্বর এমন একজন যিনি–এক অর্থে–কথা বলেন। তিনটি ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই তাঁর বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের বাণী আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাস নির্মাণ করেছে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে বর্তমানে 'ঈশ্বর' শব্দটি আমাদের জন্যে কোনও অর্থ বহন করে কিনা।

টীকা: আমি যেহেতু ইহুদি, মুসলিম ও ক্রিশ্চানদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের ইতিহাস পর্যালোচনা করছি, সেহেতু পশ্চিমে সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'খৃস্টপূর্ব' এবং 'খৃস্টাব্দ' শব্দবন্ধ দুটি যথার্থ নয়। সেজন্যে আমি বিকল্প–বিসিই (Before the Common Era) এবং সিই (Common Era)-এর আশ্রয় নিয়েছি।

AMARBOI.COM

# স্রষ্টার ইতিহাস

AMARBOI.COM

# ১.
# উদ্ভব...

আদিতে মানবজাতি এমন একজন ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছিল যিনি বস্তুনিচয়ের সৃষ্টির মূল কারণ এবং আকাশ ও পৃথিবীর শাসনকর্তা। কোনও প্রতিমা দিয়ে তাঁর উপস্থাপন ঘটেনি বা উপাসনা করার জন্যে তাঁর কোনও মন্দির কিংবা পুরোহিতও ছিল না। মানুষের সংস্কারের প্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন অনেক উঁচু স্থানের অধিকারী। আস্তে আস্তে তাঁর জাতির চেতনা থেকে হারিয়ে যান তিনি। তিনি এতটাই দূরবর্তী হয়ে পড়েছিলেন যে, লোকে আর তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে চাইল না। পরিণামে, বলা হয়ে থাকে, অদৃশ্য হয়ে যান তিনি।

এটা অন্তত একটা মতবাদ, ১৯১২ সালে প্রকাশিত *দ্য অরিজিন অভ দ্য আইডিয়া অভ গড* গ্রন্থের মাধ্যমে ফাদার উইলহেম শ্মিডট একে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। শ্মিডট মত প্রকাশ করেছেন যে, বহু সংখ্যক দেব-দেবীর উপাসনা শুরু করার আগে নারী-পুরুষ এক আদিম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল। মূলত তারা একজন পরম ঈশ্বরের (Supreme Deity) অস্তিত্ব স্বীকার করত, যিনি জগৎ সৃষ্টির করেছেন এবং সুদূরে অবস্থান করে মানুষের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। এরকম পরম ঈশ্বরে (High God) (অনেক সময় 'স্কাই গড' আখ্যায়িত করা হয়, যেহেতু তিনি স্বর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত) বিশ্বাস এখনও আফ্রিকার বহু আদি গোত্রের ধর্মীয় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে। তারা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের নৈকট্য অন্বেষণ করে; বিশ্বাস করে যে তিনি তাদের ওপর নজর রাখছেন এবং পাপের শাস্তি দেবেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে তিনি অনুপস্থিত: তাঁর কোনও বিশেষ কাল্ট নেই এবং কোনও প্রতিমার মাধ্যমেও উপস্থাপিত হননি। গোত্রের সদস্যরা বলে থাকে যে, তিনি প্রকাশের অতীত, মানুষের এই জগৎ দিয়ে তাঁকে কলঙ্কিত করা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকে তিনি 'চলে গেছেন।'

AMARBOI.COM

নৃতাত্ত্বিকগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, এই ঈশ্বর দূরবর্তী ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠায় কার্যতঃ তিনি নিম্নতর আত্মা ও অধিকতর বোধগম্য দেবতা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছেন। শ্মিডটের মতবাদও একই কথা বলছে। প্রাচীনকালে পরম ঈশ্বর পৌত্তলিকদের দেবনিচয়ের অধিকতর আকর্ষণীয় দেবতা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছেন। সুতরাং, আদিতে ঈশ্বর একজনই ছিলেন। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে জীবনের রহস্য ও যন্ত্রণা ব্যাখ্যা করার জন্যে মানব সৃষ্ট প্রাচীন ধারণাসমূহের মধ্যে একেশ্বরবাদ ছিল অন্যতম। এখানে এমন একজন আরাধ্য বা উপাস্য কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন তারও একটা আভাস মেলে।

এ ধারণার সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বহু তত্ত্ব রয়েছে। তবে মনে হয় দেবতার সৃষ্টি এমন একটা ব্যাপার মানবজাতি যা সব সময় করে এসেছে। যখন কোনও একটা ধর্মীয় আদর্শ তাদের জন্যে অকার্যকর হয়ে পড়ে, স্রেফ তার স্থানে অন্য এক ধারণা বসিয়ে দেওয়া হয়। এসব ধারণা স্কাই গডের মতো কোনওরকম হট্টগোল ছাড়াই হারিয়ে যায়। আমাদের বর্তমান কালেও অনেকে বলবেন ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের উপাস্য ঈশ্বরও স্কাই গডের মতো দূরবর্তী হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ প্রকৃতই এমনও দাবি করেছেন যে, তিনি পরলোকগমন করেছেন। বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে তাঁর অপসারণ ঘটছে। তাঁরা আমাদের চেতনায় 'ঈশ্বর আকৃতির গহ্বরের' কথা বলেন, যেখানে তাঁর অবস্থান ছিল; কারণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আমাদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি এবং মানুষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদসমূহের তিনি অন্যতম। আমরা কী হারাতে বসেছি বোঝার জন্যে—মানে, যদি সত্যি তিনি অপসৃয়মান হয়ে থাকেন—আমাদের দেখতে হবে এই ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করার সময় মানুষ কী করছিল। কী তাঁর অর্থ ছিল এবং কীভাবে তাঁর উৎপত্তি ঘটেছিল। এ জন্যে আমাদের ফিরে যেতে হবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন কালে, যেখানে ১৪,০০০ বছর আগে আমাদের ঈশ্বরের ধারণা ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছিল।

AMARBOI.COM

আজকের দিনে ধর্মকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ার অন্যতম কারণ আমাদের অনেকেই এখন আর অদৃশ্য বিষয়াদি দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকার অনুভূতি লালন করি না। আমাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্কৃতি আমাদেরকে চোখের সামনের ভৌত ও বস্তুজগতের দিকে মনোযোগ দিতে শেখায়। জগৎ দেখার এই পদ্ধতি ব্যাপক ফল অর্জন করেছে। অবশ্য এর একটা পরিণাম হচ্ছে আমরা আমাদের 'আধ্যাত্মিক' বা 'পবিত্র' অনুভূতি ছেঁটে ফেলেছি যা অধিকতর প্রথাগত সমাজে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা স্তরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, এক কালে যা

মানুষের জগতকে বোঝার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। সাউথ-সীর দ্বীপমালার অধিবাসীরা এই রহস্যময় শক্তিকে *মানা (mana)* আখ্যায়িত করে, অন্যরা একে এক ধরনের উপস্থিতি বা সত্তা হিসাবে অনুভব করে–কখনও কখনও এটা তেজস্ক্রিয়তা বা বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক ক্ষমতা হিসাবে অনুভূত হয়। গোত্রীয় প্রধান, গাছপালা, পাথর ও জীব-জানোয়ারে এর আবাস বলে বিশ্বাস করা হতো। লাতিনরা পবিত্র মনে *নুমিনা* আত্মার অনুভূতি লাভ করে। আরবরা মনে করত গোটা পরিবেশ *জিন*-এ পরিপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এই বাস্তবতার সংস্পর্শে আসতে চেয়েছে, এগুলোকে কাজে লাগাতে চেয়েছে, কিন্তু আবার একে স্রেফ শ্রদ্ধাও জানাতে চেয়েছে তারা। অদৃশ্য শক্তিসমূহকে যখন তারা ব্যক্তি সত্তায় পরিণত করে তাদের বাতাস, সূর্য, সাগর ও তারার সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু মানবীয় চরিত্রের অধিকারী দেবতা বিবেচনা করতে শুরু করে, তখন তারা অদৃশ্যের সঙ্গে নিজেদের ও চারপাশের জগতের একাত্মতার সাধনাই প্রকাশ করেছিল।

ধর্মের ইতিহাসবিদ জার্মান রুডলফ অটো ১৯১৭ সালে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *দ্য আইডিয়া অভ দ্য হোলি* প্রকাশ করেন। তাঁর বিশ্বাস *নুমিনাসের* এই অনুভূতিই ধর্মের মৌল বিষয়। এটা পৃথিবীর উৎপত্তি বা নৈতিক আচরণের একটা ভিত্তি খোঁজার ইচ্ছার অগ্রবর্তী। বিভিন্নভাবে মানুষ *নুমিনাস* শক্তি অনুভব করেছে–কখনও এটা বুনো ঘোর লাগা উত্তেজনা সৃষ্টি করে, কখনও এনে দিয়েছে গভীর প্রশান্তি; কখনও কখনও মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজাত রহস্যময় শক্তির উপস্থিতিতে ভয়, বিস্ময় ও তুচ্ছতার অনুভূতি লাভ করেছে। মানুষ যখন তারা মিথসমূহ সৃষ্টি ও দেবতাদের উপাসনা শুরু করে তখন প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহের নিখুঁত ব্যাখ্যা আকাঙ্ক্ষা করেনি। রূপায়িত কাহিনী, গুহাচিত্র ও খোদাইচিত্রগুলো ছিল তাদের বিস্ময় ও ভাবনা প্রকাশের প্রয়াসের পাশাপাশি এই ভিন্নতর রহস্যময় শক্তিকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রয়াস। প্রকৃতপক্ষেই বর্তমানকালের কবি, শিল্পী ও সঙ্গীত শিল্পীরাও একই রকম আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হন। উদাহরণ স্বরূপ, প্যালিওলিথিক যুগে কৃষি কাজের বিকাশ ঘটার সময় মাদার গডেসের উপর বিশ্বাস এই অনুভূতির প্রকাশ করেছে যে, মানুষের জীবনকে বদলে দেওয়া উর্বরতার পবিত্র মূল্য রয়েছে। শিল্পীরা তাঁকে নগ্ন অন্তঃসত্ত্বা নারী হিসাবে এঁকেছেন। সমগ্র ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে নৃতাত্ত্বিকগণ এর আবিষ্কার করেছেন। বহু শত বছর মহান মাতা (Great Mother) কল্পনাযোগ্যভাবেই গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছেন। প্রাচীন স্কাই গডের মতো পরবর্তীকালে দেবীদের মধ্যে হারিয়ে যান তিনি, অপরাপর উপাস্যের পাশে স্থান করে নেন। অত্যন্ত শক্তিশালী দেবী ছিলেন তিনি, স্কাই গডের চেয়ে শক্তিশালী তো বটেই—যিনি

AMARBOI.COM

অস্পষ্ট সত্তা রয়ে গিয়েছিলেন। প্রাচীন সুমেরিয়ায় ইনানা, ব্যাবিলনে ইশতার এবং কানানে আনাত নামে ডাকা হতো তাঁকে; মিশরে আইসিস আর গ্রিসে আফ্রোদাইত। এইসব সংস্কৃতিতে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর ভূমিকা বর্ণনা করার জন্যে আশ্চর্যজনকভাবে একই ধরনের গল্প-গাথা সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব মিথ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না, বরং অন্য যে কোনওভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে জটিল ও দূরবর্তী এক সত্তাকে বর্ণনার রূপকাশ্রিত প্রয়াস ছিল এগুলো। এই নাটকীয় ও স্মৃতি জাগানিয়া দেব-দেবীর গল্পগুলো মানুষকে তার চারপাশের অদৃশ্য অথচ ক্ষমতাবান শক্তিসমূহকে অনুভব করার ক্ষমতাকে সংগঠিত করায় সাহায্য করেছে।

প্রকৃতপক্ষেই এমন মনে হয় যে, কেবল এই ঐশ্বরিক জীবনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমেই তারা সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারে বলে প্রাচীনকালের মানুষের বিশ্বাস ছিল। পার্থিব জীবন আবশ্যকীয়ভাবে ভঙ্গুর এবং মৃত্যু দ্বারা আবৃত, কিন্তু নারী-পুরুষ দেবতার কর্মকাণ্ড অনুকরণ করলে তারা তাদের উন্নত ক্ষমতা ও কার্যকারিতার অংশীদার হতে পারবে। এইভাবে, বলা হয়ে থাকে যে, দেবতারাই মানুষকে তাদের শহর ও মন্দির নির্মাণের কায়দা শিখিয়ে দিয়েছেন—যেগুলো স্বর্গে তাঁদের নিজস্ব আবাসের অনুকরণ মাত্র। দেবতাদের পবিত্র জগৎ-মিথসমূহে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে-কেবল মানুষের অনুসরণীয় আদর্শ নয়, বরং এটা মানুষের অস্তিত্বের প্রটোটাইপ। এটাই আদি নকশা বা আর্কিওটাইপ যার ভিত্তিতে মর্ত্যে আমাদের জীবন গড়ে তোলা হয়েছে। এভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিস স্বর্গের কোনও কিছুর অনুরূপ বলে বিশ্বাস করা হতো, অধিকাংশ প্রাচীন সংস্কৃতির আচরিক ও সামাজিক সংগঠন এবং আমাদের কালের অধিকতর প্রথাগত সমাজকে প্রভাবিত করে আসছে এই ধারণা।[1] উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচীন ইরানে ইহ জগতের *(গেতিক)* প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর আবার আর্কিওটাইপাল পবিত্র জগতে *(মেনক)* একটা করে প্রতিরূপ রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হতো। আধুনিক দুনিয়ায় আমাদের পক্ষে এমন একটা ধারণা মেনে নেওয়া কঠিন, কারণ আমরা স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতাকে মহান মানবীয় মূল্যবোধ হিসাবে দেখে থাকি। তবু বিখ্যাত উক্তি *Post coitum omne animal tristis est* এখনও একটি সাধারণ অনুভূতির প্রকাশ করে: এক আন্তরিক ও প্রবলভাবে প্রত্যাশিত মুহূর্তের পর আমরা প্রায়শঃই অনুভব করি আর কিছু বুঝি আমাদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে, ধরতে পারিনি। কোনও দেবতার অনুকরণ এখনও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বোধ রয়ে গেছে: সাবাথের দিন বিশ্রাম গ্রহণ কিংবা মনডি বৃহস্পতিবারে কারও পা ধোয়া-খোদ কর্মকাণ্ডসমূহ অর্থহীন-এখনও তাৎপর্যপূর্ণ ও পবিত্র, কারণ মানুষ বিশ্বাস করে একদিন ঈশ্বর একাজগুলো করেছিলেন।

AMARBOI.COM

একই ধরনের আধ্যাত্মিকতা মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস উপত্যকায় প্রায় ৪,০০০ বিসিই কালে সুমেরিয় নামে পরিচিত এক জাতি বাস করত, যারা ওইকুমিনের (সভ্যজগত) অন্যতম আদি মহান সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করেছিল। তাদের উর, ইরেচ ও কিশ নগরীসমূহে সুমেনিররা নিজস্ব কুনিফর্ম লিপি আবিষ্কার করে, *যিগুরাত* আখ্যায়িত অনন্য সাধারণ মন্দির-টাওয়ার নির্মাণ করে, গড়ে তোলে অসাধারণ আইন, সাহিত্য ও মিথলজি। অল্প দিনের ব্যবধানেই এখানে হামলা চালিয়েছিল সেমেটিক আক্কাদিয়রা, সুমেরদের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল তারা। আরও পরে, ২,০০০ বিসিইর দিকে অ্যামোরাইটরা সুমেরিয় আক্কাদিয় সভ্যতা দখল করে নেয় ও বাবিলনকে তাদের রাজধানীতে পরিণত করে। অবশেষে আনুমানিক ৫০০ বছর পরে, অসিরিয়রা নিকটবর্তী আশুরে বসতি স্থাপন করে ও শেষপর্যন্ত বিসিই অষ্টম শতকে বাবিলন দখল করে নেয়। বাবিলনের এই ঐতিহ্য কানানের ধর্ম ও মিথলজিকেও প্রভাবিত করে, যা পরে প্রাচীন ইসরায়েলিদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে পরিণত হয়। প্রাচীন বিশ্বের অন্যান্য জাতির মতো বাবিলনবাসীরাও তাদের সাংস্কৃতিক অর্জনকে দেবতাদের অবদান হিসাবে আখ্যায়িত করেছে, তাঁরা তাদের পৌরাণিক পূর্বসূরিদের কাছে নিজেদের জীবনধারা উন্মোচিত করেছিলেন। এভাবে বাবিলনকেই স্বর্গের একটা প্রতিরূপ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে, এর মন্দির স্বর্গীয় কোনও প্রাসাদের প্রতিরূপ। স্বর্গীয় জগতের সঙ্গে এই সম্পর্ক বা যোগাযোগ বার্ষিক ভিত্তিতে মহান নববর্ষের উৎসবে পালন ও চিরকালীন রূপ পেত। বিসিই সপ্তম শতকে এটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাবিলনে নিসান—আমাদের এপ্রিল—মাসে পালিত এই উৎসবে ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজার মাথায় পরবর্তী এক বছরের জন্যে শাসনভার তুলে দিয়ে মুকুট পরানো হতো। কিন্তু এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অধিকতর স্থায়ী ও কার্যকর দেবতাদের শাসন মেনে নিতে পারলেই টেকা সম্ভব ছিল, যাঁরা জগৎ সৃষ্টির সময় আদি বিশৃঙ্খলার ভেতর শৃঙ্খলা এনেছিলেন। উৎসবের এগারটি পবিত্র দিন এভাবে আচরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ অপবিত্র কালের অংশ গ্রহণকারীদের দেবতাদের পবিত্র ও অনন্তকালে নিক্ষেপ করত। পুরোনো, মুমূর্ষু বছরকে বাতিল করার জন্যে ছাগল বলী দেওয়া হতো; জনসম্মুখে রাজার অপমান ও তাঁর জায়গায় উৎসবের রাজার সিংহাসন আরোহণ আদি বিশৃঙ্খার পুনরাবৃত্তি ঘটাত; ধ্বংসের শক্তির বিরুদ্ধে দেবতাদের লড়াইয়ের অনুকরণে নকল যুদ্ধের আয়োজন করা হতো।

এইসব প্রতীকী কর্মকাণ্ডের পবিত্র মূল্য ছিল; বাবিলনবাসীকে এগুলো পবিত্র শক্তি বা *মানায়* বিলীন হতে সক্ষম করে তুলত যার ওপর তাদের মহান

AMARBOI.COM

সভ্যতা নির্ভরশীল ছিল। যেকোনও সময়ে বিশৃঙ্খলা ও বিভাজনের শক্তির শিকার পরিণত হওয়া সংস্কৃতিকে ভঙ্গুর অর্জন মনে করা হতো। উৎসবের চতুর্থ দিন অপরাহ্নে পুরোহিত ও কয়ারিস্টরা বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে দেবতাদের বিজয় তুলে ধরা মহাকাব্য *এনুমা এলিশ* আবৃত্তি করার জন্যে সার বেঁধে পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করত। এ কাহিনী পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের সত্য ভিত্তিক বিবরণী নয়, বরং এক গূঢ় রহস্য তুলে ধরার ও এর পবিত্র শক্তি উৎসারণের কোনও এক সুচিন্তিত প্রতীকী প্রয়াস। সৃষ্টির আক্ষরিক বর্ণনা দান ছিল অসম্ভব, কেননা কল্পনাতীত ওই ঘটনাবলীর সময় কেউ উপস্থিত ছিল না: মিথ ও প্রতীকসমূহই তাই এসব বর্ণনার উপযুক্ত উপায় বা মাধ্যম। *এনুমা এলিশের* প্রতি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত বহু শতাব্দী পরে আমাদের নিজস্ব স্রষ্টা ঈশ্বরের জন্মদানকারী আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে খানিকটা আভাস দেয়। যদিও সৃষ্টি সংক্রান্ত বাইবেলিয় ও কোরানের বিবরণ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা রূপ ধারণ করে, কিন্তু এই অদ্ভুত মিথগুলো কখনও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি; বরং আরও পরে ঈশ্বরের ইতিহাসে একেশ্বরবাদী রূপকের আড়ালে আবার ফিরে এসেছে।

স্বয়ং দেবতাদের সৃষ্টির প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু হয়েছে কাহিনীর; এই থিম ইহুদি ও মুসলিম অতিন্দ্রীয়বাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে দেখব আমরা। আদিতে, *এনুমা এলিশ* বলছে, দেবতারা জোড়ায় জোড়ায় এক আকৃতিহীন জলীয় বিস্তার থেকে আবির্ভূত হন–খোদ এই জিনিসটি আবার স্বর্গীয়। বাবিলিনিয় মিথে–পরবর্তীকালে যেমন বাইবেলেও–শূন্য থেকে কোনও কিছু সৃষ্টি হয়নি; এই ধারণা প্রাচীন জগতে ছিল অপরিচিত। দেবতা বা মানুষের অস্তিত্বের আগে অনন্তকাল থেকে এই পবিত্র কাঁচামালের অস্তিত্ব ছিল। বাবিলনবাসীরা এই আদিম স্বর্গীয় বস্তু সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে একে মেসোপটেমিয়ার জলাভূমির মতো পতিত অঞ্চল ধরে নিয়েছিল, যেখানে বন্যা বারবার মানুষের ভঙ্গুর সৃষ্টিকে মুছে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলত। সুতরাং *এনুমা এলিশ*-এ সৃষ্টি-পূর্ব বিশৃঙ্খলা বা পিণ্ড কোনও ভয়ঙ্কর ফেনিয়ে ওঠা বস্তু নয়, বরং এক কাদাময় বিশৃঙ্খলা যেখানে সবকিছু সীমা, সংজ্ঞা এবং পরিচয়বিহীন:

> মিষ্টি ও তেতো
> যখন এক সঙ্গে মিশে গেল, রঞ্জিত হয়নি কোনও তৃণ, স্রোতে
> কাদাময় হয়ে ওঠেনি জল;
> দেবতাগণ ছিলেন নামহীন, স্বভাবহীন, ভবিষ্যতহীন।[২]

এরপর আদি পতিত ভূমি থেকে উত্থিত হলেন তিনজন দেবতা: আপসু (নদীর মিঠা পানির অনুরূপ), তাঁর স্ত্রী তিয়ামাত (লোনা সমুদ্র) ও মাম্মু, বিশৃঙ্খল

AMARBOI.COM

জরায়ু। তারপরও সত্যি বলতে এই দেবতারা ছিলেন আদি ও নিম্ন শ্রেণীর মডেল যাঁদের উন্নতির প্রয়োজন ছিল। 'আপসু' ও 'তিয়ামাত' নামগুলো 'গহ্বর' (abyss) 'শূন্যতা' (Void) কিংবা 'অতলান্ত সাগর' (bottomless gulf) হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। এগুলো আদিম আকৃতিহীনতার আকারহীন জড়তার কথা বলে যেগুলো তখনও স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করে উঠতে পারেনি।

পরবর্তী পর্যায়ে উৎসারণ (emanation) নামে পরিচিত এক প্রক্রিয়ায় ওদের মধ্য হতে অন্যান্য দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে যা আমাদের ঈশ্বরের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। একে অপর হতে জোড়ায় জোড়ায় আবির্ভূত হয়েছেন নতুন দেবতা। স্বর্গীয় বিবর্তন ক্রিয়াশীল থাকায় পূর্ববর্তী দেবতার চেয়ে নতুন দেবতারা অর্জন করেছিলেন উন্নততর পরিচয়। গোড়াতে এসেছেন লাহমু এবং লাহাম; এদের নামে অর্থ 'পঙ্ক' (silt): (জল আর মাটি এখনও এক সঙ্গে মেশানো)। এরপর এলেন আনশের ও কিশার, (আকাশের দিগন্ত ও সাগরের প্রতিরূপ)। তারপর অনু (আকাশমণ্ডলী) ও ইয়া এলেন; যেন শেষ হলো গোটা প্রক্রিয়া। স্বর্গীয় জগতের আকাশ, নদী ও মাটি ছিল প্রত্যেকটা অপরের চেয়ে আলাদা ও সুস্পষ্ট। কিন্তু সৃষ্টির সূচনা ঘটেছিল কেবল: কেবল যন্ত্রণাদায়ক ও অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতার শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল। তরুণ ও গতিশীল দেবতারা তাঁদের পিতামাতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, কিন্তু আপসু ও মাম্মুকে পরাজিত করতে পারলেও তিয়ামাতের বিরুদ্ধে টিকতে পারলেন না ইয়া। তিয়ামাত তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে বিপুল সংখ্যক কদাকার দানব সৃষ্টি করলেন। সৌভাগ্যক্রমে চমৎকার একটা ছেলে ছিল ইয়া'র: মারদুক, সান গড, স্বর্গীয় ধারায় সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। দেবতাদের মহাসংসদের এক সভায় মারদুক এই শর্তে তিয়ামাতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দিলেন যে, বিনিময়ে তাঁকে শাসন ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু এরপরেও অনেক কষ্টেসৃষ্টে দীর্ঘস্থায়ী এক বিপজ্জনক লড়াইতে তিয়ামাতকে হত্যা করতে সক্ষম হলেন তিনি। এই মিথে সৃজনশীলতা হচ্ছে এক ধরনের সংগ্রাম, সীমাহীন বৈরিতার বিরুদ্ধে যাকে অর্জন করতে হয়েছে।

অবশ্য, শেষ পর্যন্ত তিয়ামাতের বিশাল শবদেহের ওপর দাঁড়িয়ে মারদুক এক নতুন বিশ্ব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েই আকাশের খিলান ও মানুষের পৃথিবী সৃষ্টির জন্যে তিয়ামাতের দেহ টুকরো করেন। এরপর সৃষ্টি করলেন বিধান যা সমস্ত কিছু যথাস্থানে রাখবে। শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কিন্তু বিজয় তখনও সংহত হয়নি। বছরের পর বছর বিশেষ শাস্ত্রীয় আচারের মাধ্যমে একে বারবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ কারণেই দেবতাগণ নতুন পৃথিবীর

AMARBOI.COM

কেন্দ্রস্থল বাবিলনে মিলিত হলেন, এখানে এক মন্দির নির্মাণ করা হলো যাতে স্বর্গীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা যায়। ফলাফল, মারদুকের সম্মানে নির্মিত বিশাল যিগুরাত—'পার্থিব মন্দির অসীম স্বর্গের প্রতীক।' কাজ শেষ হওয়ার পর একেবারে শীর্ষে আসন গ্রহণ করলেন মারদুক আর অন্য দেবতাগণ সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন: 'এটা দেবতার প্রিয় শহর, বাবিলন নগরী, আপনার প্রিয় দেশ!' এরপর আচার পালন করলেন তাঁরা, 'যেখান থেকে গোটা বিশ্বজগৎ এর নিয়ম কানুন পায়, অদৃশ্য গোপন জগৎ সহজ হয়ে যায় এবং দেবতাগণ বিশ্বজগতে যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট স্থান লাভ করেন।'[৩] এসব আইন ও আচার অনুষ্ঠান পালন প্রত্যেকের জন্যে বাধ্যতামূলক; এমনকি সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দেবতাদেরও এগুলো মানতে হবে। এই মিথ বাবিলনবাসীরা যেভাবে দেখেছে সেভাবে সভ্যতার অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে। এরা ভালো করেই জানত যে তাদের পূর্বসুরিরাই যিগুরাত নির্মাণ করেছিল, কিন্তু *এনুমা এলিশের* গল্পটি তাদের এই বিশ্বাসকেই ফুটিয়ে তোলে যে, তাদের সৃজনশীল প্রয়াস কেবল স্বর্গীয় ক্ষমতায় অংশী হতে পারলেই টিকে থাকবে। নববর্ষে তাদের পালিত শাস্ত্রীয় আচার মানুষের সৃষ্টির আগেই নির্ধারণ করা হয়েছে: বস্তুনিচয়ের খোদ প্রকৃতির মাঝেই লেখা আছে এসব, এমনকি দেবতারাও যা মানতে বাধ্য। এই মিথ তাদের এই বিশ্বাসও ফুটিয়ে তোলে যে, বাবিলন এক পবিত্র ভূমি, বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থল ও দেবতাদের আবাস—সকল প্রাচীন ধর্মেই এই ধারণাটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটি পবিত্র নগরীর ধারণা—নারী-পুরুষ যেখানে সকল বস্তু ও ফলের উৎস পবিত্র ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার বোধ অনুভব করে—আমাদের নিজস্ব ঈশ্বরের তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সবশেষে যেন চকিত চিন্তা থেকেই মানুষ সৃষ্টি করলেন মারদুক। তিনি কিংগুকে (কিংগু ছিলেন তিয়ামাতের জড়বুদ্ধি সহচর, আপসুর পরাজয়ের পর যাকে সৃষ্টি করেছিলেন) আটক ও হত্যা করে স্বর্গীয় রক্ত ও মাটি মিশিয়ে সৃষ্টি করলেন প্রথম মানব। সবিস্ময় ও সশ্রদ্ধায় তা প্রত্যক্ষ করলেন দেবতারা। মানুষের সৃষ্টিরই এই পৌরাণিক বিবরণে কিছুটা রসিকতার ছোঁয়া আছে; মানুষ সৃষ্টির সেরা নয়, বরং সবচেয়ে নির্বোধ ও অকর্মা দেবতা থেকে উদ্ভূত। তবে এ কাহিনী আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তুলে ধরে–প্রথম মানুষকে এক দেবতার দেহাবশেষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল: সীমিত পরিসরে হলেও সে স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশীদার। মানুষ ও দেবতাদের মাঝে সাগরসম দূরত্ব নেই। স্বাভাবিক পৃথিবী, নারী-পুরুষ ও স্বয়ং দেবতাগণ, সবাই একই প্রকৃতির অংশীদার; তারা একই স্বর্গীয় বস্তু হতে সৃষ্ট। পৌত্তলিক দর্শন ছিল হলিস্টিক: দেবতাগণ সম্পূর্ণ রূপতাত্ত্বিক স্তরে মানবজাতির সঙ্গে সম্পর্করহিত নন:

AMARBOI.COM

ঐশ্বরিকতা মানুষ থেকে আবশ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং, দেবতাদের বিশেষ আবির্ভাব বা স্বর্গ থেকে স্বর্গীয় আইন অবতীর্ণ হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। দেবতা ও মানবজাতিকে একই সংকট মোকাবিলা করতে হয়, পার্থক্য একটাই সেটা হচ্ছে, দেবতা অনেক শক্তিমান ও অমর। এই হলিস্টিক দর্শন কেবল মধ্যপ্রাচ্যেই সীমিত ছিল না, বরং প্রাচীন বিশ্বে একটি সাধারণ বিষয় ছিল। বিসিই ষষ্ঠ শতকে পিন্ডার তাঁর অলিম্পিক গেমসের গানে এই বিশ্বাসের গ্রিক রূপটি তুলে ধরেছেন:

মানুষ ও দেবতার জাতি একই;
একই মায়ের কাছ থেকে আমরা নিশ্বাস নিই।
কিন্তু সর্ববিষয়ে ক্ষমতার পার্থক্য আমাদের বিচ্ছিন্ন রাখে।
কারণ একটি কিছুই নয়;
কিন্তু তামাটে আকাশ চিরস্থায়ী তৎপরতার মতো স্থির
তবু মনের কিংবা দেহের বিশালত্ব দিয়ে
আমরা অমরদের মতো হতে পারি।[৪]

AMARBOI.COM

নিজস্ব সাফল্য অর্জনে ব্যায়ামরত ক্রীড়াবিদদের তাদের নিজস্ব রূপে না দেখে, পিন্ডার তাদের দেবতাদের দেখানো উদাহরণের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, যাঁরা ছিলেন সকল মানবীয় অর্জনের আদর্শ। ধরা-ছোঁয়ার অতীত এমন কেউ হিসাবে মানুষ দাসের মতো দেবতাদের অনুকরণ করছে না বরং নিজেদের সুপ্ত স্বর্গীয় প্রকৃতি জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে।

মারদুক ও তিয়ামাতের মিথ কানানবাসীদের প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়: তারাও ঝড় ও উর্বরতার দেবতা বাআল-হাবাদ (Baal-Habad)-এর প্রায় একই রকম কাহিনী বর্ণনা করেছে। বাইবেলে প্রায়ই একেবারে প্রশংসাহীন সুরে এই দেবতার উল্লেখ আছে। সাগর ও নদীর দেবতা ইয়াম-নাহারের সঙ্গে বাআলের যুদ্ধের কাহিনী বিসিই চতুর্থ দশকে প্রস্তরলিপিতে পাওয়া গেছে। কানানের পরম প্রভু এলের (El) সঙ্গে বাস করতেন বাআল ও ইয়াম দুজনই। এলের সভায় ইয়াম তাঁর হাতে বাআলকে তুলে দেওয়ার দাবি জানালেন। দুটি মন্ত্রপুতঃ অস্ত্রের সাহায্যে ইয়ামকে পরাস্ত করলেন বাআল, তাঁকে যখন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় আশেরাহ (এলের স্ত্রী ও দেবকুলের মাতা) আবেদন জানালেন যে, একজন বন্দিকে হত্যা করা অসম্মানজনক। বাআল লজ্জিত হয়ে ইয়ামকে ছেড়ে দিলেন, যিনি পৃথিবীকে বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ক্রমাগত হুমকি দিয়ে সাগর ও নদীর বৈরী দিকের প্রতিনিধিত্ব করেন, অন্যদিকে ঝড়ের দেবতা বাআল পৃথিবীকে করে তোলেন উর্বর। মিথের

আরেকটি ভাষ্যে বাআল সাতমাথাঅলা ড্রাগন লোকান, হিব্রুতে লেভিয়াথান নামে আখ্যায়িত, কে হত্যা করেন। প্রায় সকল সংস্কৃতিতেই ড্রাগন হচ্ছে সুপ্ত, অসংগঠিত ও বৈশিষ্ট্যহীনতার প্রতীক। এইভাবে বাআল এক প্রকৃত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে আদি আকারহীনতায় প্রত্যাবর্তন রোধ করেছেন ও উপহার হিসাবে তাঁর সম্মানে দেবতাদের নির্মিত এক অপরূপ প্রাসাদ লাভ করেছেন। সুতরাং, একেবারে আদিম ধর্মে সৃজনশীলতাকে স্বর্গীয় হিসাবে দেখা হয়েছে: এখনও আমরা বাস্তবপক্ষে নতুন রূপদানকারী ও বিশ্বজগতের নতুন অর্থ প্রকাশক সৃজনশীল 'অনুপ্রেরণা'-কে প্রকাশ করতে ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করে থাকি।

কিন্তু বিপরীত দিকে যাত্রা করেন বাআল: মৃত্যু বরণ করেন তিনি, তাঁকে অবতরণ করতে হয় মৃত্যু ও দেবতা মত-এর জগতে। পুত্রের পরিণতি জানতে পেরে পরম ঈশ্বর এল্ সিংহাসন ছেড়ে নেমে আসেন, গায়ে চাপান মোটা পোশাক, গালে বাড়তি জিনিস গুঁজে দেন, কিন্তু পুত্রকে উদ্ধার করতে পারেন না। বাআলের প্রেমিকা ও বোন আনা স্বর্গরাজ্য ছেড়ে নেমে এসে তাঁর যমজ আত্মার সন্ধানে বের হন, 'গরু যেভাবে বাছুর বা ভেড়া যেভাবে তার বাচ্চাকে চায় সেভাবে তাঁকে কামনা করলেন তিনি।'[৫] মৃতদেহের খোঁজ পাবার পর তাঁর সম্মানে অন্ত্যেষ্টিভোজের আয়োজন করলেন, তারপর মত-কে বন্দি করে তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ভুট্টার মতো পিষে পুঁতে দিলেন জমিনে। অন্যান্য মহান দেবীগণ—ইনানা, ইশতার ও আইসিস সম্পর্কেও একই রকম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—যাঁরা নিহত দেবতার সন্ধান করেছেন ও পৃথিবীর মাটিতে নতুন জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। যা হোক, আনাতের বিজয়কে অবশ্যই আচরিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের পর বছর স্থায়ী রূপ দিতে হবে। পরে—আমরা জানি না কীভাবে, কারণ আমাদের সূত্র পূর্ণাঙ্গ নয়—বাআলকে পুনরুজ্জীবিত করে আনাতকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিপরীত লিঙ্গের একীভূতকরণের ভেতর দিয়ে প্রতীকায়িত পরিপূর্ণতা ও সাম্যের এই মহিমান্বিতকরণ প্রাচীন কানানে আচরিক যৌনতার মাধ্যমে পালিত হতো। এইভাবে দেবতাদের অনুকরণের মাধ্যমে নারী-পুরুষ বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের অংশীদার হতো আর সাগরের সৃজনশীলতা ও উর্বরতা নিশ্চিত করত। একজন দেবতার মৃত্যু, দেবীর অনুসন্ধান ও স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে বিজয়ীরূপে প্রত্যাবর্তন বহু সংস্কৃতিতেই চিরকালীন ধর্মীয় থিম ছিল এবং ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের উপাস্য এক ঈশ্বরের একেবারে ভিন্ন ধর্মেও তা পুনরাবৃত্ত হবে।

বাইবেলে আব্রাহামের ওপর এই ধর্ম প্রযুক্ত হয়েছে। আনুমানিক বিসিই বিংশ ও উনবিংশ শতকের মাঝামঝি কোনও এক সময় উর ত্যাগ করে শেষ

পর্যন্ত কানানে বসতি গড়েছিলেন আব্রাহাম। আমাদের কাছে আব্রাহামের সমসাময়িক কোনও দলিলপত্র নেই, তবে পণ্ডিতরা মনে করেন তিনি হয়তো যাযাবর গোত্রপ্রধানদের কেউ ছিলেন যিনি বিসিই তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষ দিকে স্বজাতিকে নিয়ে মেসোপটেমিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আগমনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই যাযাবররা, মেসোপটেমিয়া ও মিশরিয় সূত্রসমূহে যাদের আবিরু, আপিরু বা হাব্বির নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, পশ্চিমা সেমিটিক ভাষায় কথা বলত, হিব্রু এমনি একটি ভাষা। এরা মৌসুমী চক্রের ধারা অনুযায়ী দল বেঁধে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমানো যাযাবর বেদুঈনদের মতো ছিল না; এদের কোনও বিশেষ গোত্রে ফেলা বেশ কঠিন; ফলে এরা প্রায়শঃই রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ত। মরুবাসীদের তুলনায় এদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা ছিল উন্নততর। কেউ কেউ মার্সেনারি হিসাবে কাজ করত, অন্যরা সরকারি কাজে যোগ দিয়েছিল, বাকিরা বণিক, দাস বা কামারে পরিণত হয়। বুক অভ জেনেসিসে বর্ণিত আব্রাহামের কাহিনীতে তাঁকে সদোমের রাজার পক্ষে মার্সেনারি হিসাবে কর্মরত দেখানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী সারাহ্ মারা গেলে বর্তমান পশ্চিম তীরবর্তী হেবরনে জমি ক্রয় করেন আব্রাহাম।

জেনেসিসে বর্ণিত আব্রাহাম ও তাঁর নিকটতম বংশধরদের কাহিনী আধুনিককালের ইসরায়েল-এর কানানে তিনটি প্রধান হিব্রু বসতি ধারার ইঙ্গিতবহ হয়ে থাকতে পারে। একটি ধারা আব্রাহাম ও হেবরনের সঙ্গে সম্পর্কিত আনুমানিক বিসিই ১৮৫০ সংঘটিত হয়েছে। অভিবাসনের দ্বিতীয় ধারাটি আব্রাহামের পৌত্র জ্যাকবের সঙ্গে সম্পর্কিত যার নাম পরে ইসরায়েল রাখা হয়, ('ঈশ্বর যেন তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটান'); বর্তমান পশ্চিম তীরের আরব শহর নাবলুস, তখনকার শেচেমে বসতি করেছিলেন তিনি। বাইবেল আমাদের জানাচ্ছে, ইসরায়েলের বারটি গোত্রের পূর্বপুরুষে পরিণত জ্যাকবের পুত্র কানানের এক ভয়াবহ খরার সময় মিশরে অভিবাসী হয়েছিলেন। আনুমানিক বিসিই ১২০০ সালে ঘটেছিল হিব্রু বসতির তৃতীয় পর্যায়, এই সময় আব্রাহামের বংশধর বলে দাবিদার গোত্রগুলো মিশর থেকে কানানে এসে পৌঁছেছিল। তারা বলেছিল মিশরিয়রা তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল, কিন্তু তাদের নেতা মোজেসের উপাস্য ইয়াহ্ওয়েহ্ তাদের মুক্তি দিয়েছেন। জোরপূর্বক কানানে প্রবেশাধিকার আদায় করার পর তারা স্থানীয় হিব্রুদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলে ইসরায়েলি জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বাইবেল এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, আমাদের পরিচিত প্রাচীন ইসরায়েলিরা মোজেসের ঈশ্বর ইয়াহ্ওয়েহ্র প্রতি আনুগত্যের সুবাদে ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন জাতিগত দলের একটা কনফেডারেশন ছিল। অবশ্য বাইবেলিয় বিবরণ বহু

শত বছর পর, আনুমানিক বিসিই অষ্টম শতকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যদিও তা নিশ্চিতভাবে অতীতের কল্পকাহিনীর সূত্রই অনুসরণ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির বাইবেল পণ্ডিতগণ একটা জটিল পদ্ধতি গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভিটিকাস, নাম্বারস ও ডিউটেরোনমি-এর চারটি আলাদা উৎস শনাক্ত করা গেছে। পরবর্তীকালে এগুলোকে বিসিই পঞ্চম শতকে পেন্টাটিউক নামে পরিচিত একটি চূড়ান্ত খণ্ডে একীভূত করা হয়। সমালোচনার এই ধারা তীব্র বিরোধের মুখে পড়লেও এখন পর্যন্ত কেউ এমন কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পারেননি যা দিয়ে সৃজন এবং প্লাবনের মতো বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবরণ কিংবা মাঝে মাঝে বাইবেলে পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় কেন তার কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বাইবেলের দুজন আদি লেখক, জেনেসিস ও এক্সোডাসে যাঁদের রচনা পাওয়া যায়, সম্ভবত অষ্টম শতকে লিখেছিলেন, যদিও কেউ কেউ আরও আগের কথা বলেন। একজন 'J' নামে পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর ঈশ্বরকে 'ইয়াহ্ওয়েহ্' ডাকেন, অপরজন 'E' যেহেতু অধিকতর আনুষ্ঠানিক স্বর্গীয় উপাধি 'ইলোহিম' ব্যবহার পছন্দ করতেন। অষ্টম শতক নাগাদ ইসরায়েলিরা কানানকে দুটো পৃথক রাজ্যে বিভক্ত করেছিল। দক্ষিণের জুদাহ্ রাজ্যে রচনায় ব্যস্ত ছিলেন `J'. এদিকে 'E' এসেছিলেন উত্তরের ইসরায়েল রাজ্য থেকে (মানচিত্র দেখুন, পৃঃ ১৪)। পেন্টাটুয়েকের অন্য দুটি উৎস—ডিউটেরোনমিস্ট (D) এবং প্রিস্টলি (P)—র বর্ণিত ইসরায়েলের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত বিবরণ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করব।

AMARBOI.COM

আমরা দেখব যে, বহু ক্ষেত্রে J এবং E উভয়ই মধ্যপ্রাচ্য তাদের প্রতিবেশীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন, কিন্তু তাঁদের বিবরণ দেখায়, বিসিই অষ্টম শতক নাগাদ ইসরায়েলিরা তাদের নিজস্ব একটা দর্শন গড়ে তুলতে যাচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ: তারা বিশ্বজগতের সৃষ্টির এক বিবরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইতিহাসের বর্ণনা শুরু করেছেন, *এনুমা এলিশের* বিচারে যা নেহাৎ দায়সারা গোছের:

> ইয়াহ্ওয়েহ্ ঈশ্বর যখন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন, সেই সময় পৃথিবীতে কোনও বুনো ঝোপ জন্ম নেয়নি, গজিয়ে ওঠেনি কোনও বুনো গাছও, ইয়াহ্ওয়েহ্ ঈশ্বর তখনও বৃষ্টি বর্ষণ করাননি বা জমি কর্ষণের জন্য তখনও আবির্ভাব ঘটেনি মানুষের। যাহোক, জমিন থেকে বন্যার জল ক্রমশঃ বেড়ে উঠে ভরিয়ে দিচ্ছিল গোটা ভূমি। ইয়াহ্ওয়েহ্ ঈশ্বর মাটির মানুষকে (*আদম*) মাটি (*আদামাহ*) হতে তৈরি করলেন। তারপর তার

নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করলেন তিনি এবং এইভাবে মানুষ জীবীত প্রাণে পরিণত হল।[৬]

এটা ছিল একেবারে ভিন্ন পথে যাত্রা। মেসোপটেমিয়া ও কানানের সমসাময়িক পৌত্তলিকদের মতো বিশ্ব সৃষ্টি ও প্রাগৈতিহাসিক কালের ওপর গুরুত্ব আরোপের বদলে সাধারণ ঐতিহাসিক কালের ব্যাপারেই যেন বেশি আগ্রহী। বিসিই ষষ্ঠ শতকের আগে ইসরায়েলে সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃত আগ্রহ দেখা যায়নি, সেই সময় আমরা যাকে 'P' আখ্যায়িত করি, এই রচয়িতা, বর্তমান জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের তাঁর রাজকীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ইয়াহ্ওয়েহ্ই যে আকাশ ও পৃথিবীর *একক* স্রষ্টা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না তিনি। অবশ্য মানুষ ও স্বর্গীয় সত্তার মধ্যকার সুনির্দিষ্ট পার্থক্য সম্পর্কে 'J'–এর ধারণা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্রষ্টা বা দেবতার মতো একই উপাদানে গঠিত হওয়ার বদলে মানুষ (*আদম*), পান হতে বোঝা যায়, পৃথিবী (*আদামাহ*)রই অংশ।

পৌত্তলিক পড়শীদের বিপরীতে জাগতিক ইতিহাসকে দেবতাদের আদিম, পবিত্র সময়ের তুলনায় তুচ্ছ, নাজুক ও গুরুত্বহীন বলে নাকচ করে দেননি তিনি। পৌরাণিক সময়কাল অতিক্রম না করা পর্যন্ত অত্যন্ত দ্রুত অগ্রসর হয়েছেন তিনি, যেখানে প্লাবন ও টাওয়ার অভ বাবেলের মতো গল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত; তারপর ইসরায়েলের জাতির ইতিহাস বর্ণনায় হাত দিয়েছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে আব্রাম, পরে যার নাম আব্রাহাম হিসাবে (বহুজনের পিতা) পুণর্নামকরণ হয়েছে, যখন ইয়াহ্ওয়েহ্র কাছ থেকে নির্দেশিত হলেন যে, বর্তমান পূর্ব তুরস্কের হারানে তাঁর পরিবার ত্যাগ করে ভূমধ্যসাগর নিকটবর্তী কানানে অধিবাসী হওয়ার, তখন এর শুরু। আমাদেরকে জানান হয়েছে যে, তাঁর পৌত্তলিক পিতা তোবেহ্ উর থেকে আগেই সপরিবারে পশ্চিমে যাত্রা করেছিলেন। ইয়াহ্ওয়েহ্ এবার আব্রাহামকে বলছেন, তাঁর বিশেষ নিয়তি নির্ধারিত রয়েছে: তিনি এমন এক শক্তিশালী জাতির পিতায় পরিণত হবেন একদিন যাদের মোট সংখ্যা আকাশের তারার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং একদিন তাঁর উত্তরসুরিরা কানানের অধিকার লাভ করবে আপন ভূমির মতো করেই। 'J' বর্ণিত আব্রাহামের আহ্বান শোনার কাহিনী এই ঈশ্বরের আগামী ইতিহাসের ধারা স্থির করে দিচ্ছে। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে আচার অনুষ্ঠান ও মিথে স্বর্গীয় *মানার (mana)* অভিজ্ঞতা অনুভূত হতো। মারদুক, আআল ও আরাত নিজেদের তাঁদের উপাসকদের সাধারণ, তুচ্ছ জীবনের সঙ্গে জড়াবেন বলে ভাবা হয়নি: পবিত্র সময়ে তাঁদের কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েলের ঈশ্বর বাস্তব জগতের চলতি ঘটনাপ্রবাহে আপন ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

AMARBOI.COM

বর্তমানেই এক আজ্ঞা হিসাবে অনুভূত হয়েছেন তিনি। নিজ সম্পর্কে তাঁর প্রথম প্রত্যাদেশ ছিল একটি নির্দেশ: আব্রাহামকে আপন জাতিকে ত্যাগ করে কানান দেশে পাড়ি জমাতে হবে।

কিন্তু ইয়াহ্ওয়েহ্ কে? আব্রাহাম কি মোজেসের মতো একই ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন, নাকি তাকে ভিন্ন কোনও নামে চিনতেন তিনি? বর্তমান কালে বিষয়টি আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু বাইবেলে যেন এ বিষয়টি অদ্ভুতভাবে অস্পষ্টতায় আবদ্ধ এবং এ প্রশ্নের স্ববিরোধী জবাব দেয়। 'J ' বলছেন যে, আদমের পৌত্রের কাল থেকেই মানুষ ইয়াহ্ওয়েহ্র উপাসনা করে আসছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতকে 'P' যেন বোঝাতে চাইছেন জ্বলন্ত ঝোপে (Buruing Bush) তিনি মোজেসের কাছে আবির্ভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইসরায়েলিরা ইয়াহ্ওয়েহ্র কথা জানতই না। 'P' ইয়াহ্ওয়েহ্কে দিয়ে ব্যাখ্যা করাচ্ছেন, তিনি *প্রকৃতই* আব্রাহামের ঈশ্বর, যেন এটি একটি বিতর্কিত ধারণা: মোজেসকে তিনি বলছেন, আব্রাহাম তাঁকে 'এল শাদ্দাই' বলে ডাকতেন এবং স্বর্গীয় নাম ইয়াহ্ওয়েহ্ ছিল তাঁর অজ্ঞাত।[৭] অসামঞ্জস্যতাটুকু যেন বাইবেলের রচয়িতা বা সম্পাদকদের খুব একটা বিচলিত করেনি। 'J' আগাগোড়া তাঁর ঈশ্বরকে 'ইয়াহ্ওয়েহ' নামে অভিহিত করেছেন: তাঁর রচনাকালে ইয়েহ্ওয়েহ্ই ছিলেন ইসরায়েলের ঈশ্বর, এখানে আর কিছু দেখার ছিল না। ইসরায়েলি ধর্ম ছিল বাস্তবভিত্তিক, আমাদের বিচলিত করে তোলার মতো অনুমান নির্ভর বর্ণনার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিল না। কিন্তু তারপরেও আমাদের এটা ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে আব্রাহাম বা মোজেস বর্তমানের আমাদের মতো করে তাঁদের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন। বাইবেলের কাহিনী ও পরবর্তীকালের ইসারায়েলি ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এত নিগূঢ় যে আমরা পরবর্তী সময়ের ইহুদি ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান এইসব প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের ওপর আরোপ করতে প্রারোচিত হই। এভাবে আমরা ধরে নিই, ইসরাইয়েলের তিন পূর্ব পুরুষ আব্রাহাম, তাঁর পুত্র ইসাক ও পৌত্র জ্যাকব একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাঁরা একজন মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। ব্যাপারটা এমন ছিল বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, এটা বলা বোধ হয় অধিকতর সঠিক হবে যে, এইসব আদি হিব্রু পৌত্তলিক কানানে তাঁদের প্রতিবেশীদের নানান ধর্মীয় ধ্যানধারণার অংশীদার ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা মারদুক, বাআল ও আনাতের মতো দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে থাকবেন। হয়তো তাঁরা একই দেবতার উপাসনা করেননি: এমন হতে পারে যে আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাকের 'আতঙ্ক' কিংবা বা 'কিনসম্যান' ও জ্যাকবের 'মাইটি ওয়ান' তিন জন ভিন্ন দেবতা ছিলেন।[৮]

আরও অগ্রসর হতে পারি আমরা। এটা হওয়া খুবই সম্ভব যে আব্রাহামের ঈশ্বর ছিলেন কানানের পরম ঈশ্বর এল। এই দেবতা স্বয়ং আব্রাহামের কাছে

নিজের পরিচয় দিয়েছেন এল শাদ্দাই (পর্বতের এল) হিসাবে যা ছিল এল-এর প্রচলিত উপাধির একটি।[৯] অন্যত্র তাঁকে এল এলিয়ন (The Most High god) বা এল অভ বেথেল বলা হয়েছে। কানানের পরম ঈশ্বরের নাম ইসরা-য়েল বা ইশমা-এল এর মতো হিব্রু নামে সংরক্ষিত আছে। তারা এমনভাবে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিল যা মধ্যপ্রাচ্যের পৌত্তলিকদের অপরিচিত ছিল না। আমরা দেখব, বহু শতাব্দী পরে ইসরায়েলিরা ইয়াহ্ওয়েহ্র *মানা* বা 'পবিত্রতা'-কে ভীতিকর অভিজ্ঞতা হিসাবে আবিষ্কার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, সিনাই পর্বতচূড়ায় এক বিস্ময় ও ভয় জাগানো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মাঝে মোজেসের সামনে দেখা দেন তিনি, ইসরায়েলিদের তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে হয়েছে। সে তুলনায় আব্রাহামের দেবতা এল অনেক নমনীয় উপাস্য। আব্রাহামের সামনে বন্ধু হিসাবে আবির্ভূত হন তিনি, কখনও কখনও এমনকি মানুষের রূপও গ্রহণ করতেন। এপিফ্যানি নামে পরিচিত এক ধরনের অনুপ্রেরণা প্রাচীন পৌত্তলিক সমাজে সর্বজনবিদিত ছিল। যদিও সাধারণভাবে দেবতারা মরণশীল নারী-পুরুষের জীবন-ধারায় সরাসরি ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা হতো না, তবুও পৌরাণিক কালে বিশেষ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা দেবতাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। *ইলিয়াদ* একরম এপিফ্যানিতে পরিপূর্ণ। গ্রিক ও ট্রোজান উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মাধ্যমে দেব-দেবীরা এসেছেন, এই সময় মানবীয় ও স্বর্গীয় জগতের সীমানা প্রাচীর উন্মোচিত হয় বলে বিশ্বাস করা হতো। *ইলিয়াদের* একেবারে শেষ পর্যায়ে এক আকর্ষণীয় তরুণ প্রিয়ামকে পথ দেখিয়ে গ্রিক জাহাজ বহরের কাছে নিয়ে যান যিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে হারমিস বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১০] গ্রিকরা যখন তাদের বীরদের স্বর্ণযুগের কথা ভাবে, তারা অনুভব করে যে সেই বীরগণ দেবতাদের অনেক কাছাকাছি ছিলেন, দেবতারা আবার যা হোক মানব সন্তানদের মতো একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এপিফ্যানির এইসব গল্প হলিস্টিক পৌত্তলিক দর্শন প্রকাশ করেছে: স্বর্গ যখন অত্যাবশ্যকীয়ভাবে প্রকৃতি বা মানুষের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না তখন কোনওরকম ঝামেলা ছাড়াই তার অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব ছিল। জগৎ দেবতায় পরিপূর্ণ ছিল; যে কোনও সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও এক কোণে কিংবা হেঁটে বেড়ানো কোনও পথিকের মাঝে তাঁদের দেখা মিলে যেতে পারে। মনে হয় সাধারণ মানুষ হয়তো বিশ্বাস করত যে, এই ধরনের সাক্ষাৎ তাদের জীবনেও সম্ভব পর। এ থেকে অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস এর অদ্ভুত কাহিনীর ব্যাখ্যা মিলতে পারে। বিসিই প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমানে তুরস্ক নামে পরিচিত দেশের লিস্ট্রাবাসী অ্যাপসল পল ও তাঁর শিষ্য বার্নাবাসকে জিউস ও হারমিস বলে ভুল করেছিল।[১১]

AMARBOI.COM

মোটামুটি একইভাবে ইসরায়েলিরা যখন তাদের স্বর্ণযুগের কথা ভাবে, তারা আব্রাহাম, ইসাক ও জ্যাকবকে তাদের ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ শর্তাধীনে জীবন যাপন করতে দেখে। কোনও শেখ বা চীফটেইনের মতোই এল তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন: ভ্রমণের সময় পথ দেখান, জানিয়ে দেন কাকে বিয়ে করতে হবে, স্বপ্নে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। মাঝে মাঝে তাঁকে মনুষ্য আকৃতিতে দেখতে পান তাঁরা। এই ধারণাটি পরবর্তীকালে ইসরায়েলিদের জন্যে অভিশাপে পরিণত হবে। জেনেসিসের অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'J' আমাদের বলছেন, হেবরনের নিকটবর্তী মামরির ওক গাছের পাশে আব্রাহামের সামনে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বর। দিনের উত্তপ্ততম সময়ে চোখ তুলে তাকিয়ে তিনজন আগন্তুককে নিজ তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন আব্রাহাম। মধ্যপ্রাচ্যের স্বাভাবিক আতিথেয়তাবোধ থেকে তিনি ওঁদের বসে বিশ্রাম নেওয়ার ওপর জোর দেন তারপর দ্রুত খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কথোপকথনের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই লোকগুলোর মাঝে একজন তাঁর দেবতা ছাড়া আর কেউ নন, 'J' যাঁকে সবসময় 'ইয়াহ্ওয়েহ্' বলছেন। বাকি দুজন ফেরেশতা বা অ্যাঞ্জেল বলে জানা গেল। এই রহস্য উদ্ঘাটনে কেউই খুব একটা বিস্মিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বিসিই অষ্টম শতাব্দীতে 'J' যখন বাইবেল রচনা করছেন, তখন কোনও ইসরায়েলি এভাবে ঈশ্বরকে দেখার প্রত্যাশা করত না: অধিকাংশই এমন ধারণাকে ভীতিকর মনে করত। 'J'-এর সমসাময়িক 'E' ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্মপিতাদের অন্তরঙ্গতার গল্পগুলোকে বেমানান মনে করেছেন: আব্রাহাম বা জ্যাকবের কাহিনী বর্ণনার সময় 'E' ঘটনাবলীকে বহুকাল আগের বোঝাতে পছন্দ করেছেন এবং প্রাচীন কিংবদন্তীকে মনুষ্য রচনা তুল্য দাবি করার ব্যাপারে সীমা মেনে চলেছেন। এভাবে তিনি বলেছেন, ঈশ্বর একজন ফেরেশতার মাধ্যমে আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলেছেন। 'J' অবশ্য এ ধরনের খুঁতখুঁতে মনোভাব পোষণ করেননি, নিজের বর্ণনায় এইসব আদিম এপিফ্যানির পুরোনো স্বাদ বজায় রেখেছেন।

জ্যাকবও বেশ কিছু এপিফ্যানির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। একবার নিকটজনের মাঝ থেকে একজন স্ত্রী পছন্দ করার জন্যে হারানে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। যাত্রার প্রথম পর্যায়ে, জর্দান উপত্যকার কাছে লুয (Luz)-এর একটা পাথরকে বালিশের মতো ব্যবহার করে ঘুমিয়ে পড়েন। সেরাতে স্বপ্নে একটা মই দেখতে পান তিনি যেটা স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করেছে: দেবতা ও মানুষের জগতের মাঝখানে ওঠানামা করছে ফেরেশতারা। মারদুকের যিগুরাতের কথা মনে না করে পারি না আমরা: স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে ঝুলন্ত যিগুরাতের চূড়ায় একজন মানুষ তার দেবতাদের



AMARBOI.COM

সঙ্গে মিলিত হতে পারত। মইয়ের শেষ ধাপে জ্যাকব এল-কে দেখেছেন বলে স্বপ্নে দেখলেন, এল তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং আব্রাহামকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করলেন: জ্যাকবের বংশধররা এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়ে কানান দেশের মালিক হবে। তিনি আরও একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা জ্যাকবের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রেখেছিল বলে আমরা দেখব। পৌত্তলিক ধর্ম প্রায়শঃই এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক হতো: একটা নির্দিষ্ট এলাকায় কেবল বিশেষ দেবতার এখতিয়ার থাকে, বাইরে কোথাও গেলে সেখানকার স্থানীয় দেবদেবীর উপাসনা করাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। কিন্তু জ্যাকবকে এল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে জ্যাকব কানান ত্যাগ করে যখন অচেনা দেশে যাবেন তখনও তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন: 'আমি তোমার সঙ্গে আছি তুমি যেখানেই যাবে, আমি তোমাকে নিরাপদে রাখব।'[১২] প্রথম দিকের এপিফ্যানির এই কাহিনী দেখায়, কানানের পরম ঈশ্বর অধিকতর বিশ্বজনীন তাৎপর্যের অধিকারী হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন।

ঘুম থেকে উঠে জ্যাকব উপলব্ধি করলেন যে, তিনি বোকার মতো এমন এক পবিত্র জায়গায় রাত্রি যাপন করেছেন, যেখানে দেবতাদের সঙ্গে মানুষের কথোপকথন হওয়া সম্ভব: 'সত্যিই ইয়াহ্ওয়েহ্ এখানে আছেন, অথচ আমি তা জানতেই পারিনি!' তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছেন 'J'। পৌত্তলিকরা স্বর্গীয় শক্তির মুখোমুখি হলে যেভাবে অনুপ্রাণিত হতো ঠিক সেরকম বিস্ময় বোধ করলেন জ্যাকব: 'এ জায়গাটা কী ভীতিকর! এটা ঈশ্বরের ঘর (*বেথ এলা*) ছাড়া তাঁর কিছু নয়; এটাই স্বর্গের দরজা।' সহজাতভাবেই তিনি তাঁর সময় ও সংস্কৃতির ধর্মীয় ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন: দেবতাদের আবাস খোদ বাবিলনকে 'দেবদাদের তোরণ' (Beb-ili) নামে ডাকা হতো। দেশের পৌত্তলিক রীতি অনুযায়ী জায়গাটাকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিলেন জ্যাকব। বালিশ হিসাবে ব্যবহৃত পাথরটাকে উল্টে তেল মেখে পবিত্র করে নিলেন। এখন থেকে এ জায়গাকে আর লুয ডাকা যাবে না, ডাকতে হবে বেথ-এল—এল-এর ঘর। কানানের উর্বরতার ধর্ম বিশ্বাসে খাড়া পাথর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা বিসিই অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বেথ-এল-এ বিকাশ লাভ করতে দেখব আমরা। যদিও পরবর্তীকালের ইসরায়েলিরা এ ধরনের ধর্ম বিশ্বাসের তীব্র সমালোচনা করেছে, কিন্তু বেথ-এলে'র পৌত্তলিক স্যাঙ্কচুয়ারি জ্যাকব ও তাঁর ঈশ্বরের আদি কিংবদন্তীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

বেথ-এল ত্যাগ করার আগে জ্যাকব ওখানে প্রত্যক্ষ করা ঈশ্বরকে আপন ইলোহিম হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটা একটা কৌশলগত উপাধি, এ দিয়ে নারী-পুরুষের জন্যে দেবতার পক্ষে করা সম্ভব সবকিছুই বোঝানো হয়। জ্যাকব স্থির করেছিলেন, এল (কিংবা ইয়াহ্ওয়েহ্, 'J' যেমন

আখ্যায়িত করছেন) যদি সত্যিই হারানে তাঁর হেফাযত করতে পারেন, তাহলে তিনি বিশেষভাবে কার্যকর। একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছলেন তিনি: এলের বিশেষ নিরাপত্তার বিনিময়ে জ্যাকব তাঁকে *ইলোহিম* হিসাবে মেনে নেবেন, তাঁকেই একমাত্র দেবতা বলে গণ্য করা যায়। ইসরায়েলিদের ঈশ্বরের বিশ্বাস ছিল খুবই বাস্তবভিত্তিক। আব্রাহাম ও জ্যাকব দুজনই এলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, কারণ এল তাদের উপকারে এসেছেন: ধ্যানে বসে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ রাখেননি তাঁরা, এল কোনও দার্শনিক বিমূর্ত কল্পনা ছিলেন না। প্রাচীন বিশ্বে *মানা* ছিল স্বয়ং-প্রকাশিত জীবনের বাস্তবতা, এটা কার্যকরভাবে প্রদান করতে পারলেই দেবতা আপন উপযোগিতার প্রমাণ রাখতে পারতেন। ঈশ্বরের ইতিহাসে এই বাস্তববাদিতা বরাবরই এক উপাদান হয়ে থাকবে। উপকারে আসে বলেই কোনও জাতি ঐশী সম্পর্কে একটা বিশেষ ধরনের ধারণা বা বিশ্বাস মেনে নেয়, সেটা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দিক থেকে নিখুঁত বলে নয়।

বহু বছর পর স্ত্রী ও পরিবারসহ হারান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন জ্যাকব। কানানের ভূমিতে প্রবেশ করার সময় আবার এক অদ্ভুত এপিফ্যানির অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি। পশ্চিম তীরে জাব্বক-এর ফেরিঘাটে এক আগন্তুকের দেখা পান যার সঙ্গে সারা রাত হাতাহাতি মারপিট চলে তাঁর। ভোর হওয়ার সময় অধিকাংশ অলৌকিক সত্তার মতো প্রতিপক্ষ জানালেন যে, তাঁকে এবার বিদায় দিতে হবে, কিন্তু জ্যাকব তাঁকে আঁকড়ে থাকলেন: পরিচয় প্রকাশ না করা পর্যন্ত তাঁকে যেতে দেবেন না। প্রাচীন বিশ্বে ব্যক্তি বিশেষের নাম জানা থাকলে তার ওপর বিশেষ ক্ষমতা লাভ করা যেত; কিন্তু আগন্তুক যেন এই তথ্যটুকু দেওয়ার ব্যাপারে অনীহা দেখাচ্ছিলেন। অদ্ভুত মারপিট অব্যাহত থাকলে জ্যাকব সচেতন হয়ে উঠলেন যে, তার প্রতিপক্ষ স্বয়ং এল ছাড়া অন্য কেউ নন:

> তখন যাকব বিনয় করিয়া কহিলেন, 'বিনয় করি, আপনার নাম কি? বলুন।' তিনি বলিলেন, 'কি জন্যে আমার নাম জিজ্ঞাসা কর?' পরে তথায় যাকবকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন যাকব সেই স্থানের নাম পানুয়েল (এল-র মুখ) রাখিলেন। 'কারণ আমি এলকে সম্মুখা-সম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তিনি বলিলেন, 'তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।'[১৪]

এই এপিফ্যানির চেতনা পরবর্তীকালের ইহুদি একেশ্বরবাদের চেতনার চেয়ে বরং *ইলিয়াদের* চেতনার অনেক কাছাকাছি, ঈশ্বরের সঙ্গে এমন আন্তরিক সংযোগ পরবর্তীকালে ব্লাসফেমাস চিন্তা মনে করা হতো।

যদিও এইসব আদি কাহিনী ধর্মপিতাদের তাঁদের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি মোটামুটি সে সময়কার পৌত্তলিকদের মতো করেই দেখায়, তবু

AMARBOI.COM

এগুলো এক নতুন ধরনের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। গোটা বাইবেলে আব্রাহামকে 'বিশ্বাসী' মানুষ অভিহিত করা হয়েছে। আজকাল বিশ্বাসকে আমরা ধর্মমতের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মতিদান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে চাই, কিন্তু, আমরা যেমন দেখেছি, বাইবেলের রচয়িতাগণ ঈশ্বরে বিশ্বাসকে বিমূর্ত বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস হিসাবে দেখেননি। তাঁরা আব্রাহামের 'বিশ্বাসে'র প্রশংসা করার সময় তার অর্থডক্সির (ঈশ্বর সম্পর্কে একটা সঠিক ধর্মীয় মতামত ধারণ বা গ্রহণ) গুনকীর্তন করেননি বরং আমরা যেভাবে কোনও ব্যক্তি বা আদর্শে বিশ্বাস করার কথা বলি সেভাবে তাঁর আস্থার কথা বলেছেন। বাইবেলে আব্রাহাম বিশ্বাসী পুরুষ, কারণ তিনি মনে করেন, ঈশ্বর তাঁকে দেওয়া চমৎকার সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন, সেগুলোকে অসম্ভব মনে হলেও। স্ত্রী সারাহ যেখানে বন্ধ্যা সেখানে আব্রাহাম কেমন করে এক মহান জাতির পিতা হবেন? প্রকৃতপক্ষেই, সারাহ মা হতে পারবেন, এই ধারণাটা এতটাই হাস্যকর ছিল যে–তিনি মেনোপজ পর্ব অতিক্রম করে গিয়েছিলেন-প্রতিশ্রুতি শোনামাত্র আব্রাহাম ও সারাহ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। সকল প্রতিকূল অবস্থা ছাপিয়ে যখন অবশেষে তাদের পুত্রের জন্ম হলো, তাঁরা তাঁর নাম রাখলেন ইসাক, এ নামের অর্থ 'হাসি' বোঝাতে পারে। কিন্তু রসিকতা তিক্ততার রূপ নিল যখন ঈশ্বর এক ভয়ঙ্কর দাবি করে বসলেন: আব্রাহামকে অবশ্যই তাঁর একমাত্র পুত্রকে তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করতে হবে।

পৌত্তলিক সমাজে মানুষ উৎসর্গ করা ছিল সাধারণ ব্যাপার। নিষ্ঠুর হলেও এর মাঝে যুক্তি ও নীতি ছিল। প্রথম সন্তানকে প্রায়শঃই দেবতার বংশধর বলে বিশ্বাস করা হতো, মাকে যিনি *drcit de seigneur* নামক কর্মের মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বা করেছেন। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে দেবতার শক্তি কমে গিয়েছে; সুতরাং, সেটা পূরণ ও প্রাপ্ত সকল *মানার* সঞ্চালন নিশ্চিত করার জন্যে প্রথম সন্তানকে তার স্বর্গীয় অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হতো। অবশ্য ইসাকের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসাক ছিলেন ঈশ্বরের উপহার, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক সন্তান নন। উৎসর্গ করার কোনও কারণই ছিল না, প্রয়োজন ছিল না স্বর্গীয় শক্তি পুরণের। প্রকৃতপক্ষে, উৎসর্গের ফলে আব্রাহামের গোটা জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ত, তিনি এক মহান জাতির পিতা হবেন–এমন প্রতিশ্রুতির ওপর ছিল যার ভিত্তি। এই দেবতা ইতিমধ্যেই প্রাচীন বিশ্বের অপরাপর উপাস্য থেকে আলাদাভাবে ধরা দিতে শুরু করেছিলেন। তিনি মানবীয় দুঃখ-দুদর্শার অংশীদার ছিলেন না, নারী ও পুরুষের কাছ থেকে তাঁর শক্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজন পড়েনি। তিনি ছিলেন ভিন্ন এবং যাচ্ছেতাই দাবি তুলতে পারেন। আব্রাহাম তাঁর উপাস্যে আস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আর ইসাক মোরিয়াহ পর্বতের উদ্দেশে তিন দিনের যাত্রায় নামলেন। মোরিয়াহ

AMARBOI.COM

পর্বতই পরবর্তীকালে জেরুজালেমস্থ টেম্পলের নির্মাণস্থানে পরিণত হয়। ঐশী নির্দেশের কথা কিছুই জানতেন না ইসাক, নিজের সর্বনাশের কাঠ পর্যন্ত বহন করতে হচ্ছিল তাঁকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে আব্রাহাম হাতে ছুরি নেওয়ার পরেই কেবল ঈশ্বর নিবৃত্ত হলেন; অব্রাহামকে জানালেন এটা স্রেফ একটা পরীক্ষা ছিল। আব্রাহাম এক মহান জাতির পিতা হবার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন, যে জাতির লোকসংখ্যা আকাশের তারা বা সৈকতের বালিকণার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে।

কিন্তু আধুনিক মানুষের কাছে এটা এক ভয়ঙ্কর কাহিনী: এখানে ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারী ও খেয়ালি ধর্ষকামী হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছেন। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, আজকের বহু লোক যারা ছোটবেলায় এ কাহিনী শুনেছে তারা এমন একজন উপাস্যকে বর্জন করে। মিশর থেকে এক্সোডাসের মিথ, ঈশ্বর যখন মোজেস ও ইসরায়েলের সন্তানদের মুক্তির দিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেটাও আধুনিক অনুভূতির প্রতি সমান আক্রমণাত্মক। এ কাহিনী ভালো করেই জানা। ইসরায়েলিদের ছাড়তে অনিচ্ছুক ছিলেন ফারাও, তাই তার ওপর বল প্রয়োগ করার জন্যে ঈশ্বর মিশরের জনগণের উপর দশটি প্লেগ পাঠান। নীল নদ রক্তে পরিণত হয়; গোটা প্রান্তর ব্যাঙ আর পঙ্গপালে সয়লাব হয়ে গেল; নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেল সারা দেশ। সবার শেষে ভয়ঙ্করতম প্লেগটি পাঠালেন ঈশ্বর: মিশরিয়দের প্রথম সন্তানকে হত্যা করার জন্যে পাঠানো হলো মৃত্যুর ফেরেশতাকে, কিন্তু নিষ্কৃতি দেওয়া হয় হিব্রু দাসদের সন্তানদের। এটা বিস্ময়কর নয় যে, ফারাও ইসরায়েলিদের ছেড়ে দিতে রাজি হলেও পরে আবার সসৈন্য ধাওয়া করলেন তাদের। সী অভ রীডস-এ তাদের নাগাল পেলেন তিনি, কিন্তু ঈশ্বর সাগর দ্বিখণ্ডিত করে ইসরায়েলিদের অপর পারে যেতে সাহায্য করে রক্ষা করলেন। মিশরিয়রা যখন তাদের পিছু ধাওয়া করতে গেল, তিনি আবার সাগরকে মিলিয়ে দিয়ে ফারাও ও তাঁর বাহিনীকে নিমজ্জিত করে ফেললেন।

AMARBOI.COM

এটা নিষ্ঠুর, পক্ষপাতমূলক ও ঘাতক দেবতা: একজন যুদ্ধ দেবতা যিনি ইয়াহ্ওয়েহ্ স্যাবোথ বা সৈন্যদলের ঈশ্বর নামে পরিচিত হয়ে উঠবেন। তিনি প্রবলভাবে পক্ষপাতমূলক, পছন্দের ব্যক্তি ছাড়া আর কারও প্রতি মায়াদয়াহীন এবং একজন গোত্রীয় উপাস্য মাত্র। ইয়াহ্ওয়েহ্ এমন ভয়ঙ্কর দেবতা থেকে গেলে, তত তাড়াতাড়ি তাঁর বিলোপ ঘটত তত সবার মঙ্গল হতো। বাইবেলে যেভাবে আমাদের কাছে এসেছে, এক্সোডাসের চূড়ান্ত মিথকে ঘটনাপ্রবাহের আক্ষরিক বিবরণ বোঝানো হয়নি। অবশ্য প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের জন্যে একটা পরিষ্কার বাণী হয়ে থাকতে পারে, যারা দেবতাদের সাগর দ্বিখণ্ডিত করার ক্ষমতায় অভ্যস্থ ছিল। কিন্তু মারদুক ও বাআলের বিপরীতে ইয়েহ্ওয়েহ্

ঐতিহাসিক পৃথিবীতে এক সত্যিকার সাগর দ্বিখণ্ডিত করেছেন বলে বলা হয়েছে। এখানে বাস্তববাদিতার সামান্যই ছোঁয়া আছে। ইসরায়েলিরা এক্সোডাসের কাহিনী পুনঃবর্ণনা করার সময় আজ আমরা যেমন ঐতিহাসিক নির্ভুলতায় আগ্রহী তেমন আগ্রহী ছিল না বরং আদি বা মূল ঘটনার তাৎপর্যটুকু বের করার প্রয়াস পেয়েছে, সেটা যাই থাকুক না কেন। কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন যে, এক্সোডাস-কাহিনীটি কানানে মিশর ও এর মিত্রপক্ষের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংঘটিত এক সফল কৃষক বিদ্রোহের কিংবদন্তীর রূপ।[১০] সে সময়ে এমন একটা ঘটনা নজীরবিহীন ব্যাপার হওয়ার কথা, ফলে প্রত্যেকের মনে গভীর রেখাপাত করাই স্বাভাবিক। ক্ষমতাধর ও শক্তিমানের বিরুদ্ধে নির্যাতিতের ক্ষমতা লাভের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকত সেটা।

আমরা দেখব, ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ এক্সোডাসের নিষ্ঠুর নির্দয় দেবতা রয়ে যাননি, যদিও মিথটি তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিটির ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে, ইসরায়েলিরা তাঁকে দুর্জ্ঞেয় ও আবেগময় এক প্রতীকের আড়ালে শনাক্তকরণের অতীত একটা রূপ দিয়েছে। তারপরও এক্সোডাসের রক্তাক্ত কাহিনী স্বর্গ ও প্রতিহিংসাপূর্ণ ধর্মতত্ত্বের বিপজ্জনক ধারণা জাগানো অব্যাহত রাখবে। আমরা দেখব, বিসিই সপ্তম শতাব্দীতে ডিউটেরোনমিস্ট লেখক (D) নির্বাচনের ভীতিকর ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্যে এই প্রাচীন মিথ ব্যবহার করছেন, যা বিভিন্ন সময়ে তিনটি ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে নিয়তি নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। মানবীয় যে কোনও ধারণার মতো ঈশ্বরের ধারণাকেও নিজ স্বার্থে ব্যবহার ও অপব্যবহার করা যায়। মনোনীত জাতি ও স্বর্গীয় নির্বাচনের মিথ প্রায়শঃ ডিউটেরোনমিস্ট আমল থেকে আমাদের সময়েও দুঃখজনকভাবে প্রকট হয়ে আছে যা ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিম মৌলবাদের সময় পর্যন্ত সংকীর্ণ গোত্রীয় ধর্মতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ডিউটেরোনমিস্ট এক্সোডাস মিথের একটা ভাষ্য সংরক্ষণ করেছেন যা একেশ্বরবাদের ইতিহাসে সমানভাবে এবং আরও ইতিবাচকভাবে কার্যকর, যেখানে বলা হচ্ছে ঈশ্বর নির্যাতিত ও অক্ষমদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ডিউটেরোনমি-২৬-এ আমরা যা পাচ্ছি সেটা হয়তো 'J' এবং 'E'-র লিখিত বিবরণের আগে লিখিত এক্সোডাসের ব্যাখ্যা হতে পারে। ফসলের প্রথম ফল ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র পুরোহিতদের হাতে তুলে দিয়ে নিচের ঘোষণাটি উচ্চারণ করার নির্দেশ দেওয়া হলো ইসরায়েলিদের:

> এক নষ্টকল্প আরামিয় আমার পিতৃপুরুষ ছিলেন; তিনি অল্প সংখ্যায় মিশরে নামিয়া গিয়া প্রবাস করিলেন; এবং সে স্থানে মহৎ, পরাক্রান্ত ও বহু প্রজাতি হইয়া উঠিলেন। পরে মিশরিয়রা আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য

AMARBOI.COM

করিল, আমাদিগকে দুঃখ দিল ও কঠিন দাসত্ব করাইল; তাহাতে আমরা আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর ইয়াহ্ওয়েহ্‌র কাছে ক্রন্দন করিলাম আর ইয়াহ্ওয়েহ্ আমাদের রব শুনিয়া আমাদের কষ্ট, শ্রম ও উপদ্রবের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। ইয়াহ্ওয়েহ্ বলবান হস্ত, বিস্তারিত বাহু ও মহা ভয় করত এবং নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দ্বারা মিশর হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন। আর তিনি আমাদিগকে এই দেশ, মধু প্রবাহী দেশ দিয়াছেন এখন, ইয়াহ্ওয়েহ্, দেখ, তুমি আমাদের যে ভূমি দিয়াছ তাহার ফলের অগ্রিমাংশ আমি আনিয়াছি।[১৬]

ইতিহাসের প্রথম সফল কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাব্য অনুপ্রেরণাদায়ী ঈশ্বর একজন অভ্যুত্থানের ঈশ্বর। তিনটি ধর্ম বিশ্বাসের প্রত্যেকটিতে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের এক আদর্শের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, যদিও এটা বলতেই হবে যে ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা প্রায়ই এই আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে এবং ঈশ্বরকে স্থিতাবস্থার ঈশ্বরে পরিণত করেছে।

ইসরায়েলিরা ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে 'আমাদের পূর্ব পুরুষের ঈশ্বর' বলে ডেকেছে, তবু মনে হয় যে, তিনি হয়তো ধর্মপিতাদের উপাস্য কানানের পরম ঈশ্বর এলের চেয়ে ভিন্ন কোনও উপাস্য। হয়তো ইসরায়েলের ঈশ্বর হওয়ার আগে অন্য কোনও জাতির ঈশ্বর ছিলেন তিনি। মোজেসের কাছে প্রথম দিকের আবির্ভাবের ঘটনাগুলোয় ইয়াহ্ওয়েহ্ বারবার ও দীর্ঘসময় ধরে নিজেকে আব্রাহামের ঈশ্বর বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, যদিও মূলত তাঁকে এল শাদ্দাই ডাকা হয়েছে। এই জোর দাবি মোজেসের ঈশ্বরের পরিচয় সংক্রান্ত একটা অত্যন্ত প্রাচীন বিতর্কের প্রতিধ্বনি হয়ে থাকতে পারে। এমন মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ইয়াহ্ওয়েহ্ আদতে ছিলেন যোদ্ধা দেবতা, আগ্নেয়গিরির দেবতা, মিদিয়ান বা বর্তমান জর্দানে যাঁর উপাসনা করা হতো।[১৭] ইসরায়েলিরা কোথায় ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে আবিষ্কার করেছিল আমরা সেটা কখনও জানতে পারব না, যদি আদৌ তিনি একেবারে আনকোরা উপাস্য হয়ে থাকেন। আবার, বর্তমানে আমাদের জন্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা হতে পারে, তবে বাইবেলের লেখকদের জন্যে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পৌত্তলিক প্রাচীনকালে দেবতারা প্রায়ই একে অন্যের সঙ্গে মিশে যেতেন, কিংবা এক এলাকার দেবতাকে অন্য জাতির একই ধরনের দেবতা হিসাবে গ্রহণ করা হতো। আমরা এটুকুই নিশ্চিত হতে পারি যে, তাঁর উৎস যাই হোক না কেন, এক্সোডাসের ঘটনাবলী ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে ইসরায়েলিদের সুনির্দিষ্ট ঈশ্বরে পরিণত করেছিল এবং মোজেস ইসরায়েলিদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইনিই আব্রাহাম, ইসাক ও জ্যাকবের প্রিয় ঈশ্বর এল।

তথাকথিত 'মিদিয়নিয় তত্ত্ব'–অর্থাৎ ইয়াহ্ওয়েহ্ মূলত মিদিয়ান জাতির দেবতা ছিলেন–বর্তমানে সাধারণভাবে নাকচ করে দেওয়া হয়, কিন্তু মিদিয়ানেই মোজেস প্রথম ইয়াহ্ওয়েহ্র আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এটা স্মরণ করা হবে যে, ইসরায়েলি দাসের ওপর নির্যাতনকারী জনৈক মিশরিয়কে হত্যা করার পর মিশর থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন মোজেস। মিদিয়ানে আশ্রয় নেন তিনি, বিয়ে করেন এবং শ্বশুরের ভেড়ার যত্ন নেওয়ার সময়ই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেন: আগুনে একটা ঝোপ পুড়ছে কিন্তু ছাই হচ্ছে না। ভালো করে দেখার জন্যে তিনি আরও কাছাকাছি গেলে ইয়াহ্ওয়েহ্ মোজেসকে নাম ধরে ডাক দিয়েছিলেন, চেঁচিয়ে উঠেছেন মোজেস: 'আমি হাজির!' (*হিনেনি*, পূর্ণ মনোযোগ ও আনুগত্যের দাবিদার ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়ার পর ইসরায়েলের সকল পয়গম্বর এই জবাবই দিয়েছেন):

> তখন তিনি ঈশ্বর কহিলেন, 'এ স্থানের নিকটবর্তী হইও না, তোমার পদ হইতে জুতা খুলিয়া ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ উহা পবিত্র ভূমি।' তিনি আরও কহিলেন 'আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর, যাকেবের ঈশ্বর,' তখন মোজেস আপন মুখ আচ্ছাদন করিলেন কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি সরাইতে ভীত হইয়াছিলেন।'[১৮]

AMARBOI.COM

ইয়াহ্ওয়েহ্ প্রকৃতই আব্রাহামের ঈশ্বর, এই নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ইয়াহ্ওয়েহ্ একেবারে ভিন্ন ধরনের উপাস্য, আব্রাহামের সঙ্গে বন্ধুর মতো খাবার গ্রহণকারী ঈশ্বরের চেয়ে ভিন্নধারা। ইনি আতঙ্ক জাগান ও দূরত্ব বজায় রাখার ওপর জোর দেন। মোজেস যখন তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাইলেন, ইয়াহ্ওয়েহ্ পান ব্যবহার করে জবাব দিলেন, যেটা, আমরা দেখব, বহু শত বছর ধরে একেশ্বরবাদীরা চর্চা করবে। সরাসরি নিজের নাম প্রকাশ করার বদলে তিনি জবাব দিলেন, 'আমি যা আমি তাই।' (*Ehyeh asher ehyeh-I am who I Am*)।[১৯] কী ছিল এর মানে? পরবর্তীকালের দার্শনিকগণ স্থির করেছেন যে, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, নিশ্চয়ই তা বোঝাননি। এই পর্যায়ে হিব্রু ভাষার এমন কোনও আধিবিদ্যিক মাত্রা ছিল না, আরও ২,০০০ বছর পরে অর্জিত হয়েছিল তা। ঈশ্বর যেন আরও স্পষ্ট কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। *Ehyeh asher ehyeh* ইচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হিব্রু বাকধারা। বাইবেল যখন 'ওরা সেখানে গিয়েছিল সেখানেই গেছে,' ধরনের বাকধারা ব্যবহার করে তখন এটা বোঝায়: 'ওরা কোথায় গেছে তার কোনও ধারণাই নেই আমার।' সুতরাং, মোজেস যখন ঈশ্বরের পরিচয় জানতে চান কার্যতঃ তাঁর জবাব ছিল: 'আমার পরিচয় জানতে হবে

না!' বা 'নিজের চরকায় তেল দাও!' ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনওরকম আলোচনা চলবে না আর পৌত্তলিকরা যেমনটি করে থাকে, দেবতাদের নাম উচ্চারণের সময় অবশ্যই তাঁকে ব্যবহার করা যাবে না। ইয়াহ্ওয়েহ্ হলেন শর্তহীন একক। 'আমি তাই যা আমার হওয়ার কথা।' যেমন ইচ্ছা রূপ নেবেন তিনি এবং কোনও রকম নিশ্চয়তা দেবেন না। সোজাসুজি তাঁর জাতির ইতিহাসের ধারায় অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এক্সোডাসের মিথ চূড়ান্ত বলে প্রমাণিত হবে: এমনকি সর্বাধিক প্রতিকূল পরিবেশেও এটা ভবিষ্যতের জন্যে আশা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

ক্ষমতায়নের এই নতুন বোধের বিনিময়ে মূল্য দিতে হয়েছিল। মানবীয় উপলব্ধির বিচারে স্কাই গডকে অনেক বেশি দূরবর্তী মনে হয়েছিল। মারদুক, বাআল এবং মাতৃদেবী (Mother Goddesses)রা মানবজাতির অনেক কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু ইয়াহ্ওয়েহ্ আবার মানুষ ও স্বর্গের মাঝে বিরাট দূরত্ব ফিরিয়ে এনেছিলেন। সিনাই পর্বতের কাহিনীতে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। পর্বতের কাছে পৌঁছার পর জনতাকে পোশাক পবিত্র করে দূরে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। মোজেস ইসরায়েলিদের সতর্ক করতে বাধ্য হয়েছেন: 'পাহাড়ের কাছাকাছি যাবে না, ওটার পাদদেশ স্পর্শ করবে না। যে পাহাড়ের গায়ে হাত দেবে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।' জনতা পাহাড় থেকে দূরে অবস্থান করেছে আর ইয়াহ্ওয়েহ্ আগুন ও মেঘের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন:

> পরে তৃতীয় দিন প্রভাত হইলে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্ব্বতের উপরে নিবিড় মেঘ হইল আর অতিশয় উচ্চরবে তূরীধ্বনি হইতে লাগিল; তাহাতে শিবিরস্থ সমস্ত লোক কাঁপিতে লাগিল। পরে মোজেস ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যে লোকদিগকে শিবির হইতে বাহির করিলেন আর তাহারা পর্ব্বতের তলে দণ্ডায়মান হইল। তখন সমস্ত সিনাই পর্ব্বত ধূমময় ছিল; কেননা ইয়াহ্ওয়েহ্ অগ্নিসহ তাহার উপরে নামিয়া আসিলেন আর ভাটীর ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উঠিতে লাগিল এবং সমস্ত পর্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল।[২০]

মোজেস একাকী পাহাড়চূড়ায় উঠলেন এবং ল (Law) উৎকীর্ণ পাথরখণ্ডসমূহ গ্রহণ করলেন। পৌত্তলিক দর্শনের অনুরূপ প্রকৃতি হতে আহরণের বদলে শৃঙ্খলা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের মূল নীতিমালাসমূহ অর্থাৎ আইন এবার মহাকাশ হতে অবতীর্ণ করা হলো। ইতিহাসের ঈশ্বর জাগতিক বিশ্বের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন, তাঁর লীলাক্ষেত্র কিন্তু আবার এ থেকে গভীরভাবে আলাদা থাকার প্রবণতাও রয়েছে।

AMARBOI.COM

বিসিই পঞ্চম শতাব্দীতে সম্পাদিত এক্সোডাসের চূড়ান্ত টেক্সট-এ সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোজেসের সঙ্গে একটা চুক্তিতে (covennant) উপনীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে (এ ঘটনাটি ১২০০ সাল নাগাদ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হয়)। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মাঝে বিতর্ক আছে: কোনও কোনও সমালোচক বিশ্বাস করেন যে, বিসিই সপ্তম শতাব্দীর আগে এই চুক্তি ইসরায়েলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সময় যাই হোক, চুক্তির ধারণা আমাদের জানায় যে, ইসরায়েলিরা তখন একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠেনি, কেননা এটা কেবল বহু ঈশ্বরের পটভূমিতেই খাপ খায়। ইসরায়েলিরা এটা বিশ্বাস করত না যে সিনাইয়ের ঈশ্বর ইয়াহ্ওয়েহ্ই একমাত্র ঈশ্বর, তবে তারা অঙ্গীকার করেছিল, অন্য সব দেবতাকে অগ্রাহ্য করে তারা কেবল ইয়াহ্ওয়েহ্রই উপাসনা করবে। গোটা পেন্টাটিউকে একটা একেশ্বরবাদী ঘোষণা বা বাক্য খুঁজে বের করাও খুব কঠিন। এমনকি সিনাই পর্বতে হস্তান্ত রিত টেন কমান্ডমেন্টসও অন্য দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে: 'আমার সামনে তোমাদের জন্যে আর কোনও অচেনা দেবতা থাকবে না।'[২১] মাত্র একজন উপাস্যের উপাসনা করার ধারণাটি বলতে গেলে এক নজীরবিহীন পদক্ষেপ ছিল। মিশরিয় ফারাও আখেনাতেন মিশরের অন্যান্য প্রচলিত দেবতাকে অগ্রাহ্য করে সূর্য দেবতার উপাসনার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা অবিলম্বে সেই নীতিমালা পরিবর্তন করে ফেলেন। *মানার* সম্ভাব্য উৎসকে অগ্রাহ্য করা সোজাসুজি বোকামি মনে হয়েছে ইসরায়েলিদের। পরবর্তীকালের ইতিহাস আমাদের দেখায়, অন্য দেবতার কাল্ট অগ্রাহ্য করতে দারুণ অনিচ্ছুক ছিল তারা। যুদ্ধে আপন দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন ইয়াহ্ওয়েহ্, কিন্তু উর্বরতার দেবতা ছিলেন না তিনি। কানানে বসতি করার পর ইসরায়েলিরা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই আবার কানানের ভূস্বামী বাআলের কাল্টের আশ্রয় নিয়েছে, যিনি স্মরণাতীত কাল থেকে শস্য উৎপাদন করে আসছিলেন। পয়গম্বরগণ ইসরায়েলিদের চুক্তির শর্ত মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী প্রচলিত পদ্ধতিতে বাআল, আশেরাহ, ও আনাতের উপাসনা অব্যাহত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে বাইবেল আমাদের জানাচ্ছে যে, মোজেস সিনাই পর্বতে থাকার সময় বাকি সবাই কানানের পুরোনো পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে গিয়েছিল। তারা প্রচলিত প্রতিমা সোনালি ষাঁড় তৈরি করে তার সামনে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সিনাই পর্বত চূড়ার আতঙ্ক জাগানো দিব্যপ্রকাশের বিপরীতে এই ঘটনার উপস্থাপন সম্ভবত পেন্টাটিউকের সর্বশেষ সম্পাদকমণ্ডলীর ইসরায়েলের বিভাজনের তিক্ততার রূপ তুলে ধরার একটি প্রয়াস। মোজেসের মতো পয়গম্বরগণ ইয়াহ্ওয়েহ্র উচ্চ ধর্ম প্রচার করেছেন,

AMARBOI.COM

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দেবতা, প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে একতার হলিস্টিক দর্শন মোতাবেক প্রাচীন আচার পালন করতে চেয়েছে।

তারপরও এক্সোডাসের পর ইসরায়েলিরা ইয়াহ্ওয়েহ্কে তাদের একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে মানার অঙ্গীকার করেছিল। পরবর্তী বছরগুলোয় পয়গম্বরগণ এই চুক্তির কথা তাদের মনে করিয়ে দেবেন। কেবল ইয়াহ্ওয়েহ্কে *এলোহিম* হিসাবে উপাসনা করার অঙ্গীকার ছিল তাদের। বিনিময়ে ইয়াহ্ওয়েহ্র প্রতিশ্রুতি ছিল তারা তাঁর বিশেষ জাতিতে পরিণত হবে এবং তাঁর অসাধারণ কার্যকর প্রতিরক্ষা ভোগ করবে। ইয়াহ্ওয়েহ্ তাদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, চুক্তি ভঙ্গ করলে তিনি তাদের নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু তারপরেও ইসরায়েলিরা এই চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। জশুয়া পুস্তকে আমরা সম্ভবত ইসরায়েল ও তার ঈশ্বরের এই চুক্তির আদি বিবরণ পাই। চুক্তিটি ছিল এক আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক, দুটি পক্ষকে একসঙ্গে আবদ্ধ করার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে প্রায়শঃই এর ব্যবহার হতো। একটা নির্দিষ্ট ধরণ অনুসরণ করেছে এটা। চুক্তির টেক্সট শুরু হতো অধিকতর শক্তিশালী রাজার পরিচয় দিয়ে, তারপর বর্তমান কাল পর্যন্ত উভয়পক্ষের সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা করা হতো। সবশেষে চুক্তির অমর্যাদা হলে শাস্তির প্রকৃতিসহ অপরাপর শর্তাবলী উল্লেখ করা হতো। গোটা চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি ছিল শর্তহীন আনুগত্যের দাবি। চতুর্দশ শতাব্দীতে হিট্টিট রাজা দ্বিতীয় মুরসিলিস এবং তাঁর সামন্ত দুপ্পি তাশেকের মাঝে স্বাক্ষরিত চুক্তি বা কভেন্যান্টে রাজা দাবি তুলেছিলেন: 'আর কারও কাছে আশ্রয় চাইবে না। তোমার পিতা মিশরে উপঢৌকন পাঠিয়েছে, তুমি তা করবে না...আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হবে, আমার শত্রুর শত্রু হবে তুমি।' বাইবেল আমাদের বলছে ইসরায়েলিরা কানানে পৌছে আপনজনদের সঙ্গে মিলিত হলে আব্রাহামের সকল বংশধর ইয়াহ্ওয়েহ্র সঙ্গে এক চুক্তিতে উপনীত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোজেসের উত্তরাধিকারী জোশুয়া, ইয়াহ্ওয়েহ্র প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। চুক্তিটি প্রচলিত প্যাটার্ন অনুসরণ করেছে। ইয়াহ্ওয়েহ্র পরিচয় দেওয়া হয়েছে, আব্রাহাম, ইসাক ও জ্যাকবের সঙ্গে তাঁর কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে; এরপর এক্সোডাসের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে জোশুয়া চুক্তির শর্তাবলী উল্লেখ করে সমবেত ইসরায়েলি জাতির আনুষ্ঠানিক সম্মতি দাবি করেছেন:

> অতএব এখন তোমরা ইয়াহ্ওয়েহ্কে ভয় কর, সরলতায় ও সত্যে তাঁহার সেবা কর, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (ফরাৎ) নদীর ওপারে ও মিশরে যে দেবতাগণের সেবা করিত তাহাদিগকে দূর করিয়া দেও; এবং

AMARBOI.COM

ইয়াহ্ওয়েহ্র সেবা কর। যদি ইয়াহ্ওয়েহ্র সেবা করা তোমাদের মন্দ বোধহয়, তবে যাহার সেবা করিবে তাহাকে অদ্য মনোনীত কর; নদীর ওপারস্থ তোমাদের পিতৃপুরুষের সেবিত দেবগণ হয় হউক, কিম্বা যাহাদের দেশে তোমরা বাস করিতেছ সেই ইমোরিয়দের দেবগণ হয় হউক।[২২]

ইয়াহ্ওয়েহ্ ও কানানের প্রচলিত দেবতাদের মধ্য থেকে যে কোনও এক পক্ষকে বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল জনগণের। দ্বিধা করেনি ওরা। ইয়াহ্ওয়েহ্র মতো আর কোনও দেবতা ছিলেন না; আর কোনও উপাস্যকে তাঁর উপাসকের পক্ষে এমন কার্যকর দেখা যায়নি। ওদের জীবন ধারায় তাঁর শক্তিশালী হস্তক্ষেপ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, ইয়াহ্ওয়েহ্ই তাদের *এলোহিম* হওয়ার যোগ্যতা রাখেন: অন্য দেবতাদের বাদ দিয়ে তারা কেবল ইয়াহ্ওয়েহ্রই সেবা করবে। জোশুয়া তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন: ইয়াহওয়েহ দারুণ ঈর্ষাপরাণ। তারা চুক্তির শর্তাবলী উপেক্ষা করলে তিনি তাদের ধ্বংস করে দেবেন। জনতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইল: একমাত্র ইয়াহ্ওয়েহ্কেই তারা ইলোহিম হিসাবে বেছে নিয়েছে। 'তবে এখন আপনাদের মধ্যস্থিত বিজাতীয় দেবগণকে দূর করিয়া দেও, ও আপন আপন হৃদয় ইসরায়েলের ঈশ্বর ইয়াহ্ওয়েহ্র দিকে রাখ।'[২৩]

AMARBOI.COM

বাইবেল দেখাচ্ছে, জনগণ চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। যুদ্ধের সময়, যখন ইয়াহ্ওয়েহ্র সমারিক নিরাপত্তা প্রয়োজন হতো তখন চুক্তির কথা মনে করত তারা, কিন্তু শান্তির সময় অতীতের কায়দায় বাআল, আনাত ও আশেরাহ্র উপাসনায় মগ্ন হতো। যদিও ইয়াহ্ওয়েহ্র কাল্ট ঐতিহাসিক প্রবণতার দিক থেকে মৌলিকভাবে আলাদা ছিল, কিন্তু প্রায়ই প্রাচীন পৌত্তলিকতার ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাদশাহ্ সলোমন যখন তাঁর পিতা ডেভিড কর্তৃক জেরুসাইটদের কাছ থেকে অধিকৃত নগরী জেরুজালেমে ইয়াহ্ওয়েহ্র সম্মানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সেটা কানানের দেবতাদের মন্দিরসমূহের অনুরূপ ছিল। তিনটি বর্গাকৃতি জায়গার সমাহার ছিল তা, যা চৌকো আকৃতির একটা কক্ষে শেষ হয়েছে। এই কক্ষই 'পবিত্রতম মন্দির' নামে পরিচিত, যেখানে ইসরায়েলিদের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোর সময় বহনযোগ্য বেদী আর্ক অভ দ্য কভেন্যান্ট রাখা ছিল। মন্দিরের ভেতরে ছিল এক বিরাটাকৃতি ব্রোঞ্জ বেসিন যা কানানের মিথের আদিম সাগর ইয়াম-এর স্মারক: চল্লিশ ফুট দীর্ঘ মুক্ত একজোড়া পিলার, আশেরাহ্র উর্বরতার কাল্টের ইঙ্গিতবাহী। বেথ-এল, শিলোহ হেবরন, বেথলহেম ও ডান-এ কানানবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন মন্দিরগুলোয় ইয়াহ্ওয়েহ্র উপাসনা অব্যাহত রেখেছিল ইসরায়েলিরা, এসব জায়গায় প্রায়ই পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান করা হতো। মন্দিরটি অচিরেই

আলাদা মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছিল, যদিও, আমরা দেখব, ওখানে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আনঅর্থডক্স কর্মকাণ্ডও ঘটতে দেখা গেছে। ইসরায়েলিরা মন্দিরটিকে স্বর্গে ইয়াহ্ওয়েহ্‌র দরবারের অনুকৃতি হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল। প্রায়শ্চিত্ত দিবসে ছাগল উৎসর্গ করার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শরৎকালে তাদের নিজস্ব নববর্ষ উৎসব ছিল; এর পাঁচদিন পরে কৃষি বর্ষের শুরুতে উদযাপিত হতো ট্যাবারন্যাকলস ভোজ-এর নবান্ন উৎসব। মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ট্যাবারন্যাকলস ভোজের সময় মন্দিরে ইয়াহ্ওয়েহ্‌র অভিষেকের সম্মানে উচ্চারিত কিছু শ্লোক (Psalms) মারদুকের অভিষেকের মতো আদি বিশৃঙ্খলা দমন করার ঘটনার স্মৃতিচারণ।[২৪] বাদশাহ সলোমন স্বয়ং বিশিষ্ট সিনক্রিটিস্ট ছিলেন: অনেক পৌত্তলিক স্ত্রী ছিল তাঁর যাঁরা নিজস্ব দেবতার উপাসনা করতেন, বাদশা সলোমনের সঙ্গে তাঁর পৌত্তলিক পড়শীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

ইয়াহ্ওয়েহ্‌র কাল্টের জনপ্রিয় পৌত্তলিকতার আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার বিপদ বরাবরই ছিল। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে এটা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। ৮৬৯ সালে রাজা আহাব উত্তরের ইসরায়েলের রাজ্যের শাসনভার লাভ করেন। তাঁর স্ত্রী বর্তমান লেবাননের তায়ার ও সিদনের রাজকন্যা আন্তরিক পৌত্তলিক ছিলেন। গোটা দেশকে বাআল ও আশেরাহর ধর্মের অধীনে আনতে আগ্রহী ছিলেন তিনি। বাআলের পুরোহিতদের আমদানি করেন তিনি, উত্তরাঞ্চলীয়দের মাঝে দ্রুত অনুসারী যোগাড় করে ফেলেন তাঁরা, এরা রাজা ডেভিডের দ্বারা বিজিত হয়েছিল ও সুপ্ত ইয়াহ্ওয়েহ্ গোষ্ঠী। আহাব ইয়াহ্ওয়েহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেও জেজেবেলের ধর্মান্তকরণের প্রয়াসে বাদ সাধেননি। অবশ্য তাঁর শাসনাকালের শেষ দিকে যখন গোটা দেশ এক তীব্র খরায় আক্রান্ত হলো, তখন এলি-যাহ ('ইয়াহ্ওয়েহ্ আমাদের ঈশ্বর') নামের একজন পয়গম্বর পশমি চাদর ও চামড়ার লংক্লথ পরে দেশময় ইয়াহ্ওয়েহ্ প্রতি অবিশ্বস্ততার জন্যে সবাইকে অভিশাপ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কারমেল পাহাড়ে ইয়াহ্ওয়েহ্ ও বাআলের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করার জন্য রাজা আহাব আর প্রজাদের আহ্বান জানালেন তিনি। সেখানে বাআলের ৪৫০ জন পয়গম্বরের উপস্থিতিতে জনতার উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন: আর কতদিন ওরা উপাস্যের মাঝে দোদুল্যমানতায় ভুগবে? এরপর দুটো ষাঁড় আনতে বললেন তিনি, একটা নিজের জন্যে, অপরটি বাআলের পয়গম্বরদের জন্যে; দুটো ভিন্ন বেদীতে স্থাপন করতে হবে ওগুলো। যাঁর যাঁর ঈশ্বরকে ডাকবেন তাঁরা এবং দেখবেন কোন দেবতা দুর্যোগ গ্রাস করার জন্যে অগ্নি প্রেরণ করেন। 'রাজি!' চেঁচিয়ে জানান দিল জনতা। বাআলের পয়গম্বরগণ সারা সকাল তাঁকে আহ্বান জানিয়ে গেলেন; বেদী ঘিরে বিশেষ

AMARBOI.COM

নাচে অংশ নিলেন, চেঁচামেচি করে ছুরি ও বর্শা দিয়ে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করলেন। কিন্তু 'কোনও কণ্ঠস্বর শোনা গেল গেল না, মিলল না জবাব।' এলি-যাহ্ তিরস্কার করলেন: 'আরও জোরে চেঁচাও!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি, 'কেননা তিনি একজন দেবতা: অন্য কাজ করছেন বা ব্যস্ত আছেন; কিংবা হয়তো কোথাও যাত্রা করেছেন; হয়তো ঘুমিয়ে আছেন, এবার জেগে উঠবেন।' কিছুই ঘটল না: 'কোনও কণ্ঠস্বর শোনা গেল না, জবাব নেই, তাদের প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপই করা হলো না।'

এবার এলিযাহ্‌র পালা। ইয়াহ্ওয়েহ্‌র বেদীর চারপাশে ভিড় জমাল জনতা। বেদীর চারপাশে নালা খনন করে সেখানে পানি ঢেলে আগুন জ্বালানো আরও কঠিন করে তুললেন এলিযাহ্। এরপর ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে আহ্বান জানালেন তিনি। এবং অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে বেদী আর ষাঁড়কে গ্রাস করে নিল, শুষে নিল নালার সব পানি। মুখ থুবড়ে পড়ল জনতা। 'ইয়াহ্ওয়েহ্ই ঈশ্বর,' জোর গলায় বলল তারা, 'ইয়াহ্ওয়েহ্ই ঈশ্বর।' এলিযাহ্ মহানুভব বিজয়ী ছিলেন না—'বাআলের পয়গম্বরদের আটক কর!' নির্দেশ দিলেন তিনি। কাউকে ছাড়া যাবে না: নিকটবর্তী এক উপত্যকায় নিয়ে ওদের হত্যা করলেন তিনি।[২৫] পৌত্তলিক মতবাদ সাধারণত অপর জাতির ওপর আরোপিত হতে চায় না। জেজেবেল ছিলেন কৌতূহলোদ্দীপক ব্যতিক্রম–যেহেতু দেবালয়ে অন্যান্য দেবতার পাশে আরেকজন দেবতার খুব সহজেই স্থান মিলত। এইসব প্রাচীন পৌরাণিক ঘটনাবলী দেখায় যে, শুরু থেকেই ইয়াহ্ওয়েহ্‌র ধর্মমত ভয়ঙ্কর নির্যাতন ও অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব আমরা। গণহত্যার পর এলিযাহ্ কারমেল পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে প্রার্থনায় বসলেন, ক্ষাণিক পর পর দিগন্ত জরিপ করার জন্যে দাস পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে ক্ষুদ্র এক মেঘখণ্ডের খবর নিয়ে এল সে—মানুষের হাতের সমান হবে ওটার আকার—সাগর থেকে উঠে আসছে। এলিযাহ্ তখন দাসকে পাঠালেন আহাবকে খবর দেওয়ার জন্যে যেন বৃষ্টি পথরোধ করার আগেই তিনি দ্রুত বাড়ি ফিরে যান। বলতে গেলে কথা বলার মুহূর্তেই ঝড়ো মেঘে আকাশ অন্ধকার করে মুষলধারায় বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। প্রবল উচ্ছ্বাসে এলিযাহ্ তাঁর আলখেল্লা গুটিয়ে আহাবের রথের পাশাপাশি ছুটতে শুরু করলেন। বৃষ্টি প্রেরণের মাধ্যমে ইয়াহ্ওয়েহ্ ঝড় দেবতা বাআলের ভূমিকা দখল করে নিয়েছেন; প্রমাণ করেছেন, যুদ্ধের মতো উর্বরতাদানেও সমান পারঙ্গম তিনি।

পয়গম্বরদের হত্যা করার প্রতিক্রিয়া ঘটার আশঙ্কায় পালিয়ে সিনাই পেনিনসুলায় চলে যান এলিযাহ্; ঈশ্বর যেখানে মোজেসকে দর্শন দিয়েছিলেন

AMARBOI.COM

সেই পাহাড়ে আশ্রয় নেন। সেখানে এক নতুন থিওফ্যানির অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি যা নতুন ইয়াহ্ওয়েহ্বাদী আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করেছে। স্বর্গীয় প্রতাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পাহাড় প্রাচীরের এক ফোকরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে:

> স্বয়ং ইয়াহ্ওয়েহ্ সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন; এবং ইয়াহ্ওয়েহ্র অগ্রগামী প্রবল প্রচণ্ড বায়ু পর্ব্বতমালা বিদীর্ণ করিল, শৈল সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু সেই বায়ুতে ইয়াহ্ওয়েহ্ ছিলেন না। বায়ুর পরে ভূমিকম্প হইল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পে ইয়াহ্ওয়েহ্ ছিলেন না। ভূমিকম্পের পরে অগ্নি হইল, কিন্তু সে অগ্নিতে ইয়াহ্ওয়েহ্ ছিলেন না। অগ্নির পরে ঈষৎ শব্দকারী ক্ষুদ্র একক স্বর হইল, তাহা শুনিবামাত্র এলিযাহ্ শাল দিয়া মুখ ঢাকিলেন।[২৬]

পৌত্তলিক উপাস্যদের বিপরীতে প্রকৃতির কোনও শক্তি নন ইয়াহ্ওয়েহ্, বরং একেবারে আলাদা জগতের। সরব নীরবতার বৈপরীত্যের মাঝে প্রায় দুর্বোধ্য মৃদু হাওয়ার গুঞ্জনে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করা গেছে।

এলিযাহ্র কাহিনীতে ইহুদি ঐশীগ্রন্থের অতীত কালের সর্বশেষ পৌরাণিক বিবরণ রয়েছে। গোটা ওইকুমিনের সম্মুখে পরিবর্তনের হাওয়া ছিল পরিবেশে। বিসিই ৮০০-২০০ পর্যন্ত সময়কালকে অ্যাক্সিয়াল যুগ বলা হয়েছে। সভ্য জগতের সকল প্রধান অঞ্চলে মানুষ নতুন নতুন আদর্শ বা মতবাদ তৈরি করেছে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক রয়ে গেছে। নতুন ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। আমাদের উপলব্ধির সম্পূর্ণ অতীত কোনও কারণে সকল প্রধান সভ্যতা বাণিজ্যিক যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও সমান্তরালভাবে গড়ে উঠেছিল (যেমন চীন ও ইউরোপিয় অঞ্চলের কথা বলা যায়)। এক নতুন সমৃদ্ধির ফলে একটি বণিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। রাজা, পুরোহিত, মন্দির এবং রাজপ্রাসাদ থেকে বাজারে ক্ষমতার স্থানান্তর ঘটছিল। নতুন অর্জিত সম্পদ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আলোকনের দিকে নিয়ে যাবার পাশাপাশি ব্যক্তির বিবেক বোধকেও জাগিয়ে তুলেছে। নগরীসমূহে পরিবর্তনের ধারা ত্বরান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসাম্য ও শোষণের বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, জনগণ বুঝতে শুরু করে যে তাদের আচরণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিয়তি প্রভাবিত করতে পারে। এইসব সমস্যা ও উদ্বেগের সমাধানের লক্ষ্যে প্রত্যেক অঞ্চল স্পষ্টতঃ পৃথক মতবাদ গড়ে তোলে: চীনে তাওবাদ ও কুনফুসিয়াবাদ, ভারতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধমতবাদ এবং ইউরোপে দার্শনিক যুক্তিবাদ; মধ্যপ্রাচ্য একক কোনও সমাধান খুঁজে বের

AMARBOI.COM

করেনি, তবে ইরান ও ইসরায়েলে যথাক্রমে থরোসথ্রস্টোপ ও হিব্রু পয়গম্বরগণ যথাক্রমে একেশ্বরবাদের ভিন্ন রূপের জন্ম দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, সেসময়ের অন্যান্য মহান ধর্মীয় দর্শনের মতো 'ঈশ্বরে'র ধারণাও আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী পুঁজিবাদের চেতনার মাঝে বাজার অর্থনীতিতে বিকাশ লাভ করেছিল।

পরবর্তী অধ্যায়ে ইয়াহ্ওয়েহ্র পরিবর্তিত ধর্ম নিরীক্ষায় যাবার আগে আমি এমনি দুটো নতুন বিকাশের দিকে সংক্ষেপে নজর বোলানোর প্রস্তাব রাখছি। ভারতে ধর্মীয় বোধ সমরূপ ধারায় গড়ে উঠেছিল, কিন্তু এর আলাদা প্রবণতা ঈশ্বরের ইসরায়েলি ধারণার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাদিকে আলোকিত করবে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদও (Rationalism) গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা তাঁদের ধারণা গ্রহণ করেছে এবং সেগুলোকে নিজস্ব ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় সংযোজনের প্রয়াস পেয়েছে, যদিও গ্রিক ঈশ্বর তাদের ঈশ্বরের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন।

বিসিই সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ইরান থেকে আর্যরা ইন্দাস উপত্যকায় হামলা চালিয়ে স্থানীয় জনগণকে পরাভূত করে। তারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ধারণা চাপিয়ে দেয়, যেগুলো আমরা *বেদ* নামে পরিচিত গীতি কবিতার সংকলনে প্রকাশিত হতে দেখি। এখানে আমরা বহুসংখ্যক দেবতার উল্লেখ দেখতে পাই, যাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের দেবদেবীদের মতো মোটামুটি একই মূল্যবোধ প্রকাশ করেন এবং শক্তি, প্রাণ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রকৃতির শক্তির একাত্মতা তুলে ধরেন। কিন্তু তারপরও এমন ইঙ্গিত ছিল যাতে মানুষ বুঝতে শুরু করেছিল যে, অসংখ্য দেবতা হয়তো সবাইকে ছাপিয়ে যাওয়া একজন মাত্র স্বর্গীয় সত্তার প্রকাশ হতে পারেন। বাবিলনবাসীদের মতো আর্যরাও সজাগ ছিল যে তাদের মিথগুলো বাস্তব ঘটনার বিবরণ নয়, বরং এমন এক রহস্যের প্রকাশ যার যথাযথ ব্যাখ্যা দান এমনকি দেবতাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। আদি বিশৃঙ্খলা থেকে দেবতা ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়ার কল্পনা করতে গিয়ে তারা উপসংহারে পৌঁছায় যে কারও পক্ষে—এমনকি দেবতার পক্ষেও—অস্তিত্বের রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়:

> তাহলে কে বলতে পারবে কখন এর উৎপত্তি ঘটেছে,
> কখন এই উৎসারণ সংঘটিত হয়েছে,
> ঈশ্বর কি একে বিন্যস্ত করেছেন, নাকি করেন নাই,—
> কেবল এর স্বর্গীয় প্রতিপালকই জানেন।
> কিংবা হয়তো তিনিও জানেন না![২৭]

বেদের ধর্ম জীবনের উৎস ব্যাখ্যা করার দিকে যায়নি বা দার্শনিক প্রশ্নাবলীর বিশেষ ধরনের উত্তর দেয়নি। তার বদলে মানুষকে অস্তিত্বের বিস্ময় ও

আতঙ্কের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করার লক্ষ্যে একে গড়ে তোলা হয়েছে। উত্তরের চেয়ে বেশি প্রশ্নের উত্থাপন করেছে এবং মানুষকে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ধরে রাখার জন্যে গড়া হয়েছে।

বিসিই অষ্টম শতাব্দী নাগাদ যখন 'J' ও 'E' তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছেন, সেই সময় ভারতীয় উপমহাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মানে ছিল, বৈদিক ধর্ম প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। আর্য আগ্রাসনের পর বহু শত বছর চাপা পড়ে থাকা স্থানীয় জনগণের ধারণা ফের জেগে ওঠে ও এক নতুন ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। কর্মে নতুন আগ্রহ, অর্থাৎ কারও নিয়তি তার কর্ম দিয়ে নির্ধারিত হয়, এই ধারণা মানুষকে নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্যে দেবতাদের দায়ী করায় অনাগ্রহী করে তোলে। ক্রমবর্ধমান হারে দেবতাদের একজন একক দুর্জ্ঞেয় সত্তার (Reality) প্রতীক হিসাবে দেখা হচ্ছিল। বৈদিক ধর্ম উৎসর্গের আচার অনুষ্ঠানে ভরে উঠেছিল, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় অনুশীলন *যোগ* (মনোযোগ একীভূত করার বিশেষ চর্চার মাধ্যমে মনের শক্তিকে 'নিয়ন্ত্রণ') বোঝায় যে, বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্মের ওপর মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। উৎসর্গ ও শাস্ত্রীয় আচার যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি: এই আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্গত অর্থ আবিষ্কার করতে চেয়েছে তারা। আমরা স্মরণ করব যে, ইসরায়েলের পয়গম্বরগণও একই রকম অসন্তোষ বোধ করেছিলেন। ভারতে দেবতাদের আর উপাসকদের দেহাতীত কোনও সত্তা হিসাবে দেখা হচ্ছিল না, বরং নারী-পুরুষ সত্যের অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির সন্ধান করেছে।

AMARBOI.COM

ভারতে দেবতাগণ আর খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। এখন থেকে ধর্মীয় গুরুগণ তাদের ছাড়িয়ে যাবেন, যাদের দেবতাদের চেয়েও মহান বিবেচনা করা হবে। এটা ছিল মানুষের মূল্যের এক উল্লেখযোগ্য ঘোষণা ও নিজ হাতে নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা: উপমহাদেশের মহান ধর্মীয় দর্শনে পরিণত হবে এটা। হিন্দু ও বৌদ্ধ মতবাদের নতুন ধর্মগুলো দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি বা মানুষকে তাঁদের উপসনা করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তাদের দৃষ্টিতে এ ধরনের অস্বীকৃতি ও নিষেধাজ্ঞা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতো। পরিবর্তে হিন্দু ও বৌদ্ধরা দেবতাদের ছাড়িয়ে যেতে, অতিক্রম করতে নতুন পথের সন্ধান করেছে। অষ্টম শতাব্দীতে সাধুগণ *আরণ্যক এবং উপনিষদ* নামের প্রবন্ধে এইসব বিষয় আলোচনা শুরু করেন যা সম্মিলিতভাবে *বেদান্ত* নামে পরিচিত: সর্বশেষ বেদ। আরও অসংখ্য *উপনিষদ* প্রকাশ পেল, বিসিই পঞ্চম শতাব্দীর শেষ নাগাদ এগুলোর সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০টিতে। আমরা যাকে হিন্দু ধর্ম বলি সেটাকে সরলীকরণ করা অসম্ভব, কারণ এই ধর্মমত পদ্ধতি এড়িয়ে চলে ও কোনও একটি ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত বলে মানে না। তবে *উপনিষদ* দেবত্বের

একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলে যা দেবতাকে অতিক্রম করে যায় কিন্তু সর্ববস্তুতে নিবিড়ভাবে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

বৈদিক ধর্মে উৎসর্গের আনুষ্ঠানিকতায় মানুষ পবিত্র শক্তি অনুভব করেছে। এই পবিত্র শক্তিকে তারা ব্রাহ্মণ (Brahman) বলত। পুরোহিত গোত্রও (ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত) এই ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস ছিল। আনুষ্ঠানিক উৎসর্গকে সমগ্র বিশ্বের ক্ষুদ্র রূপ হিসাবে দেখা হতো বলে ব্রাহ্মণগণ আস্তে আস্তে সমস্ত কিছুর আধার এক শক্তিতে পরিণত হন। সমগ্র বিশ্বকে ব্রাহ্মণের রহস্যময় সত্তা থেকে সৃষ্ট এক স্বর্গীয় লীলা হিসাবে দেখা হয়েছে, যিনি সকল অস্তিত্বের অন্তর্গত অর্থ। *উপনিষদ* মানুষকে সবকিছুতে ব্রাহ্মণের অনুভূতি লালনের উৎসাহ যুগিয়েছে। এটা আক্ষরিক অর্থে দিব্যপ্রকাশের একটা প্রক্রিয়া: সকল সত্তার গুপ্তভূমির প্রকাশ ছিল এটা, সব ঘটনাই ব্রাহ্মণের প্রকাশে পরিণত হলো: বিভিন্ন ঘটনার পেছনে ঐক্যের ধারণার মাঝেই প্রকৃত দর্শন নিহিত। কোনও কোনও *উপনিষদ* ব্রাহ্মণকে ব্যক্তি-শক্তি হিসাবে দেখেছে, কিন্তু অন্যগুলো একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক মনে করেছে। ব্রাহ্মণকে তুমি বলে সম্বোধন করা যায় না; কারণ এটা নিরপেক্ষ; নারী বা পুরুষ অর্থে সে-ও বলা যাবে না, আবার সার্বভৌম উপাস্যের ইচ্ছা হিসাবেও অনুভব করা যাবে না। ব্রাহ্মণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন না। নারী ও পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না; এইরকম সকল মানবীয় কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিগতভাবে এটা আমাদের প্রতি সাড়াও দেন না: পাপ একে 'আক্রান্ত' করতে পারে না, একে আমাদের 'ভালোবাসতে' বা 'ক্ষিপ্ত' হতে বলা যায় না। বিশ্ব সৃষ্টি করার জন্যে একে ধন্যবাদ বা প্রশংসা করাও একেবারে বেমানান।

এই স্বর্গীয় শক্তিটি *আমাদের* আবৃত করে না রাখলে, পালন না করলে এবং অনুপ্রেরণা না যোগালে একেবারে দূরবর্তী হয়ে যেতেন। যোগের কৌশলসমূহ মানুষকে এক অন্তর্গত জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। আমরা দেখব, অঙ্গভঙ্গি, শ্বাসপ্রশ্বাস, খাদ্যগ্রহণ ও মানসিক একাত্মতার এইসব অনুশীলন অন্যান্য সংস্কৃতিতেও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেছিল যা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যায়িত অথচ মানুষের জন্যে স্বাভাবিক আলোকপ্রাপ্তি ও আলোকিত হওয়ার এক বোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। *উপনিষদের* দাবি অনুযায়ী সত্তার নতুন মাত্রার অভিজ্ঞতাই বাকি বিশ্বকে টিকিয়ে রাখা পবিত্র শক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে বিরাজিত চিরন্তন নীতিকে বলা হয় *আত্মা*। পুরোনো হলিস্টিক পৌত্তলিক দর্শনের একটা নতুন রূপ বা ভাষ্য এটা। আমাদের অন্তর ও বাইরের অত্যাবশ্যকীয়ভাবে স্বর্গীয় একক জীবনের (One Life) নতুন আবিষ্কার *চান্দোগ্য উপনিষদ* লবণের উদাহরণ টেনে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছে। শ্বেতাকেতু নামের এক তরুণ বার বছর

AMARBOI.COM

একটানা *বেদ* পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছে। তার বাবা উদ্দালক তাকে এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার জবাব দিতে পারল না সে। তখন তার একেবারে অজানা মৌলিক সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার কাজে হাত দিলেন উদ্দালক। ছেলেকে তিনি পানিতে এক টুকরো লবণ ফেলে পরদিন সকালে তাঁকে পরিণাম জানাতে বললেন। বাবা যখন তাকে লবণ দেখাতে বললেন, শ্বেতাকেতু তা খুঁজে পেল না, কারণ তা পুরোপুরি গলে গিয়েছিল। উদ্দালক এবার তাকে প্রশ্ন শুরু করলেন:

'এপ্রান্তে একটু চুমুক দেবে? কেমন স্বাদ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'লবণ।'

'মাঝখানে চুমুক দাও। কেমন স্বাদ?'

'লবণ।'

'ওই প্রান্তে চুমুক দাও। কেমন স্বাদ?'

'লবণ।'

'এটা ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসো।'

নির্দেশ পালন করল সে; [কিন্তু] তাতে লবণ যেমন ছিল তা থেকে বদলাল না।

[তার বাবা] তাকে বললেন: 'আমার প্রিয় পুত্র, এটা সত্যি যে তুমি এখানে সত্তা উপলব্ধি করতে পারছ না, কিন্তু এটাও ঠিক যে *এটা* এখানেই আছে। এই প্রথম সত্তা—সমস্ত বিশ্বজগৎ এই সত্তা হিসাবে রয়েছে। এটাই বাস্তব: এটাও সত্তা: *তুমি* যা, শ্বেতাকেতু!'

AMARBOI.COM

এভাবে যদিও আমরা দেখতে পাই না, ব্রাহ্মণ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন এবং আত্মার মতো আমাদের প্রত্যেকের মাঝে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করছেন।[২৮]

আত্মা ঈশ্বরকে প্রতিমা, সূদূরবর্তী 'বাহ্যিক' সত্তায় আমাদের ভয় আর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হওয়া থেকে বিরত রাখে। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরকে আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে আরোপিত সত্তা হিসাবে দেখা হয় না। আবার এটা জগতের সঙ্গে একাকারও নয়। যুক্তি দিয়ে এর অর্থ বোঝার কোনও উপায় নেই আমাদের। কেবল এক অভিজ্ঞতার (*anubhaba*) মাধ্যমে এর 'প্রকাশ' ঘটে—আমাদের কাছে যা শব্দ বা ধারণা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। ব্রাহ্মণকে 'শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, যাঁকে ঘিরেই শব্দসমূহ উচ্চারিত হয়...মন দিয়ে যাকে ভাবা যায় না, বরং মন তাঁকে দিয়েই ভাবে।'[২৯] এরকম পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়, এর *সম্পর্কে* চিন্তা করাও অসম্ভব, কেবল

একে চিন্তার একটা বিষয়ে পরিণত করা হবে মাত্র। এটি সত্তার অতীতে যাওয়ার আদি আনন্দ বোধের মাঝে অনুভবযোগ্য এক বাস্তবতা: ঈশ্বর।

> যারা জানে যে এটা ভাবনার অতীত তাদের ভাবনাতেই আসেন, তাদের ভাবনায় আসেন না যারা মনে করে ভেবে এর নাগাল পাওয়া যাবে।
> জ্ঞানীর জ্ঞানের অতীত এটা, সাধারণের চেনা।
> অনন্ত জীবনের দ্বারোদঘাটনের সচেতনতার আনন্দে চেনা যায় একে।[৩০]

দেবতাদের মতো, যুক্তি অস্বীকার করা হয়নি, বরং অতিক্রম করে যাওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ বা আত্মার অনুভূতি সঙ্গীত বা কবিতার মতো যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না, এ ধরনের শিল্প সৃষ্টি ও তা উপলব্ধি করার জন্যে বুদ্ধির প্রয়োজন; কিন্তু এটা এমন এক অভিজ্ঞতা বা বোধের যোগান দেয়, যা পুরোপুরি যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক সীমানা অতিক্রম করে যায়। ঈশ্বরের ইতিহাসেও এটাও একটা অপরিবর্তনীয় থিম হয়ে থাকবে।

যোগির (Yogi) মাঝে ব্যক্তিক দুর্জ্ঞেয়র আদর্শ বিজড়িত থাকে যে আলোকপ্রাপ্তির জন্যে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সত্তার ভিন্ন বলয়ে নিজেকে স্থাপন করে। বিসিই ৫৩৮ সালের নাগাদ সিদ্ধার্থ গৌতম নামের এক তরুণও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র, বানারসের আনুমানিক ১০০ মাইল উত্তরে কপিলাবাস্তুর বিলাসবহুল বাড়ি ছেড়ে ভিক্ষু সাধুতে পরিণত হয়েছিলেন। দুর্দশার দৃশ্য দেখে পীড়িত বোধ করেছিলেন তিনি, চারপাশের সবকিছুতে প্রত্যক্ষ করা অস্তিত্বের যন্ত্রণা উপশম করার রহস্য উদ্ধার করতে চেয়েছেন তিনি। ছয় বছর ধরে অসংখ্য হিন্দু গুরুর পায়ের কাছে বসেছেন, নানান ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করেছেন, কিন্তু কোনও সমাধানই পাননি। সন্ন্যাসীদের মতবাদ তার মনপুতঃ হয়নি, আবার তাঁর কৃচ্ছ্রতা সাধনও তাঁকে আরও হতাশ করে তুলেছিল। অবশেষে এইসব পদ্ধতি বাদ দিয়ে নিজেকে যখন ধ্যান নিমগ্ন করলেন, একরাতে আলোকপ্রাপ্ত হলেন তিনি। গোটা সৃষ্টি আনন্দে উদ্বেলিত হলো, দুলে উঠল পৃথিবী, স্বর্গ থেকে পুষ্প বর্ষিত হলো, সুবাসিত হাওয়া বইল এবং বিভিন্ন স্বর্গে দেবতারা আনন্দে মেতে উঠলেন। এবং আবারও, পৌত্তলিক দর্শনের মতো, দেবতা, প্রকৃতি ও মানুষ সহানুভূতিতে এক সূত্রে বাঁধা পড়ল। কষ্ট থেকে মুক্তি আর *নির্বাণ* লাভের যন্ত্রণার অবসানের এক নতুন আশা জেগে উঠেছিল। গৌতম পরিণত হলেন বুদ্ধে অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্ত জনে। গোড়াতে দূরাত্মা *মারা* প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে যথাস্থানে অবস্থান করে অর্জিত আনন্দ উপভোগে প্রলুব্ধ করতে চাইল: এ বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে কোনও লাভ হবে না, কারণ কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না। প্রচলিত দেবনিচয়ের দুজন দেবতা, মহাব্রহ্মা এবং সাকরা দেবতাদের প্রভু-বুদ্ধের কাছে এসে পৃথিবীতে তাঁর নতুন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করার

AMARBOI.COM

আবেদন জানালেন। রাজি হলেন বুদ্ধ; পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তাঁর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে গোটা ভারত চষে বেড়ালেন: এই যন্ত্রণাময় জগতে একটা মাত্র বিষয়ই স্থির ও স্থায়ী। সেটা হলো *ধম্ম*, সঠিক জীবন যাপনের মূল কথা, একমাত্র যা আমাদের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারে।

এর সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। দেবতাগণ সংস্কৃতির অংশ ছিলেন বলেই পরোক্ষে তাঁদের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিলেন বুদ্ধ, কিন্তু মানবজাতির তেমন প্রয়োজনে তাঁরা আসেন বলে বিশ্বাস করেননি। তাঁরাও রোগ-শোকে আক্রান্ত হন: আলোকপ্রাপ্তিতে তাঁকে তাঁরা সাহায্য করেননি; অন্য সব প্রাণীর মতো তাঁরাও পুনর্জন্মের চক্রের অংশ, শেষ পর্যন্ত তাঁরাও মিলিয়ে যাবেন। তারপরেও তাঁর জীবনের জটিল মুহূর্তগুলোয়–তাঁর বাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ের মতো তাঁর মনে হয়েছিল দেবতারা বুঝি তাঁকে প্রভাবিত করছেন, সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। সুতরাং বুদ্ধ দেবতাদের অস্বীকার করেননি, তবে তিনি বিশ্বাস করতেন চূড়ান্ত নির্বাণ লাভ দেবতাদের চেয়েও উঁচু মর্যাদার। বৌদ্ধরা যখন ধ্যানের মাধ্যমে চরম আনন্দ বা দুর্জ্ঞেয়র অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তারা আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তা  ঘটেছে মনে করে না। এসব অবস্থা বা পর্যায়ে মানুষের জন্যে স্বাভাবিক, সঠিক পথে জীবন যাপনকারী ও যোগের কৌশল আয়ত্তে আনা যে কারও পক্ষে এ অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব। সুতরাং, কোনও দেবতার ওপর ভরসা না করে অনুসারীদের নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ দিয়েছেন বুদ্ধ।

আলোকপ্রাপ্তির পর বানারসে প্রথম অনুসারীর দেখা পাওয়ার পর আপন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করলেন বুদ্ধ—এক অত্যাবশ্যকীয় সত্যের ওপর ভিত্তি করে যা গড়ে উঠেছে: সকল অস্তিত্বই দুঃখ (*dhukku*)। এটা পুরোপুরি যন্ত্রণাময়, সমগ্র জীবন খুবই জটিল। অর্থহীন প্রবাহে বিভিন্ন বস্তু আসে যায়। কোনও কিছুরই চিরন্তন তাৎপর্য নেই। কোথাও কিছু একটা ভুল আছে, এই বোধ নিয়ে ধর্মের শুরু। প্রাচীন পৌত্তলিকতার যুগে এই বোধ স্বর্গীয় জগৎ আমাদের চেনা জগতের সমরূপ আদর্শ জগতের কিংবদন্তীর দিকে টেনে নিয়ে গেছে, যা মানবজাতিকে শক্তি যোগাতে সক্ষম। বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সকল প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন, ভদ্র, দয়াময় ও সঠিক আচরণ দেখিয়ে ও কথা বলে এবং মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে এমন মাদক বা সমজাতীয় পদার্থ গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রেখে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। বুদ্ধ স্বয়ং নিজেকে এই পদ্ধতির আবিষ্কারক দাবি করেননি। একে *খুঁজে* পাওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি: 'আমি এক প্রাচীন পথ, প্রাচীন সড়ক দেখেছি। বহুযুগ আগে বুদ্ধদের পথে চলাচলের পথ।'[৩১] পৌত্তলিকতার বিধি-বিধানের মতো অস্তিত্বের অত্যাবশ্যকীয় কাঠামোর সঙ্গে এটা সম্পর্কিত, জীবনের সহজাত অবস্থার সঙ্গে



AMARBOI.COM

জড়িত। যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে দেখানো যায় বলে এর বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা ছিল তা নয়, বরং কেউ নির্ধারিত পথে জীবন পরিচালনা করতে উদ্যোগী হলে সে এর কার্যকারিতা বুঝতে পারবে বলেই এটা সেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। দার্শনিক বা ঐতিহাসিক প্রকাশের চেয়ে কার্যকারিতাই বরং সব সময় যে কোনও ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল: গত শত বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধরা এই ধরনের জীবনযাত্রা এক দুর্জ্ঞেয় বোধ জাগায় বলে জেনে এসেছে।

*কর্ম* মানুষকে অসংখ্য যন্ত্রণাময় জীবনের পুনর্জন্মের চক্রে বন্দি করেছে। কিন্তু নিজেদের অহমবোধকে সংস্কার করতে পারলেই তারা নিয়তিকে বদলাতে পারবে। পুনর্জন্মের প্রক্রিয়াকে জ্বলন্ত শিখার সঙ্গে তুলনা করেছেন বুদ্ধ, যার সাহায্য আরেকটি শিখা জ্বালানো হয়; শিখাটি না নেভা পর্যন্ত চলতে থাকে এভাবে। কেউ ভুল প্রবণতা নিয়ে জ্বলন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে স্রেফ আরেকটা বাতি জ্বালবে সে। কিন্তু শিখাটি নির্বাপিত হয়ে গেলে, যন্ত্রণাচক্রের অবসান ঘটবে, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটবে। 'নির্বাণে'র আক্ষরিক অর্থ 'শীতল হওয়া' বা 'বিদায় নেওয়া।' অবশ্য এটা স্রেফ একটা নেতিবাচক পর্যায় নয়, বরং বৌদ্ধদের জীবনে তা এমন এক ভূমিকা পালন করে যা ঈশ্বরের ভূমিকার অনুরূপ। এডওয়ার্ড কনযে তাঁর *বুদ্ধিজম: ইটস এসেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*-এ যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, বৌদ্ধরা প্রায়শঃই নির্বাণ বা পরম সত্তাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে আস্তিকের মতো একই ইমেজারি ব্যবহার করে থাকে:

> আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, নির্বাণ চিরস্থায়ী, স্থিতিশীল, অপচনশীল, অনড়, জরাহীন, মৃত্যুহীন, অজাত এবং অসৃষ্ট; এটা শক্তি, আনন্দ এবং সুখ, নিরাপদ আশ্রয়, আশ্রম ও আক্রমণের অতীত এক স্থান; এটাই প্রকৃত ও পরম সত্তা: এটাই *মঙ্গল*, চরম লক্ষ্য এবং আমাদের জীবনের এক এবং একমাত্র পরিণতি, চিরন্তন, গুপ্ত ও দুর্বোধ্য শান্তি।[৩২]

কোনও কোনও বৌদ্ধ এই রকম তুলনায় আপত্তি তুলতে পারে, কেননা তারা মনে করে ঈশ্বরের ধারণা তাদের পরম সত্তার ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে খুবই সীমিত। এর পেছনে প্রধান কারণ হলো অস্তিকগণ 'ঈশ্বর' শব্দটি সীমিত অর্থে এমন এক সত্তাকে বোঝাতে ব্যবহার করে যিনি আমাদের চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন নন। *উপনিষদের* সন্ন্যাসীদের মতো বুদ্ধ *নির্বাণের* ব্যাপারটিকে অন্য যে কোনও মানবীয় বৈশিষ্ট্যের মতো করে সংজ্ঞায়িত বা আলোচনা করা যাবে না বলে জোর দিয়েছেন।

নির্বাণ লাভ ক্রিশ্চানরা যেমনটি প্রায়শঃই বুঝে থাকে সেরকম 'স্বর্গে গমন'-এর মতো ব্যাপার নয়। বুদ্ধ বরাবরই নির্বাণ বা অন্য পরম বিষয়াদি



AMARBOI.COM

সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার গেছেন, কেননা সেটা 'অসঙ্গত' বা 'অনুচিত' ছিল। আমাদের পক্ষে নির্বাণের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমাদের ভাষা ও ধারণা অনুভূতি এবং বেদনার জগতের সঙ্গে বাঁধা। অভিজ্ঞতাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য 'প্রমাণ'। তাঁর অনুসারীরা নির্বাণের অস্তিত্ব জানতে পারবে, কারণ সুন্দর জীবন যাপনের চর্চা তাদের সেটা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম করে তুলবে।

> এই যে সন্ন্যাসী, অজাত, অসৃষ্ট, অগঠিত, অমিশ্র। যদি, সন্ন্যাসীরা অজাত, অসৃষ্টে, অগঠিত, অমিশ্র না হয় তাহলে, জাত, সাধারণ, গঠিত এবং মিশ্র থেকে মুক্তি সম্ভব হবে না। কিন্তু অসৃষ্টে অজাত, অগঠিত ও অমিশ্র আছে, সুতরাং জাত, সাধারণ, গঠিত ও মিশ্র থেকে আছে মুক্তি।[৩৩]

তাঁর সাধুদের নির্বাণের প্রকৃতি নিয়ে আঁচ অনুমান করা ঠিক হবে না। বুদ্ধ যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে একটা ভেলার ব্যবস্থা করে দেওয়া যার সাহায্যে তারা 'অপর পারে' যেতে পারবে। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে নির্বাণপ্রাপ্ত একজন বুদ্ধ কি মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকেন, প্রশ্নটিকে 'বেঠিক' বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন তিনি। এ যেন অগ্নিশিখা 'নিভে যাওয়া'র পর সেটা কোন দিকে গেছে জানতে চাওয়ার মতোই। নির্বাণে বুদ্ধ আছেন বলা যেমন ভুল হবে তেমনি তিনি নেই বলাটাও সমান ভুল: 'আছে' শব্দটার সঙ্গে আমাদের বোধগম্য কোনও অবস্থার সম্পর্ক নেই। আমরা দেখব, শত শত বছরের পরিক্রমায় ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা ঈশ্বরের 'অস্তিত্ব' সম্পর্কিত প্রশ্নেরও একই রকম জবাব দিয়ে এসেছে। বুদ্ধ দেখাতে চেয়েছিলেন যে, বোধ ও যুক্তির অতীত কোনও সত্তাকে বোঝাতে ভাষা যথাযথভাবে সমৃদ্ধ নয়। তিনি কিন্তু যুক্তিকে অস্বীকার করেননি, বরং স্পষ্ট ও সঠিক চিন্তা এবং ভাষার ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্য বলেছেন যে, কোনও ব্যক্তির ধর্মজ্ঞান বা বিশ্বাস, সে যেসব আচার অনুষ্ঠানে অংশ নেয়, সেগুলোর মতোই গুরুত্বহীন। এগুলো কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে, কিন্তু চরম তাৎপর্যমণ্ডিত কোনও বিষয় নয়। একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে উন্নত বা সুন্দর জীবন, যদি সে সত্যকে প্রকাশে ব্যর্থও হয়।

অন্যদিকে গ্রিকরা প্রবলভাবে যুক্তি ও কারণ সম্পর্কে আগ্রহী ছিল। প্লেটো (Ca ৪২৮ - Ca ৩৪৮ বিসিই) জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রজ্ঞার প্রকৃতি সংক্রান্ত সমস্যাদি নিয়ে যারপরনাই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের অধিকাংশ রচনাই সক্রেটিসের যুক্তির পক্ষে যুক্তি হিসাবে রচিত হয়েছিল। সক্রেটিস মানুষকে তাঁর চিন্তা উস্কে দেওয়া প্রশ্নের সাহায্যে তাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য

AMARBOI.COM

করতেন। ৩৯৯ সালে তরুণ সমাজকে পথভ্রষ্ট করা ও অপবিত্রতার অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় জনগণের পদ্ধতির প্রায় সমরূপ ছিল তা। তিনি ধর্মের প্রাচীন অনুষ্ঠান ও মিথের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট বোধ করেছেন, এগুলোকে তাঁর চোখে অর্থহীন, অনুপযুক্ত ঠেকেছে। ষষ্ঠ শতকের দার্শনিক পিথাগোরাস দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন প্লেটো, যিনি হয়তো আবার পার্সিয়া ও মিশরের মাধ্যমে ভারত থেকে আগত ধারণায় প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কোনও আত্মা দেহে আশ্রয় নেওয়া পতিত ও দূষিত দেবতা, অনেকটা কবরের শবের মতো এবং চিরস্থায়ী পুনর্জন্মের চক্রে অভিশপ্ত। আমাদের সত্তার সঙ্গে বেমানান এক পৃথিবীতে নিজেকে আগন্তুক মনে হবার সাধারণ মানবীয় অনুভূতিকে ভাষা দিয়েছেন তিনি। পিথাগোরাসের শিক্ষা ছিল আচরিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের ভেতর দিয়ে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে যা একে সুশৃঙ্খল মহাবিশ্বের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে তুলবে। প্লেটো স্বর্গের অস্তিত্ব, বোধগম্য জগতের অতীত অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা, আত্মা পতিত স্বর্গীয় সত্তার চেনা জগতের বাইরে একটা দেহে আটকা পড়েছে, যেটা মনের ক্ষমতার যৌক্তিকরণের মাধ্যমে আবার স্বর্গীয় অবস্থায় ফিরে পেতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করতেন। বিখ্যাত গুহার মিথে পৃথিবীতে মানুষের জীবনের অন্ধকার ও অস্পষ্টতার বিবরণ দিয়েছেন প্লেটো: সে কেবল গোটা প্রাচীরে ঠিকরে যাওয়া অনন্ত বাস্তবতার ছায়া প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু আস্তে আস্তে তাকে বের করে আনা সম্ভব, স্বর্গীয় আলোয় নিজের মনকে খাপ খাইয়ে আলোকপ্রাপ্তি ও মুক্তি লাভ করতে পারে সে।

পরবর্তী জীবনে প্লেটো হয়তো অনন্ত আকৃতি বা ধারণা থেকে সরে এসে থাকতে পারেন, কিন্তু বহু আস্তিকের কাছে তাদের ঈশ্বরের ধারণা ব্যাখ্যার প্রয়াসে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসব ধারণা ছিল স্থিতিশীল, স্থায়ী বাস্তবতা, মনের শক্তির যৌক্তিকীকরণের ভেতর দিয়ে যেগুলো উপলব্ধি করা সম্ভব। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যেসব অস্থির, ত্রুটিপূর্ণ ঘটনাবলীর মোকাবিলা করে থাকি সেগুলোর চেয়ে অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ, স্থায়ী ও ফলপ্রসূ বাস্তবতা। এই জগতের বস্তুসমূহ প্রতিধ্বনি মাত্র, স্বর্গীয় জগতের অনন্ত আকারে 'অংশগ্রহণ করে' বা 'অনুসরণ করে'। ভালোবাসা, ন্যায়বিচার ও সৌন্দর্য, ইত্যাদির মতো আমাদের সাধারণ ধারণার সমরূপ ধারণা রয়েছে। কিন্তু সকল আকৃতির মাঝে সেরা হচ্ছে ভালোর ধারণা। প্লেটো আদি আদর্শজগতের প্রাচীন মিথকে দার্শনিক রূপে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর চিরন্তন ধারণাসমূহকে পৌরাণিক স্বর্গীয় জগতের যৌক্তিক ভাষ্য হিসাবে দেখা যেতে পারে, জাগতিক বিষয়াদি যার তুচ্ছ ছায়ামাত্র। তিনি ঈশ্বরের প্রকৃতি আলোচনা করেননি, বরং আকৃতির স্বর্গীয় জগতে নিজেকে সীমিত রেখেছেন, যদিও

AMARBOI.COM

কখনও কখনও মনে হয় যে, আদর্শ সৌন্দর্য বা ভালো প্রকৃতিই এক পরম সত্তার কথা বোঝাচ্ছে। প্লেটোর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, স্বর্গীয় জগৎ স্থির, পরিবর্তনহীন। চলিষ্ণুতা ও পরিবর্তনকে গ্রিকরা নিম্নস্তরের বাস্তবতা হিসেবে দেখেছে: সত্য পরিচয়ধারী যে কোনও কিছু বরাবর একইরকম থাকে, স্থায়িত্ব ও অপরিবর্তনীয়তাই এর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সবচেয়ে নিখুঁত গতি হচ্ছে বৃত্ত, কারণ এটা চিরস্থায়ীভাবে ঘুরছে ও মূলবিন্দুতে ফিরে আসছে: ঘূর্ণায়মান মহাজাগতিক বলয়গুলো তাদের সাধ্যানুযায়ী স্বর্গীয় জগতকে অনুকরণ করে যাচ্ছে। স্বর্গের এই চরম স্থায়ী ইমেজ ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের ওপর সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করবে, যদিও এর সঙ্গে প্রত্যাদেশের ঈশ্বরের তেমন একটা মিল ছিল না; যিনি সব সময় ক্রিয়াশীল, সৃষ্টিশীল এবং বাইবেল অনুযায়ী, মানবজাতি সৃষ্টির পর অনুতপ্ত হয়ে গোটা মানবজাতিকে বন্যার পানিতে ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে মত পর্যন্ত পরিবর্তন করেন।

প্লেটোর একটা অতিন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে একেশ্বরবাদীদের কাছে যা খুবই জুৎসই মনে হয়। প্লেটোর স্বর্গীয় আকৃতিসমূহ 'মহাশূন্যে'র বাস্তবতা বা সত্তা নয়, বরং নিজের মাঝেই এর দেখা পাওয়া সম্ভব। *সিম্পোজিয়াম* নামের নাটকীয় সংলাপে প্লেটো দেখিয়েছেন চমৎকার শরীরের ভালোবাসা কীভাবে পরিশুদ্ধ ও আদর্শ সৌন্দর্যের ভাববাদী চিন্তায় রূপান্তরিত করা যায়। সক্রেটিসের শিক্ষক দায়োতিমার মুখে তিনি ব্যাখ্যা করিয়েছেন যে, এই সৌন্দর্য অনন্য, চিরকালীন এবং পরম, আমরা এ বিশ্বে যা কিছু দেখতে পাই তার কোনওটার মতোই নয়:

> চিরন্তন সমস্ত কিছুর আগে আদি এই সৌন্দর্য; এটা কখনও রূপ পরিগ্রহ করে না বা শেষ হয়ে যায় না, বাড়ে না বা কমেও যায় না; তারপর, আংশিক সুন্দর বা আংশিক কুৎসিত এর কোনও পর্যায় নয়, কখনও সুন্দর, কখনও অসুন্দর নয়, একের প্রেক্ষিতে সুন্দর আর অন্যের বিপরীতে অসুন্দর নয়, এক স্থানে সুন্দর আর অন্যত্র অসুন্দর নয়, দর্শকদের মত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল নয়, আবার এই সৌন্দর্য মুখমণ্ডল বা হাতের সৌন্দর্য বা দেহাতীত কোনও কিছুর সৌন্দর্য চিন্তার মতো নয়, কিংবা চিন্তা বা বিজ্ঞানের সৌন্দর্যের মতো নয়, কিংবা এমন কোনও সৌন্দর্য নয় যা অন্যত্র বিরাজমান সেটা জীবিত কোনও প্রাণী হোক, আকাশ কিংবা মাটি হোক, কিংবা যাই হোক না কেন, একে সে দেখবে পরম, এককভাবে অবস্থানরত, অনন্য, চিরন্তন হিসাবে।[৩৪]

সংক্ষেপে সুন্দরের মতো ধারণার সঙ্গে আস্তিকরা যাকে 'ঈশ্বর' বলবে তার অনেক মিল রয়েছে। কিন্তু এর দুর্জ্ঞেয়তা সত্ত্বেও ধারণাসমূহ মানুষের মনেই

AMARBOI.COM

পাওয়া যাওয়ার কথা। আমরা আধুনিক মানুষ চিন্তাকে কাজ হিসাবে দেখি যেন আমরা কিছু *করছি*। প্লেটো একে দেখেছেন এমন কিছু যা আমাদের মনে ঘটে: চিন্তার বিষয়বস্তু যে ব্যক্তি চিন্তা করছে তার মনে বা বুদ্ধিতে ক্রিয়াশীল বাস্তবতা। সক্রেটিসের মতো তিনি চিন্তাকে স্মরণের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন, আমরা সব সময় যা জানতাম কিন্তু ভুলে গেছি এমন কিছু স্মরণ করার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ যেহেতু পতিত স্বর্গীয় সত্তা, স্বর্গীয় জগতের আকৃতিসমূহ তাদের মাঝেই বিরাজ করে এবং যুক্তির মাধ্যমে সেগুলো 'স্পর্শ' করা সম্ভব, যেটা কেবল যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ নয় বরং আমাদের অভ্যন্তরস্থ অন্তঃসত্তাকে ছোঁয়ার প্রয়াস। ঐতিহাসিক একেশ্বরবাদের তিনটি ধর্মের প্রত্যেকটির অতিন্দ্রীয়বাদী সাধকদের এই ধারণা প্রবলভাবে প্রভাবিত করবে।

প্লেটো বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্ব অত্যাবশ্যকীয়ভাবে যৌক্তিক। এটা বাস্তবতার আরেকটি মিথ বা কাল্পনিক ধারণা। অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ বিসিই) আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তিনিই প্রথমবারের মতো সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি যৌক্তিক ব্যাখ্যাকরণের (Logical Reasoning) গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। *মেটাফিজিক্স* নামে পরিচিত (নামটি তাঁর সম্পাদকের দেওয়া, যিনি এইসব গবেষণামূলক প্রবন্ধকে 'ফিজিক্সের পরে': *মেটা টা ফিজিক্স*-এ স্থান দিয়েছিলেন), চৌদ্দটি নিবন্ধে সত্যের তত্ত্বগত উপলব্ধির প্রয়াসের পাশাপাশি তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান ও প্রথাগত জীববিদ্যারও গবেষণা করেছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও তিনি গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিনয়ের অধিকারী ছিলেন, জোর দিয়ে বলেছেন কারও পক্ষেই সত্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়, তবে আমাদের প্রত্যেকে সম্মিলিত উপলব্ধির ক্ষেত্রে যার যার ক্ষুদ্র ভূমিকা রাখতে পারে। প্লেটোর রচনাবলী সম্পর্কিত তাঁর মূল্যায়ন নিয়ে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিকভাবে তিনি যেন আকৃতি সম্পর্কে প্লেটোর দুর্জ্ঞেয়র ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী ছিলেন, এগুলোর আদি স্বাধীন সত্তা থাকার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অ্যারিস্টটল মত প্রকাশ করেছেন যে, কেবল আমাদের পরিচিত নিরেট বস্তুগত জগতে যতক্ষণ আছে ততক্ষণই আকৃতির অস্তিত্ব রয়েছে।

ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ছিল অ্যারিস্টটলের; ধর্ম ও মিথের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তিনি। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন রহস্যবাদী ধর্মে নবীশে পরিণত হওয়া ব্যক্তিদের কোনও বাস্তব জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন হয়নি, বরং 'বিশেষ অবস্থায় স্থাপনের মাধ্যমে বিশেষ আবেগ অনুভব করতে

AMARBOI.COM

হয়েছে।'[৩৫] এভাবেই তাঁর সুবিখ্যাত সাহিত্য তত্ত্ব ট্র্যাজিডি আতঙ্ক ও করুণা বোধের পরিশুদ্ধতাকে (Katharsis) সৃষ্টি করে যা পূনর্জন্মের অভিজ্ঞতার মতো। মূলত ধর্মীয় উৎসবের অংশ হিসাবে গড়ে ওঠা গ্রিক ট্র্যাজিডিসমূহ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ ছিল না বরং তা ছিল আরও নিগূঢ় সত্য আবিষ্কারের প্রয়াস। প্রকৃতপক্ষে কাব্য ও মিথের চেয়ে ইতিহাস অনেক বেশি গুরুত্বহীন, তুচ্ছ: 'একটা যা ঘটে গেছে তার বিবরণ দেয়, অপরটি বলে কী ঘটতে পারত। সে কারণে কাব্য ইতিহাসের চেয়ে ঢের বেশি দার্শনিক ও সিরিয়াস প্রাকৃতির; কারণ কাব্য বিশ্বজনীনতার কথা বলে, ইতিহাস বলে নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা।'[৩৬] ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে অ্যাচিলিস, ইদিপাস না থাকতে পারে কিন্তু আমরা হোমার ও সফোক্লিস-এর যেসব চরিত্রের সংস্পর্শে আসি সেগুলোর সঙ্গে তাদের জীবনের ঘটনাবলী অপ্রাসঙ্গিক যা মানব অবস্থা সম্পর্কে ভিন্নতর অথচ আরও গভীর সত্য প্রকাশ করে। ট্যাজিডির *ক্যাথারসিস* সম্পর্কিত অ্যারিস্টটলের বিবরণ এমন এক সত্যের দার্শনিক উপস্থাপন *হোমো রিলিজিয়াসরা* যা সবসময় সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই অনুধাবন করেছে: ঘটনাপ্রবাহের প্রতীকী, পৌরাণিক বা আচরিক উপস্থাপন নৈমিত্তিক জীবনে সহনীয় নয়, কিন্তু এগুলোকে আরও বিশুদ্ধ, আরও আনন্দময় রূপে পরিবর্তন করতে সক্ষম।

পরবর্তীকালের একেশ্বরবাদীর ঈশ্বর, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের ক্রিশ্চানদের ওপর অ্যারিস্টটলের ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণা ব্যাপক প্রভাবে রেখেছে। *ফিজিক্স*-এ তিনি বাস্তবতার প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের সারবস্তু পরীক্ষা করেছেন। তাঁর লব্ধ জ্ঞান সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রাচীন উৎসারণবাদী দার্শনিক ভাষ্য: অস্তিত্বের বিভিন্ন ধারাক্রম অনুযায়ী পর্যায় রয়েছে (hierarchy of existences), যার প্রত্যেকটি তার নিচের পর্যায়কে আকৃতি দান করে ও সেটার আকার ধারণ করে; কিন্তু প্রাচীন মিথের বিপরীতে অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব অনুযায়ী এই উৎসারণ তাদের উৎস থেকে যত দূরে যায় ততই দুর্বল হয়ে পড়ে। একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছেন অটল চালক (Unmoved Mover), অ্যারিস্টটল যাঁকে ঈশ্বর বলে শনাক্ত করেছেন। এই ঈশ্বর নিখুঁত সত্তা এবং সেকারণে চিরন্তন, অনড় ও আধ্যাত্মিক। ঈশ্বর খাঁটি চিন্তা আবার একই সময়ে ভাবুক ও ভাবনা, নিজেকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ লক্ষ্য উপলব্ধি করার এক অনন্ত মুহূর্তে ন্যস্ত রয়েছেন। বস্তু যেহেতু অসম্পূর্ণ ও মরণশীল, সুতরাং ঈশ্বরের কিংবা সত্তার উচ্চতর শ্রেণীতে কোনও বস্তুগত উপাদান নেই। অটল চালক সকল গতি ও বিশ্বজগতের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, কেননা প্রত্যেক গতির পেছনে কারণ থাকতে বাধ্য যা কোনও একক উৎস পর্যন্ত অনুসরণ করা সম্ভব। আকর্ষণের এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি বিশ্বকে চালু করেন, কেননা সকল সত্তাই খোদ পরম সত্তার দিকে ধাবমান।

AMARBOI.COM

এক অগ্রাধিকার স্থানে মানুষের অবস্থান: তাঁর মানব আত্মার বুদ্ধির মতো স্বর্গীয় আশীর্বাদ রয়েছে, যা তাকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশীদার করেছে। যুক্তি প্রয়োগের এই দেবসম ক্ষমতা তাকে জীব-জানোয়ার ও গাছপালার উপরে স্থাপন করেছে। অবশ্য দেহ ও আত্মারূপে মানুষ সমগ্র মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্ররূপ, নিজের মাঝে মৌলিক বস্তুগুলোর পাশাপাশি যুক্তির স্বর্গীয় গুণও ধারণ করে। আপন বুদ্ধিমত্তাকে পরিশুদ্ধ করে অমর ও স্বর্গীয় হয়ে ওঠাই তার দায়িত্ব। *প্রজ্ঞা (Sophia)* মানবীয় গুণাবলীর ভেতর শ্রেষ্ঠ: দার্শনিক সত্যের *ধ্যানের* (*Theoria*) মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে, যা প্লেটোর মতানুযায়ী, স্বয়ং ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের অনুকরণের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বর্গীয় করে তোলে। কেবল যুক্তি দিয়েই *থিয়োরিয়া* অর্জন করা সম্ভব নয়, বরং এর জন্যে প্রয়োজন শৃঙ্খলিত বোধের ভেতর দিয়ে আপন সত্তাকে অতিক্রম করে যাওয়া। অবশ্য খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি এ ধরনের প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে, এবং অধিকাংশই কেবল দৈনন্দিন জীবনে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন বা চর্চা *ফ্রনেসিস* (*Phronesis*) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

তাঁর ব্যবস্থায় অটল চালক (Unmoved Mover)-এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সত্ত্বেও অ্যারিস্টটলের ঈশ্বরের ধর্মীয় প্রাসঙ্গিকতা ছিল সামান্যই। তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেননি, কেননা তাতে করে অসঙ্গত পরিবর্তন ও পার্থিব কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হতো। যদিও সমস্ত কিছু তাঁর দিকে ধাবমান, কিন্তু এই ঈশ্বর বিশ্বজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে একেবারেই নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, কারণ তাঁর পক্ষে নিম্নস্তরের কোনও কিছু সম্পর্কে ভাবনা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্যই এ জগতকে পরিচালনা করেন না বা পথ দেখান না, আমাদের জীবনেও কোনও রকম প্রভাব রাখেন না, সে যেমনই হোক। ঈশ্বর তাঁর অস্তিত্বের প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর কাছ থেকে উৎসারিত মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন কিনা সেটাই এক বিরাট প্রশ্ন। এমন একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নটি প্রান্তিক হতে বাধ্য। অ্যারিস্টটল নিজেই হয়তো শেষ জীবনে তাঁর তত্ত্ব ত্যাগ করতেন। অ্যাক্সিয়েল যুগের মানুষ হিসাবে তিনি ও প্লেটো উভয়ই ব্যক্তি বিশেষের বিবেক, সুন্দর জীবন ও সমাজে ন্যায় বিচারের বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। তবু তাঁদের চিন্তা ভাবনা ছিল এলিটিস্ট। প্লেটোর আকৃতি সংক্রান্ত নিখুঁত জগৎ বা অ্যারিস্টটলের দূরবর্তী ঈশ্বর সাধারণ মরণশীলদের জীবনে খুব একটা প্রভাব রাখার অধিকারী ছিলেন না, এ সত্যটি পরবর্তীকালে তাঁদের ইহুদি ও মুসলিম ভক্তরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

সুতরাং অ্যাক্সিয়াল যুগের নয়া মতবাদগুলোয় একটা সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, মানুষের জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এক দুর্জ্ঞেয় উপাদান রয়েছে। আমাদের আলোচনায় বিভিন্ন পণ্ডিতগণ এই দুর্জ্ঞেয়কে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা

করেছেন, কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার বেলায় নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে একে গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নিয়েছেন সকলেই। তাঁরা প্রাচীন মিথলজিগুলোকে পুরোপুরি বাতিল করে দেননি, বরং নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন; মানুষকে সেগুলো ছাড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। একই সময় এইসব অতি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদসমূহ যখন গড়ে উঠছিল, ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ তখন পরিবর্তিত অবস্থার চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে তুলছিলেন যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত ইয়াহ্ওয়েহ্ *একমাত্র* ঈশ্বরে পরিণত হন। কিন্তু এই ক্ষেপাটে ইয়াহ্ওয়েহ্ কীভাবে অন্যান্য উচ্চমার্গীয় দর্শনের সঙ্গে মানিয়ে উঠবেন?

AMARBOI.COM

# ২
# এক ঈশ্বর

বিসিই ৭৪২ সালে জুদাইন রাজ পরিবারের একজন সদস্য দিব্যদৃষ্টিতে জেরুজালেমে বাদশাহ্ সলোমন কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে অবস্থানরত ইয়াহ্ওয়েহ্কে দেখতে পান। ইসরায়েলের জনগণের এক উদ্বেগময় সময় ছিল সেটা। সে বছর জুদাহ্র রাজা উয্যিয়াহ্ মারা যান এবং তাঁর ছেলে আহায সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রজাদের ইয়াহ্ওয়েহ্র পাশাপাশি পৌত্তলিক দেবতাদেরও উপাসনা করার জন্যে উৎসাহিত করেন তিনি। উত্তরাঞ্চলীয় ইসরায়েল রাজ্যে তখন প্রকট অরাজক-প্রায় অবস্থা চলছে: রাজা দ্বিতীয় জেরোবম-এর মৃত্যুর পর ৭৪৬ থেকে ৭৩২ সময় কালে পাঁচ-পাঁচজন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এদিকে আসিরিয়ার রাজা তৃতীয় তিগলেদ পিলসার বুভুক্ষের মতো তাঁদের ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়েছিলেন, ওই অঞ্চলটিকে নিজের ক্রমপ্রসারমান সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করতে উদগ্রীব ছিলেন তিনি। ৭২২ সালে তাঁর উত্তরাধিকারী রাজা দ্বিতীয় সারগন উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য দখল করে অধিবাসীদের বিতাড়িত করেন: ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় দশটি গোত্র একীভূত হতে বাধ্য হয় এবং ইতিহাস থেকে হারিয়ে যায়। ওদিকে ক্ষুদ্র জুদাহ্ রাজ্যটি আপন অস্তিত্ব নিয়ে ছিল শঙ্কিত। রাজা উয্যিয়াহর মৃত্যুর অল্প দিন পরে মন্দিরে প্রার্থনা করার সময় ইসায়াহ্ সম্ভবত প্রবল বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন; এবং একই সময় সম্ভবত অস্বস্তির সঙ্গে বিলাসবহুল মন্দিরে আনুষ্ঠানিকতার অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। ইসায়াহ্ হয়তো শাসক শ্রেণীর সদস্য ছিলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জনমুখী ও গণতান্ত্রিক, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্দশা নিয়ে দারুণভাবে চিন্তিত ছিলেন তিনি। পবিত্র মন্দিরের সামনের স্যাঙ্কচুয়্যারি

AMARBOI.COM

যখন সুগন্ধি ধুপের ধোঁয়ায় ভরে উঠত ও উৎসর্গের প্রাণীর রক্তের উৎকট গন্ধে ভরে যেত তিনি হয়তো তখন ইসরায়েলের ধর্ম অখণ্ডতা ও অন্তর্নিহিত অর্থ হারিয়ে ফেলেছে ভেবে শঙ্কিত বোধ করছিলেন।

সহসা তিনি যেন দেখতে পেলেন, স্বর্গীয় প্রাসাদের প্রতিরূপ মন্দিরের ঠিক ছাদ বরাবর স্বর্গীয় সিংহাসনে বসে আছেন ইয়াহ্ওয়েহ্। ইয়াহ্ওয়েহ্র আলখেল্লাহ স্যাঙ্কচুয়ারি পরিপূর্ণ করে ফেলেছে, দুজন সেরাফ তাঁর সেবা করছিল, ইয়াহ্ওয়েহ্ মুখের দিকে যেন না তাকাতে হয় তাই ডানা দিয়ে মুখ আড়াল করে রেখেছে তারা। সমবেত কণ্ঠে পরস্পরের উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে তারা: 'পবিত্র! পবিত্র! ইয়াহ্ওয়েহ্ স্যাবোথ পবিত্র। তাঁর প্রতাপ গোটা পৃথিবীকে পূর্ণ করেছে।'[1] ওদের কণ্ঠস্বরে গোটা মন্দির যেন ভিত্তিমূলসহ কাঁপছে বলে মনে হতে লাগল, ধোঁয়ায় ভরে গেল পুরো জায়গা, নিশ্ছিদ্র মেঘের মতো ঢেকে ফেলল ইয়াহ্ওয়েহ্কে, সিনাই পর্বতে যেমন মেঘ আর ধোঁয়া মোজেসের কাছ থেকে আড়াল করেছিল তাঁকে। বর্তমানে আমরা 'পবিত্র' শব্দটি ব্যবহার করার সময় সাধারণভাবে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু হিব্রু *কাদ্দোশ*-এর সঙ্গে নৈতিকতার কোনও সম্পর্ক নেই, এটা 'ভিন্নতা' (otherness), চরম ভিন্নতা বোঝায়। সিনাই পর্বতে ইয়াহ্ওয়েহ্র আবির্ভাব মানুষ ও স্বর্গীয় জগতের মাঝে আকস্মিক সৃষ্ট বিশাল দূরত্ব তুলে ধরেছিল। এযাত্রা সেরাফরা চিৎকার করে বলেছিল: 'ইয়াহ্ওয়েহ্ আলাদা! আলাদা! আলাদা!' সময়ে সময়ে নারী-পুরুষকে বিস্ময় ও আতঙ্কে ভরিয়ে তোলা ঐশ্বরিক অনুভূতির (*numinous*) অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন ইসায়াহ্। রুডল্ফ অটো তাঁর ক্লাসিক গ্রন্থ *দ্য আইডিয়া অভ দ্য হোলি*তে দুর্জ্ঞেয় সত্তার আতঙ্কময় উপলব্ধিকে *মিস্টেরিয়াম টেরিবল এত্ ফ্যাসিনান্স* বলে বর্ণনা করেছেন: এটা ভয়ঙ্কর, কেননা এমন গভীর ধাক্কার মতো আমাদের কাছে আসে যার ফলে আমরা স্বাভাবিক অবস্থার সান্ত্বনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি; এবং *ফ্যাসিন্যান্স*, কারণ বিপরীতে এটা এক ধরনের অদম্য আকর্ষণের সৃষ্টি করে। এই সর্বগ্রাসী অভিজ্ঞতার কোনও যুক্তি নেই, যার সঙ্গে অটো সঙ্গীত বা যৌনতার তুলনা করেছেন: এর সৃষ্ট আবেগ ভাষা বা ধারণা দিয়ে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে 'সম্পূর্ণ' ভিন্ন-এর অনুভূতির 'অস্তিত্ব' আছে, এটাও বলা যাবে না, কারণ আমাদের স্বাভাবিক বাস্তবতার জগতে এর কোনও স্থান নেই।[2] অ্যাক্সিয়াল যুগের নতুন ইয়াহ্ওয়েহ্ তখনও যোদ্ধাদের দেবতা *স্যাবোথ* ছিলেন, কিন্তু স্রেফ একজন যুদ্ধ দেবতা ছিলেন না; আবার কোনও গোত্রীয় উপাস্যও ছিলেন না তিনি, যিনি চরমভাবে ইসরায়েলের পক্ষে তাঁর প্রতাপ ও প্রতিশ্রুত ভূমির সীমানায় আবদ্ধ ছিলেন না, বরং গোটা পৃথিবীকে পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

AMARBOI.COM

ইসায়াহ্ স্থৈর্য ও আনন্দবাহী আলোকনের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী বুদ্ধ ছিলেন না। তিনি মানুষের নিখুঁত শিক্ষকে পরিণত হতে পারেননি। উল্টে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছেন, সশব্দে বলে উঠেছেনঃ

তখন আমি কহিলাম, হায় আমি নষ্ট হইলাম,
কেননা আমি অশুচি-ওষ্ঠাধর মানুষ,
এবং অশুচি-ওষ্ঠাধর জাতির মধ্যে বাস করিতেছি;
আর আমার চক্ষু রাজাকে ইয়াহ্ওয়েহ্ স্যাবোথকে দেখিতে পাইয়াছে।[৩]

ইয়াহ্ওয়েহ্র ছাপিয়ে যাওয়া পবিত্রতায় আক্রান্ত ইসায়াহ্ কেবল নিজের অসম্পূর্ণতা ও আচরিক অপবিত্রতা সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন। বুদ্ধ বা কোনও যোগীর বিপরীতে কিছু সংখ্যক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ভেতর দিয়ে নিজেকে এরকম অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত করেননি তিনি। আচমকা তাঁর কাছে হাজির হয়েছে এটা, এর প্রলয়ঙ্করী প্রভাবে সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়ে গেছেন তিনি। জ্বলন্ত কয়লায় টুকরো হাতে এক সেরাফ তাঁর কাছে উড়ে এসে মুখ পবিত্র করে দিল যাতে তিনি তাঁর মুখে ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ করতে পারেন। পয়গম্বরদের অনেকেই ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন বা সক্ষম ছিলেন না। ঈশ্বর সকল পয়গম্বরদের আদি সংস্করণ মোজেসকে জ্বলন্ত ঝোঁপ থেকে ডেকে ইসরায়েলের সন্তানের কাছে তাঁর বার্তাবাহক হওয়ার নির্দেশ দিলে মোজেস এই বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন যে, তিনি 'জড় মুখ ও জড় বিত্তের।'[৪] এই অপরাগতার জন্যে ছাড় দিয়েছেন ঈশ্বর, তাঁর ভাই আরনকে মোজেসের পক্ষে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। পয়গম্বরদের জীবন-কাহিনীর এই সাধারণ মোটিফটি ঈশ্বরের ভাষায় কথা বলার সমস্যাকেই প্রতীকায়িত করে। পয়গম্বরগণ স্বর্গীয় বার্তা ঘোষণায় আগ্রহী ছিলেন না; প্রবল চাপ ও কষ্টের মিশন গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন তাঁরা। ইসরায়েলের ঈশ্বরের এক দুর্জ্ঞেয় শক্তিতে রূপান্তর শান্ত, অচঞ্চল প্রক্রিয়া ছিল না, বরং কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করতে হয়েছে।

হিন্দুরা কখনও তাদের ব্রহ্মাকে মহান রাজা বলে আখ্যায়িত করেনি, কারণ তাদের ঈশ্বরকে এরকম মানবীয় পরিভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইসায়াহ্র দিব্যদর্শনের কাহিনীটিকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা না করার জন্য আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবেঃ এটা বর্ণনাতীতকে বর্ণনার একটা প্রয়াস মাত্র। ইসায়াহ্ নিজের অজান্তেই মানুষের কাছে আপন অভিজ্ঞতার খানিকটা ধারণা দিতে তাঁর দেশের জনগণের পৌরাণিক ঐতিহ্য ফিরে নিয়েছেন। শ্লোকসমূহে (Psalms) প্রায়শঃই ইয়াহ্ওয়েহ্কে সিংহাসনে আসীন রাজা হিসাবে বর্ণনা করা

AMARBOI.COM

হয়েছে, ঠিক তাদের প্রতিবেশীদের দেবতা বাআল, মারদুক ও দাগনের মতো,[৫] প্রায় একই ধরনের মন্দিরে রাজা হিসাবে যাদের অধিষ্ঠান ছিল। অবশ্য পৌরাণিক ইমেজারির আড়ালে ইসরায়েলে পরম সত্তা সম্পর্কিত এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ধারণা উঠে আসছিল। এই ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভীতিকর ভিন্নতা সত্ত্বেও ইয়াহ্ওয়েহ্ ইসায়াহ্র সঙ্গে কথা বলতে পারেন, ইসায়াহ্ও জবাব দেন। কিন্তু *উপনিষদের* সাধুদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য ঠেকত, কেননা ব্রাহ্মণ আত্মার সঙ্গে কথোপকথন বা সাক্ষাতের ধারণা অসঙ্গতভাবে মানবীয়।

ইয়াহ্ওয়েহ্ জিজ্ঞেস করলেন: 'আমি কাকে পাঠাব? কে আমাদের বার্তাবাহক হবে?' অতীতের মোজেসের মতো ইসায়াহ্ ঝটপট জবাব দিলেন: 'আমি উপস্থিত (*হিনেনি*), আমাকে পাঠান!' এই দর্শনের মূল কথা পয়গম্বরকে আলোকিত করা নয় বরং তাঁকে একটা নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেওয়া। প্রাথমিকভাবে পয়গম্বর তিনি যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যান, কিন্তু দুর্জ্ঞেয়র এই অভিজ্ঞতা-বোধ বৌদ্ধমতবাদের মতো জ্ঞান দান করে না বরং দায়িত্ব সৃষ্টি করে। পয়গম্বর অতিন্দ্রীয় আলোকনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবেন না বরং আনুগত্যের স্বাক্ষর রাখবেন। এটা প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক যে, বার্তা কখনও সহজ নয়। প্রচলিত সেমিটিক প্যারাডক্সের মাধ্যমে ইয়াহ্ওয়েহ্কে ইসায়াহকে বলেছেন যে মানুষ একে গ্রহণ করবে না: তারা ঈশ্বরের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করলে তিনি যেন হতাশ না হন: 'তুমি যাও, ওই জাতিকে বল, তোমরা শুনিতে থাকিও, কিন্তু বুঝিও না; এবং দেখিতে থাকিও, কিন্তু জানিও না।'[৬] সাত শত বছর পর মানুষকে একই রকম কঠিন বার্তা প্রত্যাখ্যান করতে দেখে জেসাসও এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন।[৭] খাঁটি সত্যকে মানব জাতি ধারণ করতে পারে না। ইসায়াহর আমলের ইসরায়েলিরা সংঘাত ও বিলুপ্তির উপান্তে অবস্থান করছিল। ইয়াহ্ওয়েহ্ তাদের কোনও সুসংবাদ দেননি: তাদের শহরগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, গ্রামগুলো বিধ্বস্ত হবে, জনশূন্য হয়ে পড়বে ঘরবাড়ি। ৭২২ সালে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের ধ্বংস ও দশটি গোত্রের বিতাড়ন প্রত্যক্ষ করার জন্য বেঁচে ছিলেন ইসায়াহ্। ৭০১ সালে সেন্নাচেরিব এক বিশাল আসিরিয় সেনাবাহিনী নিয়ে জুদাহ্য় হামলা চালান, এখানকার ছিচল্লিশটি নগরী ও দুর্গ অবরোধ করেন; শূলে চড়িয়ে হত্যা করেন প্রতিরোধকারী কর্মকর্তাদের, দেশছাড়া করেন ২০০০ মানুষকে এবং জেরুজালেমে ইহুদি রাজাকে 'খাঁচায় বন্দি পাখির মতো'[৮] আটক করেন। এসব আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করার পুরস্কারহীন দায়িত্ব পেয়েছিলেন ইসায়াহ্:

> যদ্যপি তাহার দশমাংশও থাকে,
> তথাপি তাহাকে পুনর্বার গ্রাস করা যাইবে;

> কিন্তু যেমন এলা ও অলোনে বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও তাহার গুঁড়ি থাকে,
> তেমনি এই জাতির গুঁড়িস্বরূপ এক পবিত্র বংশ থাকিবে।[৯]

একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের পক্ষে এসব দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া অসম্ভব ছিল না। ইসায়াহ্র বাণীর অসাধারণ মৌলিকত্ব হচ্ছে তাঁর পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। মোজেসের প্রাচীন পক্ষপাতদুষ্ট ঈশ্বর আসিরিয়াকে শত্রুর ভূমিকায় নিয়ে আসতেন; ইসায়াহ্র ঈশ্বর আসিরিয়াহকে নিজ উপায় হিসাবে দেখেছেন: দ্বিতীয় সারগন ও সেন্নাচেরিব ইসরায়েলিদের দেশান্তরী করে দেশকে ধ্বংস করেননি। 'ইয়াহ্ওয়েহ্ই জনগণকে বিতাড়ন করেছেন।'[১০]

অ্যাক্সিয়াল যুগের পয়গম্বরদের বাণীর এটাই ছিল এক সুর। কেবল মিথ ও লিটার্জিতে নয়, ইসরায়েলের ঈশ্বর নিরেট বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে প্রকাশের মাধ্যমে মূলত পৌত্তলিক উপাস্য হতে নিজের অনন্যতা প্রকাশ করেছিলেন। এবার নতুন পয়গম্বরগণ জোর দিয়ে বলতে শুরু করলেন যে, রাজনৈতিক দুর্যোগ ও বিজয় উভয়ই ঈশ্বরকে প্রকাশ করে যিনি ইতিহাসের প্রভু ও নিয়ন্তা হয়ে উঠছেন। সকল জাতি তাঁর ভাণ্ডারে ছিল। আসিরিয়াহ্ দুর্যোগ কবলিত হবে, কারণ এর শাসকগণ উপলব্ধি করতে পারেনি যে তাঁরা আসলে আরও বিশাল এক সত্তার হাতের পুতুল মাত্র।[১১] যেহেতু ইয়াহ্ওয়েহ্ আসিরিয়ার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছেন, সেহেতু ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্ষীণ একটা আশা ছিল। কিন্তু কোনও ইসরায়েলি এ কথা শুনতে চাইত না যে তার স্বজাতিই অদূরদর্শী রাজনীতি ও শোষণমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে মাথার উপর রাজনৈতিক ধ্বংস ডেকে এনেছে। এ কথা শুনে কেউ খুশি হতো না যে, ইয়াহ্ওয়েহ্ই ৭২২ এবং ৭০১ সালে আসিরিয়া যুদ্ধের রূপকার ছিলেন, ঠিক যেভাবে তিনি জোশুয়া, গিদিয়ান ও রাজা ডেভিডের সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যে জাতির তাঁর মনোনীত জাতি হওয়ার কথা সে জাতিকে নিয়ে কী ছেলেখেলা খেলছিলেন তিনি? ইসায়াহ্ কর্তৃক ইয়াহ্ওহেয়ের বর্ণনায় স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের কিছু ছিল না। মানুষকে কষ্ট হতে মুক্তি দানের বদলে ইয়াহ্ওয়েহ্ যেন অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার মোকাবিলা করতে বলছিলেন। মানুষকে পৌরাণিক কালে নিক্ষেপকারী প্রাচীন কাল্টিক রীতিনীতির আশ্রয় নেওয়ার বদলে ইসায়াহ্র মতো পয়গম্বরগণ দেশবাসীকে ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলেন এবং সেগুলোকে ঈশ্বরের সঙ্গে ভীতিকর সংলাপ হিসাবে মেনে নিতে বলেছিলেন।

মোজেসের ঈশ্বর যেখানে বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত ছিলেন, ইসায়াহ্র ঈশ্বর সেখানে বিষাদময়। ভবিষ্যদ্বাণী, আমরা যেভাবে পাই, শুরু হয়েছে এক শোকবার্তা দিয়ে যেটা চুক্তির মানুষের জন্য দারুণভাবে হতাশাব্যাঞ্জক: ষাঁড় ও

AMARBOI.COM

গাধা যার যার মনিবকে চেনে, কিন্তু 'ইসরায়েল জানে না, আমার প্রজাগণ বিবেচনা করে না।'[১২] মন্দিরে পশুর উৎসর্গ নিয়ে ইয়াহ্ওয়েহ্ দারুণ বিক্ষুব্ধ, বাছুরের চর্বি দেখে তিনি অসুস্থ বোধ করেন, ছাগলের রক্ত ও পোড়া পশুর ঝরে পড়া রক্ত বিবমিষা জাগায়। ওদের উৎসব, নববর্ষের অনুষ্ঠান ও তীর্থযাত্রা বরদাশত করতে পারেননি তিনি।[১৩] ইসায়াহ্র শ্রোতারা এতে হতচকিত হয়ে থাকতে পারে: মধ্যপ্রাচ্যে এইসব কাল্টিক আনুষ্ঠানিকতা ছিল ধর্মের মূল রূপ। পৌত্তলিক দেবতাগণ তাঁদের হ্রাসমান শক্তির নবায়নের জন্যে আনুষ্ঠানিকতার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন; মন্দিরের জাঁকজমকের ওপর তাদের মর্যাদার অংশ নির্ভর করত। এখন ইয়াহ্ওয়েহ্ বলছেন তাঁর কাছে এসব কর্মকাণ্ড একেবারে অর্থহীন। ওইকুমিনের অন্যান্য সাধু ও দার্শনিকের মতো ইসায়াহ্ উপলব্ধি করেছিলেন যে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা যথেষ্ট নয়। ইসরায়েলিদের অবশ্যই তাদের ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে হবে। ইয়াহওয়েহ্ উৎসর্গ নয় বরং সমবেদনা চেয়েছেন:

> যদ্যপি অনেক প্রার্থনা কর,
> তথাপি শুনিব না;
> তোমাদের হস্ত রক্তে পরিপূর্ণ।
> তোমরা আপনাদিগকে ধৌত কর, বিশুদ্ধ কর,
> আমার নয়নগোচর হইতে তোমাদের ক্রিয়ার দুষ্টতা দূর কর;
> কদাচরণ ত্যাগ কর,
> সদাচরণ শিক্ষা কর,
> ন্যায় বিচারের অনুশীলন কর,
> উপদ্রবী লোককে শাসন কর,
> পিতৃহীন লোকের বিচার নিষ্পত্তি কর,
> বিধবার পক্ষ সমর্থন কর।[১৪]

AMARBOI.COM

স্বয়ং পয়গম্বরগণই সমবেদনার প্রবল দায়িত্ববোধ আবিষ্কার করেছিলেন যা পরবর্তীকালে অ্যাক্সিয়াল যুগে বিকশিত সকল প্রধান ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। এ সময়কালে ওইকুমিনে বিকাশমান নতুন মতবাদসমূহ এই মর্মে জোর দিয়েছে যে, সত্যের পরীক্ষা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে সাফল্যের সঙ্গে সমন্বিত করা। মন্দিরের আনুষ্ঠানিকতা ও মিথের অপার্থিব জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকা যথেষ্ট ছিল না। আলোকপ্রাপ্তির পর পুরুষ বা নারীকে অবশ্যই বাজার এলাকায় ফিরে গিয়ে সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি দরদ প্রদর্শনের অনুশীলন করতে হবে।

সিনাইয়ের আমল থেকেই পয়গম্বরদের সামাজিক মতবাদ ইয়াহ্ওয়েহ্র কাল্টে অন্তর্লীন ছিল: এক্সোডাসের কাহিনীতে ঈশ্বর যে নির্যাতিতের পক্ষেই ছিলেন তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে এবার ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধেই নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ইসায়াহ্র পয়গম্বরত্ব প্রাপ্তির সময় আরও দুজন পয়গম্বর অরাজক উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যে একই ধরনের বাণীর শিক্ষা দিচ্ছিলেন। প্রথমজনের নাম আমোস যিনি ইসায়াহ্র মতো অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন না, বরং রাখাল হিসাবে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যে বাস করতেন। আনুমানিক ৭৫২ সালে আমোসও আকস্মিকভাবে আদিষ্ট হয়ে উত্তরের ইসরায়েল রাজ্যে ধেয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঝড়ের বেগে বেথ-এলের প্রাচীন মন্দিরে প্রবেশ করে প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা পণ্ড করে দিয়েছিলেন তিনি। বেথ-এলের যাজক আমাযিয়াহ তাড়ানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁকে। অর্বাচীন রাখালকে ভর্ৎসনা করার সময় আমরা তাঁর কণ্ঠে প্রশাসনের কর্তৃত্বের সুর শুনতে পাই। তিনি যেন তাঁকে ভবিষ্যদ্বক্তাদের কোনও সদস্য ধরে নিয়েছিলেন, যারা দলে দলে ঘুরে ভবিষ্যদ্বাণী করে পেট চালায়। 'হে দর্শক, যিহূদা দেশে পলায়ন কর।' বিকৃত কণ্ঠে বলেন তিনি। 'সেই স্থানে রুটি ভোজন কর আর সেই স্থানে ভাববাণী বল। বেথল-এলে আমরা কিন্তু বৈথেলে আর ভাববাণী বলিও না, কেননা এ রাজার পূণ্যধাম ও রাজপুরী।' একটুও দমলেন না আমোস, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তীব্র ভর্ৎসনার সুরে জবাব দিলেন, তিনি দলীয় পয়গম্বর নন, বরং ইয়াহ্ওয়েহ্র কাছ থেকে সরাসরি ক্ষমতাপ্রাপ্ত: 'আমি কোনও পয়গম্বর নই, আমি পয়গম্বরদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যও নই। আমি গোপালক ও ডুমুরফল সংগ্রাহক ছিলাম, কিন্তু ইয়াহ্ওয়েহ্ আমাকে ভেড়ার পাল দেখাশোনা থেকে সরিয়ে এনেছেন, এবং ইয়াহ্ওয়েহ্ বলেছেন: 'যাও, আমার ইসরায়েল জাতিকে ভবিষ্যৎ জানিয়ে দাও।'[১৫] তবে কি বেথ-এলের জনগণ ইয়াহ্ওয়েহ্র বাণী শুনতে রাজি নয়? খুব ভালো, আবার এক দফা বক্তব্য রাখলেন তিনি: ওদের স্ত্রীরা রাস্তায় বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে, সন্তানদের হত্যা করা হবে এবং ইসরায়েল থেকে বহু দূরে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যু ঘটবে ওদের।

নিঃসঙ্গতা ছিল পয়গম্বরের মূল বৈশিষ্ট্য। আমোসের মতো ব্যক্তিরা ছিলেন একাকী; অতীতের ছন্দ ও কর্তব্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তাঁর। এটা তাঁর বেছে নেওয়া কিছু ছিল না, তাঁর ওপর আরোপিত হয়েছে। মনে হয় যেন চেতনার স্বাভাবিক প্যাটার্ন থেকে সহসা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল তাঁকে, ফলে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ আর বজায় রাখতে পারছিলেন না। চান বা না চান জোর করে তাঁকে পয়গম্বর হতে বাধ্য করা হয়েছে। আমোস যেমন বলেছেন:

AMARBOI.COM

সিংহ গর্জন করিল, কে না ভয় করিবে?
প্রভু ইয়াহ্ওয়েহ্ কথা কহিলেন, কে না ভাববাণী বলিবে?[১৬]

বুদ্ধের মতো নির্বাণের সত্তাহীন বিলুপ্তিতে হারিয়ে যাননি আমোস; পরিবর্তে ইয়াহ্ওয়েহ্ তাঁর অহমের স্থান দখল করে তাঁকে ভিন্ন জগতে টেনে নিয়েছেন। পয়গম্বরদের মাঝে আমোসই প্রথম সামাজিক ন্যায়বিচার ও সহানুভূতির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। বুদ্ধের মতো তিনিও মানুষের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন। আমোসের ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে নির্যাতিতের পক্ষে কথা বলছিলেন ইয়াহ্ওয়েহ্, দরিদ্রদের, ভাষাহীনদের অক্ষমতাকে ভাষা দিয়েছেন। আমরা যেভাবে পাই, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর একেবারে প্রথম লাইনেই ইয়াহ্ওয়েহ্ জেরুজালেমে তাঁর মন্দির থেকে জুদাহ্ ও ইসরায়েলসহ নিকট প্রাচ্যের সবগুলো দেশের দুঃখকষ্টের কথা ভেবে তীব্র রোষে গর্জন করছেন। ইসরায়েলের জনগণ *গোয়িম* (*goyim*) অর্থাৎ জেন্টাইল (বা অ-ইহুদি)দের মতোই খারাপ: তারা হয়তো দরিদ্রের ওপর নিষ্ঠুরতা ও তাদের নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু ইয়াহ্ওয়েহ্ তা পারেন না। প্রতিটি প্রতারণা, শোষণ ও বঞ্চনার দারুণ নজীর লক্ষ করছেন তিনি: 'ইয়াহ্ওয়েহ্ যাকবের মহিমাস্থলের নাম লইয়া শপথ করিয়াছেন: নিশ্চয়ই ইহাদের কোনও ক্রিয়া আমি কখনও ভুলিয়া যাইব না।'[১৭] প্রভুর শেষ বিচারের আকাঙ্ক্ষা করার মতো কী হঠকারী তারা, যেদিন ইয়াহ্ওয়েহ্ ইসরায়েলকে আনন্দিত করবেন আর অপমানিত করবেন *গোয়িমদের*? ওদের জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে: ইয়াহ্ওয়েহ্র দিন তোমাদের কি করিবে? তাহা অন্ধকার, আলোক নহে।'[১৮] ওরা কী নিজেদের ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ভেবেছে? আসলে চুক্তির (Covenant) প্রকৃতি উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তারা, যার অর্থ দায়িত্ব, সুবিধা নয়: 'হে ইসরায়েল-সন্তানগণ, তোমরা এই বাক্য শুন, যাহা তোমাদের বিরুদ্ধে ইয়াহ্ওয়েহ্ বলিয়াছেন।' চিৎকার করে বলেছেন আমোস, 'আমি মিশর দেশ হইতে যাহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছি সেই সমস্ত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে [বলিয়াছি] :

'আমি পৃথিবীস্থ সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তোমাদেরই পরিচয় লইয়াছি এইজন্য তোমাদের সমস্ত অপরাধ ধরিয়া তোমাদিগকে প্রতিফল দিব।'[১৯]

চুক্তি অনুযায়ী ইসরায়েলের *সকল মানুষ* ঈশ্বরের নির্বাচিত এবং সে কারণে ভালো আচরণ পাবার দাবিদার। ঈশ্বর কেবল ইসরায়েলকে মহত্ব দান করার জন্যেই ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করেন না, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত

AMARBOI.COM

করাই তাঁর উদ্দেশ্য। ইতিহাসে এটাই তাঁর স্বার্থ, প্রয়োজনে তিনি আপনভূমিতে ন্যায়বিচার স্থাপন করার জন্যে আসিরিয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করবেন।

এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, অধিকাংশ ইসরায়েলি ইয়াহ্ওয়েহ্র সঙ্গে সংলাপে লিপ্ত হতে পয়গম্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে রাজি হয়নি। জেরুজালেম মন্দির বা কানানের প্রাচীন উর্বরতার দেবীদের স্বল্প চাহিদাসম্পন্ন ধর্ম পছন্দ ছিল তাদের। এভাবেই চলে আসছে: সংখ্যালঘুরা সহমর্মিতার ধর্ম অনুসরণ করে; অধিকাংশ ধার্মিক ব্যক্তিই সিনাগগ, চার্চ, মন্দির আর মসজিদে জাঁকজমকপূর্ণ উপাসনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। প্রাচীন কানানিয় ধর্মগুলো তখনও ইসরায়েলে বিকশিত হচ্ছিল। দশম শতকে রাজা প্রথম জেরোবম ডান ও বেথ-এলের স্যাঙ্কচুয়ারিতে দুটো কাল্টিক ষাঁড় স্থাপন করেছিলেন। দুই শত বছর পরও ইসরায়েলিরা সেখানে উর্বরতা বৃদ্ধির আচার ও পবিত্র যৌনতায় অংশ নিয়েছে, আমোসের সমসাময়িক পয়গম্বর হোসেয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতে যেমনটি আমরা দেখতে পাই।[২০] ইসরায়েলিদের কেউ কেউ অন্যান্য দেবতার মতো ইয়াহ্ওয়েহ্রও স্ত্রী আছে ভেবেছিল মনে হয়: প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সম্প্রতি 'ইয়াহ্ওয়েহ্ ও তাঁর আশেরাহর উদ্দেশে নিবেদিত' খোদাইলিপি আবিষ্কার করেছেন। বাআলের মতো দেবতাদের উপাসনা করে ইসরায়েল চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করছে দেখে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন হোসেয়া। সকল নতুন পয়গম্বরের মতো তিনিও ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে ভাবিত ছিলেন। যেমন ইয়াহ্ওয়েহ্কে দিয়ে তিনি বলিয়েছেন: 'আমি দয়াই *(hesed)* চাই, বলিদান নয়; এবং হত্যাযজ্ঞ অপেক্ষা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান [*daath Elohim*].'[২১]। ধর্মতত্ত্বীয় জ্ঞানের কথা বোঝাননি তিনি: *daath* শব্দটি এসেছে হিব্রু ক্রিয়াপদ *yada*: জানা থেকে, যার যৌন দ্যোতনা রয়েছে। এভাবে 'J' বলেছেন আদম তাঁর স্ত্রী ইভকে জানতেন।[২২] প্রাচীন কানানিয় ধর্মে বাআল মাটিকে বিয়ে করেছিলেন, মানুষ আচরিক যৌনমিলনের মাধ্যমে এর উদযাপন করত; কিন্তু হোসেয়া জোর দিয়ে বললেন যে, চুক্তির পর থেকে ইয়াহ্ওয়েহ্ বাআলের স্থান গ্রহণ করেছেন এবং ইসরায়েলের জনগণের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ওদের বুঝতে হবে যে বাআল নন, ইয়াহ্ওয়েহ্ই মাটিতে প্রাণের সঞ্চার করবেন।[২৩] তখনও একজন প্রেমিকের মতো ইসরায়েলকে তোয়াজ করছিলেন তিনি, তাকে কুসংস্কার বাআলের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে প্রলুব্ধ করতে বদ্ধপরিকর:

> আর সেই দিন আমি লোকদের নিমিত্তে মাঠের পশু, আকাশের পক্ষী ও ভূমির সরীসৃপ সকলের সহিত নিয়ম করিব; এবং ধনুক খড়্গ ও রণসজ্জা ভাঙ্গিয়া দেশের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিব ও তাহাদিগকে নিশ্চিন্তে শয়ন

AMARBOI.COM

করাইব। আর আমি চিরকালের জন্যে তোমাকে বাগদান করিব; হাঁ, ধার্মিকতায়, ন্যায় বিচারে, দয়াতে ও বহুবিধ অনুকম্পায় তোমাকে বাগদান করিব।[২৪]

আমোস যেখানে সামাজিক দুরাচারকে আঘাত করেছেন, হোসেয়া সেখানে ইসরায়েলি ধর্মের অন্তর্মুখীতার অভাবের প্রতি ওপর জোর দিয়েছেন: ঈশ্বরের জ্ঞান-কে (*hesed*)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যা ইয়াহ্ওয়েহ্র সঙ্গে অন্তরের সংযোগ ও উপলব্ধি বোঝায়, যাকে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বে উঠতেই হবে।

পয়গম্বরগণ কীভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁদের ভাবমূর্তি গড়ে তুলছিলেন হোসেয়া তার এক চমকপ্রদ আভাস দিয়েছেন। তাঁর পয়গম্বরত্বের একেবারে সূচনায় ইয়াহ্ওয়েহ্ যেন কঠিন নির্দেশ জারি করেছিলেন। হোসেয়াকে তিনি একজন পতিতাকে (*esheth zeaunim*) বিয়ে করতে বলেছিলেন, কেননা 'গোটা দেশ ইয়াহ্ওয়েহ্র অনুগমন হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় ভয়ানক ব্যাভিচার করিতেছে।'[২৫] অবশ্য এটা মনে হয় যে, ঈশ্বর হোসেয়াকে পতিতার [আক্ষরিক অর্থ:a wife of prostitution]-এর খোঁজে রাস্তায় ঘুরতে বলেননি। *eseth zeuumim* এমন কোনও নারী যে বাছবিচারহীন চলাফেরা করে বা উর্বরতার ধর্ম বিশ্বাসের পবিত্র পতিতা। উর্বরতার আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে হোসেয়ার পূর্ব পরিচয় ছিল বলে এটা মনে হয় যে তাঁর স্ত্রী গোমার বাআলের ধর্মের পবিত্র কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিলেন। সুতরাং, তাঁর বিয়েটা ছিল বিশ্বাসহীন ইসরায়েলের সঙ্গে ইয়াহ্ওয়েহ্র সম্পর্কের একটা প্রতীক। হোসেয়া ও গোমারের তিন সন্তান ছিল যাদের ভয়ঙ্কর প্রতীকী নাম দেওয়া হয়েছিল। বড় ছেলের নাম ছিল বিখ্যাত রণক্ষেত্রের নামানুসারে জেযরিল, মেয়ের নাম ছিল লো-রুবামাহ্ যার অর্থ যাকে ভালোবাসা হয়নি এবং ছোট ছেলের নাম ছিল লো-আম্মি [আমার জাতি নয়]। এর জন্মের পর ইয়াহ্ওয়েহ্ ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি রদ করে দেন: 'কেননা তোমরা আমার প্রজা নহ, আমিও তোমাদের ঈশ্বর নহি।'[২৬] আমরা দেখব, পয়গম্বরগণ প্রায়শঃই স্বজাতির বিপজ্জনক অবস্থা বোঝাতে দীর্ঘ প্রহসনের আশ্রয় নিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, কিন্তু এটা মনে হয় যে, হোসেয়ার বিয়ের বিষয়টি আগে থেকেই পরিকল্পিত ছিল না। টেক্সট থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গোমার তাঁদের সন্তান জন্ম নেওয়ার আগ পর্যন্ত *eseth zeuumim*-এ পরিণত হননি। কেবল পরবর্তী সময়ে হোসেয়ার মনে হয়েছে যে, তাঁর বিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে। স্ত্রী বিয়োগ এক মারাত্মক অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর, হোসেয়াকে যা ইসরায়েলিরা ইয়াহ্ওয়েহ্কে ত্যাগ করে বাআলের মতো উপাস্যদের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত

AMARBOI.COM

হওয়ায় ইয়াহ্ওয়েহ্‌র অনুভূতির স্পষ্ট ধারণা দিয়েছিল। প্রথমে গোমারকে ত্যাগ করতে চেয়েছেন হোসেয়া, তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চাননি আর: প্রকৃতপক্ষে 'আইন' অনুযায়ী অবিশ্বস্ত স্ত্রীকে তালাক দেওয়া পুরুষের দায়িত্ব। কিন্তু গোমারকে ভালোবাসতেন হোসেয়া, ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর খোঁজে বের হন এবং নতুন মালিকের কাছ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। গোমারকে ফিরে পাবার আপন ইচ্ছার মাঝে ইয়াহ্ওয়েহ্‌র ইসরায়েলকে আরেকটা সুযোগ দিতে রাজি থাকার আভাস পেয়েছেন তিনি।

পয়গম্বরগণ যখন তাঁদের মানবিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার জন্যে ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে দায়ি করছেন তখন আসলে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থে নিজেদের ভাবমূর্তি অনুযায়ী একজন ঈশ্বরকে গড়ে তুলছিলেন। রাজপরিবারের সদস্য ইসায়াহ্ ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে রাজা হিসেবে দেখেছেন; আমোস দরিদ্রের প্রতি তাঁর নিজের সহানুভূতি ইয়াহ্ওয়েহ্‌র ওপর অরোপ করেছেন, হোসেয়া ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে দেখেছেন স্ত্রী পরিত্যাগকারী স্বামী হিসাবে, যিনি স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত রয়ে গেছেন। সকল ধর্মকে কোনও না কোনও মনুষ্যরূপ নিয়ে শুরু হতে হবে। মানবজাতি থেকে বহু দূরের কোনও উপাস্য, যেমন অ্যারিস্টটলের অটল চালক (Unmoved Mover) আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে অক্ষম। এই অভিক্ষেপ যতক্ষণ নিজের মাঝে শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ এটা কার্যকর ও উপকারী হতে পারে। এটা বলা প্রয়োজন যে, মানবীয় ভাষায় ঈশ্বরের এই কাল্পনিক উপস্থাপন এক সামাজিক দায়িত্বের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে, হিন্দু ধর্মে যা অনুপস্থিত। ঈশ্বর ধর্মের প্রত্যেকটাই আমোস ও ইসায়াহ্‌র সাম্যতা ও সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা গ্রহণ করেছে। ইহুদিরাই প্রথমবারের মতো প্রাচীন বিশ্বে এক কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল যা তাদের পৌত্তলিক প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে।

AMARBOI.COM

অন্যসব পয়গম্বরের মতো হোসেয়া বহুঈশ্বরবাদীতার আতঙ্কে ভুগেছেন। তিনি উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলো নিজেদের বানানো দেবতার উপাসনা করে নিজেদের স্বর্গীয় প্রতিশোধ বয়ে আনবে ভেবে শঙ্কিত ছিলেন।

> আর এখন তাহারা উত্তরোত্তর আরও পাপ করিতেছে,
> তাহারা আপনাদের নিমিত্তে আপনাদের রৌপ্য দ্বারা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা
> ও আপনাদের নিজ বুদ্ধিমতো পুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়াছে;
> সেই সমস্তই শিল্পকারদের কর্ম্ম মাত্র; তাহাদের বিষয়ে উহারা বলে,
> যেসকল লোক যজ্ঞ করে তাহারা গোবৎসদিগকে চুম্বন করুক।[২৭]

এটা অবশ্যই কানানিয় ধর্মের অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত ও অবমূল্যায়িত বর্ণনা। কানান ও বাবিলনের মানুষ কখনও ভাবেনি যে, তাদের দেবতাদের

প্রতিমাসমূহও স্বর্গীয়, ওরা কখনও কোনও মূর্তির উপাসনা করতে মাথা নোয়ায়নি। প্রতিমাগুলো ছিল স্বর্গ বা আলৌকিকের প্রতীক। উপাসকদের মনোযোগকে আরও উর্ধ্বে আকৃষ্ট করার জন্যে তাদের কল্পনাতীত আদি ঘটনাবলীর মিথের মতো এসব নির্মাণ করা হয়েছিল। এসালিগার মন্দিরে মারদুকের মূর্তি বা কানানে আশেরাহ্‌র শিলাস্তম্ভকে কখনও দেবতাদের সঙ্গে একীভূত করা হয়নি, বরং এগুলো মানুষকে মানবজীবনে অতিপ্রাকৃত উপাদানের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তারপরেও পয়গম্বরগণ অত্যন্ত অনাকর্ষণীয় অসন্তোষের সঙ্গে পৌত্তলিক প্রতিবেশীদের উপাস্য বা দেবতাদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন। ওদের দৃষ্টিতে ঘরে তৈরি এইসব দেবতা  সোনা ও রূপা ছাড়া আর কিছুই নয়; মাত্র কয়েক ঘণ্টায় একজন কারিগর এগুলো তৈরি করেছে; ওদের চোখ আছে কিন্তু ওরা দেখতে পায় না, কান দিয়ে শোনে না, ওরা হাঁটতে পারে না; উপাসকদেরই এদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে হয়; ওরা বুদ্ধিহীন, জড় পদার্থ, মানবেতর বস্তু; তরমুজ খেতের কাগভাড়ুয়ার চেয়ে উন্নত কিছু নয়। ইসরায়েলের ইলোহিম ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র তুলনা ওরা *এলিহিম* (*elihim*), কিছু না। যেসব *গোয়িম* ওদের উপাসনা করে তারা নির্বোধ; ইয়াহ্‌ওয়েহ্ ওদের ঘৃণা করেন।[২৮]

বর্তমান কালে একেশ্বরবাদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়া দুর্ভাগ্যজনক অসহিষ্ণুতার সঙ্গে আমরা এত পরিচিত হয়ে উঠেছি যে আমরা হয়তো অন্য দেবতাদের প্রতি এই বৈরিতা যে নতুন ধর্মীয় প্রবণতা ছিল সেটা অনুধাবণ করতে পারব না। পৌত্তলিকতাবাদ আবশ্যকীয়ভাবে সহিষ্ণু ধর্মবিশ্বাস ছিল: নতুন দেবতার আবির্ভাবে পুরোনো কাল্টগুলো হুমকির সম্মুখীন না হলে প্রচলিত দেবনিচয়ের পাশে অনায়াসে আরেকজন দেবতার স্থান হতো। এমনকি অ্যাক্সিয়াল যুগের নতুন মতবাদসমূহ যেখানে দেবতাদের প্রতি প্রাচীন শ্রদ্ধার স্থান দখল করছিল তখনও প্রাচীন দেবতাদের প্রতি এমন তীব্র বিতৃষ্ণা দেখা যায়নি। হিন্দু ও বৌদ্ধমতবাদে আমরা দেখেছি, মানুষকে দেবতার ওপর সক্ষোভে চড়াও হওয়ার পরিবর্তে তাদের অতিক্রম করে যাওয়ার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অথচ ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা দেবতাদের প্রতি এরকম শান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেননি। ইহুদি ধর্মগ্রন্থে 'বহুঈশ্বরবাদীতা'র নতুন পাপ, মিথ্যা দেবতার 'উপাসনা' বিবমিষার অনুভূতির সৃষ্টি করে। এটা এমন এক প্রতিক্রিয়া যা সম্ভবত চার্চের কোনও পোপ ও ফাদার যৌনতা সম্পর্কে যেমনটি বোধ করেন সেরকম। সুতরাং এটা যৌক্তিক বিবেচনাসূত্র কোনও প্রতিক্রিয়া নয় বরং গভীর উদ্বেগ ও অবদমনের পরিচায়ক। পয়গম্বরগণ কী তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় আচরণের কোনও সুপ্ত উদ্বেগ

লালন করছিলেন? এমন কি হতে পারে, যে তাঁরা অস্বস্তির সঙ্গে সচেতন ছিলেন যে ইয়াহ্ওয়েহ্ সম্পর্কিত তাঁদের ধারণাও পৌত্তলিকদের বহুঈশ্বরবাদীতার সমরূপ, কারণ তাঁরাও নিজস্ব ভাবমূর্তি অনুযায়ী একজন দেবতার সৃষ্টি করছিলেন?

যৌনতার প্রতি ক্রিশ্চানদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা অন্য দিক দিয়েও আলোক নিক্ষেপকারী। এই পর্যায়ে অধিকাংশ ইসরায়েলি অবচেতনভাবে পৌত্তলিক উপাস্যদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। এটা সত্যি যে, ইয়াহ্ওয়েহ্ ক্রমশঃ নির্দিষ্ট কিছু বলয়ে কানানিয়দের *ইলোহিমের* ভূমিকা গ্রহণ করছিলেন: যেমন হোসেয়া যুক্তি দেখাতে চাইছিলেন যে, ইয়াহ্ওয়েহ্ বাআলের চেয়ে ভালো উর্বরতার দেবতা। কিন্তু অপরিবর্তনীয় পুরুষ দেবতা ইয়াহ্ওয়েহ্র পক্ষে আশেরাহ, ইশতার বা আনাতের ভূমিকা দখল নিশ্চয়ই কঠিন ছিল, ইসরায়েলিদের মাঝে যাঁদের বহু অনুসারী তখনও ছিল–বিশেষ করে নারীদের মাঝে। যদিও একেশ্বরবাদীরা জোর দিয়ে বলবে, তাদের ঈশ্বর লিঙ্গের উর্ধ্বে; তবু তিনি আবশ্যকীয়ভাবে পুরুষ রয়ে যাবেন; যদিও আমরা লক্ষ করব, কেউ কেউ এই অসাম্য দূর করার প্রয়াস পাচ্ছে। এটা অংশতঃ তাঁর গোত্রীয় যুদ্ধ দেবতা হিসাবে আবির্ভাবের কারণে। কিন্তু দেবীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম বা যুদ্ধ অ্যাক্সিয়াল যুগের অধিকতর কম ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখায়, এই সময় ক্রমশঃ মেয়েরা সামাজিক মর্যাদা হারাতে শুরু করেছিল। এটা মনে হয় যে, অধিকতর আদিম সমাজে নারীদের পুরুষদের চেয়ে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথাগত ধর্মে মহান দেবীদের সম্মান নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতিফলন। অবশ্য নারীর উত্থান বোঝায় যে সামরিক ও শারীরিক শক্তির পুরুষালি বৈশিষ্ট্য নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে ওইকুমিনে নারীদের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়, সভ্যতায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয় তারা। যেমন, গ্রিসে তাদের অবস্থান ছিল বিশেষভাবে খারাপ–পশ্চিমের লোকেরা প্রাচ্যের পুরুষতান্ত্রিক আচরণের সমালোচনা করার সময় এ সত্যটা তাদের মনে রাখা উচিত। এথেন্সের নারীদের জন্যে গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্প্রসারিত হয়নি, তাদের পৃথক স্থানে রাখা হতো, নিম্নস্তরের প্রাণী হিসাবে ঘৃণা করা হতো। ইসরায়েলি সমাজও আরও পুরুষতান্ত্রিক হয়ে উঠছিল। অতীতকালে নারীরা ছিল শক্তিমতী, নিজেদের তারা তাদের স্বামীদের সমকক্ষ ভাবত। ডেবোরাহর মতো কেউ কেউ যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বও দিয়েছে। এরকম বীরাঙ্গনাদের ইসরায়েলিরা জুদিথ ও এশতার হিসাবে শ্রদ্ধা করে যাবে, কিন্তু ইয়াহ্ওয়েহ্ সাফল্যের সঙ্গে কানান ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেবদেবীদের হারিয়ে দিয়ে

AMARBOI.COM

একমাত্র ঈশ্বরে পরিণত হওয়ার পর তাঁর ধর্ম প্রায় পুরোপুরিভাবে পুরুষরা পরিচর্যা করবে। দেবীদের কাল্টগুলো বাদ পড়ে যাবে আর এটাই হবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটা লক্ষণ, যা ছিল নতুন সভ্য জগতের বৈশিষ্ট্য।

আমরা দেখব, ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র বিজয় ছিল কষ্টার্জিত। এখানে চাপ, সহিংসতা ও সংঘাতের প্রয়োজন হয়েছে; এ থেকে বোঝা যায় একজন ঈশ্বরের ধর্ম ইসরায়েলিদের কাছে উপমহাদেশের জনগণের কাছে যেভাবে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম এসেছিল তেমন সহজে আসতে পারছিল না। ইয়াহ্‌ওয়েহ্ যেন শান্তি পূর্ণ স্বাভাবিক উপায়ে প্রাচীন উপাস্যদের অতিক্রম করতে পারছিলেন না। তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এভাবে ৮২ নম্বর শ্লোকে আমরা দেখি স্বর্গীয় সভার (Devine Assembly) নেতৃত্ব অর্জনের জন্যে তিনি একটা নাটক করছেন, যেটা বাবিলনিয় এবং কানানিয় উভয় মিথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে:

দেবতার মাঝে রায় ঘোষণা করার জন্যে
এলের সভায় আপন অবস্থান গ্রহণ করলেন ইয়াহ্‌ওয়েহ্।[২৯]

'বিচার নিয়ে আর প্রহসন নয়
দুষ্টদের পালন আর নয়!
দুর্বল ও এতিমদের ন্যায়বিচার পেতে দাও,
দুস্থ ও পীড়িতদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ কর,
দুর্বল ও দরিদ্রকে বাঁচাও,
দুষ্টের কবল হতে ওদের রক্ষা কর!'

মুর্খ ও নির্বোধ, ওরা অন্ধের মতো চলে,
মানব সমাজের মূল ভিত্তি হানি করে।
আমি একবার বলেছিলাম, 'তোমরাও দেবতা,
তোমরা সবাই এল এলিয়নের সন্তান';
কিন্তু তারপরেও, মানুষের মতোই মারা যাবে তোমরা;
মানুষের মতো, দেবতাগণ, তোমাদের পতন ঘটবে।

স্মরণাতীত কাল থেকে এলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা সভায় মোকাবিলা করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে অন্যান্য দেবতার বিরুদ্ধে কালের সামাজিক চ্যালেঞ্জ মেটাতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ইয়াহ্‌ওয়েহ্। পয়গম্বরদের আধুনিক সমমর্মিতার নীতি তুলে ধরেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর স্বর্গীয়

AMARBOI.COM

সহকর্মীগণ বছরের পর বছর ন্যায়বিচার ও সাম্যের পক্ষে কথা বলার জন্যে কিছুই করেননি। প্রাচীনকালে ইয়াহ্ওয়েহ্ ওঁদের *ইলোহিম* হিসাবে মেনে নিতে তৈরি ছিলেন, এল এলিয়নের ('সর্ব শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর', God Most high)[৩০] সন্তানগণ, কিন্তু দেবতারা প্রমাণ করেছেন তাঁরা অচল। মরণশীল মানুষের মতো ফুরিয়ে যাবেন তাঁরা। শ্লোক রচয়িতা ইয়াহ্ওয়েহ্কে সহযোগী দেবতাদের মৃত্যুর অভিশাপ দিতেই দেখাননি, বরং একই সঙ্গে তিনি এল'র প্রচলিত অবস্থানও কেড়ে নিয়েছেন, ইসরায়েলে তখনও যাঁর সমর্থক ছিল বলে মনে হয়।

বাইবেলে ক্ষতিকর প্রচারণা সত্ত্বেও বহু-ঈশ্বরবাদীতার মাঝে খারাপ কিছু নেই আসলে: এটা তখনই আপত্তিকর বা আনাড়ি হয়ে দাঁড়ায় যখন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্মিত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। আমরা দেখব, ঈশ্বরের ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের কেউ কেউ পরম সত্তার এই আদি ইমেজের ওপর কাজ করেছে ও এমন এক ধারণার উপনীত হয়েছে যা কিনা হিন্দু বা বৌদ্ধ দর্শনের কাছাকাছি। অন্যরা অবশ্য কখনওই এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে উঠতে পারেনি, তবে ধরে নিয়েছে যে, ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণা পরম রহস্যের অনুরূপ। 'বহুঈশ্বরবাদী ধার্মিকতার বিপদ বিসিই ৬২২ সালে জুদাহ্র বাদশাহ জোসিয়াহর শাসন আমলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পূর্বসুরি রাজা মানাসেহ (৬৮৭-৪২) এবং রাজা আমন (৬৪২-৪০)-এর সমন্বয়ের নীতিমালা বদল করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। উল্লিখিত দুই রাজা জনগণকে ইয়াহ্ওয়েহ্র পাশাপাশি কানানের অন্য দেবতাদের উপাসনা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। মানাসেহ প্রকৃতপক্ষে মন্দিরে আশেরাহ্র এক প্রতিমাও স্থাপন করেন, এখানে উর্বরতার কাল্ট দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল। অধিকাংশ ইসরায়েলি যেহেতু আশেরাহ্র ভক্ত ছিল এবং কেউ কেউ তাকে ইয়াহ্ওয়েহ্র স্ত্রী হিসাবে কল্পনা করত, তাই কেবল গোঁড়া ইয়াহ্ওয়েহ্বাদীরাই একে ব্লাসফেমাস মনে করতে পারত। কিন্তু ইয়াহ্ওয়েহ্র কাল্টকে উৎসাহিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জোসিয়াহ মন্দিরের ব্যাপক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন। শ্রমিকরা যখন প্রত্যেকটা জিনিস ওলট-পালট করছিল, প্রধান যাজক হিলকিয়েহ একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করে বসেন, যেটা কিনা ইসরায়েলের সন্তানদের উদ্দেশে দেওয়া মোজেসের শেষ সারমনের বিবরণ। জোসিয়াহর সচিব শাপানকে ওটা দেন তিনি; রাজার উপস্থিতিতে উচ্চ স্বরে তা পাঠ করেন। এটা শোনার পর তরুণ রাজা আতঙ্কে তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলেন: ইয়াহ্ওয়েহ্ তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রতি এমন ক্ষুব্ধ হওয়ায় বিস্ময়ের কিছু নেই! তাঁরা মোজেসকে দেওয়া তাঁর কঠিন নির্দেশ পালন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন।[৩১]

AMARBOI.COM

এটা প্রায় নিশ্চিত যে, হিলকিয়াহ্‌র আবিষ্কৃত 'বুক অভ দ্য ল'ই বর্তমানে আমাদের কাছে ডিউটেরোনমি নামে পরিচিত গ্রন্থের মূল অংশ ছিল। সংস্কারক দল কর্তৃক এটার সময়োচিত আবিষ্কার নিয়ে নানান মতবাদ রয়েছে। কেউ কেউ এমনও মত প্রকাশ করেছেন যে, পয়গম্বর হুলদাহ্‌র সহায়তায় হিলকিয়াহ্‌ ও শাপানই গোপনে এটা লিখেছিলেন। জোসিয়াহ্‌ অবিলম্বে হুলদাহর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। আমরা কখনওই নিশ্চিতভাবে জানতে পারব না, তবে গ্রন্থটি নিশ্চিতভাবে ইসরায়েলে এক নতুন পরিবর্তনের আভাস প্রদান করে যা সপ্তম শতকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে। মোজেসকে তাঁর শেষ সারমনে চুক্তির প্রতি নতুন কেন্দ্রিকতা আরোপ করতে ও ইসরায়েলের বিশেষ মনোনয়নের ধারণা দিতে দেখানো হয়েছে। ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ সকল জাতির মধ্য থেকে নিজ জাতিকে আলাদা করে নিয়েছেন, সেটা তাদের কোনও গুণের কারণে নয় বরং তাদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার কারণে। বিনিময়ে তিনি পুর্ণ আনুগত্য ও অন্য সব দেবতার তীব্র প্রত্যাখ্যান দাবি করেছেন। ডিউটেরোনমির মূলে অন্তর্ভুক্ত ঘোষণাটি পরে ইহুদিদের বিশ্বাস প্রকাশের মন্ত্রে পরিণত হবে:

> হে ইস্রায়েল শোন (shema)! ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ আমাদের ইলোহিম। একমাত্র ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ (ebad) আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়া আপন ঈশ্বর ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌কে প্রেম করিবে আর এই যে সকল কথা ও তোমার সমস্ত শক্তি আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি; তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক।[৩২]

AMARBOI.COM

ঈশ্বরের নির্বাচন ইসরায়েলকে *গোয়িমদের* থেকে আলাদা করে দিয়েছে। লেখক মোজেসকে দিয়ে বলাচ্ছেন, ওরা প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌঁছানোর পর স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তারা 'তাহাদের সহিত কোনও নিয়ম করিবে না, বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না।'[৩৩] মিশ্র বিবাহ বা সামাজিক মেলামেশা চলবে না। সর্বোপরি, তাদেরকে কানানিয় ধর্ম উচ্ছেদ করতে হবে। 'তাহাদের যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল ভঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের আশেরাহ্‌ মূর্তি সকল ছেদন করিবে এবং তাহাদের খোদিত প্রতিমাসকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে।' ইসরায়েলিদের নির্দেশ দিয়েছেন মোজেস, 'কেননা তুমি আপন ঈশ্বর ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র পবিত্র প্রজা; ভূতলে যত জাতি আছে সেসকলের মধ্যে আপনার নিজস্ব প্রজা করিবার জন্যে তোমার উপর ঈশ্বর ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন।'[৩৪]

আজকের দিনে ইহুদিরা *শেমা* (Shema) আবৃত্তি করার মাধ্যমে একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা দেয়: আমাদের ঈশ্বর ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ এক এবং অদ্বিতীয়।

ডিউটেরোনমিস্টরা তখনও এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারেননি। ইয়াহ্ওয়েহ্ *এবাদ (ebad)* মানে ইয়াহ্ওয়েহ্ একক বোঝায়নি, বরং ইয়াহ্ওয়েহ্ই একমাত্র উপাস্য যাকে উপাসনা করার অনুমোদন আছে। অন্য দেবতারা তখনও হুমকি স্বরূপ ছিলেন: ওদের কাল্ট আকর্ষণীয় ছিল ও ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর ইয়াহ্ওয়েহ্র কাছে থেকে প্রলুব্ধ করে ইসরায়েলিদের টেনে নিতে পারতেন। তারা ইয়াহ্ওয়েহ্র আইনকানুন মেনে চললে তিনি তাদের আশীর্বাদ করবেন, সমৃদ্ধি দান করবেন, কিন্তু তাঁকে পরিত্যাগ করলে পরিণাম হবে ধ্বংসাত্মক:

> 'এবং তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ তথা হইতে তোমরা উন্মূলিত হইবে। আর ইয়াহ্ওয়েহ্ তোমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিবেন; সেই স্থানে তুমি আপনার ও আপন পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত অন্য দেবগণের ধর্ম ও প্রস্তরের সেবা করিবে...আর তোমার জীবন তোমার দৃষ্টিতে সংশয়ে দোলায়মান হইবে...তুমি হৃদয়ে যে শঙ্কা করিবে ও চক্ষুতে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিবে, তৎযুক্ত প্রাতঃকালে বলিবে, "হায় হায় কখন সন্ধ্যা হইবে?" এবং সন্ধ্যাকালে বলিবে "হায় হায় কখন প্রাতঃকাল হইবে"।'[৩৫]

সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে রাজা জোসিয়াহ এবং তাঁর প্রজারা এই কথাগুলো শোনার সময়ে এক নতুন রাজনৈতিক হুমকির মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলেন। আসিরিয়দের ঠেকাতে সক্ষম হওয়ায় উত্তরাঞ্চলীয় দশটি গোত্রের পরিণতি এড়াতে পেরেছিল ওরা। ওই দশ গোত্র মোজেসের বর্ণিত শাস্তি ভোগ করেছিল। কিন্তু বিসিই ৬০৬ সালে বাবিলনের রাজা নেবুপোলাসার আসিরিয়দের ধ্বংস করে নিজস্ব সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ শুরু করেছিলেন।

এমনি চরম নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ডিউটেরোনমিস্টদের নীতিমালা ব্যাপক প্রভাব রাখে। ইয়াহ্ওয়েহ্র নির্দেশ মানা দূরে থাক, ইসরায়েলের শেষ দুজন রাজা সেধে বিপদ ডেকে এনেছেন। অবিলম্বে সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন জোসিয়াহ্, অদম্য উৎসাহে কাজ শুরু করেন তিনি। সমস্ত ইমেজ, মূর্তি ও উর্বরতার প্রতীক মন্দিরের বাইরে এনে পোড়ানো হয়। জোসিয়াহ্ আশেরাহ্র বিরাট মূর্তি নামিয়ে সেখানে আশেরাহ্র পোশাক তৈরি করা মন্দির পতিতাদের থাকার ঘরগুলো ধ্বংস করে দেন। পৌত্তলিকতাবাদের আশ্রয় দেশের বিভিন্ন প্রাচীন উপাসনাগৃহও ধ্বংস করা হয়। এরপর থেকে পুরোহিতরা কেবল পবিত্রকৃত জেরুজালেম মন্দিরে ইয়াহ্ওয়েহ্র উদ্দেশে প্রাণী উৎসর্গ করতে পারতেন। প্রায় ৩০০ বছর পরে জোসিয়াহ্র সংস্কার কর্ম লিপিবদ্ধকারী

AMARBOI.COM

ভাষ্যকারগণ এই অস্বীকৃতি ও দমনের ধার্মিকতার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

> [জোসিয়াহর] সাক্ষাতে লোকেরা বাআল দেবগণের যজ্ঞবেদী ভাঙিয়া ফেলিল এবং তিনি তদুপরি স্থাপিত সূর্য্য প্রতিমা ছেদন করিলেন আর আশেরা-মূর্তি ক্ষোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা সকল ভাঙিয়া ধূলিস্যাৎ করিয়া যাহারা তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছিল তাহাদের কবরের উপর সেই ধূলা ছড়াইয়া দিলেন। আর তাহাদের যজ্ঞবেদীর উপরে যাজকদের অস্থি পোড়াইলেন এবং যিহুদা ও যিরূসালেমকে শুচি করিলেন। আর মনঃশির ইফ্রায়িম ও শিমিয়নের নগরে নগরে এবং নপ্তালি পর্য্যন্ত সর্বত্র কাঁথড়ার মধ্যে এইরূপ করিলেন।[৩৬]

অন্যান্য উপাস্যদের উর্ধ্বে ওঠার বুদ্ধের বিশ্বাসের পরেও সেগুলোকে নিঃশব্দে মেনে নেওয়ার ধারেকাছেও নেই আমরা। এই পাইকারী ধ্বংস সুপ্ত উদ্বেগ ও অভিযোগ থেকে উদ্ভূত ঘৃণা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

সংস্কারকরা ইসরায়েলের ইতিহাস নতুন করে লিখেছিলেন। নতুন মতবাদ অনুযায়ী জোশুয়া, জাজেস, স্যামুয়েল এবং রাজাবলীর ঐতিহাসিক গ্রন্থ পরিমার্জনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে পেন্টটিউকের সম্পাদকগণ নতুন নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করেছেন যা এক্সোডাস মিথের ডিউটেরোনমিস্ট ব্যাখ্যাকে অধিকতর পুরোনো 'J' ও 'E'-এর বর্ণনার রূপ দিয়েছে। ইয়াহ্ওয়েহ্ এখন কানানের ধ্বংসের পবিত্র যুদ্ধের রূপকার। ইসরায়েলিদের বলা হয়েছে স্থানীয় কানানবাসীরা অবশ্যই তাদের দেশে থাকতে পারবে না,[৩৭] জোশুয়া যেন অশুভ সম্পূর্ণতার সঙ্গে এই নীতির বাস্তবায়নে বাধ্য হয়েছিলেন:

> আর সেই সময় জোশুয়া আসিয়া পর্বতময় প্রদেশ হইতে—হিব্রোন, দবির ও আনাব হইতে, যিহুদার সমস্ত পর্বতময় প্রদেশ হইতে আর ইসরায়েলের সমস্ত পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে আনাকীয়দিগকে উচ্ছেদ করিলেন; জোশুয়া তাহাদের নগরগুলোর সহিত তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন। ইসরায়েল সন্তানগণের দেশে অনাকীয়দের কেহ অবশিষ্ট থাকিল না; কেবল দেলাতে গাতে ও আসদোদে কতকগুলি অবশিষ্ট থাকিল।[৩৮]

প্রকৃতপক্ষে সন্দেহাতীতভাবেই জোশুয়া ও জাজেস কর্তৃক কানান বিজয় সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, যদিও নিশ্চিতভাবেই প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। কিন্তু এবার রক্তপাতের ঘটনাকে একটা ধর্মীয় যুক্তির ভিত্তি দেওয়া হলো।

AMARBOI.COM

নির্বাচনের এই ধরনের ধর্মতত্ত্বের বিপদ এই যে, ধর্মতত্ত্ব একজন ইসায়াহ্র অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গির সমপর্যায়ের নয়। একেশ্বরবাদের গোটা ইতিহাসকে ক্ষতবিক্ষতকারী পবিত্র যুদ্ধগুলোতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরকে আমাদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে নিজের ঘাটতিসমূহ উপলব্ধি করার বদলে এঁকে আমাদের অহমসৃষ্ট ঘৃণা বাড়িয়ে তোলা বা বৈধ করা ও একে চরম পর্যায়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে করে ঈশ্বরের আচরণ একেবারে আমাদের অনুরূপ হয়ে পড়ে, যেন তিনি আরেকজন মানুষ মাত্র। এমন একজন ঈশ্বর আমোস বা ইসায়াহ্র ঈশ্বরের চেয়ে আরও বেশি জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয়ই হওয়ার কথা, যিনি নির্দয় আত্মসমালোচনা দাবি করেন।

নিজেদের মনোনীত জাতি দাবি করার জন্যে ইহুদিদের প্রায়ই সমালোচনা করা হয়, কিন্তু তাদের সমালোচকগণ প্রায়শঃই বাইবেলিয়কালে বহুঈশ্বরবাদীতার বিরুদ্ধে পরিচালিত যুক্তিতর্ককে উস্কে দেওয়া অস্বীকৃতির সমরূপ অপরাধে দায়ী। তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রত্যেকটি যার যার ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে মনোনয়নের অনুরূপ ধর্মতত্ত্ব গড়ে তুলেছে, কখনও কখনও যা এমনকি বুক অভ জোশুয়ায় কল্পিত ধ্বংসলীলার চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছে। পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চানরা অদ্ভুতভাবে নিজেদের ঈশ্বরের নির্বাচিত  ভেবে আত্মপ্রসাদে ভোগে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রিশ্চানরা নিজেদের নব্য নির্বাচিত জাতি দাবি করে ইহুদি ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্রুসেডসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল—ইহুদিদের হারানো মর্যাদার অধিকারী হয়েছে তারা। নির্বাচনের কালভিনিস্ট ধর্মতত্ত্ব আমেরিকানদের ঈশ্বরের আপন জাতি বলে ভাবতে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। জোশুয়ার জুদাহ্ রাজ্যের মতো এমন একটা বিশ্বাসের তখনই ব্যাপক সাড়া পাওয়ার কথা যখন রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার ফলে জাতি আপন অবলুপ্তির আতঙ্কে তাড়িত। সম্ভবত এ কারণেই বর্তমানে ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের মাঝে প্রকট বিভিন্ন ধরনের মৌলবাদে এ ব্যাপারটা নতুন করে প্রাণ খুঁজে পেয়েছে। ইয়াহ্ওয়েহ্র মতো একজন ব্যক্তি-ঈশ্বরকে এভাবে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্তাকে বাঁচানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে; ব্রাহ্মণের মতো নৈর্ব্যক্তিক উপাস্যের বেলায় যা সম্ভব নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার, বিসিই ৫৮৭ সালে নেবুচাদনেযারের জেরুজালেম ধ্বংসের ঘটনা ও বাবিলনের ইহুদিদের বিতাড়নের পেছনে ক্রিয়াশীল ডিউটেরোনিজমে সকল ইসরায়েলি জড়িত ছিল না। নেবুচাদনেযারের অভিষেকের বছর ৬০৪ সালে পয়গম্বর জেরেমিয়াহ্ ইসায়াহ্র প্রতিমা-বিরোধী মতবাদের পুনর্জন্ম দেন যা মনোনীত জাতির বিজয়বাদী মতবাদ উল্টে দিয়েছিল: ঈশ্বর ইসরায়েলকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে

AMARBOI.COM

বাবিলনকে ব্যবহার করছেন এবার 'ইসরায়েলের পালা নিষিদ্ধ হবার'।[৩৯] সত্তর বছরের জন্যে নির্বাসনে যেতে হবে তাদের। এই ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর যাজকের হাত থেকে লিপি কেড়ে নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে আগুনে নিক্ষেপ করেন রাজা জোহায়াকিম। প্রাণভয়ে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন জেরেমিয়াহ্।

জেরেমিয়াহ্র জীবন দেখায়, ঈশ্বরের এই অধিকতর চ্যালেঞ্জিং ইমেজ গড়ে তোলার পেছনে কী বিশাল কষ্ট ও প্রয়াসের প্রয়োজন হয়েছিল। পয়গম্বর হতে চাননি তিনি, ভালোবাসার জাতিকে নিন্দা করতে গিয়ে গভীরভাবে বেদনার্ত হয়ে পড়েছিলেন।[৪০] জন্মগতভাবে ঝামেলাবাজ ব্যক্তি ছিলেন না তিনি, তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল। যখন তাঁর কাছে আহ্বান আসে, প্রতিবাদে কেঁদে উঠেছিলন তিনি: 'হায়, হায়, হে প্রভু ইয়াহ্ওয়েহ্, দেখ, আমি কথা কহিতে জানি না, কেননা আমি বালক!' আর ইয়াহ্ওয়েহ্ তখন 'হস্ত প্রসারিত করিয়া' তাঁর ঠোঁট স্পর্শ করলেন এবং আপন বাণী তাঁর মুখে স্থাপন করলেন। যে বাণী তাঁকে উচ্চারণ করতে হয়েছিল সেটা ছিল দ্ব্যর্থবোধক ও স্ববিরোধী: 'দেখ, উৎপাটন, ভঙ্গ, বিনাশ ও নিপাত করিবার নিমিত্ত, পত্তন ও রোপন করিবার নিমিত্ত, তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।'[৪১] সমন্বয়ের অতীত চরম অবস্থার মাঝে যন্ত্রণাদায়ক টানাপোড়েন দাবি করেছে এটা। জেরেমিয়াহ্র ঈশ্বরের অনুভূতি ছিল যন্ত্রণাময়, যার ফলে হাত-পায়ে খিঁচুনি সৃষ্টি হয়েছে, ভেঙে গেছে হৃদয়, মাতালের মতো টলতে হয়েছে তাঁকে।[৪২] *mysterium terrible et fascinans*-এর অভিজ্ঞতা যুগপৎ ধর্ষণ ও চরিত্র খোয়ানোর মতো:

> হে ইয়াহ্ওয়েহ্, তুমি আমাকে প্ররোচনা করিলে। আমি প্ররোচিত হইলাম;
> তুমি আমা হইতে বলবান, তুমি প্রবল হইয়াছ।
> আমি সমস্ত দিন উপহাসের পাত্র হইয়াছি–সকলেই আমাকে ঠাট্টা করে।
> যদি বলি তাঁহার বিষয় আর উল্লেখ করিব না, তাঁহার নামে আর কিছু কহিব না,
> তবে আমার হৃদয়ে যেন দাহকারী অগ্নি অস্থিমধ্যে রুদ্ধ হয়;
> তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি,
> আর তিষ্ঠিতে পারি না।[৪৩]

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে জেরেমিয়াহ্কে টানছিলেন ঈশ্বর: একদিকে তিনি গভীর আকর্ষণ বোধ করেছেন ইয়াহ্ওয়েহ্র প্রতি যেখানে প্রলোভনের মিষ্টি আত্মসমর্পণের সকল ছোঁয়া রয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভেসে যাওয়া এক শক্তির টানে বিধ্বস্ত বোধ করেছেন।

AMARBOI.COM

আমোসের আমল হতেই পয়গম্বর একজন নিঃসঙ্গ একাকী মানুষ। এই সময়ে ওইকুমিনের অন্যান্য অঞ্চলের বিরপীতে মধ্যপ্রাচ্য ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় আদর্শ গ্রহণ করেনি।[৪৪] পয়গম্বরদের ঈশ্বর ইসরায়েলিদের পৌরাণিক সচেতনতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে মুলস্রোতের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে এগোনোর ওপর জোর দিচ্ছিলেন। জেরেমিয়াহ্‌র যন্ত্রণার মাঝে আমরা দেখতে পাই কি বিরাট টানাপোড়েন ও স্থানচ্যুতি জড়িত ছিল এতে। ইসরায়েল ছিল পৌত্তলিক এলাকা ঘেরা ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌বাদের একটা ছোট অনক্লেভ; ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ নিজেও বহু ইসরায়েলি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। এমনকি ডিউটেরোনমিস্টরা, যাঁদের ঈশ্বর অনেক কম ভীতিকর, ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকে উৎপীড়ক সংঘাত হিসাবে দেখেছেন: তিনি মোজেসকে ইসরায়েলিদের কাছে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য করেছেন, যারা ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের সম্ভাবনায় শঙ্কিত ছিল, ঈশ্বর প্রত্যেক প্রজন্মে একজন করে পয়গম্বর পাঠাবেন ঐশী প্রচারের ভার বহন করার জন্যে।

কিন্তু তখনও সর্বব্যাপী স্বর্গীয় শক্তি আত্মার সঙ্গে তুলনীয় কোনও কিছুর আবির্ভাব ঘটেনি ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র কাল্টে। বহিস্থঃ দুর্জ্ঞেয় সত্তা হিসেবে ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌কে দেখা হয়েছে। যাঁকে দূরবর্তী মনে না হওয়ার জন্যে কোনওভাবে মানব-সম করার প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিল: বাবিলনিয়রা জুদাহ্‌য় আগ্রাসন চালিয়ে রাজা ও ইসরায়েলিদের প্রথম দলটিকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিল; শেষ পর্যন্ত জেরুজালেমও আক্রান্ত হয়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জেরেমিয়াহ্‌ মানবীয় আবেগসমূহ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র প্রতি আরোপ করা অব্যাহত রাখেন: গৃহহীন বলে দুঃখকষ্ট আর নিঃসঙ্গতার জন্যে ঈশ্বরকে বিলাপ করিয়েছেন তিনি, ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ তাঁর জাতির মতোই হতবুদ্ধি, অপমানিত ও পরিত্যক্ত বোধ করেছেন; তাদের মতোই যেন চিন্তিত, বিচ্ছিন্ন এবং বিবশ। জেরেমিয়াহ্‌ তাঁর বুকে ফুঁসে ওঠা যে ক্রোধ অনুভব করেছেন সেটা তাঁর ক্রোধ নয় বরং ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র ক্রোধ।[৪৫] পয়গম্বরগণ যখনই 'মানুষে'র কথা ভেবেছেন তখনই আপনাআপনি 'ঈশ্বরে'র কথাও ভেবেছেন—জগতে যাঁর উপস্থিতি যেন তাঁর জাতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষেই, পৃথিবীতে কার্যকর হতে চাইলে ঈশ্বরকে মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়—এ ধারণাটি ঈশ্বর সম্পর্কে ইহুদি ধারণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এমনও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ তার আপন আবেগ ও অভিজ্ঞতার মাঝে ঈশ্বরের ভূমিকা উপলব্ধি করতে সক্ষম, অর্থাৎ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ মানবীয় অবস্থারই একটা অংশ।

শত্রু যতক্ষণ সদর দরজায় অবস্থান করেছে, জেরেমিয়াহ্‌ ততক্ষণ ঈশ্বরের নামে তাঁর জাতিকে বকাবাদ্যি করেছেন (যদিও ঈশ্বর সকাশে তিনি তাদের

AMARBOI.COM

পক্ষেই কথা বলেছেন)। ৫৮৭ সালে বাবিলনিয়দের হাতে জেরুজালেমের পতন হওয়ার পর, ইয়াহ্ওয়েহ্‌র কাছ থেকে আগত ভবিষ্যদ্বাণী আরও স্বস্তি দায়ক হয়ে উঠল: তিনি তাঁর জাতিকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এখন যেহেতু তাদের শিক্ষা হয়ে গেছে, ওদের দেশে ফিরিয়ে আনবেন। বাবিলনের কর্তৃপক্ষ জেরেমিয়াহ্‌কে জুদাহ্‌য় থেকে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা প্রকাশের পক্ষে তিনি কিছু ভূসম্পত্তি কিনেছিলেন: 'কেননা ইয়াহ্ওয়েহ্ স্যারেবথ এই কথা কহেন: বাটীর, ক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ক্রয়-বিক্রয় এই দেশে আবার চলিবে।'[৪৬] এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, কেউ কেউ বিপর্যয়ের জন্যে ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে দোষারোপ করেছে। মিশর ভ্রমণকালে জেরেমিয়াহ্ ডেল্টা অঞ্চলে পলায়নকারী ইহুদিদের একটা দলের দেখা পান যারা ইয়াহ্ওয়েহ্ বিশ্বাসী ছিল না। ওই দলের মহিলারা দাবি করল যে, যতদিন তারা স্বর্গের রানি ইশতারের সম্মানে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করেছে ততদিন সব কিছু চমৎকার চলছিল; কিন্তু জেরেমিয়াহ্‌দের মতো লোকদের প্ররোচনায় সেসব বাদ দেওয়ার পরই বিপর্যয়, পরাজয় ও শাস্তি নেমে এসেছে। কিন্তু ট্র্যাজিডি যেন জেরেমিয়াহ্‌র নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টিকে আরও গভীর করে তুলেছিল।[৪৭] জেরুজালেমের পতন ও মন্দির ধ্বংসের পর তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন যে, ধর্মের এসব বাহ্যিক আবরণ স্রেফ এক অভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থার প্রতীক। ভবিষ্যতে ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তিটি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন: 'আমি তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃদয়ে তাহা লিখিব।'[৪৮]

যাদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল তাদের ৭২২ সালের উত্তরাঞ্চলীয় দশটি গোত্রের মতো একীভূত হতে বাধ্য করা হয়নি। দুটো গোষ্ঠী হিসাবে বাস করেছে তারা: একটা গোত্র বাবিলনে ও অপরটি নিপ্পুর এবং উরের অদূরবর্তী ইউফ্রেতিসের শাখা নদী শেবারের অন্য পারে এক এলাকায় যার নাম তারা রেখেছিল তেল আবিব (বসন্তকালীন পাহাড়)। ৫৯৭ সালে নির্বাসিত ইহুদিদের প্রথম দলে একজন পুরোহিত ছিলেন, তাঁর নাম ইযেকিয়েল। টানা প্রায় পাঁচ বছর নিজ গৃহে অবস্থান করেন তিনি, এ সময় কারও সঙ্গে কথা বলেননি। এরপর অস্তিত্ব বিদীর্ণকারী ইয়াহ্ওয়েহ্ দর্শনের অভিজ্ঞতা হয় তাঁর যার ফলে আক্ষরিক অর্থেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর প্রথম দিব্যদর্শনের ঘটনাটির একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা জরুরি, কারণ বহু শতাব্দী পরে—সপ্তম অধ্যায়ের আমরা যেমন দেখব—ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদীদের কাছে এটা অত্যন্ত গুরুত্ববহ হয়ে উঠবে। ইযেকিয়েল আলোর ভেতর দিয়ে বজ্র নিক্ষিপ্ত আলোর একটি মেঘ দেখেছিলেন। উত্তর দিক থেকে তীব্র হওয়া বইছিল। এই ঝড়ো অস্পষ্টতার মাঝে তিনি যেন দেখতে পেলেন—ইমেজারির সাময়িক প্রকৃতির ওপর জোর

AMARBOI.COM

দেওয়ার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন তিনি—চারটি শক্তিশালী পশু টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা বিশাল রথ। এগুলো বাবিলনের রাজপ্রাসাদের তোরণে খোদাই করা *কারিবু (Karibu)*-র মতো প্রায়, কিন্তু ইযেকিয়েল কল্পনার চোখে এগুলোকে দেখা অসম্ভব করে তুলেছেন: প্রত্যেকটার মানুষ, সিংহ, ষাঁড় ও ঈগলের চেহারা বিশিষ্ট চারটি করে মাথা, প্রত্যেকটি চাকা একটি অন্যটির উল্টোদিকে ঘুরছে। ইমেজারি কেবল দর্শনের যে অচেনা প্রভাব তিনি বর্ণনা করার চেষ্টা করছিলেন, তার গুরুত্বই তুলে ধরেছে। পশুগুলোর ডানা ঝাপটানোর শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছিল। 'পানি'র স্রোতের মতো শোনাচ্ছিল ওটার শব্দ, শাদ্দাইয়ের কণ্ঠস্বরের মতো, ঝড়ের মতো কণ্ঠস্বর, শিবিরের শব্দের মতো।' রথের ওপর সিংহাসনের মতো একটা কিছু ছিল যেখানে 'পুরুষ মতো কেউ একজন' ছিল, পিতলের মতো চকচক করছিল ওটা, বাহু থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ওটাকে আবার ইয়াহ্ওয়েহ্‌র *প্রতাপের (কেভোদ)* মতো মনে হয়েছে।'[৪৯] নিমেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন ইযেকিয়েল এবং একটা কণ্ঠস্বরকে তাঁর উদ্দেশে কথা বলতে শুনেছেন।

কণ্ঠস্বরটি ইযেকিয়েলকে 'মানব সন্তান' বলে সম্বোধন করেন, ঠিক যেন মানুষ ও স্বর্গীয় জগতের মধ্যে বর্তমান দূরত্বের ওপর জোর দেওয়ার জন্যই। কিন্তু ইযেকিয়েলের ইয়াহ্ওয়েহ্ দর্শন আবার নির্দিষ্ট কাজের বাস্তব পরিকল্পনার জন্ম দেবে। ইসরায়েলের বিদ্রোহী সন্তানদের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দিতে হবে ইযেকিয়েলকে। ঐশ্বরিক বাণীর অমানবীয় রূপটি এক ভয়ঙ্কর ইমেজ দিয়ে বোঝানো হয়েছে: বিলাপ ও গোঙানিতে আবৃত একটা পুঁথি ধরা হাত পয়গম্বরের দিকে এগিয়ে আসে। ঈশ্বরের বাণী হজম করে আপন সত্তার অংশে পরিণত করার জন্যে। যথারীতি *Mysterium terrible* এর মতোই *fascinans :* পুঁথির স্বাদ মধুর মতো মনে হলো। শেষ পর্যন্ত ইযেকিয়েল বললেন, 'আর আত্মা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেলে আমি মনস্তাপে দুঃখিত হইয়া গমন করিলাম আর ইয়াহ্ওয়েহ্‌র হস্ত আমার উপর বলবৎ ছিল।'[৫০] তিনি তেল আবিবে পৌঁছে গোটা সপ্তাহ 'স্তব্ধ থাকিয়া বসিয়া থাকলেন'।

ইযেকিয়েলের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা দেখায় যে, স্বর্গীয় জগৎ মানব জাতির কাছে কতখানি অচেনা ও দূরবর্তী হয়ে উঠেছিল। তিনি স্বয়ং এই দূরত্বের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। ইয়াহ্ওয়েহ্ বারবার বিভিন্ন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে, যেগুলো স্বাভাবিক সত্তা থেকে ইযেকিয়েলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ওসব আচরণ এই সংকটকালে ইসরায়েলের দুর্ভোগ তুলে ধরার জন্যেও প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং এক গভীরতরে স্তরে দেখিয়েছে যে, খোদ ইসরায়েল পৌত্তলিক জগতে অনাহূত হয়ে উঠছে। এই কারণে স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইযেকিয়েলের ওপর শোক প্রকাশে

নিষেধাজ্ঞা আরেপিত হয়েছে: একপাশে কাত হয়ে ৩৯০ দিন এবং অন্য পাশ ফিরে ৪০ দিন শুয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। একবার অবশ্য কোনও বাসযোগ্য নগর ছাড়া তল্পিতল্পাসহ শরণার্থীর মতো তেল আবিবের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেও হয়েছিল তাঁকে। ইয়াহ্ওয়েহ্ এমন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভরে দিয়েছিলেন তাঁকে যে কম্পন আর অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ানো থেকে বিরত থাকতে পারেননি তিনি। অন্য এক ঘটনায় পশুর বিষ্ঠা খেতেও বাধ্য করা হয়েছে তাঁকে, জেরুজালেম অবরোধকালে স্বদেশবাসীর অদৃষ্ট দুর্ভিক্ষের আগাম নিদর্শন ছিল সেটা। ইযেকিয়েল ইয়াহ্ওয়েহ্র কাল্টের প্রকট ধারাবাহিকতাহীনের (radical discontinuti)-এর প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন: কোনও কিছুই নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়ার উপায় ছিল না, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

অন্যদিকে পৌত্তলিক দর্শন দেবতা ও সাধারণ জগতের মাঝে অনুভূত ধারাবাহিকতা উপভোগ করে যাচ্ছিল। প্রাচীন ধর্মে সান্ত্বনাদায়ক কিছুই পাননি ইযেকিয়েল, যেটাকে স্বভাবক্রমে তিনি 'আবর্জনা' আখ্যায়িত করতেন। এক দিব্যদর্শনের সময় জেরুজালেমের মন্দির দেখানো হয় তাঁকে। আতঙ্কের সঙ্গে তিনি দেখাতে পান, বিনাশের দোরগোড়ায় পৌঁছেও জুদাহ্র জনগণ ইয়াহ্ওয়েহ্র মন্দিরে স্থাপিত পৌত্তলিক দেবতাদের উপাসনা করছে। খোদ মন্দির এক দুঃস্বপ্নময় জায়গায় পরিণত হয়েছে: এর কক্ষগুলোর দেয়াল কিলবিলে সাপ আর বিশ্রী সব জানোয়ারের ছবিতে ঢাকা; অশ্লীল আলোয় পুরোহিতরা 'অশ্লীল' আচরণে লিপ্ত, ঠিক যেন ব্ল্যাকরুমে যৌন ক্রিয়ায় জড়িয়ে আছে। 'হে মনুষ্যসন্তান, ইস্রায়েল জলের প্রাচীন-বর্গ অন্ধকারে, প্রত্যেকে আপন আপন ঠাকুর ঘরে কি কি কার্য্য করে তাহা কি তুমি দেখিলে?'[৫১] আরেকটা ঘরে দেবতা তামমুযের (Tammuz) দুর্ভোগের জন্যে বসে বসে কাঁদছিল মহিলারা; অন্যরা স্যাঙ্কচুয়্যারির দিকে পেছন ফিরে সূর্যের উপাসনা করছিল। সবশেষে পয়গম্বর তাঁর প্রথম দিব্যদর্শনে দেখা ইয়াহ্ওয়েহ্র প্রতাপ চলে যাওয়া রথ দেখতে পান। কিন্তু তখনও পুরোপুরি দূরবর্তী উপাস্যে পরিণত হননি ইয়াহ্ওয়েহ্। জেরুজালেম ধ্বংসের পূর্ববর্তী শেষ দিনগুলোতে ইযেকিয়েল ইসরায়েল জাতির মনোযোগ আকর্ষণ ও তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য করার ব্যর্থ প্রয়াসে ইয়াহ্ওয়েহ্ও চিৎকার করার কথা বলে গেছেন। আসন্ন বিপর্যয়ের জন্যে খোদ ইসরায়েলই দায়ী। ইয়াহ্ওয়েহ্কে বারবার দূরবর্তী মনে হলেও তিনি ইযেকিয়েলের মতো ইসরায়েলিদের বুঝতে উৎসাহ যুগিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক অমোঘ আঘাত দৈবচয়িত ও খেয়ালি নয় বরং এর নিগূঢ় যুক্তি ও সুষ্ঠুতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিষ্ঠুর জগতে প্রকট একটা অর্থ খুঁজে পাবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন তিনি।

AMARBOI.COM

বাবিলনের নদনদীর তীরে বসে নির্বাসিতদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই অনুভব করেছিল যে, প্রতিশ্রুত ভূমির বাইরে তারা ধর্ম পালন করতে পারবে না। পৌত্তলিক দেবতারা সবসময় আঞ্চলিক প্রকৃতির ছিলেন, ফলে কারও কারও কাছে ভিন্ন দেশে ইয়াহ্ওয়েহ্‌র গান গাওয়া অসম্ভব মনে হয়েছে: বাবিলনের শিশুদের পাথরের ওপর আছড়ে ফেলে মগজ বের করে ফেলার চিন্তা অনেকেই উপভোগ করেছে।[৫২] নতুন একজন পয়গম্বর অবশ্য শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা, এটা হয়তো তাৎপর্যবহ, কেননা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ও শ্লোকে পূর্বসূরিদের মতো ব্যক্তিগত সংগ্রামের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। পরবর্তীকালে তাঁর রচনা ইসায়াহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় সাধারণভাবে তাঁকে দ্বিতীয় ইসায়াহ্ আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। নির্বাসিত অবস্থায় ইহুদিদের কেউ কেউ বাবিলনের দেবতাদের উপাসনায় ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু অন্যরা এক নতুন ধর্মীয় সচেতনতার দিকে ধাবিত হয়েছে। ইয়াহ্ওয়েহ্‌র মন্দির ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল, বেথ-এল ও হেবরনের প্রাচীন কাল্টিক উপাসনালয়গুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাবিলনে তাদের পক্ষে স্বদেশী আচার-অনুষ্ঠান বা শাস্ত্রাচার পালন সম্ভব ছিল না। ওদের একমাত্র সম্বল ছিল ইয়াহ্ওয়েহ্। দ্বিতীয় ইসায়াহ্ একে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে ইয়াহ্ওয়েহ্‌কেই *একমাত্র* ঈশ্বর ঘোষণা দেন। তাঁর পুনর্লিখিত ইসরায়েলিদের ইতিহাসে এক্সোডাসের মিথ এমন ইমেজারির আবরণ পায় যা আমাদের আদিম সাগরে তিয়ামাতের বিরুদ্ধে মারদুকের বিজয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়:

> আর ইয়াহ্ওয়েহ্ মিশ্রীয় সমুদ্রের খাড়ি নিঃশেষে বিনষ্ট করিবেন।
> [ফরাৎ] নদীর উপরে নিজ উত্তপ্ত বায়ু সহকারে হস্ত দোলাইবেন,
> তাহাকে প্রহার করিয়া সপ্ত প্রণালী করিবেন,
> ও লোকদিগকে পাদুকাচরণে পার করিবেন।
> আর মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েলের বাহির হইয়া আসিবার সময়ে যেমন তাহার নিমিত্ত পথ হইয়াছিল তেমনি তাহার প্রজাদের
> অবশিষ্টাংশের অশূর হইতে অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্ত এক রাজপথ হইবে।[৫৩]

প্রথম ইসায়াহ্ ইতিহাসকে স্বর্গীয় সতর্কবাণীতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সান্ত্বনা পুস্তকে (Book of Cousolation) বিপর্যয়ের পর দ্বিতীয় ইসায়াহ্ ইতিহাসকে ভবিষ্যতের নতুন আশা সঞ্চারে ব্যবহার করেছেন। ইয়াহ্ওয়েহ্ অতীতে ইসরায়েলকে একবার উদ্ধার করে থাকলে আবারও তা করতে

AMARBOI.COM

পারবেন। তিনি স্বয়ং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উদগাতা, তাঁর চোখে সকল *গোয়িম* কোনও পাত্রের এক ফোঁটা পানির চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র ঈশ্বর যাঁর গুরুত্ব আছে। বাবিলনের প্রাচীন উপাস্যদের একটা ঠেলাগাড়িতে তুলে সূর্যাস্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে কল্পনা করেছেন দ্বিতীয় ইসায়াহ্।[৫৪] তাদের দিন ফুরিয়ে গেছে: 'আমি কি ইয়াহ্ওয়েহ্ নই?' বারবার জিজ্ঞাসা রেখেছেন তিনি, 'আমার পাশে আর কোনও দেবতা নেই।'[৫৫]

আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই;
আমি ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারী ইয়াহ্ওয়েহ্।
আমি ব্যতীত অন্য নাই।[৫৬]

*গোয়িমদের* দেবনিচয়কে অস্বীকার যেতে দেরি করেননি দ্বিতীয় ইসায়াহ্, বিপর্যয়ের পর যাদের অবশ্য বিজয়ী রূপে দেখা হয়ে থাকতে পারে। নির্বিকার চিত্তে তিনি ধরে নিয়েছেন, ইয়াহ্ওয়েহ্ই—মারদুক বা বাআল নন—সমস্ত মহান ঘটনাবলী ঘটিয়েছেন যা বিশ্বকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সম্ভবত বাবিলনের সৃষ্টি সংক্রান্ত মিথগুলোর সঙ্গে নতুন যোগাযোগ এটার কারণেই ইসরায়েলিরা প্রথমবারের মতো সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইয়াহ্ওয়েহ্র ভূমিকার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তারা অবশ্যই বিশ্বজগতের ভৌত বা বাস্তব উৎপত্তি বা সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়াস পায়নি বরং বর্তমান কঠিন বিশ্ব পরিস্থিতিতে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে। ইয়াহ্ওয়েহ্ আদিকালের দানবসদৃশ্য বিশৃঙ্খলাকে দমন করে থাকলে তাঁর পক্ষে নির্বাসিত ইসরায়েলিদের উদ্ধার করা কোনও ব্যাপারই নয়। এক্সোডাস মিথ ও সময়ের সূচনালগ্নে জলীয় বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিজয়ের পৌত্তলিক গল্প গাথার মাঝে মিল লক্ষ করে স্বর্গীয় ক্ষমতা বা শক্তির এক নতুন আবির্ভাবের আশায় আস্থার সঙ্গে বুক বাঁধার আহ্বান জানিয়েছেন দ্বিতীয় ইসয়াহ। উদাহরণ স্বরূপ, এখানে তিনি কানানের সৃষ্টি সংক্রান্ত মিথ, দানব লোতানের বিরুদ্ধে বাআলের বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সাগর-দানবকে রাহাব: কুমীর (*tannin*) ও অতলগহ্বর (*tebom*) বলেও ডাকা হতো:

ওঠো, জাগিয়া ওঠো! শক্তিতে আবৃত করো,
ইয়াহ্ওয়েহ্র হাত,
জাগিয়া ওঠো, অতীত কালের ন্যায়,
সেই বহু প্রজন্ম অতীতের সময়ের ন্যায়।
তুমি কি রাহাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করো নাই;

আর ড্রাগনকে (*tannin*) বিদ্ধ করো নাই?
তুমি কি সাগরকে শুস্ক করো নাই,
বিশাল গহ্বরের (*tehom*) পানিকে
সাগতলকে পথে রূপান্তরিত করার জন্যে
যাতে উদ্ধারপ্রাপ্তরা অতিক্রম করিতে পারে?[৫৭]

ইসরায়েলের ধর্মীয় কল্পনায় অবশেষে ইয়াহ্ওয়েহ্ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিদের গ্রাস করে ফেললেন: নির্বাসিত অবস্থায় পৌত্তলিকতাবাদের প্রলোভন আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল ও জুদাইজমের ধর্ম জন্ম নিয়েছিল। সে সময় ইয়াহ্ওয়েহ্র কাল্ট সঙ্গত কারণেই বিলুপ্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল ঠিক তখন চরম হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্থিতিতে তিনি মানুষের আশাবাদী হয়ে ওঠার উপায়ে পরিণত হয়েছিলেন।

সুতরাং, ইয়াহ্ওয়েহ্ পরিণত হয়েছিলেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে। দার্শনিক দিক দিয়ে তাঁর দাবির যৌক্তিকতা বিচারের কোনও প্রয়াস ছিল না। বরাবরের মতো নতুন মতাদর্শ যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব বলে নয় বরং তা হতাশা রোধ ও আশা সঞ্চারে কার্যকর বলেই সফল হয়েছিল। ইহুদিরা স্থানচ্যুত ও বিতাড়িত অবস্থায় থাকায় ইয়াহ্ওয়েহ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী কাল্টকে আর দূরবর্তী, অস্বস্তিকর ভাবতে পারেনি। এটা বরং প্রবলভাবে ওদের অবস্থা তুলে ধরেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় ইসায়াহ্র ঈশ্বরের ইমেজে আরামপ্রদ কিছুই ছিল না। তিনি মানব মনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছেন:

কারণ ইয়াহ্ওয়েহ্ কহেন, আমার সংকল্প সকল ও
তোমাদের সংকল্প সকল এক নয়,
এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়।
কারণ ভূতল হইতে আকাশ মণ্ডল যত উচ্চ,
তোমাদের পথ হইতে আমার পথও
তোমাদের সংকল্প হইতে আমার সংকল্প তত উচ্চ।[৫৮]

ঈশ্বরের রূপ ভাষা ও ধারণার আওতার অতীত। মানুষ যা আশা করে ইয়াহ্ওয়েহ্ সবসময় সেটা করেনও না। অত্যন্ত দুঃসাহসী এক অনুচ্ছেদে, আজকের দিনে যেটাকে বেশ কটু মনে হয়, পয়গম্বর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন মিশর ও আসিরিয়াও ইসরায়েলের পাশে ইয়াহ্ওয়েহ্র জাতিতে রূপান্তরিত হবে। ইয়াহ্ওয়েহ্ বলবেন: 'আমার প্রজা

AMARBOI.COM

মিসর আমার হস্তকৃত অশূর ও অধিকার ইস্রায়েল আশীর্ব্বাদ যুক্ত হউক।'[৫৯] দুর্জ্ঞেয় সত্তার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন তিনি যার ফলে নির্বাচনের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা তুচ্ছ ও অপর্যাপ্ত মনে হয়েছে।

বিসিই ৫৩৯ সালে পারসিয়ার রাজা সাইরাস বাবিলনিয় সাম্রাজ্য অধিকার করার পর পয়গম্বরদের বিরুদ্ধে বুঝি বদলা নেওয়া হয়েছে মনে হয়েছে। সাইরাস তাঁর নতুন প্রজাদের ওপর পারসিয় দেবতাদের চাপিয়ে দেননি, তবে বিজয়ীর বেশে বাবিলনে প্রবেশ করার পর মারদুকের মন্দিরে উপাসনা করেছেন। বাবিলনিয়দের কাছে পরাস্ত জাতির দেবতাদের প্রতিমাও তাদের আদি গৃহে পুনঃস্থাপন করেন তিনি। বিশ্ব বিশালাকৃতির আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যের অধীনে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ায় দেশান্তরীকরণের পুরোনো পদ্ধতি প্রয়োগ প্রয়োজন মনে করেননি। প্রজারা তাঁদের নিজস্ব এলাকায় নিজস্ব দেবতাদের উপাসনা করলে শাসন করার বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়। গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে প্রাচীন মন্দিরসমূহের পুনঃস্থাপন উৎসাহিত করেছেন তিনি, বারবার দাবি করেছেন, তাদের দেবতাই তাঁর ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক ধর্মের কোনও কোনও রূপের অন্তর্দৃষ্টির সহনশীলতা ও উদারতার উদাহরণ। ৫৩৮ সালে ইহুদিদের জুদাহয় ফিরে তাদের মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি দিয়ে এক আদেশ জারি করেন সাইরাস। কিন্তু ওদের অধিকাংশই ফিরে না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে: এরপর থেকে কেবল সংখ্যালঘু একটা দল প্রতিশ্রুত ভূমিতে বাস করবে। বাইবেল আমাদের বলছে, ৪২,৩৬০ জন ইহুদি বাবিলন ও তেল আবিব ত্যাগ করে স্বদেশের পথ ধরেছিল, যেখানে তাঁরা তাদের হতবুদ্ধি স্বজাতিদের ওপর নতুন জুদাইজম চাপিয়ে দিয়েছিল।

আমরা নির্বাসনের পর রচিত এবং পেন্টাটিউকের অংশে পরিণত প্রিস্টলি ট্র্যাডিশনের রচনায় এর সঙ্গে কী জড়িত ছিল তা দেখতে পাই। এটা আমাদের 'J' এবং 'E' বর্ণিত ঘটনাবলীর নিজস্ব ব্যাখ্যা যোগায় এবং নাম্বারস ও লেভিটিকাস শীর্ষক দুটো নতুন পুস্তক যোগ করেছে। আমাদের প্রত্যাশা মতোই ইয়াহ্ওয়েহ্ সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত ও অতিরঞ্জিত ধারণা ছিল 'P'-র। যেমন, তিনি বিশ্বাস করতেন না যে 'J' যেভাবে বলেছেন সেভাবে কারও পক্ষেই সত্যি সত্যি ঈশ্বরকে *দেখা* সম্ভব। ইযেকিয়েলের বহু ধারণার মতো তাঁর বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণা এবং প্রকৃত সত্তার মাঝে একটা পার্থক্য রয়েছে। 'P'-এর সিনাই পর্বতে মোজেসের কাহিনীতে মোজেস ইয়াহ্ওয়েহ্ দর্শন লাভের জন্যে আবেদন জানাচ্ছেন, ইয়াহ্ওয়েহ্ জবাবে বলছেন: 'তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না।'[৬০] তার বদলে স্বর্গীয় প্রতাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পাহাড় প্রাচীরের একটা ফোকরে আশ্রয় নিতে হবে মোজেসকে যেখান থেকে তিনি ইয়াহ্ওয়েহ্ বিদায়

নেওয়ার সময় এক ঝলকের জন্যে অনেকটা পেছন থেকে দেখতে পাবেন। 'P'-এমন একটা ধারণা যোগান দিয়েছেন যেটা ঈশ্বরের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। নারী-পুরুষ কেবল স্বর্গীয় সত্তার একটা আভা দেখতে পাবে, যাকে তিনি বলছেন 'ইয়াহ্ওয়েহ্‌র *প্রতাপ (kavod),'* তাঁর সত্তার একটা প্রকাশ, যাকে স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।[৬১] মোজেস যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তাঁর চেহারায়ও এই 'প্রতাপ' বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, এমন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ঝলমল করছিল যে, ইসরায়েলিরা তাঁর দিকে তাকাতে পারছিল না।[৬২]

ইয়াহ্ওয়েহ্‌র 'প্রতাপ' পৃথিবীতে তাঁর উপস্থিতির একটি প্রতীক, সুতরাং এটা নারী-পুরুষের সৃষ্ট ঈশ্বর সংক্রান্ত ইমেজ ও স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্রতার পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। এভাবে এটা ইসরায়েলি ধর্মের পৌত্তলিক বৈশিষ্ট্যের এক পাল্টা ভারসাম্য ছিল। এক্সোডাসের প্রাচীন কাহিনীগুলো পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'P' এটা ভাবেননি যে ঘুরে বেড়ানোর দিনগুলোয় স্বয়ং ইয়াহ্ওয়েহ্ ইসরায়েলিদের সঙ্গে ছিলেন: সেটা হতো একটা অসম্ভব পার্থিব ব্যাপার। বরং তার বদলে তিনি ইয়াহ্ওয়েহ্ যেখানে মোজেসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেই তাঁবু ইয়াহ্ওয়েহ্‌র 'প্রতাপে' ভরে ওঠা দেখিয়েছেন। একইভাবে মন্দিরে অবস্থানকারীও কেবল 'ইয়াহ্ওয়েহ্‌র প্রতাপপুষ্ট' হতে পারে।[৬৩]

পেন্টাটিউকে 'P'-র সবচেয়ে বিখ্যাত অবদান অবশ্যই জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি সংক্রান্ত বিবরণ, যা *এনুমা এলিশের* অনুসরণ। আদিম গহ্বরের (*tehom, tiamat*-এর অপভ্রংশ) পানি দিয়ে শুরু করেছেন 'P', যেখান থেকে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ইয়াহ্ওয়েহ্। তবে দেবতাদের যুদ্ধের কোনও উল্লেখ নেই, উল্লেখ নেই ইয়াম, লোতান বা রাহাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়েরও। ইয়াহ্ওয়েহ্ একাই সবকিছুর অস্তিত্ব দান করার দাবিদার। বস্তু ক্রম-উৎসারিত হয়নি, বরং ইয়াহ্ওয়েহ্ স্রেফ অনায়াস ইচ্ছা দিয়েই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বভাবতই পৃথিবীকে ইয়াহ্ওয়েহ্‌র উপাদান বিশিষ্ট স্বর্গীয় ভাবতে যাননি 'P'। প্রকৃতপক্ষে 'P'-র ধর্মতত্ত্বে 'পৃথকীকরণ' (Separation) খুবই গুরুত্বপূর্ণ: রাত্রি হতে দিন, পানি হতে জমিন এবং অন্ধকার হতে আলোকে পৃথক করার ভেতর দিয়ে ঈশ্বর মহাবিশ্বকে এক সুশৃঙ্খল রূপ দিয়েছেন। প্রত্যেক পর্যায়ে ইয়াহ্ওয়েহ্ সৃষ্টিকে আশীর্বাদ ও পবিত্র করেছেন এবং 'ভালো' আখ্যা দিয়েছেন। বাবিলনিয়দের কাহিনীর বিপরীতে মানব সৃষ্টি হচ্ছে সৃষ্টির ক্লাইমেক্স, হাস্যকর পশ্চাদচিন্তা নয়। নারী এবং পুরুষ স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশীদার না হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের অনুরূপ আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের: তাদের অবশ্যই তাঁর সৃজনশীল কর্মধারাকে এগিয়ে নিতে হবে। *এনুমা এলিশে* যেমন রয়েছে, ছয়দিনব্যাপী সৃষ্টি কর্মের পর সপ্তম দিনে সাবাথের

AMARBOI.COM

মতো বিশ্রামের কথা রয়েছে: বাবিলনিয় বর্ণনায় এই দিনে মহাসভা 'নিয়তি নির্ধারণ' ও মারদুককে স্বর্গীয় উপাধি দান করার জন্যে মিলিত হয়েছিল। 'P'-র বর্ণনায় প্রথম দিনে বিরাজিত আদিম বিশৃঙ্খলার প্রতীকী বিপরীত অবস্থান পেয়েছে সাবাথ। শিক্ষামূলক সুর ও পুনরাবৃত্তি বোঝায়, 'P'-র সৃষ্টি-কাহিনী *এনুমা এলিশের* মতো আচরিক আবৃত্তির উদ্দেশে রচিত হয়েছিল; ইয়াহ্ওয়েহ্র কাজের প্রশংসা এবং ইসরায়েলের স্রষ্টা ও শাসক হিসাবে তাঁকে অভিষিক্ত করার জন্য।[৬৪]

স্বভাবতই 'P'-র ইহুদিবাদে নতুন মন্দির ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়। নিকট প্রাচ্যে মন্দিরকে প্রায়শঃই মহাবিশ্বের অনুকৃতি হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। মন্দির নির্মাণ ছিল এমন এক কর্মকাণ্ড যা মানুষকে খোদ দেবতাদের সৃজনশীলতায় যোগ দিতে সক্ষম করে তোলে। নির্বাসনকালে বহু ইসরায়েলি চুক্তির আর্ক-এর পুরোনো কাহিনীসমূহে সান্ত্বনা খুঁজে পেত; আর্ক একটা বহনযোগ্য মন্দির যেখানে ঈশ্বর তাঁর জাতির সঙ্গে 'তাবু খাটিয়েছেন' (*Shaken*), তাদের গৃহহীন অবস্থার অংশীদার হয়েছেন। স্যাঙ্কচুয়্যারি নির্মাণ, বিরান এলাকায় ভল্ট অভ মিটিং বর্ণনা করার সময় প্রাচীন পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন 'P '। এর স্থাপত্য নকশা নতুন নয়, বরং স্বর্গীয় মডেলেরই অনুকরণ: সিনাই পর্বতে মোজেসকে ইয়াহ্ওয়েহ্ অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছিলেন: 'তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব। আবাসের ও তাহার সকল দ্রব্যের বা আদর্শ আমি তোমাকে দেখাই, তদনুসারে তোমরা সকলই করিবে।'[৬৫] স্যাঙ্কচুয়্যারি নির্মাণের দীর্ঘ বিবরণী আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার কথা বলা হয়নি; এটা কেউ কল্পনা করেনি যে প্রাচীন ইসরায়েলিরা সত্যি সত্যি 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল; এবং নীল, বেগুনি ও লাল, এবং শাদা মসিনা সূত্র ও ছাগলোম ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও শিটী কাষ্ঠ' ইত্যাদি দিয়ে এমন একটা বিশাল উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেছিল।[৬৬] এই দীর্ঘ প্রক্ষেপন আসলে 'P'-র সৃষ্টি-কাহিনীর স্মারক। নির্মাণের প্রত্যেক পর্যায়ে মোজেস 'সকল কাজ দেখেছেন' এবং সৃষ্টির দিনের ইয়াহ্ওয়েহ্র মতো 'মানুষকে 'আশীর্বাদ করেছেন'। বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে স্যাঙ্কচুয়্যারি নির্মিত হয়েছিল; উপাসনালয়ের স্থপতি বেয়ালেল ঈশ্বরের চেতনা (*ruach elohim*) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন যা বিশ্বসৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তাধারা ছিল, এবং উভয় বিবরণীই সাবাথ বিশ্রামের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।[৬৭] মন্দির নির্মাণ আদি সাম্যেরও একটা প্রতীক যা মানবজাতি পৃথিবী ধ্বংস করার আগে বিরাজমান ছিল।

ডিউটেরোনমিতে দাসসহ প্রত্যেককে একদিন বিশ্রাম দান ও ইসরায়েলিদের এক্সোডাসের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য সাবাথের

AMARBOI.COM

পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[৬৮] সাবাথকে এক নতুন তাৎপর্য দান করেছেন 'P'। ঈশ্বরকে অনুসরণ করার ও বিশ্ব সৃষ্টির স্মরণের উপলক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এটা। সাবাথ বিশ্রাম গ্রহণের সময় ইহুদিরা এমন এক কর্মকাণ্ডে অংশ নিত যা আদিতে ঈশ্বর একাই পালন করেছিলেন: স্বর্গীয় জীবন যাপনের একটা প্রতীকী প্রয়াস এটা ছিল। প্রাচীন পৌত্তলিকতাবাদে মানবীয় প্রতিটি আচরণ দেবতাদের কর্মকাণ্ডের অনুকরণ ছিল, কিন্তু ইয়াহ্ওয়েহ্র কাল্ট স্বর্গীয় ও মানব জগতের মাঝখানে এক বিশাল দূরত্ব তুলে ধরেছিল। এবার মোজেসের তোরাহ্ অনুকরণের মাধ্যমে ইহুদিরা ইয়াহ্ওয়েহ্র আরও কাছাকাছি যাবার প্রেরণা পেল। ডিউটেরোনমিতে বেশ কিছু অবশ্য পালনীয় আইনের উল্লেখ করা হয়েছে, টেন কমান্ডমেন্টস যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্বাসন ও এর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে পেন্টাটিউককে একে বিস্তৃত করে ৬১৩টি নির্দেশ (*mitzvot*) সম্বলিত জটিল বিধিবিধানে পরিণত করা হয়। সূক্ষ্ম এই নির্দেশনাগুলো বহিরাগত কারও চোখে অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে; নিউ টেস্টামেন্টের যুক্তিতর্কে তা খুব নেতিবাচক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্রিশ্চানরা যেমনটি ভাবতে চায়, ইহুদিরা সেরকম অসহনীয় ভার মনে করেনি এগুলোকে, বরং তারা একে ঈশ্বরের সকাশে বেঁচে থাকার প্রতীকী উপায় হিসাবে দেখেছে। ডিউটেরোনমিতে আহার সংক্রান্ত বিধিবিধান ইসরায়েলের বিশেষ মর্যাদার নিদর্শন ছিল।[৬৯] এগুলোকে ঈশ্বরের পবিত্র ভিন্নতার আচরিক প্রয়াস হিসাবেও দেখেছে তারা মানুষ ও স্বর্গের মধ্যকার বেদনাদায়ক বিচ্ছিন্নতাকে যা দূর করে দিয়েছে। ইসরায়েলিরা যখন মধুকে মাংস হতে, অপরিচ্ছন্ন থেকে পরিচ্ছন্নকে ও গোটা সপ্তাহ থেকে সাবাথকে আলাদা করে তখন তারা ঈশ্বরের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড অনুকরণের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হতে পারে।

AMARBOI.COM

'J' এবং 'E' ও ডিউটেরোনমিস্ট বর্ণনার পাশাপাশি পেন্টাটুয়েকে প্রিস্টলি বিবরণের রচনাবলী স্থান পেয়েছে। যে কোনও প্রধান ধর্ম যে কতগুলো স্বাধীন দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে গঠিত, এটা আমাদের তা মনে করিয়ে দেয়। কোনও কোনও ইহুদি বরাবরই ডিউটেরোনমিয় ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকে থাকে, যিনি ইসরায়েলকে প্রচণ্ডভাবে *গোয়িমদের* থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে বেছে নিয়েছিলেন; কেউ কেউ একে মেসিয়ানিক মিথ পর্যন্ত প্রসারিত করেছে যখন সময়ের শেষ পর্যায়ে 'ইয়াহ্ওয়েহ্র দিবসে'র প্রত্যাশা করা হয়েছে, যেদিন তিনি ইসরায়েলকে মহিমান্বিত করবেন ও অন্যান্য জাতিকে অপদস্থ করবেন। এসব পৌরাণিক বিবরণী ঈশ্বরকে খুব দূরবর্তী সত্তা হিসাবে দেখতে চেয়েছে। একটা বিষয়ে নীরব সম্মতি রয়েছে যে, নির্বাসনের পর পয়গম্বরদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে আর সরাসরি যোগাযোগ হবে না; ইনোখ ও

দনিয়েলের মতো সুদূর অতীতের মহান ব্যক্তিত্বের ওপর আরোপিত প্রতীকী দর্শনের মাধ্যমেই কেবল তা অর্জিত হয়।

দূর অতীতের এই বীরদের একজন, দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার ক্ষেত্রে বাবিলনে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হিসাবে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন জব। নির্বাসনের পরে রক্ষাপ্রাপ্তদের একজন এই প্রাচীন কিংবদন্তী উল্লেখ করে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন কাহিনীতে ঈশ্বর কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছেন জব, তিনি ধৈর্যের সঙ্গে অপরিসীম দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন বলে ঈশ্বর অতীতের ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। জবের কাহিনীর নতুন ভাষ্যে রচয়িতা প্রাচীন কিংবদন্তীকে দুভাগ করে ঈশ্বরের আচরণের বিরুদ্ধে জবকে ক্ষুব্ধ দেখিয়েছেন। তিনজন সান্ত্বনাদাতাকে নিয়ে স্বর্গীয় বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপনের সাহস দেখিয়েছেন জব, লিপ্ত হয়েছেন প্রবল বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে। ইহুদিদের ধর্মীয় ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ধর্মীয় কল্পনা আরও গভীর বিমূর্ত প্রকৃতির অনুধাবনের দিকে বাঁক নিয়েছিল। পয়গম্বরগণ দাবি করেছিলেন যে, পাপের ফল হিসাবেই ইসরায়েলকে দুর্দশাগ্রস্ত করেছেন ঈশ্বর; জবের রচয়িতা দেখাচ্ছেন, ইসরায়েলিদের কেউ কেউ প্রচলিত জবাবে আর সন্তুষ্ট ছিল না। জব এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করেছেন এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক অপূর্ণতা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, কিন্তু ঈশ্বর সহসা তাঁর হিংস্র ভাবনায় বাদ সাধছেন। এক দিব্যদর্শনে জবকে দেখা দিয়ে আপন সৃষ্ট জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি: জবের মতো এক সামান্য সৃষ্টি দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের সঙ্গে তর্কে যাবার সাহস করেন কীভাবে? জব হার মানেন, কিন্তু একজন আধুনিক পাঠক, যিনি দুঃখ বেদনার আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দার্শনিক সমাধানের সন্ধানে আছেন, এ সমাধানে সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। অবশ্য জবের রচয়িতা প্রশ্ন তোলার অধিকার অস্বীকার করছেন না, কিন্তু বোঝাতে চাইছেন স্রেফ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এসব চিন্তাতীত বিষয়ের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক আঁচ-অনুমানকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশের পথ খুলে দিতে হবে, পয়গম্বররা যেমন পেয়েছিলেন।

ইহুদিরা তখনও পর্যন্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার শুরু করেনি, তবে চতুর্থ শতাব্দীতে তারা গ্রিক র‍্যাশনালিজমের প্রভাবের আওতায় এসেছিল। বিসিই ৩৩২ সালে মেসিদোনিয়ার আলেকজান্দার পারসিয়ার তৃতীয় দারিয়াসকে পরাজিত করেন এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ গড়ে তুলতে শুরু করে গ্রিকরা। তারা তায়ার, সিদন, গাযা, ফিলাদেলফিয়া (আম্মান ও ত্রিপোলি) এবং এমনকি শেচেম-এ নগররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। প্যালেস্তাইন ও ডায়াসপোরার ইহুদিরা হেলেনিক সংস্কৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, অনেকের

AMARBOI.COM

কাছে তা ছিল অস্বস্তিকর, অন্যরা গ্রিক থিয়েটার, দর্শন, ক্রীড়া ও কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তারা গ্রিক ভাষা শিখেছে, জিমন্যাসিয়ামে শরীর চর্চা করেছে এবং গ্রিক নাম গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ মার্সেনারি হিসাবে গ্রিক সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছে। নিজেদের ঐশীগ্রন্থ গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেছে তারা, ফলে সেপচুয়াজিন্ট নামে পরিচিত ভাষ্যটির সৃষ্টি; এভাবে গ্রিকদের কেউ কেউ ইসরায়েলের ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারে এবং ইয়াহ্ওয়েহ্ (বা ইয়াও, যেভাবে সম্বোধন করত তারা)-কে যিউস ও দায়োনিসাসের পাশাপাশি উপাসনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কেউ কেউ সিনাগগ বা বিকল্প স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হযেছিল। ডায়াসপোরার ইহুদিরা মন্দিরে উপাসনার বদলে বিকল্প এই স্থান গড়ে তোলে। এখানে তারা তাদের ঐশীগ্রন্থ পাঠ করত, প্রার্থনায় মগ্ন হতো ও সারমন শুনত। প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বের অন্য আর কিছুর সঙ্গে সিনাগগের মিল ছিল না। এখানে কোনও রকম আচার-অনুষ্ঠান পালন বা উৎসর্গের উপস্থিতি ছিল না বলে নিশ্চয়ই এগুলোকে দর্শনের স্কুলের মতো মনে হতো; সুপরিচিত কোনও ইহুদি পুরোহিতের আগমনের সংবাদ পেলে অধিক সংখ্যায় সিনাগগে হাজির হতো তারা, যেমন আপন দার্শনিকদের বক্তব্য শোনার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াত। কোনও কোনও গ্রিক এমনকি তোরাহ্‌র নির্দিষ্ট অংশ অনুসরণ করত ও ইহুদিদের সঙ্গে সমন্বয়বাদী সেক্টে যোগ দিয়েছিল। বিসিই চতুর্থ শতাব্দীতে ইহুদি ও গ্রিকদের ইয়াহ্ওয়েহ্‌কে জনৈক গ্রিক দেবতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলার বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে।

অবশ্য অধিকাংশ ইহুদি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। মধ্যপ্রাচ্যের হেলেনিস্টিক নগরসমূহে ইহুদি ও গ্রিকদের মাঝে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন বিশ্বে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না। নগরীসমূহে দেবতারা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। মনে করা হতো যে তাঁদের কাল্টের প্রতি অবহেলা করা হলে তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা তুলে নেবেন। যেসব ইহুদি এইসব দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করত তাদের 'নাস্তিক' ও সমাজের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়। বিসিই দ্বিতীয় শতাব্দী নাগাদ এই বৈরিতা আরও গভীর হয়ে ওঠে: প্যালেস্তাইনে যখন সেলুসিদ গভর্নর অ্যান্তিওকাস এপিফেন্স জেরুজালেমকে হেলেনাইজ করে মন্দিরে যিউসের কাল্ট চালু করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তখন এমনকি একটা বিদ্রোহেরও সৃষ্টি হয়েছিল। ইহুদিরা নিজস্ব সাহিত্য গড়ে তুলতে শুরু করেছিল যেখানে যুক্তি দেখানো হয় যে, প্রজ্ঞা গ্রিক চাতুর্য নয় বরং ইয়াহ্ওয়েহ্ ভীতি। মধ্যপ্রাচ্যে প্রজ্ঞা-সাহিত্য ছিল এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা, দার্শনিক বিচার বিবেচনা নিয়ে নয় বরং বেঁচে থাকার সর্বোত্তম উপায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে জীবনের অর্থ খুঁজে পাবার প্রয়াস পেয়েছে এটা: প্রায়শঃ অনেক বাস্তবভিত্তিক হতে দেখা গেছে এটাকে। বিসিই তৃতীয় শতাব্দীতে বুক অভ প্রোভার্বস-এর রচয়িতা আরেকটু অগ্রসর হয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে,

AMARBOI.COM

প্রজ্ঞা হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা অর্থাৎ এটাই ছিল তাঁর প্রথম সৃষ্টি। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখব, এই বিশ্বাসটি আদি ক্রিশ্চানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রজ্ঞাকে ব্যক্তিক রূপ দিয়েছেন রচয়িতা যেন একে আলাদা সত্তা মনে হয়:

ইয়াহ্ওয়েহ্ নিজ পথের আরম্ভে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, *
তাঁহার কর্ম্ম সকলের পূর্বে, পূর্ব্বাবধি।
আমি স্থাপিত হইয়াছি অনাদি কালাবধি,
আদি অবধি, পৃথিবীর উদ্ভবের পূর্ব্বাবধি।
তৎকালে আমি তাঁহার কাছে কার্য্যকরী ছিলাম;
আমি দিন দিন আনন্দময় * ছিলাম,
তাঁহার সম্মুখে নিত্য আহ্লাদ করিতাম;
আমি তাঁহার ভূমণ্ডলে আহ্লাদ করিতাম,
মনুষ্য সন্তানগণে আমার আনন্দ হইত।[৭০]

অবশ্য প্রজ্ঞা স্বর্গীয় সত্তা ও ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রিস্টলি রচয়িতাদের বর্ণিত ঈশ্বরের 'প্রতাপে'র মতো, যা মানব জাতি সৃষ্টি ও মানুষের জীবনে অনুভব করতে পারে ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনার কথা বোঝায়: রচয়িতা প্রজ্ঞাকে (*হোখমাহ*) পথে পথে ঘুরে মানুষকে ইয়াহ্ওয়েহকে ভয় করার আহ্বান জানাচ্ছেন বলে দেখিয়েছেন। বিসিই দ্বিতীয় শতাব্দীতে জেরুজালেমের একজন ধর্মভীরু ইহুদি জেসাস বেন সিরা প্রজ্ঞার একই রকম চিত্র এঁকেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, স্বর্গীয় সভায় দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞা নিজ গুণ গাইছেন: তাঁর আগমন ঘটেছে স্বর্গীয় বাণী হিসাবে পরম প্রভুর (Most High) মুখ হতে যা দিয়ে ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টির সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি রয়েছে কিন্তু ইসরায়েলের জনগণের মাঝে আপন আবাস বেছে নিয়েছেন তিনি।[৭১]

ইয়াহ্ওয়েহ্র 'প্রতাপে'র মতো প্রজ্ঞার চরিত্রটি পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের একটা প্রতীক। ইহুদিরা ইয়াহ্ওয়েহ্র এমন এক উঁচু ধারণার বিকাশ ঘটাচ্ছিল যে মানব জীবনে তাঁর সরাসরি হস্তক্ষেপের কল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। 'P'-এর মতো তারা ঈশ্বরকে আমাদের জ্ঞান ও স্বর্গীয় সত্তার

---

* (বা) ইয়াহয়ে আপন পথের আদিস্বরূপ আমাকে গঠন করিয়াছিলেন।

(বা) [তাঁহার] আনন্দজনক।

AMARBOI.COM

অভিজ্ঞতার মাঝে পার্থক্য টানার পক্ষপাতি ছিল। আমরা যখন মানুষের খোঁজে ঈশ্বরকে ছেড়ে প্রজ্ঞার গোটা বিশ্ব ঘুরে বেড়ানোর কথা পড়ি তখন খুব সহজেই ইশতার, আনা ও আইসিসের মতো পৌত্তলিক দেবীদের কথা মনে পড়ে যায় যাঁরা নিষ্কৃতির দায়িত্ব নিয়ে স্বর্গীয় জগৎ হতে অবতরণ করেছিলেন। বিসিই ৫০ সালের দিকে প্রজ্ঞা-সাহিত্য আলেকজান্দ্রিয়ায় ধর্মীয় যুক্তির রূপ লাভ করেছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার এক ইহুদি *দ্য উইজডম অভ সলোমন*-এ ইহুদিদের চারপাশের আগ্রাসী হেলেনিক সংস্কৃতিকে প্রতিহত করে আপন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখানে ইহুদিদের গুরুত্বপূর্ণ বসতি ছিল—গ্রিক দর্শন নয় বরং ইয়াহ্ওয়েহ্ ভীতিই প্রকৃত প্রজ্ঞা গড়ে তুলেছে। গ্রিক ভাষায় লিখেছেন তিনি; প্রজ্ঞাকে (*সোফিয়া*) ব্যক্তিরূপ দিয়েছেন ও যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে একে ইহুদি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়:

> [সোফিয়া] ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রশ্বাস,
> সর্বশক্তিমানের প্রতাপের নিখাদ উৎসারণ;
> সুতরাং অপবিত্র কোনও কিছুই তাঁহার মাঝে প্রবেশাধিকার পাইবে না।
> তিনি অনন্ত আলোকের প্রতিফলন,
> ঈশ্বরের সক্রিয় ক্ষমতার ঝলমলে শশী
> তাহার মহত্ত্বের ভাবমূর্তি।[৭২]

AMARBOI.COM

এই অনুচ্ছেদটি জেসাসের মর্যাদা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে ক্রিশ্চানদের কাছেও দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইহুদি রচয়িতা অবশ্য সোফিয়াকে কেবল দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের এক বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখেছেন, যিনি নিজেকে মানবীয় উপলব্ধির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর-যেভাবে-আপনাকে-মানুষের-কাছে-প্রকাশ করেছেন, ঈশ্বর সম্পর্কিত মানবীয় উপলব্ধি, ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তার চেয়ে রহস্যজনকভাবে আলাদা; যিনি সব সময় আমাদের উপলব্ধিকে এড়িয়ে যাবেন।

*দ্য উইজডম অভ সলোমন*-এর রচয়িতা গ্রিক চিন্তা-ভাবনা ও ইহুদি ধর্মের মধ্যকার টানাপোড়েন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। আমরা দেখেছি, অ্যারিস্টটলের সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার ঈশ্বর ও বাইবেলের মানবীয় ব্যাপারে তীব্রভাবে জড়িত ঈশ্বরের মাঝে এক জটিল এবং সম্ভবত সমন্বয়ের অতীত পার্থক্য রয়েছে। গ্রিক ঈশ্বরকে মানুষের যুক্তির মাধ্যমে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল, কিন্তু বাইবেলের ঈশ্বর কেবল প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করেন। এক অতল গহ্বর ইয়াহ্ওয়েহ্কে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, কিন্তু গ্রিকরা বিশ্বাস করত যে, যুক্তির ক্ষমতা মানুষকে ঈশ্বরের

নিকটবর্তী করে; সুতরাং আপন প্রচেষ্টা দিয়েই তারা তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারবে। তা সত্ত্বেও যখনই একেশ্বরবাদীরা গ্রিক দর্শনের প্রেমে পড়েছে অনিবার্যভাবে তারা তাদের ঈশ্বরকে নিজেদের ঈশ্বরের সঙ্গে মেলানোর প্রয়াস পেয়েছে। এটা আমাদের কাহিনীর একটা প্রধান থিম হয়ে দাঁড়াবে। প্রথম যাঁরা এই প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁদের প্রথম জন হচ্ছেন প্রখ্যাত ইহুদি দার্শনিক ফিলো অভ আলেকজান্দ্রিয়া (৩০ বিসিই-৪৫ সিই)। ফিলো ছিলেন প্লেটোনিস্ট; আপন মেধা ও জ্ঞানে যুক্তিবাদী দার্শনিক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চমৎকার গ্রিক ভাষায় লিখতেন তিনি; সম্ভবত হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন না, তবু ধর্মপ্রাণ ইহুদি ও *মিতযভোতের* অনুসারী ছিলেন। নিজ ঈশ্বর ও গ্রিক ঈশ্বরের মাঝে বেমানান কিছু দেখেননি তিনি। তবে অবশ্যই একথা বলা প্রয়োজন যে, ফিলোর ঈশ্বরকে ইয়াহ্ওয়েহ্ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হয়। যেমন, ফিলো যেন বাইবেলের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন, এগুলোকে তিনি বিস্তারিত রূপক বর্ণনায় পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। স্মরণযোগ্য, অ্যারিস্টটল ইতিহাসকে অদার্শনিকসুলভ বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর ঈশ্বরের কোনও মানবীয় গুণ নেই: যেমন, তিনি 'ক্রুদ্ধ' হয়েছেন বলাটা খুবই ভুল হবে। আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে যেটুকু জানতে পারি সেটা হলো তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা মাত্র। তবু ধার্মিক ইহুদি হিসাবে ফিলো বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর পয়গম্বরদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল?

সম্পূর্ণ উপলব্ধির অতীত ঈশ্বরের মূল সত্তা (*আউসিয়া*) এবং পৃথিবীতে তাঁর কর্মকাণ্ডকে ফিলো তাঁর 'ক্ষমতা' (*dynameis*) বা 'শক্তি' (*energeia*) বলেছেন, এ দুটোর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য টেনে এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন তিনি। মূলত এটা 'P' এবং প্রজ্ঞা-রচয়িতাদের সমাধানের অনুরূপ ছিল। ঈশ্বর স্বয়ং কেমন কোনওদিনই আমরা তা জানতে পারব না। ফিলো তাঁকে দিয়ে মোজেসকে বলিয়েছেন: 'আমাকে বুঝতে পারাটা মানুষের প্রকৃতি, এমনকি গোটা আকাশ এবং মহাবিশ্বের সাধের অতীত।'[৭৩] আমাদের সীমিত উপলব্ধিতে নিজেকে অভিযোজিত করার জন্যে ঈশ্বর তাঁর 'ক্ষমতা'র মাধ্যমে যোগাযোগ করেন যার সঙ্গে প্লেটোর স্বর্গীয় আকারের মিল আছে বলে মনে হয় (যদিও ফিলো সব সময় এ ব্যাপারে স্থির নন)। এগুলো মানুষের বোধগম্য উচ্চস্তরের বাস্তবতা। এগুলো ঈশ্বরের কাছ থেকে উৎসারিত বলে মনে করেছেন ফিলো, যেমন প্লেটো ও অ্যারিস্টটল আদি কারণ হতে মহাবিশ্বকে উৎসারিত হতে দেখেছিলেন। এসব ক্ষমতার দুটি বিশেষভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিলো এদের নাম দিয়েছেন রাজকীয় ক্ষমতা (Kingly Power), যা মহাবিশ্বের শৃঙ্খলার মাঝে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটায়; এবং সৃজনী ক্ষমতা, যার

AMARBOI.COM

মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের ওপর বর্ষিত আশীর্বাদের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেন। এসব ক্ষমতার কোনওটাকে স্বর্গীয় সত্তার *আউসিয়ার* সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না–যেটা দুর্ভেদ্য রহস্যের আড়ালে ঢাকা থাকে। এগুলো কেবল আমাদের বোধের অতীত এক সত্তার কিঞ্চিৎ আভাস পেতে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে ফিলো ঈশ্বরের অপরিহার্য সত্তাকে (*আউসিয়া*) রাজকীয় ও সৃজনী ক্ষমতায় পরিবেষ্টিত থাকার কথা বলেছেন, অনেকটা ট্রিনিটির মতো। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি মামরিতে দুজন দেবদূতসহ ইয়াহ্ওয়েহ্‌র অ্যাব্রাহামের কাছে হাজির হওয়ার কাহিনীর ব্যাখ্যা করার সময় যুক্তি দেখান: ঈশ্বরের *আউসিয়ার* রূপক উপস্থাপন দুই উচ্চতম ক্ষমতাসহ তিনি স্বয়ং।[৭৪]

'J' হয়তো এ ধারণায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন। প্রকৃতপক্ষেই, ইহুদিরা ঈশ্বর সম্পর্কে ফিলোর ধারণাকে অনেকটা অসত্য হিসাবে দেখেছে। ক্রিশ্চানরা অবশ্য তাঁকে দারুণ রকম উপকারী হিসাবে দেখবে এবং আমরা দেখব, গ্রিকরা ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় 'সত্তা' (essence) এবং যে 'শক্তি' (energies) তাঁকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে, এ দুটোর পার্থক্য লুফে নিয়েছিল। তারা তাঁর স্বর্গীয় লোগোসের তত্ত্বেও প্রভাবিত হবে। প্রজ্ঞা-রচয়িতদের মতো ফিলো কল্পনা করেছেন যে ঈশ্বর সৃষ্টির একটা মহাপরিকল্পনা (*লোগোস*) প্রণয়ন করেছিলেন; যার সঙ্গে প্লেটোর আকৃতির জগতের মিল রয়েছে। এইসব আকৃতি এরপর ভৌত বিশ্বে স্থাপন করা হয়। ফিলো কিন্তু সবসময় অটল ছিলেন না। কখনও তিনি বলেছেন লোগোস অন্যতম একটা শক্তি, অন্য সময় মনে হয়েছে তিনি একে শক্তির চেয়েও বড় কিছু, মানুষের পক্ষে অর্জনযোগ্য ঈশ্বর সম্পর্কিত সর্বোচ্চ ধারণা মনে করছেন। অবশ্য, আমরা যখন লোগোসের কথা ভাবি তখন ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও ইতিবাচক জ্ঞান পাই না: আমাদেরকে বাস্তব যুক্তির নাগালের বাইরে এক অনুভবভিত্তিক উপলব্ধির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যা 'চিন্তার উপায়ের চেয়ে উন্নত কিছু চিন্তা করা যেতে পারে এমন যেকোনো কিছুর চেয়ে মূল্যবান।'[৭৫] এটা প্লেটোর ধ্যান *(থিয়োরিয়া)*-র মতো কিছু, একই ধরনের একটা ব্যাপার। ফিলো জোর দিয়ে বলেছেন, আমরা কখনওই ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তার কাছাকাছি যেতে পারব না: ঈশ্বর মানব মনকে যে পরমানন্দ স্বীকৃতিতে ছাপিয়ে যান তার মাঝেই সর্বোচ্চ সত্য অনুধাবন করতে পারি আমরা।

যেমন শোনাচ্ছে, ততটা নিরস নয় ব্যাপারটা: অজানার উদ্দেশে এক আবেগময় আনন্দ যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন ফিলো, যা তাঁকে মুক্তি ও সৃজনশীল ক্ষমতা এনে দিয়েছে। প্লেটোর মতো আত্মাকে তিনি ভৌত জগতে নির্বাসিত অবস্থায় থাকার মতো দেখেছেন। একে অবশ্যই আবেগ, অনুভূতি এমনকি ভাষা ত্যাগ করে, এর প্রকৃত আবাস ঈশ্বরের দিকে এগোতে হবে, কারণ এসব

AMARBOI.COM

আমাদের অপূর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে রাখে। শেষ পর্যন্ত এটা এমন এক আনন্দের পর্যায়ে উন্নীত হবে যা একে অহমের আতঙ্কময় সীমাবদ্ধতা থেকে এক বৃহত্তর পূর্ণ সত্তায় তুলে নেবে। আমরা দেখেছি, ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা প্রায়শঃই কল্পনা-নির্ভর অনুশীলন ছিল। পয়গম্বরগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা নিয়ে ভেবেছেন, মনে করেছেন একে ঈশ্বর নামে আখ্যায়িত সত্তার প্রতি আরোপ করা যেতে পারে। ফিলো দেখাচ্ছেন: ধর্মীয় ভাবনা অনেকাংশে সৃজনশীলতার অন্যান্য রূপের মতোই। কখনও কখনও, বলেছেন তিনি, নিজের গ্রন্থসমূহ নিয়ে বিষণ্ন মনে সংগ্রাম করে কোনও পথ খুঁজে পাননি, আবার কখনও মনে হয়েছে তাঁর ওপর স্বর্গীয় প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে:

> আমি...সহসা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলাম, ধারণাগুলো তুষারপাতের মতো নেমে আসছে, যার ফলে স্বর্গীয় প্রভাবে আমি করিব্যান্টিক (Corybrantic) উন্মাদনায় ভরে উঠলাম এবং স্থান-কাল-পাত্র, বর্তমান, নিজেকে কী বলা হয়েছে, কী লেখা হয়েছে, সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে গেলাম। কেননা আমি অভিব্যক্তি, ধারণা, জীবনের এক আনন্দ, বস্তুর স্পষ্ট স্বচ্ছতা অতিক্রম করে যাওয়া তীক্ষ্ণ দর্শন, যা সবচেয়ে স্পষ্ট উপস্থাপনের ফলে চোখের সামনে উপস্থিত হতে পারে, তা অর্জন করলাম।[৭৬]

AMARBOI.COM

অচিরেই গ্রিক জগতের সঙ্গে এমন একটা সমন্বয় অর্জন দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। ফিলোর মৃত্যুর বছর আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হত্যালীলা পরিচালিত হয় এবং ইহুদিদের বিদ্রোহের ব্যাপক আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। বিসিই প্রথম শতকে রোমানরা যখন উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তখন তারা নিজেরাই গ্রিক সংস্কৃতির কাছে পরাস্ত হয়ে পূর্বসূরিদের উপাস্যদের গ্রিক দেবনিচয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রিক দর্শনকে আপন করে নেয়। তারা অবশ্য ইহুদিদের প্রতি গ্রিকদের বৈরিতার উত্তরাধিকার লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, গ্রিকদের চেয়ে ইহুদিদেরই বেশি পছন্দ করত তারা, গ্রিক নগরসমূহে ওদের প্রয়োজনীয় মিত্র হিসাবে বিবেচনা করত যেখানে রোমের প্রতি বৈরিতার ক্ষীণ অস্তিত্ব ছিল। ইহুদিদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল: ওদের ধর্ম সুপ্রাচীন ঐতিহ্য হিসাবে পরিচিত ছিল, একে সম্মান জানানো হয়েছে। ইহুদি ও রোমানদের ভেতর সম্পর্ক এমনকি প্যালেস্তাইনেও চমৎকার ছিল, যেখানে বিদেশী শাসন সহজে মেনে নেওয়া হতো না। বিসিই প্রথম শতাব্দী নাগাদ রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গোটা সাম্রাজ্যের এক দশমাংশ ছিল ইহুদি: ফিলোর আলেকজান্দ্রিয়ায় জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ ছিল ইহুদি।

রোমান সাম্রাজ্যের জনগণ এক নতুন ধর্মীয় সমাধানের অনুসন্ধানে ছিল: একেশ্বরবাদী ধ্যান-ধারণাসমূহ প্রচারণা পাচ্ছিল, স্থানীয় দেবতাদের আরও বৃহৎ, সর্বব্যাপী এক ঐশ্বরিক সত্তার প্রকাশ হিসাবে দেখা হচ্ছিল। রোমানরা ইহুদিবাদের উন্নত নৈতিক চরিত্রে আকৃষ্ট হয়েছে। বোধগম্য কারণে যারা খৎনা করা ও গোটা তোরাহ্ অনুসরণ করার বেলায় অনিচ্ছুক ছিল তারা প্রায়শঃই 'গডফিয়ারার' (Godfearer) নামে পরিচিত সিনাগগের সম্মান সূচক সদস্যপদ গ্রহণ করত, ওদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ছিল: এমনকি এমনও মত প্রকাশ করা হয়েছে যে ফ্ল্যাভিয় সম্রাটদের একজন সম্ভবত ইহুদিবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যেমন কন্সতন্তাইন পরে ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করবেন। অবশ্য, প্যালেস্তাইনে রাজনৈতিক উগ্রপন্থীদের একটা দল তীব্রভাবে রোমান শাসনের বিরোধিতা করে। সিই ৬৬ সালে তারা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অবিশ্বাস্যভাবে রোমান সেনাবাহিনীকে চার বছর ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহ ডায়াসপোরার ইহুদিদের মাঝে ছড়িয়ে যাবার আশঙ্কা করে কর্তৃপক্ষ, ফলে নিষ্ঠুরভাবে তা দমন করে। সিই ৭০ সালে নতুন সম্রাট ভেসপাসিয়ান-এর সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত জেরুজালেম অধিকার করে, মন্দির পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে নগরীটিকে রোমান নগরে রূপান্তরিত করে এর নাম রাখে আইলিয়া কাপিলানা। আরও একবার দেশান্তরী হতে বাধ্য হয় ইহুদিরা।

নয়া ইহুদিবাদের মূল প্রেরণা মন্দির ধ্বংস বিরাট দুঃখের কারণ ছিল; কিন্তু পরবর্তী ঘটনার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে মনে হয় ডায়াসপোরার হেলেনাইজড ইহুদিদের তুলনায় প্রায়শঃ অনেক বেশি রক্ষণশীল প্যালেস্তাইনের ইহুদিরা, সম্ভবত আগে থেকেই এই বিপর্যয়ের জন্যে তৈরি ছিল। পবিত্র ভূমিতে অসংখ্য গোত্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল যারা বিভিন্নভাবে জেরুজালেম মন্দির থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। এসিন ও কুমরান গোষ্ঠীর বিশ্বাস ছিল যে মন্দির অর্থলিপ্সু ও দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে; আলাদা কমিউনিটিতে বাস শুরু করেছিল তারা, মৃত সাগর তীরবর্তী মঠ ধরনের কমিউনিটির মতো একটা নতুন মন্দির গড়ে তুলছে বলে বিশ্বাস ছিল তাদের, যা হাতে নির্মিত নয়। ওদের মন্দির হবে আত্মার; প্রাচীন রীতি অনুযায়ী পশু উৎসর্গ করার বদলে নিজেদের পরিশুদ্ধ করত তারা এবং দীক্ষাগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান ও দলীয় ভোজের মাধ্যমে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করত। পাথরের মন্দিরে নয়, ঈশ্বরের আবাস হবে প্রেমময় ভ্রাতৃসংঘে।

প্যালেস্তাইনের সকল ইহুদির মাঝে ফারিজিরা ছিল সবচেয়ে প্রগতিশীল। এরা এসিনদের সমাধানকে বাড়াবাড়িরকম অভিজাত শ্রেণীর মনে করেছিল। নিউ টেস্টামেন্টে ফারিজিদের কপটাচারী ও চরম ভণ্ড হিসেবে বর্ণনা করা

AMARBOI.COM

হয়েছে। এর জন্যে দায়ী প্রথম শতকের ধর্মীয় যুক্তিতর্কের বিকৃতি। ফারিজিরা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ইহুদি ছিল। তারা বিশ্বাস করত গোটা ইসরায়েল পুরোহিতদের এক পবিত্র জাতি হিসাবে অ্যাখ্যায়িত। মন্দিরের মতো তুচ্ছ ঘরেও ঈশ্বর অবস্থান করতে পারেন। এরই প্রেক্ষিতে তারা রাজকীয় বা স্বীকৃত পুরোহিত গোত্রের মতো জীবন যাপন করত এবং নিজস্ব বাড়িতে পবিত্রতা অর্জনের সেইসব বিধিবিধান পালন করত সেগুলো কেবল মন্দিরের জন্যে প্রযোজ্য ছিল। আচরিক অবস্থায় খাদ্যগ্রহণের ওপর জোর দিত তারা, কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক ইহুদির খাবার টেবিল আসলে মন্দিরে ঈশ্বরের বেদীর মতো। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতির একটা অনুভূতি গড়ে তুলেছিল ওরা। পুরোহিত শ্রেণী ও জাঁকাল আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ইহুদিরা এখন ঈশ্বরের কাছে সরাসরি প্রার্থনা জানাতে পারে। প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় আচরণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত করতে পারে; তোরাহ্ অনুযায়ী দান হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ *মিতয্‌ভাহ* (*mitzvah*): দুজন বা তিনজন ইহুদি সম্মিলিতভাবে যখন তোরাহ্ পাঠ করে, ঈশ্বর তখন তাদের মাঝে উপস্থিত থাকেন। শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোয় দুটো আলাদা মতবাদ জন্ম নিয়েছিল। একটির নেতৃত্বে ছিলেন শাম্মাই দ্য এল্ডার, এটা ছিল বেশি উগ্র। অন্যটির নেতৃত্বে ছিলেন মহান ব্যাবাই হিল্লেল দ্য এল্ডার। ফারিজিদের ইতিহাসে এই মতবাদই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। একটা গল্প চালু আছে যে, একদিন জনৈক পৌত্তলিক এসে হিল্লেলকে জানায় তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় প্রভু গোটা তোরাহ্ আবৃত্তি করতে পারলে সে ইহুদিবাদে দীক্ষা নেবে। হিল্লেল জবাব দিয়েছেন: 'নিজে যেটা করতে পারবে না সেটা অন্যকে করতে বলো না। এটা গোটা তোরাহ্; যাও এবং শিখে নাও।'[৭৭]

দুর্যোগের বছর ৭০ সাল নাগাদ প্যালেস্তাইনি ইহুদিবাদে ফারিজিরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও গুরুত্বপূর্ণ গোত্রে পরিণত হয়; ইতিমধ্যেই ওরা দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্যে মন্দিরের প্রয়োজন নেই ওদের, এই বিখ্যাত গল্পটি যেমন দেখায়:

> একবার ব্যাবাই ইয়োহান্নান বেন যাক্কাই জেরুজালেম থেকে আসছিলেন, র‍্যাবাই জোশুয়া তাঁকে অনুসরণ করেন এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান।
>
> 'আমাদের দুর্দশা!' বললেন ব্যাবাই জোশুয়া, 'এই যে, যেখানে ইসরায়েলিদের অসাম্যতার প্রায়শ্চিত হতো, সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে।'
>
> 'বৎস আমার,' বললেন ব্যাবাই ইয়োহান্নান, 'দুঃখ করো না। এটার মতোই কার্যকর প্রায়শ্চিত্তের স্থান আমাদের কাছে। এবং সেটা কী? এটা

হচ্ছে প্রেমময় দয়ার প্রকাশ, যেমন কথায় আছে: "কারণ আমি ক্ষমা চাই, উৎসর্গ নয়"।'[৭৮]

কথিত আছে, জেরুজালেম অধিকারের পর র‍্যাবাই ইয়োহান্নানকে একটা কফিনে করে জ্বলন্ত নগরী থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ইহুদি বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি, রাষ্ট্র ছাড়াই ইহুদিরা ভালো থাকবে বলে ধারণা ছিল তাঁর। রোমানরা ইয়োহান্নানকে জেরুজালেমের পশ্চিমে জবনেহতে স্ব-শাসিত একটা ফারিজিয় সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছিল। প্যালেস্তাইন ও বাবিলোনিয়ায়ও একই ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয় যারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখত। এই সমাজগুলো *তান্নাইম* নামে পরিচিত পণ্ডিতদের জন্ম দিয়েছিল, যাদের মধ্যে খোদ র‍্যাবাই ইয়োহান্নান স্বয়ং, র‍্যাবাই আকিভা দ্য মিস্টিক এবং র‍্যাবাই ইশমায়েল অন্তর্ভুক্ত ছিলেন: এঁরা *মিশনাহ* সংকলিত করেন: কথ্য আইনের লিখিত রূপ, মোজেসের আইনকে যা হালনাগাদ করেছে। এরপর *অ্যামোরাইম* নামে পরিচিত নতুন আরেক শ্রেণীর পণ্ডিত *মিশনাহ্*র ব্যাখ্যা দান শুরু করেন এবং সম্মিলিতভাবে *তালমুদ* নাম পরিচিত প্রবন্ধগুচ্ছ রচনা করেন। আসলে দুটো *তালমুদ* সংকলিত হয়েছিল; চতুর্থ শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমাপ্ত *জেরুজালেম তালমুদ* এবং অধিকতর প্রভাবশালী হিসাবে বিবেচিত *বাবিলোনিয় তালমুদ*-এর সংকলন পঞ্চম শতকের শেষের দিকে শেষ হয়। প্রত্যেক প্রজন্মের পণ্ডিতগণ *তালমুদ* এবং এর ওপর প্রদত্ত পূর্বসুরিদের ব্যাখ্যার ওপর নিজস্ব মতামত দান শুরু করায় এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রয়ে যায়। বহিরাগতরা যেমনটি ভাবতে চান, এই প্রথাসিদ্ধ ধ্যান উপলব্ধি নিরস বিষয় ছিল না। এটা ছিল ঈশ্বরের বাণী নিয়েই অনন্ত ধ্যান, নতুন পবিত্র মন্দির; পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার প্রত্যেকটা এক নতুন মন্দিরের দেয়াল ও দরবারের প্রতীক, আপন জাতির মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্থাপন করছে।

ইয়াহ্ওয়েহ্ বরাবরই এক দুর্জ্ঞেয় উপাস্য ছিলেন, যিনি মহাশূন্য থেকে অদৃশ্য থেকে মানবজাতিকে পরিচালনা করছেন। র‍্যাবাইগণ তাঁকে মানুষের মাঝে ও জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে গভীরভাবে উপস্থিত করে তোলেন। মন্দির হাতছাড়া ও ফের নির্বাসিত হওয়ার যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার পর নিজেদের মাঝে একজন ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল ইহুদিদের। র‍্যাবাইগণ ঈশ্বর সংক্রান্ত কোনও আনুষ্ঠানিক মতবাদ গড়ে তোলেননি। পরিবর্তে প্রায় দৃশ্যমান সত্তার মতো তাঁকে অনুভব করেছেন। ওঁদের আধ্যাত্মিকতাকে 'স্বাভাবিক অতিন্দ্রীয়বাদ'[৭৯] হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তালমুদের একেবারে শুরুর দিকের অনুচ্ছেদগুলোয় ঈশ্বরকে রহস্যময় বাস্তব সত্তা হিসাবে অনুভব করা হয়েছে। র‍্যাবাইগণ পবিত্র আত্মা (Holy Spirit)-র কথা বলেছেন যিনি সৃষ্টি এবং স্যাঙ্কচুয়্যারির নির্মাণ নিয়ে ভাবিত ছিলেন; প্রবল হাওয়া বা প্রচণ্ড



AMARBOI.COM

অগ্নিশিখায় নিজ উপস্থিতি অনুভব করিয়েছিলেন। অন্যরা ঘণ্টাধ্বনি বা তীক্ষ্ণ করাঘাতের শব্দের মতো শুনতে পেয়েছেন একে। উদাহরণস্বরূপ, র‍্যাবাই ইয়োহান্নান একদিন ইযেকিয়েলের রথ দর্শনের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় আকাশ থেকে আগুন নেমে এল এবং কাছেই দেবদূতদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল: এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিল যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে এক বিশেষ মিশন পেয়েছেন তিনি।[৮০]

তাঁদের সত্তার অনুভূতি এত প্রবল ছিল যে প্রচলিত যে কোনও বাস্তব মতবাদ বেমানান মনে হতো। র‍্যাবাইগণ বারবার মত প্রকাশ করেছেন যে সিনাই পর্বতের পাদদেশে অপেক্ষমান প্রত্যেক ইসরায়েলি ভিন্ন ভিন্নভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছিল। ব্যাপারটি ছিল এরকম, ঈশ্বর 'প্রত্যেকের উপলব্ধির মাত্রা অনুযায়ী'[৮১] ওদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। একজন র‍্যাবাই যেমন বলেছেন: 'ঈশ্বর গুরুভার হয়ে মানুষের কাছে আসেন না বরং তাঁকে গ্রহণ করার মানুষটির ক্ষমতার সঙ্গে মানানসইভাবেই উপস্থিত হন।'[৮২] র‍্যাবাইদের এই গুরত্বপূর্ণ দর্শনের মানে হচ্ছে ঈশ্বরকে কোনও সূত্র দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয় বা সবার কাছে তিনি একরকম নন। তিনি অত্যাবশ্যাকীয়ভাবে মানসিক উপলব্ধি। প্রত্যেক ব্যক্তি যার যার নিজস্ব বিশেষ মেজাজ-মর্জির চাহিদার সমাধান হিসাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে 'ঈশ্বরে'র সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ করবে। র‍্যাবাই জোর দিয়ে বলছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি পয়গম্বর ভিন্ন ভিন্নভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। আমরা দেখব, অন্য একেশ্বরবাদীরাও পুরোপুরি অনুরূপ ধারণা গড়ে তুলবে। এখন পর্যন্ত ইহুদিদের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধর্মতাত্ত্বিক ধারণাসমূহ ব্যক্তিগত ব্যাপার, প্রশাসন এগুলো চাপিয়ে দেয় না।

AMARBOI.COM

যে কোনও প্রথাবদ্ধ মতবাদ ঈশ্বরের আবশ্যকীয় রহস্যময়তাকে সীমিত করে দেবে। র‍্যাবাই যুক্তি দেখিয়েছেন, ঈশ্বর সম্পূর্ণ বোধের অতীত। এমনকি মোজেসও ঈশ্বরের রহস্য ভেদ করতে পারেননি: দীর্ঘ গবেষণার পর রাজা ডেভিড স্বীকার  গেছেন যে, তাঁকে বোঝার চেষ্টা বৃথা, কারণ তিনি মানুষের বুদ্ধির নাগালের বাইরে।[৮৩] ইহুদিরা এমনকি ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করার অনুমতি পায়নি, এটা তাঁকে প্রকাশ করার যে কোনও প্রয়াস যে অপর্যাপ্ত হতে বাধ্য তারই স্মারক: YHWH এভাবে ঈশ্বরের নাম লেখা হয়েছিল, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময় নামটি উচ্চারণ করা হয় না। প্রকৃতিতে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি আমরা; কিন্তু র‍্যাবাই হুনা যেমন বলেছেন, এটা কেবল গোটা সত্তা সম্পর্কে আমাদের খুবই সামান্য ধারণা দেয়: 'বজ্র, ঘূর্ণিঝড়, তুফান, বিশ্বজগতের নিয়ম শৃঙ্খলার অর্থ এবং নিজ

প্রকৃতি মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়; তাহলে কী করে সে সকল রাজার রাজার কার্যকলাপ বোঝার দাবি করে?'[৮৪] ঈশ্বরের ধারণার মোদ্দা কথা হচ্ছে রহস্যময়তা এবং জীবনের বিস্ময় সম্পর্কে অনুভূতি উৎসাহিত করা নিখুঁত সমাধানের সন্ধান নয়। র‍্যাবাইগণ এমনকি প্রার্থনার সময় ঘনঘন ঈশ্বরের প্রশংসা করার ব্যাপারে ইহুদিদের সতর্ক করে দিয়েছেন, কারণ তাদের ভাষা ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।[৮৫]

এই দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্বোধ্য সত্তা কীভাবে বিশ্ব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছিলেন? র‍্যাবাইগণ একটি প্যারাডক্সের মাধ্যমে এই সংক্রান্ত মত প্রকাশ করেছেন: 'ঈশ্বর হচ্ছেন পৃথিবীর স্থান, কিন্তু পৃথিবী ঈশ্বরের স্থান নয়।'[৮৬] ঈশ্বর পৃথিবীকে ঘিরে আছেন, আবৃত্ত করে রেখেছেন, কিন্তু সাধারণ সৃষ্টির মতো তিনি *এখানে* বাস করেন নাই। আরেকটি প্রিয় ইমেজে তাঁরা বলছেন যে, আত্মা যেমন দেহকে ভরিয়ে রাখে ঈশ্বর তেমনি পৃথিবীকে ভরে রেখেছেন: আত্মা দেহে থেকেও দেহাতীত। আবার, তাঁরা এও বলেছেন যে, ঈশ্বর ঘোড়ার পিঠে একজন সওয়ারির মতো: যখন তিনি ঘোড়ার দিকে থাকেন, আরোহীকে ঘোড়ার ওপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু তিনি পশুটির চেয়ে উন্নত এবং লাগাম থাকে তাঁর হাতে। এগুলো ইমেজ মাত্র এবং অনিবার্যভাবে অপূর্ণাঙ্গ; এগুলো ছিল এক বিশাল, সংজ্ঞাতীত 'কিছু'র কল্পনাভিত্তিক বর্ণনা, যার মাঝে আমরা বেঁচে থাকি, চলাফেরা করি এবং আমাদের সত্তাকে পাই। তাঁরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলবার সময় বাইবেল-লেখকদের মতো, মানুষের প্রবেশাতীত স্বর্গীয় রহস্যের সঙ্গে তিনি তাঁর যেসব চিহ্ন দেখার অনুমতি দিয়ে থাকেন তার মাঝে সযত্নে পার্থক্য টানার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা YHWH এবং পবিত্র আত্মার 'প্রতাপ' (কাভোদ) ইমেজ পছন্দ করেছেন, এগুলো আমাদের অনুভূতির ঈশ্বরের সঙ্গে যে স্বর্গীয় সত্তার প্রকৃত রূপ মেলে না তারই স্মারক।

AMARBOI.COM

তাদের অন্যতম প্রিয় ঈশ্বর সমার্থক শব্দ ছিল হিব্রু *শাকান* হতে গৃহীত *শেকিনাহ*, যার অর্থ কারও তাঁবুতে বাস করা বা আবৃত্ত করা; যেহেতু এখন আর মন্দিরের অস্তিত্ব নেই, যেই ঈশ্বর ইসরায়েলিদের পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁর ইমেজ ঈশ্বরের নৈকট্যের কথা তুলে ধরেছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, পৃথিবীতে তাঁর জাতির সঙ্গে বাসকারী *শেকিনাহ* এখনও টেম্পল মাউন্টে বাস করছেন, যদিও মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্য র‍্যাবাইদের যুক্তি ছিল, মন্দির ধ্বংস হওয়ায় *শেকিনাহ* জেরুজালেম থেকে মুক্ত হয়ে বাকি বিশ্বে বাস করার সুযোগ পেয়েছেন।[৮৭] স্বর্গীয় 'প্রতাপ' বা পবিত্র আত্মার মতো শেকিনাহ্‌কে আলাদা স্বর্গীয় সত্তা হিসাবে চিন্তা করা হয়নি বরং পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপস্থিতি মনে করা হয়েছে।

র‍্যাবাইগণ স্বজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন এবং লক্ষ করেছেন যে এটা সবসময় ওদের সঙ্গে ছিল:

> এসো এবং দেখ ইসরায়েলিরা ঈশ্বরের কত প্রিয়, কারণ ওরা যেখানেই গেছে শেকিনাহ্ ওদের অনুসরণ করেছে, যেমন বলা হয়েছে, 'ওরা যখন মিশরে ছিল আমি কি তখন ওদের পূর্বপুরুষদের ঘরে নিজেকে সহজে প্রকাশ করেছিলাম?' বাবিলনে শেকিনাহ্ ওদের সঙ্গে ছিল, যেমন বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্বার্থে আমাকে বাবিলনে পাঠানো হয়েছিল।' এবং ভবিষ্যতে যখন ইসরায়েল নিষ্কৃতি লাভ করবে, শেকিনাহ্ ওদের সঙ্গে থাকবে, যেমন বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের বন্দিত্ব ঘোচাবেন।' অর্থাৎ ঈশ্বর বন্দিত্বের সাথে ফিরে আসবেন।[৮৮]

ইসরায়েল এবং ঈশ্বরের সম্পর্ক এতো নিবিড় ছিল যে অতীতে যখন তিনি ইসরায়েলকে উদ্ধার করেছেন, ইসরায়েলিরা ঈশ্বরকে বলেছে: 'আপনি আপনাকেই মুক্তি দিয়েছেন।'[৮৯] নিজস্ব ইহুদি ঢঙে র‍্যাবাইগণ এই ধারণা গড়ে তুলছিলেন যে, ঈশ্বরের অনুভূতি সত্তার (রুয়াখ) সঙ্গে জড়িত, হিন্দুরা যাকে আত্মা বলেছে। নির্বাসিতরা যেখানেই যাক না সেখানেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভূতি বা ধারণা গড়ে তুলতে শেকিনাহ্‌র ইমেজ সাহায্য করেছিল। র‍্যাবাইগণ ডায়াসপোরার এক সিনাগগ থেকে অন্যটিতে শেকিনাহ্‌র ঘুরে বেড়ানোর কথা বলেছেন, অন্যরা বলেছেন এটা সিনাগগের দরজায় দাঁড়িয়ে ইহুদিদের হাউস অভ স্টাডিজের দিকে প্রতি পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াকে আশীর্বাদ জানায়; ইহুদিরা সিনাগগে সম্মিলিতভাবে *শেমা* আবৃত্তি করার সময়ও শেকিনাহ্ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।[৯০] পূর্বকালের ক্রিশ্চানদের মতো ইসরায়েলিরা তাদের র‍্যাবাইদের দ্বারা নিজেদেরকে 'এক দেহ এবং এক আত্মা'[৯১] বিশিষ্ট একটি সমাজ হিসেবে দেখতে উৎসাহিত হয়েছে। এই সমাজই নতুন মন্দির, অন্তস্থ ঈশ্বরের আবাস: এজন্যেই যখন তারা সিনাগগে 'ভক্তি সহকারে নিখুঁত সমস্বরে *শেমা* আবৃত্তি করে এক সুরে এক মনে আর এক কণ্ঠে' তখন ঈশ্বর তাদের মাঝে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু সমাজের যে কোনওরকম অসামঞ্জস্য তিনি ঘৃণা করেন এবং স্বর্গে ফিরে যান, দেবদূতরা যেখানে 'এক স্বরে এবং এক সুরে' স্বর্গীয় প্রশংসার গান[৯২] গাইতে থাকে। ঈশ্বর এবং ইসরায়েলের উচ্চ সম্মিলন তখনই সম্ভব হবে যখন ইসরায়েলিদের সঙ্গে ইসরায়েলিদের নিম্ন সম্মিলন সম্পন্ন হবে: র‍্যাবাইগণ ক্রমাগত তাদের বলে গেছেন, ইহুদিদের কোনও দল যখন একসঙ্গে তোরাহ্ পাঠ করে, শেকিনাহ্ তাদের মাঝে বসে থাকে।[৯৩]

WWW.AMARBOI.COM

নির্বাসিত অবস্থায় ইহুদিরা চারপাশের বিশ্বের কঠোরতা অনুভব করেছে; এই ধরনের উপস্থিতির বোধ তাদের সদাশয় ঈশ্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার অনুভূতি লাভে সাহায্য করেছে। তারা যখন তাদের ফিলেক্টরিগুলো (Plyaetoris: *tfillin*) হাত ও মাথায় জড়াত, আচরিক ঝালড় পরত এবং *শেমার বাণী* লেখা *mezuzah* দরজায় ঝোলাত ডিউটেরোনমি অনুযায়ী ঐসব অস্পষ্ট ও অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যার প্রয়াস না পেতে বলা হয়েছে তাদের, তা এর মূল্য সীমীত করে দেবে; বরং তাদের উচিত হবে এসব *mitzvot*-এর অনুসরণ যেন ঈশ্বরের পরিব্যাপী ভালোবাসা সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে পারে সে অবকাশ দেওয়া; 'ইসরায়েল প্রিয়ভাজন! *mitzvot* দিয়ে বাইবেল তাঁকে ঘিরে রেখেছে: মাথা আর বাহুতে *tfillin*, দরজায় একটা *mizuzah*, পোশাকে *tzitzit*,[৯৪] এগুলো যেন কোনও রাজার তার রানিকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্যে উপহার দেওয়া রত্নের মতো। ব্যাপারটা সহজ ছিল না। তালমুদ দেখায় যে, কেউ কেউ চিন্তা করেছিল এমন অন্ধকার পৃথিবীতে ঈশ্বর খুব একটা আসেন-যান কিনা।[৯৫] যারা জেরুজালেম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল কেবল তাদের মাঝেই নয়, বরং বরাবর ডায়াসপোরায় বাসকারী ইহুদিদের মাঝেও র‍্যাবাইদের আধ্যাত্মিকতা ইহুদিদের একটা মান স্থাপন করেছিল। সেটা একটা নিখুঁত তত্ত্বীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে নয়: আইন-এর বহু অনুশীলনের যৌক্তিক কোনও অর্থ নেই, র‍্যাবাইদের ধর্ম গৃহীত হয়েছিল এর কার্যকারিতার জন্যে। র‍্যাবাইদের দর্শন তাদের স্বজাতির হতাশায় কবলিত হওয়া ঠেকিয়েছিল।

অবশ্য এ ধরনের আধ্যাত্মিকতা ছিল কেবল পুরুষের জন্যে–কেননা প্রয়োজন না থাকায়, নারীদের র‍্যাবাই হওয়া, তোরাহ্ পাঠ বা সিনাগগে যাবার অনুমতি ছিল না। সেসময়ের অধিকাংশ মতাদর্শের মতো ঈশ্বরের ধর্ম পুরুষতান্ত্রিক রূপ নিচ্ছিল। নারীদের দায়িত্ব ছিল বাড়িতে আচরিক পবিত্রতা বজায় রাখা। ইহুদিরা বহু আগেই বিভিন্ন উপকরণ আলাদা করার মাধ্যমে সৃষ্টিকে পবিত্র করেছিল। এই চেতনার আলোকে নারীদের পুরুষ সমাজ থেকে একটা ভিন্ন স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেমন রান্নাঘরে দুধ আর মাংস আলাদা তাকে রাখতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এর অর্থ ছিল ওদের নিম্নস্তরে ঠেলে দেওয়া। যদিও র‍্যাবাইরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে নারীরা ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট, কিন্তু পুরুষদের সকালের প্রার্থনায় তাদের অ-ইহুদি (জেন্টাইল) দাস বা নারী হিসাবে সৃষ্টি না করার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তবু বিয়েকে পবিত্র দায়িত্ব এবং পারিবারিক জীবনকে পবিত্র বিবেচনা করা হতো। র‍্যাবাইগণ বিধিবিধানে এর পবিত্রতার প্রতি জোর দিয়েছেন যাকে প্রায়শঃই ভুল বোঝা হয়েছে।

AMARBOI.COM

ঋতুস্রাবের সময় যৌন মিলনে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ এই নয় নারীকে নোংরা বা অস্পৃশ্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। পুরুষরা যেন স্ত্রী-সঙ্গকে নিশ্চিত ভেবে না বসে সেজন্যেই এই অবকাশের সৃষ্টি করা হয়েছিল: 'কারণ একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে অনেক বেশি জেনে ফেলতে পারে এবং তাতে বিতৃষ্ণা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে, তোরাহ্ বলছে [ঋতুস্রাবের] পর সাতদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে *নিদ্দাহ* [যৌন সঙ্গমের অতীত] হতে হবে যাতে করে পরে সে পুরুষের কাছে বিয়ের দিনের মতো প্রিয় হয়ে উঠতে পারে।'[৯৬] উৎসবের দিনে সিনাগগে যাবার আগে একজন পুরুষের জন্যে আচরিক স্নান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সে সাধারণ অর্থে অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা বলে নয়, বরং সে যেন পবিত্র প্রার্থনার জন্যে নিজেকে আরও বেশি পবিত্র করে তুলতে পারে সে জন্যে। এবং একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ঋতুস্রাবের পর আসন্ন পবিত্রতা: অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার লক্ষ্যে নারীকে আচরিক-স্নানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে যৌনতা যে পবিত্র হতে পারে, এ ধারণা ক্রিশ্চানদের কাছে বিসদৃশ্য শোনাবে, খৃস্টধর্মে যৌনতা ও ঈশ্বরকে অনেক সময় পরস্পর বিরোধী হিসাবে দেখা হবে। এ কথা সত্যি যে, পরবর্তীকালের ইহুদিরা র‍্যাবাইদের এসব বিধিনিষেধের নেতিবাচক ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু র‍্যাবাইগণ নিরানন্দ, সন্ন্যাসমূলক জীবনবিরোধী আধ্যাত্মিকতার প্রচার করেননি।

বরং, উল্টো তাঁরা জোর দিয়েছেন যে ভালো ও আনন্দে থাকা ইহুদিদের কর্তব্য। বারবার তারা বাইবেলীয় চরিত্র জ্যাকব, ডেভিড বা এশতারের অসুস্থ বা অসুখী অবস্থায় পবিত্র আত্মার তাদের 'ত্যাগ' করা বা 'পরিত্যাগ' করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৭] অনেক সময় আত্মা তাঁদের ছেড়ে যাচ্ছে মনে হলে তাঁরা শ্লোক আবৃত্তি করে দেখিয়েছেন: 'হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, আমাকে কেন তুমি ত্যাগ করলে?' ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় জেসাস যখন এই প্রশ্নটি উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন ওঠে এখানে। র‍্যাবাইগণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, নারী-পুরুষ কষ্ট পাক এটা চাননি ঈশ্বর। দেহ যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গঠিত, সুতরাং একে সম্মান দিতে হবে, যত্ন নিতে হবে: এমনকি মদ পান বা যৌনতার মতো আনন্দ ত্যাগ করাটাও পাপ হতে পারে, কারণ মানুষের উপভোগের জন্যেই ঈশ্বর এগুলো দান করেছেন। দুঃখ কষ্টে আর সন্ন্যাসে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। তাঁরা মানুষকে পবিত্র আত্মা 'অধিকার করার' প্রকৃত পথে চলার তাগিদ দেওয়ার সময় আসলে এক অর্থে নিজেদের জন্যে ঈশ্বরের নিজস্ব ইমেজ গড়ে নেওয়ার কথাই বুঝিয়েছেন। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের কাজের শুরু ও মানুষের কাজের শেষ কোথায় বলা মোটেই সহজ নয়। পয়গম্বরগণ সব সময় তাঁদের

নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি ঈশ্বরের ওপর আরোপ করে পৃথিবীতে তাঁকে দৃশ্যমান করে তুলেছেন। এখন র‍্যাবাইরা এমন একটা কাজে নিজেদের নিয়োজিত করলেন যেটা একাধারে মানবীয় ও স্বর্গীয়। যখন তাঁরা কোনও নতুন বিধান জারি করেছেন, সেটাকে একই সঙ্গে ঈশ্বর প্রদত্ত ও তাঁদের নিজস্ব আরোপিত বলেও দেখা হয়েছে। তোরাহ্‌র সংখ্যা বাড়িয়ে তাঁরা পৃথিবীতে তাঁর উপস্থিতির বিস্তার ঘটাচ্ছিলেন এবং একে আরও কার্যকর করে তুলছিলেন। নিজেরাই তোরাহ্‌র অবতার হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছেন তারা; 'ল'-এর ক্ষেত্রে দক্ষতার কারণে অন্য যে কারও চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি মাত্রায় 'ঈশ্বরের মতো'[৯৮] ছিলেন।

সর্বব্যাপী ও অন্তস্থ ঈশ্বরের এই বোধ ইহুদিদের মানুষকে পবিত্র হিসাবে দেখতে সাহায্য করেছে। র‍্যাবাই আকিভার শিক্ষা (*reduce*), 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো করেই ভালোবাসতে হবে'ই ছিল 'তোরাহ্‌র মহান নীতি।'[৯৯] ঈশ্বর, যিনি তাঁর অনুরূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের বিরুদ্ধে আক্রমণ সেই ঈশ্বরেরই প্রত্যাখ্যান স্বরূপ। এটা নাস্তিক্যের সমান, ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করার ব্লাসফেমাস প্রয়াস। এ কারণেই হত্যা সর্বোচ্চ পাপ, ঐশীগ্রন্থ আমাদের শেখায়, যে মানুষের রক্ত ঝরায় সে যেন স্বর্গীয় প্রতিরূপকেই বিনষ্ট করে।[১০০] আরেকজন মানুষের সেবা করার কাজটি হচ্ছে *imitatio de*: এতে ঈশ্বরের বদান্যতা আর দয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যেহেতু সকলকেই ঈশ্বরের প্রতিরূপে গড়ে তোলা হয়েছে, সেহেতু সবাই সমান: এমনকি সর্বোচ্চ পুরোহিত যদি কাউকে আহত করেন তো তাকেও প্রহার করা যাবে, কেননা আঘাত করে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার অনুরূপ অপরাধ করেছেন।[১০১] ঈশ্বর আদম (*adam*) নামে একজন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে, যদি কেউ একজন মানুষকেও ধ্বংস করে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যেন সে গোটা বিশ্ব ধ্বংস করেছে।[১০২] এটা স্রেফ চড়া আবেগ ছিল না, বরং আইনের মূল নীতি: এর অর্থ ছিল, উদাহরণ স্বরূপ, যুদ্ধ বিদ্রোহের সময় কোনও একদলের স্বার্থে একজন ব্যক্তিকেও হত্যা করা যাবে না। কাউকে অপমানিত করা, হোক না সে *গোয়* (*Goy*) বা দাস, অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, কেননা এটা হত্যার সমান, ঈশ্বরের ভাবমূর্তিকে অস্বীকার করার অপবিত্র অপরাধ।[১০৩] মুক্তি বা স্বাধীনতার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: র‍্যাবাইদের গোটা সাহিত্য তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে বন্দি করার কোনও রকম উল্লেখ খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই কারও স্বাধীনতা খর্ব করার অধিকারী। কারও সম্পর্কে বাজে গুজব রটানো ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার সামিল।[১০৪] ঈশ্বরকে বড় ভাইয়ের মতো কিছু যেন না ভাবে ইহুদিরা, মহাশূন্য হতে যিনি তাদের প্রতিটি

WWW.ARBOI.COM

নড়াচড়ার উপর নজর রাখছেন; বরং তাদের প্রত্যেক মানুষের মাঝে ঈশ্বর উপস্থিতির একটা বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে অন্যদের সঙ্গে আমাদের আচার আচরণ পবিত্র সাক্ষাতে পরিণত হয়।

প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী বাস করতে পশু জগতের কোনও সমস্যা হয় না, কিন্তু নারী-পুরুষের জন্যে যেন পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠা কঠিন। ইসরায়েলের ঈশ্বর মাঝে মাঝে যেন একেবারে অপবিত্র ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতাকে উৎসাহিত করেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু শত শত বছরের পরিক্রমায় ইয়াহ্ওয়েহ্ এমন এক ধারণার রূপ নিয়েছিলেন যা মানুষকে স্বজাতির প্রতি দরদ ও শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যা ছিল অ্যাক্সিয়াল যুগের সকল ধর্মের বৈশিষ্ট্য বা নির্দেশক। র‍্যাবাইদের মতবাদ ঈশ্বরের ধর্মসমূহের দ্বিতীয়টির অনেক কাছাকাছি, ঠিক একই ঐতিহ্য বা ধারায় প্রোথিত ছিল যার শেকড়।

AMARBOI.COM

# ৩.
# জেন্টাইলদের প্রতি আলো

ফিলো যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর প্লেটোনাইজড় ইহুদিবাদ প্রচার করছেন এবং হিল্লেল ও শাম্মাই জেরুজালেমে যুক্তির জাল বিস্তার করে চলেছেন; সেই একই সময়ে একজন ক্যারিশম্যাটিক ফেইথ হীলার উত্তর প্যালেস্তাইনে কাজ শুরু করেছিলেন। জেসাস সম্পর্কে খুব কমই জানি আমরা। তাঁর জীবনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণী হচ্ছে সেইন্ট মার্কের গস্পেল, যা জেসাসের মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পর আনুমানিক ৭০ সালে রচিত হয়েছিল। ততদিনে জেসাস তাঁর অনুসারীদের জন্যে যে তাৎপর্য অর্জন করেছিলেন সেগুলোর ঐতিহাসিক বাস্তবতা পৌরাণিক উপাদানের ভারে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেইন্ট মার্ক এই তাৎপর্যকেই মূলত বিশ্বস্ত, সরলরৈখিক উপস্থাপনের বদলে তুলে ধরেছেন। প্রাথমিক ক্রিশ্চানরা তাঁকে এক নতুন মোজেস, নয়া জোশুয়া, নতুন ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেখেছে। বুদ্ধের মতো জেসাসও যেন তাঁর সমসাময়িক অনেকের গভীর আকাঙ্ক্ষা ধারণ করেছেন এবং যে-স্বপ্ন ইহুদিদের শত শত বছর তাড়া করে ফিরেছিল তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। জীবদ্দশায় প্যালেস্তাইনের ইহুদিরা তাঁকে মেসায়াহ বলে বিশ্বাস করেছিল: তিনি জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন এবং ডেভিডের পুত্র বলে তাঁর গুণ গাওয়া হয়েছিল; কিন্তু এর মাত্র কয়েকদিন পরেই রোমানদের কষ্টদায়ক ক্রুসিফিক্সশন নামক শাস্তি প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়। কিন্তু সাধারণ অপরাধীর মতো মৃত্যুবরণকারী একজন মেসায়াহর কেলেঙ্কারী সত্ত্বেও অনুসারীরা বিশ্বাস করতে চায়নি যে তাঁকে বিশ্বাস করা ভুল হয়েছে। গুজব ছিল যে, তিনি মৃত অবস্থা থেকে আবার উত্থিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছে, ক্রুসিফিক্সশনের তিন দিন পর নাকি তাঁর কবর ফাঁকা দেখা গেছে; অন্যরা তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে; এবং একবার ৫০০ মানুষ যুগপৎ দেখতে পেয়েছিল তাঁকে। অনুসারীদের বিশ্বাস

AMARBOI.COM

ছিল যে অচিরেই তিনি ঈশ্বরের মেসিয়ানিক রাজ্য উদ্বোধন করার জন্যে আবার ফিরে আসবেন। যেহেতু এধরনের বিশ্বাস ধর্ম বিরোধী কিছু ছিল না, ওদের গোত্রটিকে হিল্লেলের পৌত্র এবং অন্যতম মহান *তেন্নাইম* র‍্যাবাই গ্যামালিয়েলর মতো ব্যক্তিও প্রকৃত ইহুদি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর অনুসারীরা খাঁটি ইহুদিদের মতো প্রতিদিন মন্দিরে উপাসনা করত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জেসাসের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানে অনুপ্রাণিত নব্য ইসরায়েল এক অ-ইহুদি (জেন্টাইল) ধর্ম বিশ্বাসে পরিণত হবে, যা ঈশ্বর সম্পর্কে এর নিজস্ব সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলবে।

আনুমানিক সিই ৩০ সালে জেসাসের মৃত্যুর সময় ইহুদিরা আন্তরিকভাবে গোঁড়া একেশ্বরবাদী ছিল, সুতরাং মেসায়াহ স্বর্গীয় সত্তা হবেন এমনটা কেউ আশা করেনি: তিনি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হলেও একজন সাধারণ মানুষই হবেন। কোনও কোনও র‍্যাবাই মত প্রকাশ করেছেন যে, অনন্তকাল থেকেই ঈশ্বর তাঁর নাম ও পরিচয় জানতেন। সুতরাং, এদিক দিয়ে ভাবলে একথা বলা যেতে পারে যে, সময়ের সূচনার আগে থেকেই প্রোভার্বস এবং এক্লেসিয়াস্টিকাসে'র স্বর্গীয় প্রজ্ঞার সত্তার মতো একই প্রতীকী রূপে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন মেসায়াহ্। ইহুদিরা মনোনীত সত্তা মেসায়াহ্‌কে জেরুজালেমে প্রথমবারের মতো স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী রাজা ও আধ্যাত্মিক নেতা রাজা ডেভিডের বংশধরকে প্রত্যাশা করেছিল। শ্লোক (Psalms) সমূহ কখনও কখনও ডেভিড বা মেসায়াহকে 'ঈশ্বরের পুত্র' অ্যাখ্যা দিয়েছে, কিন্তু সেটা ছিল ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা বোঝানোর একটা স্বাভাবিক কায়দা। বাবিলন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে *গোয়িমদের* ঘৃণিত উপাস্যদের মতো ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌রও একজন পুত্র আছে, এটা কল্পনাও করেনি কেউ।

আদি রচনা হিসাবে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বিবেচিত মার্কের গস্পেল জেসাসকে সম্পূর্ণ সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করেছে, যাঁর পরিবার আছে, আছে ভাই ও বোন। কোনও দেবদূত তাঁর জন্মের ঘোষণা দেয়নি বা তাঁর দোলনাকে ঘিরে গান করেনি। শিশু বা কৈশোরে কোনওভাবেই তাঁকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে মনে হয়নি। যখন তিনি শিক্ষা দান শুরু করেন, নাযারেথের শহরবাসীরা একজন সামান্য ছুতোরের ছেলের এমন প্রতিভাবান হয়ে ওঠায় বিস্মিত হয়েছিল। জেসাসের কর্মজীবন দিয়ে বর্ণনা শুরু করেছেন মার্ক। মনে হয়, তিনি সম্ভবত মূলত ভবঘুরে সন্ন্যাসী জন দ্য ব্যাপটিস্ট-এর অনুসারী ছিলেন, যিনি সম্ভবত একজন এসিন: জেরুজালেমকে মারাত্মকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত বিবেচনা করেছেন জন এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রচারণা চালিয়েছেন। জনগণকে অনুশোচনা করে জর্দান নদীতে স্নান করে পবিত্র হওয়ার এসিন আচার আপন করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। ল্যুক জেসাস এবং

AMARBOI.COM

জন প্রকৃতই সম্পর্কিত ছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। জনের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্যে নাযারেথ থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জুদাহয় এসেছিলেন জেসাস। মার্ক যেমন আমাদের বলছেন: 'আর তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য হইতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত"।'[১] জেসাসকে নিমেষে মেসায়াহ বলে শনাক্ত করেছেন জন দ্য ব্যাপটিস্ট। জেসাস সম্পর্কে এরপর আমরা যা শুনতে পাই তা হলো, তিনি গ্যালিলির সমস্ত গ্রাম আর শহরে 'ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল'[২] ঘোষণাসহ শিক্ষা দান শুরু করেছিলেন।

জেসাসের মিশনের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে নানান ধারণা রয়েছে। তাঁর বাণীর খুব অল্প অংশই গস্পেলসমূহে নথিভুক্ত করা হয়েছিল বলে মনে হয় এবং পরবর্তীকালের পরিমার্জনায় এসব বাণীর অনেকাংশই তাঁর মৃত্যুর পর সেইন্ট পল প্রতিষ্ঠিত চার্চসমূহে বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এমন কিছু সূত্র রয়ে গেছে যেগুলো তাঁর কর্মধারার আবশ্যকীয় ইহুদি প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়। ফেইথ হীলারবা গ্যালিলির পরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে: জেসাসের মতোই ভিক্ষুকের জীবন যাপন করত তারা, ধর্মপ্রচার করত, অসুস্থদের সারাত এবং দুরাত্মা তাড়াত। আবার জেসাসের মতোই এইসব গ্যালিলিয় পবিত্র ব্যক্তির বিপুল সংখ্যক নারী শিষ্য থাকতে দেখা যেত। অন্যরা যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে, জেসাস সম্ভবত হিল্লেল-এর মতো একই ভাবধারার ফারিজি ছিলেন, ঠিক পলের মতোই, যিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেওয়ার আগে নিজেকে ফারিজি দাবি করেছিলেন। তিনি র‍্যাবাই গামালিয়েলের শিষ্য ছিলেন বলে বর্ণিত আছে।[৩] নিঃসন্দেহে জেসাসের শিক্ষা ফারিজিদের প্রধান মতামতের অনুসারী ছিল, কারণ তিনিও বিশ্বাস করতেন যে দান ও প্রেমই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ *mitzvot*; ফারিজিদের মতো তোরাহ্‌র অনুসারী ছিলেন তিনি এবং বলা হয়ে থাকে যে সমসাময়িকদের তুলনায় অনেক কঠোর অনুসরণের শিক্ষা দিতেন।[৪] হিল্লেলের সোনালি বিধির (Golden Rule) একটি ভাষ্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি, তাঁর যুক্তি ছিল গোটা আইনকে 'সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি তাহা করিও' এই একটা মাত্র সাধারণ বাক্য প্রকাশ সম্ভব।[৫] সেইন্ট ম্যাথুর গস্পেলে জেসাস 'স্ক্রাইব ও ফারিজিদের' বিরুদ্ধে তীব্র ও অশ্লীল মন্তব্য উচ্চারণ করেছেন, তাদেরকে ভয়ানক কপটাচারী হিসাবে তুলে ধরেছেন।[৬] এটা প্রকৃত তথ্যের বা ঘটনার বিকৃত বিবৃতি এবং জেসাসের মিশনের মূল বৈশিষ্ট্য দানের মারাত্মক লঙ্ঘন তো বটেই সেই সঙ্গে ফারিজিদের বিরুদ্ধে তিক্ত বিষোদগারও প্রায় নিশ্চিতভাবেই অসত্যও। উদাহরণ স্বরূপ, ল্যুক তাঁর গস্পেল এবং অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস উভয়েই ফারিজিদের প্রতি

AMARBOI.COM

বেশ সুবিচার করেছেন এবং ফারিজিরা যদি সত্যি জেসাসকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া চরম শত্রু হতো তাহলে পল তাঁর ফারিজি পটভূমি নিয়ে বাগাড়ম্বর করতে যেতেন না। ম্যাথুর গস্পেলের অ্যান্টি-সেমিটিক সুর ৮০র দশকে ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের মধ্যকার টানাপোড়েন তুলে ধরে। গস্পেল প্রায়ই দেখায় জেসাস ফারিজিদের সঙ্গে তর্ক করছেন, কিন্তু আলোচনা হয় আন্তরিকতাপূর্ণ কিংবা শাম্মাইয়ের অধিকতর কঠোর মতবাদের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে।

জেসাসের মৃত্যুর পর অনুসারীরা তিনি স্বর্গীয় সত্তা ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাপারটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘটেনি, আমরা যেমনটি দেখব, জেসাস মানবরূপে ঈশ্বর ছিলেন, এই মতবাদ চতুর্থ শতাব্দীর আগে চূড়ান্ত হয়নি। ক্রিশ্চানদের অবতারবাদে বিশ্বাস ধীরে ধীরে, জটিল এক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে। জেসাস নিঃসন্দেহে কখনও নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেননি। দীক্ষা গ্রহণের সময় স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর তাঁকে 'ঈশ্বর পুত্র' বলে আহ্বান করেছিল, কিন্তু এটা হয়তো প্রিয় মেসায়াহ হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। আকাশ থেকে ধ্বনিত এধরনের ঘোষণায় তেমন অস্বাভাবিক কিছু ছিল না প্রায়শঃই, র‍্যাবাইগণ প্রায়শঃই তাঁদের ভাষায় *বাত কোল*– আক্ষরিক অর্থে, "কণ্ঠস্বরের কন্যা"–এর অনুভূতি লাভ করতেন, যা ছিল সরাসরি পয়গম্বর সুলভ প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির বিকল্প একধরনের অনুপ্রেরণা।[৭] পবিত্র আত্মা যখন র‍্যাবাই ইয়োহান্নান বেন যাক্কাই ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কবুতরের রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর মিশনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, সেই সময় এরকম *বাত কোল* শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। জেসাস স্বয়ং নিজেকে 'দ্য সান অভ ম্যান' হিসাবে পরিচয় দিতেন। এই উপাধি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু এটা মনে হয় যে মূল আরামাইক বাকধারা *বার নাশা* মানবীয় অবস্থার দুর্বলতা এবং মরণশীলতার উপরই জোর দিয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে জেসাস নিজেকে ক্রমে একদিন কষ্ট সয়ে মারা যাবেন এমন একজন অসহায় মানব সন্তান হওয়ার ব্যাপারে জোর দিয়ে বরং অপ্রত্যাশিত কাজই করে থাকবেন।

অবশ্য গস্পেলসমূহ আমাদের বলে যে, ঈশ্বর জেসাসকে নির্দিষ্ট কিছু স্বর্গীয় 'ক্ষমতা' (*dunamis*) দিয়েছিলেন যে কারণে তিনি কিছুটা মরণশীল থাকলেও রোগ মুক্ত করা ও পাপ মোচনের মতো ঈশ্বর-সম কাজ করার সমর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং লোকে যখন জেসাসকে কর্মরত দেখেছে, তখন তারা ঈশ্বর কেমন তার জীবন্ত, চলমান মূর্তির দেখাই পেয়েছে। একবার তাঁর তিন শিষ্য স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখার দাবি করেছেন। এ কাহিনীটি তিনটি সিপনোটিক গস্পেলেই রক্ষিত আছে। পরবর্তীকালের ক্রিশ্চানদের কাছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এখানে বলা হয়েছে, পিটার, জেমস এবং জন নামের তিনজন অনুসারীসহ এক উঁচু পাহাড়ে

AMARBOI.COM

উঠেছিলেন জেসাস–ওটাকে সাধারণভাবে গ্যালিলির তাবর পাহাড় বলে মনে করা হয়। সেখানে অনুসারীদের সামনে 'দেহের পরিবর্তন' ঘটান তিনিঃ তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং তাহার বস্ত্র দীপ্তির ন্যায় শুভ্র হইল।[৮] আইন ও পয়গম্বরদের প্রতিভূ হিসাবে মোজেস ও এলিযাহ্ সহসা তাঁর পাশে হাজির হলেন এবং তিনজনে কথোপকথনে লিপ্ত হলেন। পিটার পুরোপুরি হতবিহ্বল হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, কি বলছেন বুঝতে পারেননি, এই দিব্যদর্শনকে স্মরণীয় করে রাখতে ওদের তিনখানা কুটির নির্মাণ করতে হবে। সিনাই পর্বতে মোজেসের ওপর নেমে আসা সেই উজ্জ্বল মেঘের মতো মেঘ পাহাড়চূড়া ঢেকে ফেলে এবং একটা *বাত কোল* ঘোষণা দেয়: 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত, ইহার কথা শুন।'[৯] বহু শতাব্দী পরে গ্রিক ক্রিশ্চানরা এই দিব্যদর্শনের অর্থ নিয়ে ভাবতে গিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ঈশ্বরের 'ক্ষমতা'ই জেসাসের 'পরিবর্তিত দেহায়বয়বের' মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তারা আরও উল্লেখ করেছে যে জেসাস কখনও এইসব স্বর্গীয় 'ক্ষমতা' বা *দিনামেইজ* কেবল নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার দাবি করেননি। জেসাস বারবার অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তারা 'বিশ্বাস' রাখলে অবশ্যই এসব 'ক্ষমতা' ভোগ করতে পারবে। 'বিশ্বাস' দিয়ে অবশ্যই সঠিক ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করার কথা বোঝাননি তিনি, বরং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ এবং উন্মুক্ত হওয়ার এক অন্তর্গত প্রবণতার চর্চার কথা বুঝিয়েছেন। অনুসারীরা মনে কোনও রকম সন্দেহ পুষে না রেখে ঈশ্বরের কাছে উন্মুক্ত হতে পারলে তাঁর মতো তারাও সব কিছু করতে পারবে। র‍্যাবাইদের মতো জেসাস একথা বিশ্বাস করতেন না যে আত্মা (Spitit) কেবল সুবিধাপ্রাপ্ত অভিজাতদের জন্যে, বরং সদিচ্ছাধারী সকল মানুষের: কোনও কোনও অনুচ্ছেদে সেই র‍্যাবাইদের কারও কারও মতো এমনও মত প্রকাশিত হয়েছে যে, এমনকি *গোয়িম*রাও 'আত্মা'কে গ্রহণ করতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন জেসাস। তাঁর অনুসারী 'বিশ্বাস' থাকলে তারা এমনকি আরও বড় কেরামতি দেখাতে পারবে। কেবল তারা যে পাপ মোচন ঘটাতে আর দূরাত্মা তাড়াতে পারবে তাই নয়, গোটা একটা পাহাড়কে সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে পর্যন্ত সক্ষম হবে।[১০] তারা আবিষ্কার করবে যে তাদের নাজুক মরণশীল জীবনই মেসিয়ানিক রাজ্যে ক্রিয়াশীল ঈশ্বরের 'ক্ষমতা'য় অলৌকিক রূপ ধারণ করেছে।

জেসাসের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা এই বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারেনি যে তিনি কোনও না কোনওভাবে ঈশ্বরের একটা ইমেজের ধারক ছিলেন। প্রায় সূচনা থেকেই তারা জেসাসকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা শুরু করেছিল। সেইন্ট পলের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বরের ক্ষমতাকে *গোমিয়*দের কাছে গ্রহণ উপযোগি করে তোলা উচিত, তিনি তাই বর্তমান তুরস্ক, ম্যাসিদোনিয়া-এর গ্রিসে গস্পেল

AMARBOI.COM

প্রচার করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কোনও অ-ইহুদি মোজেসের আইনের পুরোপুরি অনুসরণ না করেও নব্য ইসরায়েলের সদস্য হতে পারে। এতে অনুসারীদের মূল দলটি ক্ষুব্ধ হয়, আলাদা ইহুদি গোত্র হিসাবে পরিচিত হতে চেয়েছিল ওরা। এক আবেগময় বিরোধের পর পলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায় তারা। অবশ্য পলের ধর্মান্তরিতদের অধিকাংশই ছিল ডায়াসপোরার ইহুদি বা 'গডফিয়ারার', ফলে নব্য ইসরায়েল গভীরভাবে ইহুদিবাদী রয়ে গিয়েছিলে। পল কখনওই জেসাসকে 'ঈশ্বর' সম্বোধন করেননি। তিনি ইহুদি অর্থে তাঁকে 'সান অভ গড' বলে ডেকেছেন; জেসাস স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার ছিলেন, একথা তিনি বিলকুল বিশ্বাস করতেন না: স্রেফ ঈশ্বরের 'ক্ষমতা' আর 'আত্মা' ছিল তাঁর আয়ত্তে যা পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটায় এবং স্বর্গীয় সত্তার সঙ্গে যাকে একাকার করা যায় না। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, জেন্টাইল জগতে নব্য-ক্রিশ্চানরা এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের বোধ বজায় রাখত না; ফলে শেষ পর্যন্ত একজন মানুষ যে দুর্বল ও মরণশীল মানবজীবনের ওপর জোর দিয়েছেন তাঁকে স্বর্গীয় বলে বিশ্বাস করা হয়েছে। জেসাসের দেহে ঈশ্বরের অবতারের ধারণা বা মতবাদ বরাবরই ইহুদিদের বিক্ষুব্ধ করেছে, এবং পরবর্তী সময়ে মুসলিমরাও ব্লাসফেমাস বলে আবিষ্কার করবে। সুনির্দিষ্ট বিপদ সম্বলিত কঠিন মতবাদ এটা। ক্রিশ্চানরা প্রায়শঃই আলাদাভাবে একে ব্যাখ্যা করে থাকে। তারপরেও ধর্মের ইতিহাসে এ ধরনের অবতারবাদী ভক্তি মোটামুটি একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য: আমরা দেখব, এমনকি ইহুদি ও মুসলিমরাও আশ্চর্যরকম সাদৃশ্যপূর্ণ নিজস্ব ধর্মতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে।

প্রায় একই সময়ে ভারতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে জেসাসের চমকপ্রদ স্বর্গীয়করণের পেছনে ক্রিয়াশীল ধর্মীয় প্রেরণা বুঝতে পারি আমরা। বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় ধর্মে স্বয়ং বুদ্ধ এবং মানবরূপে আবির্ভূত হিন্দু দেবতার মতো উন্নত সত্তার প্রতি প্রবল ভক্তি প্রকাশের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ভক্তি নামে পরিচিত এ ধরনের ব্যক্তিগত আনুগত্য, মানবায়িত ধর্মের জন্যে মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ বলে মনে হয়। এটা একেবারে নতুন ধরনের বিচ্যুতি হলেও উভয় ধর্মবিশ্বাসে অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী বাদ না দিয়েই ধর্মের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল।

আনুমানিক বিসিই দুই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বুদ্ধের মৃত্যুর পর মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর একটা স্মৃতিচিহ্নের আকাঙ্ক্ষা করেছিল, কিন্তু তারা এও ভেবেছে যে কোনও মূর্তি নির্মাণ সঙ্গত হবে না, কেননা নির্বাণ লাভের পর স্বাভাবিক অর্থে তাঁর আর কোনও 'অস্তিত্ব' নেই। কিন্তু তারপরেও বুদ্ধের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ ও তাঁর আলোকপ্রাপ্ত মানব রূপ নিয়ে ধ্যান করার প্রয়োজন এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, শেষ অবধি বিসিই প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম

AMARBOI.COM

ভারতের গান্ধারা ও যমুনা নদী তীরবর্তী মথুরায় প্রথমবারের মতো তাঁর মূর্তির আবির্ভাব ঘটে। এই প্রতিমাগুলো থেকে পাওয়া ক্ষমতা ও প্রেরণা বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যদিও গৌতমের দেওয়া শিক্ষা অন্তরের শৃঙ্খলা ও সত্তার বাইরের কারও প্রতি ভক্তি প্রকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সব ধর্মই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। তা না হলে সেগুলো অচল হয়ে পড়বে। অধিকাংশ বৌদ্ধের কাছে *ভক্তি* অপরিসীম মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। এটা বিলুপ্তির আশঙ্কায় থাকা বেশ কিছু আবশ্যকীয় সত্য তাদের মনে করিয়ে দেয়। স্মরণ করা যেতে পারে, বুদ্ধ প্রথম আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পর ব্যাপারটি গোপন রাখতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু যন্ত্রণাকাতর মানুষের প্রতি দরদ থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছর 'পথ' প্রদর্শনে বাধ্য হয়েছেন। তারপরেও বিসিই প্রথম শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধ মঙ্ক বা ভিক্ষুরা আপন নির্বাণ লাভের প্রয়াসে মঠে মঠে বন্দি হয়ে যাওয়ায় এই বিষয়টি বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিলেন যেন। *ভিক্ষু* পেশা অত্যন্ত কঠিন ছিল বলে অনেকেই একে সাধ্যের অতীত মনে করেছে। সিই প্রথম শতাব্দীতে এক নতুন ধরনের বৌদ্ধ বীরের আবির্ভাব ঘটে: *বোধিসত্তা,* যিনি বুদ্ধের উদাহরণ অনুসরণ করেন এবং মানুষের জন্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে আপন নির্বাণ বিসর্জন দেন। দুর্গত মানুষকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে তিনি পুনর্জন্মের কষ্ট ভোগে প্রস্তুত। বিসিই প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে সংকলিত *প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্রসমূহ* (Sermons on the Perfection of Wisdom)-এ যেমন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বোধিসত্তারা:

> আপন *নির্বাণ* লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। বরং বিপরীতে, তাঁরা সত্তার অত্যন্ত যন্ত্রণাময় পৃথিবী জরিপ করেছেন, কিন্তু তারপরেও উচ্চমার্গের আলোক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, জন্ম ও মৃত্যুর পালায় কম্পিত ওরা নন। পৃথিবীর প্রতি করুণাবশত পৃথিবীর উপকার সাধনের ব্রত নিয়েছেন ওরা, পৃথিবীকে শান্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ওরা স্থির করেছেন: 'আমরা পৃথিবীর জন্যে আশ্রয়ে পরিণত হব, পৃথিবীর বিশ্রামের স্থল, পৃথিবীর পরম স্বস্তি, পৃথিবীর শান্তির দ্বীপ, পৃথিবীর আলোকমালা, পৃথিবীর উদ্ধারপ্রাপ্তির উপায়ের পথ প্রদর্শক।'[১১]

এছাড়াও, *বোধিসত্ত* অপরিসীম মেধার অধিকারী হয়েছিলেন, যা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দুর্বলকে সাহায্য করতে সক্ষম। *বোধিসত্তার* কাছে প্রার্থনাকারী বৌদ্ধ জগতের এক স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে পারবে, যেখানকার পরিবেশ আলোকপ্রাপ্তি অনেক সহজ করে দেবে।

টেক্সট জোর দিয়েছে যে এসব ধারণা আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করার নয়। এগুলো মামুলি যুক্তি বা পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পর্কহীন, বরং স্রেফ

AMARBOI.COM

ধরাছোঁয়ার অতীত এক সত্যের প্রতীক মাত্র। সিই দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে দার্শনিক নাগার্জুন দ্বন্দ্বমূলক শূন্য (Void) মতবাদের প্রবর্তক, সাধারণ ধারাণাগত ভাষার অপূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বিপরীত ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ব্যবহার করেছিলেন তিনি। তাঁর জোরাল বক্তব্য ছিল পরম সত্য কেবল সাধনা বা ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক শৃঙ্খলার ভেতর দিয়েই অর্জন করা সম্ভব। এমনকি বুদ্ধের শিক্ষাও ছিল প্রথাগত, মানবসৃষ্ট ধারণা যা তিনি যে সত্য বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন তার প্রতি সুবিচার করেনি। এই দর্শন গ্রহণকারী বৌদ্ধরা এমন ধারণা গড়ে তুলেছিল যে, আমরা যা কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করি তা আসলে মায়া। পশ্চিমে আমরা এদের হয়তো আদর্শবাদী বলব। সকল বস্তুর মূল সত্তা, পরম বা অ্যাবসোলিউট আসলে শূন্য, কিছু না, স্বাভাবিক জ্ঞানে যার কোনও অস্তিত্ব নেই। এই শূন্যতাকে নির্বাণের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাটা স্বাভাবিক। যেহেতু গৌতমের মতো একজন বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেছেন, এর মানে অলৌকিক কোনও উপায়ে তিনি স্বয়ং নির্বাণে *পরিণত* হয়েছেন, পরমের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। সুতরাং নির্বাণাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেই বুদ্ধদের সঙ্গে একীভূত হওয়ারও প্রত্যাশী।

বুদ্ধ এবং *বোধিসত্তাদের* প্রতি এই ভক্তির সঙ্গে জেসাসের প্রতি ক্রিশ্চানদের ভক্তির মিল আছে। এটা ধর্মকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে, যেমন পল ইহুদিদের *গোয়িমদের* কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। একই সময়ে হিন্দুদের মাঝেও একই ধরনের *ভক্তির* একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যার কেন্দ্রে ছিলেন অন্যতম বৈদিক দেবতা শিব এবং বিষ্ণু। তারপরও সাধারণ মানুষের ভক্তি *উপনিষদের* দার্শনিক মিতাচারের চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছিল। কার্যত, হিন্দুরা এক ত্রিত্ববাদ জন্ম দিয়েছিল: ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু ছিলেন এক একক অলৌকিক সত্তার তিন প্রতীক বা বৈশিষ্ট্য।

AMARBOI.COM

অনেক সময় শিবরূপে ঈশ্বরের রহস্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা অনেক সহজ হয়ে থাকে: তিনি একাধারে ভালো-মন্দ, উর্বরতা-সংযমের দেবতা, যিনি স্রষ্টা এবং ধ্বংসকারী। জনপ্রিয় কিংবদন্তী অনুযায়ী শিব একজন মহান যোগিও ছিলেন, আবার ভক্তবৃন্দকে তিনি ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বর সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারণার ঊর্ধ্বে ওঠারও অনুপ্রেরণা যোগান। বিষ্ণু মূলত আরও দয়াময় ও কর্মতৎপর। তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে মানুষের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রূপ হচ্ছে কৃষ্ণ চরিত্রটি, যিনি অভিজাত পরিবারে জন্ম নিলেও বেড়ে উঠেছিলেন রাখাল হিসাবে। জনপ্রিয় কিংবদন্তীগুলোয় রাখালীনিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গল্প অত্যন্ত প্রিয়, এসব গল্প ঈশ্বরকে আত্মার প্রেমিক হিসাবে উপস্থাপন করেছে। তারপরেও *ভগবদ*

*গীতায়* বিষ্ণু যখন কৃষ্ণরূপে রাজপুত্র অর্জুনের সামনে উপস্থিত হন সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা:

> হে ঈশ্বর, তোমার দেহে আমি দেবতাদের দেখি,
> আর বহু প্রাণের অস্তিত্ব:
> মহাবিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মা,
> বসে আছেন পদ্ম সিংহাসনে,
> দেবতা সকল আর স্বর্গীয় সরিসৃপ।[১২]

যেভাবেই হোক, কৃষ্ণের দেহে সব কিছুই আছে: তাঁর কোনও আদি বা অন্ত নেই, মহাশূন্য পূর্ণ করে আছেন তিনি এবং সব সম্ভাব্য উপাস্যদের ধারণ করছেন: 'সংক্ষুব্ধ ঝড়-দেবতা, সূর্য দেবতাগণ, উজ্জ্বল দেবতাগণ এবং 'আচারের দেবতাগণ।'[১৩] তিনি 'মানুষের ক্লান্তিহীন চেতনা', মানুষের মূল সত্তা।[১৪] সমস্ত কিছু কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়: সমস্ত নদীসমূহ যেমন সাগরের দিকে ধেয়ে যায় বা আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে মথ। এই ভয়ানক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ দিশাহারা অর্জুনের কম্পিত হওয়া আর কিছুই করার থাকে না।

ভক্তির বিকাশ পরম সত্তার সঙ্গে মানুষের যেকোনও ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গভীর চাহিদার জবাব দেয়। ব্রাহ্মণকে পুরোপুরি দুর্জ্ঞেয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার পর তাঁর একেবারে দূরবর্তী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে প্রাচীন 'স্কাই গডে'র মতো মানুষের চেতনা থেকে পুরোপুরি মুছে যেতে পারেন তিনি। বুদ্ধ ধর্মে *বোধিসত্তা* মতবাদ এবং বিষ্ণুর *অবতারসমূহ* যেন ধর্মীয় বিকাশের আরেকটি পর্যায় নির্দেশ করে, যখন মানুষ পরম সত্তা মানুষের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হতে পারে না বলে জোর দিয়েছে। এইসব প্রতীকী মতবাদ এবং মিথ একটামাত্র এপিফ্যানি দিয়ে পরম সত্তাকে প্রকাশ করার ব্যাপারটি অস্বীকার করে: *বোধিসত্তা* এবং বুদ্ধের কোনও সীমা পরিসীমা নেই; আর অসংখ্য *অবতার* রয়েছে বিষ্ণুর। এসব মিথ মানুষের জন্যে আদর্শও প্রকাশ করে: মানবজাতিকে আলোকপ্রাপ্ত বা দেবত্বপ্রাপ্ত হিসাবে দেখায় এগুলো, যা মানুষের উদ্দীষ্ট।

সিই প্রথম শতাব্দী নাগাদ ইহুদিদেরও একই ধরনের স্বর্গীয় পরিব্যাপীতার তৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল। জেসাসের ব্যক্তিসত্তা এই চাহিদা মিটিয়েছিল বলে মনে হয়। আমাদের জানা ক্রিশ্চান ধর্মটির স্রষ্টা গোড়ার দিকের ক্রিশ্চান লেখক সেইন্ট পল বিশ্বাস করতেন, জেসাস জগতে ঈশ্বরের মূল প্রত্যাদেশ হিসাবে তোরাহ্‌কে প্রতিস্থাপিত করেছেন।[১৫] তিনি একথা দিয়ে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, জানা সহজ নয়। পলের পত্রাবলী এক সুসমন্বিত ধর্মতত্ত্বের

বিবরণ চেয়ে বরং কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার উত্তর। জেসাসকে তিনি অবশ্যই মেসায়াহ্ বলে বিশ্বাস করতেন: 'ক্রাইস্ট' শব্দটি হিব্রু *মসিয়াক* শব্দটির অনুবাদ, যার অর্থ মনোনীত জন। পল ব্যক্তি জেসাস সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলেছেন যেন তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন, যদিও ইহুদি হিসাবে পল জেসাস ঈশ্বরের অবতার ছিলেন বলে বিশ্বাস করতেন না। জেসাস সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বারবার 'যিশু খৃস্টে' (In christ) শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন: ক্রিশ্চানদের বাস 'যিশু খৃস্টে', তাঁর মৃত্যুতে তাঁরা ব্যাপ্টাইজ হয়েছে, চার্চ কোনওভাবে তাঁর দেহ গঠন করেছে।[১৬] পল যুক্তি দিয়ে এই সত্যের পক্ষে কথা বলেননি। বহু ইহুদির মতো তিনি গ্রিক যুক্তিবাদের প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন, যাকে তিনি স্রেফ 'বোকামি'[১৭] বলে বর্ণনা করেছেন। এক আধ্যাত্মিক ও অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতার ফলে তিনি জেসাসকে এক ধরনের পরিবেশ হিসাবে বর্ণনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেখানে 'আমরা বাস করি, চলাফেরা করি এবং আমাদের সত্তার সন্ধান পাই।'[১৮] পলের ধর্মীয় বোধের উৎসে পরিণত হয়েছিলেন জেসাস: সেই কারণেই জেসাস সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলেছিলেন তিনি তাঁর সমসাময়িকরা যেমন করে ঈশ্বরের আলোচনা করে থাকবেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পল বলেছেন যে, 'আমাদের পাপের'[১৯] জন্যে জেসাস কষ্ট ভোগ করেছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় একেবারে গোড়ার দিকে জেসাসের অনুসারীরা তাঁর মৃত্যুর কেলেঙ্কারীতে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং ঘটনাটি কোনওভাবে আমাদের স্বার্থেই ঘটেছে বলে ব্যাখ্যা করে। নবম অধ্যায়ে আমরা দেখব, সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্য ইহুদিরাও আরও এক মেসায়াহ্‌র কলঙ্কজনক পরিসমাপ্তির প্রেক্ষিতে একই রকম ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে। গোড়ার দিকের ক্রিশ্চানরা মনে করেছে যে কোনও রহস্যময় উপায়ে জেসাস বেঁচে আছেন এবং তাঁর 'ক্ষমতা' এখন তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের মাঝে স্থান পেয়েছে। পলের পত্রাবলী থেকে আমরা জানি যে, গোড়ার দিকের ক্রিশ্চানরা সব ধরনের অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল যা হয়তো এক নতুন ধরনের মানবতার ইঙ্গিতবাহী হয়ে থাকবে: কেউ কেউ ফেইথ-হীলার-এ পরিণত হয়েছিল, কেউ আবার স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলত, অন্যরা ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত বলে বিশ্বাস করা বাণীর প্রচার করত। চার্চের প্রার্থনাগুলো কোলাহলপূর্ণ জাঁকাল ব্যাপার ছিল, মোটেই বর্তমান কালের প্যারিশ-চার্চের সান্ধ্য উপাসনা সঙ্গীতের মতো রুচিশীল নয়। জেসাসের মৃত্যু কোনওভাবে উপকারে এসেছিল বলেই মনে হয়: এটা 'এক নতুন ধরনের জীবন' এবং এক 'নতুন সৃষ্টি' সহজ করে তুলেছিল যা পলের পত্রাবলীর স্থায়ী সুর।[২০]

AMARBOI.COM

ক্রুসিফিক্সশন আদমের কোনও 'আদি পাপে'র প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত কোনও মতবাদ ছিল না: আমরা দেখব, চতুর্থ শতাব্দীর আগে এই মতবাদ জন্ম নেয়নি এবং এটা শুধু পশ্চিমেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পল এবং অন্য নিউ টেস্টামেন্ট রচয়িতাগণ কখনওই তাঁদের নিষ্কৃতি লাভের (Salvation) স্পষ্ট, পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পাননি। তবু ক্রাইস্টের আত্মউৎসর্গ-সূচক মৃত্যু একই সময়ে ভারতে বিকাশ পাওয়া *বোধিসত্তার* আদর্শের অনুরূপ। *বোধিসত্তার* মতো ক্রাইস্ট কার্যত মানুষ ও পরম সত্তার মধ্যস্থতাকারীতে পরিণত হয়েছিলেন, পার্থক্য হচ্ছে, জেসাসই *একমাত্র* মধ্যস্থতাকারী এবং তাঁর দেওয়া মুক্তি *বোধিসত্তাদের* মতো ভবিষ্যতের অনাদায়ী অনুপ্রেরণা নয়, বরং তর্কাতীত ব্যাপার। পল জোর দিয়ে বলেছেন জেসাসের ত্যাগ ছিল অনন্য। তিনি যদিও বিশ্বাস করতেন যে অন্যের স্বার্থে তাঁর নিজস্ব ভোগান্তি ছিল মঙ্গলকর, কিন্তু তাঁর স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল জেসাসের দুর্ভোগ এবং মৃত্যু সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের।[২১] এখানে সুপ্ত বিপদ রয়েছে। অসংখ্য বুদ্ধ এবং ছলনাময় ও বৈপরীত্যে পূর্ণ সকল *অবতার* বিশ্বাসীকে মনে করিয়ে দেয় যে, পরমসত্তাকে কোনও একটা আকারে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। খৃস্টধর্মের একক অবতারবাদ বোঝাতে চায় যে, ঈশ্বরের অন্তহীন সত্তা মাত্র একজন মানুষের মাঝে প্রকাশ *পেয়েছিল* যা তাঁকে একধরনের অপরিপক্ক পৌত্তলিকতার দিকে ঠেলে দিতে থাকে।

জেসাস জোর দিয়ে বলে গেছেন যে, ঈশ্বরের 'ক্ষমতা' কেবল তাঁর একার জন্যে নয়। জেসাস এক নতুন ধরনের মানুষের প্রথম উদাহরণ, এই যুক্তি দেখিয়ে পল এই দর্শনকে আরও বিকশিত করেছেন। প্রাচীন ইসরায়েল যা কিছু অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে তিনি কেবল সেগুলো অর্জনই করেননি, বরং এক নতুন *আদমে* পরিণত হয়েছেন, এক নতুন মানবতা যেখানে *গোয়িমসহ* সব মানুষ যেভাবেই হোক যোগ দিতে বাধ্য।[২২] আবার, এটার সঙ্গে বৌদ্ধদের বিশ্বাস, যেহেতু সকল বুদ্ধ পরমসত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন, সেহেতু, এক বুদ্ধসমাজে (Buddhahood) যোগ দেওয়াই মানুষের আদর্শ হতে ভিন্ন নয়।

ফিলিপিস্থ চার্চের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে কিছু জরুরি প্রসঙ্গ উত্থাপনকারী গোড়ার দিকের ক্রিশ্চান-হাইম বলে বিবেচিত গানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি। নবদীক্ষিতদের তিনি বলেছেন, তাদের অবশ্যই জেসাসের মতো আত্মত্যাগের প্রবণতা থাকতে হবে,

ঈশ্বরের স্বরূপ বিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের
সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না,
কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন,

AMARBOI.COM

দাসের রূপ ধারণ করিলেন,
মনুষ্যদের সাহায্যে জন্মিলেন;
এবং আকারে প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া
আপনাকে অবনত করিলেন;
মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমনকি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।
এই কারণ ঈশ্বর তাহাকে অতিশয় উচ্চ-পদান্বিতও করিলেন,
এবং তাহাকে সেই নাম দান করিলেন,
যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;
যেন যীশুর নামে স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতালনিবাসীদের
'সমুদয় জানু পতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে'
যে যীশু খৃস্টের প্রভু *(Kyrios)*,
এই রূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।[২৩]

এই প্রার্থনা সঙ্গীতে যেন ক্রিশ্চানদের এমন একটা বিশ্বাস প্রতিফলিত হচ্ছে যে 'আত্মশূন্য' *(Kenosis)* করার ভেতর দিয়ে মানুষ হওয়ার আগে জেসাস 'ঈশ্বরের সঙ্গে' অবস্থান করছিলেন, এবং 'মানবরূপে' *বোধিসত্তার* মতো মানবীয় অবস্থার দুর্ভোগের অংশীদার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনন্ত কাল ধরে YHWH-এর পাশে দ্বিতীয় স্বর্গীয় সত্তা হিসাবে খৃস্টের অস্তিত্বের ধারণা গ্রহণ করা পলের মতো ইহুদির পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রার্থনা সঙ্গীত দেখাচ্ছে মহিমান্বিত হওয়ার পরেও জেসাস ঈশ্বরের চেয়ে ভিন্ন এবং নিম্নস্তরে রয়ে গেছেন। ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করে *কাইরিয়স* উপাধি দিচ্ছেন। জেসাস নিজে এই উপাধি গ্রহণ করতে পারেন না, উপাধিটি দেওয়া হয়েছে কেবল 'পিতা ঈশ্বরের মহিমায়।'

প্রায় চল্লিশ বছর পর সেইন্ট জনের গস্পেলের রচয়িতা (রচনাকাল Ca-১০০) একই ধরনের মত প্রকাশ করেন। সূচনায় তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত *বাণী* 'শুরু হতেই ঈশ্বরের সঙ্গে' ছিল বলে বর্ণনা করেছেন: 'সকলেই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁরা ব্যতিরেকে হয় নাই।'[২৪] লেখক ফিলোর মতো একই অর্থ বোঝাতে *লোগোস* শব্দটি ব্যবহার করছিলেন না: তাঁকে হেলেনাইজড ইহুদিবাদের চেয়ে বরং প্যালেস্তাইনি ইহুদিবাদের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত বলে মনে হয়। এই সময়ে লিপিবদ্ধ *তারগামস (Targums)* নামে পরিচিত হিব্রু ঐশীগ্রন্থের আরামিক অনুবাদে *মেমরা* (বাণী) শব্দটি পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রতাপ', 'পবিত্র আত্মা' ও 'শেকিনাহ্'র মতো অন্যান্য কারিগরি পরিভাষার মতোই ছিল এর অর্থ যা পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং স্বয়ং ঈশ্বরের দুর্বোধ্য সত্তার

পার্থক্যের উপর জোর দেয়। স্বর্গীয় প্রজ্ঞার মতো, 'বাণী' ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি পরিকল্পনাকে প্রতীকায়িত করে। পল এবং জন জেসাসের পূর্বজীবন থাকার কথা বলার সময় আসলে এটা বোঝাতে চাননি যে তিনি পরবর্তীকালে ত্রিত্ববাদী ধারণা অনুযায়ী দ্বিতীয় স্বর্গীয় 'ব্যক্তি' ছিলেন। তাঁরা বুঝিয়েছেন, জেসাস মানবীয় এবং ব্যক্তিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। যেহেতু তাঁর প্রদর্শিত 'ক্ষমতা' ও 'প্রজ্ঞা' ঈশ্বর থেকে গৃহীত কর্মকাণ্ড, তাই কোনওভাবে 'যাত্রা হইতে তিনি ছিলেন'[২৫] বলে তা প্রকাশ করেছিলেন।

কঠোর ইহুদি পটভূমিতে এইসব ধারণা বোধগম্য ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ের গ্রিক পটভূমির ক্রিশ্চানরা এগুলোকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করবে। সিই ১০০ সালের দিকে রচিত অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস-এ আমরা দেখতে পাই, প্রথম দিকের ক্রিশ্চানদের তখনও ঈশ্বরের ইহুদি ধারণাই ছিল। পেন্টেকস্টের ভোজে যখন সিনাই পর্বতে তোরাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার বার্ষিকী উদযাপনের উদ্দেশ্যে ডায়াসপোরা থেকে শত শত ইহুদি জেরুজালেমে সমবেত হয়েছিল, তখন জেসাসের সঙ্গীদের ওপর পবিত্র আত্মা অবতরণ করেছিলেন। 'হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল...এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল।'[২৬] এই প্রথম ইহুদি ক্রিশ্চানদের সামনে তাদের সমসাময়িক *তেন্নাইম*দের মতো পবিত্র আত্মা নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। অবিলম্বে অনুসারীরা দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে 'পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক এবং মিসমপতামিয়া, যিহুদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও আশিয়া, ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিসর এবং লুবিয়া দেশস্থ, কুরীনির নিকটবর্তী এই অঞ্চল নিবাসী এবং প্রবাসকারী রোমীয়'[২৭] থেকে আগত ইহুদি ও গডফিয়ারারদের মাঝে প্রচারণা শুরু করে দিয়েছিলেন। সবিস্ময়ে তারা আবিষ্কার করে যে, অনুসারীরা তাদের নিজস্ব ভাষাতেই প্রচার করছে। পিটার জমায়েতের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে উঠে দাঁড়ানোর পর এই ঘটনাকে ইহুদিদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বলে তুলে ধরেন তিনি। পয়গম্বরগণ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, এমন একদিন আসবে যখন ঈশ্বর মানবজাতির ওপর তাঁর আত্মা অবতরণ করাবেন যার ফলে এমনকি নারী ও দাসরাও দিব্যদর্শন পাবে, স্বপ্ন দেখবে।[২৮] সেইদিন মেসিয়ানিক রাজ্যের উদ্বোধন ঘটবে এবং ঈশ্বর তাঁর জাতির সঙ্গে পৃথিবীতে বসবাস করবেন। নাযারেথের জেসাসই যে ঈশ্বর, এ দাবি করেননি পিটার। তিনি ছিলেন 'অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর-কর্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য: তাহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐসকল কার্য্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেই জান।' তাঁর নিষ্ঠুর মৃত্যুর পর ঈশ্বর আবার তাঁকে জীবন দান করেছেন এবং 'ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চীকৃত হওয়াতে' তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। পয়গম্বর এবং শ্লোক রচয়িতাগণ সবাই

AMARBOI.COM

এই ঘটনার আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন; এইভাবে 'ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয়ই' জানুক যে, জেসাসই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই মেসায়াহ।[২৯] এই বক্তৃতাটিকে গোড়ার দিকের ক্রিশ্চানদের বার্তা (*Kerygma*) বলে মনে হয়।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অ্যাক্টস-এর রচয়িতার উল্লিখিত স্থানগুলোতেই খৃস্টধর্ম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল: ডায়াসপোরার ইহুদি সিনাগগগুলোতে এর শেকড় ছড়িয়ে পড়ে যা বিপুলসংখ্যক গডফিয়ারার বা ধর্মান্তরিতদের আকৃষ্ট করে। পলের পরিমার্জিত বা সংস্কৃত ইহুদিবাদ যেন তাদের বহু দোদুল্যমানতার সমাধান দিয়েছিল। তারাও 'বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছে' বলে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর এবং একটা সুসঙ্গত অবস্থানের অভাব ছিল। ডায়াসপোরার বহু ইহুদি পশুর রক্তে সিক্ত জেরুজালেম-মন্দিরকে আদিম ও বর্বর প্রতিষ্ঠান ভাবতে শুরু করেছিল। জনৈক হেলেনিস্টিক ইহুদি স্তিফেন এর গল্পের ভেতর দিয়ে অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ধরে রেখেছে। এই ব্যক্তি জেসাসের গোত্রে দীক্ষা নিয়েছিল এবং ব্লাসফেমির অভিযোগে তাকে ইহুদিদের শাসক সভা স্যানহেড্রিন পাথর ছুড়ে হত্যা করেছিল। স্তিফেন তাঁর আবেগময় শেষ বক্তব্যে 'মন্দির ঈশ্বরের প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক অসম্মান বলে দাবি করেছিল, 'তথাপি তিনি পরাৎপর (Most High), তিনি হস্তনির্ম্মিত গৃহে বাস করেন না।'[৩০] মন্দির ধ্বংসের পর ডায়াসপোরার ইহুদিদের কেউ কেউ র‍্যাবাইদের হাতে বিকশিত তলমুদিয় ইহুদিদের গ্রহণ করেছিল। অন্যারা তাদের খৃস্টধর্মের মাঝে তোরাহ্‌র অবস্থান এবং ইহুদিবাদের বিশ্বজনীনতা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পেয়েছিল। এটা অবশ্যই গডফিয়ারারদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল, যারা ৬১৩টি মিতযভোত-এর ভার ছাড়াই নব্য ইসরায়েলের পূর্ণ সদস্য হতে পেরেছিল।

প্রথম শতাব্দীতে ক্রিশ্চানরা ইহুদিদের মতোই সম্পর্কিত ভাবনা ও প্রার্থনা অব্যাহত রেখেছিল। তারা র‍্যাবাইদের মতো যুক্তি দেখিয়েছে; তাদের গির্জাগুলো সিনাগগের মতোই ছিল। আশির দশকে ক্রিশ্চানরা তোরাহ্‌ অনুসরণে অস্বীকৃতি জানালে সিনাগগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বহিষ্কার করা হয় তাদের, সেসময় ইহুদিদের সঙ্গে তাদের প্রবল বিরোধ দেখা দিয়েছিল। আমরা দেখেছি যে প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকের দশকগুলোয় ইহুদিবাদ বহুজনকে ধর্মান্তরিত হতে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু ৭০-এর পরে ইহুদিরা রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে ওদের অবস্থানের অবনতি ঘটে। খৃস্টধর্মে গডফিয়ারাবদের পক্ষ ত্যাগ ধর্মান্তরিতদের ব্যাপারে ইহুদিদের সন্দিহান করে তোলে, তারা আর ধর্মান্তরকরণে আগ্রহ বোধ করেনি। পৌত্তলিকরা আগে যেখানে ইহুদিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল, এবার তারা খৃস্টধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু এরা ছিল প্রধানত দাস ও নিম্নশ্রেণীর

AMARBOI.COM

সদস্য। দ্বিতীয় শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকেই কেবল উচ্চ শিক্ষিত পৌত্তলিকরা ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে এবং এক সন্দিহান পৌত্তলিক সমাজের কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা তুলে ধরতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

রোমান সাম্রাজ্যে খৃস্টধর্মকে ইহুদিবাদেরই একটা শাখা হিসাবে দেখা হয়েছিল, কিন্তু ক্রিশ্চানরা যখন স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে তারা আর সিনাগগের সদস্য নয়, তখন তাদের মূল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির মহাপাপ সংঘঠনকারী ধর্মান্ধদের একটা 'রিলিজিও' হিসাবে তীব্র অসন্তোষের সঙ্গে দেখা হলো। রোমানদের রীতিনীতি কঠোরভাবে রক্ষণশীল ছিল: পরিবার প্রধান এবং আদি-রীতিনীতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। 'প্রগতি'কে প্রায়ই ভবিষ্যতের দিকে নিঃশঙ্ক যাত্রা না ভেবে স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তন হিসাবে দেখা হতো। অতীতের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত সম্পর্ক চ্যুতিকে আমাদের সমাজের মতো সুপ্ত সৃজনশীল হিসাবে দেখা হতো না, আমাদের সামাজে যা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। নতুন আবিষ্কারকে বিপজ্জনক ও রাষ্ট্রদ্রোহ হিসাবে দেখা হয়েছে। রোমানরা ঐতিহ্যের বিধিনিষেধ ছিন্নকারী গণ-আন্দোলনের ব্যাপারে প্রবলভাবে সন্দেহপ্রবণ ছিল। নাগরিকরা যাতে ধর্মীয় 'হাতুড়েদের হাতে না পড়ে সেজন্যে সতর্কতা অবলম্বন করত। অবশ্য তখন সাম্রাজ্য জুড়ে এক ধরনের অস্থিরতা ও উদ্বেগের আবহ বিরাজ করছিল। এক বিশাল সাম্রাজ্যে বসবাসের অভিজ্ঞতা প্রাচীন ঈশ্বর বা দেবতাদের যেন তুচ্ছ ও অপর্যাপ্ত করে তুলেছিল। লোকে ভিনদেশী ও অস্বস্তিকর সংস্কৃতির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এক নতুন আধ্যাত্মিক সমাধানের সন্ধান করেছিল তারা। প্রাচ্যের কাল্টের আমদানি ঘটেছিল ইউরোপে: রাষ্ট্রের অভিভাবক রোমের প্রথাগত দেবতাদের পাশাপাশি আইসিস ও সিমিলে-এর মতো দেবতাদের উপাসনা চলছিল। সিই প্রথম শতাব্দীতে নতুন রহস্য-ধর্মগুলো নবীশদের নিষ্কৃতি ও পরজগতের জ্ঞান দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এ সবটাই ধর্মীয় উৎসাহের কোনও প্রাচীন বিধানের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রাচ্যের দেবতারা প্রবল পরিবর্তন বা পরিচিত আচার-নিষ্ঠা ত্যাগের দাবি ওঠাননি বরং তাঁরা ছিলেন নবাগত সন্ন্যাসীর মতো, এক বৃহত্তর জগতের প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধ জাগিয়ে তুলেছেন। আপনি যত ইচ্ছা ততগুলো রহস্য কাল্টে যোগ দিতে পারতেন কিন্তু শর্ত একটাই সেখানে প্রাচীন দেবতাদের অসম্মান করতে পারবেন না এবং মোটামুটিভাবে পরিমিতি বোধ বজায় রাখতে হবে, তাহলেই কোনও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় রহস্য-ধর্মগুলোকে মেনে নেওয়া হতো এবং তা অঙ্গীভূত হয়ে যেত।

ধর্ম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বা জীবনের অর্থের সন্ধান দেবে, এটা কেউ আশা করেনি। সে ধরনের আলোকনের জন্যে দর্শনের দারস্থ হতো মানুষ। প্রাচীন কালের রোমান সাম্রাজ্যে মানুষ দেবতাদের পূজা বা উপাসনা করত

AMARBOI.COM

বিপদে সাহায্য কামনা, রাষ্ট্রের জন্যে স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রার্থনা এবং অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতার নিরাময়মূলক অনুভূতির জন্যে। ধর্ম ছিল ধারণার চেয়ে বরং কাল্ট ও আচারের ব্যাপর; এর ভিত্তি ছিল আবেগ, আদর্শ বা সচেতনভাবে গৃহীত তত্ত্ব নয়। বর্তমানকালেও এটা একেবারে অপরিচিত বিষয় নয়: আমাদের সমাজে অনেকেই আছে যারা ধর্মীয় প্রার্থনা সভায় যোগ দিলেও ধর্মতত্ত্বে আগ্রহী নয়, তারা অতি অদ্ভুত কিছু চায় না, পরিবর্তনের ধারণাকেও অপছন্দ করে। এরা মনে করে প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত আচার-বিধিগুলো তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে এবং একধরনের নিরাপত্তা বোধের যোগান দেয়। সারমন থেকে এরা অসাধারণ ধারণা বেরিয়ে আসার আশা করে না, শাস্ত্রাচারের পরিবর্তনে অস্বস্তি বোধ করে। মোটামুটি একইভাবে প্রাচীন যুগের শেষ ভাগে বহু পৌত্তলিকই পূর্বপুরুষদের মতো আদি দেবতাদের উপাসনা করতে ভালোবাসত। প্রাচীন আচার-আচরণ তাদের আত্মপরিচয়ের অনুভূতি যোগাত, স্থানীয় ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিত এবং সবকিছু বরাবরের মতো চলার নিশ্চয়তা বলে মনে হতো। সভ্যতা যেন নাজুক অর্জন ছিল, একে অস্তিত্বের নিরাপত্তা বিধানকারী পৃষ্ঠপোষক দেবতাদের নির্বিচারের উপেক্ষা করে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে না। পূর্বপুরুষদের ধর্ম বিশ্বাস ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কোনও কাল্ট প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে প্রচ্ছন্নভাবে শঙ্কিতই বোধ করত তারা। সুতরাং, খৃস্টধর্মের উদ্ভব জগতেরই মন্দটুকু ছিল। ইহুদিবাদের মতো শ্রদ্ধাযোগ্য প্রাচীনত্ব ছিল না তার, আবার আকর্ষণীয় পৌত্তলিকতাবাদের আচার-মালারও–যা সবার দৃষ্টিগ্রাহ্য ও উপভোগ্য ছিল–অভাব ছিল। এটা একটা প্রচ্ছন্ন হুমকিও ছিল, কেননা ক্রিশ্চানরা মাত্র *একজন* ঈশ্বরের কথা বলেছে, অন্য দেবতাদের আখ্যায়িত করছিল ভ্রান্তি হিসাবে। রোমান জীবনীকার গাইয়ুস সুতোনিয়াস (৭০-১৬০) খৃস্টধর্মকে অযৌক্তিক এবং উৎকেন্দ্রিক আন্দোলন মনে করেছেন, এটা একটি *সুপারস্টিশিও নোভা এত্ প্রাভা*–'নতুন' বলেই এটি 'খারাপ'।[৩১]

ধর্ম নয়, জ্ঞান ও আলোকনের জন্যে শিক্ষিত পৌত্তলিকরা দর্শনের দ্বারস্থ হতো। তাদের সাধু-সন্যাসি এবং জ্ঞানীরা হলেন প্রাচীনকালের প্লেটো, পিথাগোরাস এবং এপিকতেতাসের মতো দার্শনিকগণ। তাঁদের এমনকি 'ঈশ্বরের পুত্র' হিসাবে দেখত তারা: উদাহরণ স্বরূপ, প্লেটোকে দেবতা অ্যাপোলো-পুত্র মনে করা হয়েছে। দার্শনিকগণ ধর্মের প্রতি শীতল শ্রদ্ধা বজায় রেখেছেন, তবে একে নিজেদের কর্মকাণ্ড হতে আবশ্যকীয়ভাবে আলাদা হিসাবেই দেখতেন। শ্বেত-প্রাসাদে অবস্থানকারী কেতাবী পণ্ডিত ছিলেন না ওঁরা; তাঁদের একটা দায়িত্ব বা মিশন ছিল, তাঁরা নিজস্ব মতবাদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে সমসাময়িকদের আত্মার মুক্তি ঘটাতে ব্যাকুল ছিলেন।

AMARBOI.COM

সক্রেটিস এবং প্লেটো দুজনই তাঁদের দর্শনের ব্যাপারে 'ধার্মিক' ছিলেন, তাঁরা বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক গবেষণার ফলে বিশ্বজগতের মহিমা অবলোকন করার এক দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে আবিষ্কার করেছিলেন। সেই প্রথম শতাব্দী নাগাদ তাই বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে, অনুপ্রাণিত করার মতো আদর্শের খোঁজে ও নৈতিক প্রেরণার জন্যে তাদের শরণাপন্ন হয়। খৃস্টধর্মকে বর্বরোচিত বিশ্বাস বলে মনে হয়েছে। ক্রিশ্চান ঈশ্বরকে এক ভয়ঙ্কর আদিম উপাস্যের মতো মনে হয়েছে যিনি মানুষের জীবনে অযৌক্তিকভাবে বারবার হস্তক্ষেপে করে চলেন: তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টটলদের মতো দার্শনিকদের সুদূরবর্তী পরিবর্তন রহিত ঈশ্বরের কোনওই মিল নেই। প্লেটো বা আলেকজান্দার দা গ্রেটের মতো মাপের মানুষকে ঈশ্বরের পুত্র ভাবা এক কথা, কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের কোনও এক অচেনা-অজানা কোণে অসম্মানজনক মৃত্যু বরণকারী এক সামান্য ইহুদিকে ঈশ্বর-পুত্র কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রাচীন যুগের শেষভাগে প্লেটোর মতবাদ সবচেয়ে জনপ্রিয় দর্শন ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর নব্য প্লেটোনিস্টরা নৈতিকতা ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ প্লেটোর প্রতি নয়, বরং অতিন্দ্রীয়বাদী প্লেটোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর শিক্ষা দার্শনিককে তাঁর প্রকৃত সত্তাকে দেহের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে আপন সত্তাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে এবং স্বর্গীয় জগতে আরোহণে সক্ষম করতে ইহুদিদের উপাকারে আসেনি এক চমৎকার ব্যবস্থা ছিল এটা, ধারাবাহিকতা ও সমরূপতার ইমেজ হিসেবেই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যবহার করেছে। সকল সত্তার ধারায় একেবারে চূড়ায় অবস্থানকারী সময়ের পরিবর্তনের আঁচড়ের বাইরে আপন চিন্তায় মগ্ন দ্য ওয়ান। প্রকৃত সত্তার পরিণতি হিসাবে দ্য ওয়ান হতেই সবকিছু অস্তিত্ব পেয়েছে: অনন্ত আকৃতিসমূহ দ্য ওয়ান হতে উৎসারিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে নিজস্ব বলয়ে সূর্য, নক্ষত্ররাজি এবং চাঁদকে সক্রিয় করেছে; সবশেষে দেবতাগণ যাদের এখন দ্য ওয়ানের দেবসভার মন্ত্রণা দাতা হিসাবে দেখা হচ্ছে, মানুষের পার্থিব জগতে স্বর্গীয় প্রভাব প্রেরণ করেছেন। প্লেটোনিস্টদের কোনও বর্বর উপাস্যের প্রয়োজন হয়নি যিনি অকস্মাৎ বিশ্ব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা মানুষের একটা ছোট দলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্তরকে অগ্রাহ্য করেছেন। কোনও ক্রুশবিদ্ধ মেসায়াহ্‌র মাধ্যমে ভীতিদায়ক মুক্তির প্রয়োজন ছিল না তাঁর। সর্বপ্রাণে জীবনদানকারী ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে একজন দার্শনিক তাঁর নিজস্ব যৌক্তিক শৃঙ্খলিত উপায়েই স্বর্গীয় জগতে আরোহণ করতে পারেন।

ক্রিশ্চানরা কীভাবে পৌত্তলিক সমাজে তাদের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিয়েছিল? একে দুটো আসনের মধ্যবর্তী একটা অবস্থা বলে ঠেকেছে, রোমান

AMARBOI.COM

অর্থে ধর্মও মনে হয়নি, আবার দর্শনও নয়। তার ওপর, ক্রিশ্চানরা তাদের 'বিশ্বাসে'র তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত নিজেদের আলাদা বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেতন ছিল না; এদিক দিয়ে পৌত্তলিক পড়শীদের সঙ্গে মিল ছিল তাদের। তাদের ধর্মের কোনও সুসমন্বিত ধর্মতত্ত্ব ছিল না, কিন্তু একে অঙ্গীকারের সযত্ন বিকাশ হিসাবে অনেক সঠিকভাবে বর্ণনা করা যেত। তারা তাদের 'ক্রীড' আবৃত্তি করার সময় কতগুলো নির্দিষ্ট প্রস্তাবনায় সম্মতি প্রকাশ করত না। উদাহরণ স্বরূপ, *ক্রীডার* শব্দটি মনে হয় *কোর দেয়ার* (*Cor Dare*) থেকে এসেছে: যার অর্থ হৃদয় দেওয়া। যখন *তারা ক্রীডো* (*Credo*) শব্দটি উচ্চারণ করত (কিংবা গ্রিক ভাষার *পিস্তেনো*), তখন মননশীলতার চেয়ে বরং আবেগের প্রকাশ ঘটত। এভাবে সিলিসিয়ার বিশপ অভ মপসুয়েস্তিয়া থিয়োদর (৩৯২ থেকে ৪২৮) ধর্মান্তরিতদের কাছে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> যখন তুমি ঈশ্বরের সকাশে 'আমি নিজেকে আবদ্ধ করলাম *(Pisteuo)*' কথাটা উচ্চারণ করো, তোমরা বোঝাও তাঁকে তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, কখনও তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে না, তোমরা তাঁর সঙ্গে থাকবে এবং জীবন কাঠামোকে অন্য যেকোনও কিছুর চেয়ে উচ্চতর মনে করবে এবং এমনভাবে তোমাদের আচার-আচরণকে গড়ে তুলবে যাতে তা তাঁর নির্দেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।[৩২]

AMARBOI.COM

পরবর্তীকালের ক্রিশ্চানদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আরও তত্ত্বীয় বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে এবং তারা ধর্মের ইতিহাসে বিরল ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের আবেগের জন্ম দেবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা দেখেছি, ইহুদিবাদে কোনও সুনির্দিষ্ট অর্থডক্সি ছিল না, বরং ঈশ্বর সম্পর্কিত সকল ধারণা আবিশ্যিকভাবে ব্যক্তিগত বিষয় ছিল। গোড়ার দিকে ক্রিশ্চানরা এই প্রবণতার অংশীদার ছিল।

অবশ্য দ্বিতীয় শতাব্দীতে খৃস্টধর্ম গ্রহণকারী কিছু সংখ্যক পৌত্তলিক তাদের ধর্মটি ঐতিহ্যের ধ্বংসাত্মক কোনও লঙ্ঘন নয় বোঝাতে অবিশ্বাসী পড়শীদের নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস পায়; এসব অ্যাপোলোজিস্টের অন্যতম প্রধান ছিলেন জাস্টিন অভ সিসেরা (১০০-১৬৫)। ইনি ধর্মের জন্যে শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। অর্থের সন্ধানে তাঁর অস্থিরতার মাঝে আমরা সেসময়ের আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার ধারণা পাই। জাস্টিন তেমন গভীর বা মেধাবী চিন্তাবিদ ছিলেন না। খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেওয়ার আগে তিনি স্টয়িকদের অনুগামী ভবঘুরে দার্শনিক ও পিথারগোরিয়ান ছিলেন, কিন্তু তাদের পদ্ধতির মূল কথা বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন তিনি। দর্শনের প্রয়োজনীয় মেজাজ মেধার অভাব ছিল তাঁর, কিন্তু কাল্টের উপাসনা ও আচার-আচরণের অতীত কিছু যেন প্রয়োজন ছিল।

খৃস্টধর্মে তিনি তাঁর সমাধান খুঁজে পান। তাঁর দুই 'অ্যাপোলজিয়ায় (১৫০ এবং ১৫৫) তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ক্রিশ্চানরা স্রেফ প্লেটোকে অনুসরণ করছে, যিনি ঈশ্বর মাত্র একজন বলে উল্লেখ করে গেছেন। গ্রিক দার্শনিকগণ এবং ইহুদি পয়গম্বরদের সকলেই ক্রাইস্টের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন—একটা যুক্তি যা তাঁর আমলের পৌত্তলিকদের প্রভাবিত করে থাকবে, কেননা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি নতুন আগ্রহ জন্ম নিয়েছিল তখন। তিনি আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জেসাস ছিলেন *লোগোস* বা স্বর্গীয় কারণের মানবরূপ, স্টয়িকরা যাঁকে কসমসের শৃঙ্খলার মাঝে দেখতে পেয়েছে; গোটা ইতিহাস জুড়ে *লোগোস* বিশ্বে ক্রিয়াশীল ছিলেন, গ্রিক এবং হিব্রুদের সমানভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি অবশ্য এই উন্নত ধরনের ধারণাটির কোনও ব্যাখ্যা দেননিঃ একজন মানব সন্তান কী করে *লোগোসের* অবতার হতে পারেন, *লোগোসই* কি বাইবেলের প্রতীক বাণী বা প্রজ্ঞা? একক ঈশ্বরের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ছিল?

অন্য ক্রিশ্চানরা আঁচ-অনুমানের প্রতি ভালোবাসা থেকে নয় বরং গভীর উদ্বেগকে প্রশমিত করার স্বার্থে আরও উগ্র ধর্মতত্ত্ব গড়ে তুলছিল। বিশেষ করে *নসটিকোয়রা* (জ্ঞানীগণ) স্বর্গীয় জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দর্শন ছেড়ে মিথলজির শরণাপন্ন হয়েছিল। তাঁদের মিথসমূহ ঈশ্বর এবং স্বর্গ সম্পর্কে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল যাকে দুর্ভোগ ও গ্লানির উৎস হিসাবে অনুভব করেছিল তারা। ১৩০ থেকে ১৬০ সাল সময় কালে আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষা দান করেছিলেন বাসিলিদেস ও তাঁর সমসাময়িক ভ্যালেন্তিনাস—রোমে শিক্ষা দানের জন্যে মিশর ত্যাগ করেছিলেন তিনি—এরা দুজনই প্রচুর অনুসারী পেয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে, খৃস্টধর্ম গ্রহণকারী অনেকের মাঝেই দিশাহারা, উন্মূল এবং প্রবলভাবে স্থানচ্যুতির অনুভূতি ক্রিয়াশীল ছিল।

অতি দুর্বোধ্য এক সত্তার কথা বলতে শুরু করেছিল *নস্টিকোয়রা*, তারা এর নাম দিয়েছিল গডহেড—যেহেতু এটাই আমরা যে নিম্নতর সত্তাকে 'ঈশ্বর' বলি তাঁর উৎস। এর সম্পর্কে আমাদের বলার মতো কিছুই নাই, কেননা আমাদের মনের সীমিত সাধ্যের বাইরে এর অবস্থান। ভ্যালেন্তিনাস গডহেডের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এভাবে:

> নিখুঁত এবং পূর্বাহ্নেই বিদ্যমান...অদৃশ্য ও নামহীন শূন্যতায় বাসরত: এটাই সূচনার শুরু এবং পূর্বপুরুষ এবং গভীরতা। এটা আধেয় এবং অদৃশ্য, চিরন্তন এবং অজাত, অনন্তকাল থেকে এটা শান্ত এবং গভীর নিঃসঙ্গ। এর সঙ্গে ছিল ভাবনা, যাকে মহিমা আর নৈঃশব্দ্যও বলা হয়।[৩৩]

মানুষ সবসময় এই পরম বা অ্যাবসোলিউট সম্পর্কে বহু জল্পনা-কল্পনা করেছে, কিন্তু তাদের কোনও ব্যাখ্যাই পর্যাপ্ত ছিল না। গডহেডকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, যা 'ভালো'ও না আবার 'মন্দ'ও না; এমনকি একে 'অস্তিত্ববান'ও বলা যাবে না। বাসিলিদেস শিক্ষা দিয়েছেন যে, একেবারে আদিতে কেবল ঈশ্বর নন, কেবল গডহেডই ছিলেন, সঠিক করে বলতে গেলে যা আসলে 'কিছুই না,' কারণ আমাদের বোধগম্য অর্থে এর কোনও অস্তিত্ব ছিল না।[৩৪]

কিন্তু এই 'কিছু না' নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তিনি আর 'গভীর এবং নৈঃশব্দ্যে' একাকী অবস্থান করে সন্তোষ বোধ করছিলেন না। তখন এর অতলান্ত গভীরতায় এক অন্তস্থ আন্দোলন ঘটে যার ফলে প্রাচীন পৌত্তলিক মিথলজিতে বর্ণিত উৎসারণগুলোর মতো ধারাবাহিক উৎসারণের সৃষ্টি হয়। এইসব উৎসারণের প্রথমটি ছিলেন 'ঈশ্বর', যাঁকে আমরা চিনি এবং যাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা করি। কিন্তু এমনকি 'ঈশ্বর'ও আমাদের অগম্য ছিলেন এবং আরও বিশদ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ফলস্বরূপ ঈশ্বর হতে জোড়ায় জোড়ায় আরও উৎসারণ ঘটতে থাকল, যার প্রত্যেকটি তাঁর স্বর্গীয় গুণাবলীর প্রকাশ করেছে। ঈশ্বর লিঙ্গভেদের ঊর্ধ্বে, *এনুমা এলিশের* মতো, কিন্তু উৎসারিত প্রত্যেক জোড়ায় একটি পুরুষ এবং অপরটি নারী–অধিকতর প্রথাগত একেশ্বরবাদের পৌরুষ বাচক পরিচয় দূর করার একটা প্রয়াস ছিল এটা। উৎসারিত প্রত্যেকটি জোড়া দুর্বলতর ও ক্ষীণকায় হয়ে ওঠে, কেননা এগুলো স্বর্গীয় উৎস হতে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল। অবশেষে যখন এরকম ৩০টি উৎসারণ (বা ঈয়নঃ যুগ) আবির্ভূত হওয়ার পর প্রক্রিয়াটির থেমে যায় এবং স্বর্গীয় জগৎ প্লেরোমা (*Pleroma*) গঠিত হয়। নসটিকরা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য এক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রস্তাবনা রাখছিল না, কেননা সবাই বিশ্বাস করত যে সৃষ্টি এধরনের যুগ, অপদেবতা ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় পরিপূর্ণ। সেইন্ট পল সিংহাসন, প্রাচীর (Dominations), সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছিলেন, অন্যদিকে দার্শনিকরা বিশ্বাস করতেন যে, এইসব অদৃশ্য শক্তি ছিল প্রাচীন দেবতা, এগুলোকে তারা মানুষ এবং দ্য ওয়ান-এর মাঝে মধ্যস্থতাকারীতে পরিবর্তন করেছেন।

একটা বিপর্যয়–এক আদিম পতনের ঘটনা ঘটে গিয়েছিল নসটিকরা যাকে নানাভাবে বর্ণনা করেছে। কেউ বলেছে সোফিয়া প্রেজ্ঞতা অগম্য গডহেড সম্পর্কে এক নিষিদ্ধ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা করায় আশীর্বাদ বঞ্চিত হয়। তাঁর মাত্রাছাড়া অনুমানের কারণে প্লেরোমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পতিত হয় সে এবং তারই কষ্ট ও দুর্দশা বস্তুজগৎ গঠন করে। নির্বাসিত অবস্থায় দিশাহারা সোফিয়া স্বর্গীয় উৎসে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সৃষ্টিজগতে ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রাচ্য ও পৌত্তলিকদের ধারণার মিশেল এই বিশ্বাস নসটিকদের গভীর অনুভূতি প্রকাশ

AMARBOI.COM

করে যে, আমাদের বিশ্ব কোনওভাবে স্বর্গের বিকৃতি; অজ্ঞতা এবং স্থানচ্যুতি থেকে যার সৃষ্টি। অন্য নসটিকরা শিক্ষা দিয়েছে যে 'ঈশ্বর' বস্তুজগৎ সৃষ্টি করেননি, কেননা মৌল বস্তুর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। এটা কোনও এক ঈয়নের কাজ, যাঁকে তারা *দোমিনেশন্স (Dominations)* বা স্রষ্টা আখ্যায়িত করেছে। 'ঈশ্বরে'র প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে প্লেরোমার কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন ইনি। পরিণতিতে তাঁর পতন ঘটে এবং বিদ্রোহের প্রকাশ হিসাবে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ভ্যালেন্তিনাস যেমন ব্যাখ্যা করেছেন: তিনি, 'জ্ঞানবিহীন থেকেই স্বর্গমণ্ডলী তৈরি করেছেন; মানুষের জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে ছাড়াই আকার দিয়েছেন; পৃথিবীকে না বুঝেই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।'[৩৫] কিন্তু অন্য এক ঈয়ন লোগোস উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং নারী ও পুরুষকে আবার ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের পথ বাতলে দিতে জেসাসের দৈহিক রূপ ধরে পৃথিবীতে নেমেছেন। শেষ পর্যন্ত এধরনের খৃস্টধর্ম দমিত হবে, কিন্তু আমরা দেখব, বহু শতাব্দী পরে ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা আবার এ ধরনের মিথের দ্বারস্থ হচ্ছে, কারণ এটা অর্থডক্স ধর্মতত্ত্বের চেয়ে অনেক নির্ভুলভাবে তাদের 'ঈশ্বর' সংক্রান্ত ধর্মীয় বোধ বা অনুভূতি প্রকাশ করেছে।

এসব মিথ কখনওই সৃষ্টি ও মুক্তিলাভের আক্ষরিক বিবরণ হিসাবে বোঝানো হয়নি, স্রেফ অন্তর্গত সত্যের এক প্রতীকী প্রকাশ ছিল এগুলো। 'ঈশ্বর' এবং 'প্লেরোমা' 'মহাশূন্যে'র কোনও বাহ্যিক বাস্তবতা নন বরং অন্তরে এর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করতে হয়:

> ঈশ্বর, সৃষ্টি এবং একই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের অনুসন্ধান ত্যাগ কর। নিজেকে দিয়েই শুরু করো তাঁর সন্ধান। জেনে নাও তোমার অন্তরে কে সবকিছু তার বিষয় করে নিচ্ছে, আর বলছে, 'আমার ঈশ্বর, আমার মন, আমার চিন্তা, আমার আত্মা, আমার দেহ।' দুঃখ, আনন্দ, প্রেম আর ঘৃণার উৎস কোথায় জান। শেখ কীভাবে ইচ্ছা ছাড়াই কেউ দেখে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসে গভীরভাবে। এসব অনুসন্ধান কর, নিজের মাঝেই তাঁকে পাবে।[৩৬]

প্লেরোমা আত্মার একটা মানচিত্র তুলে ধরেছে। কোথায় খুঁজতে হবে তা নসটিকের জানা থাকলে এমনকি এই অন্ধকার জগতেও স্বর্গীয় আলো অনুভব করা সম্ভব: সোফিয়া কিংবা *দেমিয়ার্জের* (Demiurge) আদি পতনের সময় স্বর্গীয় আলোকচ্ছটাও প্লেরোমা থেকে ছিটকে বেরিয়ে বস্তুর মাঝে আটকা পড়ে গিয়েছে। নসটিক তার আপন আত্মার মাঝে স্বর্গীয় ছটার সন্ধান পেতে পারে,

নিজের মাঝে অবস্থানরত স্বর্গীয় উপাদান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে, যা তাকে গন্তব্য দেখিয়ে দেবে।

নসটিকরা দেখিয়েছে যে, খৃস্টধর্মে নবদীক্ষিতদের অনেকেই ইহুদিবাদ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণায় সন্তুষ্ট ছিল না। তারা একজন দয়াময় উপাস্যের সৃষ্টি 'ভালো' হিসাবে পায়নি। একই ধরনের দ্বৈতবাদ এবং স্থানচ্যুতি মারসিয়নের (১০০-১৬৫) মতবাদকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। রোমে প্রতিদ্বন্দ্বী গির্জা প্রতিষ্ঠা করে প্রচুর অনুসারী পেয়েছিলেন মারসিয়ন। জেসাস বলেছিলেন, একটি ভালো গাছ ভালো ফলের জন্ম দেয়:[৩৭] পৃথিবী যেখানে মন্দ আর বেদনায় স্পষ্টভাবে পরিপূর্ণ সেখানে একজন ভালো ঈশ্বরের সৃষ্টি হয় কী করে? ইহুদি ধর্মগ্রন্থও মারসিয়নকে আতঙ্কিত করেছিল, যেখানে ন্যায়বিচারের উন্মাদনায় গোটা একটা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্নকারী রুক্ষ কঠোর ঈশ্বরের বর্ণনা রয়েছে। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে 'যুদ্ধের জন্যে উদগ্রীব' ইহুদি-ঈশ্বরই 'তাঁর কর্মকাণ্ডে অস্থির এবং স্ববিরোধী'[৩৮] পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জেসাস দেখিয়েছেন যে, আরেকজন ঈশ্বর ছিলেন ইহুদি ধর্মগ্রন্থে যাঁর কথা কখনও উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয় এই ঈশ্বর 'প্রসণ্ন, কোমল আর স্রেফ ভালো এবং অনন্যসাধারণ।'[৩৯] তিনি পৃথিবীর 'বিচারক সম' স্রষ্টার চেয়ে সম্পূর্ণই ভিন্ন। এই পৃথিবী যেহেতু তাঁর সৃষ্টি নয়, সুতরাং আমাদের উচিত তাঁকে ত্যাগ করা, কেননা এটা সেই দয়াময় উপাস্য সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানাতে পারে না; আমাদের 'ওল্ড' টেস্টামেন্ট প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ, কেবল জেসাসের চেতনা বহনকারী নিউ টেস্টামেন্টের পুস্তকগুলোর দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। মারসিয়নের শিক্ষার জনপ্রিয়তা দেখায় তিনি এক সাধারণ উদ্বেগের জবাব যুগিয়েছিলেন। এক সময় এমনও মনে হয়েছিল যে তিনি বুঝি ভিন্ন চার্চের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। ক্রিশ্চানদের অভিজ্ঞতার এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হাত দিয়েছিলেন তিনি; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ক্রিশ্চানরা বস্তুজগতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করেছে, এবং এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক আছে যারা জানে না হিব্রু ঈশ্বর-এর কী অর্থ করা যায়।

উত্তর আফ্রিকার ধর্মতাত্ত্বিক তার্তুলিয়ান (১৬০-২২০) অবশ্য দেখিয়েছিলেন যে মারসিয়নের 'ভালো' ঈশ্বরের সঙ্গে বাইবেলের ঈশ্বরের চেয়ে বরং গ্রিক দর্শনের ঈশ্বরের মিল বেশি। এই অটল উপাস্য যার সঙ্গে ত্রুটিযুক্ত এই জগতের কোনও সম্পর্ক নেই, জেসাস ক্রাইস্টের ইহুদি ঈশ্বরের চেয়ে বর্ণিত অটল চালকের (Unmoved Mover)-এর অনেক কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, গ্রিকো-রোমান বিশ্বের অনেকেই বাইবেলিয় ঈশ্বরকে ভ্রান্তিময়, হিংস্র উপাস্য হিসাবে দেখেছে, যাঁর উপাসনা প্রাপ্তির যোগ্যতা নেই। ১৭৮ সালের দিকে পৌত্তলিক দার্শনিক সেলসাস ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর সম্পর্কে

AMARBOI.COM

সংকীর্ণ আঞ্চলিক ধারণা পোষণ করার অভিযোগ এনেছিলেন। ক্রিশ্চানদের নিজস্ব বিশেষ প্রত্যাদেশের দাবি করার ব্যাপারটা তাঁকে হতবাক করেছিল: ঈশ্বর সকল মানুষের কাছেই সুলভ অথচ ক্রিশ্চানরা ছোট ছোট দলে জড়ো হয়ে ঘোষণা দেয়: ঈশ্বর এমনকি কেবল আমাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্যে গোটা জগৎ, স্বর্গের সঞ্চালন পরিত্যাগ করেছেন, অগ্রাহ্য করেছেন বিশাল পৃথিবীকে।'[৪০] রোমান কর্তৃপক্ষের হাতে নির্যাতিত হওয়ার সময় ক্রিশ্চানদের ধারণা রোমানদের বিশ্বাসের প্রতি ব্যাপক আক্রমণসূচক ছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে 'নাস্তিক্যবাদের' অভিযোগ আনা হয়েছিল। প্রচলিত দেবতাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্রিশ্চানরা রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে আনবে এবং নাজুক শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করবে ভেবে মানুষ শঙ্কিত হয়েছিল। খৃস্টধর্মকে সভ্যতার সাফল্যকে অগ্রাহ্যকারী এক বর্বর বিশ্বাস মনে হয়েছিল।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ নাগাদ অবশ্য সত্যিকার অর্থে সংস্কৃত কিছু পৌত্তলিক খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিতে শুরু করে। তারা গ্রিকো-রোমান আদর্শের সঙ্গে বাইবেলের সেমেটিক ঈশ্বরকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এদের মাঝে প্রথম ছিলেন ক্লিমেন্ট অভ আলেকজান্দ্রিয়া (১৫০-২১৫)। তিনি হয়তো ধর্মান্তরের আগে এথেন্সে দর্শন পাঠ করেছিলেন। ইয়াহওয়েহ্ ও গ্রিক দার্শনিকদের ঈশ্বর যে একই, এব্যাপারে ক্লিমেন্টের মনে কোনও রকম সন্দেহ বা সংশয় ছিল না: প্লেটোকে তিনি অ্যাটিক মোজেস বলেছেন। তবু জেসাস ও সেইন্ট পল উভয়েই হয়তো তাঁর ধর্মতত্ত্বে অধিক মানতেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের ঈশ্বরের মতো ক্লিমেন্টের ঈশ্বর তাঁর *অ্যাপাথিয়া* দিয়ে বৈশিষ্ট্যায়িত হয়েছেন: তিনি সম্পূর্ণ আবেগ কষ্টভোগ বা পরিবর্তনে অক্ষম। স্বয়ং ঈশ্বরের স্থিরতা ও নিস্পৃহতার অনুকরণ করার মাধ্যমে ক্রিশ্চানরা স্বর্গীয় জীবনে অংশ নিতে পারে। ক্লিমেন্ট জীবন যাপনের একটা নিয়ম প্রণয়ন করেছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে যা র‍্যাবাইদের প্রণীত আচরণবিধির অনুরূপ, পার্থক্য একটাই স্টয়িক আদর্শের সঙ্গে এর মিল ছিল অনেক বেশি। একজন ক্রিশ্চানকে জীবনের সব পর্যায়ে ঈশ্বরের অচঞ্চলতার অনুকরণ করতে হবে: তাকে অবশ্যই ঠিক হয়ে বসতে হবে, শান্তভাবে কথা বলতে হবে, শরীর কাঁপানো অট্টহাসি থেকে বিরত থাকতে হবে, এমনকি ঢেঁকুরও তুলতে হবে ধীরে। শান্ত থাকার এই অধ্যাবসায়ী চর্চার ভেতর দিয়ে ক্রিশ্চানরা অন্তর্গত বিপুল শান্তি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠবে, যা আসলে তাদের মাঝে খোদিত ঈশ্বরেরই ইমেজ। ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে কোনও দূরত্ব নেই। ক্রিশ্চানরা একবার স্বর্গীয় জগতের উপযোগি হয়ে উঠলে তারা দেখবে এক স্বর্গীয় সঙ্গী আমাদের সঙ্গে একই ঘরে বাস করছে, টেবিলে বসছে, আমাদের জীবনের সকল নৈতিক প্রায়াসে অংশ নিচ্ছে।[৪১]

AMARBOI.COM

তারপরেও ক্লিমেন্ট বিশ্বাস করতেন জেসাসই ঈশ্বর ছিলেন। 'জীবিত ঈশ্বর, যিনি কষ্ট সয়েছেন এবং উপাসিত হচ্ছেন।'[৪২] তিনিই 'তাদের পা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিয়েছিলেন,' তিনি ছিলেন 'বিশ্বজগতের প্রভু ও নিরহঙ্কার ঈশ্বর"[৪৩] ক্রিশ্চানরা ক্রাইস্টের অনুকরণ করলে তারাও স্বর্গীয়, অপাপবিদ্ধ ও যন্ত্রণাবোধহীন উপাস্যে পরিণত হবে। প্রকৃতই ক্রাইস্ট স্বর্গীয় *লোগোস* ছিলেন যিনি মানব রূপ গ্রহণ করেছেন 'যাতে তোমরা একজন মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরে পরিণত হওয়ার উপায় শিখতে পার।'[৪৪] পশ্চিমে বিশপ অভ লিয়ন্স ইরেনিয়াস (১৩০-২০০) একই ধরনের মতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। জেসাস ছিলেন স্বর্গীয় কারণ *লোগোসের* অবতার। তিনি মানব রূপ নেওয়ার পর মানুষের উন্নতির প্রত্যেকটা স্তরকে পবিত্র করেছেন এবং ক্রিশ্চানদের জন্যে আদর্শে পরিণত হয়েছেন। একজন অভিনেতা যেভাবে তাঁর অভিনীত চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করা হয়, তাদেরও ঠিক সেভাবে তাঁর অনুকরণ করতে হবে; তাহলেই তাদের মানবীয় সম্ভাবনা পূর্ণতা পাবে।[৪৫] ক্লিমেন্ট এবং ইবেনিয়াস তাঁদের নিজস্ব সময় ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে ইহুদি ঈশ্বরকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলেন। যদিও পয়গম্বরদের ঈশ্বরের–যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর করুণরস (Pathos) এবং আক্রম্যতা (Vulnerahility)–সঙ্গে তেমন মিল ছিল না, তবু ক্লিমেন্টের *অ্যাপ্যাথিয়া* মতবাদ ঈশ্বর সম্পর্কে ক্রিশ্চানদের ধারণার মৌল বিষয়ে পরিণত হবে। গ্রিক বিশ্বে আবেগ ও পরিবর্তনের চক্র হতে উর্ধ্বে উঠে অতিমানবীয় স্থৈর্যের আকাঙ্ক্ষা করেছে মানুষ। অন্তর্গত বৈপরীত্য সত্ত্বেও এই আদর্শ টিকে গেছে।

ক্লিমেন্টের ধর্মতত্ত্ব জটিল প্রশ্নের জবাব দেয়নি। একজন সাধারণ মানুষ কী করে *লগোস* বা স্বর্গীয় কারণ হয়ে থাকতে পারে? জেসাস স্বর্গীয় ছিলেন বলে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে? লগোস ও 'ঈশ্বর পুত্র' কী একই আর হেলেনিক বিশ্বের এই ইহুদি উপাধি কী অর্থ প্রকাশ করেছে? একজন যন্ত্রণাবোধহীন ঈশ্বর কী করে জেসাসের মাঝে কষ্ট ভোগ করতে পারেন? ক্রিশ্চানরা কীভাবে বিশ্বাস করে যে তিনি স্বর্গীয় সত্তা ছিলেন, আবার একই সময়ে জোর দিয়ে বলে যে ঈশ্বর মাত্র *একজন?* তৃতীয় শতাব্দীতে ক্রিশ্চানরা এসব প্রশ্নের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে। শতাব্দীর প্রথম বছরগুলোয় রোমে সাবেলিয়াস নামে প্রায় অখ্যাত এক ব্যক্তি মত প্রকাশ করেন যে, বাইবেলিয় পরিভাষার 'পিতা', 'পুত্র' এবং 'আত্মাকে' নাটকের চরিত্র রূপায়নের জন্যে অভিনেতাদের মুখোশ (*পারসোনা*)-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অভিনেতারা নাটকীয় চরিত্র গ্রহণ ও তাদের কণ্ঠস্বর দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মুখোশের আশ্রয় নেয়। সুতরাং একক ঈশ্বর এভাবেই জগতের ব্যাপারে বিভিন্ন *পারসোনা* গ্রহণ করেছিলেন। সাবেলিয়াস কিছু অনুসারী আকৃষ্ট করেছিলেন বটে কিন্তু

AMARBOI.COM

অধিকাংশ ক্রিশ্চান তাঁর তত্ত্বে বিষন্ন সাড়া বোধ করেছেঃ এখানে বোঝানো হয়েছে যন্ত্রণাবোধের অতীত ঈশ্বর পুত্রের ভূমিকা পালনের সময় কোনও ভাবে কষ্ট সয়েছেন। এ ধারণা একেবারে অগ্রহণযোগ্য বলে আবিষ্কার করেছে তারা। কিন্তু তারপরেও (২৬০ থেকে ২৭২) পল অভ সামোসাতা বিশপ অভ অ্যান্টিওক পর্যন্ত যখন বললেন যে জেসাস একজন সামান্য মানুষ ছিলেন যাঁর মাঝে মন্দিরে থাকার মতো ঈশ্বরের বাণী এবং প্রজ্ঞার বাস ছিল—একেও একই রকম আন-অর্থডক্স বিবেচনা করা হলো। ২৬৪তে অ্যান্টিওকের এক সিনদে পলের ধর্মতত্ত্বের নিন্দা করা হয়েছিল, যদিও রানি জেনোরিয়া অভ পালমিরার সমর্থন নিয়ে তিনি তাঁর পদ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। জেসাস স্বর্গীয় ছিলেন, ক্রিশ্চানদের এই বিশ্বাসকে একই রকম জোরাল ঈশ্বর মাত্র একজন বিশ্বাসের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা বেশ কঠিন হয়ে উঠছিল।

২০২ সালে বিশপ অভ জেরুজালেমের সেবায় একজন যাজক হতে ক্লিমেন্ট আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করে কাতেসেতিকাল শিক্ষালয়ে গেলে তাঁরই এক মেধাবী ছাত্র তরুণ অরিগেন তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক বিশ বছর। তরুণ অরিগেন প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন যে শাহাদাৎ বরণই স্বর্গে যাবার উপায়। চার বছর আগে তাঁর বাবা লেনিদেস (Leonedes) অ্যারিনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন, অরিগেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। অবশ্য পোশাক লুকিয়ে রেখে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন তাঁর মা। ক্রিশ্চান জীবনের অর্থ জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, এই বিশ্বাস নিয়ে শুরু করেছিলেন অরিগেন; কিন্তু পরে এই অবস্থান বদল করে ক্রিশ্চান প্লেটোনিজমের একটা রূপ খাঁড়া করেন তিনি। মাঝে এক অনতিক্রম্য দূরত্ব দেখার বদলে কেবল শাহাদাৎ বরণের মতো চরম স্থানচ্যুতি দিয়ে মানুষ ও ঈশ্বরকে সম্পর্কিত করা সম্ভব। অরিগেন এমন এক ধর্মতত্ত্বের অবতারণা করেন যেখানে বিশ্বজগতের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারাবাহিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিল আলো, আশাবাদ ও আনন্দের। একজন ক্রিশ্চান পর্যায়ক্রমে সত্তার বা অস্তিত্বের ধাপ বেয়ে তাঁর স্বাভাবিক উপাদান ও গন্তব্য ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারে।

প্লেটোনিস্ট হিসাবে ঈশ্বর ও আত্মার মাঝে সম্পর্কের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন অরিগেনঃ স্বর্গ সম্পর্কে জ্ঞান মানুষের স্বাভাবিক। বিশেষ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একে আবার সজাগ ও জাগিয়ে তোলা যায়। সেমেটিক ঐশীগ্রন্থের সঙ্গে নিজ প্লেটোনিক দর্শনের সমন্বয়ের জন্যে বাইবেল পাঠের এক প্রতীকী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন অরিগেন। এভাবে মেরির গর্ভে ক্রাইস্টের ভার্জিন বার্থকে প্রাথমিকভাবে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যাবে না, বরং আত্মায় স্বর্গীয় প্রজ্ঞার জন্ম হিসাবে দেখতে হবে। নসটিকদের কিছু ধারণাও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। মূলত আধ্যাত্মিক জগতের সকল সত্তা স্বর্গীয় বাণী ও প্রজ্ঞায় লোগোস

নিজেকে প্রকাশকারী অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরেরই ধ্যান করেছিল। কিন্তু এই নিখুঁত ধ্যানে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্বর্গীয় জগৎ থেকে দেহে পতিত হয়, দেহ তাদের পতন থামিয়ে দেয়। অবশ্য সব আশা তিরোহিত হয়ে যায়নি। মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকবে এমন এক দীর্ঘ অবিরাম যাত্রায় আত্মা আবার ঈশ্বরের কাছে যেতে পারবে। এটা ক্রমশঃ দেহের শৃঙ্খল ছাড়িয়ে লিঙ্গভেদের উর্ধ্বে উঠে খাঁটি আত্মায় পরিণত হবে। ধ্যান (*থিয়োরিয়া*)-এর মাধ্যমে আত্মা ঈশ্বরের জ্ঞানে (*নসিস*) সমৃদ্ধ হবে, যা একে পরিবর্তন করে চলবে যতক্ষণ না, প্লেটো স্বয়ং যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, নিজেই স্বর্গীয় রূপ নেয়। ঈশ্বর গভীর রহস্যময়, আমাদের মানবীয় ভাষা বা ধারণা কোনওটাই তাঁকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু আত্মা যেহেতু ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশীদার; সুতরাং, ঈশ্বরকে বোঝার ক্ষমতা রয়েছে তার। লোগোসের ধ্যানমগ্ন হওয়া আমাদের স্বভাবজাত, কেননা সকল আধ্যাত্মিক সত্তা (*লোগিকোই*) আদিতে পরস্পরের সমান ছিল। যখন তাদের পতন ঘটে, কেবল জেসাস ক্রাইস্টের মনই স্বর্গীয় জগতে রয়ে গিয়ে পরম সন্তোষের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে ধ্যান করছিলেন এবং আমাদের নিজস্ব আত্মা ছিল তাঁরই আত্মার সমান। মানুষ জেসাসের ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস একটা স্তর বা পর্যায় মাত্র যা আমাদের যাত্রা পথে সাহায্য করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরকে সামনা সামনি দেখার পর তা দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠবে।

নবম শতাব্দীতে অরিগেনের কোনও কোনও ধারণাকে ধর্মদ্রোহী বলে নিন্দা জানাবে চার্চ। অরিগেন বা ক্লিমেন্ট কেউই বিশ্বাস করেননি যে, ঈশ্বর শূন্য হতে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যা পরে অর্থডক্স ক্রিশ্চান মতবাদে পরিণত হয়। জেসাসের অলৌকিতা ও মানুষের মুক্তি সম্পর্কিত অরিগেনের ধারণা স্পষ্টই পরবর্তীকালের ক্রিশ্চান শিক্ষার সঙ্গে যায় না: ক্রাইস্টের মৃত্যুর ফলে আমরা 'রক্ষা' পেয়েছি বলে বিশ্বাস করতেন না তিনি, বরং তাঁর বিশ্বাস ছিল আমরা আমাদের নিজস্ব শক্তিতেই ঈশ্বরের দিকে উত্থিত হব। আসল কথা হচ্ছে অরিগেন ও ক্লিমেন্ট তাঁদের ক্রিশ্চান-প্লেটোনিজম শিক্ষা দেওয়ার সময় কোনও আনুষ্ঠানিক মতবাদ *ছিল না।* ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন কিনা কিংবা মানুষ কীভাবে স্বর্গীয় হতে পারে নিশ্চিত করে জানত না কেউ। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর অস্থির ঘটনাপ্রবাহ এক যন্ত্রণাদায়ক সংগ্রামের পরেই কেবল অর্থডক্স বিশ্বাসের সংজ্ঞার পথে নিয়ে যাবে।

অরিগেন সম্ভবত তাঁর স্ব-নপুংসীকরণের জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন। গস্পেলে জেসাস বলেছেন, কেউ কেউ স্বর্গীয় রাজ্যের স্বার্থে নিজেদের পুরুষত্ব বিনষ্ট করেছে। একথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেছেন অরিগেন। প্রাচীন কালের শেষ পাদে পুরুষত্ব বিনষ্টকরণ বেশ চালু একটা ব্যাপার ছিল; অরিগেন

AMARBOI.COM

অবশ্য নিজের ওপর ছুরি চালিয়ে বসেননি, কিংবা তাঁর এ সিদ্ধান্তটি সেইন্ট জেরোমি (৪৪২-৪২০)-দের মতো কোনও কোনও পশ্চিমা ধর্মতাত্ত্বিকের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়া যৌনতার প্রতি কোনও বিকারপ্রসূত ঘৃণা থেকেও সৃষ্টি হয়নি। বৃটিশ পণ্ডিত পিটার ব্রাউন মত প্রকাশ করেছেন, এটা হয়তো তাঁর মানবীয় অবস্থার অনিশ্চয়তার মতবাদ তুলে ধরার প্রয়াস ছিল, যাকে আত্মা কর্তৃক অচিরেই ছাপিয়ে যাবার কথা। দৃশ্যত, ঈশ্বর যেহেতু নারী বা পুরুষ কোনওটাই নন, তাই স্বর্গীয়করণের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় লিঙ্গের মতো অসংখ্য উপাদান পেছনে ফেলে যেতে হবে। যে কালে লম্বা দাড়ি (প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের প্রতীক) দার্শনিকদের বৈশিষ্ট্য ছিল সে যুগে অরিগেনের মসৃণ গাল এবং উচ্চ কণ্ঠস্বর হয়তো বা চমকপ্রদ একটা দৃশ্য ছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ায় অরিগেনের পুরোনো শিক্ষক অমোনিয়াম সাক্কাসের কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন প্লটিনাস (২০৫-২৭০) এবং পরে ভারতে আসার সুযোগ পাওয়ার আশায় রোমান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ভারতে পড়াশোনা করতে উদগীব ছিলেন তিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অভিযানের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি ঘটে, অ্যান্টিওকে পালিয়ে যান প্লটিনাস। পরবর্তী সময়ে রোমে এক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। নিজের ব্যাপারে তেমন প্রচারমুখী ছিলেন না তিনি, এমনকি জন্মদিনও পালন করতেন না, তাই তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি খুব সামান্য। সেলসাসের মতো প্লটিনাসও খৃস্টধর্মকে সম্পূর্ণ আপত্তিকর বিশ্বাস বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু তারপরেও ঈশ্বরের তিনটি ধর্মেরই অসংখ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর দর্শনের একটু বিস্তৃত আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। প্লটিনাসকে একটা জলাধার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে: তিনি গ্রিক ধ্যান ধারণার ৮০০ বছরের মূল ধারা আত্মস্থ করে তাকে এমন এক রূপে প্রকাশ করেছেন যা আমাদের শতাব্দীর টি. এস. এলিয়ট এবং হেনরি বার্গসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরও প্রভাবিত করে গেছে। প্লেটোর ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্লটিনাস সত্তাকে উপলব্ধি করার একটা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু, মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজায় আগ্রহী ছিলেন না তিনি বা জীবনের ভৌত উৎসও ব্যাখ্যা করারও প্রয়াস পাননি। একটা বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যার জন্যে মহাশূন্যের দিকে তাকানোর বদলে প্লটিনাস অনুসারীদের নিজেদের মাঝে আশ্রয় নিতে বলেছেন এবং মননের গভীরে অনুসন্ধান চালানোর তাগিদ দিয়েছেন।

মানুষ একটা ব্যাপারে সচেতন যে তাদের বর্তমান অবস্থায় কোথাও গড়মিল আছে; নিজেকে নিয়ে বা অপরের বেলায় বেকায়দা অবস্থানে আছে বলে মনে হয় তাদের, অন্তস্থ প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগহীন এবং দিশাহারা। দ্বন্দ্ব ও সারল্যের ঘাটতি যেন আমাদের অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তা

AMARBOI.COM

সত্ত্বেও আমরা ক্রমাগত বহুমাত্রিক ঘটনাবলীকে একসূত্রে গাথতে চাইছি এবং সুশৃঙ্খল সমগ্রে পরিণত করতে চাইছি। আমরা যখন কোনও ব্যক্তির দিকে চোখ ফেরাই একটা পা, একটা হাত, তারপর আরেকটা হাত, মাথা, এভাবে দেখি না, বরং আপনাআপনি এসব উপাদানকে একজন পরিপূর্ণ মানুষের মাঝে সংগঠিত করি। একতার জন্যে এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের মানসিক কাজের ধারায় মৌলিক বিষয়। আমাদের অবশ্যই, প্লটিনাসের বিশ্বাস অনুযায়ী, বস্তুনিচয়ের মূলসুরের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সূত্র আবিষ্কারের জন্যে আত্মাকে অবশ্যই প্লেটোর পরামর্শ অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে হবে, পরিশুদ্ধতার একটা পর্যায় অতিক্রম করতে হবে এবং ধ্যানে (থিয়োরিয়া) মগ্ন হতে হবে, বিশ্বজগৎ ছাড়িয়ে, অনুভবের জগৎ পার হয়ে এমনকি বুদ্ধি বা মননের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে বস্তুর বা সত্তার অন্তস্থল দেখার জন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তবে এটা আমাদের বস্তুর কোনও সত্তা অভিমুখে উত্তরণ নয় বরং মনের গহীন গভীরে ডুব দেওয়া। একে বলা যায় অভ্যন্তরে আরোহন।

পরম সত্তা এক আদিম একক, প্লটিনাস যাকে দ্য ওয়ান বলেছেন। প্রতিটি বস্তু অস্তিত্বের জন্যে এই সক্ষম সত্তার কাছে ঋণী। দ্য ওয়ান যেহেতু নিজেই সরল, এর সম্পর্কে বলার কিছু নেই: এর অঙ্গ বা মূলসুর হতে সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্পন্ন এমন কিছু নেই যে সাধারণ বর্ণনা সম্ভবপর করে তুলবে। স্রেফ এটা *ছিল*। স্বভাবতই দ্য ওয়ান নামহীন। আমরা 'দ্য ওয়ান' সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা করতে চাইলে, ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্লটিনাস, 'সেক্ষেত্রে "নীরবতাতে"ই অনেক বেশি সত্যের সন্ধান মিলব।'[৪৬] এর অস্তিত্ব আছে, তাও বলতে পারব না আমরা, কেননা স্বত্তা স্বয়ং হওয়ায়, কোনও বস্তু নয়, বরং সকল বস্ত্র থেকে ভিন্ন।'[৪৭] প্রকৃতপক্ষেই, ব্যাখ্যা করেছেন প্লটিনাস, এটা 'সবকিছু, আবার কিছুই না, অস্তিত্বমান কোনও বস্তু হতে পারে না এটা, তারপরও এটাই সব।'[৪৮] আমরা দেখব, এই ধারণাটি ঈশ্বরের ইতিহাসে একটা স্থির সুরে পরিণত হবে।

কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি, তাই এই নীরবতা পূর্ণাঙ্গ সত্য হতে পারে না বলে যুক্তি দেখিয়েছেন প্লটিনাস। দ্য ওয়ান তাঁর দুর্ভেদ্য অস্পষ্টতার চাদরে আড়াল হয়ে থাকলে এটা সম্ভব হতো না। দ্য ওয়ান নিশ্চয়ই নিজেকে ছাড়িয়ে আমাদের মতো অপূর্ণ সত্তার কাছে নিজেকে বোধগম্য করে তুলতে আপন সারল্যের ঊর্ধ্বে উঠেছেন। এই স্বর্গীয় ঊর্ধ্বরোহণকে 'পরম আনন্দ' হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এরকম বলার কারণ, এটা খুঁতহীন মহত্ত্বের দিক দিয়ে 'আপনাকে ছাড়িয়ে যাওয়া': 'কোনও চাওয়া নেই, কোনও কিছুর ওপর অধিকার নেই, কোনও অভাব নেই, দ্য ওয়ান নিখুঁত এবং রূপকার্থে, তিনি ছাপিয়ে গেছেন আর এর প্রাচুর্যই নতুনের সৃষ্টি

AMARBOI.COM

করেছে।'[৪৯] এসবের মাঝে ব্যক্তিগত কিছুই ছিল না; প্লটিনাস দ্য ওয়ানকে ব্যক্তিত্বসহ সকল মানবীয় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চিন্তা করেছেন। চরম সরল এই 'উৎস' থেকে অস্তিত্বশীল সকল কিছুর ব্যাখ্যার করার জন্যে তিনি উৎসারণের প্রাচীন মিথের শরণাপন্ন হয়েছেন–এই প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করার লক্ষ্যে কিছু উপমার ব্যবহার করেছেন: এ যেন সূর্যের আলো বা আগুন থেকে বিকিরিত তাপের মতো, আপনি যত উত্তাপের কেন্দ্রের দিকে যাবেন ততই উত্তপ্ততর হয়ে ওঠে। প্লটিনাসের খুব প্রিয় একটা উপমা ছিল বৃত্তের কেন্দ্রের সঙ্গে দ্য ওয়ানের তুলনা, যাতে ভবিষ্যতের সকল সম্ভাব্য বৃত্তের সম্ভাবনা রয়েছে। জলাশয়ের পানিতে পাথর ফেললে সৃষ্টি হওয়া তরঙ্গের সঙ্গে মিল আছে এর। *এনুমা এলিশের* মতো মিথে উল্লিখিত উৎসারণের বিপরীতে–যেখানে দেবতাদের মতো জোড়া থেকে উদ্ভূত অপর জোড়া অধিকতর নিখুঁত এবং কার্যকর হয়ে ওঠে–প্লটিনাসের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল একেবারে উল্টো। নসটিকদের মিথের মতো কোনও বস্তু এর উৎস দ্য ওয়ান থেকে যত দূরে সরে আসবে, সেটা ততই দুর্বল হয়ে পড়বে।

দ্য ওয়ান থেকে বিকিরিত প্রথম দুটি উৎসারণকে স্বর্গীয় হিসাবে দেখেছেন প্লটিনাস, কেননা এগুলো ঈশ্বরকে জানতে ও ঈশ্বরের জীবনধারায় আমাদেরকে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলে। দ্য ওয়ানের সঙ্গে মিলে এগুলো এক স্বর্গীয় ত্রয়ী গড়ে তুলেছে যা ট্রিনিটির চূড়ান্ত ক্রিশ্চান সমাধানের মোটামুটিভাবে বেশ কাছাকাছি। প্লটিনাসের প্রকল্পের প্রথম উৎসারণ, মন প্লেটোর ধারণা জগতের অনুরূপ। দ্য ওয়ানের সারল্যকে বোধগম্য করেছে এটা; কিন্তু জ্ঞান এখানে সহজাত ও প্রত্যক্ষ। এটা গবেষণা ও যুক্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কষ্টকর উপায়ে অর্জিত নয়, বরং আমাদের অনুভূতি যেমন কোনও বস্তু সামগ্রীকে বুঝে নেয়, সেভাবে আত্মস্থ হয়েছে। আত্মা উৎসারিত হয় মন থেকে ঠিক যেমন মনের উৎসারণ দ্য ওয়ান থেকে। এটা পূর্ণাঙ্গতার চেয়ে খানিকটা দূরবর্তী, এই পর্যায়ে জ্ঞান কেবল অসংলগ্নভাবে সংগ্রহ করা যাবে, ফলে তাতে পরম সারল্য ও সামঞ্জস্যতার ঘাটতি হয়। আত্মা আমাদের চেনা বাস্তবতার সঙ্গে মানানসই: বাকি সমস্ত ভৌত ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের উৎসারণ ঘটে আত্মা থেকে যা আমাদের জগতকে এর যেটুকু ঐক্য ও সামঞ্জস্যতা আছে তার যোগান দেয়। এখানে আবার একটা বিষয় জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্লটিনাস দ্য ওয়ান, মন ও আত্মার ত্রয়ীকে 'মহাশূন্যে' ঈশ্বর হিসাবে কল্পনা করেননি। স্বর্গ সকল অস্তিত্বের সম্মিলন। ঈশ্বর সর্বেসর্বা এবং নিম্নস্তরের সত্তা ততক্ষণই টিকে থাকে যতক্ষণ তারা দ্য ওয়ানের পরম সত্তায় অংশ নেয়।[৫০]

দ্য ওয়ানের দিকে প্রত্যাবর্তনের এক সমরূপ চলিষ্ণুতায় বহির্মুখী উৎসারণ রহিত হয়। আমাদের মনের কার্যধারা হতে আমরা যেমন জানি যে

দ্বন্দ্ব ও বহুমাত্রিকতা থেকে অসন্তোষের কারণে সকল সত্তাই ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা করে আবার দ্য ওয়ানের কাছে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু এটা বাহ্যিক সত্তার দিকে আরোহণ নয়, বরং মনের গভীরে অভ্যন্তরীণ অবতরণ। আত্মাকে অবশ্যই হৃত সারল্য ফিরে পেতে হবে, ফিরে যেতে হবে তার প্রকৃত সত্তায়। যেহেতু সকল আত্মাই একই সত্তা দ্বারা সজীব হয়েছে, সুতরাং মানুষকে একজন শিল্পীকে ঘিরে থাকা কোরাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বিশেষ কোনও ব্যক্তির সুরভঙ্গে অসাম্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, কিন্তু সবাই পরিচালকের দিকে মনোনিবেশ করলে গোটা সমাজ লাভবান হবে, কেননা, 'ওরা তখন যেভাবে গান গাওয়া উচিত সেভাবেই গাইবে এবং প্রকৃতই তার সঙ্গে থাকবে।'[৫১]

দ্য ওয়ান কঠোরভাবে নৈর্ব্যক্তিক; এর কোনও লিঙ্গ পরিচয় নেই এবং আমাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। একইভাবে ব্যাকরণগতভাবে মন পুরুষবাচক এবং আত্মা (Psyche) নারীবাচক শব্দ, এখানে লিঙ্গের ভারসাম্য ও সমতা সম্পর্কিত পৌত্তলিকদের প্রাচীন দর্শন রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্লটিনাসের আগ্রহ প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে। বাইবেলিয় ঈশ্বরের বিপরীতে, এটা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাড়ির পথ দেখাতে আসে না, আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে না, কিংবা ভালোবাসে না, কিংবা নিজেকে আমাদের সামনে প্রকাশ করে না। নিজ সম্পর্কে ছাড়া অন্য কিছুর জ্ঞান নেই এর।[৫২] তারপরেও মানব আত্মা কখনও কখনও দ্য ওয়ানের উপলব্ধিতে আনন্দে উদ্বেলিত হয়। প্লটিনাসের দর্শন যৌক্তিক প্রক্রিয়া নয় বরং এক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান ছিল:

> এখানে আমাদের, আমাদের দিক থেকে, সবকিছু একপাশে সরিয়ে রেখে কেবল এর দিকে মনোনিবেশ করে আমাদের সকল বন্ধন ছেড়ে তাতেই পরিণত হতে হবে, এখান থেকে পলায়নের জন্যে অবশ্যই আমাদের তাড়াহুড়ো করতে হবে, আমাদের সকল সত্তা দিয়ে ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করার জন্যে আমাদের পার্থিব বন্ধন নিয়ে অধৈর্য হতে হবে, যেন আমাদের কোনও অংশই ঈশ্বরের থেকে সরে না থাকে। সেখানে হয়তো আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাব এবং বিধি যেমন প্রকাশ করেছে যেভাবে আমাদের দেখব: বুদ্ধির আলোয় পরিপূর্ণ বা স্বয়ং আলোয়, খাঁটি, প্রফুল্ল, বায়বীয়, জাত-প্রকৃত অর্থে, সত্তা—প্রকৃত নামে দেবতা হিসাবে।[৫৩]

এই ঈশ্বর কোনও অজ্ঞাত বস্তু নন, বরং আমাদের সর্বোত্তম সত্তা, 'জানার বা উপলব্ধির মাধ্যমে আসে না, যা কিনা বুদ্ধিমান সত্তা আবিষ্কার করে (মন বা

AMARBOI.COM

*nons*-এ) বরং এটা উপস্থিতি (*Parousia*), যা সকল জ্ঞানকে অতিক্রম করে।[৫৪]

প্লেটোনিয় ধারণার প্রভাব বলয়ে খৃস্টধর্ম ভিন্ন অবস্থান তৈরি করে নিচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে ক্রিশ্চান চিন্তাবিদরা যখনই নিজস্ব ধর্মীয় অনুভূতি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন, স্বভাবতই তারা প্লটিনাস ও তাঁর পৌত্তলিক অনুসারীদের নিওপ্লেটোনিক দর্শনের আশ্রয় নিয়েছেন। এক নৈর্ব্যক্তিক, মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অতীত, মানুষের জন্যে স্বাভাবিক আলোকপ্রাপ্তির এই ধারণা ভারতের হিন্দু-বুদ্ধ মতাদর্শের অনেক বেশি কাছাকাছি, যেখানে পড়াশোনায় গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন প্লটিনাস। সুতরাং বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও পরম সত্তা সম্পর্কিত দর্শনের ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদী ও অন্যান্য ধারণার গভীর সাদৃশ্য ছিল। লোকে পরম সত্তা সম্পর্কে ধ্যান করার সময় একই ধরনের ধারণা বা উপলব্ধি বোধ করে। কোনও এক সত্তার উপস্থিতিতে আনন্দ ও আতঙ্কের বোধ–যাকে নির্বাণ, দ্য ওয়ান, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর বলা হয়–মনের একটা বিশেষ অবস্থা এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যা খুবই স্বাভাবিক, মানুষের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

ক্রিশ্চানদের কেউ কেউ গ্রিক বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। অন্যরা এনিয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি। ১৭০ সাল নাগাদ এক প্রবল নির্যাতনকালে মন্তানুস নামে এক নতুন পয়গম্বর আধুনিক তুরস্কের ফ্রাইগিয়ায় আবির্ভূত হয়ে নিজেকে স্বর্গীয় অবতার দাবি করেন: 'আমিই প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানুষের মাঝে যিনি অবতরণ করেছেন,' চেঁচিয়ে বলতেন তিনি। 'আমি পিতা, পুত্র ও প্যারাক্লিট।' তাঁর সহচর প্রিসিলা ও ম্যাক্সিমিলাও একই রকম দাবি করেছিলেন।[৫৫] মন্তানিজম প্রবল প্রলয়বাদী বিশ্বাস ছিল যা ঈশ্বরের এক ভীতিজনক চিত্র এঁকেছিল। এর অনুসারীরা শুধু যে ইহজাগতিক জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য ছিল তা নয় বরং তাদের এও বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ হচ্ছে শাহাদাৎ বরণ। বিশ্বাসের স্বার্থে তাদের যন্ত্রণাময় মৃত্যু ক্রাইস্টের আগমন তরান্বিত করবে: শহীদরা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঈশ্বরের সৈনিক। ভয়ঙ্কর এই বিশ্বাস ক্রিশ্চানদের চেতনায় এক সুপ্ত চরমপন্থাকে উস্কে দিয়েছিল: ফ্রাইগিয়া, সিরিয়া ও গলে দাবানলের মতো মন্তানিজমের বিস্তার ঘটে। উত্তর আফ্রিকায় যেখানকার জনগণ মানুষের বলী দাবি করে, এমন দেবতায় অভ্যস্থ ছিল বলে সেখানে তা বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ভূমিষ্ঠ প্রথম শিশুর উৎসর্গ দাবিকারী তাদের বাআলের কাল্ট মাত্র দ্বিতীয় শতাব্দীতে সম্রাট কর্তৃক রদ হয়েছিল। অচিরেই এই বিদ্রোহী বিশ্বাসটি (ক্রিড) লাতিন চার্চের নেতৃস্থানীয় ধর্মতাত্ত্বিক তারতুলিয়ানের মতো ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রাচ্যে ক্লিমেন্ট ও অরিগেন এক প্রশান্ত, প্রফুল্ল অবস্থায় ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তনের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু পশ্চিমের চার্চ ঈশ্বর

AMARBOI.COM

মুক্তির শর্ত হিসাবে ভয়ঙ্কর মৃত্যু দাবি করে বসলেন। এই পর্যায়ে পশ্চিমে ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় খৃস্টধর্মকে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হচ্ছিল আর একেবারে গোড়া থেকে চরমপন্থা ও জরবদস্তির একটা প্রবণতা কাজ করছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচ্যে খৃস্টধর্ম দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। ২৩৫ সাল নাগাদ রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মে পরিণত হয়েছিল তা। ক্রিশ্চানরা এ সময় একটি মাত্র বিশ্বাসের এমন এক মহান চার্চের কথা বলত যেখানে চরমপন্থা বা বাড়াবাড়ির স্থান নেই। এই অর্থডক্স ধর্মতাত্ত্বিকরা নসটিক, মারসিয়নাইট, মন্তানিস্টদের নৈরাশ্যবাদী দর্শন বাতিল ঘোষণা করে মধ্যপন্থা বেছে নেন। ধর্মবিশ্বাসে রহস্যময় কাল্ট ও কঠিন সন্ন্যাসব্রতের জটিলতা পরিহার গ্রিকো-রোমান বিশ্বের বোধগম্য পথে ধর্ম বিশ্বাস গড়ে তুলতে সক্ষম উচ্চ বুদ্ধিমত্তার লোকজনের কাছে আবেদন রাখতে শুরু করেছিল এটা। নতুন এই ধর্ম নারীদেরও আগ্রহী করে তোলে: এর ঐশীগ্রন্থগুলো শিখিয়েছে যে স্রষ্টা নারী বা পুরুষ নন এবং জোর দিয়ে বলে ক্রাইস্ট যেভাবে চার্চের আকাঙ্ক্ষা করেন ঠিক তেমনিভাবে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের প্রত্যাশায় থাকে। ইহুদিবাদ এককালে যেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ধর্ম হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি সব সুবিধার অধিকারী হয়ে উঠেছিল খৃস্টধর্ম, তদুপরি খৎনা ও ভিনদেশী 'আইনে'র সমস্যা ছিল না এর। চার্চগুলোর প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা ও পরস্পরের প্রতি ক্রিশ্চানদের দরদী ব্যবহারে পৌত্তলিকেরা বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়েছিল। নির্যাতন থেকে রক্ষা আর ভেতরের অসন্তোষ থেকে বাঁচার দীর্ঘ সংগ্রামকালে চার্চ এমন এক দক্ষ সংগঠন গড়ে তুলেছিল যা প্রায় একটা সাম্রাজ্যের অনুরূপ: এটা বহুগোত্রীয় ক্যাথলিক, আন্তর্জাতিক, সর্বজনীন এবং দক্ষ আমলাদের হাতে পরিচালিত হচ্ছিল।

AMARBOI.COM

এতে করে চার্চ স্থিতিশীলতা বজায় রাখার একটা শক্তিতে পরিণত হয়েছিল যা সম্রাট কন্সতান্তাইনের পছন্দ হয়েছিল। ৩১২ সালের মিলভিয়ান যুদ্ধের পর খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবং এর পরের বছর খৃস্টধর্মকে বৈধতা দেন। এর ফলে ক্রিশ্চানদের সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার অধিকার জন্মে, স্বাধীনভাবে উপাসনা করার সুযোগ পায় তারা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠে। যদিও আরও দুশো বছর ধরে পৌত্তলিকতার বিকাশ ঘটেছিল কিন্তু খৃস্টধর্মই সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। বস্তুগত অগ্রগতির স্বার্থে চার্চে যাতায়াতকারীরা ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। সহিষ্ণুতার আবেদন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নির্যাতিত গোষ্ঠী এই চার্চ অচিরেই নিজস্ব আইন ও বিধি বিধানের প্রতি আনুগত্য দাবি করে বসবে। খৃস্টধর্মের বিজয়ের কারণগুলো অস্পষ্ট; রোমান সম্রাটের সমর্থন ছাড়া এটা কিছুতেই সাফল্য অর্জন করতে পারত না, যদিও অনিবার্যভাবে তা নিজস্ব সমস্যার জন্ম

দিয়েছিল। পুরোপুরি প্রতিকূলতার ধর্ম বলে সমৃদ্ধির কালে কখনওই এটা তুঙ্গ অবস্থায় থাকতে পারেনি। যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান জরুরি হয়ে পড়েছিল, তার অন্যতম ছিল ঈশ্বরের মতবাদ: কন্সতান্তাইন চার্চে শান্তি স্থাপন করার পরপরই ভেতর থেকে একটা নতুন বিপদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল যা খৃস্টধর্মকে তিক্ত বিরোধে লিপ্ত দুটো শিবিরে ভাগ করে দেয়।

AMARBOI.COM

# ৪.

# ট্রিনিটি: ক্রিশ্চান ঈশ্বর

মোটামুটিভাবে ৩২০ সাল নাগাদ এক প্রবল ধর্মতত্ত্বীয় আবেগ মিশর, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরের দেশসমূহে জোরাল হয়ে উঠেছিল। নাবিক ও পর্যটকরা জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ভাষ্য গাইতে শুরু করেছিল যেখানে দাবি করা হয়েছে যে পিতা অগম্য এবং অদ্বিতীয় প্রকৃত ঈশ্বর, কিন্তু পুত্র চিরন্তনও নন এবং নন অজাতও; যেহেতু তিনি পিতার কাছ থেকে প্রাণ ও অস্তিত্ব লাভ করেছেন। স্নানাগারের একজন পরিচারককে 'পুত্র এসেছিলেন শূন্যতা থেকে' জোরের সাথে একথা বলে স্নানার্থীদের হয়রানি করার কথা শুনতে পাই, জনৈক মানিচেঞ্জার, বিনিময় হার জানতে চাওয়া হলে জবাব দেওয়ার আগে সৃষ্ট জগৎ ও অসৃষ্ট ঈশ্বরের পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখে; আরেকজন রুটিপ্রস্তুতকারী ক্রেতাকে জানায় যে, পিতা তাঁর পুত্রের চেয়ে শ্রেয়তর। আজকের দিনে লোকে যেভাবে ফুটবল নিয়ে আলাপ করে ঠিক সেই একই রকম উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এইসব বিমূর্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠেছিল লোকে।[১] আলেকজান্দ্রিয়ার আরিয়াস নামের ক্যারিশম্যাটিক, সুদর্শন প্রেসবিটার এই বিতর্ককে আরও উস্কে দিয়েছিলেন। আকর্ষণীয় কোমল কণ্ঠের অধিকারী ছিলে আরিয়াস, চেহারায় দারুণ নির্বিকার ছাপ। বিশপ আলেকজান্দারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি, বিশপ উপেক্ষাও করতে পারেননি আবার জবাব দেওয়াও হয়ে উঠেছিল তাঁর জন্যে কঠিন: পিতা ঈশ্বরের মতো একইভাবে জেসাস ক্রাইস্ট ঈশ্বর ছিলেন কীভাবে? আরিয়াস ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতা অস্বীকার করছিলেন না; প্রকৃতপক্ষে জেসাসকে তিনি 'শক্তিশালী ঈশ্বর' এবং 'পূর্ণ ঈশ্বর'[২] বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল জেসাসকে প্রকৃতিগতভাবে স্বর্গীয় ভাবাটা ব্লাসফেমাস হবে: জেসাস স্পষ্ট করে



AMARBOI.COM

বলেছেন যে, পিতা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আলেকজান্দার এবং তাঁর তরুণ সহকারী আথানাসিয়াস অচিরেই বুঝতে পারলেন যে ব্যাপারটা আর সামান্য ধর্মতাত্ত্বিক শোভনতায় সীমিত নেই। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলছিলেন আরিয়াস। এদিকে দক্ষ প্রচারবিদ আরিয়াস আপন ধারণায় সুর দিলেন এবং অচিরেই বিশপদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও এসব বিশপদের মতোই প্রবল উৎসাহে বিতর্কে লিপ্ত হলো।

বিতর্ক এতই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে সম্রাট কন্সতন্তাইন বিষয়টি সুরাহা করার উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং আধুনিক তুরস্কের নাইসিয়াতে এক সিনদ আহ্বান করেন। বর্তমানে আরিয়াসের নাম ধর্মোদ্রোহের প্রতিশব্দ, কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সময় কোনও আনুষ্ঠানিক অর্থডক্স অবস্থান ছিল না তাঁর এবং কেন বা কীভাবে আরিয়াসের ভুল হয়েছে নিশ্চিত করে জানার উপায় ছিল না। তাঁর দাবিতে নতুন কিছু ছিল না: উভয় পক্ষের কাছে অতি সম্মানিত অরিগেনও একই ধরণের মতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু অরিগেনের আমলের চেয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, মানুষ প্লেটোর ঈশ্বরকে বাইবেলের ঈশ্বরের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে সমন্বিত করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না। উদাহরণস্বরূপ, আরিয়াস, আলেকজান্দার এবং আথানাসিয়াস এমন একটা মতবাদে বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছিলেন যা যেকোনও প্লেটোবাদীকে চমকে দিত: তাঁরা ঐশীগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে মনে করেছেন, ঈশ্বর শূন্য হতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আসলে, জেনেসিস এই দাবি করেনি। প্রিস্টলি লেখকগণ বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন যে, ঈশ্বর আদিম বিশৃঙ্খলা থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর একেবারে শূন্য হতে গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, এই ধারণাটি ছিল একেবারে নতুন। গ্রিক মননে এটা ছিল একেবারে আনকোরা, ক্লিমেন্ট ও অরিগেনের মতো ধর্মবিদরা যারা প্লেটোর উৎসারণ প্রকল্প বিশ্বাস করে গেছেন, তারা কখনও এমন কথা বলেননি। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ ক্রিশ্চানরা জগৎ উৎপত্তিগতভাবে নাজুক, অপূর্ণ এবং এক বিশাল গহ্বর দ্বারা ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন থাকার নসটিকদের ধারণা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। শূন্য হতে সৃষ্টির এই নতুন মতবাদ মহাবিশ্ব সৃষ্টিকে অপরিহার্যভাবে ভঙ্গুর আর অস্তিত্বের জন্যে পুরোপুরি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীলতার উপর জোর দেয়। গ্রিক চিন্তাধারার মতো ঈশ্বর ও মানুষ আর নিকটবর্তী থাকল না। এক বিরাট শূন্যতা থেকে ঈশ্বর প্রতিটি সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন, যেকোনও মুহূর্তে তিনি তাঁর হেফাযতের হাত তুলে নিতে পারেন। ঈশ্বরের নিকট হতে সত্তার চিরন্তন উৎসারণের বিশাল ধারা আর রইল না: পৃথিবীতে স্বর্গীয় *মানা* প্রেরণকারী আধ্যাত্মিক সত্তাসমূহের মধ্যবর্তী একটা

AMARBOI.COM

জগৎও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলল। আপন প্রচেষ্টায় সত্তার ধারা বেয়ে আর ঈশ্বরের কাছে পৌঁছার উপায় থাকল না। নারী ও পুরুষের একমাত্র ঈশ্বর যিনি মূলত শূন্য হতে তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাণশক্তি বজায় রেখেছেন, কেবল তাঁর পক্ষেই চিরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।

ক্রিশ্চানরা জানত জেসাস ক্রাইস্ট নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাদের রক্ষা করেছেন; তারা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং একদিন ঈশ্বরের অস্তিত্বের মুখোমুখি হতে পারবে, যিনি স্বয়ং সত্তা এবং প্রাণ। কোনওভাবে ক্রাইস্ট ঈশ্বর ও মানবজাতিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা দূরত্বটুকু অতিক্রম করে যেতে সক্ষম করে তুলেছেন তাদের। প্রশ্ন হলো, কাজটা কীভাবে করেছেন তিনি? মহাবিভক্তির কোন পাশে ছিলেন তিনি? প্লেরোমা, মধ্যস্থতাকারী ও ঈয়নের পূর্ণতার আর কোনও স্থান ছিল না। হয় ক্রাইস্ট, বাণী স্বর্গীয় রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন (যেটা এখন কেবল ঈশ্বরের নিজস্ব অঞ্চল) না হয় নাজুক সৃষ্ট ব্যবস্থার অংশ ছিলেন তিনি। আরিয়াস ও আথানাসিয়াস মহাগহ্বরের বিপরীত দিকে স্থাপন করেছিলেন তাঁকে: আথানাসিয়াস রেখেছেন স্বর্গীয় অঞ্চলে এবং সৃষ্ট জগতে রেখেছেন আরিয়াস।

অদ্বিতীয় ঈশ্বর ও তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে আবশ্যকীয় পার্থক্যের ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন আরিয়াস। বিশপ আলেকজান্দারের উদ্দেশে তিনি যেমন লিখেছিলেন, ঈশ্বর একমাত্র অজন্মা, একমাত্র চিরকালীন, একমাত্র তাঁরই কোনও আদি নেই, তিনিই একমাত্র সত্য, একমাত্র তিনিই অমরত্বের অধিকারী, একমাত্র সর্বজ্ঞানী, সর্বোত্তম, একমাত্র স্রষ্টা।'[৩] ঐশীগ্রন্থ ভালো করেই রপ্ত ছিল আরিয়াসের। ক্রাইস্ট-বাণী কেবল আমাদের মতোই সৃষ্ট জীব, এ দাবির সপক্ষে অসংখ্য দলিল উপস্থাপন করেছেন তিনি। প্রোভার্বসে দেওয়া স্বর্গীয় প্রজ্ঞার বর্ণনা ছিল তাঁর মূল অনুচ্ছেদ, যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, আদিতে ঈশ্বর প্রজ্ঞা *সৃষ্টি* করেছিলেন।[৪] এই টেক্সট-এ আরও বলা হয়েছে যে প্রজ্ঞা ছিল সৃষ্টির এজেন্ট। সেইন্ট জনের গস্পেলের উপক্রমণিকায় এ ধারনাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আদিতে বাণী ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে:

AMARBOI.COM

> সকলেই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে,
> তাহার কিছুই তাহা ব্যতিরেকে হয় নাই।[৫]

অন্যান্য সৃষ্ট জীবকে অস্তিত্ব দানের জন্যে ঈশ্বরের ব্যবহৃত সরঞ্জাম ছিল লোগোস। সুতরাং, এটা অন্য সকল বস্তু বা সত্তা থেকে একেবারেই ভিন্ন ও ব্যতিক্রমী উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর একে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং লোগোস আবশ্যিকভাবে স্বয়ং ঈশ্বরের চেয়ে আলাদা এবং ভিন্ন।

সেইন্ট জন পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে জেসাসই লোগোস ছিলেন, তিনি এও বলেছেন লোগোসই ছিলেন ঈশ্বর।[৬] তবু প্রকৃতিগতভাবে তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, জোর দিয়ে বলেছেন আরিয়াস, বরং ঈশ্বর কর্তৃক স্বর্গীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি। আমাদের বাকি সবার চেয়ে তিনি আলাদা, কারণ ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন যে লোগোস মানুষ হওয়ার পর নিখুঁতভাবে তাঁকে মানবেন এবং, বলা যায়, জেসাসের প্রতি আগাম ঐশ্বরিকতা আরোপ করেছিলেন। কিন্তু জেসাসের অলৌকিকত্ব সহজাত ছিল না। এটা ছিল স্রেফ উপহার বা পুরস্কার। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনেও বহু বিবরণ উপস্থাপনে সফল হয়েছিলেন আরিয়াস। জেসাস ঈশ্বরকে 'পিতা' সম্বোধন করেছিলেন, এই ব্যাপারটাই একটা পার্থক্য থাকার কথা প্রকাশ করে; পিতৃত্বের প্রকৃতির কারণেই পূর্বঅস্তিত্ব ও পুত্রের উপর সুনির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব বোঝায়। বাইবেলের উল্লিখিত ক্রাইস্টের অসম্মান ও দুর্বলতা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলোর প্রতিও জোর দিয়েছেন আরিয়াস। যেমনটি তাঁর প্রতিপক্ষ দাবি করেছে, জেসাসকে অসম্মানিত করার কোনও উদ্দেশ্য আরিয়াসের ছিল না। ক্রাইস্টের গুণাবলী এবং আমৃত্যু আনুগত্য সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করতেন তিনি, যা আমাদের মুক্তি নিশ্চিত করেছে। আরিয়াসের ঈশ্বর গ্রিক দার্শনিকদের ঈশ্বরের কাছাকাছি ছিলেন, দূরবর্তী ও বিশ্বজগতের উর্ধ্বে; তিনিও মুক্তির গ্রিক ধারণার অনুসারী ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, স্টয়িকরা সব সময় শিক্ষা দিয়েছে যে গুণবান মানুষের পক্ষে সবসময়ই স্বর্গীয় মর্যাদা লাভ সম্ভব। প্লেটোনিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও এটা আবশ্যিক ছিল। আরিয়াস আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে ক্রিশ্চানরা নিষ্কৃতি পেয়েছে ও স্বর্গীয় মর্যাদা লাভ করেছে, তারা ঈশ্বরের প্রকৃতির অংশীদার। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল জেসাস আমাদের জন্যে পথ তৈরি করে গেছেন বলে। তিনি নিখুঁত মানব জীবন যাপন করে গেছেন; আমৃত্যু এমনকি ক্রুশবিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের আনুগত্য করেছেন। সেইন্ট পল যেমন বলেছেন, আমৃত্যু আনুগত্য প্রদর্শনের সুবাদেই ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছেন এবং স্বর্গীয় প্রভু (*Kyrios*) উপাধি দান করেছেন।[৭] জেসাস মানুষ না হলে আমাদের কোনও আশাই থাকত না। প্রকৃতিগতভাবে ঈশ্বর হলে তাঁর জীবনে অসাধারণত্ব বলে কিছুই থাকত না, অনুকরণ করার মতো কিছু থাকত না আমাদের। ক্রাইস্টের পুত্রানুগত্যের আদর্শ নিয়ে ধ্যান করার মাধ্যমে ক্রিশ্চানরাও স্বর্গীয় হয়ে উঠতে পারবে। নিখুঁত সৃষ্টি ক্রাইস্টকে অনুকরণের ভেতর দিয়ে তারাও 'অপরিবর্তনীয় ও অপনোদনযোগ্য ঈশ্বরের নিখুঁত সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারবে।'[৮]

কিন্তু মানুষের ঈশ্বরকে ধারণ করার ক্ষমতা সম্পর্কে আথানাসিয়াসের ধারণা এতটা আশাবাদী ছিল না। মানুষকে জন্মগতভাবে নাজুক হিসাবে

AMARBOI.COM

দেখেছেন তিনি: শূন্য হতে এসেছি আমরা এবং পাপের ফলে আবার শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছি। সুতরাং ঈশ্বর যখন তাঁর সৃষ্টি নিয়ে ভাবেন তিনি,

> দেখেন সকল সৃষ্ট প্রকৃতিকে এর নিজস্ব ধারায় ছেড়ে দেওয়া হলে তা বিপদাপন্ন এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে। এটা রোধ এবং বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব হীনতায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষার্থে তিনি আপন চিরন্তন লোগোস হতে সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।[৯]

ঈশ্বরের লোগোসের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হয়েই কেবল মানুষ বিলুপ্তি বিনাশ এড়াতে পারে, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই হচ্ছেন নিখুঁত সত্তা। লোগোস স্বয়ং দুর্বল সৃষ্টি হলে তাঁর পক্ষে মানবজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হতো না। আমাদেরকে জীবনদানের জন্যে লোগোসকে দেহ দান করা হয়েছিল। তিনি মৃত্যু ও পাপের নশ্বর পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন আমাদেরকে ঈশ্বরের নির্লিপ্ততা ও অমরত্বের ভাগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু লোগোস স্বয়ং নাজুক সৃষ্টি হলে এটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত, যিনি নিজেই আবার শূন্যতায় হারিয়ে যেতে পারতেন। বিশ্বের যিনি স্রষ্টা একমাত্র তাঁর পক্ষেই একে রক্ষা করা সম্ভব এবং তার মানে, দেহধারী লোগোসরূপী ক্রাইস্ট অবশ্যই পিতার মতো একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আথানাসিয়াস যেমন বলেছেন, আমরা যাতে স্বর্গীয় হয়ে উঠতে পারি সেজন্যেই বাণী মানুষের রূপ নিয়েছিলেন।[১০]

AMARBOI.COM

২০শে মে, ৩২৫ তারিখে বিশপগণ যখন সংকট দূর করার লক্ষ্যে নাইনিয়াতে সমবেত হয়েছিলেন, খুব অল্প সংখ্যকই ক্রাইস্ট সম্পর্কে আথানাসিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার ছিলেন। বেশির ভাগই আথানাসিয়াস এবং আরিয়াসের মতামতের মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আথানাসিয়াস আগত প্রতিনিধিদের ওপর নিজস্ব ধর্মতত্ত্ব চাপিয়ে দিতে সক্ষম হন এবং সম্রাটের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কেবল আরিয়াস ও তাঁর দুজন সাহসী সহচর তাঁর ক্রীডে সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জানান। ফলে প্রথমবারের মতো শূন্য হতে সৃষ্টি মতবাদ সরকারী মতবাদে পরিণত হয়, যেখানে ক্রাইস্ট নগণ্য সৃষ্টি বা ঈয়ন নন বলে জোর দেওয়া হয়েছে। স্রষ্টা ও উদ্ধারকারী ছিলেন একই সত্তা।

> আমরা একমাত্র ঈশ্বর,
> পিতা সর্বশক্তিমানের উপর বিশ্বাস রাখি,
> যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তুর স্রষ্টা,

এবং বিশ্বাস করি একজন প্রভু ঈশ্বর, পুত্র জেসাস ক্রাইস্টে,
ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান,
অর্থাৎ পিতার সত্তা (*ousia*) থেকে সৃষ্ট,
ঈশ্বর হতে ঈশ্বর,
আলো হতে আলো,
প্রকৃত ঈশ্বর হতে প্রকৃত ঈশ্বর,
জাত, পিতার সঙ্গে
একই বস্তু দ্বারা (*homoousion*) সৃষ্ট নয়,
যার মাধ্যমে সকল বস্তু সৃষ্টি হয়েছে,
যেসব জিনিস স্বর্গে আছে আর
যেসব জিনিস আছে মর্ত্যে,
যিনি আমাদের জন্যে ও আমাদের
মুক্তির জন্যে মানুষের রূপ নিয়েছেন,
কষ্ট সয়েছেন,
তৃতীয় দিবসে আবার পুনরুত্থিত হয়েছেন,
আরোহণ করেছেন স্বর্গে
এবং নেমে আসবেন
জীবিত ও মৃতদের বিচারের জন্যে,
এবং আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র আত্মায়।[১১]

AMARBOI.COM

কন্সতন্তাইন ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়াদি না বুঝলেও এই ঐকমত্যের প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু আসলে নাইসিয়ায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। সম্মেলন শেষ হওয়ার পর বিশপগণ আগের মতোই আবার যার যার শিক্ষাদানে ফিরে গিয়েছিলেন। পরবর্তী আরও ষাট বছর আরিয়ান সংকট অব্যাহত ছিল। আরিয়াস ও তাঁর অনুসারীগণ পাল্টা লড়াই করে রাজকীয় অনুগ্রহ লাভে সফল হন। কমপক্ষে পাঁচবার নির্বাসিত হয়েছিলেন আথানাসিয়াস। নিজের ক্রীড টিকিয়ে রাখা খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছিল তাঁর পক্ষে। বিশেষ করে *homoousion* শব্দটি (আক্ষরিক অর্থে, একই উপাদানে তৈরি) দারুণ বিতর্কিত ছিল, কারণ এটা ঐশীগ্রন্থ বিরোধী এবং এতে বস্তুগত সংযোগ রয়েছে। এভাবে দুটো তামার মুদ্রাকে *homoousion* বলা যেতে পারে, কেননা দুটোই একই বস্তু থেকে তৈরি।

আবার, আথানাসিয়াসের ক্রীড বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব হীন। এখানে জেসাসকে স্বর্গীয় বলা হলেও ব্যাখ্যা করা হয়নি লোগোস দ্বিতীয় ঈশ্বর না হয়েও কীভাবে তিনি পিতার মতো 'একই উপাদানে'র হতে পারেন। ৩৩৯

সালে আথানাসিয়াসের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্মী বিশপ অভ আনসিরা মার্সেলাস, যিনি এমনকি নির্বাসনে একবার তাঁর সঙ্গীও হয়েছিলেন–যুক্তি দেখিয়েছেন যে লোগোস চিরন্তন স্বর্গীয় সত্তা হতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরের মাঝে প্রচ্ছন্ন গুন; এ হিসাবে, নাইসিন ফরমুলাকে ত্রি-ঈশ্বরবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারত: তিন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা রয়েছে এখানে: পিতা, পুত্র এবং আত্মা। বিতর্কিত *homiousion* শব্দের পরিবর্তে মার্সেলাস আপোস রফার জন্যে *homiousion* অর্থাৎ 'একরকম' বা 'একই স্বভাবের' শব্দটি প্রস্তাব করেন। এই বিতর্কের জটিল ধারা প্রায়শঃ পরিহাসের সৃষ্টি করেছে; উল্লেখযোগ্যভাবে গিবন মনে করেছেন, তুচ্ছ বিষয়ে ক্রিশ্চান ঐক্য হুমকির মুখে পড়াটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। অবশ্য ধারণাগত দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা অসুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও ক্রাইস্টের অলৌকিত্বের আবশ্যকতার প্রতি ক্রিশ্চানদের আঁকড়ে থাকার ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদ। মার্সেলাসের মতো বহু ক্রিশ্চান ঈশ্বরের একত্বের প্রতি হুমকিতে অস্বস্তিতে ভুগছিল। মার্সেলাস বোধ হয় বিশ্বাস করেছিলেন যে লোগোস কেবল একটা অতিক্রমশীল পর্যায় ছিল: সৃষ্টির সময় ঈশ্বর হতে আবির্ভূত হয়েছিল এটা, জেসাসের মাঝে স্থান করে নিয়েছে ও নিষ্কৃতি সমাপ্ত হওয়ার পর আবার স্বর্গীয় রূপে হারিয়ে যাবে, যাতে কেবল ঈশ্বরই সর্বেসর্বা রয়ে যাবেন।

শেষ পর্যন্ত আথানাসিয়াস মার্সেলাস ও তাঁর অনুসারীদের বোঝাতে সমর্থ হন যে, তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত, কারণ আরিয়ানদের চেয়ে তাঁদের মতের মিল অনেক বেশি। যাঁরা বলেন যে, লোগোস পিতার মতো একই প্রকৃতির ছিল এবং যাঁরা বিশ্বাস করেন যে তিনি প্রকৃতিগত দিক থেকে ঈশ্বরের *মতো*, তারা আসলে 'ভ্রাতৃপ্রতীম', আমরা যা বলি, তাঁরাও সেকথাই বোঝান, আমরা কেবল পরিভাষা নিয়ে বিতর্ক করছি।'[১২] আরিয়াসের বিরোধিতায় অগ্রাধিকার দিতে হবে, যিনি ঘোষণা করেছেন যে পুত্র ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির। বহিরাগত কারও চোখে এসব ধর্মতত্ত্বীয় যুক্তিতর্ককে অনিবার্যভাবে সময়ের অপচয় মনে হবে: কারও পক্ষেই কোনও কিছু স্পষ্টভাবে প্রমাণ করার উপায় ছিল না, ও বিরোধ কেবলই ভাঙনেরই কারণ হয়েছে। অবশ্য অংশগ্রহণকারীদের জন্যে এটা কোনও শুষ্ক বিতর্ক ছিল না, বরং ক্রিশ্চান উপলব্ধির প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা ব্যাপার ছিল। আরিয়াস, আথানাসিয়াস এবং মার্সেলাস, এঁদের প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেছেন যে জেসাসের সঙ্গে একটা নতুন কিছু পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। তাঁরা ধারণাগত প্রতীকের সাহায্যে এই উপলব্ধিকে নিজেদের এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রকাশ-উপযোগি করে তোলার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন। ভাষা কেবল প্রতীকায়িত হতে পারে, কারণ যে সত্তাসমূহের দিকে তারা নির্দেশ

AMARBOI.COM

করেছেন তা ছিল অনির্বচনীয়। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে খৃস্টধর্মে এক গোঁড়া অসহিষ্ণুতার অনুপ্রবেশ ঘটছিল, শেষ পর্যন্ত যা 'সঠিক' বা অর্থডক্স প্রতীক মেনে নেওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ও বাধ্যতামূলক করে তুলবে। খৃস্টধর্মের নজীরবিহীন মতবাদ বিষয়ক এই বিকার অনায়াসে মানবীয় প্রতীক ও স্বর্গীয় সত্তার ভেতর ভুল বোঝাবুঝি বা দ্বিধার জন্ম দিতে পারত। খৃস্টধর্ম আগাগোড়াই একটি স্ববিরোধী ধর্মবিশ্বাস (Paradoxical faith): প্রথম দিকের ক্রিশ্চানদের জোরাল ধর্মীয় অনুভূতি একজন ক্রুশবিদ্ধ মেসায়াহ্‌র কেলেঙ্কারীর আদর্শগত আপত্তি বা মতবিরোধ অতিক্রম করেছিল। এবার নাইসিয়াতে একেশ্বরবাদের সঙ্গে স্পষ্ট সামঞ্জস্যহীনতা সত্ত্বেও চার্চ ইনকারনেশন বা অবতারবাদের বৈপরীত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

বিখ্যাত মরুচারী সাধক আথানাসিয়াস তাঁর জীবনীগ্রন্থ *লাইফ অভ অ্যান্টনি* তে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন যে, তাঁর নতুন মতবাদ কীভাবে খৃস্টীয় আধ্যাত্মিকতাকে প্রভাবিত করেছে। মনাস্টিসিজম-এর প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত অ্যান্টনি মিশরিয় মরুভূমিতে কঠোর কৃচ্ছ্রতার জীবন যাপন করতেন। তা সত্ত্বেও অজ্ঞাত পরিচয় লেখক কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন মরু-সাধক বা মঙ্কদের নীতিকথার গ্রন্থ *দ্য সেয়িংস অভ দ্য ফাদারস*-এ তিনি অত্যন্ত মানবিক এবং সহজে বিচলিত ব্যক্তি হিসাবে অঙ্কিত হয়েছেন যিনি একঘেয়েমিতে ক্লান্ত, মানুষের সমস্যাদি নিয়ে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন এবং সংজ্ঞা ও সরাসরি উপদেশ বা পরামর্শ দেন। কিন্তু জীবনীগ্রন্থে আথানাসিয়াস একেবারে ভিন্ন আলোয় নিজেকে উপস্থাপন করেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি আরিয়ান মতবাদের প্রবল বিরোধীতে রূপান্তরিত হয়েছেন: ইতিমধ্যেই তিনি আসন্ন দেবত্বের আস্বাদ গ্রহণ করেছেন, কেননা এক চমকপ্রদ মাত্রায় তিনি স্বর্গীয় অ্যাপাথিয়ার অংশীদার। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বিশ বছর অশুভ আত্মার সঙ্গে যুদ্ধ চালানোর পর যখন সমাধি থেকে উঠে আসেন, আথানাসিয়াস বলছেন, যে অ্যান্টনির দেহে বয়সের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। প্রকৃত ক্রিশ্চান ছিলেন তিনি, যার অচঞ্চল এবং নিস্পৃহ বৈশিষ্ট্য তাঁকে আর সবার চেয়ে ভিন্নতা দান করেছে: 'তাঁর আত্মা ছিল অবিচল, তাই তাঁর বাহ্যিক অভিব্যক্তিও ছিল শান্ত।'[১৩] নিখুঁতভাবে ক্রাইস্টকে অনুকরণ করেছিলেন তিনি: ঠিক লোগোস যেভাবে দেহ ধারণা করে পাপী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অশুভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, অ্যান্টনিও একইভাবে শয়তানের আস্তানায় অবতরণ করেছিলেন। আথানাসিয়াস কখনও ধ্যানের কথা বলেননি, যা কিনা ক্লিমেন্ট বা অরিগেনের মতো ক্রিশ্চান প্লেটোনিস্টদের মতবাদ অনুযায়ী দেবত্বপ্রাপ্তি ও মুক্তির উপায় ছিল। তুচ্ছ মরণশীল মানুষের পক্ষে এভাবে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক শক্তির বলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছানো সম্ভব বলে বিবেচিত হচ্ছিল না আর। তার

AMARBOI.COM

বদলে ক্রিশ্চানদের অবশ্যই দেহধারী বাণীর পাপাচারপূর্ণ বস্তুজগতে অবতীর্ণ হওয়াকে অনুকরণ করতে হবে।

কিন্তু তখনও দ্বিধান্বিত ছিল ক্রিশ্চানরা: ঈশ্বর যদি একজনই হয়ে থাকেন, তাহলে লোগোস কীভাবে স্বর্গীয় হতে পারেন? অবশেষে পূর্ব তুরস্কের কাপাদোসিয়ার তিনজন অসাধারণ ধর্মবিদ এমন একটা সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন যা ইস্টার্ন অর্থডক্স চার্চকে সন্তুষ্ট করে। এঁরা হলেন বিশপ অভ সিসারিয়া বাসিল (৩২৯-৭৯), তাঁর ছোট ভাই বিশপ অভ নাইসা গ্রেগরি (৩৩৫-৯৫) এবং বন্ধু গ্রেগরি অভ নাথিয়ানযাস (৩২৯-৯১)। কাপাদোসিয়ানস হিসাবে আখ্যায়িত এই ব্যক্তিগণ গভীরভাবে আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন। অনুমান ও দর্শনে এখন আনন্দ লাভ করলেও তাঁদের বিশ্বাস ছিল ধর্মীয় অভিজ্ঞতাই ঈশ্বর সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি। গ্রিক দর্শনে প্রশিক্ষিত এঁরা তিনজনেই সত্যের বাস্তব বিষয়াদি এবং এর অধিকতর দুর্বোধ্য দিকগুলোর পার্থক্যের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। আদি গ্রিক যুক্তিবাদীরা এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন: প্লেটো দর্শনের (যা যুক্তি দ্বারা উপস্থাপিত বলে প্রমাণযোগ্য ছিল) সঙ্গে পৌরাণিকভাবে প্রাপ্ত একই মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনের ধরাছোঁয়ার বাইরের শিক্ষার পার্থক্য টেনেছেন। আমরা দেখেছি অ্যারিস্টটলও মানুষ শেখার (*Mathein*) জন্যে রহস্য ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করে না, বরং একটা কিছুর অভিজ্ঞতা (*Pathein*) লাভ করতে চায় বলে একই রকম পার্থক্য রেখা টেনেছিলেন। বাসিলও *ডগমা* ও *কেরিগমা*-র পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে ক্রিশ্চান অর্থে একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে উভয় ধরণের ক্রিশ্চান শিক্ষাই আবশ্যক। *কেরিগমা* হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ নির্ভর চার্চের গণশিক্ষা; কিন্তু *ডগমা* বাইবেলিয় সত্যের গভীরতর অর্থ প্রকাশ করে যা কেবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও প্রতীকী রূপেই উপলব্ধি করা সম্ভব। গস্পেল সমূহের সরাসরি বাণীর আড়ালে বা পাশাপাশি পয়গম্বরদের কাছ থেকে 'রহস্যময়ভাবে' এক গোপন ও নিগূঢ় ঐতিহ্য বিবরণ হস্তান্তরিত হয়েছে: এটা 'ব্যক্তিগত এবং গোপন শিক্ষা ছিল,'

> যা আমাদের পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষেরা নীরবে সংরক্ষণ করেছেন, যা উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল রোধ করেছে...এই নীরবতার সাহায্যে রহস্যের পবিত্র রূপ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। অদীক্ষিতজনদের এই শিক্ষা বহন করার অনুমোদন নেই: লিখিতরূপে এদের অর্থ প্রকাশ করা যাবে না।[১৪]

শাস্ত্রীয় প্রতীক ও জেসাসের শিক্ষার সাবলীলতার আড়ালে ছিল অধিকতর গোপন এক *ডগমা*, যা ধর্মবিশ্বাসের আরও উন্নত উপলব্ধি তুলে ধরে।

AMARBOI.COM

নিগূঢ় এবং প্রকাশিত সত্যের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঈশ্বরের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। কেবল গ্রিক ক্রিশ্চানদের মাঝেই এটা সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং ইহুদি ও মুসলিমরাও নিগূঢ় ঐতিহ্য গড়ে তুলবে। 'গোপন' মতবাদের ধারণার পেছনে মানুষের মত বন্ধ করার উদ্দেশ্য কাজ করেনি। ফ্রিম্যাসনরির কোনও আদি ধরনের কথা বলেননি বাসিল। তিনি কেবল এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে সকল ধর্মীয় সত্য স্পষ্ট এবং যৌক্তিকভাবে প্রকাশ উপযোগি নয়। কোনও কোনও ধর্মীয় দর্শনের অভ্যন্তরীণ অনুরণন রয়েছে যা কেবল কেউ তার একান্ত নিজস্ব সময়ে প্লেটোর সংজ্ঞানুযায়ী *থিয়োরিয়া* বা ধ্যানের মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে পারে। যেহেতু সকল ধর্ম স্বাভাবিক ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যের অতীত এক অনিবর্চনীয় সত্তার প্রতি নিবেদিত, সেহেতু বক্তব্য সীমাবদ্ধ এবং বিভ্রান্তিকর। আত্মার চোখ দিয়ে এসব সত্যকে না 'দেখলে' যেসব লোক এখনও খুব অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি তারা ভ্রান্ত ধারণা পেয়ে বসতে পারে। সুতরাং, আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি ঐশীগ্রন্থসমূহের অ্যাধ্যাত্মিক তাৎপর্যও রয়েছে যা সবসময় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বুদ্ধও উল্লেখ করেছেন যে কিছু কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা 'অসংগত' বা বেমানান, যেহেতু এগুলো ভাষার আয়ত্তের অতীত বাস্তবতার কথা বলে। ধ্যানের এক অন্তর্মুখী কৌশলের আশ্রয় নিয়েই কেবল আপনি তা আবিষ্কার করতে পারবেন: এক অর্থে আপনাকেই তা তৈরি করে নিতে হবে। ভাষায় এগুলোর বর্ণনা দেওয়ার প্রয়াস বিটোফেনের শেষ কোয়ারটেট এর কোনও একটার মৌখিক বর্ণনা দেওয়ার মতোই অদ্ভুত হয়ে উঠতে পারে। বাসিল যেমন বলেছেন, এসব দুর্বোধ্য ধর্মীয় বাস্তবতা কেবল শাস্ত্রের প্রতীকী ভঙ্গি বা আরও ভালো, নীরবতার সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে।[১৫]

পশ্চিমের খৃস্টধর্ম আরও বাগাড়ম্বরপূর্ণ ধর্মে পরিণত হবে এবং অনিবার্যভাবে *কেরিগমার* ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে: এটাই হয়ে দাঁড়াবে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এর প্রধান সমস্যা। অবশ্য গ্রিক অর্থডক্স চার্চে উন্নত সকল ধর্মতত্ত্ব নীরব বা অ্যাপফ্যাটিক হবে। গ্রেগরি অভ নাইসা যেমন বলেছেন, ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রতিটি ধারণাই সদস্যপূর্ণ, এক মিথ্যা সমরূপতা, প্রতিমা: এটা স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে পারে না।[১৬] ক্রিশ্চানদের অবশ্যই আব্রাহামের মতো হতে হবে, যিনি গ্রেগরির উপস্থাপিত জীবনীতে ঈশ্বর সম্পর্কে সকল ধারণা বাদ দিয়ে এমন এক বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন যা, 'যে কোনও ধারণার চেয়ে অবিমিশ্র এবং খাঁটি ছিল।'[১৭] গ্রেগরি তাঁর *লাইফ অভ মোজেস*-এ জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমরা যার প্রত্যাশা করি তার প্রকৃত দর্শন এবং জ্ঞান দেখার সঙ্গে জড়িত নয় বরং এমন এক সচেতনতার সঙ্গে সম্পর্কিত যার ফলে আমাদের লক্ষ্য সকল জ্ঞানকে ছাপিয়ে যায় এবং দুর্বোধ্যতার অন্ধকার দিয়ে সবদিক

AMARBOI.COM

থেকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন।'[১৮] আমরা বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে পারি না, কিন্তু সিনাই পর্বতে নেমে আসা মেঘের আড়ালে নিজেদের ঢাকতে পারলেই কেবল আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারব। ঈশ্বরের সত্তা (*ousia*) এবং বিশ্বে তার কর্মধারা (*energaiai*)-র মাঝে ফিলো যে পার্থক্য টেনেছিলেন, বাসিল তারই শরণাপন্ন হয়েছেন: 'আমরা কেবল তাঁর কাজ (*energeiai*) দিয়েই ঈশ্বরকে জানতে পারি, কিন্তু আমরা তার সত্তার দিকে অগ্রসর হই না।'[১৯] এটাই ইস্টার্ন চার্চের ভবিষ্যতের সকল মূল কথায় পরিণত হবে।

কাপাদোসিয়রা পবিত্র আত্মার ধারণা গড়ে তুলতেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে নাইসিয়ায় দায়সারাভাবে এদিকটাতে নজর দেওয়া হয়েছিল: 'আর আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র আত্মায়' কথাগুলো যেন শেষ বিবেচনায় আথানাসিয়াসের বিশ্বাসে যোগ করা হয়েছিল। পবিত্র আত্মার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিল মানুষ। এটা কি কেবল ঈশ্বরের একটি প্রতীক বা সমার্থক শব্দ নাকি আরও বেশি কিছু? 'কেউ কেউ একে (আত্মা) এক ধরনের কাজ ভেবেছিল,' বলেছেন গ্রেগরি অভ নাযিয়ানযাস। 'কেউ ভেবেছে সৃষ্ট প্রাণী, কেউ ভেবেছে ঈশ্বর, কেউ বুঝে উঠতে পারেনি তাঁকে কি ডাকা যায়।'[২০] সেইন্ট পল নবায়ন, সৃষ্টি এবং পবিত্রকরণ সম্পর্কে পবিত্র আত্মার উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু এসব কাজ কেবল ঈশ্বর দ্বারাই সম্পাদন সম্ভব। সুতরাং বোঝা যায়, পবিত্র আত্মা, আমাদের মাঝে যার উপস্থিতিকে আমাদের মুক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, নিশ্চয়ই স্বর্গীয়, সামান্য সৃষ্টি নন। কাপাদোসিয়রা একটা ফর্মুলা প্রয়োগ করেছিলেন যা আরিয়াসের সঙ্গে বিরোধের সময় ব্যবহার করেছেন আথানাসিয়াস: 'ঈশ্বরের একক সত্তা (*ousia*) রয়েছে যা আমাদের বোধের অতীত রয়ে গেছে—কিন্তু তিনটি অভিব্যক্তি তাঁকে জ্ঞাত করেছে।

ঈশ্বরকে তাঁর অজ্ঞেয় *ousia* দিয়ে চিন্তা শুরু করার বদলে কাপাদোসিয়রা মানবজাতির তাঁর *hypostases*-এর অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ শুরু করেন। যেহেতু ঈশ্বরের *ousia* অপরিমেয়, আমরা কেবল পিতা, পুত্র ও আত্মারূপে আমাদের মাঝে প্রকাশের মাধ্যমেই তাঁকে জানতে পারি। অবশ্য এর মানে এই ছিল না যে কাপাদোসিয়রা, কোনও কোনও পশ্চিমা ধর্মবিদ যেমন মনে করেন, তিনটি স্বর্গীয় সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। গ্রিক ভাষার সঙ্গে যারা পরিচিত নয় তাদের কাছে *hypostasis* শব্দটি ছিল বিভ্রান্তিকর, কারণ এর বহু অর্থ ছিল: সেইন্ট জেরোমির মতো কোনও কোনও লাতিন পণ্ডিত বিশ্বাস করতেন যে *hypostasis* শব্দটি অর্থ *ousia*-র মতো এবং তাঁরা ভেবেছিলেন গ্রিকরা তিনটি ঐশী সত্তায় বিশ্বাস করে। কিন্তু কাপোদোসিয়রা জোর দিয়ে বলেছেন *ousia* এবং *hypostasis*-এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, যা মনে রাখা অত্যাবশ্যক। এভাবে

AMARBOI.COM

কোনও বস্তুর *ousia* হচ্ছে যা ওই বস্তুকে বিশেষ রূপ দিয়েছে; এটা কোনও বস্তুর ভেতরে আছে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে *hypostasis* শব্দটি ব্যবহার করা হয় বাইরে থেকে একটি বস্তুকে প্রকাশ করার জন্যে। অনেক সময় কাপোদোসিয়গণ *hypostasis* শব্দের পরিবর্তে *Prosopon* শব্দটি ব্যবহারেও আগ্রহী ছিলেন। *Proposon*-এর আদি অর্থ ছিল 'শক্তি' (Force), কিন্তু বেশ কিছু গৌণ অর্থও যোগ হয়েছে: ফলে একে কোনও ব্যক্তির মনের অবস্থার বাহ্যিক প্রকাশ, চেহারার অভিব্যক্তি বোঝাতে ব্যবহার করা যেতে পারে; একে তার সচেতনভাবে গৃহীত কোনও ভূমিকা বা অভিনয়ের জন্যে বেছে নেওয়া কোনও চরিত্র বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়ে। পরিণামে *hypostasis*-এর মতো *Proposon*-এর মানে কারও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক প্রকাশ কিংবা দর্শকের চোখে উপস্থাপিত ব্যক্তিক সত্তা। সুতরাং কাপোদোসিয়রা যখন বলেন যে, ঈশ্বর তিন *hypostases*-এ একজন *ousia*, তাঁরা বুঝিয়েছেন যে ঈশ্বর স্বয়ং একজন: স্বর্গীয় আত্ম-সচেতনতা মাত্র একটিই। কিন্তু যখন তিনি তাঁর কোনও কিছু সৃষ্ট জীবকে দেখান, তখন তিনি তিন *Prosopoi*।

এভাবে *hypostases* পিতা, পুত্র এবং আত্মাকে স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে মেলানো যাবে না, কারণ গ্রেগরি অভ নাইসা যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'স্বর্গীয় সত্তা (*Ousia*) ভাষাতীত এবং নামকরণের অতীত', 'পিতা,' 'পুত্র' ও 'আত্মা' হচ্ছে 'আমাদের ব্যবহৃত পরিভাষা মাত্র যা দিয়ে আমরা তাঁর *energeiai*-এর কথা বলি, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন।'[২১] কিন্তু এসব শব্দের প্রতীকী মূল্য রয়েছে, কেননা এগুলো অনির্বচনীয় বাস্তবতাকে আমাদের বোধগম্য ইমেজে তর্জমা করে। মানুষ ঈশ্বরকে দুর্জ্ঞেয় (অগম্য আলোয় ঢাকা পিতা), সৃজনশীল (লোগোস) এবং সর্বব্যাপী (পবিত্র আত্মা) হিসাবে অনুভব করেছে। কিন্তু এই তিনটি *hypostases* স্বয়ং স্বর্গীয় প্রকৃতির আংশিক ও অসম্পূর্ণ আভাস মাত্র, যা এধরনের ইমেজারি ও ধারণাকরণের বহু দূরে অবস্থান করে।[২২] সুতরাং, ট্রিনিটি (ত্রিত্ব)কে আক্ষরিকভাবে সত্যি হিসাবে দেখা চলবে না, বরং একে ঈশ্বরের গোপন জীবনের প্রকৃত সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত উদাহরণ হিসাবে নিতে হবে।

গ্রেগরি অভ নাইসা তাঁর পত্র *টু আলাবিয়াস: দ্যাট দেয়ার আর নট থ্রি গডস্*-এ তিনটি স্বর্গীয় ব্যক্তি বা *hypostases*-এর অবিভাজ্যতা বা সহাবস্থান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের রূপরেখা এঁকেছিলেন। ঈশ্বর নিজেকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছিলেন, এটা যেন কেউ না ভাবে, এটা ভয়ঙ্কর এবং সত্যি বলতে ব্লাসফেমাস ধারণা। ঈশ্বর যখন নিজেকে পৃথিবীতে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন এই তিনটি রূপেই পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন।

ট্রিনিটি এভাবে আমাদের 'সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বর হতে প্রতিটি কাজের' প্যাটার্নের একটা আভাস দেয়: ঐশীগ্রন্থ যেমন দেখায়, এর উৎস ছিল পিতার কাছে, পুত্রের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে এবং আত্মার পরিব্যাপীতার মাধ্যমে পৃথিবীতে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু স্বর্গীয় প্রকৃতি কাজের প্রতিটি পর্যায়ে সমানভাবে উপস্থিত। আমরা আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনটি *hypostases*-এর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বুঝতে পারি: পুত্রের প্রকাশ না হলে আমরা কখনও পিতা সম্পর্কে জানতে পারতাম না, পুত্রকেও আমরা চিনতে পারতাম না অন্তর্গত আত্মা ছাড়া, যিনি তাঁকে আমাদের কাছে পরিচিত করেছেন। আত্মা পিতার স্বর্গীয় বাণীর সহচর, ঠিক নিঃশ্বাস (গ্রিক, *নিউমা*, লাতিন, *স্পিরিতাস*) যেমন মানুষের কথার সঙ্গে থাকে। ঐশীরাজ্যে তিন ব্যক্তি পাশাপাশি অবস্থান করেন না। একই ব্যক্তির মনে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের উপস্থিতির সঙ্গে আমরা তাঁদের তুলনা করতে পারি: দর্শন হয়তো ওষুধ বিজ্ঞান হতে আলাদা হতে পারে, কিন্তু এটা চেতনার একটা আলাদা স্তরে থাকে না। বিভিন্ন বিজ্ঞান পরস্পরকে ছাপিয়ে যায়, গোটা মনকে পূর্ণ করে, কিন্তু আবার আলাদা থেকে যায়।[২৩]

কিন্তু শেষমেষ ট্রিনিটি অতিন্দ্রীয় বা অ্যাধ্যাত্মিক অনুভূতি হিসাবেই কেবল অর্থ বহন করে: একে যাপন করতে হবে, চিন্তা করা যাবে না, কারণ ঈশ্বর মানবীয় ধারণার অতীতে অবস্থান করেন। এটা যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিবরণ নয় বরং যুক্তিকে তালগোল পাকিয়ে দেওয়া এক কাল্পনিক উদাহরণ। গ্রেগরি অভ নাযিয়ানযাস একের মাঝে তিনজনের ধ্যান এক গভীর ও সীমাহীন আবেগের প্রকাশ ঘটায় যা চিন্তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্পষ্টতাকে ঘোলা করে দেওয়ার কথা বলে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

> আমি যখনই একজনের কথা ভাবি, সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের মহিমায় আলোকিত হয়ে উঠি; আমি তিনজনকে আলাদা করে নেওয়ামাত্র আবার ফিরে যাই একজনে। যখন কোনও একজনের কথা ভাবি, আমি পরিপূর্ণভাবে তাঁর কথা ভাবি; আমার চোখ পরিপূর্ণ, আমার ভাবনার বৃহৎ অংশ আমাকে ছেড়ে যায়।[২৪]

গ্রিক ও রাশিয়ান অর্থডক্স ক্রিশ্চানরা ট্রিনিটির ধ্যানকে অনুপ্রেরণাদায়ী ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হিসাবে আবিষ্কার করে গেছে। অবশ্য বহু পশ্চিমা ক্রিশ্চানের কাছে ট্রিনিটি স্রেফ হতবুদ্ধিকর। এর কারণ হতে পারে, ওরা হয়তো কাপাদোসিয়দের অ্যাখ্যায়িত *Kerygmatic* গুণাবলী বিবেচনা করেছে, অথচ গ্রিকদের বেলায় এটা ছিল *ডগম্যাটিক* সত্য যা কেবল অন্তর দিয়ে এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার

ফলাফল হিসাবে আয়ত্ত করা যায়। অবশ্য যৌক্তিকভাবে এর কোনও অর্থই হয় না। প্রথমদিকে এক সারমনে গ্রেগির অভ নাযিয়ানযাস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ট্রিনিটির *ডগমার* দুর্বোধ্যতাই আমাদের ঈশ্বরের পরম রহস্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়; আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তাঁকে বোঝার আশা করা ঠিক নয়।[২৫] এটা আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে সহজ সাধারণ বক্তব্য রাখা থেকে বিরত রাখে, যিনি নিজেকে প্রকাশ করার সময় এক অলৌকিক উপায়েই কেবল নিজের প্রকৃতি দেখাতে পারেন। ট্রিনিটি কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে পারার পথ খুঁজে পাবার সাধ্য আছে বলে ভাবতেও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন বাসিল, সোজা কথায়: উদাহরণ স্বরূপ, গডহেডের তিনটি *hypostases* কীভাবে এক এবং একই সঙ্গে সমরূপ ও আলাদা এই ধাঁধার জবাব খোঁজার প্রয়াস পাওয়া অনুচিত। এটা ভাষা, ধারণা ও বিশ্লেষণের মানবীয় ক্ষমতার অতীত।[২৬]

এভাবে ট্রিনিটিকে অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা যাবে না; এটা বিমূর্ত কোনও 'তত্ত্ব' নয়, বরং *থিয়োরিয়া* বা ধ্যানের ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা যখন এই *ডগমার* কারণে বিব্রত বোধ করে পরিত্যাগ করার প্রয়াস পেয়েছিল, তখন তারা ঈশ্বরকে যুক্তির যুগের (Age of Reason) সঙ্গে যৌক্তিক ও বোধগম্য করতে চেয়েছিল। এটা, যেমন আমরা দেখব, আমাদের উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত ঈশ্বরের প্রয়াণের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া অন্যতম উপাদান। কাপাদোসিয়রা যেসব কারণে এই কল্পনা-নির্ভর উদাহরণের অবতারণা করেছিলেন তার অন্যতম ছিল ঈশ্বর যেন আরিয়াসদের মতো ধর্মদ্রোহীদের বোধের গ্রিক দর্শনের যৌক্তিক ঈশ্বরের পরিণত না হতে পারেন। আরিয়াসের ধর্মতত্ত্ব একটু বেশি স্পষ্ট ও যৌক্তিক ছিল। ট্রিনিটি ক্রিশ্চানদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে সত্তাকে আমরা 'ঈশ্বর' বলি মানব বুদ্ধিতে তাঁর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। নাইসিয়ায় প্রকাশিত অবতারবাদ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাতে সরল বহুঈশ্বরবাদীতার সূত্রপাত হতে পারত। মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরকে অতি বেশি মানবীয় ভাবতে শুরু করে বসতে পারে: 'তিনি' ঠিক আমাদের মতো ভাবছেন, কাজ করছেন, পরিকল্পনা করছেন, এমন ভাবনাও শুরু হতে পারত। এরপর ঈশ্বরের ওপর সব ধরণের পূর্বধারণাপ্রসূত মতামত চাপিয়ে দিয়ে সেগুলোকে পরম রূপ দেওয়াটা খুব দূরের ব্যাপার নয়। এই প্রবণতা সংশোধনের প্রয়াস ট্রিনিটি। একে ঈশ্বর সম্পর্কিত সত্য বিবরণ হিসাবে না দেখে বরং কোনও কবিতা বা ধর্মতত্ত্বীয় নাচ হিসাবে দেখা যেতে পারে, তুচ্ছ মরণশীল মানুষ, 'ঈশ্বর' সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে আর গ্রহণ করেছে তার মাঝামাঝি কিছু এবং এক নীরব উপলব্ধি যে এমন যেকোনও বক্তব্য বা *কেরিগমা* কেবল সাময়িক হতে পারে।

AMARBOI.COM

'থিয়োরি' শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রিক ও পশ্চিমাদের পার্থক্য নির্দেশমূলক। প্রাচ্যের খৃস্টধর্মে *থিয়োরিয়া* সবসময় চিন্তা বোঝায়। পশ্চিমে তা যৌক্তিকভাবে প্রদর্শিত যুক্তিভিত্তিক প্রকল্প বুঝিয়ে থাকে। ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও 'থিয়োরি' গড়ে তোলা বোঝায় যে 'তাঁকে' চিন্তার মানবীয় ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে ধারণ করা যেতে পারে। নাইসিয়ায় মাত্র তিনজন লাতিন ধর্মবিদ ছিলেন। অধিকাংশ পশ্চিমা ক্রিশ্চান আলোচনার এই মাত্রায় যোগ্য ছিলেন না, তারা কোনও কোনও গ্রিক পরিভাষা বুঝতে না পারায় ট্রিনিটি মতবাদের বেলায় অসুখী বোধ করেছেন। সম্ভবত এটা ভিন্ন বাগধারায় সম্পূর্ণ অনুবাদযোগ্য ছিল না। প্রত্যেক সংস্কৃতিকে ঈশ্বর সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা সৃষ্টি করতে হয়। ট্রিনিটির গ্রিক ব্যাখ্যা পশ্চিমাদের কাছে অচেনা মনে হয়ে থাকলে তাদের নিজস্ব ভাষ্য নিয়ে এগিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল।

যে লাতিন ধর্মতাত্ত্বিক লাতিন চার্চের জন্যে ট্রিনিটিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন তাঁর নাম অগাস্তিন। গভীর প্লেটোবাদী ছিলেন তিনি, ছিলেন প্লটিনাসের অনুগত, ফলে পশ্চিমের অনেক সহকর্মীর চেয়ে এই মতবাদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল তাঁর। তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী, ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটা প্রায়শঃই পরিভাষাগত কারণে হয়েছে:

> অনির্বচনীয় বিষয়াদি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব আমরা কোনওভাবে হয়তো প্রকাশ করতে পারি আমাদের অবস্থান থেকে তা কোনও ভাবেই পূর্ণভাবে কিছু প্রকাশ করে না, আমাদের গ্রিক বন্ধুগণ একজন সত্তা এবং তিনটি বস্তুর কথা বলেছেন, কিন্তু লাতিনরা বলেছেন একজন সত্তা বা বস্তু এবং তিন ব্যক্তিত্বের কথা।[৭]

AMARBOI.COM

গ্রিকরা যেখানে ঈশ্বরের একক অপ্রকাশিত সত্তা বিশ্লেষণে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর তিনটি *hypotases*-কে বিবেচনা করে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়েছিল, যেখানে স্বয়ং অগাস্তিন এবং তাঁর পরবর্তী সময়ের পশ্চিমা ক্রিশ্চানরা স্বর্গীয় একত্ব দিয়ে শুরু করে তাঁরপর এর তিনটি প্রকাশ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। অগাস্তিনকে অন্যতম ফাদার অভ দ্য চার্চ হিসাবে গ্রিকরা শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু তাঁর ত্রিত্ববাদী ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে তারা সন্দিহান ছিল, এতে করে ঈশ্বরকে তাদের কাছে বড় বেশি যৌক্তিক ও মানবরূপী মনে হয়েছে। গ্রিকদের মতো অগাস্তিনের মতবাদ বিমূর্ত (*metaphysical*) ছিল না, বরং তা ছিল মনস্তাত্ত্বিক ও বড় বেশি ব্যক্তিক।

অগাস্তিনকে পশ্চিমা চেতনার জনক বলা যেতে পারে। সেইন্ট পল ছাড়া আর কোনও ধর্মবিদ পশ্চিমে তাঁর মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

প্রাচীনকালের শেষ পর্যায়ের অন্য যেকোনও চিন্তাবিদের চেয়ে তাঁকে অনেক অন্তরঙ্গভাবে চিনি আমরা, বিশেষ করে তাঁর রচিত ঈশ্বর আবিষ্কারের অসাধারণ এবং আবেগময় বিবরণ *কনফেশনস*-এর জন্য। জীবনের গোড়া থেকেই একটা ঈশ্বরবাদী ধর্মের সন্ধানে ছিলেন অগাস্তিন। ঈশ্বরকে তিনি মানবজাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক হিসাবে দেখেছেন: 'আমাদের তিনি তাঁর জন্যে সৃষ্টি করেছেন,' *কনফেশনস*-এর শুরুতে ঈশ্বরকে বলেছেন তিনি, 'এবং তোমার মাঝে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত অস্থির থাকবে আমাদের হৃদয়।'[২৮] কারথেজে বক্তৃতা শিক্ষা দেওয়ার সময় তিনি নসটিকবাদের মেসোপটেমিয় রূপ ম্যানিশেইজম-এর দীক্ষা নেন। কিন্তু এর সৃষ্টিতত্ত্ব তাঁকে সন্তুষ্ট করতে না পারায় পরে তা ত্যাগ করেন। অবতারের ধারণাকে তাঁর কাছে আক্রমণাত্মক মনে হয়েছিল, ঈশ্বরের ধারণার অসম্মান: কিন্তু তিনি ইতালিতে থাকার সময় বিশপ অভ মিলান আমব্রস তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে খৃস্টধর্ম প্লেটো ও প্লাটিনাসের সঙ্গে বেমানান নয়। কিন্তু তারপরেও অগাস্তিন চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়ে দীক্ষা গ্রহণে অনীহ ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন খৃস্টধর্মের ক্ষেত্রে কুমারব্রত গ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং এমন সিদ্ধান্ত নেওয়াকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন: 'প্রভু, আমাকে পবিত্রতা দাও,' প্রার্থনা করতেন তিনি, 'কিন্তু এখনই নয়।'[২৯]

তাঁর চূড়ান্ত পরিবর্তনের ব্যাপারটা ছিল *Sturm und Drang*, অতীত জীবনের সঙ্গে সহিংস সম্পর্কচ্ছেদের পর কষ্টকর পুনর্জন্ম—যা পাশ্চাত্যের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে। একদিন মিলানে তিনি তাঁর বন্ধু অলিপিয়াসের সঙ্গে বাগানে বসে থাকার সময় সংগ্রাম চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়ে:

AMARBOI.COM

> এক গুপ্ত গভীরতা থেকে গভীর আত্ম-মূল্যায়ন আমার সকল কষ্টকে তুলে এনে 'আমার হৃদয়ের সামনে হাজির করল' (শ্লোক ১৮: ১৫)। এতে এক প্রবল ঝড় ও প্রবল অশ্রু বর্ষণ সৃষ্টি হলো। গোঙানির সঙ্গে সব অশ্রু ঝরাতে আমি অলিপিয়াসের পাশ থেকে উঠে পড়লাম (কান্নার জন্যে নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি জরুরি মনে হয়েছে) ...কোনওমতে একটা ডুমুর গাছের নিচে লুটিয়ে পড়লাম, অশ্রুকে আর বাধা দিরাম না। আমার দুচোখে নদী বইতে শুরু করল, তোমার পছন্দের উৎসর্গ (শ্লোক ৫০: ১৯) এবং যদিও এই ভাষায় নয়, কিন্তু এই অর্থে—আমি বারবার তোমাকে বলেছি, 'আর কতদিন, হে প্রভু, আর কতদিন এমন তীব্র রাগান্বিত থাকবে?' (শ্লোক ৬: ৪)[৩০]

পশ্চিমে ঈশ্বর আমাদের কাছে খুব সহজে ধরা দেননি। অগাস্তিনের বিশ্বাস পরিবর্তনকে মনস্তাত্ত্বিক অ্যাবরিঅ্যাকশন মনে হয়, যার পর নবদীক্ষিতের মাঝে

সব আবেগ হারিয়ে ঈশ্বরের বাহুতে ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পরার অনুভূতি জাগে। মাটিতে লুটিয়ে কান্নার সময় অগাস্তিন অকস্মাৎ কাছের এক বাড়ি থেকে শিশুকণ্ঠে *'তোলে, লেগে*: হাতে নাও, পড়, হাতে নাও, পড়!' বাক্যটির পুনরাবৃত্তি শুনতে পান। একে প্রত্যাদেশ ধরে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান অগাস্তিন এবং বিস্মিত অবস্থায় দ্রুত অসুস্থ আলিপিয়াসের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর নিউ টেস্টামেন্টখানা তুলে নেন। রোমানদের উদ্দেশে রাখা সেইন্ট পলের বক্তব্যের পাতা মেলে ধরেন তিনি: 'দাঙ্গা এবং মদ্যপানের অনুষ্ঠানে নয়, যৌনতা ও নোংরামিতে নয়, যুদ্ধ-বিদ্রোহে নয়, বরং প্রভু জেসাস ক্রাইস্টকে গ্রহণ কর এবং দেহ আর এর লালসার জন্যে কোনও ব্যবস্থা রেখো না।' এক দীর্ঘ সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটল: 'আমার আর বেশি পড়ার প্রয়োজন বা ইচ্ছা হলো না,' স্মৃতিচারণ করেছেন অগাস্তিন, 'এই বাক্যটির শেষ শব্দটি শেষ হওয়ামাত্রই  যেন সকল উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তির এক আলো আমার সারা হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সন্দেহের সকল ছায়া মিলিয়ে গেল।'[৩১]

অবশ্য ঈশ্বর আনন্দেরও উৎস হতে পারেন: কিন্তু এই ধর্মান্তরকরণের অল্পদিন পরেই অগাস্তিন মা মনিকার সঙ্গে তিবার নদীর তীরে অসতিয়ায় এক পরম আনন্দের অনুভূতি লাভ করেন। সপ্তম অধ্যায়ে এ বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা। প্লেটোবাদী হিসাবে অগাস্তিন জানতেন ঈশ্বরকে অন্তরেই পাওয়া যায়। *কনফেশনস*-এর দশম পর্বে তিনি তাঁর ভাষায়, *মেমোরিয়া* বা স্মৃতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এটা মনে রাখার চেয়ে অনেক জটিল একটি প্রক্রিয়া, মনস্তাত্ত্বিকগণ যাকে বলছেন অবচেতন, তার অনেক কাছাকাছি। অগাস্তিনের কাছে স্মৃতি একসঙ্গে গোটা মন–চেতন ও অবচেতন-এর পরিচায়ক। এর জটিলতা ও বৈচিত্র্য তাঁকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। এটা ছিল এক 'ভীতি-জাগানো রহস্য,' ইমেজ, আমাদের অতীত আর অসংখ্য প্রান্তর, খাদ ও গুহার অস্তিত্বে ভরা এক অপরিমেয় জগৎ।[৩২] এই গিজগিজে অন্তর জগতেই ঈশ্বরের সন্ধানে অবতরণ করেছিলেন অগাস্তিন, যিনি আপাত স্ববিরোধীভাবে তাঁর অন্তর-বাইরে দুভাবেই ছিলেন। বাহ্যিক জগতের ঈশ্বরের ভেতর এবং বাইরে দুজায়গাতেই ছিলেন। কেবল বাহ্যিক জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ খোঁজা অর্থহীন। মনের প্রকৃত জগতেই কেবল তাঁর সন্ধান মিলতে পারে:

> আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, সৌন্দর্য যুগপৎ কত পুরোনো আবার একেবারে নতুন, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। আর দেখ, তুমি ছিলে অন্তরে, আমি ছিলাম বাইরের জগতে আর সেখানে খুঁজেছি তোমাকে, আর আমার অসুন্দর অবস্থায় তোমার সৃষ্ট সুন্দর সব জিনিসের মাঝে ঝাপ

AMARBOI.COM

> দিয়েছি। আমার সঙ্গে ছিলে তুমি, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম না। সুন্দর সব জিনিস আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, অথচ তোমার মাঝে তাদের অস্তিত্ব না থাকলে তাদের কোনও অস্তিত্বই থাকত না।[৩৩]

সুতরাং ঈশ্বর কোনও বস্তুগত সত্তা বা বাস্তবতা নন, বরং আত্মার জটিল গহ্বরের আধ্যাত্মিক সত্তা। অগাস্তিন কেবল প্লেটো আর প্লাটিনাসের সঙ্গে নয়, বরং নিরীশ্বরবাদী ধর্মের বৌদ্ধ, হিন্দু এবং শামানদের অভিজ্ঞতারও অংশী হয়েছেন। তারপরেও তাঁর উপাস্য কোনও নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর ছিলেন না, বরং জুদো-ক্রিশ্চান ঐতিহ্যের প্রবলভাবে ব্যক্তিক ঈশ্বর। ঈশ্বর মানুষের দুর্বলতার মাঝে স্থান করে নিয়েছেন এবং তার সন্ধানে গেছেন:

> আমার বধির অবস্থাকে ছিন্ন করে সজোরে আহ্বান আর চিৎকার করলে তুমি। তুমি ছিলে তীব্র উজ্জ্বল, আমার অন্ধত্বকে দূর করে দিয়েছ। সুবাসিত ছিলে তুমি, আমি শ্বাস গ্রহণ করেছি আর এখন তোমার পেছনে ছুটছি। আমি তোমার স্বাদ গ্রহণ করেছি, অনুভব করেছি আর তোমার জন্যে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটেনি। আমাকে তুমি স্পর্শ করেছ আর আমি তোমার শান্তির খোঁজ পেতে অগ্নিতে আক্রান্ত হয়েছি।[৩৪]

AMARBOI.COM

গ্রিক ধর্মবিদরা সাধারণত তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ধর্মতাত্ত্বীয় রচনায় উল্লেখ করেননি, কিন্তু অগাস্তিনের ধর্মতত্ত্ব তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনী থেকে জন্ম নিয়েছে।

মনের প্রতি অগাস্তিনের দুর্বলতা তাঁকে পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে লিখিত ত্রিত্ববাদের নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক প্রবন্ধগুচ্ছ *দে ত্রিনিতেত* (*De Trinitate*) গড়ে তুলতে প্ররোচিত করেছে। ঈশ্বর যেহেতু নিজ প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু আমাদের মনের গভীরে এক ট্রিনিটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারা উচিত। গ্রিকরা আদিভৌতিক রহস্যময়তা ও বাহ্যিক পার্থক্য উপভোগ করত। অগাস্তিন সেদিকে না গিয়ে আমাদের অধিকাংশের প্রত্যক্ষ করা সত্যের মুহূর্ত দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। আমরা যখন 'ঈশ্বরই আলো' বা 'ঈশ্বরই সত্য' জাতীয় কথা শুনি, তখন আমাদের আধ্যাত্মিক আগ্রহ বেড়ে ওঠা টের পাই এবং মনে করি যে 'ঈশ্বর' আমাদের জীবনের একটা মূল্য ও অর্থ দিতে পারেন। কিন্তু ওই মুহূর্তের আলোকনের পর আমরা আবার আমাদের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরে আসি, যেখানে আমরা 'পরিচিত এবং পার্থিব বস্তুতে'[৩৫] মোহান্ধ হয়ে থাকি। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন,

আমাদের পক্ষে আর সেই অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার মুহূর্তটির নাগাল পাওয়া সম্ভব হয় না। চিন্তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আমাদের কাজে আসবে না: পরিবর্তে আমাদের 'তিনি সত্য'[৩৬] ধরনের বাক্য দিয়ে 'মন কী বোঝে' সেটা বুঝতে হবে। কিন্তু যাঁকে চিনি না সেই সত্তাকে কি ভালোবাসা সম্ভব? অগাস্তিন দেখাতে চেয়েছেন, যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের মনে প্লেটোর ইমেজের মতো ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এক ট্রিনিটির অস্তিত্ব আছে, তাই আমরা আমাদের আদি রূপের–আদি নকশা—যার ভিত্তিতে আমাদের আকার দেওয়া হয়েছে–আকাঙ্ক্ষা করি।

মন নিজেকে ভালোবেসেছে, এ দিয়ে যদি শুরু করি, আমরা ট্রিনিটির দেখা পাই না, দেখা মেলে দ্বিত্বের: ভালোবাসা ও মন। কিন্তু মন নিজের সম্পর্কে সজাগ না থাকলে–আমরা যাকে আত্মসচেতনতা বলি সেটা সহ–নিজেকে ভালোবাসতে পারবে না। দেকার্তের আভাসে অগাস্তিন যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞান অন্য সমস্ত নিশ্চয়তার মূল ভিত্তি। এমনকি সন্দেহের অনুভূতিও আমাদের আত্মসচেতন করে তোলে।[৩৭]

সুতরাং, আত্মার মাঝে তিনটি গুণের বাস: স্মৃতি, উপলব্ধি ও ইচ্ছা; যেগুলো যথাক্রমে জ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান ও ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বর্গীয় তিন ব্যক্তির মতো এই মানসিক কর্মকাণ্ডগুলো আবশ্যিকভাবে এক, কারণ এগুলো তিনটি আলাদা মন গঠন করে না, বরং প্রত্যেকে গোটা মনকে পরিপূর্ণ করে রাখে ও বাকি দুটোকে আবৃত করে: 'আমার মনে আছে যে, স্মৃতি, উপলব্ধি আর ইচ্ছা আছে আমার; আমি বুঝি যে আমি বুঝি, আমার ইচ্ছা আছে ও আমি মনে করতে পারি। আমি আমার নিজস্ব ইচ্ছা, উপলব্ধি ও স্মৃতিশক্তিকে পরিচালিত করতে পারি।'[৩৮] কাপাদোসিয়দের বর্ণিত স্বর্গীয় ট্রিনিটির মতো তিনটি উপাদানের সবগুলোই, সুতরাং, 'একটি জীবন, একটি মন ও একটি সত্তা তৈরি করে।'[৩৯]

AMARBOI.COM

তবে আমাদের মনের কর্মধারা বোঝাটা কেবল প্রথম পদক্ষেপ: আমরা আমাদের মনে যে ট্রিনিটির মুখোমুখি হই, সেটা স্বয়ং ঈশ্বর নন, বরং আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরের একটা চিহ্ন। আথানাসিয়াস ও গ্রেগরি অভ নাইসা উভয়ই মানুষের আত্মায় ঈশ্বরের পরিবর্তনকারী উপস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে আয়নায় প্রতিফলনের তুলনা টেনেছিলেন। একে সঠিকভাবে বোঝার জন্যে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে গ্রিকরা আয়নায় সৃষ্ট প্রতিবিম্বকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করত, দর্শকের চোখ থেকে বিচ্ছুরিত আলো বস্তু হতে আসা আলোর সঙ্গে মিলে কাঁচের গায়ে আকৃতির সৃষ্টি করে।[৪০] অগাস্তিনের বিশ্বাস ছিল, মনের ট্রিনিটিও একটা প্রতিফলন যাতে ঈশ্বরের উপস্থিতি রয়েছে, যা তাঁর দিকে গমন করে।[৪১] কিন্তু কীভাবে আমরা আয়নায়

গভীরভাবে সৃষ্ট প্রতিফলিত ইমেজ পেরিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি? কেবল মানবীয় প্রয়াসে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কেবল ঈশ্বর বাণীর রূপ ধরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছিলেন বলেই আমরা আমাদের মাঝে ঈশ্বরের প্রতিরূপ পুনঃস্থাপিত করতে পারি, পাপের দরুণ যা ক্ষতিগ্রস্ত বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের আমরা স্বর্গীয় কর্মকাণ্ডের কাছে মেলে ধরি যা আমাদের তিন রকম শৃঙ্খলার সাহায্য বদলে দেবে, অগাস্তিন যাকে বলছেন বিশ্বাসের ট্রিনিটি: *রেতিনিও* (আমাদের মনে অবতারের সত্য ধারন), কনতেমপ্লাতিও (সেগুলোর কথা ভাবা) ও *দাইলেকতি* (সেগুলোর মাঝে আনন্দ লাভ করা)। এভাবে ক্রমশঃ আমাদের মনে ঈশ্বরের উপস্থিতির ধারাবাহিক বোধ জাগানোর ভেতর দিয়ে ট্রিনিটি প্রকাশিত হবে।[৪২] এই জ্ঞান স্রেফ বুদ্ধিগত তথ্যের সংগ্রহ নয়, বরং এক সৃজনশীল অনুশীলন যা আমাদের সত্তার গভীরতর প্রদেশে এক স্বর্গীয় মাত্রার প্রকাশ ঘটিয়ে আমাদেরকে বদলে দেবে।

পশ্চিমা বিশ্বে সেটা ছিল অন্ধকার, ভয়ানক সময়। বিভিন্ন বর্বর গোত্র ইউরোপে অনুপ্রবেশ করে রোমান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল: পশ্চিমে সভ্যতার পতন অনিবার্যভাবে সেখানে ক্রিশ্চান আধ্যাত্মিকতার ওপর প্রভাব ফেলেছিল। অগাস্তিনের মহান শিক্ষক আমব্রোস এমন এক ধর্মবিশ্বাসের প্রকাশ করেছিলেন যেটা ছিল অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আত্মরক্ষামূলক: *ইন্টেগ্রেতাস* বা সামগ্রিকতা ছিল এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ। চার্চকে এর মতবাদের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হচ্ছিল এবং ভার্জিন মেরির নিষ্পাপ দেহের মতো বর্বরদের মিথ্যা মতবাদ হতে একে মুক্ত রাখতেই হবে (যাদের অনেকেই আরিয়ানিজমে দীক্ষা নিয়েছিল)। অগাস্তিনের পরবর্তী কালের রচনায় এক গভীর দুঃখবোধও রয়েছে। রোমের পতন তাঁর আদি পাপ-এর মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল, পরবর্তীকালে যা পশ্চিমা বিশ্বদৃষ্টির রূপ পাবে। অগাস্তিন বিশ্বাস করতেন যে, স্রেফ আদমের পাপের কারণে ঈশ্বর মানুষকে অনন্ত নরক যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করেছেন। এই সহজাত অপরাধ যৌন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁর সকল বংশধরদের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে, যৌনক্রিয়া আবার, অগাস্তিন যাকে বলেছেন, 'উদগ্র-লালসায়' দূষিত। উদগ্র-লালসা হচ্ছে ঈশ্বরের পরিবর্তে তুচ্ছ প্রাণীর মাঝে আনন্দ সন্ধান; যৌনক্রিয়ার সময় যখন আমাদের যুক্তিবোধ কামনা ও আবেগে পুরোপুরি ভেসে যায়, যখন ঈশ্বর পুরোপুরি বিস্মৃত হন ও প্রাণীকূল নির্লজ্জভাবে পরস্পরকে নিয়ে আনন্দে মগ্ন হয়, তখন প্রবলভাবে এটা অনুভূত হয়। শিহরণের ডামাডোল ও বেসামাল কামনায় যুক্তির এই প্রতীক বা ইমেজের পতন ঘটে। অবৈধ কামনা অস্বস্তি করভাবে বর্বরদের হাতে পশ্চিমে আইন-শৃঙ্খলার যুক্তির উৎস রোমের

AMARBOI.COM

পতনের মতো। অগাস্তিনের কঠোর মতবাদ এ দুইকে মিলিয়ে এক নিষ্করুণ ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন:

> পাপের ফলে (স্বর্গ হতে) বহিষ্কৃত আদম তাঁর উত্তরসুরিকেও মৃত্যু ও নরকবাসের সাজায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যে উত্তরসূরিকে তিনি স্বয়ং পাপের দ্বারা একেবারে শেকড়ে বিনষ্ট করেছেন; সুতরাং (উদগ্র যৌন লালসার মাধ্যমে, যার দ্বারা অবাধ্যতার কারণে তাঁর ওপর এক জুৎসই শাস্তি আরোপ করা হয়েছিল) তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীনি হতে–যিনি তাঁর পাপের কারণ এবং শাস্তিভোগোর সঙ্গীনি হতে–নতুন যে বংশধরই আসুক না কেন আদি পাপের ভার বহন করতে হবে তাঁকে যুগ যুগ ধরে, যার দ্বারা চূড়ান্ত ভাবে বিদ্রোহী দেবদূতদের সঙ্গে সীমাহীন শাস্তির মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত ...এটা নিজেই অসংখ্য ভ্রান্তি ও দুঃখের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে, সুতরাং, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, মানুষের হতভাগ্য পিণ্ডটি নিথর পড়েছিল, গড়াগড়ি যাচ্ছিল অশুভের মাঝে; এক ভ্রান্তি থেকে আরেক ভ্রান্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল; যোগ দিয়েছে পাপাচারী একদল দেবদূতের সঙ্গে, সবচেয়ে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত মাশুল গুনছে।[৪৩]

AMARBOI.COM

ইহুদি বা গ্রিক অর্থডক্স ক্রিশ্চানদের ক্ষেত্রেই আদমের পতনকে এমন ভয়ানক দৃষ্টিতে দেখেনি; পরবর্তীকালে মুসলিমরাও আদি পাপের এমন কঠোর ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করেনি। পশ্চিমে অনন্য এই মতবাদ অতীতে তারতুলিয়ানের বর্ণিত ঈশ্বরের চেহারা আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

অগাস্তিন আমাদের এক কঠিন ঐতিহ্যের উত্তরসূরি করে গেছেন। যে ধর্মটি নারী ও পুরুষকে আপন মানব সত্তাকে বংশপরম্পরায় ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে দেখার শিক্ষা দেয়, সেটা তাদেরকে আপন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। সাধারণভাবে যৌনতাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা ও বিশেষ করে নারীদের অসম্মানে এই বিচ্ছিন্নতা অনেক বেশি স্পষ্ট। যদিও আদিতে খৃস্টধর্ম নারীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ছিল, কিন্তু অগাস্তিনের সময়েই এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতায় আক্রান্ত হয়েছিল এটা। নারীদের প্রতি জেরোমির বিদ্বেষপূর্ণ চিঠিপত্রগুলোকে কখনও কখনও বিকৃতির পরিচায়ক বলে মনে হয়। তার্তুলিয়ান নারীদের অশুভ প্রলোভন ও মানব জাতির জন্যে চিরকালীন বিপদ বলে অভিযুক্ত করেছিলেন:

> তোমরা কী জান না যে, তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন ইভ? বর্তমান যুগে তোমাদের লিঙ্গের ওপরই ঈশ্বরের সাজা বহাল আছে: অপরাধকে

প্রয়োজনের তাগিদে থাকতে হবে। *তোমরা* শয়তানের দরজা; *তোমরা* সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের উন্মোচক; *তোমরা* স্বর্গীয় আইনের প্রথম লঙ্ঘনকারী; *তোমরাই* সেই শয়তান যাকে আক্রমণ করার সাহস পায়নি, তাকে প্রলুব্ধ করেছ। *তোমরা* ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মানুষকে হেলাফেলায় ধ্বংস করেছ। *তোমাদের* সীমালঙ্ঘনের কারণে এমনকি ঈশ্বরের পুত্রকেও মরতে হয়েছিল।[৪৪]

সায় দিয়েছেন অগাস্তিন; 'মা হোক বা স্ত্রী হোক, কী এসে যায়,' এক বন্ধুকে লিখেছিলেন তিনি, 'তারপরও এরা প্রলুব্ধকারীই, প্রত্যেক নারীর ভেতর যার অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।'[৪৫] আসলে ঈশ্বর যে নারী সৃষ্টি করেছেন, এটা নিয়েই বিভ্রান্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন অগাস্তিন, 'যদি আদমের একজন ভালো সঙ্গী ও কথা বলার মানুষের প্রয়োজন থেকেই থাকে, সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সৃষ্টি না করে বন্ধু হিসাবে দুজন পুরুষের ব্যবস্থা করলেই অনেক ভালো হতো।'[৪৬] সন্তান ধারণই নারীর একমাত্র কাজ, যার ফলে যৌন রোগের মতো আদি পাপ পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। যে ধর্মটি মানবজাতির অর্ধাংশকে বাঁকা চোখে দেখে আর অনিচ্ছাকৃত যেকোনও মন, হৃদয় ও দেহের নড়াচড়াকে মনে করে মারাত্মক উগ্র যৌন লালসা, সে ধর্মটি কেবল নারী ও পুরুষকে তাদের অবস্থানচ্যুতই করতে পারে। পশ্চিমা খৃস্টধর্ম কখনওই এই বিকৃত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের বিন্যাসের প্রতিটি পর্যায়ে ভারসাম্যহীন প্রতিক্রিয়ায় এটা এখনও চোখে পড়ে। পুবের নারীরা যখন এই সময়ে ওইকুমিনের নারীদের বহনকারী হীনম্মন্যতার ভার বহন করছিল, তখন পশ্চিমে তাদের বোনেরা বহন করেছিল ঘৃণা ও পাপময় যৌনতার বাড়তি ছাপ; যে ঘৃণা আর আতঙ্ক তাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ঈশ্বরের ধারণা যেখানে দেহে পরিণত হয়েছে ও আমাদের মানবীয় পরিচয়ের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে ক্রিশ্চানদের দেহের প্রতি আরও মর্যাদাশীল হওয়া উচিত ছিল, উল্টো ব্যাপারটি ঘটা অদ্ভুত এক পরিহাস বটে। এই জটিল বিশ্বাস নিয়ে আরও বিতর্ক হয়েছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আপোলিনারিয়াস নেস্টোরিয়াস ও ইউতিচেস-এর মতো 'ধর্মদ্রোহীগণ' কঠিন সব প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন। সৃষ্টের ঐশ্বরিকতা কীভাবে তার মানবরূপের সঙ্গে খাপ খেয়েছে? মেরি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মাতা নন, বরং মানুষ জেসাসের মাতা? ঈশ্বর অসহায় ক্রন্দনরত শিশু হন কীভাবে? বরং এটাই বলা কি বেশি সঙ্গত নয় যে তিনি মন্দিরের মতো খৃস্টের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন? স্পষ্ট সামঞ্জস্যহীনতা সত্ত্বেও অর্থডক্সরা তাদের মতবাদ আঁকড়ে ছিল। বিশপ অভ

আলেকজান্দ্রিয়া সিরিল আথানাসিয়াসের বিশ্বাস পুনরাবৃত্তি করেন: ঈশ্বর প্রকৃতই আমাদের পঙ্কিল জগতে এত গভীরভাবে নেমে এসেছিলেন যে তাঁকে এমনকি মৃত্যু ও অসহায়ত্বের স্বাদও গ্রহণ করতে হয়েছে। ঈশ্বর সম্পূর্ণ যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে, কষ্টভোগ বা পরিবর্তনে অক্ষম, এরকম দৃঢ় একটা বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিশ্বাস মেলানো কঠিন মনে হয়েছে। প্রধানত স্বর্গীয় *আপাথিয়া* দিয়ে বৈশিষ্ট্যায়িত গ্রিকদের দূরবর্তী ঈশ্বরকে জেসাস ক্রাইস্টের মাঝে দেহধারণকারী ঈশ্বর হতে একেবারেই আলাদা মনে হয়েছে। অর্থডক্সরা ভেবেছে কষ্ট ভোগকারী অসহায় ঈশ্বরের ধারণাকে প্রবল আক্রমণাত্মক হিসাবে আবিষ্কারকারী 'ধর্মদ্রোহীরা' এর রহস্য ও বিস্ময়ের ঐশীরূপ বিনষ্ট করতে চেয়েছেন। অবতারবাদের বৈপরীত্যকে হেলেনিক ঈশ্বরের প্রতিষেধক মনে হয়–যিনি আমাদের আত্মতুষ্টি দূর করার জন্যে কিছুই করেননি এবং যিনি পুরোপুরি যৌক্তিক ছিলেন।

৫২৯ সালে সম্রাট জাস্তিনিয়ান অ্যাথেন্সে বুদ্ধিবৃত্তিক পৌত্তলিকতাবাদের শেষ ঘাঁটি দর্শনের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ বন্ধ করে দেন: এর শেষ পণ্ডিত ছিলেন প্লটিনাসের বিশেষ অনুরাগী শিষ্য প্রক্লাস (৪১২-৪৮৫)। পৌত্তলিক দর্শন আড়ালে চলে যায় এবং নতুন খৃস্টধর্মের কাছে পরাস্ত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যাহোক, চার বছর পর চারখানা অতিন্দ্রীয়বাদী প্রবন্ধ রচনা প্রকাশিত হয় যেগুলোর রচয়িতা সেইন্ট পলের প্রথম আথেনিয় দীক্ষাপ্রাপ্ত ডেনিস দ্য আরোপাগাইত হিসাবে কথিত। আসলে এগুলো লিখেছিলেন পরিচয় গোপন করে যাওয়া জনৈক ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রিক ক্রিশ্চান। কিন্তু ছদ্মনামের একটা প্রতীকী ক্ষমতা ছিল, যা মূল লেখকের পরিচয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ: ছদ্ম-ডেনিস নিওপ্লেটোনিজমের দর্শনকে ব্যাপ্টাইজ করতে সক্ষম এবং গ্রিকদের ঈশ্বরের সঙ্গে বাইবেলের সেমেটিক ঈশ্বরকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ডেনিস কাপাদোসিয় পাদরিদেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন। বাসিলের মতো তিনিও *কেরিগমা ও ডগমার* পার্থক্যকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। এক চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, দুটো ধর্মতত্ত্বীয় ধারা রয়েছে এবং দুটোই অ্যাপসলদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। *কেরিগমা* সম্বলিত গস্পেলসমূহ স্পষ্ট ও সহজবোধ্য এবং ডগমা সম্পর্কিত গস্পেলগুলো অস্পষ্ট ও অতিন্দ্রীয়। অবশ্য দুটোই পরস্পর হতে স্বাধীন, কিন্তু খৃস্টধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটা 'প্রতীকী ও শিষ্যত্বে'র কথা বলে, আর অপরটি 'দার্শনিক ও প্রমাণের ক্ষমতা রাখে'–এবং সব কিছুর মাঝে অনির্বচনীয় বিজড়িত।'[৪৭] *কেরিগমা* এর স্পষ্ট প্রকাশিত সত্য দিয়ে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়, কিন্তু *ডগমার* নীরব বা গুপ্ত ধারা এক রহস্য যা দীক্ষার দাবি করে: 'এটা দীক্ষার মাধ্যমে আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ও কার্যকর করে যা কিছু



AMARBOI.COM

শিক্ষা দেয় না।'[৪৮] অ্যারিস্টটলের মতোই একই ভাষায় জোর দিয়ে একথা বলেছেন ডেনিস। এক রকম ধর্মীয় সত্য আছে যা কখনও ভাষা, যুক্তি বা যুক্তিভিত্তিক আলোচনা দিয়ে স্পষ্টভাবে বোঝানো সম্ভব নয়। এর প্রকাশ ঘটে প্রতীকের সাহায্যে, সাহিত্যের ভাষা বা ভঙ্গির মাধ্যমে, কিংবা মতবাদ দ্বারা, যেগুলো 'পবিত্র আড়াল,' যা অনির্বচনীয় অর্থকে দৃষ্টির আড়ালে রেখেছে কিন্তু যা আবার চরম রহস্যময় ঈশ্বরকে মানুষের প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার সঙ্গে অভিযোজিত করে ও ধারণাগতভাবে না হলেও অন্তত কাল্পনিকভাবে বোধগম্য রূপে বাস্তবতাকে (Reality) প্রকাশ করে।[৪৯]

গুপ্ত বা নিগূঢ় অর্থ কেবল সুবিধাপ্রাপ্ত অভিজাতদের জন্যে নয় বরং সকল ক্রিশ্চানের জন্যে। ডেনিস কেবল সাধু সন্ন্যাসীদের উপযুক্ত কষ্টকর কোনও শৃঙ্খলার পক্ষে কথা বলেননি। সকল বিশ্বাসীর অনুসৃত শাস্ত্রাচার ঈশ্বরকে লাভ করার প্রধান উপায়। তাঁর ধর্মতত্ত্বে এরই প্রাধান্য ছিল। এক শক্ত পর্দার আড়ালে এসব সত্য লুকায়িত থাকার উদ্দেশ্য নারী-পুরুষকে শুভ ইচ্ছা হতে বঞ্চিত করা নয়, বরং সকল ক্রিশ্চানকে অনুমান ও ধারণার বোধ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে স্বয়ং ঈশ্বরের অব্যক্ত সত্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। যে বিষয় কাপাদোসিয়দের সকল ধর্মতত্ত্ব অ্যাপোফ্যাটিক হওয়া উচিত, এই দাবি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল সেটাই ডেনিসের জন্যে অপ্রকাশযোগ্য ঈশ্বরের কাছে যাবার এক শক্তিশালী পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ডেনিস 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করারই পক্ষপাতি ছিলেন না—এর কারণ সম্ভবত শব্দটি অপর্যাপ্ত ও মানুষ-সদৃশ্য একটা সুর পেয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রক্লাসের *থিউলজি* কথাটি পছন্দ করতেন প্রধানত যা শাস্ত্রীয় ছিল: পৌত্তলিক জগতে *থিউলজি* ছিল উৎসর্গ ও স্বর্গীয়করণের মাধ্যমে স্বর্গীয় *মানা* আহরণের উপায়। ঈশ্বর-আলোচনায় ডেনিস এর প্রয়োগ করেছেন, যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা গেলে প্রকাশিত প্রতীকে বিজড়িত স্বর্গীয় *energeiai*-ও উন্মুক্ত করতে পারে। তিনি কাপাদোসিয়দের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে ঈশ্বরের জন্যে সকল ধারণা ও ভাষাই অপর্যাপ্ত এবং একে অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের অতীত এক সত্তার সঠিক বিবরণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি খোদ 'ঈশ্বর' শব্দটিও ক্রটিপূর্ণ, কেননা ঈশ্বর 'ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে,' 'সত্তার অতীত এক রহস্য।'[৫০] ক্রিশ্চানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে ঈশ্বর, নিম্নস্তরের সত্তাসমূহের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত আরেকটি সত্তা নন। মানুষ বা অন্যান্য জিনিস ঈশ্বরের বিপরীতে এক আলাদা সত্তা বা বিকল্প সত্তা হিসাবে দাঁড়ায় না, যা জানার কোনও বিষয় হতে পারে। অস্তিত্ব আছে এমন জিনিসগুলোর একটি নন ঈশ্বর; তিনি আমাদের অভিজ্ঞতাজাত যেকোনও কিছুর চেয়ে আলাদা। আসলে ঈশ্বরকে বরং 'কিছু না' ডাকাই অধিক সঠিক: এমনকি তিনি আমাদের

ট্রিনিটি কোনওটাই নন।'[৫১] তিনি যেমন সকল সত্তার উর্ধ্বে তেমনি সকল নামেরও উর্ধ্বে।[৫২] তারপরেও আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হওয়ার একটা পদ্ধতি হিসাবে আমাদের অক্ষমতাকে তাঁর কথা বলার জন্যে ব্যবহার করতে পারি, যা আমাদের প্রকৃতির *'দেবাত্বোরোপণ'* (*theosis*) ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বর 'পিতা,' 'পুত্র' ও 'আত্মা'র মতো তাঁর কোনও কোনও নাম ঐশীগ্রন্থে আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এগুলোর উদ্দেশ্য তাঁর সম্পর্কে তথ্য জানানো নয়, বরং নারী ও পুরুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে তাদের তাঁর স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশ গ্রহণে সক্ষম করে তোলা।

*দ্য ডিভাইন নেমস্* শিরোনামের প্রবন্ধের প্রত্যেক অধ্যায়ে ঈশ্বর প্রকাশিত একটি *কেরিগমা* সম্পর্কিত সত্য দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন ডেনিস: তাঁর মহত্ব (goodness), প্রজ্ঞা, পিতৃত্ব, ইত্যাদি। এরপর তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে যদিও ঈশ্বর এসব উপাধি দিয়ে তাঁর একটা কিছুর প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কিন্তু তিনি যা প্রকাশ করেছেন সেটা স্বয়ং তিনি নন। আমরা সত্যিই ঈশ্বরকে বুঝতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই এসব গুণাবলী ও নাম অস্বীকার করতে এগিয়ে যেতে হবে। এভাবে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে তিনি 'ঈশ্বর' আবার 'ঈশ্বর-নন,' 'ভালো' বলেই আবার যোগ করতে হবে তিনি 'ভালো-নন' বিপরীত এই ধাক্কা, জানা ও অজানা উভয়কেই ধারণকারী একটি প্রক্রিয়া আমাদের পার্থিব ধারণাসমূহের উর্ধ্বে তুলে নেবে, আমরা স্বয়ং আপ্রকাশঅযোগ্য সত্তার কাছে পৌঁছে যাব। এভাবে আমরা একথা বলে শুরু করব যে:

> তাঁর সম্পর্কে উপলব্ধি, যুক্তি, জ্ঞান, স্পর্শ, ধারণা, কল্পনা, নাম ও আরও বহু জিনিস রয়েছে। কিন্তু তাঁকে বোঝা যায় না, তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা যায় না, তাঁকে নামও দেওয়া যায় না। তিনি বস্তুসমূহের একটি নন।[৫৩]

সুতরাং ঐশীগ্রন্থ পাঠ ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য অবগত হবার কোনও প্রক্রিয়া নয় বরং *কেরিগমাকে* ডগমায় রূপান্তরিত এক বৈপরীত্যপূর্ণ অনুশীলন হওয়া উচিত। এই পদ্ধতি একটি *থিউরজি*, স্বর্গীয় ক্ষমতা ধারণ যা আমাদের স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে আরোহণে সক্ষম করে তোলে এবং, প্লটিনাস সব সময় যেমন শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আমরা স্বর্গীয় হয়ে উঠি। এটা আমাদের চিন্তা বন্ধ করার একটি পদ্ধতি! আমাদেরকে ঈশ্বর সম্পর্কিত সকল ধারণা ত্যাগ করে যেতে হবে। আমরা আমাদের মনের ক্রিয়া থামাতে বলি।[৫৪] এমনকি ঈশ্বরের গুণাবলীর অস্বীকৃতিও পেছনে ফেলে যেতে হবে। তাহলে এবং কেবল তাহলেই আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পরমানন্দদায়ক ঐক্য অর্জন করতে পারব।

AMARBOI.COM

পরমানন্দের কথা বলতে গিয়ে মনের বিচিত্র অবস্থা কিংবা অস্পষ্ট যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত সচেতনতার বিকল্প ধরনের কথা বোঝাননি ডেনিস। এটা প্রার্থনা ও *থিয়োরিয়ার* বিপরীতধর্মী পদ্ধতিতে প্রত্যেক ক্রিশ্চানের আয়ত্ত করার মতো একটা ব্যাপার। এটা আমাদের কথা বন্ধ করবে এবং আমাদের নীরব স্থানে পৌঁছে দেবে। 'আমরা যখন বুদ্ধির অতীত সেই অন্ধকারে ঝাঁপ দেব, আমরা কেবল ভাষার অভাব দ্বারাই আক্রান্ত হব না, বরং আবিষ্কার করব যে আমরা বাকহারা ও জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছি।'[৫৫] গ্রেগরি অভ নাইসার মতো তিনিও. মোজেসের সিনাই পর্বতে আরোহণের কাহিনীকে উপদেশমূলক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মোজেস পাহাড়ে ওঠার পর স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখতে পাননি, কেবল ঈশ্বর যেখানে ছিলেন সেখানেই উপস্থিত হয়েছিলেন। এক ঘন মেঘের অস্পষ্টতায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন তিনি, কিছুই দেখতে পাননি: এভাবে আমরা যেসব দেখতে বা বুঝতে পারি সেগুলো প্রতীকমাত্র (ডেনিস *Paradigm* শব্দটি ব্যবহার করেছেন) যা সকল চিন্তার অতীত এক সত্তার উপস্থিতি প্রকাশ করে। মোজেস অজ্ঞতার অন্ধকারে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং এর ফলে এমন কিছুর সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছেন যা সকল উপলব্ধিকে ছাড়িয়ে যায়: আমরাও একই রকম আনন্দ লাভ করতে পারব যা আমাদেরকে 'আমাদের সত্তার বাইরে নিয়ে' ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দেবে।

ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পর্বতশীর্ষে নেমে আসেন বলেই কেবল এটা সম্ভব। এখানেই নিওপ্লেটোনিজম থেকে সরে এসেছেন ডেনিস। নিওপ্লেটোনিজমে ঈশ্বরকে স্থির ও দূরবর্তী মনে করা হয়েছে, যিনি মানবীয় প্রয়াসে কোনও সাড়া দেন না। গ্রিক দার্শনিকগণের ঈশ্বর যেসব অতিন্দ্রীয়বাদী হঠাৎ করে তাঁর সঙ্গে আনন্দময় মিলনে সক্ষম হতো তাদের ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন, অথচ বাইবেলের ঈশ্বর মানুষের কাছে আসেন। ঈশ্বরও এক 'পরমানন্দ' লাভ করেন যা তাঁকে নিজেকে ছাড়িয়ে সৃষ্ট সত্তার নাজুক জগতে নিয়ে আসে:

> এবং আমাদেরকে সাহস করে অবশ্যই নিশ্চিত করে বলতে হবে (কেননা এটাই সত্যি) যে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা স্বয়ং বিশ্বের প্রতি তাঁর চমৎকার ও সুন্দর আকাঙ্ক্ষা হতে...তাঁর সদয় কার্যক্রমের মাধ্যমে আপনার মাঝে হতে বেরিয়ে আসেন সত্তা আছে এমন সব জিনিসের দিকে...এবং এভাবে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর অলৌকিক আসন থেকে নেমে আসেন এক আনন্দময় ক্ষমতার মাধ্যমে সকল সত্তার অন্তরে বাস করার জন্যে, এক আনন্দময় ক্ষমতায় যা সকল সত্তার ঊর্ধ্বে এবং যার মাধ্যমে তিনি আবার নিজের মাঝেই রয়ে যান।[৫৬]

AMARBOI.COM

এক স্বয়ংক্রিয়া প্রক্রিয়ার বদলে উৎসারণ ভালোবাসা প্রকাশের এক আবেগময় ও স্বতঃস্ফূর্ততায় পরিণত হয়েছিল। ডেনিসের অস্বীকৃতি ও স্ববিরোধিতার কৌশলটি আমরা করি এমন কিছু নয়, এটা এমন কিছু যা আমাদের মাঝে ঘটে।

প্লটিনাসের বেলায় 'পরমানন্দের' ব্যাপারটি ছিল খুবই আকস্মিক ব্যাপার: জীবনে মাত্র দু-তিনবার এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তিনি। ডেনিস পরমানন্দকে প্রত্যেক ক্রিশ্চানের সার্বক্ষণিক অবস্থা হিসাবে দেখেছেন। এটাই ঐশীগ্রন্থ বা শাস্ত্রের গুপ্ত বা নিগূঢ় বাণী, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভঙ্গিমায় যার প্রকাশ। এভাবে পুরোহিত যখন প্রার্থনা সভার শুরুতে বেদী ছেড়ে প্রত্যাবর্তনের আগে জমায়েতের ভেতর দিয়ে পানি ছিটিয়ে সাঙ্কচুয়্যারির দিকে এগোন, সেটা কেবল পরিশুদ্ধকরণের একটা আচার থাকে না–যদিও তা একটা আচারও বটে–স্বর্গীয় আনন্দের অনুকরণ করে এটা, যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর নির্জনতা ত্যাগ করে সৃষ্ট জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেন। ডেনিসের ধর্মতত্ত্বকে বোঝার সবেচেয়ে সেরা উপায় সম্ভবত এই যে, ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যতটা নিশ্চয়তা দিতে পারি এবং আমাদের বলার সত্যের সবটুকুই যে প্রতীকী এটা উপলব্ধি করার মাঝে আধ্যাত্মিক নাচ হিসাবে একে বিবেচনা করা। ইহুদিবাদের মতো ডেনিসের ঈশ্বরের দুটো বৈশিষ্ট্য রয়েছে: একটা আমাদের দিকে ফেরানো এবং জগতে নিজেকে প্রকাশ করে; অপরটি ঈশ্বরের দূরবর্তী দিক, যা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য থেকে যায়। তিনি তাঁর চিরকালীন রহস্যের মাঝে 'নিজের মধ্যেই রয়ে যান,' আবার একই সময় সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ মিশে থাকেন। জগতের অতিরিক্ত আরেকটি সত্তা নন তিনি। গ্রিক ধর্মতত্ত্বে ডেনিসের পদ্ধতিটি আদর্শে পরিণত হয়। অবশ্য পশ্চিমের ধর্মবিদরা আলোচনা ও ব্যাখ্যা অব্যাহত রাখবেন। কেউ কেউ কল্পনা করেছে যে যখন তারা 'ঈশ্বর' শব্দটি উচ্চারণ করে তখন স্বর্গীয় সত্তাটি মনের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। কেউ কেউ আবার তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ঈশ্বরের প্রয়োগ করবে–বলবে ঈশ্বর এটা চেয়েছেন, ওটা নিষেধ করেছেন এবং সেটা পরিকল্পনা করেছেন–এক অর্থে যা বিপজ্জনক রকম পৌত্তলিকতাবাদী। কিন্তু গ্রিক অর্থডক্সের ঈশ্বর রহস্যময়ই রয়ে যাবেন ও ট্রিনিটি প্রাচ্যের ক্রিশ্চানদের কাছে তাদের মতবাদ সমূহের বৈশিষ্ট্যেও কথা মনে করিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত গ্রিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, প্রকৃত ধর্মতত্ত্বকে অবশ্যই ডেনিসের দুটো যোগ্যতা পূরণ করতে হবে: একে একাধারে নীরব এবং স্ববিরোধী (Paradoxical) হতে হবে।

গ্রিক ও লাতিনরাও সৃষ্টের ঐশ্বরিকতা সম্পর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিল। অবতারবাদের গ্রিক ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন বাইযান্তাইন ধর্মতত্ত্বের জনক হিসাবে পরিচিত ম্যাক্সিমাস দ্য কনফেসর (৫৮০-৬৬২)। এর সঙ্গে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বরং বৌদ্ধ

AMARBOI.COM

আদর্শের অনেক বেশি মিল। ম্যাক্সিমাস বিশ্বাস করতেন যে কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হলেই মানুষ পূর্ণতা পেতে পারে, ঠিক যেমন বৌদ্ধদের বিশ্বাস ছিল, আলোকপ্রাপ্তিই মানুষের আসল গন্তব্য। এভাবে ঈশ্বর ঐচ্ছিক, মানুষের অবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া বাহ্যিক অচেনা সত্তা বা বিষয় নন। নারী-পুরুষের *অলৌকিকের* যোগ্যতা রয়েছে, তা অর্জিত হলেই সে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। আদমের পাপের মোচন ঘটাতে লোগোস মানবমূর্তি ধরেননি; প্রকৃতপক্ষে আদম পাপ না করলেও অবতারের ব্যাপারটা ঘটত। লোগোসের অনুরূপে নারী-পুরুষের সৃষ্টি করা হয়েছিল, একমাত্র এই মিলটি নিখুঁত হলেই তারা পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারবে। তাবর পাহাড়ে জেসাসের মহিমান্বিত মানবরূপ আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানবীয় অবস্থা দেখিয়েছে। বাণীকে দেহ দান করা হয়েছে যাতে করে 'গোটা মানবজাতি মানবরূপী ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরে পরিণত হতে পারে সম্পূর্ণ দেহ এবং আত্মায়, প্রকৃতি ও পূর্ণ ঈশ্বরে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে, আত্মা এবং দেহে এবং কৃপায়।'[৫৭] আলোকন ও বুদ্ধত্বের ক্ষেত্রে যেমন অতিপ্রাকৃত সত্তার হস্ত ক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত হয়নি, বরং মানুষের জন্যে স্বাভাবিক ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, এখানেও দেবতায় পরিণত খৃস্ট আমাদের দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের কৃপায় আমরা কোন স্তরে উঠতে পারি। ক্রিশ্চানরা বরং সেভাবেই মানব-ঈশ্বর জেসাসকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে যেভাবে বৌদ্ধরা আলোকপ্রাপ্ত গৌতমের মূর্তিকে শ্রদ্ধা দেখায়: তিনিই (বুদ্ধ) ছিলেন মহিমান্বিত এবং সম্পূর্ণ মানুষের প্রথম উদাহরণ।

অবতারবাদের গ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি খৃস্টধর্মকে যেখানে প্রাচ্যের ঐতিহ্যের অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল, জেসাস সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে একেবারে ভিন্ন পথ গ্রহণ করে। ধ্রুপদী ধর্মতত্ত্বের উদ্গাতা বিশপ অভ ক্যান্টারবারি, আনসেল্ম (১০৩৩-১১০৯) তাঁর *হোয়াই গড বিকেইম ম্যান* প্রবন্ধে এই মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, পাপ এত বড় মাত্রার অবমাননা ছিল যে মানবজাতিকে নিয়ে গৃহীত পরিকল্পনা বাতিল না করার জন্যে পাপ মোচন ছিল অত্যাবশ্যক। আমাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে বাণীকে দেহ দান করা হয়েছিল। ঈশ্বরের বিচারের দাবি ছিল এমন একজনকে দায় শোধ করতে হবে যিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ: অপরাধের মাত্রা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে কেবল ঈশ্বরের পুত্রই আমাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারবেন, কিন্তু অপরাধী যেহেতু মানুষ ছিল, তাই মুক্তিদাতাকেও মানবজাতির সদস্য হতে হবে। এটা এক গোছানো, আইনসম্মত প্রকল্প যেখানে ঈশ্বরকে চিন্তাশীল, যাচাইকারী ও বিশ্লেষণকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন তিনি একজন মানুষ। এটা নিষ্ঠুর ঈশ্বরের পাশ্চাত্য ভাবমূর্তি আরও জোরাল

AMARBOI.COM

করেছিল, যিনি একধরনের মানব-উৎসর্গের মতো করে নিবেদিত আপন পুত্রের ভয়ঙ্কর মৃত্যুতেই সন্তুষ্ট হতে পারেন।

পাশ্চাত্য জগতে প্রায়শঃই ট্রিনিটির মতবাদকে ভুল বোঝা হয়েছে। মানুষ তিনটি আলাদা স্বর্গীয় চরিত্র কল্পনা করতে চায়, কিংবা গোটা মতবাদটিকে অগ্রাহ্য করে 'ঈশ্বর'কে পিতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে ও জেসাসকে বানায় স্বর্গীয় বন্ধু–ঠিক সমপর্যায়ের নয়। মুসলিম এবং ইহুদিরাও এ মতবাদকে বিভ্রান্তিকর, এমনকি ব্লাসফেমাস মনে করেছে। কিন্তু তারপরেও আমরা দেখব ইহুদিবাদ ও ইসলামের অতিন্দ্রীয়বাদীরা আশ্চর্যজনকভাবে একই ধরনের ঐশ্বরিক ধারণা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, *কেনোসিসের* ধারণা অর্থাৎ ঈশ্বরের নিজেকে উজার করে দেওয়ার আনন্দের ধারণাটি *কাব্বালাহ* এবং সুফীবাদ উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ট্রিনিটিতে ফাদার তিনি যা তাঁর সবটুকুই উজার করে পুত্রকে দিয়ে দেন–এমনকি ভিন্ন জগতে নিজেকে প্রকাশ করার সম্ভাবনাটুকুও। একবার বাণী উচ্চারিত হয়ে যাবার পর, বলা হয়েছে, পিতা নীরব রয়ে যান: তাঁর সম্পর্কে আমাদের আর বলার কিছু থাকে না, যেহেতু আমরা ঈশ্বর হিসাবে কেবল লোগোস বা পুত্রকেই চিনি। সুতরাং পিতার কোনও পরিচয় নেই, স্বাভাবিক অর্থে 'আমি'হীন, এবং ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে ঘোলাটে করে দেয়। 'প্রথম সত্তা'র একেবারে সূচনায় 'কিছু না' যে কেবল ডেনিস লক্ষ করেছেন তা নয়, প্লটিনাস, ফিলো এবং এমনকি বুদ্ধও দেখেছেন। পিতাকে যেহেতু খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের শেষ হিসাবে দেখা হয়, সুতরাং কোনও খ্রিস্টানের যাত্রা স্থানহীন, ঠিকানাহীন এবং সত্তাহীনের দিকে অগ্রসর হওয়ায় পরিণত হয়। ব্যক্তিক ঈশ্বর বা ব্যক্তিতে পরিণত পরম বা চরম সত্তার ধারণা মানুষের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে: হিন্দু ও বুদ্ধদের *ভক্তির* ব্যক্তি পর্যায়ের আনুগত্যের অনুমোদন দিতে হয়েছিল। কিন্তু ট্রিনিটির উদাহরণ বা প্রতীক বোঝাতে চায় যে, ব্যক্তিত্বকে অবশ্যই অতিক্রম করে যেতে হবে এবং ঈশ্বরকে মানুষের বর্ধিত রূপ ভাবা ও তাঁকে আমাদের মতো আচরণ বা চলাফেরা করছেন বলে কল্পনা করাটা যথেষ্ট নয়।

অবতারবাদের মতবাদকে বহুঈশ্বরবাদিতা রোধ করার আরেকটি পদক্ষেপ হিসাবেও দেখা যেতে পারে। একবার 'ঈশ্বর'কে 'মহাশূন্যে' সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা হিসাবে দেখা হলে অতি সহজেই তাঁর সামান্য মূর্তি বা প্রতীকে পরিণত হওয়ার সম্বাবনা থাকে, যা মানুষকে আপন বৈশিষ্ট্যর বাইরে এনে আপন সংস্কার ও আকাঙ্ক্ষার উপাসনায় সক্ষম করে তোলে। অপরাপর ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো ব্রাহ্মণ-আত্মার উদাহরণের মতো পরম সত্তা মানবীয় রূপের সঙ্গে কোনওভাবে মিশে আছেন, এমন ধারণায় জোর দিয়ে এটা ঠেকানোর প্রয়াস পেয়েছে। আরিয়াস–এবং পরে নেস্টোরিয়াস এবং ইউতিচেস–প্রত্যেকে জেসাসকে মানুষ

AMARBOI.COM

বা ঐশী সত্তার যেকোনও একটি বানাতে চেয়েছিলেন এবং তাদের বাধা দেওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল মানুষ ও ঐশীরূপকে আলাদা করে রাখার প্রবণতা। একথা ঠিক যে, তাঁদের সমাধান অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত ছিল, কিন্তু *ডগমাকে—কেরিগমার* বিপরীত—কবিতা বা সঙ্গীতের মতো পুরোপুরি প্রকাশযোগ্যতার মাঝে আটকে রাখা উচিত হবে না। অবতার মতবাদ–আথানাসিয়াস এবং ম্যাক্সিমাস কোনওভাবে যা প্রকাশ করেছেন–'ঈশ্বর' এবং মানুষ যে অবিচ্ছেদ্য হতে বাধ্য সেই বিশ্বজনীয় দর্শন প্রকাশেরই এক প্রয়াস। পশ্চিমে, যেখানে অবতারবাদের ধারণার বিকাশ এভাবে হয়নি, সেখানে ঈশ্বরের একটি বাহ্যিক সত্তা ও আমাদের পরিচিত জগতের এক বিকল্প সত্তা রয়ে যাবার প্রবণতা রয়ে গেছে। পরিণামে এই 'ঈশ্বর'কে-প্রক্ষিপ্ত করা খুব সহজ ছিল, যা সাম্প্রতিককালে অবনমিত হয়ে গেছে।

তা সত্ত্বেও জেসাসকে একমাত্র *অবতার* বানানোর মাধ্যমে, আমরা দেখেছি, ক্রিশ্চানরা ধর্মীয় সত্যের প্রশ্নে আলাদা মতবাদ গ্রহণ করেছে: জেসাস ছিলেন মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রথম ও শেষ বাণী, যার ফলে ভবিষ্যতের প্রত্যাদেশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ফলে, ইহুদিদের মতো তারাও সপ্তম শতাব্দীতে আরবে এক পয়গম্বর আবির্ভূত হয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি প্রত্যাদেশ লাভ ও আপন জাতির জন্যে এক নতুন ঐশীগ্রন্থ আনার দাবি করলে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তবু শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদের নতুন রূপ 'ইসলাম' নামে পরিচিত হয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই ধর্মটির বহু উৎসাহী নবদীক্ষিত এখানকার (যেখানে হেলেনিজম ছিল বিদেশী মতবাদ) গ্রিক ত্রিত্ববাদ হতে স্বস্তির সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সেখানে এমন এক বাগধারায় ঈশ্বরের রহস্যকে প্রকাশ করে যা তাদের অচেনা ছিল, স্বর্গীয় সত্তার অধিকতর সেমেটিক ধারণাকেই বেছে নেয় তারা।

AMARBOI.COM

# ৫.
# একত্ব: ইসলামের ঈশ্বর

৬১০ সালের দিকে হিজাজের সমৃদ্ধ শহর মক্কায় এক আরব বণিক, যিনি কোনওদিন বাইবেল পড়েননি এবং সম্ভবত ইসায়াহ্, জেরেমিয়াহ্ বা ইযেকিয়েলের নামও শোনেননি, এমন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যা আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদের অভিজ্ঞতার অনুরূপ। মক্কার কুরাইশ গোত্রের সদস্য মুহাম্মদ ইবন আব্দাল্লাহ প্রত্যেক রমযান মাসে আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন হবার উদ্দেশ্যে সপরিবারে হিরা পর্বতে যেতেন। পেনিনসুলার আরবদের মাঝে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। আরবদের পরম ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা ও পবিত্র মাসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগত দরিদ্রদের মাঝে খাবার আর অর্থ দান করে সময় কাটাতেন তিনি। সম্ভবত উদ্বেগাকুল ভাবনাতেও প্রচুর সময় ব্যয় করতেন তিনি। মুহাম্মদের (স) পরবর্তী জীবনচরিত হতে আমরা জানি যে, মক্কার সাম্প্রতিক আ[illegible]মকপ্রদ সাফল্য সত্ত্বেও সেখানকার এক উদ্বেগজনক অস্থিরতার ব্যাপারে দারুণ সজাগ ছিলেন তিনি। মাত্র দুই প্রজন্ম আগে আরবের মরুপ্রান্তরের অন্যান্য বেদুঈন গোত্রের মতো যাযাবরের কঠিন জীবন যাপন করে এসেছে কুরাইশরা: প্রতিদিন টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে কঠিন সংগ্রামের। অবশ্য ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকের বছরগুলোয় ব্যবসা-বাণিজ্যে দারুণ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় তারা এবং মক্কাকে আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত করে। ওরা এত ধনী হয়ে ওঠে যা তাদের স্বপ্নের অতীত ছিল। কিন্তু তাদের আমূল বদলে যাওয়া জীবনধারার অর্থ ছিল তীব্র ও নিষ্ঠুর এক পুঁজিবাদের কাছে প্রাচীন গোত্রীয় মূল্যবোধগুলোর পরাস্ত হয়ে যাওয়া। মানুষ কেমন যেন দিশাহারা ও উন্মূল বোধে আক্রান্ত ছিল। মুহাম্মদ (স) জানতেন যে এক বিপজ্জনক পথে এগোচ্ছে কুরাইশরা; নতুন



AMARBOI.COM

পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করার জন্যে একটা মতাদর্শ খুঁজে পাবার প্রয়োজন ছিল।

এসময় যেকোনও রাজনৈতিক সমাধানই ধর্মীয় ধরনের হতো। মুহাম্মদ (স) জানতেন, কুরাইশরা অর্থ-কেন্দ্রিক এক নতুন ধর্ম গড়ে তুলছিল। এটা খুব একটা বিস্ময়কর ছিল না, কারণ নিশ্চয়ই তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে সম্পদই যাযাবর জীবনের বিপদ থেকে তাদের 'রক্ষা' করেছে, আরবের মরুপ্রান্তরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অপুষ্টি ও গোত্রীয় সহিংসতা থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে, যেখানে প্রত্যেক বেদুঈন গোত্র প্রতিদিন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কার মোকাবিলা করত। এখন পর্যাপ্ত খাবার হয়েছে তাদের, মক্কাকে বাণিজ্য ও বিপুল বিনিয়োগের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করছিল তারা। নিজেদেরই আপন ভাগ্য নিয়ন্তা বলে ভেবেছে; কেউ কেউ এমনকি এমনও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, সম্পদ তাদের এক ধরনের অমরত্ব দান করবে। কিন্তু মুহাম্মদের (স) বিশ্বাস ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতার *(ইসতাকা)* এই কাল্ট গোত্রের বিলুপ্তি ডেকে আনবে। প্রাচীন যাযাবর আমলে সর্বাগ্রের বিবেচনা ছিল গোত্র, ব্যক্তি সব সময় দ্বিতীয় স্থানেতে ছিল: গোত্রের প্রতিটি সদস্য জানত অস্তিত্বের জন্যে তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ফলে দলের দরিদ্র ও দুর্বল সদস্যের প্রতি লক্ষ রাখাকে দায়িত্ব হিসাবে দেখতে হতো তাদের। কিন্তু এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ সাম্প্রদায়িক আদর্শের জায়গা দখল করে নিয়েছে, প্রতিযোগিতা পরিণত হয়েছে রেয়াজে। লোকেরা নিজস্ব সম্পদ গড়ে তুলছে, দুর্বল কুরাইশদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করছে না। প্রত্যেকটা ক্ল্যান বা গোত্রের ক্ষুদ্রতর পারিবারিক গ্রুপ মক্কার সম্পদের ভাগ পাওয়ার লক্ষ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছিল এবং অপেক্ষাকৃত অসফল ক্ল্যানগুলোর কোনও কোনওটা [মুহাম্মদের (স) নিজস্ব হাশিম ক্ল্যানের মতো] নিজের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন মনে করেছে। মুহাম্মদ (স) বিশ্বাস করছিলেন যে কুরাইশরা তাদের জীবনযাত্রার কেন্দ্রে আরেকটা দুর্জ্ঞেয় মূল্য যোগ করতে না শিখলে, অহংকার ও প্রলোভন হতে মুক্ত না হলে তাঁর গোত্র নৈতিক দিক দিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে; পারস্পরিক সংঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে রাজনৈতিকভাবেও।

আরবের বাকি অংশের অবস্থাও ছিল হতাশাব্যাঞ্জক। বহু শতাব্দী ধরে হিজাজ এবং নাজদ অঞ্চলের বেদুঈন গোত্রগুলো জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে অত্যাবশ্যক সাম্প্রদায়িক চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে আরবরা *মুরুওয়াহ্* নামে এক আদর্শ গড়ে তুলেছিল যা ধর্মের বহু কাজ সম্পন্ন করত। প্রচলিত ধারণায় আরবদের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না। বিভিন্ন

পৌত্তলিক দেবতারা ছিলেন, আরবরা তাঁদের মন্দিরে উপাসনা করত, কিন্তু তারা এমন কোনও মিথলজি গড়ে তোলেনি যা এসব দেবতার ও পবিত্র স্থানের সঙ্গে জীবনের চেতনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। পরকালের জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না তাদের, তবে তারা বিশ্বাস করত যে *দহ্‌র*—যাকে সময় বা নিয়তি হিসাবে অনুবাদ করা যায়—সর্বোচ্চ—মৃত্যু হার যেখানে অস্বাভাবিক রকম বেশি ছিল, সেখানে এমন একটা প্রবণতা সম্ভবত অত্যাবশ্যকই ছিল। পশ্চিমের পণ্ডিতগণ প্রায়শঃই *মরুব্বাহকে* 'পৌরষ' হিসাবে অনুবাদ করে থাকেন, কিন্তু এর তাৎপর্যের পরিধি ছিল আরও ব্যাপক: এটা দিয়ে যুদ্ধে সাহস বোঝাত, দুখ-কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য বোঝাত আর বোঝাত গোত্রের প্রতি চরম আনুগত্য। *মুরুব্বাহর* গুণাবলী একজন অরবকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করে মুহূর্তের নোটিসে তার *সায়ীদ* বা গোত্রপ্রধানের নির্দেশ পালনের দাবি করে ও তাকে গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যেকোনও অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার বীরের দায়িত্ব গ্রহণে নিবেদিত প্রাণ থাকতে হতো, গোত্রের দুর্বল সদস্যদের রক্ষা করতে হতো। গোত্রের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে *সায়ীদ* সম্পদ ও অন্যান্য জিনিস সমভাবে বন্টন করতেন ও ঘাতক গোত্রের একজন সদস্যকে হত্যা করার মাধ্যমে আপন জাতির যেকোনও সদস্যের হত্যার বদলা নিতেন। এখানেই আমরা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ দেখতে পাই: স্বয়ং ঘাতককে শাস্তি দেওয়ার কোনও দায়িত্বও ছিল না, কারণ প্রাক-ইসলামি যুগের সমাজে একজন ব্যক্তি কোনও রক্তচিহ্ন না রেখেই উধাও হয়ে যেতে পারত। তার বদলে শত্রুগোত্রের যেকোনও একজন সদস্যই এধরনের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আরেকজনের সমান ছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বহীন এক অঞ্চলে, যেখানে প্রত্যেক গোত্রীয় গ্রুপ আলাদা আইনের প্রতীক ছিল এবং যেখানে আধুনিক পুলিসের মতো কোনও শক্তির অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে মোটামুটিভাবে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়ই ছিল প্রতিশোধ বা রক্ত-বিবাদ। কোনও গোত্র প্রধান প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হলে এর সদস্যরা মর্যাদা হারাত এবং অন্যরা শাস্তির ভয় না করেই এর সদস্যদের অনায়াসে হত্যা করতে উৎসাহী হয়ে উঠত। এভাবে প্রতিশোধ ছিল ন্যায়-বিচারের রূঢ় ও তৈরি একটা ধরণ, যার মূল অর্থ ছিল কোনও গোত্রই যেন খুব সহজে অন্যটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে না পারে। এতে বিভিন্ন গোত্র সহিংসতার এক বিরামহীন চক্রে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও থাকত, যেখানে লোকজন একটা প্রতিশোধ আক্রমণের সমানুপাতিক হয়নি মনে করলে আরও খুনখারাবির জন্ম হতে পারত।

সন্দেহাতীতভাবে নিষ্ঠুর হলেও *মুরুব্বাহর* অনেকগুলো জোরাল দিকও ছিল। এটা সমতাবোধের গভীর ও জোরাল বোধ উৎসাহিত করেছে এবং বস্তু-

AMARBOI.COM

সামগ্রীর প্রতি নির্লিপ্ততার জন্ম দিয়েছে, যা, আবার বলতে হয়, সম্ভবত জীবন ধারনের জন্যে প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় রসদপত্রের ঘাটতি আছে এমন এক অঞ্চলে জরুরি ছিল: দান ও বদান্যতার কাল্টও গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল; এগুলো আগামী দিনের চিন্তা না করার শিক্ষা দিয়েছিল আরবদের। আমরা দেখব, এসব গুণ ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বহু শত বছর আরবদের উপকারে এসেছে *মুরুব্বাহ*, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ এটা আর আধুনিকতার শর্তাবলী পুরণ করতে পারছিল না। প্রাক-ইসলামি যুগের শেষ পর্যায়ে, মুসলিমরা যে সময়কালকে *জাহিলিয়াহ্*—অজ্ঞতার কাল—বলে অভিহিত করে থাকে, এক ব্যাপক অসন্তোষ আর আধ্যাত্মিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল বলে মনে হয়। আরবরা চারপাশ থেকে দুই পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য স্যাসানিয় পারসিয়া এবং বাইযান্তিয়াম দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। বসতি অঞ্চলসমূহ থেকে আধুনিক ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ ঘটছিল আরবে; সিরিয়া বা ইরাক ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী বণিকগণ সভ্যতার বিস্ময়কর কাহিনী সাথে করে নিয়ে আসছিল।

তা সত্ত্বেও আরবরা যেন চিরস্থায়ী বর্বরতার অভিশাপে অভিশপ্ত মনে হয়েছে। গোত্রগুলো অবিরাম হানাহানিতে লিপ্ত ছিল, যার ফলে নামমাত্র সম্পদ একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ আরব জাতিতে পরিণত হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও এরকম একটা অস্তিত্ব গড়ে ওঠার ব্যাপারে আবছাভাবে সজাগ ছিল তারা। নিজের হাতে নিয়তি তুলে নিয়ে নিজস্ব সভ্যতা গড়ে তুলতে পারছিল না তারা। সে জায়গায় পরাশক্তিগুলোর অব্যাহত শোষণের শিকার হয়ে চলছিল: প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আরবের অধিকতর উর্বর ও অনন্য এলাকা এখনকার ইয়েমেন—মৌসুমী বৃষ্টির আর্শিবাদ ছিল এখানে—পার্সিয়ার এক সামান্য প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। একই সময়ে এ অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী ধারণাসমূহ পুরোনো সাম্প্রদায়িক নীতিকে দুর্বল করে তোলা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের সংবাদ নিয়ে আসছিল। উদাহরণ স্বরূপ, পরকালের জীবন সম্পর্কিত ক্রিশ্চান মতবাদ প্রতিটি ব্যক্তির অনন্ত নিয়তিকে পবিত্র মূল্য দিয়েছিল: ব্যক্তিকে দলের অধীনে স্থাপনকারী এবং গোত্রের অস্তিত্বের ওপরই নারী-পুরুষের অমরত্ব পুরোপুরি নির্ভরশীল বলে দাবিদার গোত্রীয় আদর্শের সঙ্গে এটা কীভাবে খাপ খেতে পারে?

মুহাম্মদ (স) অসাধারণ মেধার অধিকারী মানুষ ছিলেন। ৬৩২ সালে যখন তিনি পরলোকগমন করেন, তখন আরবের প্রায় সকল গোত্রকে এক নতুন ঐক্যবদ্ধ সমাজ বা *উম্মাহ্* অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। আরবদের নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে চমৎকার মানানসই আধ্যাত্মিকতা এনে দিয়েছেন তিনি, যা এমন এক শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছে যে মাত্র একশো বছরের ব্যবধানে

AMARBOI.COM

হিমালয় পর্বতমালা থেকে পিরেনীজ অবধি বিস্তৃত নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে তারা। প্রতিষ্ঠা করেছে এক অসাধারণ সভ্যতার। কিন্তু মুহাম্মদ (স) ৬১০ সালের রমযান মাসে যখন হিরা পর্বতের চূড়ায় ছোট্ট গুহায় প্রার্থনায় নিমগ্ন হন, এরকম এক অসাধারণ সাফল্যের কথা চিন্তাও করেননি তিনি। বহু আরবের মতো মুহাম্মদও (স) বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, প্রাচীন আরবীয় দেবনিচয়ের পরমেশ্বর আল্লাহই–যার অর্থ স্রেফ 'ঈশ্বর'–ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের উপাস্য ঈশ্বর। এও বিশ্বাস ছিল যে কেবল এই ঈশ্বরের একজন পয়গম্বরের পক্ষেই আপন জাতির সমস্যা সমাধান সম্ভব, কিন্তু তিনি *নিজেই* যে সেই পয়গম্বর হতে যাচ্ছেন এটা কখনওই বিশ্বাস হয়নি তাঁর। আরবরা আসলেই দুঃখের সঙ্গে অনুভব করত যে আল্লাহ্ কখনও তাঁদের প্রতি কোনও পয়গম্বর প্রেরণ করেননি বা কোনও ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেননি, যদিও স্মরণাতীতকাল থেকে তাঁরই মন্দির রয়েছে ওদের মাঝে। সপ্তম শতাব্দী নাগাদ অধিকাংশ আরব বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে মক্কার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সুপ্রাচীনকালের চৌকো আকৃতির বিশাল উপাসনাগৃহ কাবাহ্ মূলত আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, যদিও এখন তা নাবাতিয় দেবী হুবালের অধিষ্ঠান। মক্কাবাসীরা আরবের সবচেয়ে পবিত্র স্থান কাবাহ্ গৃহ নিয়ে দারুণ গর্ব বোধ করত। প্রতি বছর গোটা পেনিনসুলার আরবরা মক্কায় হজ্জ বা তীর্থযাত্রায় সমবেত হয়ে কয়েকদিন ধরে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতা পালন করত। কাবাহ্র চারপাশের পবিত্র এলাকা স্যাঙ্কচুয়্যারিতে সব রকমের সহিংসতা ছিল নিষিদ্ধ–যাতে মক্কায় আরবরা পুরোনো গোত্রীয় বর্বরতা সাময়িকভাবে স্থগিত জানা থাকায় শান্তিপূর্ণভাবে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারে। কুরাইশরা জানত, স্যাঙ্কচুয়্যারি ছাড়া তাদের পক্ষে বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল না। তারা এও জানত যে কাবাহ্ গৃহের অভিভাবকত্ব এবং এর প্রাচীন পবিত্রতা রক্ষার সাফল্যের ওপর অন্যান্য গোত্রের মাঝে তাদের সম্মান বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু যদিও আল্লাহ্ কুরাইশদের বিশেষ কৃপা করার জন্যে আলাদা করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি আব্রাহাম, মোজেস বা জেসাসের মতো একজন বার্তাবাহক কখনও পাঠাননি, আরবদের নিজস্ব ভাষার কোনও ঐশীগ্রন্থও ছিল না।

সুতরাং আধ্যাত্মিক দিক থেকে হীনম্মন্যতার এক ব্যাপক বোধ কাজ করছিল। আরবরা যেসব ইহুদি ও ক্রিশ্চানের সংস্পর্শে আসত তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ না পাওয়ায় তাদের বর্বর জাতি বলে ক্ষেপাত। আরবরা তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী এসব লোকদের প্রতি একধরনের মিশ্র অসন্তোষ আর শ্রদ্ধা বোধ করত। ইহুদিবাদ ও খৃস্টধর্ম এ অঞ্চলে খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি যদিও, আরবরা ধর্মের এই অগ্রসর রূপকে



AMARBOI.COM

নিজেদের প্রচলিত পৌত্তলিকতাবাদের চেয়ে উচ্চতর বলে স্বীকার করত। মক্কার উত্তরে ইয়াসরিব [পরবর্তীকালে মদিনা] ও ফাদাক নামের বসতিতে অজ্ঞাত উৎসের কিছু ইহুদি গোত্রের বাস ছিল; এবং পার্সিয়ান ও বাইযান্তাইন সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকার উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর কিছু কিছু গোত্র মনোফিসাইট বা নেস্টোরিয়ান খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বেদুঈনরা মারাত্মক রকম স্বাধীনচেতা ছিল, তারা ইয়েমেনি ভাইদের মতো পরাশক্তির শাসনাধীনে না যাবার ব্যাপারে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তারা এটাও বুঝতে পেরেছিল যে পারসিয় ও বাইযান্তাইন উভয় এলাকাই সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে ইহুদিবাদ ও খৃস্টধর্মকে ব্যবহার করছে। সম্ভবত তারা সহজাত প্রবৃত্তির বশে এও বুঝেছিল যে নিজস্ব ঐতিহ্য ক্ষয়ে যাওয়ায় সাংস্কৃতিকভাবে যথেষ্ট স্থানচ্যুতির স্বীকার হয়েছে তারা; আর যাহোক বিদেশী ভাষা ও ঐতিহ্যের আশ্রয়ে বিদেশী কোনও মতাদর্শ অন্তত চায়নি তারা।

আরবদের কেউ কেউ যেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংস্রবহীন অধিকতর নিরপেক্ষ একশ্বেরবাদের একটা ধরন আবিষ্কারের প্রয়াসে নিয়েজিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে প্যালেস্তাইনি ক্রিশ্চান ইতিহাসবিদ সোযোমেনোস আমাদের জানাচ্ছেন, সিরিয়াবাসী আরবদের কেউ কেউ তাদের ভাষায় আব্রাহামের সত্য ধর্ম পুনরাবিষ্কার করেছিল। ঈশ্বর তোরাহ্ বা গস্পেল প্রেরণের আগেই এসেছিলেন আব্রাহাম, সুতরাং তিনি ইহুদি বা ক্রিশ্চান কোনওটাই ছিলেন না। মুহাম্মদ (স) তাঁর নিজস্ব পয়গম্বরত্বের আহ্বান পাওয়ার অল্পদিন আগে, তাঁর প্রথম জীবনীকার মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃ. ৭৬৭) আমাদের জানাচ্ছেন যে, মক্কার চারজন কুরাইশ আব্রাহামের সত্য ধর্ম *হানিফায়াহ্‌র* সন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কোনও কোনও পশ্চিমা পণ্ডিত এই ক্ষুদ্র *হানিফায়াহ্* দলটিকে *জাহিলিয়াহ্‌র* সময়ের আধ্যাত্মিক অস্থিরতার প্রতীক ধর্মীয় কাহিনী বলে যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু এর কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতা থাকতে বাধ্য। চারজন *হানিফের* মধ্যে তিনজন প্রথম দিকের মুসলিমদের সুপরিচিত ছিলেন: উবায়দাল্লাহ্ ইবন জাহ্‌শ ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর চাচাত ভাই, ওয়ারাকা ইবন নওফল, যিনি পরে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন, ছিলেন মুহাম্মদের (স) প্রথমদিকের আধ্যাত্মিক পরামর্শক এবং যায়েদ ইবন আমর ছিলেন মুহাম্মদের (স) অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবন আল-খাত্তাবের চাচা। একটা গল্প প্রচলিত আছে: আব্রাহামের ধর্মের সন্ধানে মক্কা ত্যাগ করে সিরিয়া ও ইরাকের পথে রওনা দেওয়ার আগে যায়েদ একদিন কাবাহগৃহের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উপাসনাগৃহকে ঘিরে প্রাচীন কায়দায় প্রদক্ষিণরত কুরাইশদের উদ্দেশে বলছিলেন: 'হে কুরাইশগণ, যাঁর হাতে যায়েদের আত্মা তাঁর দোহাই, আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউই আব্রাহামের

AMARBOI.COM

ধর্ম অনুসরণ করছ না।' এরপর দুঃখের সঙ্গে আবার যোগ করেছেন, 'হে খোদা, যদি জানতাম কীভাবে উপাসনা আপনার পছন্দ আমি সেভাবেই আপনার উপাসনা করতাম; কিন্তু আমি যে জানি না।'[১]

যায়েদের *ঐশ্বরিক* প্রত্যাদেশের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় ৬১০ সালের রমজান মাসের সপ্তদশ রাতে, যখন মুহাম্মদ (স) ঘুম থেকে অকস্মাৎ জেগে উঠে এক সর্বগ্রাসী স্বর্গীয় উপস্থিতিতে নিজেকে আচ্ছন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলেন। পরে এই অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতাকে তিনি স্পষ্ট আরবীয় পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে একজন দেবদূত তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে জোরাল নির্দেশ দিয়েছেন: '*আবৃত্তি কর' (ইকরা!)*। হিব্রু পয়গম্বরগণ যেমন প্রায়শঃই ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণে অনীহা দেখিয়েছেন, মুহাম্মদও (স) তেমনি প্রতিবাদ করে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, 'আমি আবৃত্তিকার নই!' তিনি *কাহিন* অর্থাৎ আরবের সেসময়ের অনুপ্রাণিত ভবিষ্যৎ-বক্তা গণক বা সন্যাসী ছিলেন না। কিন্তু, বলেছেন মুহাম্মদ (স), দেবদূত তাঁকে তীব্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন, তখন তাঁর মনে হয়ে ছিল বুঝি দম বেরিয়ে যাচ্ছে। যখন মনে হচ্ছিল আর সহ্য করতে পারবেন না, দেবদূত তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আবার নির্দেশ দেন 'আবৃত্তি কর!' *ইকরা!* ফের আপত্তি জানান মুহাম্মদ (স) এবং আবার তাঁকে আলিঙ্গন করলেন দেবদূত, সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত জাপ্টে ধরে রাখলেন। অবশেষে, তৃতীয় ভয়ঙ্কর মারাত্মক আলিঙ্গনের শেষ পর্যায়ে মুহাম্মদ (স) আবিষ্কার করলেন তাঁর মুখে এক নতুন ঐশীগ্রন্থের প্রথম শব্দগুলো উচ্চারিত হচ্ছে:

> পাঠ, কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিদি সৃষ্টি করিয়োছেন—সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক* হইতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না**।*

আরবী ভাষায় প্রথমবারের মতো ঈশ্বরের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। এই

---

* সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। তফসীরকারগণ এর অর্থ রক্তপিণ্ড করেছেন। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীগণ মার্তৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমকিবাশের বর্ণনায় বলেন যে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে জরায়ু গাত্র সংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং এই সম্পৃক্তি সংঘটিত না হলে গর্ভাধান স্থায়ী হয় না। একারণে বর্তমানে '*আলাক*' শব্দের অনুবাদ করা হয় 'এমন কিছু যা লাগিয়া থাকে।' সূত্র *আল-কুরানুল করীম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

** মুহাম্মদ (স)-এর ৪০ বছর বয়সে প্রতি হেরা গুহায় এই সুরার প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এটাই প্রথম প্রত্যাদেশ।



AMARBOI.COM

ঐশীগ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত *কুরানঃ* আবৃত্তি নামে পরিচিত হয়ে উঠবে।

আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণায় সজাগ হয়ে ওঠেন মুহাম্মদ (স); একজন তুচ্ছ ঘৃণিত *কাহিনে* পরিণত হয়েছেন ভেবে শঙ্কা বোধ করেছেন তিনি, লোকে উট হারালে পরামর্শ করার জন্যে *কাহিন*দের কাছে যেত। *কাহিনের* ওপর *জিনের* আসর হয়েছে বলে মনে করা হতো, এক ধরনের *পরী* যারা সারা এলাকা ঘুরে বেড়ায়, এরা খুব খেয়ালি হতে পারে, মানুষকে ভুল পথে টেনে নিতে পারে। কবিরাও নিজেদের *জিনের* আসরগ্রস্ত মনে করতেন। এভাবে হাসান ইবন সাবিত নামে ইয়াসরিবের এক কবি, যিনি পরে মুসলিম হয়েছিলেন, বলেছেন যে, তিনি যখন কবিত্ব অর্জন করেন তখন তাঁর *জিন* আবির্ভূত হয়ে তাঁকে জোর করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে মুখ দিয়ে অনুপ্রাণিত কথামালা বের করিয়েছিল। কেবল এধরনের অনুপ্রেরণার সঙ্গেই মুহাম্মদ (স) পরিচিত ছিলেন। নিজেই হয়তো একজন *জিনের* আসরগ্রস্ত *মজনুন*-এ পরিণত হয়েছেন, এই চিন্তা তাঁকে এমন হতাশায় পূর্ণ করে দিয়েছিল যে বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। *কাহিন*দের আগাগোড়া ঘৃণা করতেন মুহাম্মদ (স), এদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সাধারণত দুর্বোধ্য প্রলাপের মতো ছিল, তিনি সঙ্কেতময় কোরানকে আরবের প্রচলিত কবিতা হতে স্বতন্ত্র বোঝাতে যত্নবান ছিলেন। এবার গুহা থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে পাহাড়-চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। কিন্তু পাহাড়ের পাশে আবার এক সত্তার মুখোমুখি হয়েছিলেন, যাঁকে তিনি পরে জিব্রাইল বলে শনাক্ত করেছেন:

> আমি যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছি, আকাশ থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র পয়গম্বর এবং আমি জিব্রাইল!' কে কথা বলছে দেখার জন্যে আকাশের দিকে তাকালাম, আর অদ্ভুত ব্যাপার, মানুষের রূপ ধরে দিগন্তে দাঁড়িয়ে আছেন জিব্রাইল...তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, সামনেও যেতে পারছিলাম না, পেছনেও না; এবার তাঁর ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম, কিন্তু আকাশের যেদিকেই তাকাই, দেখি আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।[৩]

ইসলামে জিব্রাইলকে প্রায়ই প্রত্যাদেশের পবিত্র আত্মা হিসাবে শনাক্ত করা হয়ে থাকে যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইনি কোনও সাধারণ প্রাকৃতিক দেবদূত নন, বরং এক সীমাহীন সর্বব্যাপী উপস্থিতি, যার কাছ থেকে পলায়ন অসম্ভব। ঐশ্বরিক সত্তার অপরিমেয় উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন মুহাম্মদ (স), হিব্রু পয়গম্বরগণ যাকে *কাদ্দোশ*, পবিত্রতা, ঈশ্বরের

AMARBOI.COM

ভীতিকর অন্যরূপ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই উপলব্ধি অর্জনের সময় তাঁরাও মৃত্যুর কাছাকাছি এবং শারীরিক ও মানসিক পর্যায়ে চরম অবস্থার বোধে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু ইসায়াহ্ বা জেরেমিয়াহ্‌র বিপরীতে, মুহাম্মদ (স)-এর সমর্থন পাওয়ার মতো প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের কোনও সান্ত্বনার স্থল ছিল না, যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের যন্ত্রণায় নিজের অজান্তেই স্ত্রী খাদিজার শরণাপন্ন হলেন মুহাম্মদ (স)।

থরথর কাঁপতে কাঁপতে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে খাদিজার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুহাম্মদ (স)। 'আমাকে আবৃত্ত করো!' 'আবৃত্ত করো!' স্বর্গীয় সত্তার কবল হতে নিজেকে আড়াল করার জন্যে জোর গলায় চেঁচালেন। আতঙ্ক খানিকটা প্রশমিত হওয়ার পর মুহাম্মদ (স) খাদিজার কাছে জানতে চাইলেন সত্যিই তিনি *মজনুনে* পরিণত হয়েছেন কিনা। ঝটপট তাঁকে আশ্বস্ত করেন খাদিজা: 'আপনি আপনার আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আপনি দরিদ্র ও অবহেলিতকে সাহায্য করেন, তাদের ভার বহন করেন। আপনি আপনার জাতির হারিয়ে যাওয়া উন্নত নৈতিক চরিত্রের পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। অতিথিদের আপনি সম্মান দেখান, দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে যান। এমনটা হতে পারে না, প্রিয়তম!'[৪] ঈশ্বর এমন খামখেয়ালি আচরণ করেন না। খাদিজা বর্তমানে ক্রিশ্চান ও ঐশীগ্রন্থ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফলের সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ দিলেন। ওয়ারাকার মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না: মুহাম্মদ (স) মোজেস এবং অন্য পয়গম্বরদের ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, আরবদের জন্যে স্বর্গীয় দূতে পরিণত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত, কয়েক বছর পেরুনোর পর মুহাম্মদ (স) নিশ্চিত হন যে, আসলেও ব্যাপারটা তাই; কুরাইশদের মাঝে প্রচারণা শুরু করেন তিনি, তাদের নিজস্ব ভাষার এক ঐশীগ্রন্থ উপহার দেন।

অবশ্য, বাইবেলের বিবরণ অনুসারে তোরাহ্ যেমন সিনাই পর্বতে মোজেসের ওপর এক দফায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তার বিরীতে কোরান দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে একটু একটু করে, এক লাইন এক লাইন, এক পঙক্তি এক পঙক্তি করে মুহাম্মদের (স) উপর অবর্তীণ হয়েছিল। প্রত্যাদেশসমূহ ছিল এক কষ্টকর অভিজ্ঞতা: 'এমন একটাও প্রত্যাদেশ পাইনি যেটা গ্রহণ করার সময় আমার আত্মা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়নি,' পরবর্তী কালে বলেছেন মুহাম্মদ (স)।[৫] খুব মনোযোগের সঙ্গে স্বর্গীয় বাণী শুনতে হতো তাঁকে, এক একটা দিব্যদর্শনের অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে যা সবসময় নিরেট তথ্য রূপে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হতো না। মাঝে মাঝে, বলেছেন তিনি, ঐশীবাণীর বিষয়বস্তু ছিল পরিষ্কার: জিব্রাইলকে যেন দেখতে পেতেন তিনি, তাঁর বক্তব্য শুনতেন। কিন্তু অন্যান্য সময় প্রত্যাদেশসমূহ

AMARBOI.COM

কষ্টকর রকম অব্যক্ত ছিল: কখনও কখনও ঘন্টাধ্বনির মতো আমার ওপর অবতীর্ণ হয় এটা, এবং আমার জন্যে সেটাই সবচেয়ে কষ্টকর; ঘন্টাধ্বনি ক্ষীণ হয়ে আসার পর প্রত্যাদেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি আমি।'[৬] ধ্রুপদীকালের গোড়ার দিকের জীবনীকারগণ প্রায়শঃই খুবই মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে, আমাদের যাকে অবচেতন মন বলে আখ্যায়িত করা উচিত, তার কথা শুনছেন বলে দেখিয়েছেন, ঠিক যেমন তাঁর মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে উঠে আসা কবির সত্তার চেয়ে রহস্যজনকভাবে আলাদা বলে নিজেকে ঘোষণাকারী কবিতা 'শোনার' প্রক্রিয়া বর্ণনা দিয়ে থাকেন। কোরানে ঈশ্বর মুহাম্মদকে (স) সতর্কতার সঙ্গে এবং ওয়ার্ডসওঅর্থ যাকে বলেছেন 'এক প্রাজ্ঞ বশ্যতা'[৭] সহ সামঞ্জস্যহীন অর্থের দিকে মনোনিবেশ করতে বলেন। যথাসময়ে প্রকৃত অর্থ নিয়ে উদ্ভাসিত হবার আগে তিনি যেন অবশ্যই কোনও বাণী তাড়াহুড়ো করে উচ্চারণ না করেন বা এর ওপর কোনও ধারণাগত তাৎপর্য চাপিয়ে না দেন:

> তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না।* ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণকারী, অত:পর ইহার বিশাল ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।[৮]

AMARBOI.COM

সকল সৃজনশীল কর্মের মতোই এক কঠিন প্রক্রিয়া ছিল এটা। মুহাম্মদ (স) সাধারণত এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থায় চলে যেতেন, কখনও কখনও চেতনা হারিয়েছেন বলেও মনে হতো; এমনকি তীব্র ঠাণ্ডার দিনেও দরদর করে ঘামতে থাকতেন তিনি। প্রায়ই দুঃখবোধের মতো অনুভূতিতে ভারি হয়ে উঠত তাঁর অন্তর, যার ফলে তিনি দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা দাবিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন, সমসাময়িক কিছু ইহুদি অতীন্দ্রিয়বাদী সচেতনতার একরকম বিকল্প অবস্থায় প্রবেশ করার সময় এরকম ভঙ্গিমাই গ্রহণ করত–যদিও একথা মুহাম্মদের (স) না জানারই কথা।

এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে মুহাম্মদ (স) প্রত্যাদেশকে এরকম প্রবল চাপ হিসাবে দেখেছিলেন: তিনি যে কেবল আপন জাতির জন্যে সম্পূর্ণ নতুন এক রাজনৈতিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তাই নয়, বরং তিনি

---

* প্রথম প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় জিব্রাইল (আ) কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করতে থাকলে রাসুলুল্লাহ (স) সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতেন যাতে তা ভুলে না যান। এতে তার বিশেষ কষ্ট হতো। তাঁকে মনোযোগের সঙ্গে শুনে যেতে বলা হয়েছে, সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। সূত্র: *পবিত্র কুরআনুল করীম*, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

সর্বকালের মহান এক আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক ক্লাসিক জন্ম দিচ্ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর অনির্বচনীয় বাণী আরবী ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে, কারণ কোরান হচ্ছে ইসলামের আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র, জেসাস অর্থাৎ লোগোস যেমন খৃস্টধর্মের মূল বিষয়। অন্য যেকোনও প্রধান ধর্ম প্রবক্তার চেয়ে মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে অনেক বেশি জানি আমরা। এবং কোরানে, যার বিভিন্ন সুরা বা অধ্যায়ের সময়কাল মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত কাছাকাছি পর্যায় পর্যন্ত জানা যায়, আমরা দেখতে পাই কীভাবে আস্তে আস্তে তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছে এবং ক্রমশঃ যার আওতা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। একেবারে শুরুতেই তিনি তাঁর কর্তব্য বা করণীয় দেখেননি, বরং অল্প অল্প করে তা তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়েছে, ঘটনাপ্রবাহের অন্তস্থ যুক্তির প্রতি যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তিনি। কোরানে আমরা ইসলামের সূচনার সমসাময়িক কালের ঘটনাবলীর বিবরণ পাই, ধর্মের ইতিহাসে যা অনন্য। এই পবিত্র গ্রন্থে ঈশ্বর যেন চলমান পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করছেন: তিনি মুহাম্মদের (স) কোনও কোনও সমালোচকের জবাব দিচ্ছেন, যুদ্ধের বা গোড়ার দিকের মুসলিমদের অন্তর্দ্বন্দ্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন ও মানব জীবনের স্বর্গীয় মাত্রার দিকে ঈঙ্গিত করছেন। আমরা বর্তমানে যে পর্যায়ক্রমে পাঠ করি, ঠিক এভাবে মুহাম্মদের (স) কাছে অবতীর্ণ হয়নি এটা, বরং অনেকটা অগোছালভাবে, পরিস্থিতি যেমন দাবি করেছে, সেগুলোর গভীরতর তাৎপর্যের প্রতি তিনি যেভাবে সাড়া দিয়েছেন সেভাবে। যখনই কোনও একটি অংশ অবতীর্ণ হতো, মুহাম্মদ (স) লিখতে বা পড়তে জানতেন না বলে উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন, মুসলিমরা তা মুখস্থ করে ফেলত এবং অল্প কজন যারা শিক্ষিত ছিল তারা লিখে রাখত। মুহাম্মদের (স) পরলোকগমনের প্রায় বিশ বছর পর প্রত্যাদেশসমূহের প্রথম আনুষ্ঠানিক সংকলন সম্পাদিত হয়েছিল। সম্পাদকগণ দীর্ঘ সুরাগুলোকে গ্রন্থের শুরুতে ও ক্ষুদ্র সুরাগুলোকে শেষে স্থান দিয়েছেন। খামখেয়ালি মনে হলেও এই বিন্যাস সেরকম কিছু নয়, কেননা কোরান এমন কোনও বিবরণ বা যুক্তি নয় যার পর্যায়ক্রম বজায় রাখার আবশ্যকতা আছে। পরিবর্তে বিভিন্ন বিষয়ের উপর চিন্তা রয়েছে এতে: সাধারণ জগতে ঈশ্বরের উপস্থিতি, পয়গম্বরদের জীবন-কথা বা শেষ বিচার। আরবীর অসাধারণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করার ক্ষমতাহীন কোনও পশ্চিমবাসীর চোখে কোরান একঘেয়ে আর পুনরাবৃত্ত বলে মনে হয়। যেন বার বার একই বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু কোরান একান্তে পাঠের জন্যে নয়, বরং তা প্রার্থনায় আবৃত্তি করার উপযোগি। মুসলিমরা যখন মসজিদে কোনও সুরার পাঠ শোনে, ধর্ম বিশ্বাসের মৌল সকল বিষয় মনে তাদের পড়ে যায়।

AMARBOI.COM

মুহাম্মদ (স) যখন মক্কায় প্রচারণা শুরু করছিলেন, আপন ভূমিকা সম্পর্কে সংযত ধারণা ছিল তাঁর। একটা নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন, একথা মনে হয়নি তখন, বরং তিনি ভেবেছিলেন কুরাইশদের কাছে একমাত্র ঈশ্বরের পুরোনো ধর্মই আবার ফিরিয়ে আনছেন। এমনকি প্রথমদিকে মক্কা এবং এর পরিপার্শ্বের আরব ছাড়া আর কারও উদ্দেশে প্রচার করাও ঠিক হবে না বলে ভেবেছিলেন তিনি।[৯*] সম্ভবত একটা থিওক্র্যাসি প্রতিষ্ঠার কোনও স্বপ্নও ছিল না তার; থিওক্র্যাসি কী, হয়তো তাও জানতেন না: নগরে তাঁর কোনও রাজনৈতিক ভূমিকা থাকবে না, কেবল এর *নাযির* (সতর্ককারী) মাত্র।[১০] আল্লাহ্ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন কুরাইশদের তাদের অবস্থার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে। অবশ্য, তাঁর প্রথমদিকের বার্তাগুলো প্রলয়ের সুরবাহী ছিল না। এটা ছিল আশার আনন্দময় বার্তা। কুরাইশদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হয়নি মুহাম্মদকে (স)। সবাই মনে মনে স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহয় বিশ্বাস করত এবং অধিকাংশের বিশ্বাস ছিল যে তিনিই ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের উপাস্য ঈশ্বর। তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে কোনও সংশয় বা বিতর্ক ছিল না। কোরানের প্রথমদিকের এক সুরায় মুহাম্মদের (স) উদ্দেশে ঈশ্বর বলছেন:

> যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তাহা হইলে উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে?
>
> যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।'[১১]

AMARBOI.COM

কিন্তু সমস্যা ছিল কুরাইশরা এই বিশ্বাসের তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করছিল না। প্রথম প্রত্যাদেশ পরিষ্কার করে দিয়েছিল ঈশ্বর তাদের এক ফোঁটা শুক্র বিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন; খাবার এবং অস্তিত্বের জন্যে তারা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল, অথচ তারপরেও নিজেদের তারা এক অবাস্তব ধারণা (*ইয়তকা*) ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার (ইস্তাকা)[১২] বিশ্বাস থেকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র হিসাবে দেখছে যা এক সভ্য আরব সমাজের সদস্য হিসাবে তাদের দায়িত্বের প্রতি অন্ধ।

পরিণামে কোরানের শুরুর দিকের সকল পঙক্তি কুরাইশদের ঈশ্বরের

---

* এই নগরে ও এর চতুর্দিকের অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীদের সতর্ক করতে... (সূত্র: *পবিত্র কুরআনুল করীম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

করুণা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠার জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছে। যেদিকেই চোখ ফেরাবে সেদিকেই তাঁর চিহ্ন দেখবে তারা। তখনই তাদের উপলব্ধিতে আসবে সাম্প্রতিক সাফল্য সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে তাদের কত ঋণ, প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টার ওপর তাদের চরম নির্ভরশীলতা বুঝতে পারবে:

> মানুষ* ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ।
> তিনি উহাকে কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?
> শুক্র বিন্দু হইতে তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন, অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন; তৎপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন। ইহার পর যখন ইচ্ছা তখন উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।
>
> না, কখনও না, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে এখনও উহা পুরোপুরি করে নাই।
>
> মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক! আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি; এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য দ্রাক্ষা, শাক-সবজি, যয়তুন,** খর্জুর, বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য, ইহা তোমাদের ও তোমাদের আন-আমের*** ভোগের জন্য।[১৩]

AMARBOI.COM

সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন নেই। কোরানে একজন অবিশ্বাসী (*কাফির বি না'মত আল্লাহ্*) আমরা যেভাবে বুঝি, নাস্তিক নয়, বরং ঐ ব্যক্তি যে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ, যে খুব পরিষ্কারভাবে বোঝে যে ঈশ্বরের প্রতি তার ঋণ কতখানি কিন্তু তারপরও বিকৃত অকৃতজ্ঞতার চেতনায় তাঁকে সম্মান প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানায়।

কোরান কুরাইশদের নতুন কিছু শিক্ষা দিচ্ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটা বারবার দাবি করছে যে এটা জানা বিষয়াদিই আরও বিশদ, বিস্তারিত ও প্রাঞ্জলভাবে আবার 'স্মরণ' করিয়ে দিচ্ছে। বারবার 'তুমি কি দেখনি...?' বা 'তুমি কি ভেবে দেখনি...?' ধরনের বাক্য দিয়ে এক একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে কোরান। ঈশ্বরের বাণী মহাশূন্য থেকে উচ্চারিত কোনও কঠোর নির্দেশ নয়, বরং কুরাইশদের সঙ্গে কথোপকথনে যুক্ত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, এটি কুরাইশদের সাফল্যে আল্লাহর ঘর কাবাহ্‌র বিরাট অবদানের কথা মনে করিয়ে

---

* মানুষ দ্বারা এখানে কাফির বোঝায়।

** জলপাই জাতীয় আরবদেশের ফলবিশেষ।

*** আআম ১৫০, গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি।

দেয়, যা আসলে এক অর্থে ঈশ্বরের কাছে ঋণী থাকার মতোই। কুরাইশরা উপাসনাগৃহকে আচরিক প্রদক্ষিণ করতে ভালোবাসে, কিন্তু যখনই বস্তুগত সাফল্যকে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করে বসে সেই মুহূর্তে এইসব প্রাচীন আচার-আচরণের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হয় তারা। পার্থিব জগতে ঈশ্বরের মহিমা ও ক্ষমতার 'নিদর্শন' (*আয়াত*)-এর প্রতি লক্ষ করা উচিত তাদের। তারা নিজস্ব জীবনে, সমাজে, ঈশ্বরের দয়া পুনর্গঠনে ব্যর্থ হলে প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। পরিণামে মুহাম্মদ (স) তাঁর নবদীক্ষিতদের দিনে দুবার আচরিক প্রার্থনায় (*সালাত*) নত হতে বলেছিলেন। এই বাহ্যিক ভঙ্গিমা মুসলিমদের অন্তরের ভঙ্গিকে বিকশিত করা ও জীবনকে সঠিক পথে আনতে সাহায্য করবে। মুহাম্মদের (স) ধর্ম শেষ পর্যন্ত *ইসলাম* নামে পরিচিত হবে, যা আল্লাহর কাছে প্রত্যেক দীক্ষিতের প্রত্যাশিত সামাজিক আত্মসমর্পণের ভূমিকা: *মুসলিম* সেই নারী বা পুরুষ যে তার সমগ্র সত্তাসহ স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রথম মুসলিমদের *সালাত* আদায় করতে দেখে কুরাইশরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল: কুরাইশদের উদ্ধত ক্ল্যানের কোনও সদস্য, যার রয়েছে শত শত বছরের বেদুঈন স্বাধীনতার ইতিহাস, এভাবে দাসের মতো মাটিতে মাথা ঠুকবে, এটা তাদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। মুসলিমরা গোপনে প্রার্থনা করার জন্য মক্কার আশপাশের পাহাড়ি গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত নির্ভুলভাবে তাদের চেতনা ধরতে পেরেছিলেন।

বাস্তবিক অর্থে *ইসলামের* অর্থ ছিল মুসলিমদের একটা ন্যায়বিচার ভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব রয়েছে যেখানে দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতি সদয় আচরণ করা হয়। কোরানের প্রথমদিকে নীতিগতবাণী ছিল খুবই সহজ: সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলা অন্যায় এবং একজনের সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট অংশ দান করার মাধ্যমে সমাজের সম্পদ ভাগ করে নেওয়াটাই সৎ কাজ।[14] দান (*যাকাত*) আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা (*সালাত*) ইসলামের পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় 'স্তম্ভ' (*রুকন*) বা অনুশীলন তুলে ধরে। হিব্রু পয়গম্বরদের মতো মুহাম্মদ (স) এমন এক নীতির প্রচার করেছিলেন যাকে আমরা তাঁর একজন মাত্র ঈশ্বরের উপাসনার পরিণাম স্বরূপ সমাজতান্ত্রিক বলতে পারি। ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও অবশ্য পালনীয় মতবাদের অস্তিত্ব ছিল না: প্রকৃতপক্ষে, ধর্মতত্ত্বীয় আঁচ-অনুমানের বিষয়ে কোরান প্রচণ্ডভাবে সন্দিহান, একে তা *যান্না* হিসাবে বাতিল করে দিয়েছে, যার অর্থ এমন বিষয়াদি মন-গড়া চিন্তাভাবনা যা কেউ কখনও জানতে বা প্রমাণ করতে পারবে না। অবতার ও ট্রিনিটির ক্রিশ্চান মতবাদ *যান্নার* প্রধান উদাহরণ বলে মনে হয়েছে; মুসলিমরা যে এসব ধারণাকে *ব্লাসফেমাস* আখ্যায়িত করেছে

AMARBOI.COM

তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পরিবর্তে ইহুদিবাদের মতো, ঈশ্বরকে নৈতিক ঔচিত্যের মাঝে অনুভব করা হয়েছে। ইহুদি বা ক্রিশ্চানদের সঙ্গে বা তাদের ঐশীগ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় মুহাম্মদ (স) সরাসরি ঐতিহাসিক একেশ্বরবাদের মূল জায়গায় প্রবেশ করেছিলেন।

অবশ্য কোরানে আল্লাহ YHWH-এর চেয়ে আরও বেশি নৈর্ব্যক্তিক। বাইবেলের ঈশ্বরের মতো তাঁর দুঃখবোধ ও আবেগ নেই। প্রকৃতির 'নিদর্শনসমূহে' আমরা কেবল আল্লাহর খানিকটা আভাস দেখতে পারি। তিনি এমনই দুর্জ্ঞেয় যে আমাদের পক্ষে কেবল 'রূপক গল্প'[১৫] দিয়েই তাঁর সম্পর্কে কথা বলা সম্ভব। সুতরাং, কোরান বারবার মুসলিমদের গোটা জগতকে এপিফ্যানি হিসাবে দেখার তাগিদ দেয়; তাদের অবশ্যই আসল সত্তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা দেখার জন্যে সকল বস্তুতে বিস্তৃত দুর্জ্ঞেয় সত্তাকে দেখতে বিচ্ছিন্ন জগতের ভেতর দিয়ে দেখার কল্পনা নির্ভর প্রয়াস চালাতে হবে। পবিত্রতার বা প্রতীকী মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে মুসলিমদের:

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন (*আয়াত*) রহিয়াছে।[১৬]

AMARBOI.COM

কোরান বারবার ঈশ্বরের 'নিদর্শণসমূহ' বা 'বাণী' বোঝার জন্যে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। মুসলিমরা যুক্তিকে বিসর্জন দেবে না, বরং মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে জগতের দিকে তাকাবে। এই প্রবণতাই পরবর্তীকালে মুসলিমদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এক অসাধারণ ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, যাকে খৃস্টধর্মের মতো কখনওই ধর্মের প্রতি হুমকি হিসাবে দেখা হয়নি। প্রাকৃতিক জগতের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এর একটা দুর্জ্ঞেয় মাত্রা ও উৎস রয়েছে, যার সম্পর্কে আমরা কেবল নিদর্শন বা প্রতীকের সাহায্যেই কথা বলতে পারি: এমনকি পয়গম্বরগণের কাহিনী, শেষ বিচারের দিনের বিবরণ ও স্বর্গের সুখকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা যাবে না, একে দেখতে হবে এক সুউচ্চ অনির্বচনীয় রূপক হিসাবে।

কিন্তু খোদ কোরানই সবচেয়ে বড় নিদর্শন: প্রকৃতপক্ষে এর পঙক্তিগুলোকে *আয়াত* বলা হয়। পশ্চিমের জনগণের কাছে কোরানকে কঠিন ঠেকে। সমস্যাটা প্রধানত অনুবাদের। আরবী ভাষা অনুবাদ করা বিশেষ করে

কঠিন: যেমন এমনকি সাধারণ সাহিত্য বা রাজনীতিকদের জাগতিক উচ্চারণও ইংরেজি অনুবাদে প্রায়শঃই বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অচেনা ঠেকে, কোরানের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্যি, যা কিনা দারুণ পরোক্ষ ভাষা এবং শব্দ উহ্য রেখে গভীরভাবে রচিত। প্রথমদিকের সূরাগুলোয় বিশেষ করে স্বর্গীয় প্রভাবে মানবীয় ভাষার চূর্ণবিচূর্ণ আর টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার ছাপ দেখায়। মুসলিমরা প্রায়ই বলে যে ইংরেজি অনুবাদে কোরান পাঠের সময় ভিন্ন কোনও গ্রন্থ পাঠের অনুভূতি হয় তাদের, কারণ আরবীর সৌন্দর্যের কোনও কিছুই সেখানে থাকে না। এর নাম যা বোঝায়, এটা সশব্দে আবৃত্তি করার বিষয় এবং ভাষার শব্দ এর প্রভাবের অত্যাবশ্যকীয় অংশ। মুসলিমরা বলে, তারা মসজিদে কোরান উচ্চারিত হতে শোনে যখন, শব্দের স্বর্গীয় মাত্রায় নিজেকে আবৃত বলে মনে হয় তাদের, যেমনটি মুহাম্মদ (স) হিরা পর্বত বা দিগন্তের যেদিকেই চোখ ফিরিয়েছেন সেদিকেই জিব্রাইলকে দেখেছেন এবং আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছেন ঠিক সেরকম। এটা কেবল তথ্যের সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠ করার গ্রন্থ নয়। এক ধরনের স্বর্গীয় বোধ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্যে; আর তাড়াহুড়ো করে এটা পড়া যাবে না:

AMARBOI.COM

> এইরূপে আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি—সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদের জন্য উপদেশ।
>
> আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।'[১৭]

মুসলিমরা দাবি করে, সঠিক পথে কোরানের শরণাপন্ন হয়ে তারা জাগতিক বিশ্বের ক্ষণস্থায়ী ও পলায়নপর ঘটনার আড়ালে অবস্থানকারী এক দুর্জ্ঞেয়, এক পরম সত্তা ও ক্ষমতার অস্তিত্ব টের পায়। সুতরাং, কোরান পাঠ এক আধ্যাত্মিক অনুশীলন, যা বুঝতে ক্রিশ্চানদের কষ্ট হতে পারে, কারণ সে অর্থে তাদের কোনও পবিত্র ভাষা নেই, জেসাসই ঈশ্বরের বাণী, নিউ টেস্টামেন্ট গ্রিকের সঙ্গে পবিত্রতার কোনও সম্পর্ক নেই। ইহুদিদের অবশ্য তোরাহ্‌র প্রতি একই রকম মনোভাব রয়েছে। তারা বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক পাঠ করার সময় কেবল পৃষ্ঠার ওপর চোখ বুলিয়ে যায় না; বারবার উচ্চকণ্ঠে শব্দসমূহ আবৃত্তি করে, ঈশ্বর সিনাই পর্বতে মোজেসের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার সময় যে শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন বলে বলা হয় সেগুলোর স্বাদ আস্বাদন করে। অনেক সময় আত্মার নিঃশ্বাসে কম্পিত অগ্নিশিখার মতো সামনে পেছনে দোল খায়

তারা। নিঃসন্দেহে যেসব ইহুদি এভাবে বাইবেল পাঠ করে তারা ক্রিশ্চানদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে, অন্যদিকে ক্রিশ্চানদের কাছে পেন্টাটিউকের বেশির ভাগ অংশই নেহাতই নিরস ও অস্পষ্ট ঠেকে।

মুহাম্মদের (স) গোড়ার দিকের জীবনীকারগণ বারবার প্রথমবারের মতো কোরান শোনার পর আরবদের বিস্ময় ও বিহ্বলবোধের বর্ণনা দিয়েছেন। একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই এমন অসাধারণ সুন্দর ভাষা জন্ম দেওয়া সম্ভব বিশ্বাস করে অনেকেই নিমেষে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ধর্মান্তরিতরা বারবার এই অভিজ্ঞতাকে স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছে, যা কিনা তাদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ঘা দিয়ে অনুভূতির প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করেছে। এভাবে তরুণ কুরাইশ উমর ইবন আল-খাত্তাব মুহাম্মদের (স) ঘোরতর বিরোধী ছিলেন; প্রাচীন পৌত্তলিকতার অনুগত ছিলেন তিনি,* পয়গম্বরকে হত্যা করতে ছিলেন সদাপ্রস্তুত। কিন্তু এই মুসলিম সল অভ তারসাস বাণী জেসাস-এর দিব্যদর্শনে নয় বরং কোরান দ্বারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মান্তকরণের দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষ্য রয়েছে, দুটিই উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথম বিবরণী অনুযায়ী, উমর জানতে পারেন যে গোপনে ইসলাম গ্রহণকারী তাঁর বোন এক নতুন সুরার আবৃত্তি শুনছেন। 'কী বাজে কথা এটা?' রাগত স্বরে গর্জে উঠে সবেগে বাড়ির পথ ধরেন তিনি, সোজা ভেতরে ঢুকে বেচারা ফাতিমাহ্‌কে মাটিতে ফেলে দেন। কিন্তু যখন দেখলেন ফাতিমাহ্‌র শরীর কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে সম্ভবত লজ্জা পেয়েছিলেন তিনি, কারণ তাঁর অভিব্যক্তির পরিবর্তন ঘটেছিল। হট্টগোলের সময় অতিথি কোরান আবৃত্তিকারের ফেলে যাওয়া পাণ্ডুলিপি তুলে নেন তিনি, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত কুরাইশদের একজন হিসাবে পড়তে শুরু করেন। উমর আরবী কথ্য-কবিতার স্বীকৃত বোদ্ধা ছিলেন, ভাষার তাৎপর্য নিয়ে কবিরা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসতেন, কিন্তু কোরানের মতো কোনও কিছু কখনও চোখে পড়েনি তাঁর। 'কী চমৎকার আর উন্নত বাণী!' বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে উচ্চারণ করেন তিনি এবং নিমেষে আল্লাহ্‌র নতুন ধর্মে দীক্ষা নেন।[১৮] ভাষার সৌন্দর্য তাঁর ঘৃণা ও সংস্কারের দেয়াল ভেদ করে এক অজ্ঞাত চেতনায় টোকা দিয়েছিল। আমাদের সবার এধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যখন কোনও একটা কবিতা যুক্তির চেয়ে গভীর কোনও স্তরে স্বীকৃতির তারে টোকা দেয়। উমরের ধর্মান্তরিত হওয়ার অপর বিবরণে এক রাতে উমরের কাবাহয় মুহাম্মদের (স) মুখোমুখি হওয়ার কথা আছে। উপাসনাগৃহের সামনে আপন মনে কোরান আবৃত্তি করছিলেন মুহাম্মদ (স)। শব্দগুলো শোনা প্রয়োজন ভেবে চুপিচুপি বিশাল গ্রানিট কিউবকে ঢেকে রাখা দামাস্ক কাপড়ের আড়ালে ঢুকে আস্তে আস্তে আগে বেড়ে একেবারে পয়গম্বরের সামনে পৌঁছে যান উমর। তাঁর

AMARBOI.COM

জবানীতে, 'কাবাহ্‌র আচ্ছাদন বাদে আমাদের মাঝখানে আর কিছুই ছিল না'—একটা বাদে তাঁর সকল প্রতিরোধ ধসে পড়েছিল। এরপর আরবী ভাষার যাদু এর চমক দেখাল: 'কোরান শোনার পর আমার হৃদয় নরম হয়ে গেল, আমি কাঁদলাম এবং ইসলাম আমার মাঝে প্রবেশ করল।'[১৯] কোরানই ঈশ্বরের 'মহাশূন্যে' বিশাল এক সত্তায় পরিণত হওয়া রোধ করেছে ও তাঁকে প্রত্যেক বিশ্বাসীর মন আর হৃদয়ে স্থান করে দিয়েছে।

কোরান দ্বারা ধর্মান্তরিত উমর এবং অন্যান্য মুসলিম অভিজ্ঞতাকে জর্জ স্টেইনার রচিত *রিয়েল প্রেজেন্সেস: ইজ দেয়ার এনিথিং ইন হোয়াট উই সে?* গ্রন্থে বর্ণিত শিল্পের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তিনি তাঁর ভাষায় 'সিরিয়াস আর্ট, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের অখণ্ডতা' যা 'আমাদের অস্তিত্বের গভীর প্রদেশে অনুসন্ধান চালায়'-এর কথা বলেছেন। এটা এক ধরনের আক্রমণ বা ঘোষণা, যা 'আমাদের সতর্ক সত্তার ছোট কুটিরে জোর করে প্রবেশ করে এবং আমাদের নির্দেশ দেয় "জীবনকে বদলাও"।' এমন এক আহ্বানের পর কুটিরখানা 'আর আগের মতো একই রকম বসবাসের যোগ্য থাকে না।'[২০] উমরের মতো মুসলিমরা যেন চেতনাকে নাড়িয়ে দেওয়া এরকম অভিজ্ঞতারই মুখোমুখি হয়েছিলেন, এক সচেতনতা বোধ ও অস্বস্তিকর অনুভূতি, যা তাদের ঐতিহ্যবাহী অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক চ্যুতিতে সক্ষম করে তুলেছিল। এমনকি যেসব কুরাইশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তারাও কোরানের কারণে অস্বস্তি বোধ করেছে, একে পরিচিত সকল ধরনের বাইরে বলে আবিষ্কার করেছে: এটা কাহিনি বা কবির অনুপ্রেরণার মতো কিছু ছিল না, আবার জাদুকরের মন্ত্রের মতোও নয়। কোনও কোনও বর্ণনায় দেখা যায় যেসব শক্তিশালী কুরাইশ বিরোধিতা অটল ছিল তারাও কোনও সুরা শোনার সময় পরিষ্কার হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। মুহাম্মদ (স) যেন একেবারে নতুন সাহিত্য ধারা সৃষ্টি করছিলেন যার জন্যে কেউ কেউ তখনও প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু অন্যরা শিহরিত হয়েছে। কোরানের এই অভিজ্ঞতা ছাড়া ইসলামের এমন প্রতিষ্ঠালাভ খুবই অসম্ভব ছিল। আমরা দেখেছি, প্রাচীন ইসরায়েলিদের পুরোনো ধর্মীয় আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করতে প্রায় ৭০০ বছর লেগেছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (স) আরবদের মাত্র ২৩ বছরে এই কঠিন পরিবর্তন অর্জনে সাহায্য করেছেন। কবি ও পয়গম্বর স্বরূপ মুহাম্মদ (স) এবং টেক্সট ও থিওফ্যানিরূপ কোরান শিল্প ও ধর্মের বিরাজমান মিলের এক অসাধারণ বিস্ময়কর উদাহরণ।

মিশনের প্রথম বছরগুলোয় মুহাম্মদ (স) তরুণ সমাজ হতে অনেককে আপন ধর্মে আকৃষ্ট করেছিলেন: এরা মক্কার পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার মোহমুক্ত হয়ে উঠছিল; এছাড়া সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত ও প্রান্তিক সদস্যদের

AMARBOI.COM

সমানভাবে টেনেছেন তিনি, যেখানে নারী দাস এবং দুর্বলতর ক্ল্যানের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুরুর দিকের সূত্রসমূহ যেমন জানায়, এক পর্যায়ে মনে হয়েছিল গোটা মক্কা বুঝি মুহাম্মদের (স) পরিমার্জিত আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করে বসবে। স্থিতাবস্থায় বেশি খুশি ছিল যারা অপেক্ষাকৃত সেই ধণিক শ্রেণী বোধগম্য কারণেই দূরত্ব বজায় রেখেছে; কিন্তু মুহাম্মদ (স) পৌত্তলিক দেবতাদের উপাসনা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার আগ পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ ঘটেনি তাঁর। মিশনের প্রথম তিন বছরে মনে হয়েছে যে মুহাম্মদ (স) তাঁর বার্তার একেশ্বরবাদী বিষয়বস্তুর প্রতি জোর দিচ্ছেন না। লোকজন সম্ভবত ধরে নিয়েছিল যে, পরমেশ্বর আল্লাহর পাশাপাশি বরাবরের মতো আরবের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী দেব-দেবীর উপাসনাও চালিয়ে যেতে পারবে তারা। কিন্তু যেই তিনি এসব প্রাচীন কাল্টগুলোকে পৌত্তলিকতাবাদী বলে নিন্দা জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় রাতারাতি সিংহভাগ অনুসারী হারালেন তিনি এবং ইসলাম এক ঘৃণিত ও নির্যাতিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠিতে পরিণত হলো। আমরা দেখেছি, একজন মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে সচেতনতার কষ্টকর পরিবর্তন প্রয়োজন পড়ে। গোড়ার দিকের ক্রিশ্চানদের মতো প্রথম মুসলিমদের বিরুদ্ধেও সমাজকে প্রবলভাবে হুমকির সম্মুখীনকারী 'নাস্তিকতা'র অভিযোগ উঠেছে। মক্কায়, যেখানে নাগরিক সভ্যতা ছিল একেবারে নতুন এবং কুরাইশদের গর্বিত স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁকে নাজুক অর্জন মনে হয়েছে, অনেকেই যেন সেই রোমের ক্রিশ্চানদের রক্তের নেশায় আক্রান্ত নাগরিকদের মতো অনুভূতি বোধ করেছিল। কুরাইশরা যেন আদিপুরুষদের দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদকে গভীর হুমকি বিবেচনা করেছে। অচিরেই স্বয়ং মুহাম্মদ (স)-এর জীবনই বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ কুরাইশদের সঙ্গে এই বিচ্ছেদকে *স্যাটানিক ভার্সেস*-এর ঘটনার সময়কার বলে অনুমান করেন, সালমান রুশদীর ঘটনার পর যা বেশ কুখ্যাতি অর্জন করেছে। হিজাজবাসী আরবদের কাছে তিনজন আরবীয় দেবী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন: 'আল-লাত (যার নামের অর্থ স্রেফ 'দেবী') এবং আল-উয্যা (শক্তিমান), তায়েফ এবং নাখলায় যথাক্রমে এদের মন্দির ছিল এবং মক্কার দক্ষিণ পুবে-আল মানাত–চরমজন–লোহিত সাগর উপকূল কুদাঈদে মন্দির ছিল তার। এই দেবীগণ জুনো বা পালাস আথিন এর মতো সম্পূর্ণ মানবাকৃতি ছিলেন না। প্রায়শঃ এদের *বানাত আল্লাহ* বা ঈশ্বরের কন্যা বলে সম্বোধন করা হতো, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এতে করে পূর্ণ-বিকশিত কোনও দেবনিচয়ের কথা বোঝায়। আরবরা বিমূর্ত সম্পর্ক বোঝাতে এই ধরনের আত্মীয়তা-সূচক শব্দবন্ধ ব্যবহার করত: এভাবে *বানাত আল-দাহর* এর আক্ষরিক অর্থ 'নিয়তির কন্যাগণ'

AMARBOI.COM

সোজাসুজি দুর্ভাগ্যে বা ভাগ্যের পরিবর্তন বোঝায়। *বানাত আল্লাহ্*-তে কেবল 'স্বর্গীয় সত্তাসমূহ' বুঝিয়েছিল। মন্দিরসমূহে এসব দেবতাকে সত্যিকার প্রতিমা দিয়ে উপস্থাপন করা হয়নি, খাড়া পাথর-স্তম্ভ ছিল ওদের প্রতীক, অনেকটা প্রাচীন কানানবাসীদের মাঝে যেমনটি চালু ছিল সেরকম। আরবরা এদের আনাড়ি সহজ ঢঙে উপাসনা করত না, ঐশ্বরিকতার কেন্দ্র হিসাবে দেখত। কাবাহ্‌গৃহসহ মক্কার মতো তায়েফ, নাখলাহ ও কুদাঈদ আরবদের আবেগের জমিনে অত্যাবশ্যকীয় আধ্যাত্মিক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্মরণাতীতকাল থেকে তাদের আদিপিতারা এসব জায়গায় উপাসনা করে গেছে, এটা ধারাবাহিকতার একটা স্বস্তিদায়ক বোধ যুগিয়েছে।

*স্যাটানিক ভার্সেসে*'র কাহিনী কোরান বা প্রাথমিককালের কথ্য বা লিখিত কোনও উৎসে উল্লেখ করা হয়নি। পয়গম্বরের সবচেয়ে বিশ্বস্ত জীবনীগ্রন্থ ইবন ইসহাকের *সিরার* অন্তর্ভূক্ত হয়নি; কেবল দশম শতকের ইতিহাসবিদ আবু জাফর আত্-তাবারি (মৃ. ৯২৩)-র রচনায় তা পাওয়া যায়। তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, দেবীদের কাল্ট নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আপন গোত্রের অধিকাংশ সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় মুহাম্মদ (স) বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং শয়তানের প্ররোচণায় কিছু বিকৃত পঙক্তি উচ্চারণ করেন যেগুলোয় *বানাত আল্লাহ*-কে দেবদূতদের মতো করে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মানার অনুমোদন ছিল। তথাকথিত এই '*স্যাটানিক ভার্সেস*'-এর তিন দেবী আল্লাহর সমকক্ষ নন, বরং নিম্নস্তরের অলৌকিক সত্তা, যারা মানবজাতির পক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। অবশ্য পরে, তারাবি বলছেন যে, জিব্রাইল পয়গম্বরকে পাঙক্তিগুলো 'শয়তানে'র সৃষ্টি বলে জানিয়ে কোরান থেকে বাদ দিয়ে নতুন পঙক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার কথা বলেন যার মাধ্যমে *বানাত আল্লাহকে* তুচ্ছ মূর্তি ও কল্পনার মূর্ত সৃষ্টি ঘোষণা করা হয়:

> তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ—'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে? তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? এই প্রকার বণ্টন তো অসঙ্গত।
>
> এইগুলি কতক নামমাত্র যাহা তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ—যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলিল প্রেরণ করেন নাই। তাহারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ আসিয়াছে।[২১]

এটা ছিল পূর্বপুরুষদের পৌত্তলিক দেবতাদের বিরুদ্ধে কোরানের সবচেয়ে নিষ্ঠুর নিন্দাবাদ। একবার কোরানে এই পঙক্তিগুলোর অন্তর্ভূক্তির পর

AMARBOI.COM

কুরাইশদের সঙ্গে সমন্বয়ের সব সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। এরপর থেকে একজন সতর্ক একেশ্বরবাদীতে পরিণত হন মুহাম্মদ (স) এবং *শিরক* (পৌত্তলিকতা, আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর সঙ্গে অপর কোনও সত্তাকে শরীক করা) ইসলামের সবচেয়ে গুরুতর পাপে পরিণত হয়।

*স্যাটানিক ভার্সেসের* ঘটনায় মুহাম্মদ (স) বহুঈশ্বরবাদীতার প্রতি কোনও রকম ছাড় দেননি-মানে ঘটনাটা যদি আদৌ ঘটে থাকে। এটাও কল্পনা করা ঠিক হবে না যে 'শয়তানে'র ভূমিকা বোঝায় যে কোরান ক্ষণিকের জন্য অশুভ দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছিল: ইসলামে শয়তান খৃস্টধর্মে তার যে রূপ সে তুলনায় অনেক বেশি সামালযোগ্য। কোরান আমাদের বলছে, শেষ বিচারের দিনে তাকে ক্ষমা করা হবে। আরবরা বারবার পরোক্ষ মানবীয় মেজাজ মর্জি বা প্রাকৃতিক প্রলোভন বোঝাতে 'শয়তান' শব্দটি প্রয়োগ করত।[22] এই ঘটনা হয়তো স্বর্গীয় বার্তাকে মানুষের ভাষায় রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (স) নিঃসন্দেহে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটারই ইঙ্গিতবাহী: এটা কোরানের আনুশাসনিক পঙক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যেখানে বোঝানো হয়েছে যে অতীতের অধিকাংশ পয়গম্বর স্বর্গীয় বার্তা পরিবেশনের সময় এরকম শয়তানি ভুল করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর সবসময় তাঁদের ভুল সংশোধন করেছেন ও সেগুলোর জায়গায় নতুন ও শ্রেষ্ঠতর প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন। বিষয়টি দেখার একটি বিকল্প এবং অধিকতর সেক্যুলার উপায় হচ্ছে, মুহাম্মদ (স) যেকোনও সৃজনশীল শিল্পীর মতোই নতুন অন্তর্দৃষ্টির আলোয় নিজের কাজ পর্যালোচনা করছেন, এভাবে চিন্তা করা। সূত্রসমূহ দেখায়, মুহাম্মদ (স) বহুঈশ্বরবাদীতার প্রশ্নে কুরাইশদের সঙ্গে আপোসরফায় চরম অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন তিনি, আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে ছাড় দিতে দ্বিধা করেননি, কিন্তু যখনই কুরাইশরা তাঁকে মনোল্যাট্রাস সমাধান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে-ওদের আদিপিতাদের দেবতার উপাসনা করার সুযোগ দিয়ে তিনি ও মুসলিমরা এক আল্লাহর উপাসনা করবেন-জোরের সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন মুহাম্মদ (স)। কোরানে যেমনন উল্লেখ রয়েছে '... এবং আমি ইবাদতকারী নই তাহার যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ। এবং তোমরাও তাহার ইবাদতকারী নও যাঁহার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।'[23] মুসলিমরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করবে আর উপাসনার মিথ্যা বস্তুর কাছে নতি স্বীকার করবে না-সে দেবী হোক বা মূল্যবোধ-কুরাইশরা যার সমর্থন করে।

ঈশ্বরের অনন্যতার বোধ কোরানের নৈতিক ভিত্তি। বস্তুগত বিষয়াদির আনুগত্য প্রকাশ বা নিম্নতর সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন *শিরক* (পৌত্তলিকতা), ইসলামের সর্বোচ্চ পাপ। বলতে গেলে প্রায় একই ভঙ্গিতে ইহুদি ধর্মগ্রন্থের

AMARBOI.COM

মতো কোরান পৌত্তলিক উপাস্যদের ভর্ৎসনা করেছে: এগুলো একেবারে অক্ষম। এসব দেবতা খাদ্য বা পুষ্টি দিতে পারে না, যেহেতু এরা ক্ষমতাহীন, এদের জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করা অর্থহীন। তার পরিবর্তে মুসলিমদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে আল্লাহ্ই পরম এবং একক সত্তা:

> বল: 'তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়;
> 'আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী;
> 'তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই,
> 'এবং তাহার সমতুল্য কেহই নাই।'[২৪]

আথানাসিয়াসের মতো ক্রিশ্চানরাও বারবার বলে গেছেন যে কেবল সত্তার উৎসই উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন। ট্রিনিটি ও অবতারবাদের মতবাদের মাধ্যমে তাঁরা এই দর্শন প্রকাশ করেছিলেন। কোরান ঐশ্বরিক একত্বের সেমেটিক ধারণায় ফিরে গিয়ে ঈশ্বর পুত্র 'জন্ম' দিতে পারেন, এমন কল্পনায় অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই, একমাত্র তিনিই মানুষকে রক্ষা করতে পারেন এবং তার প্রয়োজনীয় সকল আত্মিক ও শারীরিক পুষ্টি যোগাতে পারেন। কেবল তাঁকে *আস-সামাদ* 'সবার নির্ভরস্থল' হিসাবে স্বীকার করার মাধ্যমে মুসলিমরা সময় ও ইতিহাসের অতীত সত্তার এক মাত্রাকে সম্বোধন করবে যা তাদের গোত্রীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে নিয়ে যাবে। মুহাম্মদ (স) জানতেন, একেশ্বরবাদ গোত্রীয়বাদের বিরোধী: সকল উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু একজন মাত্র উপাস্য সমাজ ও ব্যক্তি উভয়কেই সংহত করবে।

AMARBOI.COM

অবশ্য ঈশ্বর সম্পর্কিত সহজ সরল কোনও ধারণা নেই। একক এই উপাস্য আমাদের মতো কোনও সত্তা নন, যাঁকে আমরা চিনি এবং বুঝতে পারি। '*আল্লাহ আকবার!*' (আল্লাহ মহান!) ধ্বনিটি, যার মাধ্যমে মুসলিমদের *সালাতে* আহ্বান জানান হয়, ঈশ্বর ও বাকি সমস্ত সত্তার পার্থক্য তুলে ধরার পাশাপাশি ঈশ্বর স্বয়ং যেমন (*আল-ধাত*) এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের বলার পরিধি ও পার্থক্য নির্দেশ করে। কিন্তু তারপরেও এই দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রথমদিকের এক বিবরণে (*হাদিস*) উল্লেখ রয়েছে যে ঈশ্বর মুহাম্মদ (স) কে বলছেন: 'আমি গুপ্ত সম্পদ ছিলাম; আমি প্রকাশিত হতে চেয়েছি। সেজন্যে, আমি জগৎ সৃষ্টি করেছি যাতে জ্ঞাত হতে পারি।'[২৫] কোরান এবং প্রকৃতির নির্দশনসমূহ (*আয়াত*) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মুসলিমরা পৃথিবীতে প্রেরিত স্বর্গীয় সত্তার বৈশিষ্ট্য জানতে পারে, কোরান যাকে বলছে 'ঈশ্বরের মুখাবয়ব'–*ওয়াজহ্ আল্লাহ*। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অপর দুটি

ধর্মের মতো ইসলাম এটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, আমরা কেবল ঈশ্বরের অনির্বচনীয় সত্তাকে আমাদের সীমিত উপলব্ধির সঙ্গে মানানসই করে তোলা কর্মধারায়ই তাঁকে দেখতে পারি। কোরান মুসলিমদের চারপাশ থেকে তাদের পরিবেষ্টন করে রাখা ঈশ্বরের মুখাবয়ব বা সত্তার চিরস্থায়ী সচেতনতা বোধ (*তাকওয়া*) বিকাশের তাগিদ দেয়: 'তুমি যেদিকেই তাকাবে, সেদিকেই আল্লাহর মুখাবয়ব দেখতে পাবে।'[২৬] ক্রিশ্চান ফাদারদের মতো কোরান আল্লাহকে পরম সত্তা হিসাবে দেখে, একমাত্র যাঁর প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। 'ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।'[২৭] কোরানে আল্লাহর নিরানব্বই নাম বা গুণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো তিনিই 'সর্বশ্রেষ্ঠ', বিশ্বজগতে আমরা যত ভাল গুণ দেখি সেগুলোর উৎস তিনি, সেদিকে গুরুত্ব দেয়। এভাবে তিনি *আল-গনি* (সমৃদ্ধ এবং অসীম) বলেই জগৎ টিকে আছে; তিনি সকল প্রাণের দাতা (*আল-মুহ্য়ী*), সর্বজ্ঞাতা (*আল-আলিম*), ভাষার স্রষ্টা (*আল-কালিমাহ্:* সুতরাং তাঁকে ছাড়া জীবন, জ্ঞান বা ভাষা অস্তিত্ব পেত না। একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত অস্তিত্ব ও ইতিবাচক মূল্যের অধিকারী, এটা তারই সাক্ষী। কিন্তু তারপরেও স্বর্গীয় নামগুলো যেন বারবার একে অপরটিকে রদ করে দিচ্ছে বলে মনে হয়। এভাবে ঈশ্বর *আল-কাহ্তার* যিনি প্রভুত্ব করেন এবং শত্রুর বিনাশ ঘটান এবং *আল-হালিম* যিনি চরম ধৈর্যশীল; তিনি *আল-ক্বাবিদ* যিনি ছিনিয়ে নেন, এবং *আল-বাসিত* যিনি উদারভাবে দান করেন; *আল-খাফিদ* যিনি অবনত করেন, এবং *আল-রাফিক্ব*, যিনি সম্মান দেন। মুসলিমদের ধর্মানুরাগের ক্ষেত্রে অল্লাহর নামগুলো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে: এগুলো আবৃত্তি করা হয়, তসবীহ্তে গোণা হয় এবং মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়। এসব মুসলিমদের মনে করিয়ে দেয় যে তাদের উপাস্য ঈশ্বরকে মানবীয় ধারণায় ধারণ করা সম্ভব নয় এবং তিনি সাধারণ সহজ কোনও সংজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করেন।

AMARBOI.COM

ইসলামের 'স্তম্ভ'গুলোর প্রথমটি হবে শাহাদাহ্: মুসলিমদের বিশ্বাসের ঘোষণা: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত পুরুষ।' এটা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকৃতি নয়, বরং আল্লাহই যে একমাত্র প্রকৃত সত্তা তার নিশ্চয়তা, সৌন্দর্য বা অনন্যতা: যেসব সত্তার এই গুণগুলোর অধিকারী বলে মনে হয় সেগুলো তারা কেবল এই অত্যাবশ্যকীয় সত্তায় অংশগ্রহণ করে বলেই এগুলো পায়। এই ঘোষণা উচ্চারণ দাবি করে যে মুসলিমরা অল্লাহকে তাদের জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করবে, তাঁকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়ে জীবনকে সংহত করে তুলবে। ঈশ্বরের একত্বের ঘোষণা কেবল *বানাত আল্লাহ*'র মতো দেব-দেবীদের উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা অস্বীকার নয়। ঈশ্বর একজন বলার অর্থ কেবল সংখ্যা বাচক

সংজ্ঞা প্রদান নয়: জীবন ও সমাজের চালিকাশক্তি হিসাবে সেই একক সত্তাকে গ্রহণ করার আহ্বান। প্রকৃত সংহত সত্তায় ঈশ্বরের একত্বের দেখা মিলতে পারে। কিন্তু স্বর্গীয় একত্বে মুসলিমদের অন্যদের ধর্মীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি দেওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু ঈশ্বর একজনই, সেহেতু সঠিকভাবে নির্দেশিত সকল ধর্ম নিশ্চয়ই কেবল তাঁর নিকট থেকেই এসেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একক সত্তায় বিশ্বাস সাংস্কৃতিক শর্তাধীন এবং বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাবে, কিন্তু সকল উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু অবশ্য অবশ্যই সেই সত্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে থাকবে—আরবরা যাঁকে সব সময় আল্লাহ বলে ডেকে এসেছে। কোরানের অন্যতম ঐশ্বরিক নাম হচ্ছে 'আল-নূর': আলো। নিচের কোরানের এই বিখ্যাত পঙক্তিগুলোয় ঈশ্বর সকল জ্ঞানের উৎস ও সেই সঙ্গে দুর্জ্ঞেয়কে চেনার জন্যে মানুষের উপায়ও:

> আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যাহার মধ্যে আছে একটা প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পুত পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি...'[২৮]

AMARBOI.COM

ঈশ্বর সংক্রান্ত কোরানের আলোচনার আবশ্যিকভাবে প্রতীকী ধরনের স্মারক হচ্ছে *কা* (*Ka*) প্রত্যয়। সুতরাং, *আন-নূর*, আলো, স্বয়ং ঈশ্বর নন, বরং বিশেষ কোনও রূপের (*প্রদীপ*) ওপর যে আলোক তিনি স্থাপন করেন, যা কোনও ব্যক্তির হৃদয়ে (*কুলুঙ্গি*) জ্বলজ্বল করে। আলো বা জ্যোতিকে এর কোনও বাহকের সঙ্গে মেলানো যাবে না, কিন্তু তা তাদের সবার ক্ষেত্রেই সাধারণ। একেবারে সূচনাকাল থেকে মুসলিম ভাষ্যকারগণ যেমন বলে এসেছেন, আলো বা জ্যোতি ঐশ্বরিক সত্তার একটা বিশেষ ভালো প্রতীক, যা সময় ও স্থানের উর্ধ্বে। এই পঙক্তিসমূহে উল্লিখিত জয়তুন গাছের উপমাকে প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতার পরোক্ষ উল্লেখ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা একটি মাত্র 'শেকড়' হতে উদ্ভুত হয়ে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার নানারকম বৈচিত্র্যে ভাগ হয়ে গেছে, যাকে বিশেষ কোনও ঐতিহ্যে বা স্থানের সঙ্গে মেলানো বা সীমিত করা সম্ভব নয়, এটা পুবদিকেরও নয়, পশ্চিমদিকেরও নয়।

ক্রিশ্চান ওয়ারাকা ইবন নওফল যখন মুহাম্মদকে (স) প্রকৃত পয়গম্বর হিসাবে স্বীকৃতি দেন, তখন তিনি কিংবা মুহাম্মদ (স) কেউই আশা করেননি

যে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। মুহাম্মদ (স) কখনও ইহুদি বা ক্রিশ্চানদের তাঁর আল্লাহর ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাননি, যদি না বিশেষ করে কেউ ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, কেননা তাঁদেরও নিজস্ব প্রকৃত প্রত্যাদেশ ছিল। কোরান প্রত্যাদেশকে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের বার্তা ও দর্শন রদকারী হিসাবে দেখেনি, বরং এতে মানবজাতির ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ দিকটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ পশ্চিমের অনেকেই সহিষ্ণুতা নামক গুণটিকে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে আগ্রহ বোধ করে না। অথচ শুরু থেকে মুসলিমরা প্রত্যাদেশকে ইহুদি বা ক্রিশ্চানদের চেয়ে কম মাত্রায় একচেটিয়া বিবেচনা করে এসেছে। আজ বহু জন ইসলামকে যে অসহিষ্ণুতার জন্যে দোষারোপ করে সেটা সবসময় ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শন থেকে উদ্ভূত নয়, এর উৎস সম্পূর্ণ ভিন্ন।[২৯] মুসলিমরা অবিচারের বেলায় অসহিষ্ণু, সেটা তাদের নিজস্ব শাসকদের তরফ থেকে হোক–ইরানের শাহ্ মুহাম্মদ রেযা পাহ্লভী—কিংবা শক্তিশালী পশ্চিমা দেশগুলোর দিক থেকে হোক। কোরান অপরাপর ধর্মীয় ঐতিহ্যকে মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ বলে নিন্দা করে না, বরং দেখায় যে প্রত্যেক নতুন পয়গম্বর পূর্বসুরিদের দর্শনের নিশ্চয়তা ও ধারাবাহিকতার কথা বলেছেন। কোরান শিক্ষা দেয়, আল্লাহ পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন: ইসলামি বিবরণ বলে এধরনের পয়গম্বরের সংখ্যা ১,২৪,০০০, অসীমত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত প্রতীকী সংখ্যা। এভাবে কোরান বারবার উল্লেখ করেছে যে, এটা আবশ্যিকভাবে নতুন কোনও বাণী আনছে না আর মুসলিমদের অবশ্যই অতীতের ধর্মসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর জোর দিতে হবে:

> তোমরা উত্তম পন্থা[*] ব্যতীত কিতাবীদের সহিত বিতর্ক করিবে না, তবে তাহাদের সহিত করিতে পার যাহারা উহাদের মধ্যে সীমা লঙ্ঘনকারী। এবং বল, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাহার প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'[৩০]

কোরান স্বভাবতই আব্রাহাম, নোয়াহ্, মোজেস ও জেসাসের মতো আরবদের পরিচিত পয়গম্বরদের শনাক্ত করেছে যাঁরা ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের পয়গম্বর ছিলেন। এখানে প্রাচীন আরবজাতি মিদিয়ান এবং সামূদ জাতির কাছে প্রেরিত

---

[*] অর্থাৎ সৌজন্যের সঙ্গে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে তর্ক করবে। সূত্র: *পবিত্র কুরআনুল করীম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

AMARBOI.COM

হূদ ও সালিহ্ পয়গম্বরের কথা উল্লেখ আছে। বর্তমানে মুসলিমরা জোরের সঙ্গে বলে যে মুহাম্মদ (স) হিন্দু ও বুদ্ধদের কথা জানলে তাদের ধর্মগুরুদেরও অন্তর্ভুক্ত করতেন: তাঁর পরলোকগমনের পর ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের মতো ইসলামি সাম্রাজ্যে তাদেরও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। একই নীতি অনুযায়ী, যুক্তি দেখায় মুসলিমরা, কোরান হয়তো আমেরিকান ইন্ডিয়ান বা অস্ট্রেলিয় আদিবাসীদের শামান বা পবিত্র ব্যাক্তিদেরও সম্মান প্রদর্শন করত।

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকায় মুহাম্মদের (স) বিশ্বাস অচিরেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। কুরাইশদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মক্কাবাসী মুসলিমদের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। গোত্রীয় নিরাপত্তাবিহীন দাস ও মুক্ত দাসরা এমন নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয় যে কয়েকজনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে এবং মুহাম্মদের (স) ক্ল্যানকে বশ্যতা স্বীকার করানোর প্রয়াসে বয়কট পর্যন্ত করা হয়েছিল: এই বঞ্চনাই সম্ভবত মুহাম্মদ (স)-এর প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদের (স) জীবনও বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে। উত্তরাঞ্চলের বসতি ইয়াসরিবের পৌত্তলিক অধিবাসীরা মুসলিমদের স্ব স্ব ক্ল্যান ত্যাগ করে সেখানে অভিবাসী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কোনও আরবের জন্যে এমন একটা পদক্ষেপ নেওয়া ছিল চরম নজীরবিহীন: আরবে গোত্রের পবিত্র একটা মূল্য ছিল, এই ধরনের পক্ষ ত্যাগ ছিল আবশ্যকীয় নীতিমালার লঙ্ঘন। বিভিন্ন গোত্রীয় দলের মাঝে দৃশ্যতঃ অন্তহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল ইয়াসরিব। পৌত্তলিকদের অনেকেই মরুদ্যানের সমস্যাদির রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমাধান হিসাবে ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত ছিল। বসতিতে ইহুদিদের বড় আকারের বেশ কয়েকটি গোত্র ছিল যারা একেশ্বরবাদ গ্রহণে পৌত্তলিকদের মানসিক ভূমিকে প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এর মানে হচ্ছে, আরবীয় দেব-দেবীদের অসম্মানে কুরাইশদের মতো তারা আক্রান্ত বোধ করেনি। ৬২২ সালের গ্রীষ্মকালে যথারীতি প্রায় সত্তর জন মুসলিম সপরিবারে ইয়াসরিবের উদ্দেশে পাড়ি জমায়।

ইয়াসরিবে (বা মদীনা, অর্থাৎ শহর, মুসলিমরা পরে যে নামে ডাকবে) *হিজরা* বা অভিবাসনের আগের বছর মুহাম্মদ (স) ইহুদিবাদ সম্পর্কে উপলব্ধির আলোকে নিজের ধর্মকে এর আরও কাছাকাছি আনার উদ্দেশ্যে অভিযোজন করেন। বহু বছর একাকী কাজ করার পর তিনি হয়তো একটি প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করার প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিলেন। এভাবেই ইহুদিদের প্রায়শ্চিত্ত দিবসে মুসলিমদের উপবাস পালনের নির্দেশ দেন তিনি এবং ইহুদিদের মতো দিনে তিনবার প্রার্থনা করার নিয়ম চালু করেন, এর আগে দিনে দুবার প্রার্থনা চলছিল। মুসলিমদের ইহুদি নারী বিয়ের অনুমতি ছিল; খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত কিছু নিয়মকানুন পালন করারও প্রয়োজন

AMARBOI.COM

ছিল। সর্বোপরি, ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের মতো মুসলিমদেরও এখন অবশ্যই জেরুজালেমের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে হবে। শুরুতে মদীনার ইহুদিরা মুহাম্মদকে (স) একটা সুযোগ দিতে তৈরি ছিল: মরুদ্যানের জীবনযাত্রা অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল; মদীনার অসংখ্য গোঁড়া পৌত্তলিকদের মতো তারাও মুহাম্মদকে (স) সন্দেহাবসর দিতে চেয়েছিল, কেননা তিনি ইতিবাচকভাবে তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মদের (স) বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং মক্কা হতে আগত নবাগতদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন পৌত্তলিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রত্যাখ্যানের পক্ষে ইহুদিদের শক্ত ধর্মীয় যুক্তি ছিল: পয়গম্বরত্বের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করত তারা। একজন মেসায়াহর অপেক্ষায় থাকলেও এ পর্যায়ে কোনও ইহুদি বা ক্রিশ্চান তাঁরা পয়গম্বর হবেন বলে তারা বিশ্বাস করত না। কিন্তু তারপরেও রাজনৈতিক বিবেচনা থেকেও ওরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল: আগের দিনে যুদ্ধরত আরব গোত্রগুলোর যে কোনও একটির পক্ষে যোগ দিয়ে ফায়দা লুটেছিল ওরা। মুহাম্মদ (স) অবশ্য এ দুটো গোত্রকেই নতুন মুসলিম *উম্মাহয়* কুরাইশদের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন—এক ধরনের অতি-গোত্র (Super tribe), ইহুদিরাও যার সদস্য ছিল। মদীনায় নিজেদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়তে দেখে ইহুদিরা বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। ওরা 'মুসলিমদের গল্প শুনে ঠাট্টা তামাশা করার উদ্দেশ্যে'[৩১] মসজিদে সমবেত হতো। ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে উন্নত ধারণা থাকায় কোরানের কাহিনীর ভুল খুঁজে বের করার কাজটা তাদের পক্ষে ছিল খুব সহজ, কিছু কিছু কাহিনীতে বাইবেলের ভাষ্যের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য রকম ভিন্নতা ছিল। মুহাম্মদের (স) পয়গম্বরত্বের দাবি নিয়েও টিটকারী দিত ওরা, বলত যে লোক নিজেকে পয়গম্বর দাবি করে অথচ উট হারিয়ে গেলে বলতে পারে না সেটা কোথায়—এতো বড়ই বেখাপ্পা ব্যাপার।

ইহুদিদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা সম্ভবত মুহাম্মদের (স) জীবনে সবচেয়ে বড় হতাশাব্যাঞ্জক ঘটনা ছিল; এতে তাঁর ধর্মীয় অবস্থান প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনও কোনও ইহুদি আবার বন্ধুসুলভ ছিল, তারা মুসলিমদের সঙ্গে সম্মানসূচক পদে যোগ দিয়েছিল। বাইবেল নিয়ে মুহাম্মদের (স) আলাপ-আলোচনা করে অন্য ইহুদিদের সমালোচনার জবাব বাতলে দিত তারা; ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে এই জ্ঞান মুহাম্মদকে (স) আপন দর্শন উন্নত করার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে। প্রথমবারের মতো মুহাম্মদ (স) পয়গম্বরদের সঠিক পর্যায়ক্রম জানতে পারেন, এতদিন পর্যন্ত তাঁর এ সংক্রান্ত ধারণা ছিল অস্পষ্ট। তিনি এবার বুঝতে পারেন যে, মোজেস বা জেসাসের আগেই আব্রাহামের আগমন ঘটা অত্যন্ত জরুরি ছিল। এর আগে পর্যন্ত মুহাম্মদ (স) সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন যে ইহুদি ও ক্রিশ্চানরা একই ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এবার তিনি

AMARBOI.COM

জানলেন, ওদের পরস্পরের ভেতর মারাত্মক মতদ্বৈততা রয়েছে। আরবদের মতো বহিরাগতদের চোখে দুটো অবস্থার মাঝে তেমন একটা পার্থক্য ধরা পড়েনি; তোরাহ্ ও গস্পেলের অনুসারীরা র‍্যাবাইগণ কর্তৃক পরিবর্ধিত কথ্য-আইন (Oral Law) ও ট্রিনিটির ব্লাসফেমাস মতবাদের মতো ভ্রান্ত বিষয়াদি আব্রাহামের খাঁটি ধর্ম বা *হানিফায়াহ্য়* যোগ করেছে ধরে নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। মুহাম্মদ (স) আরও জানতে পারেন, ইহুদিদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থে তাদের অবিশ্বাসী জাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে যারা স্বর্ণ বাছুরের উপাসনা করার জন্যে পৌত্তলিকতায় ফিরে গিয়েছিল। ইহুদিদের বিরুদ্ধে কোরানের যুক্তিগুলো খুবই উন্নত, এতে বোঝা যায় ইহুদিদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় মুসলিমরা নিজেদের কতটা হুমকির মুখে ভেবেছিল, যদিও কোরান তখনও জোরের সঙ্গে বলেছে যে 'পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশের সকল জাতি'[৩২] ভ্রান্তিতে পড়েনি এবং সব ধর্মই আসলে এক।

মদীনার বন্ধুসুলভ ইহুদিদের কাছে মুহাম্মদ (স) আব্রাহামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইশমায়েলের কাহিনীও জানতে পারেন। বাইবেলের বর্ণনানুসারে উপপত্নী হ্যাগারের গর্ভে জন্ম নেওয়া আব্রাহামের এক ছেলে ছিল, কিন্তু সারাহর গর্ভে ইসাক জন্ম নেওয়ার পর তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন এবং হ্যাগার ও ইশমাইলকে ত্যাগ করার দাবি তোলেন। আব্রাহামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে ঈশ্বর তখন তাঁকে ইশমায়েল এক মহান জাতির পিতা বলে গণ্য হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। আরবীয় ইহুদিরা স্থানীয় কিংবদন্তীও এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বলেছিল যে, আব্রাহাম মক্কা উপত্যকায় হ্যাগার ও ইশমায়েলকে ফেলে যান, এখানে ঈশ্বর স্বয়ং তাদের দায়িত্ব নেন। শিশু ইশমায়েল তৃষ্ণায় ছটফট করার সময় তিনি পবিত্র যমযম কূপ উন্মোচিত করে দেন। পরে আব্রাহাম ইশমায়েলকে দেখতে আসেন; তারপর পিতা-পুত্র মিলে একমাত্র ঈশ্বরের প্রথম মন্দির কাবাহ্ নির্মাণ করেন। আরবজাতির পিতায় পরিণত হন ইশমায়েল, সুতরাং ইহুদিদের মতো তারাও আব্রাহামের বংশধর। এ কাহিনী নিঃসন্দেহে মধুর শুনিয়েছিল মুহাম্মদের (স) কানে: আরবদের নিজস্ব ঐশীগ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন তিনি, এবার আদিপুরুষদের ধর্মানুরাগে তিনি তাদের ধর্মবিশ্বাসকে স্থাপন করতে পারবেন। ৬২৪ সালের জানুয়ারি মাসে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে মদীনার ইহুদিদের বৈরিতা স্থায়ী, স্বাধীনতার ঘোষণা দিল আল্লাহর নতুন ধর্ম। জেরুজালেমের বদলে মক্কার দিকে মুখ করে প্রার্থনা করার জন্যে মুসলিমদের নির্দেশ দিলেন মুহাম্মদ (স)। প্রার্থনার দিক (*কিবলা*) পরিবর্তনকে মুহাম্মদের (স) সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্রিয়া হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পুরোনো দুটো প্রত্যাদেশের ওপর অনির্ভরশীল মক্কার দিকে ফিরে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে মুসলিমরা আভাসে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কোনও প্রতিষ্ঠিত

AMARBOI.COM

ধর্মের অংশ নয়, বরং কেবল ঈশ্বরের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে। এক ঈশ্বরের ধর্মকে বিবদমান বিভিন্ন পক্ষে অশোভনভাবে বিভক্তকারী কোনও ক্ষুদ্র গোত্রে যোগ দিচ্ছে না তারা। তার বদলে অব্রাহামের আদি ধর্মে ফিরে যাচ্ছে, যিনি প্রথম *মুসলিম* ছিলেন এবং তাঁর পবিত্র গৃহ নির্মাণ করেছিলেন:

> তাহারা বলে 'ইয়াহুদি বা খৃস্টান হও, ঠিক পথ পাইবে।' বল, 'বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে ইমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকে নিকট হইতে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মাসমর্পণকারী।'[৩৩]

স্বয়ং ঈশ্বরের চেয়ে সত্যের তুচ্ছ মানবীয় ব্যাখ্যা বেছে নেওয়া নিঃসন্দেহে পৌত্তলিকতা।

মুসলিমরা মুহাম্মদের (স) জন্ম তারিখ বা প্রথম প্রত্যাদেশের দিন থেকে তাদের বছর গণনা করে না—এসবে আসলে নতুনত্ব কিছু ছিল না—বরং *হিজরার* বছর থেকে (মদীনায় অভিবাসন) কাল গণনা করে থাকে, যখন মুসলিমরা ইসলামকে রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিণত করে ইতিহাসে ঐশী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে শুরু করেছিল। আমরা দেখেছি, কোরান শিক্ষা দেয় সকল ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায়বিচার ও সমতা ভিত্তিক একটা সমাজের জন্যে কাজ করা । প্রকৃতই মুসলিমরা তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব খুব গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। গোড়াতে রাজনৈতিক নেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেননি মুহাম্মদ (স), কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাপ্রবাহ আরবদের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন এক রাজনৈতিক সমাধানের দিকে ঠেলে দিয়েছিল তাঁকে। *হিজরা* এবং ৬৩২ সালে পরলোকগমনের মধ্যবর্তী দশ বছর সময় কালে মুহাম্মদ (স) এবং প্রথম দিকের মুসলিমরা মদীনার প্রতিপক্ষ ও মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে টিকে থাকার তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এদের সবাই *উম্মাহ্‌কে* নিশ্চিহ্ন করতে প্রস্তুত ছিল। পশ্চিমে মুহাম্মদকে (স) প্রায়শঃই যুদ্ধবাজ ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, যিনি অস্ত্রের জোরে অনিচ্ছুক বিশ্বের উপর ইসলাম চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাণের দায়ে লড়েছেন মুহাম্মদ (স) এবং কোরানে ন্যায়-যুদ্ধের ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করছিলেন যার সঙ্গে অধিকাংশ ক্রিশ্চান

AMARBOI.COM

একমত পোষণ করবে; তিনি কখনওই কাউকে তাঁর ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে কোরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোনও জবরদস্তি' চলবে না। কোরানে যুদ্ধকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে, আত্মরক্ষার যুদ্ধই কেবল ন্যায়-যুদ্ধ। কখনও কখনও উন্নত মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে যুদ্ধ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যেমন খ্রিশ্চানরা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করেছিল। মুহাম্মদের (স) রাজনৈতিক যোগ্যতা ছিল খুবই উঁচু মানের। মুহাম্মদের জীবনের শেষ প্রান্তে অধিকাংশ আরবীয় গোত্র *উম্মাহ্য়* যোগ দিয়েছিল, যদিও মুহাম্মদ (স) ভালো করেই জানতেন যে তাদের ইসলাম হয় নামমাত্র বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহ্যিক। ৬৩০ সালে মক্কা নগরীর দুয়ার মুহাম্মদের (স) জন্যে উন্মুক্ত হয়, বিনা রক্তপাতে তিনি নগরীর দখল লাভ করেন। ৬৩২ সালে পরলোকগমনের অল্পদিন আগে তিনি 'বিদায় হজ্জ' সম্পাদন করেছিলেন, যার মাধ্যমে প্রাচীন আরবীয় পৌত্তলিক অনুষ্ঠান *হজ্জের* ইসলামিকরণ করে আরবদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় তীর্থ যাত্রাকে তাঁর ধর্মের পঞ্চম 'স্তম্ভে' পরিণত করেন।

অনুকূল পরিস্থিতিতে জীবনে একবার হজ্জ পালন প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। স্বাভাবিকভাবেই তীর্থযাত্রীরা মুহাম্মদকে (স) স্মরণ করে, কিন্তু এর আচার-অনুষ্ঠানগুলো পয়গম্বরের চেয়ে বরং আব্রাহাম, হ্যাগার ও ইশমায়েলের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যেই বোঝানো হয়েছে। বহিরাগতের চোখে এসব আচার অনুষ্ঠান অদ্ভুত ঠেকে–ভিনদেশী যেকোনও সামাজিক বা ধর্মীয় আচারের মতোই–কিন্তু এগুলো এক প্রবল ধর্মীয় অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে সক্ষম এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ইসলামি আধ্যাত্মিকতার সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যাদি তুলে ধরে। বর্তমানে নির্দিষ্ট সময়ে মক্কায় সমবেত হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর অনেকেই আরব নয়, কিন্তু তারা প্রাচীন আরবীয় অনুষ্ঠানগুলোকে আপন করে নিতে পেরেছে। জাতি বা শ্রেণীর সকল ব্যবধান আড়ালকারী ঐতিহ্যবাহী তীর্থযাত্রার পোশাকে যখন তারা কাবাহ্য় সমবেত হয়, তাদের মনে অনুভূতি জাগে যে তারা দৈনন্দিন জীবনের অহমিকাপূর্ণ ব্যস্ততা থেকে মুক্তি পেয়ে এমন এক গোষ্ঠীর সাথে মিশে গেছে যার লক্ষ্য এক, ভাবনা এক। উপাসনাগৃহের চারপাশে প্রদক্ষিণ শুরুর আগে সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে তারা বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ্ তোমার সেবায় আমি হাজির।' এই আনুষ্ঠানিকতার অবিচ্ছেদ্য অর্থ অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন ইরানি দার্শনিক আলি শরিয়তি:

> প্রদক্ষিণ করতে করতে আপনি যখন কাবাহ্র নিকটবর্তী হন, আপনার মনে হবে একটা ক্ষীণ ধারা বিশাল এক নদীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এক

স্রোতের ধাক্কায় মাটির সঙ্গে সম্পর্ক হারান আপনি। সহসা বানের জলে ভাসতে থাকেন। কেন্দ্রের কাছে যাবার পর মানুষের ভিড় আপনার ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করে যে নতুন জীবন লাভ করেন আপনি। এখন আপনি জনতার অংশ; এখন একজন মানুষ, জীবিত ও চিরন্তন...কাবাহ্ এই পৃথিবীর সূর্য যার মুখ আপনাকে এর কক্ষপথে টেনে নিয়ে যায়। আপনি এই বৈশ্বিক ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়ে যান। আল্লাহর চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে অচিরেই নিজেকে বিস্মৃত হবেন আপনি...এমন একটা পদার্থে পরিণত হয়ে গেছেন আপনি যা ক্রমশঃ গলিত এবং অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এটা ভালোবাসার চরম এবং পরম চূড়া।[৩৪]

ইহুদি ও ক্রিশ্চানরা গোষ্ঠীগত আধ্যাত্মিকতার উপরও জোর দিয়েছে। *হজ্জ* প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলিমকে *উম্মাহ্র* প্রেক্ষিতে ঈশ্বরকে কেন্দ্রে স্থাপন করে ব্যক্তিগত সংহতির একটা অভিজ্ঞতা দান করে। অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রেই শান্তি ও সমতা তীর্থযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; তীর্থযাত্রীরা একবার স্যাঙ্কচুয়্যারিতে পা রাখার পর সব ধরনের সহিংসতা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তীর্থযাত্রীরা একটা কীটও মারতে পারবে না, কর্কশ কণ্ঠে কথা বলবে না। এ কারণেই ১৯৮৭ সালের হজ্জ-এর সময় ইরানের তীর্থযাত্রীরা দাঙ্গা বাধানোর ফলে ৪০২ জন নিহত ও ৬৪৯ জন আহত হলে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের জন্ম হয়েছিল।

৬৩২ সালের জুন মাসে স্বল্পকালীন অসুস্থতার পর অপ্রত্যাশিতভাবে পরলোকগমণ করেন মুহাম্মদ (স)। তাঁর পরলোকগমনের পর বেদুঈনদের কেউ কেউ *উম্মাহ্র* সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু আরবের রাজনৈতিক ঐক্য ছিল অটুট। শেষ পর্যন্ত বিরূপ গোত্রগুলোও এক ঈশ্বরের ধর্ম গ্রহণ করে: মুহাম্মদের (স) বিস্ময়কর সাফল্য আরবদের দেখিয়েছে যে শত শত বছর ধরে তাদের উপকারে আসা পৌত্তলিকতাবাদ আধুনিক বিশ্বে বেকার। আল্লাহর ধর্ম সহমর্মিতার নীতির প্রচলন ঘটিয়েছিল যা ছিল অধিকতর উন্নত ধর্মের বৈশিষ্ট্য: ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচার এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি শক্তিশালী সাম্যবাদ ইসলামি আদর্শের বৈশিষ্ট্য হিসাবে অব্যাহত রয়ে যাবে।

মুহাম্মদ (স) জীবদ্দশায় এখানে নারী-পুরুষের সাম্যও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে পাশ্চাত্যে কথায় কথায় ইসলামকে উৎপত্তিগতভাবে নারী বিদ্বেষী ধর্ম হিসাবে তুলে ধরা হয়, কিন্তু খৃস্টধর্মের মতো আল্লাহর ধর্মও আদিতে নারীদের পক্ষে ইতিবাচক ছিল। প্রাক-ইসলামি যুগ *জাহিলিয়াহ্র* সময় নারীদের প্রতি আরবদের মনোভাব অ্যাক্সিয়াল যুগ পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গির মতো ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, বহুগামিতা ছিল সাধারণ ব্যাপার, স্ত্রীরা যার যার বাবার বাড়িতে অবস্থান করত। অভিজাত নারীরা বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করতেন–যেমন

AMARBOI.COM

মুহাম্মদের (স) প্রথম স্ত্রী খাদিজা অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী ছিলেন–কিন্তু সংখ্যাগুরু নারীদের অবস্থান ছিল দাসদের সমপর্যায়ের; তাদের কোনও রাজনৈতিক বা মানবাধিকার ছিল না; শিশুকন্যা হত্যা ছিল সাধারণ ব্যাপার। মুহাম্মদের (স) প্রথমদিকের দীক্ষিতদের মাঝে নারীরা ছিল, তাদের মুক্তির পরিকল্পনা ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরান কন্যা-শিশু হত্যার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে শঙ্কিত হওয়ার কারণে আরবদের ভর্ৎসনা করেছে। কোরান নারীদের উত্তরাধিকার ও তালাকের বৈধ অধিকারও দিয়েছে: ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পশ্চিমের নারীদের এর তুল্য কিছুই ছিল না। *উম্মাহর* কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে নারীদের উৎসাহিত করেছেন মুহাম্মদ (স); নারীরাও তাদের মতামত শোনা হবে এই আত্মবিশ্বাস হতে সরাসরি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, একবার মদীনার নারীরা মুহাম্মদের (স) কাছে অভিযোগ জানাল যে, পুরুষরা কোরান পাঠে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে, তারা পুরুষদের নাগাল পেতে মুহাম্মদের (স) সাহায্য চাইল। মুহাম্মদ (স) সাহায্য করলেন। ওদের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, নারীরাও যেখানে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সেখানে কোরান কেন কেবল পুরুষদের সম্বোধন করেছে। ফলে নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধন করে এক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিল যাতে উভয় লিঙ্গের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৩৫] এরপর থেকে কোরান বারবার আলাদাভাবে নারীদের সম্বোধন করেছে, ইহুদি বা ক্রিশ্চান ধর্মগ্রন্থে যার নজীর বিরল।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, খৃস্টধর্মের মতো এই ধর্মটিও পুরুষদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, তারা এমনভাবে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করেছে যা মুসলিম নারীদের পক্ষে নেতিবাচক। কোরান মর্যাদার প্রতীক হিসাবে কেবল মুহাম্মদের (স) স্ত্রীগণের জন্যেই পর্দার পরামর্শ দিয়েছে, সবার জন্যে নয়। অবশ্য সভ্য জগতে ইসলাম স্থান করে নেওয়ার পর মুসলিমরা নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় অবনমিতকারী ওইকুমিনের রেওয়াজ গ্রহণ করে। তারা মহিলাদের অবগুণ্ঠণে আড়াল করার ও পার্সিয়া ও ক্রিশ্চান বাইযান্তিয়ামের হেরেমে আলাদা করে রাখার রীতি গ্রহণ করে। এসব জায়গায় এভাবে নারীদের অবস্থা প্রান্তিক হয়ে গিয়েছিল। আব্বাসিয় খেলাফতের (৭৫০-১২৫৮) সময় নাগাদ মুসলিম নারীদের অবস্থা ইহুদি ও ক্রিশ্চান সমাজে তাদের স্বগোত্রীয়দের মতোই করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ মুসলিম নারীবাদীরা পুরুষদের কোরানের আদি চেতনায় ফিরে যাবার আবেদন জানাচ্ছে।

এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের মতো ইসলামকেও নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; এরই পরিণামে এর বিভিন্ন

AMARBOI.COM

সেক্ট ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে। এর প্রথমগুলো–সুন্নী ও শিয়াহ্‌র মাঝে বিভক্তি–মুহাম্মদের (স) আকস্মিক মৃত্যুর পর নেতৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতা থেকেই আঁচ করা গিয়েছিল। মুহাম্মদের (স) ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু কারও কারও মনে হয়েছে মুহাম্মদ (স) হয়তো চাচাত ভাই এবং মেয়েজামাই আলি ইবন আবি তালিবকেই উত্তরাধিকারী বা *খলিফা* হিসাবে দেখতে চাইতেন। আলি স্বয়ং আবু বকরের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরে তাঁকেই প্রথম তিন খলিফা: আবু বকর, উমর ইবন আল-খাত্তাব এবং উসমান ইবন আফফানের নীতিমালায় অসন্তুষ্ট ভিন্ন মতাবলম্বীদের আনুগত্যের কেন্দ্র মনে হয়েছে। অবশেষে ৬৫৬ সালে আলি চতুর্থ খলিফা হন: শিয়াহ্‌রা পরে তাঁকে *উম্মাহ্‌র* প্রথম ইমাম বা নেতা আখ্যায়িত করবে। নেতৃত্বের প্রশ্নে শিয়াহ্ ও সুন্নীদের বিভক্তি বিশ্বাসের চেয়ে বরং অধিকতর রাজনৈতিক ছিল; এর ফলে মুসলিম ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কিত এর ধারণাসহ রাজনীতির গুরুত্ব ঘোষিত হয়েছে। *শিয়াহ-ই-আলি* [আলির পক্ষাবলম্বী] সংখ্যালঘু রয়ে যায় ও প্রতিবাদসূচক এক ধর্মানুরাগের সৃষ্টি করে যা মুহাম্মদের (স) দৌহিত্র হুসাইন ইবন আলির করুণ পরিণতিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। হুসাইন উমাঈয়া শাসন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (যিনি আলির মৃত্যুর পর খেলাফত দখল করেছিলেন) এবং উমাঈয়া খলিফা ইয়াযিদের ক্ষুদ্র একদল সমর্থকের হাতে ৬৮০ সালে আধুনিক ইরাকের কুফার কাছে কারবালা সমতলে নিহত হন। সকল মুসলিমই হুসাইনের হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করে শিহরিত হয়, কিন্তু তিনি শিয়াহ্‌দেরই বিশেষ নেতায় পরিণত হয়েছেন, কখনও কখনও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুতে বরণ করে নেওয়া যে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে, এ তারই উদাহরণ। মুসলিমরা আপন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা শুরু করে দিয়েছিল। প্রথম চারজন খলিফা কেবল বাইযান্তাইন ও পার্সিয়া সাম্রাজ্যের আরবদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, এ দুটো সাম্রাজ্যই তখন ছিল পতনোন্মুখ। কিন্তু উমাঈয়া খলিফাদের অধীনে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা অব্দি অব্যাহত থাকে, যার পেছনে আরব সাম্রাজ্যবাদ যতখানি প্রেরণা হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল, ধর্ম ততটা ছিল না।

নতুন সাম্রাজ্যের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে কারও ওপর বল প্রয়োগ করা হয়নি; প্রকৃতপক্ষে, মুহাম্মদের (স) পরলোকগমনের পর প্রায় শত বছর সময় কালে ধর্মান্তরকরণকে উৎসাহিত করতে দেখা যায়নি, ৭০০ সালের দিকে আইন করে এর ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছিল: মুসলিমরা বিশ্বাস করত যে ইহুদিবাদ যেমন জ্যাকবের বংশধরদের জন্যে, ইসলামও তেমনি আরবদের ধর্ম। কিতাবি জাতি বা *আহল আল-কিতাব* হিসাবে ইহুদি ও

ক্রিশ্চানরা *জিম্মি* বা সংরক্ষিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আব্বাসিয় খলিফারা ধর্মান্তরকরণ উৎসাহিত করতে শুরু করলে তাঁদের সাম্রাজ্যে বহু সেমিটিক ও আর্য নতুন ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। খৃস্টধর্মে জেসাসের ব্যর্থতা এবং অসম্মানের মতো ইসলামের সাফল্যও গঠনমূলক ছিল। জাগতিক সাফল্যকে অবিশ্বাসকারী খৃস্টধর্মের মতো কোনও মুসলিমের ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনে রাজনীতি বাহ্যিক কোনও ব্যাপার নয়। মুসলিমরা নিজেদের ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী একটা ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনে অঙ্গিকারাবদ্ধ মনে করে। *উম্মাহ্‌র* পবিত্র মূল্য রয়েছে, নির্যাতন ও অনাচার অবিচার থেকে মানবতাকে রক্ষার এই প্রয়াসকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের এক 'নিদর্শন' হিসাবে এর রাজনৈতিক স্বাস্থ্য একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ক্রিশ্চানের জীবনে বিশেষ ধর্মতত্ত্বীয় মতামতের (ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, মেথডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট) মতো অবস্থান দখল করে থাকে। ক্রিশ্চানদের চোখে রাজনীতির প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি অদ্ভুত ঠেকে থাকলে, তাদের একথা ভাবা উচিত, তাদের দুর্বোধ্য ধর্মতত্ত্বীয় বিতর্কও ইহুদি ও মুসলিমদের কাছে সমান অদ্ভুত মনে হয়।

সুতরাং ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক বছরগুলোয় ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে মুসলিমদের চিন্তা বা অনুমান প্রায়শঃই খেলাফতের অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত রাজনৈতিক উদ্বেগ হতে উদ্ভূত ছিল। খৃস্টধর্মে জেসাসের ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত বিতর্কের মতোই *উম্মাহ্‌র* নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি কে হবেন এবং তাঁর চরিত্র কেমন হওয়া উচিত, এ সম্পর্কিত জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ইসলামে একই রকম গঠনমূলক বলে প্রতিভাত হয়েছে। *রাশিদুন* (প্রথম চার 'সঠিক পথে পরিচালিত' খলিফা)-এর পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুসলিমরা আবিষ্কার করে যে তারা মদীনার যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ক্ষুদ্র সমাজের বদলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে বাস করছে। এক সম্প্রসারমান সাম্রাজ্যের অধিকর্তা তারা; নেতারা যেন ইহজাগতিকতা ও প্রলোভনে তাড়িত হচ্ছেন। অভিজাত সমাজে দুর্নীতি ও বিলাসিতা ছড়িয়ে পড়েছিল; দরবারের আচার পয়গম্বর ও তাঁর সহচরদের কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন যাপনের চেয়ে একেবারে ভিন্ন রূপ নিয়েছিল। অধিকতর ধার্মিক মুসলিমরা কোরানের সাম্যবাদের বক্তব্য নিয়ে শাসনযন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। এতে বিভিন্ন সমাধান আর সেক্টের উদ্ভব হয়।

AMARBOI.COM

সর্বাধিক জনপ্রিয় সমাধানটি আবিষ্কার করেছিলেন আইনবিদ ও ট্র্যাডিশনিস্টবৃন্দ যারা মুহাম্মদ (স) ও *রাশিদুনদের* আদর্শে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। এর ফলে তোরাহ্‌র বিধিমালার অনুরূপ শরীয়াহ্ আইনের উদ্ভব

ঘটে। এই আইন কোরান ও পয়গম্বরের জীবন ও বাণীর ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। মুহাম্মদ (স) ও তাঁর প্রথম দিকের সহচরদের বাণী (*হাদিস)* এবং আচরণ (*সুন্নাহ্)* সম্পর্কিত বিস্ময়কর সংখ্যাক কথ্য বিবরণী প্রচলিত ছিল, অষ্টম ও নবম শতকে বেশকজন সম্পাদক এগুলো সংগ্রহ করেন; এদের মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারি এবং মুসলিম ইবন আল হিজ্জাজ আল-কুশাই। যেহেতু মুহাম্মদ (স) পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন বলে বিশ্বাস করা হয়, সুতরাং মুসলিমদের প্রতিদিনের জীবনে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এভাবে কথায়, ভালোবাসায়, খাদ্য গ্রহণে, পরিচ্ছন্নতা ও উপাসনায় ঈশ্বরের প্রতি উন্মুক্ত মুহাম্মদের (স) জীবন অনুকরণ করার মধ্য দিয়ে ইসলামি পবিত্র আইন মুসলিমদের ঈশ্বরের নিকটবর্তী জীবন যাপনে সাহায্য করে থাকে। পয়গম্বরের আদর্শ অনুসরণ করে মুসলিমরা তাঁর মতো ঈশ্বরের নৈকট্য অর্জনের আশা করে। এভাবে একজন মুসলিম যখন *সালাম আলাইকুম* (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা *সুন্নাহ* অনুসরণ করে, যেমনটি মুহাম্মদ (স) স্বয়ং করতেন, যখন তারা জীবে দয়া প্রদর্শন করে বা তাঁর মতো এতিম ও দরিদ্রদের প্রতি করুণা দেখায়, অন্যদের সঙ্গে আচরণে বিশ্বস্ত ও মহৎ হয়, তখন তাদের ঈশ্বরের স্মরণ হয়। বাহ্যিক আচার-আচরণকে শেষ কথা হিসাবে দেখা যাবে না, বরং তা কোরানে বর্ণিত ও স্বয়ং পয়গম্বরের দেখানো *তাকওয়া* বা 'ঈশ্বর সচেতনতা' অর্জনের প্রয়াস, যাতে ঈশ্বরের সার্বক্ষণিক স্মরণ (*জিকির)* জড়িত। *সুন্নাহ* ও *হাদিসের* বৈধতা নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে: কোনও কোনওটাকে অন্যগুলোর চেয়ে অধিকতর বিশ্বস্ত মনে করা হয়। কিন্তু শেষ বিচারে এইসব বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতার চেয়ে এগুলো যে কাজে এসেছে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ: শত শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের জীবনে এগুলো ঈশ্বরের পবিত্র বোধ জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

পয়গম্বরের বাণী বা *হাদিস* প্রধানত দৈনন্দিন জীবনের বিষয়াবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তবে অধিবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বও রয়েছে। এসব বক্তব্যের বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক সরাসরি মুহাম্মদের (স) কাছে উচ্চারিত বলে বিশ্বাস করা হয়। এসব *হাদিস কুদসি* (পবিত্র বিবরণ) বিশ্বাসীর মনে ঈশ্বরের অবস্থান ও উপস্থিতির ওপর জোর দেয়: উদাহরণ স্বরূপ, একটি সুবিখ্যাত *হাদিস*-এ কিছু পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে যা দিয়ে একজন মুসলিম ঐশ্বরিক উপস্থিতি অনুভব করতে পারে, যা বিশ্বাসীর মনে মূর্ত হয়েছে বলে মনে হয়: আপনাকে কোরান এবং শরিয়াহ্‌র নির্দেশাবলী পালনের মাধ্যমে শুরু করতে হবে, তারপর ধর্মানুরাগের স্বেচ্ছা কর্মকাণ্ডের দিকে অগ্রসর হবেন:

AMARBOI.COM

আমার নির্ধারিত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে আমার দাস আমার নিকটবর্তী হয়, যা আমার সর্বাধিক পছন্দনীয়। এবং আমার দাস অবশ্য পালনীয় কর্মকাণ্ডের দ্বারা আমার নিকটবর্তী হয়ে আমার ভালোবাসা অর্জন করে: আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, আমি তাঁর কানে পরিণত হই যা দিয়ে সে শোনে, চোখে পরিণত হই, যা দিয়ে সে দেখে, হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং পায়ে পরিণত হই যা দিয়ে সে হাঁটে।[৩৬]

ইহুদিবাদ ও খৃস্টধর্মের মতো দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বর এই জগতে অনুভূত এক সর্বব্যাপী সত্তা। মুসলিমরা অপর দুটি অপেক্ষাকৃত পুরোনো ধর্মের মতো একই রকম পদ্ধতিতে ঐশ্বরিক উপস্থিতির অনুভূতি গড়ে তুলতে পারে।

মুহাম্মদের (স) জীবনধারা অনুসরণ করে যারা এই ধরনের ধর্মানুরাগ গড়ে তোলে তাদের বলা হয় *আহল আল-হাদিস* বা ট্র্যাডিশনিস্ট। প্রচণ্ড সাম্যতার নীতির কারণে সাধারণ মানুষের কাছে এদের একটা আবেদন ছিল; উমাঈয়া ও আব্বাসিয়দের দরবারের বিলাসিতার বিরুদ্ধে ছিল তারা, কিন্তু শিয়াহ্‌দের বিপ্লবাত্মক কৌশলের পক্ষাবলম্বন করেনি। খলিফার ব্যতিক্রমী আধ্যাত্মিক গুণাবলী প্রয়োজন থাকার কথা তারা বিশ্বাস করত না: খলিফা কেবল একজন প্রশাসক। কিন্তু তারপরেও কোরান ও *সুন্নাহর* ঐশ্বরিক প্রকৃতির ওপর জোর দিয়ে প্রত্যেক মুসলিমকে অন্তস্থঃভাবে বিদ্রোহী ও চরম ক্ষমতার তীব্র বিরোধী ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের উপায় বাতলে দিয়েছিল তারা। মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব পালন করার জন্যে পুরোহিত গোষ্ঠীর কোনও প্রয়োজন স্বীকার করা হয়নি। প্রত্যেক মুসলিম তার নিয়তির জন্যে ঈশ্বরের কাছে দায়ী।

AMARBOI.COM

সর্বোপরি ট্যাডিশনিস্টরা শিক্ষা দিয়েছে যে, কোরান এক চিরন্তন বাস্তবতা, যা তোরাহ্ বা লোগোসের মতো স্বয়ং ঈশ্বরের: সময়ের সূচনার আগেই এর অস্তিত্ব ছিল তাঁর মনে। তাদের কোরানের অসৃষ্ট'র তত্ত্ব বোঝায় যে কোরান আবৃত্তি করার সময় মুসলিমরা সরাসরি অদৃশ্য ঈশ্বরের বাণী শুনতে পায়। কোরান তাদের অন্তস্তলে ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করে। এর পবিত্র বাণী আবৃত্তি করার সময় তাদের মুখে তাঁর বক্তব্য ধ্বনিত হয়, আর যখন তারা পবিত্র গ্রন্থটি হাতে নেয়, যেন স্বয়ং ঈশ্বরকেই স্পর্শ করে। প্রথম যুগের ক্রিশ্চানরাও ব্যক্তি জেসাস সম্পর্কে একই কথা ভেবেছিল:

যাহা আদি হইতে ছিল,
যাহা আমরা শুনিয়াছি,
যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি,

যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি,
এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি,
জীবনের সেই বাক্যের বিষয়
লিখিতেছি।[৩৭]

জেসাস বা বাণীর প্রকৃত মর্যাদা বা অবস্থানের প্রশ্নটি ক্রিশ্চানদের যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছে। এবার মুসলিমদের মাঝে কোরানের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হবেঃ আরবী টেক্সট ঠিক কোন অর্থে প্রকৃত ঈশ্বরের বাণী? কোরানের এই মর্যাদা বৃদ্ধিকে কোনও কোনও মুসলিম ব্লাসফেমাস মনে করেছে, যেমনটি জেসাসকে লোগোসের মানব রূপ কল্পনা করায় কোনও কোনও ক্রিশ্চান মর্মপীড়া বোধ করেছিল।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিয়াহ্‌রা এমন সব ধারণা গড়ে তোলে যেগুলো খৃস্টিয় অবতারবাদেরই আরও কাছাকাছি। হুসাইনের করুণ মৃত্যুর পর শিয়াহ্‌রা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, কেবল তাঁর বাবা আলি ইবন আবি তালিবের বংশধররাই *উম্মাহ্‌র* নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য। এরা ইসলামেরই এক সুস্পষ্ট আলাদা গোত্রে পরিণত হয়। একাধারে চাচাত ভাই ও মেয়ে-জামাই হিসাবে মুহাম্মদের (স) সঙ্গে আলির রক্তের সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি। যেহেতু মুহাম্মদের (স) কোনও ছেলেই শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি, আলি ছিলেন তাঁর নিকটতম পুরুষ আত্মীয়। কোরানে পয়গম্বরদের প্রায়ই বংশধরদের জন্যে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। স্বর্গীয় আশীর্বাদের এই ধারণাকে প্রসারিত করে শিয়াহ্‌রা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, আলির পরিবারের মাধ্যমে কেবল মুহাম্মদের (স) পরিবারেরই ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান (*ইলম*) রয়েছে। কেবল তাঁরাই *উম্মাহ্‌কে* ঐশ্বরিক নির্দেশনা পৌঁছে দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। আলির কোনও বংশধর ক্ষমতাসীন হলে মুসলিমরা আবার ন্যায়-বিচারের স্বর্ণযুগের আশা করতে পারবে ও ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী *উম্মাহ্‌* পরিচালিত হবে।

ব্যক্তি আলির প্রতি ভক্তি বিস্ময়কর প্রাবল্য লাভ করায় কিছু চরমপন্থী শিয়াহ্‌ গ্রুপ আলি ও তাঁর উত্তরসুরিদের স্বয়ং মুহাম্মদের (স) চেয়েও মর্যাদা সম্পন্ন অবস্থানে নিয়ে যাবে এবং প্রায় ঐশ্বরিক মর্যাদা দান করবে। তারা প্রাচীন পার্সি মনোনীত দেবতার বংশের পরিবারের ঐতিহ্য অনুসরণ করছিল, যে পরিবার বংশ পরম্পরায় স্বর্গীয় মহিমা বিস্তার করে চলেছে। উমাঈয়া আমলের শেষ দিকে কিছু কিছু শিয়াহ্‌ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে আলির বংশধরদের একটা বিশেষ ধারাতেই নির্ভরযোগ্য *ইলম* সীমাবদ্ধ। কেবল এই পরিবারেই মুসলিমরা ঈশ্বর মনোনীত *উম্মাহ্‌র* প্রকৃত ইমাম বা নেতার সন্ধান পাবে। তিনি ক্ষমতায় থাকুন বা না থাকুন, তাঁর পথ-নির্দেশনার কোনও বিকল্প

AMARBOI.COM

নাই; সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব তাঁর প্রতীক্ষায় থাকা; তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া। যেহেতু এইসব ইমামকে আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখা হতো, তাই খলিফাদের চোখে তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রের শত্রু: শিয়াহ্ ঐতিহ্য অনুসারে বেশ কয়েকজন ইমামকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়; কেউ কেউ আত্মগোপনে যেতেও বাধ্য হন। কোনও ইমাম পরলোকগমণের সময় আত্মীয়দের মধ্য হতে একজনকে তাঁর *ইলমের* উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যেতেন। আস্তে আস্তে ইমামগণ ঈশ্বরের *অবতার* হিসাবে পূজ্য হতে শুরু করলেন: তাঁদের প্রত্যেকে পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের উপস্থিতির 'প্রমাণ' (*হুজ্জাহ্*) ছিলেন ও রহস্যময় কোনও উপায়ে মানুষের মাঝে ঈশ্বরকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর বাণী, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী আসলে ঈশ্বরেরই বাণী, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ। ক্রিশ্চানরা যেমন জেসাসকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার পথ, সত্য এবং আলো হিসাবে দেখেছিল, শিয়াহ্রাও তাদের ইমামদের ঈশ্বরের কাছে যাবার দ্বার (*বাব*) এবং প্রত্যেক প্রজন্মের জন্যে পথ (*সাবিল*) এবং দিক নির্দেশনা মনে করে সম্মান দেখায়।

শিয়াহ্দের বিভিন্ন শাখা আলাদা আলাদাভাবে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার সন্ধান করেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'টুয়েলভার' (দ্বাদশবাদী) শিয়াহ্রা হুসাইনের মাধ্যমে আগত ৯৩৯ সালে সর্বশেষ ইমাম আত্মগোপনে গিয়ে মানব সমাজ হতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আলির পরবর্তী বারো প্রজন্মকে মর্যাদা দিয়েছে, তাঁর কোনও বংশধর ছিল না বলে এই ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। সেভেনারস (সপ্তবাদী) হিসাবে পরিচিত ইসমায়েলিরা বিশ্বাস করত, এদের মাঝে সপ্তম জনই শেষ ইমাম ছিলেন। দ্বাদশবাদীদের মাঝে এক ধরনের মেসিয়ানিক ধারা দেখা দিয়েছিল, এরা বিশ্বাস করত যে দ্বাদশ বা গোপন ইমাম স্বর্গযুগের সূচনা করতে আবার ফিরে আসবেন। নিঃসন্দেহে এসব ধারণা বিপজ্জনক ছিল। এগুলো কেবল রাজনৈতিকভাবে দ্রোহমূলকই ছিল না, এগুলোকে খুব সহজেই আনাড়ি, সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তো অধিকতর চরমপন্থী শিয়াহ্রা কোরানের প্রতীকী ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে এক নিগূঢ় ধারা গড়ে তুলেছিল যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব। এদের ধর্মানুরাগ অধিকাংশ মুসলিমের পক্ষে দারুণ রকম দুর্বোধ্য ছিল, যারা এই অবতারবাদী ধারণাকে ব্লাসফেমাস মনে করেছে, ফলে শিয়াহ্দের অস্তিত্ব অভিজাত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝেই বেশি দেখা গেছে। ইরানি বিপ্লবের পর থেকে পশ্চিমে আমরা শিয়াহ্ মতবাদকে উৎপত্তিগতভাবে ইসলামের মৌলবাদী অংশ হিসাবে তুলে ধরতে প্ররোচিত হয়েছি, কিন্তু এধরনের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। শিয়াহ্ মতবাদ এক অভিজাত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। আসলে, যেসব মুসলিম কোরানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যৌক্তিক যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করতে চেয়েছে শিয়াহ্দের

AMARBOI.COM

সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে তাদের। মুতাযিলি নামে পরিচিত এই যুক্তিবাদীরা নিজস্ব আলাদা গ্রুপ গড়ে তুলেছিল; সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকারও ছিল তাদের: শিয়াহ্দের মতো মুতাযিলিরাও রাজদরবারের বিলাসিতার বিরুদ্ধে ছিল এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঘনঘন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত।

রাজনৈতিক প্রশ্ন মানুষের জীবন ধারায় ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে এক ধর্মতত্ত্বীয় বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। উমাঈয়াদের সমর্থকরা প্রায় কপটতার সঙ্গে দাবি করেছিল যে, তাদের অনৈসলামিক আচরণের জন্যে তারা দায়ী নয়, কেননা ঈশ্বরই এভাবে তাদের নিয়তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের পরম শক্তি ও সর্বজ্ঞতার ব্যাপারে কোরানে জোরাল ধারণা রয়েছে; পূর্ব-নির্ধারিত এই নিয়তির সমর্থনে বহু টেক্সট খাড়া করা যেতে পারে। কিন্তু কোরান আবার সমানভাবে মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কেও জোর দেয়: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ না সে-জাতি নিজেদের অন্তরে পরিবর্তন ঘটায়।' পরিণতিতে শাসকগোষ্ঠীর সমালোচকরা স্বাধীন ইচ্ছা ও নৈতিক দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। মুতাযিলিরা মধ্যপন্থা গ্রহণ (*ই'তাযাল্*–আলাদা থাকা) করে চরম অবস্থান হতে নিজেদের সরিয়ে নেয়। মানুষের নৈতিক চরিত্র রক্ষার জন্যেই স্বাধীন ইচ্ছার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তারা। যেসব মুসলিম ঈশ্বরকে ন্যায়-অন্যায়ের মানবীয় ধারণার ঊর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করে, তারা তাঁর ন্যায়-বিচারের বিরোধিতা করেছে। যে ঈশ্বর কেবল ঈশ্বর হবার কারণে সকল সুনীতির লঙ্ঘন করে পার পেয়ে যান, তিনি আসলে দানব; স্বৈরাচারী খলিফার চেয়ে ভালো কিছু নন। শিয়াহ্দের মতো মুতাযিলিরা ঘোষণা করেছিল যে, ন্যায়-বিচার ঈশ্বরের মূলসত্তা। তিনি কারও প্রতি অন্যায় করতে পারেন না; যুক্তি বিরোধী কোনও কিছুর নির্দেশ দিতেও *পারেন না।*

AMARBOI.COM

এখানেই ট্র্যাডিশনিস্টদের সঙ্গে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ট্র্যাডিশনিস্টরা যুক্তি উপস্থাপন করে যে, মানুষকে আপন ভাগ্যের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা বানিয়ে তারা ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতার অসম্মান করছে। তারা অভিযোগ তোলে, মুতাযিলিরা ঈশ্বরকে *খুব বেশি* যৌক্তিক ও *বেশি রকম* মানুষের মতো করে ফেলেছে। ঈশ্বরের অত্যাবশ্যকীয় দুর্বোধ্যতার ওপর জোর দেওয়ার জন্যেই পূর্ব-নির্ধারিত নিয়তির মতবাদ গ্রহণ করেছিল তারা: আমরা তাঁকে বোঝার দাবি করলে তিনি আর ঈশ্বর থাকবেন না, মানুষের তুচ্ছ কল্পনায় পরিণত হবেন। ঈশ্বর ভলো-খারাপের মানবীয় ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে; তাঁকে আমাদের মান ও প্রত্যাশায় বন্দি করা যাবে না: ঈশ্বরের নির্ধারিত বলেই কোনও কাজ ভালো বা খারাপ, স্বয়ং ঈশ্বরকে বাধ্য করার মতো এসব মানবীয় মূল্যবোধের দুর্জ্ঞেয় মাত্রা আছে বলে নয়। মুতাযিলিদের পক্ষে একথা বলা ভুল ছিল যে পুরোপুরি মানবীয় আদর্শ ন্যায়-বিচারের ধারণা ঈশ্বরের মূল সত্তা। পূর্ব নির্ধারিত নিয়তি ও স্বাধীন ইচ্ছার

সমস্যা, যা ক্রিশ্চানদেরও ভুগিয়েছে, ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণার একটা কেন্দ্রীয় সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ব্রহ্মার মতো একজন নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর 'ভালো' বা 'খারাপে'র উর্ধ্বে অবস্থান করছেন, এটা অনায়াসে বলা যায়, যেগুলোকে দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের মুখোশ হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু যে ঈশ্বর কোনও রহস্যময় উপায়ে একজন ব্যক্তি, যিনি মানুষের ইতিহাসে অংশ নেন, নিজেকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত করেন তিনি। এই 'ঈশ্বর'কে জীবনের-চেয়ে-বৃহৎ স্বৈরাচারী বা বিচারক বানানো অত্যন্ত সহজ ও 'তাঁকে' দিয়ে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করানো যায়। 'ঈশ্বর'কে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রিপাবলিকান বা সমাজতন্ত্রী, কিংবা বর্ণবাদী বা বিপ্লবী রূপ দিতে পারি। এই বিপদ অনেককে ব্যক্তিক ঈশ্বরকে ধর্মবিরোধী ধারণা হিসাবে দেখতে প্ররোচিত করেছে, কারণ এটা আমাদেরকে আমাদের সংস্কারে প্রোথিত করে ও আমাদের মানবীয় ধারণাকে পরম পর্যায়ে উন্নীত করে।

এই বিপদ এড়াতেই ট্র্যাডিশনিস্টরা ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের ব্যবহৃত কালোত্তীর্ণ ঈশ্বরের সত্তা ও তাঁর কর্মকাণ্ডের মাঝে পার্থক্যের অবতারণা করেছে। তারা দাবি করে যে, যেসব গুণাবলী দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে পার্থিব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে সক্ষম করে তোলে—যেমন, ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন, বক্তব্য—কোরানে যেসব গুণ আল্লাহর বলে উল্লেখ আছে—যেগুলো অসৃষ্ট কোরানের মতোই অনন্ত কাল ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে অবস্থান করছে। এগুলো সব সময় আমাদের বোধগম্যতার অতীতে রয়ে যাবে, যা ঈশ্বরের জ্ঞানাতীত সত্তার চেয়ে ভিন্ন। ঠিক ইহুদিরা যেমন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বা তোরাহ্ কালের সূচনার আগে থেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল বলে কল্পনা করেছে, এবার মুসলিমরাও একইভাবে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত ধারণা গড়ে তুলতে শুরু করছিল এবং বোঝাতে চেয়েছে যে তাঁকে মানব মনে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩২) যদি মুতাযিলিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের ধারণাকেই মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় মতবাদ ঘোষণার প্রয়াস না পেতেন, এই দুর্বোধ্য যুক্তি হয়তো বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককেই প্রভাবিত করতে পারত। কিন্তু খলিফা মুতাযিলিদের বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রাডিশনিস্টদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করলে সাধারণ মুসলিম জনগণ এই অনৈসলামিক আচরণে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। আহমাদ ইবন হানবাল (৭৮০-৮৫৫) নামে এক নেতৃস্থানীয় ট্র্যাডিশনিস্ট আল-মামুনের ইনকুইজিশন থেকে অল্পের জন্যে রেহাই পেয়ে জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও ক্যারিশমা—নিপীড়কদের জন্যে প্রার্থনা করেছেন তিনি—খেলাফতকে চ্যালেঞ্জ করে ও অসৃষ্ট কোরান সংক্রান্ত তাঁর বিশ্বাস মুতাযিলিদের যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণ-অভ্যুত্থানের মূল চেতনা হয়ে দাঁড়ায়।

AMARBOI.COM

ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও রকম যৌক্তিক আলোচনার সমর্থনে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ইবন হানবাল। এভাবে মধ্যপন্থী মুতাযিলি আল-হুয়াঈয়ান আল-কারাবিসি (মৃ. ৮৫৯) যখন আপোসফার প্রস্তাব রাখলেন যে, ঈশ্বরের বাণী হিসাবে কোরান অসৃষ্ট, কিন্তু যখন তা মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তা সৃষ্টিতে পরিণত হয়, ইবন হানবাল এই মতবাদের তীব্র নিন্দা জানান। আল-কারাবিসি তাঁর মতবাদ আবার বদলাতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, কোরানের লিখিত ও উচ্চারিত আরবী যতক্ষণ ঈশ্বরের চিরকালীন বক্তব্যের ধারক ততক্ষণ *অসৃষ্ট।* কিন্তু ইবন হানবাল একেও অবৈধ ঘোষণা করেন, কেননা এরকম যুক্তিভিত্তিক উপায়ে কোরানের উৎস সম্পর্কে আঁচ-অনুমান করা অর্থহীন। অব্যক্ত ঈশ্বরকে জানতে যুক্তি লাগসই উপায় নয়। তিনি মুতাযিলিদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরকে সব রকম রহস্যহীন করে ধর্মীয় মূল্যহীন এক বিমূর্ত ফরমুলায় পরিণত করার অভিযোগ আনেন। কোরান পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করার সময় যখন বলে যে ঈশ্বর 'বলেন' এবং 'দেখেন' এবং 'আরশে বসেন', ইবন হানবাল জোরে দিয়ে বলেন যে, এসবকে আক্ষরিক অর্থেই ব্যাখ্যা করতে হবে, কিন্তু কীভাবে 'জিজ্ঞেস করা যাবে না' (*বিলা কাঈফ)*। তাঁকে বোধ করি চরমপন্থী আথানাসিয়াসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যিনি অধিকতর যুক্তিবাদী ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবতারবাদের চরম ব্যাখ্যার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। ইবন হানবাল ঈশ্বরের অত্যাবশ্যক অনিবর্চনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিল, যা সব ধরণের যুক্তি ও ধারণাগত বিশ্লেষণের অতীত একটা বিষয়।

কিন্তু কোরান তারপরেও ক্রমাগত বুদ্ধিবৃত্তি ও উপলব্ধির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। ইবন হানবালের অবস্থান কিছুটা সরলমনা ছিল। বহু মুসলিমই একে বিকৃত ও অস্পষ্টতার দোষে আক্রান্ত মনে করেছে। আবু আল-হাসান ইবন ইসমাইল আল-আশারি (৮৭৮-৯১৪) এক আপোসরফার সন্ধান পেয়েছিলেন। মুতাযিলি ছিলেন তিনি, কিন্তু পরে এক স্বপ্নে পয়গম্বর কর্তৃক *হাদিস* পাঠ করার তাগিদ পেয়ে ট্র্যাডিশবাদে যোগ দেন। আল-আশারি এর পর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে চলে গিয়ে অত্যুৎসাহী ট্র্যাডিশনিস্টে পরিণত হন। মুতাযিলিদের ইসলামের কলঙ্ক আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন তিনি। আবার স্বপ্নে মুহাম্মাকে (স) দেখেন তিনি: এ পর্যায়ে পয়গম্বরকে অসন্তুষ্টই দেখাচ্ছিল, তিনি বলেছিলেন: 'আমি তোমাকে যৌক্তিক বিবেচনা বিসর্জন দিতে বলিনি, বরং সত্য *হাদিসকে* সমর্থন দিতে বলেছি!'[৩৮] এরপর থেকে আল-আশারি ইবন হানবালের অজ্ঞাবাদী চেতনাকে সমর্থন করার জন্যে মুতাযিলিদের যৌক্তিক কৌশলের প্রয়োগ ঘটাতে শুরু করেছিলেন। মুতাযিলিদের যেখানে অভিমত ছিল যে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অযৌক্তিক হতেই

AMARBOI.COM

পারে না, সেখানে আল-আশারি যুক্তি-তর্ক দিয়ে দেখান যে ঈশ্বর আমাদের উপলব্ধির অতীত। মুতাযিলিরা ঈশ্বরকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ বিরস ধারণায় নামিয়ে আনার বিপদের মাঝে ছিল; আল-আশারি কোরানের পরিপূর্ণ ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন, এর অসামঞ্জস্যতা সত্ত্বেও। প্রকৃতই, ডেনিস দ্য আরোপাগাইতের মতো তাঁর বিশ্বাস ছিল প্যারাডক্স ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি বাড়াবে। আর পাঁচটা মানবীয় ধারণার মতো ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণাও আলোচিত বা বিশেষিত হতে পারে, ঈশ্বরকে এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনার বিরোধী ছিলেন তিনি। জ্ঞান, ক্ষমতা, জীবন, ইত্যাদি স্বর্গীয় গুণাবলী বাস্তব, অনন্তকাল হতে এগুলো ঈশ্বরের অধিকারে *ছিল।* কিন্তু এসব ঈশ্বরের সত্তা হতে আলাদা, কারণ ঈশ্বর অত্যাবশ্যকীয়ভাবে একজন, অদ্বিতীয় এবং সহজ। তিনি স্বয়ং সারল্য বলে তাঁকে জটিল কোনও সত্তা হিসাবে বিচেনা করা চলবে না। আমরা তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা দিয়ে বা তাঁকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করতে পারি না। আল-আশারি এই প্যারাডক্স দূর করার কোনও প্রয়াস পেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন: এভাবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, কোরান যখন বলে যে ঈশ্বর 'আরশে বসেন,' আমাদেরকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে এটা সত্যি, যদিও এটা 'বসার' খাঁটি চেতনা উপলব্ধি করার বোধের অতীত।

আল-আশারি আরোপিত অসচ্ছতা ও চরম যুক্তিবাদের মাঝামাঝি একটা পথ খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। কোনও কোনও অক্ষরবাদী দাবি করেছে যে, কোরানের বক্তব্য অনুযায়ী আশীর্বাদপ্রাপ্তরা যদি স্বর্গে ঈশ্বরকে 'দেখা'র সুযোগ পায়, সেক্ষেত্রে তাঁর বাস্তব কাঠামো অবশ্যই আছে। হিশাম ইবন হাকিম এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে:

> আল্লাহর দেহ আছে, স্পষ্ট, প্রশস্ত, উঁচু ও দীর্ঘ, সমান মাত্রার, আলোয় উজ্জ্বল, এর ত্রিমাত্রায় বিপুল আকারের, স্থানের অতীত অবস্থানে, খাঁটি ধাতুর দণ্ডের মতো, গোলাকার কোনও রত্নের মতো উজ্জ্বল, রঙ, স্বাদ, গন্ধ এবং স্পর্শসহ।[৩৯]

শিয়াহ্দের কেউ কেউ এই মত গ্রহণ করেছে, কারণ তারা বিশ্বাস করে, ইমামরা ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, মুতাযিলিরা জোর দিয়ে বলেছে, কোরান যখন ঈশ্বরের 'হাতে'র কথা বলে, একে অবশ্যই তাঁর মহানুভবতা ও বদান্যতার রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। আল-আশারি অক্ষরবাদীদের বিরোধিতা করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোরান অনুযায়ী আমরা প্রতীকী ভাষায়ই কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলতে পারি। তবে তিনি

AMARBOI.COM

ট্র্যাডিশনিস্টদের পাইকারী যুক্তি বিসর্জন দেওয়ারও বিরোধিতার করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, মুহাম্মদ (স) এসব সমস্যার মোকাবিলা করেননি, তা না হলে তিনি মুসলিমদের দিক নির্দেশনা দিয়ে যেতেন; এখন সকল মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের প্রকৃত ধর্মীয় ধারণা বজায় রাখার জন্যে এ ধরনের ব্যাখ্যামূলক উপায়গুলোকে উপমা *(কিয়াস)* হিসাবে ব্যবহার করা।

আল-আশারি ক্রমাগত আপোসমূলক অবস্থানের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এভাবে তিনি যুক্তি খাড়া করেছেন যে, কোরান ঈশ্বরের চিরন্তন ও অসৃষ্ট বাণী, কিন্তু কালি, কাগজ, আরবী ভাষা, যা দিয়ে পবিত্র বিষয়বস্তু ধারণ করা হয়েছে তা সৃষ্ট। তিনি মুতাযিলিদের স্বাধীন ইচ্ছার মতবাদের সমালোচনা করেছেন, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের কাজের 'স্রষ্টা' হতে পাবেন; কিন্তু মুক্তি অর্জনে মানুষের কোনও ভূমিকা নেই, ট্র্যাডিশনিস্টদের এই দৃষ্টিভঙ্গিরও বিরোধিতা করেছেন তিনি। তাঁর সমাধান কিছুটা জটিলই ছিল: ঈশ্বর কর্মের স্রষ্টা কিন্তু মানুষকে সেগুলোর সুফল বা কুফল অর্জনের অনুমতি দেন। অবশ্য ইবন হানবালের বিপরীতে আল-আশারি প্রশ্ন তুলতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রস্তুত ছিলেন এইসব আধ্যাত্মিক সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্যে, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি উপসংহারে পৌঁছান যে, যে রহস্যময় ও অনির্বচনীয় সত্তাকে আমরা ঈশ্বর বলে ডাকি, তাঁকে গোছানো, যুক্তিভিত্তিক কোনও পদ্ধতিতে আবদ্ধ করার চেষ্টা চালানো ঠিক নয়। আল-আশারি মুসলিম ট্র্যাডিশন *কালামের* (আক্ষরিক অর্থে 'বাণী' বা 'আলোচনা') প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সাধারণত ধর্মতত্ত্ব হিসাবে যার অনুবাদ করা হয়ে থাকে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে তাঁর অনুসারীরা কালামের কার্যপদ্ধতির পরিমার্জনা করে তাঁর মতবাদকে উন্নত করে। প্রথম দিকের আশারিরা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের আলোচনার জন্যে একটা আধ্যাত্মিক কর্মকাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিল। আশারি মতবাদ বা ধারার সর্ব প্রথম ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন আবু বকর আল-বাকিলানি (মৃ. ১০১৩)। *আল-তাওহীদ* (একত্ব) শিরোনামের প্রবন্ধে মুতাযিলিদের সঙ্গে একমত পোষণ করে তিনি বলেছেন যে, যুক্তি প্রয়োগ করে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে: প্রকৃতপক্ষে কোরানই দেখিয়েছে যে আব্রাহাম কেমন করে পদ্ধতিগতভাবে প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে করতে চিরন্তন স্রষ্টাকে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু আল-বাকিল্লানি প্রত্যাদেশের সাহায্য ছাড়া আমাদের ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য টানার সাধ্যে আছে বলে মানেননি, কারণ এগুলো স্বাভাবিক বিষয় নয়, বরং ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ভালো-মন্দের মানবীয় ধারণায় আবদ্ধ নন।

আল-বাকিলানি মুসলিমদের ধর্ম বিশ্বাসের একটা আধ্যাত্মিক যুক্তি আবিষ্কারের লক্ষ্যে 'অ্যাটোমিজম' বা 'অকেশনালিজম' নামে পরিচিত তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন: আল্লাহ ছাড়া আর কোনও প্রভু, সত্তা বা নিশ্চয়তা নেই।

AMARBOI.COM

তিনি দাবি করেছিলেন, বিশ্বের প্রতিটি জিনিস ঈশ্বরের সরাসরি মনোযোগের ওপর নির্ভরশীল। গোটা মহাবিশ্বকে অসংখ্য অ্যাটোমে পরিণত করা হয়েছে: স্থান এবং কাল ধারাবাহিক নয়, আর কোনও কিছুরই নির্দিষ্ট পরিচয় নেই। আথানাসিয়াসের মতোই আল-বাকিলানি সুবিশাল মহাবিশ্বকে চরমভাবে শূন্যে পরিণত করেছিলেন। কেবল ঈশ্বরই বাস্তব; কেবল তিনিই আমাদের অস্তিত্বহীনতা হতে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালন করেন; প্রতি মুহূর্তে আপন সৃষ্টির অস্তিত্ব বাজায় রাখেন। সৃষ্টির টিকে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করার মতো কোনও প্রকৃতিক আইন নেই। যদিও অপরাপর মুসলিমরা বেশ সাফল্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করছিল, কিন্তু আশারিবাদ মৌলিক দিক থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিরোধী রয়ে যায়, তবে তারপরেও এর ধর্মীয় প্রাসঙ্গিকতা ছিল। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপস্থিতি ব্যাখ্যা ও বিশ্বাস সাধারণ যুক্তির ওপর নির্ভর করে না বোঝানোর এক আধ্যাত্মিক (*metaphsical*) প্রয়াস ছিল এটা। বাস্তব সত্যের বিবরণের পরিবর্তে শৃঙ্খলা হিসাবে কাজে লাগানো হলে এটা মুসলিমদের কোরানে উল্লিখিত ঈশ্বর সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। বিপরীত দিকে, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য বাদ দেওয়ার মাঝে এবং আবশ্যিকভাবে দুর্ভেদ্য এক ধর্মীয় মনোভাবকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করার মাঝেই এর দুর্বলতা নিহিত। এর ফলে একজন মুসলিম যেভাবে ঈশ্বরকে দেখে আর অন্যান্য বস্তুকে যেভাবে বিবেচনা করে, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যের সৃষ্টি হতে পারে। মুতাযিলি ও আশারিবাদী, উভয় দলই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সাধারণ যৌক্তিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে ঈশ্বরের ধর্মীয় অনুভূতিকে যুক্ত করতে চেয়েছিল। এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। মুসলিমরা বোঝার চেষ্টা করছিল যে, আমরা যেভাবে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সেভাবে ঈশ্বরকে নিয়ে আলাপ করা সম্ভব কিনা। আমরা দেখেছি, গ্রিকরা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নীরবতাই তাদের মতে ধর্মতত্ত্বের সবচেয়ে জুৎসই ধরণ। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলিমও একই উপসংহারে পৌঁছাবে।

মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সহচরবৃন্দ আল-বাকিলানির তুলনায় ঢের আদিম সমাজের সদস্য ছিলেন। ইসলামি সাম্রাজ্য সভ্য দুনিয়ায় বিস্তৃত হয়েছে, ফলে মুসলিমরা ঈশ্বর ও জগতকে দেখার বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে আরও উন্নত পদ্ধতির সংস্পর্শে এসেছে। সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাচীন হিব্রু দর্শনের পূর্ণযাপন করেছেন মুহাম্মদ (স) এবং পরবর্তী প্রজন্ম সমূহকেও ক্রিশ্চান চার্চের মোকাবিলা করা কিছু সমস্যা অতিক্রম করতে হয়েছে। কেউ কেউ এমনকি ক্রাইস্টের ওপর দেবত্ব আরোপের খৃস্টিয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোরানের অবস্থান সত্ত্বেও অবতারবাদী ধর্মতত্ত্বের শরণাপন্ন হয়েছে। ইসলামি

AMARBOI.COM

প্রয়াস দেখায় যে, দুর্জ্ঞেয় অথচ ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে চায়, একই রকম সমাধানের দিকে ধাবিত করে।

*কালামের* পরীক্ষা দেখায়, যদিও 'ঈশ্বরকে' যৌক্তিকভাবে দুর্বোধ্য প্রমাণ করার জন্যে যৌক্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব, কিন্তু কোনও কোনও মুসলিম এতে অস্বস্তি বোধ করবে। পশ্চিমে খৃস্টধর্মে *কালাম* কখনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। মুতাযিলিদের সমর্থক আব্বাসীয় খলিফারা এদের মতবাদ বিশ্বাসীরা 'গ্রহণ' না করায় চাপিয়ে দিতে পারেননি। মধ্যযুগের পুরো সময়টায় ভবিষ্যতের চিন্তাবিদদের ওপর যুক্তিবাদের প্রভাব অব্যাহত থাকে, কিন্তু তা সংখ্যালঘুর প্রয়াস রয়ে যায়; অধিকাংশ মুসলিম গোটা বিষয়টিকে অবিশ্বাস করে বসে। খৃস্টধর্ম ও ইহুদিবাদের মতো সেমিটিক অভিজ্ঞতা থেকে ইসলাম আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের হেলেনিক কেন্দ্রসমূহের গ্রিক যুক্তিবাদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। অন্য মুসলিমরা ইসলামের ঈশ্বরের আরও প্রবল হেলেনাইজেশনের প্রয়াস পেয়েছিল এবং তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মে এক নতুন দার্শনিক উপাদানের যোগ করেছে। ইহুদিবাদ, খৃস্টধর্ম এবং ইসলাম, এই তিনটি ধর্ম দর্শনের বৈধতা ও ঈশ্বরের রহস্যময়তার সঙ্গে এর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলাদা কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ উপসংহারে পৌঁছুবে।

AMARBOI.COM

# ৬.
# দার্শনিকদের ঈশ্বর

নবম শতকে আরবরা গ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সংস্পর্শে আসে এবং এর ফলস্বরূপ এক সাংস্কৃতিক জাগরণের সৃষ্টি হয় যাকে ইউরোপিয় ভাষায় রেনেসাঁ ও আলোকনের মিলন হিসাবে দেখা যেতে পারে। অনুবাদকের একটা দল, যাদের অধিকাংশই ছিল নেস্টোরিয়ান ক্রিশ্চান, আরবী ভাষায় গ্রিক টেক্সট সুপ্রাপ্য ক্বরে তোলে, চমৎকার ছিল তাদের অনুবাদ। আরব মুসলিমরা এবার অ্যাস্ট্রনমি, আলকেমি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র নিয়ে গবেষণায় মনোযোগি হওয়ায় এমন সাফল্য অর্জন করে যে নবম ও দশম শতকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে এত বেশি সংখ্যক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অর্জিত হয় যা অতীতের কোনও সময় ঘটেনি। *ফালসাফাহ্* নামের এক আদর্শের প্রতি নিবেদিত এক নতুন ধরনের মুসলিমদের আবির্ভাব ঘটে। সাধারণত একে 'দর্শন' হিসাবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে, কিন্তু এর আরও ব্যাপক ও ঋদ্ধ অর্থ রয়েছে: অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি *ফিলোসফেসদের* মতো *ফায়লাসুফগণ* মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী আইন অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে জীবনধারণ করতে চেয়েছে। প্রথম দিকে তারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর জোর দিলেও পরে অনিবার্যভাবে গ্রিক মেটাফিজিক্সের শরণাপন্ন হয় ও এর নীতিমালাকে ইসলামে প্রয়োগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে গ্রিক দার্শনিকদের ঈশ্বর ও আল্লাহ্ একই। গ্রিক ক্রিশ্চানরাও হেলেনিজমের সঙ্গে নৈকট্য বোধ করেছিল, কিন্তু গ্রিকদের ঈশ্বরকে বাইবেলের অধিকতর স্ববিরোধী ঈশ্বর দিয়ে বদলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: ফলে, আমরা দেখব, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের পর্যালোচনায় যুক্তি তর্কের খুব একটা স্থান নেই বিশ্বাস করে তারা তাদের নিজস্ব দার্শনিক ঐতিহ্যে বিশ্বাস থেকে থেকে পিছু হাটে গিয়েছিল। অবশ্য *ফায়লাসুফরা* বিপরীত উপসংহারের পৌছেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, যুক্তিবাদ ধর্মের সবচেয়ে অগ্রসর

AMARBOI.COM

রূপের প্রতিনিধিত্ব করে–তারা ঐশীগ্রন্থের প্রকাশিত ঈশ্বরের চেয়ে উচ্চতর ঈশ্বর ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছিল।

বর্তমান সময়ে আমরা সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনকে ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখে থাকি, কিন্তু ফায়লাসুফরা সাধারণভাবেই ধার্মিক মানুষ ছিল, নিজেদের পয়গম্বরের অনুগত সন্তান মনে করত তারা। সৎ মুসলিম হিসাবে রাজনৈতিকভাবে তারা সজাগ ছিল, রাজ দরবারের বিলাসিতার বিরোধিতা করত ও যুক্তির নির্দেশ অনুযায়ী আপন সমাজকে সংস্কার করতে চেয়েছে। তাদের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ছিল: তাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গবেষণা গ্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল বলে তাদের বিশ্বাস ও অধিকতর যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর একটা সংযোগ আবিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বরকে পুরোপুরি পৃথক বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীতে অবনমন ও ধর্ম বিশ্বাসকে মানুষের অপরাপর বিষয়াদি হতে আলাদা করে দেখা সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না ফায়লাসুফদের বরং তারা তাদের চোখে আদিম ও সংকীর্ণ উপাদানসমূহ হতে পরিশুদ্ধতা আনতে চেয়েছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তাদের কোনও সংশয় ছিল না–প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্ব-প্রকাশিত বোধ করত তারা–কিন্তু আল্লাহ্ তাদের যুক্তিবাদী আদর্শের সঙ্গে মাননসই দেখাতে যুক্তি দিয়ে প্রমাণের গুরুত্ব অনুভব করেছিল।

অবশ্য সমস্যা ছিল। আমরা দেখেছি, গ্রিক দার্শনিকদের ঈশ্বর প্রত্যাদেশের ঈশ্বরের চেয়ে একেবারে ভিন্ন ছিলেন: অ্যারিস্টটল বা প্লাটিনাসের পরম উপাস্য কালহীন এবং নিরাসক্ত, যিনি জাগতিক বিষয়ের দিকে লক্ষ করেননি, ইতিহাসে নিজেকে প্রকাশ করেননি, বিশ্বজগতের সৃষ্টি করেননি এবং সময়ের শেষে বিচার করবেন না। প্রকৃতপক্ষে একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের এক প্রধান থিওফ্যানি ইতিহাসকে দর্শনের তুলনায় নিম্নস্তরের বলে অ্যারিস্টটল নাকচ করে দিয়েছিলেন। কেননা বিশ্বজগৎ অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের নিকট হতে উৎসারিত হচ্ছে; এর কোনও সূচনা, মধ্যস্থল বা শেষ নেই। ফায়লাসুফরা ইতিহাসের মায়ার উর্ধ্বে যেতে চেয়েছে, তারা এর বাইরে পরিবর্তনহীন আদর্শ স্বর্গীয় জগতের পরিচয় জানতে চেয়েছিল। যুক্তির প্রতি জোর দেওয়া সত্ত্বেও ফালসাফাহ্‌র এক নিজস্ব বিশ্বাসের তাগিদ ছিল। বিশ্বজগতে যেখানে উদ্দেশ্যপূর্ণ শৃঙ্খলার চেয়ে বিশৃঙ্খলা আর যন্ত্রণাই বেশি উপস্থিত মনে হয়, যেখানে প্রকৃতই যুক্তির নীতিমালা কার্যকর ভাববার জন্যে সাহসের প্রয়োজন ছিল। চারপাশের সার্বক্ষণিক ধ্বংসাত্মক ও তালগোল পাকানো ঘটনাপ্রবাহের মাঝে তাদেরও এক পরম অর্থবোধকতার অনুভূতি গড়ে তুলতে হয়েছিল। ফালসাফাহ্য় একধরনের আভিজাত্য, বস্তুনিষ্ঠতার সন্ধান ও কালহীন দৃষ্টিভঙ্গি

AMARBOI.COM

(Vision) ছিল। এক বিশ্বজনীন ধর্ম চেয়েছিল তারা, যা ঈশ্বরের কোনও বিশেষ প্রকাশ দিয়ে সীমাবদ্ধ নয় কিংবা নির্দিষ্ট স্থান বা কালে প্রোথিত নয়; তাদের বিশ্বাস ছিল যুগ যুগ ধরে সকল সাংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মানের ব্যক্তিদের হাতে উন্নত হয়ে ওঠা আরও অগ্রসর ভাষায় কোরানের প্রত্যাদেশ অনুবাদ করাই তাদের দায়িত্ব। ঈশ্বরকে রহস্য হিসাবে না দেখে ফায়লাসুফরা বিশ্বাস করত যে তিনিই স্বয়ং যুক্তি।

বর্তমানে এরকম যৌক্তিক বিশ্বজগতের ধারণায় বিশ্বাস আমাদের চোখে অপরিপক্ক ঠেকে, কারণ আমাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো বহু আগেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের প্রমাণের অসারতা প্রকাশ করে দিয়েছে। নবম ও দশম শতাব্দীর কোনও ব্যক্তির কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গি অসম্ভব ছিল, তবে ফালসাফাহর অভিজ্ঞতা আমাদের চলমান ধর্মীয় বিপত্তির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। আব্বাসীয় আমলে সংঘটিত বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের নতুন তথ্য সংগ্রহের চেয়েও অধিক কিছু করার প্রয়োজন হয়েছিল। আমাদের বর্তমান কালের মতো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এক নতুন ভিন্ন মানসিকতার বিকাশের দাবি করেছে, যা ফায়লাসুফদের বিশ্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়। বিজ্ঞান প্রত্যেক ঘটনা বা বিষয়ের পেছনে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা রয়েছে বলে বিশ্বাস দাবি করে। এর ওপর এখানে এক ধরনের সাহস ও কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন, যেগুলো ধর্মীয় সৃজনশীলতার চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন নয়। পয়গম্বর বা অতিন্দ্রীয়বাদীদের মতো বিজ্ঞানীরাও নিজেদের অজ্ঞাত বাস্তবতার অন্ধকার এবং অনিশ্চিত বলয়ের মোকাবিলায় ঠেলে দেন। এতে করে অনিবার্যভাবে ফায়লাসুফদের ঈশ্বর সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়েছিল এবং তারা সমসাময়িকদের বিশ্বাস পরিবর্তন, এমনকি ত্যাগ করতেও বাধ্য হয়েছে। একইভাবে আমাদের বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন বহু লোকের ক্ষেত্রেই ধ্রুপদী ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস অসম্ভব করে তুলেছে। পুরোনো ধর্মতত্ত্ব আঁকড়ে থাকাটা কেবল সাহসেরই ব্যর্থতা নয় বরং এতে সংহতিও বিনষ্ট হতে পারে। ফায়সালুফরা ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের মূলধারার সঙ্গে তাঁদের নতুন দর্শনের সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রিক-অনুপ্রাণিত বৈপ্লবিক ঈশ্বর ধারণার অবতারণা করেছে। কিন্তু তারপরেও তাদের যৌক্তিক উপাস্যের শেষ পরিণতি ধর্মীয় সত্যের ব্যাপারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানায়।

AMARBOI.COM

ফায়লাসুফরা অতীতের যে কোনও একেশ্বরবাদীদের তুলনায় আরও গভীরভাবে গ্রিক দর্শন ও ধর্মের সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছিল। মুতাযিলি এবং আশারিবাদীরা উভয়ই প্রত্যাদেশ ও স্বাভাবিক যুক্তির মাঝে একটা সেতুবন্ধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের বেলায় প্রত্যাদেশের ঈশ্বরের

অবস্থান ছিল সবার আগে। ইতিহাসকে থিওফ্যানি হিসাবে দেখার প্রচলিত একেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল '*কালাম*'; তাদের দাবি ছিল: নিরেট ও বিশেষ কিছু ঘটনাবলীর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এগুলোই আমাদের সীমিত নিশ্চয়তার যোগান দেয়। প্রকৃতপক্ষে, আশারিরা সাধারণ নিয়ম ও চিরকালীন নীতিমালার অস্তিত্বে সন্দিহান ছিল। যদিও এই অ্যাটমিজমের ধর্মীয় ও কল্পণাপ্রবণতার মূল্য ছিল, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক চেতনার বিরোধী ছিল বলে ফায়লাসুফদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাদের ফালসাফাহ নিরেট ও বিশেষ ধরনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে আশারিদের প্রত্যাখ্যাত সাধারণ নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। যৌক্তিক বিতর্কের মাধ্যমে তাদের ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে হবে, কোনও নির্ধারিত সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ কোনও নারী ও পুরুষের কাছে নির্দিষ্ট প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নয়। এই বাস্তব সরল সত্যের অনুসন্ধান তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় ও চরম সত্তাকে অনুভব করার পথ নির্দিষ্ট করে দেয়, ঈশ্বর সবার ক্ষেত্রে একই রকম নন, অনিবার্য সাংস্কৃতিক বর্ণ থাক বা না থাক, মৌলিক ধর্মীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারবেন না: 'জীবনের আসল বা শেষ অর্থ কী?' গবেষণাগারে বিশ্বজনীন প্রয়োগ আছে এমন কিছুর বৈজ্ঞানিক সমাধান খোঁজার পাশাপাশি বিশ্বাসীরা ক্রমবর্ধমান হারে কেবল মুসলিমদের অধিকারভুক্ত কোনও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারে না। কিন্তু তারপরেও কোরানের গবেষণা হতে দেখা যায় যে স্বয়ং মুহাম্মদের (স.) এক বিশ্বজনীন দর্শন ছিল, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন: সত্য পথে পরিচালিত সকল ধর্মই ঈশ্বর হতে আগত। ফায়লাসুফরা কোরানকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং দুটোর মাঝে সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছে: উভয়ই ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুযায়ী ঈশ্বরের কাছে পৌঁছার বৈধ পথ। বিজ্ঞান ও প্রত্যাদেশ, যুক্তিবাদ ও বিশ্বাসের মাঝে মৌলিক কোনও পার্থক্য দেখেনি তারা, বরং প্রফেটিক ফিলসফি নামে আখ্যায়িত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে। ইতিহাসের সূচনালগ্ন হতে ঈশ্বরের একই সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াসে নিয়োজিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধর্মের মূলে অবস্থানরত প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে চেয়েছিল তারা।

গ্রিক বিজ্ঞান এবং মেটাফিজিক্সের সংস্পর্শে আসার সুবাদে ফালসাফাহ্ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেও তা হেলেনিজমের ওপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল ছিল না। গ্রিকরা তাদের মধ্যপ্রাচীয় উপনিবেশগুলোয় একটা বিশেষ মানসম্পন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে চাইত, যাতে হেলেনিস্টিক দর্শনে আলাদা জোর দেওয়া হলেও আশা করা হতো যে, প্রত্যেক ছাত্র এক বিশেষ অনুক্রমে একগুচ্ছ নির্দিষ্ট বিষয় পাঠ করবে। ফলে এক ধরনের সমতা ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি

AMARBOI.COM

হয়েছিল। ফায়লাসুফরা অবশ্য এই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করেনি, বরং যখন যেভাবে পেয়েছে বিষয়বস্তু পড়ে নিয়েছে। এর ফলে অনিবার্যভাবে এক নতুন দৃষ্টিকোণের দুয়ার খুলে গেছে। নিজস্ব ইসলামি ও আরবীয় দর্শনের পাশাপাশি পার্সিয়া, ভারতীয় ও নসটিক প্রভাবেও তাদের চিন্তা-চেতনা আলোড়িত হয়েছে।

এভাবে কোরানে যৌক্তিক পদ্ধতি প্রয়োগকারী প্রথম মুসলিম ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-কিন্দি (মৃত্যু. ৭০) ঘনিষ্ঠভাবে মুতাযিলিদের কাছাকাছি ছিলেন; বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অ্যারিস্টটলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন তিনি। বসরায় শিক্ষাগ্রহণ করলেও বাগদাদের স্থায়ী হয়েছিলেন তিনি। এখানে খলিফা আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শনে তাঁর আবদান ও প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু তাঁর মূল আগ্রহ ছিল ধর্ম। মুতাযিলি পটভূমির কারণে দর্শনকে তিনি প্রত্যাদেশের অনুগামী ছাড়া ভিন্ন কিছু ভাবতে পারেননি: পয়গম্বরদের অনুপ্রাণিত জ্ঞান সবসময়ই দার্শনিকদের তুচ্ছ মানবীয় দর্শনকে অতিক্রম করে গেছে। পরবর্তীকালে অধিকাংশ ফয়ালাসুফ এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করবে না। আল-কিন্দি অবশ্য অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্য আবিষ্কারেও উদগ্রীব ছিলেন। সত্য একটাই, শত শত বছর ধরে এটা যেমন সাংস্কৃতিক বা ভাষাগত আচরণই গ্রহণ করে থাকুক না কেন, দার্শনিকের দায়িত্ব হচ্ছে একে খুঁজে বের করা।

> সত্য স্বীকার করে নেওয়ার এবং তা যে কোনও উৎস হতেই আসুক, হোক না কেন অতীত প্রজন্মের এবং বিদেশী জাতির, গ্রহণ করতে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। যিনি সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত তাঁর জন্যে সত্যের চেয়ে অধিক মূল্যবান অন্য কিছু নেই; সত্য কখনও তাঁকে ছোট বা অসম্মান করে না, বরং যিনি এর দিকে হাত বাড়ান, সত্য তাঁকে মহিমান্বিত ও সম্মানিত করে।[১]

AMARBOI.COM

এখানে আল-কিন্দি কোরানের অনুসারী। কিন্তু নিজেকে পয়গম্বরদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রিক দার্শনিকদেরও শরণাপন্ন হয়েছিলেন বলে আরও অগ্রসর হয়েছেন তিনি। একজন প্রধান চালক (Prime Mover)-এর অস্তিত্ব প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের যুক্তি ব্যবহার করেছেন তিনি, যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যৌক্তিক বিশ্বে সবকিছুর পেছনেই কারণ রয়েছে। সুতরাং পুরো প্রক্রিয়া শুরু করার জন্যে একজন অটল চালক নিশ্চয়ই থাকবেন। এই প্রথম নীতিই (First Principle)-ই অপরিবর্তনীয়, নিখুঁত ও অবিনশ্বর সত্তা স্বয়ং। কিন্তু এই উপসংহারে পৌঁছার পর আল-কিন্দি কোরানের শূন্য হতে সৃষ্টির মতবাদ অনুসরণ করে অ্যারিস্টটলকে ছেড়ে গেছেন। একে শূন্য হতে (ex nihilo)

কোনও কিছু করা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটাই, যুক্তি দেন আল-কিন্দি, ঈশ্বরের বিশেষ অধিকার। তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁর পক্ষে এভাবে কাজ করা সম্ভব এবং তিনিই আমাদের চারপাশের জগতে আমরা যেসব কর্মকাণ্ড লক্ষ করি তার প্রকৃত কারণ।

ফালসাফাহ্র আগমন ছিল শূন্য হতে সৃষ্টির মতবাদ প্রত্যাখ্যানের জন্যে; সুতরাং আল-কিন্দিকে প্রকৃত ফায়লাসুফ হিসাবে বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু তিনি ছিলেন পদ্ধতিগত মেটাফিজিক্সের সঙ্গে ধর্মীয় সত্যের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইসলামি প্রয়াসের অগ্রপুরুষ। তাঁর উত্তরসুরিগণ ছিলেন আরও উগ্র। এভাবে আবু বকর মুহাম্মদ ইবন যাকারিয়া আর-রাযি (মৃত্যু. ৯৩০) যাঁকে মুসলিম ইতিহাসের মহা-ননকনফরমিস্ট হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, অ্যারিস্টটলের মেটাফিজিক্স নাকচ করে নসটিকদের মতো সৃষ্টিকে স্রষ্টার কর্মকাণ্ড হিসাবে দেখেছেন: সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ঈশ্বরের হতে বস্তু উৎসারিত হতে পারে না। তিনি প্রাইম মুভার সম্পর্কিত অ্যারিস্টটলিয় সমাধানও প্রত্যাখ্যান করেন, প্রত্যাদেশ ও পয়গম্বরত্বের কোরানিক মতবাদসমূহও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেবল যুক্তি ও দর্শনই আমাদের রক্ষা করতে পারে। সুতরাং আর-রাযি প্রকৃত পক্ষে একেশ্বরবাদী ছিলেন না: সম্ভবত তিনিই প্রথম মুক্ত চিন্তাবিদ যিনি ঈশ্বরের ধারণাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বেমানান জানতে পেরেছিলেন। দক্ষ চিকিৎসক এবং দয়ালু ও দানশীল মানুষ ছিলেন তিনি, ইরানে নিজ এলাকা রাঈতে হাসপাতাল প্রধান হিসাবে বহু বছর কাজ করেছেন। অধিকাংশ ফায়লাসুফই তাদের যুক্তিবাদকে এতটা চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়নি। সাধারণ মুসলিম বিশ্বাসীদের সঙ্গে বিতর্কে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত ফায়লাসুফ প্রতিষ্ঠিত কোনও ধর্মের ওপর নির্ভর করতে পারে না, তার নিজেকেই চিন্তা করে সমাধান করতে হয়, কেননা একমাত্র যুক্তিই আমাদের সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। প্রকাশিত মতবাদসমূহের ওপর নির্ভরতা অর্থহীন, কারণ বিভিন্ন ধর্ম একমত হতে পারে না। কোনটা সঠিক, কে বলতে পারবে? কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ—যাঁকে ভ্রান্তিমূলকভাবে আর-রাযি[২] বলেই ডাকা হয়—এক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের কী হবে? জানতে চান তিনি। তাদের বেশিরভাগ দার্শনিক চিন্তাভাবনায় অক্ষম, তবে কি তাদের আশা নেই, ভুল আর বিভ্রান্তিতেই রয়ে যাবে তারা? ইসলামে ফালসাফাহ্র সংখ্যালঘু গোত্র রয়ে যাবার অন্যতম কারণ এর আভিজাত্যবাদ। এ মতবাদ নির্দিষ্ট বুদ্ধিমত্তার অধিকারীদের ভেতরই আবেদন জাগাতে পেরেছিল এবং তা মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য পরিণত হতে শুরু করা সাম্যবাদের চেতনা বিরুদ্ধে ছিল।

তুরস্কের ফায়লাসুফ আবু-নসর্ আল-ফারাবি (মৃত্যু. ৯৮০) দার্শনিক যুক্তিবাদে অক্ষম অশিক্ষিত জনগণের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁকে

প্রকৃত ফালসাফাহ্র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেখা যেতে পারে। তিনি এই মুসলিম আদর্শের আকর্ষণীয় বিশ্বজনীনতা তুলে ধরেছিলেন। আল-ফারাবিকে আমরা রেনেসাঁ পুরুষ বলতে পারি; কেবল চিকিৎসক নন, সঙ্গীত শিল্পী ও অতিন্দ্রীয়বাদীও ছিলেন তিনি। তাঁর *অপিনিয়নস অভ দ্য ইনহ্যাবিট্যান্টস অভ আ ভারচুয়াস সিটিতে* মুসলিম আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্বেগের বিষয়াদিও তুলে ধরেছিলেন তিনি। *রিপাবলিক*-এ প্লেটো যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, সাধারণ মানুষের ওপর প্রয়োগের যোগ্যতা রাখেন এমন একজন দার্শনিকের যৌক্তিক নীতিমালার অধীনে কোনও সৎসমাজ পরিচালিত হতে হবে। আল-ফারাবি মত প্রকাশ করেছেন, প্লেটো যেমন ব্যক্তির কথা কল্পনা করেছিলেন মুহাম্মদ (স) ঠিক তেমন একজন শাসক ছিলেন। তিনি মানুষের বোধগম্য এক কল্পনানির্ভর (Imaginitive) রূপের ধরণে কালোত্তীর্ণ সত্য প্রকাশ করেছেন, সুতরাং প্লেটোর আদর্শ সমাজ গঠনের জন্যে ইসলামই উপযুক্ত। সম্ভবত ইসলামের শিয়াহ্ ধরণ এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল, কারণ এর প্রাজ্ঞ ইমামের কাল্ট। সক্রিয় সুফী হলেও আল-ফারাবি প্রত্যাদেশকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন। প্রচলিত প্রত্যাদেশের মতবাদ যেমন বোঝায়, মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হতে সুদূরবর্তী গ্রিক দার্শনিকদের ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে 'কথা বলা' ও জাগতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। অবশ্য, তার মানে এই ছিল না যে আল-ফারাবির মূল ভাবনা হতে ঈশ্বর দূরবর্তী ছিলেন। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রে ছিল ঈশ্বরের অবস্থান, ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা দিয়েই তাঁর রচনা মূর্ত হয়েছে। অবশ্য, এই ঈশ্বর অ্যারিস্টটল ও প্লটিনাসের ঈশ্বর: সকল সত্তার শুরু তিনি। ডেনিস দ্য আরোপাগাইতের অতিন্দ্রীয় দর্শনের উপর নির্ভর করে বেড়ে ওঠা কোনও গ্রিক ক্রিশ্চান ঈশ্বরকে কেবল ভিন্ন এক সত্তা হিসাবে তুলে ধরে এমন তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু আল-ফারাবি অ্যারিস্টটলের কাছাকাছি রয়ে গেছেন। ঈশ্বর 'সহসা' সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বিশ্বাস করতেন না তিনি। সেক্ষেত্রে অনন্ত ও অটল ঈশ্বরের অশোভন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ত।

AMARBOI.COM

গ্রিকদের মতো আল-ফারাবি দ্য ওয়ান হতে দশটি পর্যায়ক্রমিক উৎসারণ বা 'বুদ্ধিমত্তায়' সত্তার ধারা অগ্রসর হতে দেখেছেন, যার প্রতিটি টলেমিয় বলয় সমূহের একেকটি অংশ সৃষ্টি করেছে: বাইরের আকাশসমূহ, স্থির তারকামণ্ডলীর বলয়; শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ ও চাঁদের বলয়। আমরা একবার আমাদের পার্থিব জগতে প্রবেশ করলে জড় পদার্থ হতে শুরু হয়ে গাছ-পালা ও জীবজন্তুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে মানুষে শেষ হওয়া বিপরীত দিক হতে বিকশিত সত্তার একটা ধারাক্রম (Hierarchy) সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি;

যার আত্মা ও বুদ্ধিমত্তা স্বর্গীয় কারণের (Reason) অংশ, কিন্তু যার দেহ আসে মাটি হতে। প্লেটো এবং প্লাটিনাস বর্ণিত পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়ায় মানুষ তার পার্থিব বাধা ছিন্ন করে স্বাভাবিক গন্তব্য ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে পারে।

সত্তা সম্পর্কে কোরানের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পার্থক্য ছিল, কিন্তু আল-ফারাবি দর্শনকে সত্য উপলব্ধি করার শ্রেয়তর উপায় হিসাবে দেখেছেন; মানুষের কাছে আবেদন সৃষ্টি করার জন্যে পয়গম্বরগণ যা কাব্যিক এবং রূপকার্থে প্রকাশ করেছিলেন। ফালসাফাহ্ সবার উপযোগি ছিল না। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি এক ধরনের নিগূঢ় উপাদান ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। ফালসাফাহ্ ছিল এ ধরনের একটি নিগূঢ় অনুশীলন। সুফীবাদ ও শিয়াহ্বাদও পবিত্র আইন ও কোরানকে কাঠোরভাবে অনুসরণকারী *উলেমাদের* চেয়ে ভিন্নভাবে ইসলামকে ব্যাখ্যা করেছে। আবার, সাধারণ মানুষকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু তারা নিজস্ব মতবাদের গোপনীয়তা বজায় রাখেনি, বরং ফায়লাসুফ, সুফী এবং শিয়াহ্দের সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, ইসলাম সম্পর্কিত তাদের অধিকতর দুঃসাহসী ও উদ্ভাবনী ভাষ্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারত। ফালসাফাহ্র মতবাদ, সুফীবাদ কিংবা শিয়াহ্দের ইমামতত্ত্বের আক্ষরিক বা সরলীকৃত ব্যাখ্যা সত্য আবিষ্কারের প্রতীকী, যৌক্তিক কিংবা কল্পনানির্ভর পদ্ধতি বোঝার যোগ্যতা বা প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তিকে ধাঁধায় ফেলে দিতে পারে। এই গোপন দলগুলোর মন-প্রাণের বিশেষ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাব্রতীকে যত্নের সঙ্গে এসব জটিল ধারণা গ্রহণ করার উপযোগি করে তোলা হতো। আমরা দেখেছি, *ডগমা* ও *কেরিগমার* পার্থক্যকরণে গ্রিক ক্রিশ্চানরা একই রকম ধারণা গড়ে তুলেছিল। পশ্চিমে গুপ্ত বা নিগূঢ় ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি, সবার বোধগম্য বলে বিবেচিত ধর্মের *কেরিগম্যাটিক* ব্যাখ্যাই অনুসৃত হয়েছে। তথাকথিত ভিন্ন মতাবলম্বীদের আত্মগোপনে যেতে না দিয়ে পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা স্রেফ তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে আর নন-করফরমিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। ইসলামি রাজ্যে নিগূঢ় চিন্তাবিদগণ সাধারণত নিজেদের বিছানাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আল-ফারাবির উৎসারণ-মতবাদ ফায়লাসুফদের কাছে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আমরা দেখব, অতিন্দ্রীয়বাদীগণও শূন্য হতে সৃষ্টির মতবাদের তুলনায় উৎসারণের ধারণাকে বেশি সহানুভূতিশীল বলে আবিষ্কার করেছে। দর্শন ও যুক্তিকে ধর্মের প্রতিপক্ষ বিবেচনা করার বদলে মুসলিম সুফী ও ইহুদি কাব্বালিস্টরা প্রায়শঃই ফায়লাসুফদের দর্শনকে তাদের অধিকতর কল্পনা নির্ভর ধর্মের প্রতি অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে দেখেছে। শিয়াহ্ মতবাদে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্পষ্ট। ইসলামে তারা সংখ্যালঘু রয়ে গেলেও দশম শতাব্দী শিয়াহ্ শতাব্দী হিসাবে পরিচিত, কেননা গোটা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন

AMARBOI.COM

গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক পদসমূহে শিয়াহ্‌রা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। এইসব শিয়াহ্ উদ্যোগের সফলতা ছিল বাগদাদের সুন্নী খেলাফতের বিপরীতে ৯০৯ সালে তিউনিসে শিয়াহ্ খেলাফতের প্রতিষ্ঠা। এটা ছিল ফাতিমিয় বা 'সেভেনারস' নামে পরিচিত ইসমায়েলি সম্প্রদায়ের অর্জন, এরা বার জন ইমামের কর্তৃত মেনে নেওয়া অধিক সংখ্যাক 'টুয়েলভার' শিয়াহ্‌দের চেয়ে আলাদা। ৭৬৫ সালে সাধুপ্রতীম ষষ্ঠ ইমাম জাফর ইবন সাদিকের মৃত্যুর পর ইসমায়েলিরা টুয়েলভারদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। জাফর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে ছেলে ইসমাইলকে মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু ইসমাইলের অকাল মৃত্যু ঘটলে টুয়েলভাররা তাঁর ভাই মুসার নেতৃত্ব মেনে নেয়। কিন্তু ইসমায়েলিরা ইসমাইলের অনুগত রয়ে যায় এবং বিশ্বাস করে যে নেতৃত্বের ধারা শেষ হয়ে গেছে। তাদের উত্তর আফ্রিকার খেলাফত প্রবল ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে: ৯৭৩ সালে আধুনিক কায়রোর অবস্থান আল-কাহিরাহ্‌য় রাজধানী স্থানান্তর করে এখানে তারা বিখ্যাত আল-আযহার মসজিদ নির্মাণ করে।

তবে ইমামদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দীপনা ছিল না। আমরা যেমন দেখেছি, শিয়াহ্‌রা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে রহস্যময় কোনও উপায়ে ইমামগণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের সত্তা ধারণ করেন। কোরানের প্রতীকী পাঠের ওপর নির্ভরশীল নিজস্ব নিগূঢ় ধার্মিকতা গড়ে তুলেছিল তারা। মনে করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা আলি ইবন আবি তালিবকে গুপ্তজ্ঞান দিয়েছিলেন এবং এই *ইলম* তাঁর সরাসরি বংশধর মনোনীত ইমামদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। প্রত্যেক ইমাম 'মুহাম্মদের আলো'র ধারক *(আল-নূর আল-মুহাম্মদ)*—পয়গম্বরসূচক চেতনা—যা মুহাম্মদকে (স) নিখুঁতভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পনে সক্ষম করে তুলেছিল। পয়গম্বর বা ইমামদের কেউই স্বর্গীয় ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা এমনভাবে খোদামুখী ছিলেন যে বলা যায়, ঈশ্বর তাঁদের মাঝে সাধারণ মরণশীলদের মাঝে যেভাবে অবস্থান করেন তারা চেয়ে আরও পরিপূর্ণভাবে অবস্থান করেছেন। নেস্টরিয়ানরা জেসাস সম্পর্কে একই রকম ধারণা পোষণ করত। নেস্টরিয়ানদের মতো শিয়াহ্‌রাও তাদের ইমামদের আলোকিত স্বর্গীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ ঈশ্বরের 'মন্দির' বা 'কোষাগার' হিসাবে দেখেছে। এই *ইলম* কেবল গোপন তথ্য নয় বরং পরিবর্তন ও অন্তর শুদ্ধকরণের উপায়। দা'ঈর (আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) পথ নির্দেশ অনুসরণ করে অনুসারী স্বপ্নের মতো স্পষ্ট দিব্যদর্শনে শৈথিল্য ও অনুভূতিহীন অবস্থা হতে বেরিয়ে আসবে। এটা তাকে এমনভাবে বদলে দিত যে, কোরানের নিগূঢ় ব্যাখ্যা বোঝার ক্ষমতা অর্জন করত সে। দশম শতাব্দীর ইসমায়েলি দার্শনিক নাসিরি আল-খুসর এর

এই কবিতায় আমরা দেখতে পাই সচেতন হয়ে ওঠার ক্রিয়াই মূল অভিজ্ঞতা–এই কবিতায় তিনি তাঁর জীবনকে বদলে দেওয়া ইমাম দর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন:

> অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রবাহিত কোনও সাগরের কথা কী শুনেছ তুমি?
> কোনও শেয়ালকে কী দেখেছ সিংহে পরিণত হতে?
> একটা নুড়ি পাথরকে রত্নে পরিণত করতে পারে সূর্য, এমনকি প্রকৃতির হাত যাকে বদলাতে পারে না।
> আমিই সেই মূল্যবান রত্ন, আমার সূর্য তিনি, যাঁর রশ্মিতে এই নিকষ অন্ধকার জগৎ আলোয় পরিপূর্ণ।
> ভক্তির কারণে এই কবিতায় আমি তাঁর [ইমামের] নাম উচ্চারণ করতে পারছি না, কিন্তু কেবল এটুকু বলতে পারি, প্লেটো স্বয়ং তাঁর দাসে পরিণত হতেন। তিনিই গুরু, আত্মার পরিত্রাতা, ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট, প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি, জ্ঞান ও সত্যের ধারা।
> হে জ্ঞানের প্রতিভূ, গুণের রূপ,
> প্রজ্ঞার আত্মা, মানুষের অভীষ্ট,
> হে গর্বের গর্ব, তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, মলিন
> ও জীর্ণ পশমের পোশাক পরে,
> এবং চুম্বন দিয়েছি তোমার হাতে যেন বা তা
> পয়গম্বরের মাজার বা কাবাহর কৃষ্ণ পাথর।[৩]

AMARBOI.COM

গ্রিক অর্থডক্স ক্রিশ্চানদের কাছে তাবর পর্বতের ক্রাইস্ট যেমন মানুষের ঐশীরূপের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বুদ্ধ যেমন গোটা মানবজাতির পক্ষে ধারণ যোগ্য আলোক ধারণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবে ঈশ্বরের পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতার মধ্য দিয়ে ইমামদের মানবীয় প্রকৃতি বা রূপ বদলে গেছে।

ফায়লাসুফরা ধর্মের বাহ্যিক ও যৌক্তিক উপাদানসমূহের দিকে অতিমাত্রায় মনোযোগী হয়ে উঠে এর আধ্যাত্মিক সত্যকে উপেক্ষা করছিল বলে শঙ্কিত বোধ করেছে শিয়াহ্‌রা। যেমন মুক্ত চিন্তাবিদ আর-রাযির বিরোধিতা করেছে তারা। কিন্তু নিজস্ব দর্শন ও বিজ্ঞান গড়ে তুলেছিল তারা, কিন্তু সেগুলো শেষ কথা ছিল না বরং কোরানের অন্তর্নিহিত অর্থ (*বাতিন*) উপলব্ধিতে সক্ষম করে তোলার আধ্যাত্মিক অনুশীলন হিসাবে বিবেচিত ছিল। বিজ্ঞান ও গণিতের বিমূর্ত বিষয়াদি দিয়ে ধ্যান ইন্দ্রিয়জ কল্পনা হতে তাদের পরিশুদ্ধ করেছিল ও দৈনন্দিন জীবনের সচেতনতা থেকে, সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। আমরা যেভাবে বাহ্যিক সত্যের সঠিক ও আক্ষরিক উপলব্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানকে

ব্যবহার করি তা না করে ইসমায়েলিরা তাদের কল্পনাশক্তিকে বাড়ানোর প্রয়াস পেয়েছে। তারা প্রাচীন ইরানের যরোস্ট্রিয়ান মিথের শরণাপন্ন হয়ে সেগুলোকে কিছু নিও-প্লেটোনিক ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে মুক্তি লাভের ইতিহাসের এক নতুন ধারণা গড়ে তুলেছিল। এখানে স্মরণ করে যেতে পারে যে, অধিকাংশ প্রথাগত সমাজে মানুষ বিশ্বাস করত এই মর্ত্যের পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাবলী স্বর্গীয় বলয়ের ঘটনাপ্রবাহের পুনরাবৃত্তি: প্লেটোর আকৃতি বা চিরন্তন আদর্শ জগতের মতবাদে দার্শনিক পরিভাষায় এই চিরকালীন বিশ্বাসই প্রকাশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাক-ইসলামি ইরানে বাস্তবতা দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী ছিল: এভাবে দৃশ্যমান (*গেতিক*) আকাশের পাশাপাশি এক স্বর্গীয় (*মেনক*) আকাশের অস্তিত্ব ছিল যা সাধারণ বোধশক্তি দিয়ে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আরও বিমূর্ত ও আধ্যাত্মিক সত্তা বা বাস্তবতার ক্ষেত্রে একথা আরও সত্যি: এখানে *গেতিকে* আমাদের প্রত্যেক প্রার্থনা বা সৎকাজের, আবার স্বর্গীয় বলয়ে অনুরূপ সৃষ্টি হয় এবং একে সত্য রূপ ও চিরন্তন তাৎপর্য দান করে।

এইসব স্বর্গীয় আদি রূপ বা আদর্শ আমাদের কল্পনার ঘটনাবলী ও আকার যেমন প্রায়ই আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের চেয়ে আরও বেশি বাস্তব এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঠেকে ঠিক সেভাবে অনুভূত হতো। বিপরীতে হতাশাব্যাঞ্জক বহু ঘটনাবলী থাকা সত্ত্বেও একে আমাদের জীবন ও আমাদের অনুভবের পৃথিবীর যে একটা অর্থ ও গুরুত্ব আছে সেই বিশ্বাস প্রকাশের প্রয়াস হিসাবে দেখা যেতে পারে। দশম শতাব্দীতে ইসমায়েলিরা এই মিথলজি পুনরুজ্জীবিত করে, ইসলামে দীক্ষা নেওয়ার সময় পার্সিয় মুসলিমরা যা ত্যাগ করেছিল, কিন্তু যা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ রয়ে গিয়েছিল। একে তারা কল্পনাপ্রসূতভাবে উৎসারণের প্লেটোনিক মতবাদের সঙ্গে সংশ্লেষ করে। আল-ফারাবি ঈশ্বর ও বস্তুতজগতের মাঝে দশটি উৎসারণ কল্পনা করেছিলেন যা টলেমিয় বলয়সমূহের তত্ত্বাবধান করে। শিয়াহ্‌রা এবার পয়গম্বর ও ইমামদের এই স্বর্গীয় প্রকল্পের 'আত্মা'য় পরিবর্তন করল। প্রথম স্বর্গের সর্বোচ্চ 'পয়গম্বরত্বে'র বলয়ে ছিলেন মুহাম্মদ (স); দ্বিতীয় স্বর্গে ছিলেন আলি পরবর্তী বলয়গুলোর প্রত্যেকটায় ক্রমানুসারে প্রভুত্ব করেছেন সাত জন ইমাম। এতে করে শেষে, বস্তজগতের নিকটতম বলয়ে ছিলেন মুহাম্মদের (স) মেয়ে, আলির স্ত্রী ফাতিমাহ–যার সুবাদে এই পবিত্র ধারা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং তিনি ইসলামের জননী ও স্বর্গীয় প্রজ্ঞা সোফিয়ার সমপর্যায়ের। দেবরূপ ইমামদের এই কল্পনা শিয়াহ্‌ ইতিহাসের ইসমায়েলি ব্যাখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে। এটা কেবল বাহ্যিক জাগতিক ঘটনাবলীর পর্যায়ক্রম ছিল না–যার অনেকগুলোই করুণ। এইসব বর্ণাঢ্য মানুষদের জীবন আদর্শ জগতের *(মেনোক)* ঘটনা প্রবাহের অনুরূপ।[৪]

AMARBOI.COM

একে অলীক ধারণা বলে চট করে উপহাস করা উচিৎ হবে না আমাদের। বর্তমান পশ্চিমে আমরা বস্তুগত সঠিকতকতার দিকে মনোযোগের জন্যে গর্ব বোধ করি, কিন্তু ধর্মের 'গুপ্ত' (*বাতিন*) মাত্রার অনুসন্ধানকারী ইসমায়েলি *বাতিনিরা* এক সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্যে নিয়োজিত ছিল। কবি বা শিল্পীদের মতো প্রতীকী পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তারা, যার সঙ্গে যুক্তির মিল ছিল সামান্যই, তবে তারা মনে করত এতেই যৌক্তিক ধারণায় প্রকাশিত বা অনুভবে উপলব্ধ বাস্তবতার চেয়ে আরও গভীর বাস্তবতা প্রকাশ পায়। সে অনুযায়ী কোরান পাঠের একটা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল তারা, যাকে তারা বলত *তাওয়িল*—আক্ষরিক অর্থে, 'পেছনে নিয়ে যাওয়া' (Carrying back)। এভাবে আদি মূল কোরানের কাছে ফিরে যেতে পারবে বলে ভেবেছিল তারা, যা মুহাম্মদ (স) *গেতিকে* আবৃত্তি করার সময়ই *মেনোকে* উচ্চারিত হয়েছিল। ইরানি শিয়াহ্‌বাদের ইতিহাসবিদ প্রয়াত হেনরি করবিন *তাওয়িলের* অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গীতের ছন্দের তুলনা করেছেন। ইসমায়েলি যেন এক ধরনের 'শব্দ' শুনতে পেত—কোরানের কোনও পঙক্তি বা কোনও *হাদিস*—একই সময়ে বিভিন্ন মাত্রায়; আরবী শব্দের মতোই এর স্বর্গীয় প্রতিপক্ষের উচ্চারণ শোনার জন্যে নিজেকে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছে সে। এই প্রয়াস তার জটিল কোলাহলময় মনকে স্থির করে তুলত ও প্রতিটি শব্দকে ঘিরে থাকা নৈঃশব্দ্যের প্রতি সচেতন করে তুলত, ঠিক কোনও একজন হিন্দু যেমন পবিত্র উচ্চারণ ওঁম কে ঘিরে থাকা অনন্ত নীরবতায় কান পেতে থাকে। নৈঃশব্দ্যে কান পেতে থাকার সময় ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য ও ধারণার সঙ্গে পূর্ণ সত্তার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে।[৫] এক নেতৃস্থানীয় ইসমায়েলি চিন্তাবিদ আবু ইয়াকুব আল-সিজিস্তানি (মৃত্যু. ৯৭১) ব্যাখ্যা করেছেন, এই অনুশীলন ঈশ্বরকে যেভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন সেভাবে উপলব্ধি করতে মুসলিমদের সাহায্য করে। মুসলিমরা প্রায়শঃই ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলার সময় মানবীয় পরিভাষা ব্যবহার করে তাকে অতিমানব ধরনের কিছু বানায়, অন্যদিকে অন্যরা সকল ধর্মীয় অর্থ বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে কেবল ধারণার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। এর বদলে আল-সিজিস্তানি দ্বিগুণ নেতির ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। আমাদের উচিত নেতিবাচক অর্থে ঈশ্বর সম্পর্কে কথা শুরু করা; যেমন: তিনি 'সত্তা' না বলে 'সত্তা নন', 'প্রাজ্ঞ' না বলে 'অজ্ঞ নন,' বলা যেতে পারে, ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রাণহীন ও বিমূর্ত নেতিকে আবার বাতিল করতে হবে আমাদের। আমরা যেভাবে শব্দগুলো ব্যবহার করি সেভাবে বলতে হবে ঈশ্বর 'অজ্ঞ না নন' বা তিনি 'কিছু-না নন।' মানবীয় কথা বলার ঢঙের সঙ্গে তিনি মেলেন না। এই ভাষাগত অনুশীলনের চর্চার মাধ্যমে একজন *বাতিনি* ঈশ্বরের রহস্য

বোঝানোর প্রয়াস পাওয়ার সময় ভাষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠবে।

পরবর্তী কালের ইসমায়েলি চিন্তাবিদ হামিদ আল-দিন কিরমানি (মৃত্যু. ১০২১) তাঁর *রাহাফ আল-আকল* (*বাম ফর ইন্টেলেক্ট*)-এ এই অনুশীলন বা চর্চার অপরিসীম শান্তি ও সন্তোষ লাভের কথা বর্ণনা করেছেন। এটা বিরস, বুদ্ধির অনুশীলন বা পণ্ডিতি কোনও চাল ছিল না, বরং এখানে ইসমায়েলির জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় এক ধরনের তাৎপর্যের অনুভূতি নিয়ে যোগ হয়েছে। ইসমায়েলি লেখকগণ বার বার *বাতিনকে* আলোকপ্রাপ্তি বা পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে তথ্য প্রদান *তাওয়িলের* কাজ ছিল না বরং যুক্তির চেয়ে গভীর কোনও স্তরে বিস্ময়ের অনুভূতি গড়ে তোলা এর কাজ যা *বাতিনি*কে আলোকিত করে তুলবে। এটা পালায়নবাদী কোনও বিষয়ও ছিল না। ইসমায়েলিরা ছিল রাজনৈতিক কর্মী। প্রকৃতপক্ষেই ষষ্ঠ ইমাম জাফর ইবন সাদিক বিশ্বাসকে কর্ম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। পয়গম্বর ও ইমামদের মতো বিশ্বাসীকে জাগতিক জীবনেই ঈশ্বরের দর্শনকে কার্যকর করে তুলতে হবে।

শিয়াহ্ শতাব্দীতে বসরায় গড়ে ওঠা এক গুপ্ত গোষ্ঠী *ইকওয়ান আল-সাফা* বা ব্রেদরেন অভ পিউরিটি-ও এইসব আদর্শ গ্রহণ করেছিল। ব্রেদরেনরা সম্ভবত ইসমায়েলিদের দলছুট অংশ ছিল। ইসমায়েলিদের মতো এরাও নিজেদের বিজ্ঞান, বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করেছিল। ইসমায়েলিদের মতোই ব্রেদরেনরাও *বাতিন* বা জীবনের গূঢ় অর্থের সন্ধান করেছিল। এদের এপিসলস্ (*রাসায়েল*) দার্শনিক বিজ্ঞানের বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছিল। সুদূর স্পেন পর্যন্ত এর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রেদরেনরা আবার বিজ্ঞান ও অতিন্দ্রীয়বাদের মিশ্রণ ঘটিয়েছিল। গণিতকে দর্শন ও মনস্তত্ত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন সংখ্যা আত্মার সহজাত বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করে; এগুলো ছিল মনোসংযোগের একটা পদ্ধতি যা শিক্ষাব্রতীকে মনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে সফল করে তুলত। সেইন্ট অগাস্তিন যেমন আত্মজ্ঞানকে ঈশ্বরের জ্ঞানের জন্যে অপরিহার্য হিসাবে দেখেছিলেন, ঠিক তেমনি নিজ সম্পর্কে এক গভীর উপলব্ধিও ইসলামি অতিন্দ্রীয়বাদের মূল বিষয়ে পরিণত হয়। সুন্নী অতিন্দ্রীয়বাদী অর্থাৎ সুফী, যাদের সঙ্গে ইসমায়েলিরা যথেষ্ট নৈকট্য বোধ করত, তাদের একটা নীতিবাক্য ছিল: 'যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে।' ব্রেদরেনদের 'ফার্স্ট এপিলস্'-এ একথা উদ্ধৃত হয়েছে।[৬] আত্মার সংখ্যা নিয়ে ধ্যান করার সময় মনের গভীরে মানব সত্তার মূল আদি ওয়ানে ফিরে যেত তারা। ব্রেদরেনরা ফায়লাসুফদেরও বেশ

AMARBOI.COM

কাছাকাছি ছিল। মুসলিম যুক্তিবাদীদের মতো তারাও সত্যের অখণ্ড রূপের উপর জোর দিয়েছে, সর্বত্রই যার অনুসন্ধান করতে হবে। একজন সত্যানুসন্ধানী অবশ্যই 'বিজ্ঞান ত্যাগ করবে না, কোনও পুস্তককে নিন্দা করবে না, নির্দিষ্ট কোনও বিশ্বাসও আঁকড়ে থাকবে না।'[৭] ঈশ্বর সম্পর্কে এক নিওপ্লেটোনিক ধারণা গড়ে তুলেছিল তারা, যাঁকে তারা প্লটিনাসের অনির্বচনীয় দুর্বোধ্য 'দ্য ওয়ানে'র মতোই দেখেছে। ফায়লাসুফদের মতো তারা প্রচলিত কোরানিক মতবাদের 'শূন্য হতে সৃষ্টি'র বদলে উৎসারণের প্লেটোনিক মতবাদেরই অনুসারি ছিল: জগৎ স্বর্গীয় 'কারণ'কে প্রকাশ করে আর মানুষ ঐশী জগতে অংশ নিতে পারে, আপন যৌক্তিক ক্ষমতাকে পরিশোধন করে 'দ্য ওয়ানে'র কাছে ফিরে যেতে পারে।

পশ্চিমে আভিসেনা নামে পরিচিত আবু আলি ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৭)-এর রচনাবলীতে ফালসাফাহ্ এর সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছেছিল। সেন্ট্রাল এশিয়ার বুখারার কাছে এক শিয়াহ্ কর্মকর্তার পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী ইবন সিনা তাঁর বাবার কাছে আগত ইসমায়েলিদের যুক্তি-তর্ক দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এক বিস্ময়বালকে পরিণত হন তিনি। ষোল বছর বয়সে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের পরামর্শক এবং আঠার বছর বয়সে গণিত, যুক্তিবিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। অবশ্য অ্যারিস্টটল তাঁর কাছে কঠিন ঠেকেছে, কিন্তু আল-ফারাবির *ইনটেনশন্স অভ অ্যারিস্টটল'স মেটাফিজিক্স* পাঠ করার পর আলোর দেখা পান। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক হিসাবে কাজ করছেন তিনি, গোটা ইসলামি সাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃষ্ঠপোষকদের খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এক পর্যায়ে বর্তমান ইরান ও দক্ষিণ ইরাক অঞ্চলের শাসক শিয়াহ্ বায়িদ বংশের উজিরের দায়িত্ব পান তিনি। মেধাবী এবং প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবী ইবন সিনা তথাকথিত পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণও ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে যে সুরা ও যৌনতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির কারণে মাত্র আটান্ন বছর বয়সে অকাল মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

ইবন সিনা বুঝতে পেরেছিলেন, ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে ফালসাফাহ্‌র অভিযোজনের প্রয়োজন রয়েছে। আব্বাসীয় খেলাফতের তখন পতনোন্মুখ অবস্থা। *রিপাবলিকে* প্লেটোর বর্ণিত আদর্শ দার্শনিক সমাজ গঠনের জন্যে খেলাফতভিত্তিক রাষ্ট্রকে আর উপযোগি ভাবা যাচ্ছিল না। স্বাভাবতই ইবন সিনা শিয়াহ্ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তবে ফালসাফাহ্‌র নিও প্লেটোনিজমের প্রতি বেশি আকর্ষণ ছিল তাঁর। তিনি অতীতের ফায়লাসুফদের চেয়ে বেশি সাফল্যের সঙ্গে এর ইসলামিকরণে সফল হয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বাস্তবতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তোলার ফালসাফাহ্‌র দাবি প্রমাণ করতে

AMARBOI.COM

হলে একে অবশ্যই সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকতর অর্থ প্রকাশ করতে হবে, যা–যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন–রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের এক প্রধান সত্য। ধর্মকে ফালসাফাহ্‌র নিম্নস্তরের ভাষ্য হিসাবে না দেখে ইবন সিনা মনে করেছেন মুহাম্মদের (স) মতো পয়গম্বর যেকোনও দার্শনিকের চেয়ে শ্রেয়তর, কারণ তিনি মানবীয় কারণের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না, বরং সরাসরি ও সহজাতভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করেছেন। এটা সুফীদের বর্ণিত অতিন্দ্রীয়বাদী অভিজ্ঞতা ও স্বয়ং প্লটিনাস উল্লিখিত প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ রূপের অনুরূপ। অবশ্য এর মানে এই ছিল না যে, বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের কিছুই বোঝা যাবে না। অ্যারিস্টটলের প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ইবন সিনা ঈশ্বরের অস্তিত্বের এক যৌক্তিক প্রতিপাদ্য বের করেছিলেন যা ইহুদিবাদ ও ইসলামের মধ্যযুগের শেষদিকের দার্শনিকদের আদর্শে পরিণত হয়েছিল। ফায়লাসুফ বা ইবন সিনার মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তাঁরা কখনও সাহায্যবিহীন মানবীয় যুক্তি দিয়ে পরম সত্তার অস্তিত্বের জ্ঞান লাভের সম্ভাব্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেননি। যুক্তি মানুষের মহোত্তম কাজ: এটা স্বর্গীয় কারণের অংশী এবং ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসুতার ক্ষেত্রে স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এর। এভাবে যাদের ঈশ্বরকে জানার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা বা ক্ষমতা আছে ইবন সিনা তাদের জন্যে একে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবে দেখেছেন, কারণ যুক্তি ঈশ্বরের ধারণাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে এবং তাঁকে কুসংস্কার ও মানব রূপ হতে মুক্ত করতে পারে। ইবন সিনা ও তাঁর উত্তসূরিরা যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখানোর যৌক্তিক প্রতিপাদ্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা কিন্তু আমাদের মতো করে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্তাপন করেননি। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানার জন্যে যুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছেন তাঁরা।

আমাদের মনের কাজের ধারা বিবেচনার মাধ্যমে ইবন সিনার 'প্রমাণে'র শুরু। আমরা জগতের দিকেই চোখ ফেরাই, বিভিন্ন অসংখ্য উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যৌক্তিক জিনিস বা সত্তা দেখতে পাই। যেমন কোনও গাছ বাকল, কাঠ, মজ্জা, শাখা-প্রশাখা আর পাতার সমন্বয়। কোনও কিছু বোঝার চেষ্টা করার সময় আমরা একে 'বিশ্লেষণ' করি, একে ভাগ করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছাই যার পর আর ভাগ করা যায় না। সাধারণ উপাদানসমূহ আমাদের কাছে মুখ্য ঠেকে এবং এদের সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক বস্তুকে মনে হয় গৌণ। সুতরাং যেসব জিনিস আর ছোট করা যায় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অবিরাম সারল্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ফালসাফাহ্‌র একটা নীতি ছিল, বাস্তবতা যৌক্তিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রের সৃষ্টি করে; এর মানে সারল্যের জন্যে আমাদের অন্তহীন সন্ধান এক ব্যাপক মাত্রায় বস্তুসমূহে প্রতিফলিত হতে

AMARBOI.COM

হবে। সকল প্লেটোনিস্টের মতো ইবন সিনাও মনে করেছেন আমাদের চারপাশে দেখা জটিলতা (multiplicity) নিশ্চয়ই কোনও আদি এককের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের মন যেহেতু যৌগিক বস্তুকে গৌণ এবং সৃষ্ট বলে দেখে, এই প্রবণতা নিশ্চয়ই বাইরের কোনও এক সরল ও উচ্চতর সত্তা দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। জটিল বস্তু অনিশ্চিত, নির্ভরশীল এবং নির্ভরশীল বস্তুসমূহ যে বস্তুর ওপর তারা নির্ভরশীল সেগুলোর চেয়ে নিম্নস্তরের, ঠিক যেমন সন্তান-সন্ততিরা মর্যাদার দিক থেকে জন্মদাতা পিতার নিম্নপর্যায়ের। এমন কিছু যা স্বয়ং সরল তাকেই দার্শনিকগণ 'প্রয়োজনীয় সত্তা' বলেন, অর্থাৎ এটা অস্তিত্বের জন্যে কারও ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। তেমন কোনও সত্তা কী আছেন? ইবন সিনার মতো ফায়লাসুফ নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে সৃষ্টিজগৎ যৌক্তিক, এবং এই যৌক্তিক বিশ্বের একজন অকারণ সত্তা থাকতে বাধ্য, অস্তিত্বের ধারাক্রমের সর্বোচ্চ বিন্দুতে একজন অটল চালক (আন-মুভড মুভার)। নিশ্চয়ই কারণ এবং ফলাফলের কোনও ধারা কিছু দিয়ে শুরু হয়েছিল। এমন একজন পরম সত্তার অনুপস্থিতির মানে হবে আমাদের মন সামগ্রিকভাবে বাস্তবতার প্রতি সজানুভূতিশীল নয়। সুতরাং, সেটাই আবার বোঝাবে যে এই মহাবিশ্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যৌক্তিক নয়। যে পরিপূর্ণ সরল সত্তার ওপর জটিল অনিশ্চিত বাস্তবতা সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল, ধর্মগুলো তাকেই 'ঈশ্বর' বলে আখ্যায়িত করেছে। যেহেতু এটা সকল বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেহেতু একেবারে নিখুঁত এবং শ্রদ্ধা ও উপাসনার যোগ্য। কিন্তু এর অস্তিত্ব যেহেতু অন্য যেকোনও কিছুর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই সত্তার ধারায় এটা স্রেফ আরেকটা বস্তুমাত্র নয়।

ঈশ্বর স্বয়ং যে সরল, দার্শনিক ও কোরান এ বিষয়ে একমত: তিনি একক। সুতরাং এরপরই কথা আসে যে তাঁকে বিভিন্ন অংশ বা গুণাবলীতে ভাগ করা বা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। যেহেতু এই সত্তাটি চূড়ান্তরূপে সরল, সেহেতু এর কোনও কারণ নেই, গুণাবলী নেই, কোনও সময়গত মাত্রা নেই এবং তাঁর সম্পর্কে বলার মতো কিছুই আমাদের নেই। ঈশ্বর বাস্তব চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তু হতে পারেন না, কারণ আমাদের মস্তিষ্ক অন্য সবকিছু যেভাবে বিবেচনা করে তাঁকে সেভাবে বিবেচনা করতে পারবে না। ঈশ্বর যেহেতু আবিশ্যিকভাবে অদ্বিতীয়, সেহেতু স্বাভাবিক অনিশ্চিত অর্থে বিরাজিত কোনও কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা করা যাবে না। এই অবস্থায় আমরা যখন ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলি তখন আলোচনাযোগ্য সবকিছু থেকে তাঁকে আলাদা রাখার জন্যে আমাদের উচিত নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু সকল বস্তুর উৎস, আমরা তাঁর সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় স্বীকার করে নিতে পারি। আমরা যেহেতু জানি যে শুভের অস্তিত্ব আছে, সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই অত্যাবশ্যক বা

AMARBOI.COM

'প্রয়োজনীয়' শুভ (Goodness); যেহেতু আমরা জানি যে প্রাণ, ক্ষমতা ও জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বর নিশ্চয় অত্যাবশ্যক ও সম্পূর্ণ অর্থে জীবন্ত, ক্ষমতাবান ও বুদ্ধিমান। অ্যারিস্টটল শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর যেহেতু নিখুঁত বা খাঁটি কারণ—যুগপত যুক্তি প্রয়োগের ভঙ্গি এবং চিন্তার লক্ষ্য এবং বিষয়—কেবল নিজেকে নিয়েই ভাবতে পারেন তিনি; নিম্ন পর্যায়ের অনিশ্চিত বাস্তবতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। এটা সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী এবং সৃষ্ট জগতে উপস্থিত ও সক্রিয় বলে কথিত প্রত্যাদেশের ঈশ্বরের প্রতিকৃতির সঙ্গে মেলে না। ইবন সিনা একটা আপোসের প্রয়াস পেয়েছিলেন: ঈশ্বর এতই সুমহান যে তাঁর পক্ষে মানুষের মতো তুচ্ছ বিশেষ কোনও সত্তার জ্ঞানে ও তাদের কাজে অবতরণ করা সম্ভব নয়। অ্যারিস্টটল যেমন বলেছিলেন, 'এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো দেখার চেয়ে না দেখা ভালো।'[৮] ঈশ্বর ভূমি ও পৃথিবীর তুচ্ছ স্বল্পস্থায়ী জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে নোংরা করতে পারেন না। কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের চিরন্তন প্রক্রিয়ায় তিনি তাঁর নিকট হতে উৎসারিত সব কিছু এবং তিনি যাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন সেসব বুঝতে পারেন। তিনি জানেন যে তিনিই অনিশ্চিত প্রাণীর কারণ। তাঁর চিন্তা এতই নিখুঁত যে চিন্তা ও তাঁকে বাস্তবে রূপদান একই সঙ্গে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং, নিজেকে নিয়ে তাঁর চিরন্তন ভাবনা ফায়লাসুফদের বর্ণিত উৎসারণের প্রক্রিয়ার সূচনা করে। কিন্তু ঈশ্বর কেবল সাধারণভাবে বিশ্বজনীন অর্থে আমাদের এবং এই জগতকে জানেন, তিনি ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে ভাবেন না।

তবু ইবন সিনা ঈশ্বরের রূপের এই বিমূর্ত উপস্থাপনে সন্তুষ্ট হতে পারেননি: একে তিনি বিশ্বাসীদের অর্থাৎ সুফী ও *বাতিনি*দের ধর্মীয় মনস্তত্ত্বে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় মনস্তত্ত্বে উৎসাহী ইবন সিনা পয়গম্বরত্বের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে উৎসারণের প্লটিনিয় প্রকল্পের ব্যবহার করেছিলেন। ইবন সিনা অনুমান করেছেন, 'দ্য ওয়ান' হতে সত্তার অবতরণের দশটি পর্যায়ের প্রত্যেকটায় আত্মা বা দেবদূতসহ দশটি খাঁটি বুদ্ধিমত্তা টলেমিয় বলয়সমূহকে সক্রিয় করে তুলেছিল যা মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝে *বাতিনি*দের কাল্পনিক আদি আদর্শ জগতের অনুরূপ এক মধ্যবর্তী জগৎ সৃষ্টি করেছে। এইসব বুদ্ধিমত্তার কল্পনা শক্তিও রয়েছে; প্রকৃতপক্ষে, এগুলো কল্পনার খাঁটি পর্যায় এবং কল্পনার মধ্যবর্তী এই জগতের মধ্য দিয়ে—এলোমেলো কারণ দিয়ে নয়—নারী-পুরুষ ঈশ্বর সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারে। বুদ্ধিমত্তার শেষ বলয়টি হচ্ছে আমাদের বলয়—দশম—জিব্রাইল নামে পরিচিত প্রত্যাদেশের পবিত্র আত্মা আলো ও জ্ঞানের উৎস। মানুষের আত্মা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশীল বুদ্ধিমত্তায় তৈরি এবং জিব্রাইলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশতে পারে। সুতরাং পয়গম্বরদের

AMARBOI.COM

পক্ষে ঈশ্বর সম্পর্কে সহজাত ও কল্পনা-নির্ভর জ্ঞান অর্জন সম্ভব, ব্যবহারিক এবং এলোমেলো যুক্তির উর্ধ্বে যে বুদ্ধিমত্তা, তার অর্জিত জ্ঞানের সমপর্যায়ের হবে এই জ্ঞান। সুফীদের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে, মানুষের পক্ষে যুক্তি বিচার প্রয়োগ না করে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ঈশ্বরের দর্শন লাভ সম্ভব। সিলোজিসম প্রয়োগের বদলে তারা সিম্বলিজম এবং ইমেজারির কল্পনা নির্ভর উপাদান ব্যবহার করেছে। পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) এই স্বর্গীয় জগতের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে একীভূত হয়েছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখব, দিব্যদর্শন ও প্রত্যাদেশের এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দার্শনিকভাবে ঝোঁক বিশিষ্ট সুফীদের নিজস্ব ধর্মীয় বোধ আলোচনায় সক্ষম করে তুলবে।

প্রকৃতপক্ষে, জীবনের শেষ পর্যায়ে ইবন সিনা স্বয়ং যেন অতিন্দ্রীয়বাদীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর *কিতাব আল-আশেরাত* (দ্য বুক অভ অ্যাডমোনিশন্স) শীর্ষক নিবন্ধে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যৌক্তিক পদ্ধতির ব্যবহারের স্পষ্ট বিরোধী হয়ে উঠছিলেন, একে হতাশাব্যাঞ্জক মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি, যাকে বলে, 'প্রাচ্য দর্শন' *আল-হিকমত আল-মাশারিনক্কিয়ার* দিকে ঝুঁকছিলেন। ভৌগোলিক পুবদিকের কথা বোঝায়নি এটা, আলোর উৎসের কথা বুঝিয়েছে। একটি নিগূঢ় নিবন্ধ রচনার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন তিনি, আলোকন (*ইশরাক*), যেখানে যুক্তিতর্কের ওপর নির্ভরশীল অনুশীলনের একটি পদ্ধতি গড়ে তুলবেন বলে ভেবেছিলেন। আমরা জানি না শেষ পর্যন্ত নিবন্ধটি লিখতে পেরেছিলেন কিনা: যদি লিখে থাকেন, তাহলে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে যেমন দেখব, মহান ইরানি দার্শনিক ইয়াহিয়া সুহরাওয়ার্দি *ইশরাকি* মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে ইবন সিনা পরিকল্পিত দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সংশ্লেষ ঘটেছিল।

কালাম ও ফালসাফাহ্‌র অনুশীলন ইসলামি সাম্রাজ্যের ইহুদিদের মাঝে একই রকম বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। প্রথমবারের মতো তারা ইহুদিবাদে মেটাফিজিকাল অনুমান নির্ভর উপাদান যোগ করে আরবী ভাষায় নিজস্ব দর্শন রচনা শুরু করেছিল। মুসলিম ফায়লাসুফদের বিপরীতে ইহুদি দার্শনিকরা দর্শন বিজ্ঞানের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শুধু ধর্মীয় বিষয়াদিতে মনোযোগ দিয়েছিল। ইসলামের ভাষাতেই ইসলামের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে ভেবে বাইবেলের ব্যক্তিক ঈশ্বরকে ফায়লাসুফদের ঈশ্বরের সমান করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মুসলিমদের মতো তাঁরা ঐশীগ্রন্থ ও তালমুদে ঈশ্বরের মানবীয় রূপ দেখে উদ্বিগ্ন ছিল; নিজেদের জিজ্ঞেসা করেছে, এই ঈশ্বর কীভাবে দার্শনিকদের ঈশ্বর হতে পারেন। স্বভাবতই ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল তারা, তারা মুসলিম চিন্তাবিদদের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল ছিল। এভাবে ইহুদিবাদে প্রথম দার্শনিক ব্যাখ্যা

প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণকারী সা'দিয়া ইবন জোসেফ (৮৮২-৯২) একজন তালমুদিস্ট ও মুতাযিলিও ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজস্ব শক্তি বলে যুক্তি ঈশ্বর-জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ফায়লাসুফের মতো ঈশ্বর সম্পর্কে যৌক্তিক ধারণা অর্জনকে *মিতযভাহ*, অর্থাৎ ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবে দেখেছেন তিনি। কিন্তু আবার মুসলিম যুক্তিবাদীদের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর মনে এতটুকু সংশয় ছিল না। সা'দিয়ার কাছে স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব এত নিশ্চিত মনে হয়েছিল যে, তাঁর *বুক অভ বিলিফস অ্যান্ড অপিনিয়নস* গ্রন্থে বিশ্বাস নয় বরং ধর্মীয় সন্দেহের সম্ভাবনাই প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন তিনি।

সা'দিয়া যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোনও ইহুদির প্রত্যাদেশের সত্যকে মেনে নেওয়ার বেলায় যুক্তির ওপর চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে, ঈশ্বর পুরোপুরিভাবে মানবীয় যুক্তিতে সুগম্য। শূন্য হতে সৃষ্টির ধারণা যে দার্শনিক সমস্যায় পূর্ণ ও যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব এ কথা মেনে নিয়েছিলেন সা'দিয়া, কারণ ফায়লাসুফদের ঈশ্বর আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিবর্তন সূচিত করতে সমর্থ নন। কী করে আধ্যাত্মিক একজন ঈশ্বর বস্তুগত একটা জগতের উৎস হতে পারেন? এখানেই আমরা যুক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যাই এবং মেনে নিতে হয় যে, প্লেটোনিস্টদের বিশ্বাস অনুযায়ী বস্তু চিরন্তন নয়, বরং সময়ের বিস্তারে এর একটা সূচনা ছিল। একমাত্র এটিই ঐশীগ্রন্থ ও সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। একবার এ ব্যাখ্যা মেনে নিলে ঈশ্বর সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য বের করতে পারি আমরা। সৃষ্ট জগৎ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পিত; এর প্রাণ এবং শক্তি আছে: সুতরাং এর স্রষ্টা ঈশ্বরের অবশ্যই প্রজ্ঞা, প্রাণ ও ক্ষমতা থাকতে বাধ্য। এইসব গুণাবলী ক্রিশ্চানদের ট্রিনিটি মতবাদে প্রকাশিত পৃথক *hypostases* নয়, বরং ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যমাত্র। আমাদের মানবীয় ভাষা ঈশ্বরের পরিচয়কে পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করতে পারে না বলে আমরা এভাবে তাঁকে বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হই ও তাঁর চরম সারল্যকে যেন নষ্ট করি। আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে যথাসম্ভব নিখুঁত হতে চাইলে কেবল সঠিকভাবে এটুকুই বলতে পারি যে, তিনি আছেন। সা'দিয়া অবশ্য ঈশ্বরের সব ইতিবাচক বর্ণনাই নিষিদ্ধ করেননি, দার্শনিকদের দূরবর্তী নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরকে বাইবেলের ব্যক্তিক মানবীয় ঈশ্বরের উর্ধ্বেও স্থান দেননি। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি জগতে আমাদের প্রত্যক্ষ করা দুঃখকষ্টের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পাওয়ার সময় তালমুদ ও প্রজ্ঞা রচয়িতাদের শরণ নিয়েছেন, বলেছেন দুঃখ-কষ্ট পাপের শাস্তি, আমাদের বিনয়ী করে তোলার জন্যে আমাদের তা শুদ্ধ ও নিয়মনিষ্ঠ করে তোলে। প্রকৃত ফায়লাসুফ এব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবে না, কারণ এখানে ঈশ্বরকে বড় বেশি মানবীয় রূপ দেওয়া হয়েছে ও তাঁর ওপর পরিকল্পনা ও ইচ্ছার মতো গুণ আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু সা'দিয়া

ঐশীগ্রন্থের প্রকাশিত ঈশ্বরকে ফালসাফাহ্‌র ঈশ্বরের চেয়ে নিম্নস্তরের হিসেবে দেখেননি। পয়গম্বরগণ যে কোনও দার্শনিকের চেয়ে শ্রেয়তর ছিলেন। শেষ বিচারে যুক্তি কেবল বাইবেলের শিক্ষাকেই পদ্ধতিগতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেতে পারে।

অন্য ইহুদিরা আরও অগ্রসর হয়েছিল। নিওপ্লেটোনিস্ট সলোমন ইবন গাবিরোল (১০২২-১০৭০) তাঁর *ফাউন্টেন অভ লাইফ*-এ শূন্য হতে সৃষ্টির মতবাদ মেনে নিতে পারেননি, তিনি ঈশ্বরকে কিছু মাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রদান করার জন্যে উৎসারণ তত্ত্বকে অভিযোজনের প্রয়াস পেয়েছেন। গাবিরোল দাবি করেন, ঈশ্বর উৎসারণ প্রক্রিয়া শুরু করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করছেন এবং এভাবে প্রক্রিয়াটিকে কম-যান্ত্রিক করার প্রয়াস পেয়েছেন; ঈশ্বরকে তিনি একই গতিবিদ্যার অধীন না করে অস্তিত্বের নিয়ম নীতির নিয়ন্তা হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু বস্তু কীভাবে ঈশ্বর হতে আসতে পারে গাবিরোল সে ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অন্যরা আরও কম উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ছিল। বাহিয়া ইবন পাকুদাহ্‌ (মৃত্যু. ১০৮০) গোঁড়া প্লেটোনিস্ট ছিলেন না, তবে যখনই সুবিধাজনক মনে করেছেন কালামের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। এভাবে সা'দিয়ার মতো তিনিও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। জগৎ অবশ্যই দুর্ঘটনাবশতঃ অস্তিত্ব লাভ করেনি: সেটা হবে কাগজের ওপর কালি ছড়িয়ে একটা চমৎকার অনুচ্ছেদ লেখা হয়ে গেছে কল্পনা করার মতোই হাস্যকর ধারণা। বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যপূর্ণতা বোঝায় যে ঐশীগ্রন্থের ভাষ্য মোতাবেক নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা আছেন। এই চরম আদর্শিক মতবাদের অবতারণা করে বাহিয়া কালাম ছেড়ে ফালসাফাহ্‌য় সরে গেছেন; তিনি ইবন সিনার প্রমাণ দেখিয়ে বলেছেন, এক প্রয়োজনীয় সরল সত্তার অস্তিত্ব থাকতে বাধ্য।

বাহিয়া বিশ্বাস করতেন যে, কেবল পয়গম্বর ও দার্শনিকরাই সঠিকভাবে ঈশ্বরের উপসানা করেছেন। পয়গম্বরের ঈশ্বর সম্পর্কে সরাসরি ও সহজাত জ্ঞান ছিল, দার্শনিকের থাকে তাঁর সম্পর্কে যৌক্তিক জ্ঞান। বাকি সবাই কেবল তাঁর এক অভিক্ষেপ, নিজের কল্পনায় সৃষ্ট ঈশ্বরের উপাসনা করছে। এরা অন্ধের মতো, অন্য মানুষ দ্বারা পরিচালিত, যদি না তারা নিজেরাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস না পায়। যে কোনও ফায়লাসুফের মতোই অভিজাত ছিলেন বাহিয়া, আবার তাঁর প্রবল সুফী প্রবণতাও ছিল: যুক্তি আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানাতে *পারে*, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারে না। শিরোনামে যেমন বোঝা যায়, বাহিয়ার নিবন্ধ *ডিউটিজ অভ দ্য হার্ট* ঈশ্বরের প্রতি সঠিক মনোভাব গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য করার জন্যে যুক্তি

ব্যবহার করেছে। নিওপ্লেটোনিজমের সঙ্গে তাঁর ইহুদিবাদের কোথাও সংঘাত বাধলে তিনি স্রেফ তা বাদ দিয়ে গেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধর্মীয় বোধ যেকোনও যৌক্তিক পদ্ধতিকে এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু যুক্তি যদি ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলতে না পারে, তাহলে ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়ে যৌক্তিক আলোচনার যথার্থতা কী? এ প্রশ্নটি মুসলিম চিন্তাবিদ আবু হামিদ আল-গাযযলি (১০৫৮-১১১১) কে তাড়িত করেছে। ধর্মীয় দর্শনের ইতিহাসে গাযযালি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ পুরুষ। তাঁর জন্ম খোরাশানে। বিশিষ্ট আশারিয় ধর্মতাত্ত্বিক জুয়াঈনির অধীনে কালাম শিক্ষা করেছিলেন তিনি, এত গভীর ছিল তাঁর জ্ঞান যে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে বাগদাদের মর্যাদাসম্পন্ন নিযামিয়াহ মসজিদের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল ইসমায়েলিদের শিয়াহ্ চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে সুন্নী মতাদর্শের পক্ষাবলম্বন করা। আল-গাযযালির অবশ্য এক ধরনের অস্থির মানসিকতা ছিল যার কারণে সত্যের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে এবং সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেছেন, সহজ প্রচলিত অর্থে সন্তুষ্ট হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। আমাদের তিনি যেমন বলছেন,

> প্রতিটি অন্ধকার কোণে উঁকি দিয়েছি আমি, প্রত্যেক সমস্যার ওপর আক্রমণ চালিয়েছি, ঝাপ দিয়েছি প্রতিটি গহ্বরে। আমি সকল গোত্রের বিশ্বাস পরখ করেছি, প্রতিটি গোষ্ঠীর গূঢ় মতবাদ উন্মোচিত করার প্রয়াস পেয়েছি। এসবই করেছি যাতে সত্য ও মিথ্যা, সঠিক ধর্ম ও বিদ্রোহী মূলক আবিষ্কারের পার্থক্য বুঝতে পারি।[৯]

AMARBOI.COM

সা'দিয়ার মতো দার্শনিকের অনুভূত সন্দেহাতীত নিশ্চয়তার অনুসন্ধানে ছিলেন তিনি, কিন্তু ক্রমবর্ধমান হারে মোহমুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কঠোর গবেষণা সত্ত্বেও পরম নিশ্চয়তা তাঁকে এড়িয়ে গেছে। তাঁর সমসমায়িকরা বিভিন্নভাবে যার যার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও মেজাজ অনুযায়ী ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন কালামে, ইমামের সাহায্যে, ফালসাফাহ্ আর সুফী অতিন্দ্রীয়বাদে। আল-গাযযালি যেন এগুলোর প্রতিটি অনুশীলন গবেষণা করেছেন 'আসলে' এগুলো কী[১০] সেটা বোঝার প্রয়াসে। তাঁর গবেষণাভুক্ত ইসলামের চারটি প্রধান ভাষ্যের অনুসারীরা সম্পূর্ণ দৃঢ় প্রত্যয় দাবি করলেও আল-গাযযালির জিজ্ঞাসা ছিল, এই দাবি বস্তুনিষ্ঠাভাবে যাচাই করা যাবে কীভাবে?

যেকোনও আধুনিক সংশয়বাদীর মতোই আল-গাযযালি সজাগ ছিলেন যে নিশ্চয়তা একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যা বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্য নাও হতে পারে। ফায়লাসুফরা বলেছে, তাঁরা যৌক্তিক তর্কবিতর্কের মাধ্যমে বিশেষ

জ্ঞান অর্জন করেছে, অতিন্দ্রীয়বাদীরা জোর দিয়ে বলেছে, সুফী চর্চার মাধ্যমে তারা এটা লাভ করেছে, ইসমায়েলিরা ভেবেছে এটা কেবল ইমামের শিক্ষার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যে সত্তাকে আমরা 'ঈশ্বর' ডাকি, তাঁকে অভিজ্ঞতা দিয়ে পরখ করা যায় না, সুতরাং আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে আমাদের বিশ্বাসসমূহ নিছক বিভ্রান্তি নয়? অধিকতর প্রথাগত প্রমাণাদি আল-গাযযালির কঠোর মানদণ্ডকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। কালামের ধর্মতত্ত্ববিদরা ঐশীগ্রন্থে পাওয়া প্রস্তাবনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু এসবকে যুক্তিসঙ্গতভাবে যাচাই করা হয়নি। ইসমায়েলিরা একজন গোপন ও অগম্য ইমামের শিক্ষার ওপর নির্ভর করেছে, কিন্তু ইমাম যে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত কী করে সেটা নিশ্চিত হব আমরা, আমরা তাঁর সন্ধান না পেলে এই অনুপ্রেরণার যুক্তি কী? ফালসাফাহ্ বিশেষভাবে অসন্তোষজনক ছিল। আল-গাযযালি তাঁর যুক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ আল-ফারাবি ও ইবন সিনার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাসে অভিজ্ঞ কারও পক্ষেই তাঁদের যুক্তি খণ্ডণ করা সম্ভব বিশ্বাস করে আল-গাযযালি তিন বছর পুরোপুরি আত্মস্থ না করা পর্যন্ত ফালসাফাহ অধ্যায়ন করেছেন।[১১] তাঁর নিবন্ধ *দ্য ইনকোহেরেন্স অভ দ্য ফিলোসফারস*-এ তিনি যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, ফায়লাসুফরা প্রশ্নটিকে খুঁচিয়েছে। ফালসাফাহ্ জাগতিক দর্শনযোগ্য ঘটনাবলী যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা বা গণিতশাস্ত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে তা দারুণ উপকারে আসবে বটে কিন্তু এ থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না। উৎসারণের মতবাদ ঠিক না ভুল সেটা কেউ প্রমাণ করবে কীভাবে? ফায়লাসুফরা কীভাবে স্থির করল যে, ঈশ্বর কেবল সাধারণ বিশ্বজনীন বিষয়ে ওয়াকিবহাল, ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে নন? তারা এটা প্রমাণ করতে পারবে? ঈশ্বর অতিমহান বলে তুচ্ছ বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ হবেন, তাদের এই যুক্তি ঠিক নয়ঃ অজ্ঞতা আবার কবে থেকে মহত্ত্বের মাপকাঠি হল? এসব প্রস্তাবনা যথার্থভাবে যাচাই করার জো নেই, সুতরাং ফায়লাসুফরা মানুষের সাধ্যের অতীত ও অনুভূতি দিয়ে যাচাই অযোগ্য জ্ঞান আহরণের প্রয়াস পেয়ে অযুক্তি ও অদার্শনিক সুলভ আচরণ করেছে।

কিন্তু সত্যের প্রকৃত অনুসন্ধানীকে কী অবস্থায় ফেলেছিল তা? ঈশ্বরে গভীর অটুট বিশ্বাস কী অসম্ভব? সত্যানুসন্ধানের চাপ আল-গাযযালির উপর এমন হতাশার সৃষ্টি করেছিল যে সাময়িক বৈকল্য ঘটেছিল তাঁর। হতাশার বিপর্যয়কর অনুভূতির চাপে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দিশাহারা বোধ করেছেন তিনি। অবশেষে ১০৯৪ সালে আবিষ্কার করেছেন যে, তিনি কথা বলতে বা লেকচার দিতে পারছেন নাঃ

AMARBOI.COM

ঈশ্বর আমার জিভ সংকুচিত করে দিলেন, আমি আর নির্দেশনা দিতে পারছিলাম না। তাই একটা নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষা দান করার জন্য নিজের ওপর জোর খাটালাম যাতে আমার অসংখ্য ছাত্র উপকৃত হতে পারে, কিন্তু আমার জিভ একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি।[12]

বিষণ্ণতার শিকারে পরিণত হলেন তিনি। চিকিৎসকরা সত্যি সত্যি তাঁর মনের গভীরে এক গভীর বিরোধ শনাক্ত করলেন, তাঁকে বললেন সুপ্ত উদ্বেগ হতে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিশ্বাস ফিরে পেতে ব্যর্থ হলে নরক বাসের শাস্তির আশঙ্কায় আল-গাযযালি সম্মানজনক শিক্ষকতার পদ ছেড়ে সুফীদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে যান।

এখানেই যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন তিনি। যুক্তি বিসর্জন না দিয়ে—সুফীবাদের চরম রূপকে বরাবরই আবিশ্বাস করেছেন তিনি—গাযযালি আবিষ্কার করলেন, অতিন্দ্রীয় অনুশীলন এক ধরনের সরাসরি কিন্তু সহজাত বোধ সৃষ্টি করে যাকে 'ঈশ্বর' বলা যেতে পারে। বৃটিশ পণ্ডিত জন বাউকার দেখিয়েছেন, অস্তিত্বের আরবী শব্দ *উজ্যুদ* এসেছে মূল *ওয়াজাদা* হতে: 'সে পেয়েছে'।[13] সুতরাং, আক্ষরিক অর্থে *উজ্যুদ*-এর মানে 'যা পাওয়া সম্ভব': এটা গ্রিক মেটাফিজিক্যাল পরিভাষার চেয়ে অনেক সংহত ও মুসলিমদের আরও বেশি অবকাশ দেয়। যখন কোনও আরবীভাষী দার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়ার প্রয়াস পান তখন আরও এক জিনিসের মাঝে ঈশ্বরকে আরেকটা বস্তু হিসাবে তুলে ধরার প্রয়োজন হয় না। তাঁকে পাওয়া সম্ভব প্রমাণ করতে পারলেই হয়। ঈশ্বরের *উজ্যুদের* চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে—বা যাবে না—মৃত্যুর পরে বিশ্বাসী যখন ঐশী সত্তার মুখোমুখি হবে তখন, কিন্তু পয়গম্বর ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের মতো লোক যাঁরা ইহজীবনেই এই অভিজ্ঞতা আর্জনের দাবি করেছেন তাঁদের সেই দাবি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সুফীরা অবশ্যই ঈশ্বরের *উজুদের* অভিজ্ঞতা লাভের দাবি করেছে: *ওয়াজদ* শব্দটি ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ভাববাদী উপলব্ধির প্রকাশের প্রায়োগিক শব্দ বা ঈশ্বর যে বাস্তব, কষ্ট-কল্পনা নয় তার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা—*ইয়াকিন*—দান করেছে। স্বীকার্য, তাদের দাবিতে এইসব সংবাদ ভুল বোঝা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সুফীদের সংসর্গে দশ বছর কাটানোর পর আল-গাযযালি আবিষ্কার করেন, মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার অতীতে অবস্থানকারী কোনও সত্তাকে যাচাই করার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। ঈশ্বর সম্পর্কে সুফীদের জ্ঞান যৌক্তিক বা মেটাফিজিক্যাল জ্ঞান নয়, বরং অতীতের পয়গম্বরদের সহজাত অভিজ্ঞতার অনেক কাছাকাছি: এভাবে সুফীরা ইসলামের মূল বোধের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে নিজেরাই এর অত্যাবশ্যক সত্যের সন্ধান *পেয়েছিল।*

AMARBOI.COM

সুতরাং, আল-গাযযালি এমন এক অতিন্দ্রীয়বাদী বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিলেন যা রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে; পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব রাষ্ট্রযন্ত্র সাধারণভাবে ইসলামে অতিন্দ্রীয়বাদীদের তীর্যক দৃষ্টিতে দেখেছে। ইবন সিনার মতো আল-গাযযালিও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য জাগতিক জীবনের অতীত এক আদি আদর্শ জগতে বিশ্বাসের শরাণাপন্ন হয়েছিলেন। দৃশ্যমান জগৎ (*আলম-আল শাহাদাহ*) হচ্ছে তাঁর ভাষায় প্লেটোনিক বুদ্ধিমত্তার জগৎ *আলম-আল* মালাকুত এর নিম্নস্তরের অনুকৃতি, যেকোনও ফায়লাসুফই যেমন মেনে নেয়। কোরান ও ইহুদি-ক্রিশ্চানদের বাইবেল এই আধ্যাত্মিক জগতের কথাই বলেছে। মানুষ বাস্তবতার উভয় জগতেই অবস্থান করে: সে ইহজগতের পাশাপাশি আত্মার জগতেও বাস করে, কারণ ঈশ্বর ঐশী রূপ মানুষের মাঝে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। আল-গাযযালি তাঁর অতিন্দ্রীয়বাদ বিষয়ক নিবন্ধ *মিশকাত আল-আনওয়ার*-এ সুরা নূরের ব্যাখ্যা করেছেন আগের অধ্যায়ে যেটা উদ্ধৃত করেছি।[14] এইসব পঙক্তিতে উল্লিখিত আলো বা জ্যোতি ঈশ্বর ও অন্যান্য আলোদানকারী বস্তু: প্রদীপ, নক্ষত্রমালা, দুটোর কথাই বলে। আমাদের যুক্তিও আলো দানকারী। এটা কেবল আমাদের অন্যান্য বস্তুকে চিনতেই সক্ষম করে তোলে না, বরং ঈশ্বরের মতো স্থান ও কাল অতিক্রম করে যেতে পারে। সুতরাং এটা আধ্যাত্মিক জগতের একই বাস্তবতার অংশ। কিন্তু 'যুক্তি' দিয়ে স্পষ্ট করার জন্যে কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, বিশ্লেষণী ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করেননি তিনি। আল-গাযযালি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ব্যাখ্যাকে আক্ষরিক অর্থে বোঝা যাবে না: আমরা এসব বিষয় কেবল অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় আলোচনা করতে পারি যা সৃজনশীল কল্পনার এখতিয়ার।

অবশ্য কারও কারও এমন ক্ষমতা থাকে যা যুক্তির চেয়ে উচ্চতর। আল-গাযযালি যাকে বলেছেন 'পয়গম্বরসুলভ চেতনা'। যাদের এই গুণের অভাব রয়েছে তারা কেবল অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি বলেই এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা উচিত হবে না। এটা সুর-কালা কারও সঙ্গীতকে বিভ্রান্তি দাবি করার মতোই অবাস্তব ব্যাপার হবে—সঙ্গীত উপভোগ করতে পারছে না বলেই সে এমন কথা বলছে। আমরা আমাদের যুক্তি প্রয়োগ ও কল্পনাশক্তি দিয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারি, কিন্তু পয়গম্বর বা অতিন্দ্রীয়বাদী, যাঁদের ঈশ্বরকে ধারণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে কেবল তাদের পক্ষেই সর্বোচ্চ ধরনের জ্ঞান লাভ সম্ভব। কথাটা উচ্চমার্গীয় শোনাচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম বা প্রথার অতিন্দ্রীয়বাদীরা দাবি করেছে যে জেন বা বৌদ্ধদের ধ্যানের মতো অনুশীলনে প্রয়োজনীয় সহজাত গ্রহণ ক্ষমতা বিশেষ গুণ, যা কাব্য রচনার বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে তুলনীয়। সবার এই অতিন্দ্রীয় প্রতিভা থাকে না। এই

অতিন্দ্রীয় জ্ঞানকে আল-গাযযালি ঈশ্বর একাই অস্তিত্বমান বা তাঁর সত্তা থাকার চেতনাবোধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর পরিণাম আত্মবোধ তিরোহিত হয়ে ঈশ্বরের বিলীন হয়ে যাওয়া। অতিন্দ্রীয়বাদীরা রূপক বিশ্বের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম, অপেক্ষাকৃত স্বল্পগুণ সম্পন্ন মরণশীলদের সন্তুষ্ট করতে হয় একে; তারা

> বিশ্বে ঈশ্বর ছাড়া যে আর কোনও সত্তা নেই সেটা দেখতে সক্ষম হন, এবং দেখেন একমাত্র তাঁর মুখাবয়ব ছাড়া (কোরান ২৮: ৮৮) অন্য সবকিছু আবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে...প্রকৃতপক্ষে তিনি ছাড়া আর সবকিছুই খাঁটি সত্তাবিহীন এবং [প্লেটোনিক প্রকল্পের] প্রথম বুদ্ধিমত্তা হতে প্রাপ্ত সত্তার দিক হতে বিবেচনা করলে স্রষ্টার (Maker) মুখবয়বের প্রেক্ষিতে ছাড়া এর কোনও সত্তা নেই; সুতরাং একমাত্র যে জিনিসটি সত্য তা হচ্ছে ঈশ্বরের মুখাবয়ব।[১৫]

বাহ্যিক বস্তুগত সত্তার পরিবর্তে কেবল যুক্তি দিয়ে অস্তিত্ব প্রমাণযোগ্য ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বব্যাপী বাস্তবতা এবং চূড়ান্ত অস্তিত্ব যাঁকে এর ওপর নির্ভরশীল ও অস্তিত্ব গ্রহণকারী অন্যান্য বস্তুকে আমরা যেভাবে দেখি বা অনুভব করি সেভাবে অনুভব করা যাবে না: দেখার এক বিশেষ ভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে আমাদের।

শেষে আবার বাগদাদে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছিলেন আল-গাযযালি, কিন্তু এই বিশ্বাস কখনও হারাননি যে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কখনওই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আল-গাযযালি তাঁর আত্মজৈবনিক প্রবন্ধ *আল-মুনাদি মিন আল-দালাল* (দ্য ডেলিভারেন্স ফ্রম এরার)-এ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বিশ্বাস হারানোর বিপদোন্মুখ কাউকে রক্ষা করার উপযোগী কিছু ফালসাফাহ্ বা কালামে নেই। স্বয়ং তিনি সংশয়বাদের *(সাফসাফা)* কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন, যখন উপলব্ধি করেছেন সন্দেহাতীতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব। যে সত্তাকে আমরা 'ঈশ্বর' বলে ডাকি তাঁর অবস্থান বোধশক্তি ও যৌক্তিক চিন্তার বাইরে, সুতরাং বিজ্ঞান বা মেটাফিজিক্স-এর পক্ষে আল্লাহর *উজ্যুদ* প্রমাণ বা নাকচ কোনওটাই সম্ভব নয়। যাদের বিশেষ অতিন্দ্রীয়বাদী বা পয়গম্বরসুলভ গুণ নেই তাদের জন্যে আল-গাযযালি দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে সচেতনাবোধ গড়ে তুলতে মুসলিমদের সক্ষম করে তুলতে এক অনুশীলনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন। ইসলামে এক অমোচনীয় প্রভাব রেখে গেছেন তিনি। মুসলিমরা আর কখনওই ঈশ্বরকে অন্য কোনও সত্তার মতো মনে করতে যাবে না, যাঁর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হতে পারে। এর

AMARBOI.COM

পর থেকে মুসলিম দর্শন আধ্যাত্মিকতার এবং ঈশ্বরের অতিন্দ্রীয় আলোচনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে।

ইহুদিবাদেও প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন তিনি। স্প্যানিশ দার্শনিক জোসেফ ইবন সাদিক (মৃত্যু. ১১৪৩) ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক ইবন সিনার প্রমাণ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে, ঈশ্বর স্রেফ আর একটা সত্তা নন–আমাদের স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধির জগতে 'বিরাজিত' এক বস্তু নন। আমরা ঈশ্বরকে বোঝার দাবি করলে তার মানে দাঁড়াবে তাঁকে সীমিত ও অপূর্ণ বোঝানো। ঈশ্বর সম্পর্কে সবচেয়ে সঠিক যে বিবৃতি আমরা দিতে পারি সেটা হচ্ছে তিনি উপলব্ধির অতীত, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। আমরা জগতে ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক অর্থে কথা বলতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের সত্তা *আল-ধাত* সম্পর্কে নয়, যা সবসময় আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যাবে। টলেমিয় চিকিৎসক জুদাহ্ হালেভি (১০৮৫-১১৪১) আল-গাযযালিকে গভীরভাবে অনুসরণ করেছেন। যৌক্তিকভাবে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যাবে না; তার মানে এই নয় যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন অযৌক্তিক, আসল কথা তাঁর অস্তিত্বের যৌক্তিক উপস্থাপনের ধর্মীয় কোনও মূল্য নেই। এ থেকে অতি সামান্যই জানতে পারব আমরা: এমন একজন দূরবর্তী ও নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর কীভাবে এমন অসম্পূর্ণ বস্তুজগৎ সৃষ্টি করতে পারেন বা এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর অর্থবোধক কোনও সম্পর্ক আছে কিনা সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করার কোনও উপায় নেই। দার্শনিকরা যখন যুক্তি প্রয়োগ করে মহাবিশ্বকে পরিচালনাকারী ঐশী বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একীভূত হবার দাবি করেছেন তখন তাঁরা আসলে নিজেদেরই বিভ্রান্ত করেছেন। একমাত্র পয়গম্বরদেরই ঈশ্বর সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান বা ধারণা ছিল, যাদের সঙ্গে ফালসাফাহ্‌র কোনওই সম্পর্ক ছিল না।

আল-গাযযালির মতো দর্শন বুঝতে পারেননি হালেভি, কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানই নির্ভরযোগ্য। আল-গাযযালির মতো তিনিও এক বিশেষ ধরনের ধর্মীয় জ্ঞানের দাবি করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে কেবল ইহুদির অধিকারভুক্ত দাবি করেছেন। তবে প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে *গোয়িমরা* ঈশ্বর জ্ঞানের নিকটবর্তী হতে পারে বলে তিনি একে নমনীয় করার চেষ্টা চালিয়েছেন; কিন্তু তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক রচনার *দ্য কুযারি-র* উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতির মাঝে ইসরায়েলের অনন্যতা প্রতিষ্ঠা করা। তালমুদের র‍্যাবাইদের মতো হালেভি বিশ্বাস করতেন *মিতযভোত*-এর সযত্ন অনুসরণের মাধ্যমে যেকোনও ইহুদির পক্ষেই পয়গম্বরসুলভ চেতনা অর্জন সম্ভব। যে ঈশ্বরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটবে তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে অস্তিত্ব উপস্থাপনযোগ্য কোনও বস্তুগত বিষয় নন, বরং

AMARBOI.COM

আবশ্যিকভাবে এক মানসিক অভিজ্ঞতা। তাঁকে এমনকি ইহুদির 'স্বাভাবিক' সত্তার বর্ধিতরূপ হিসাবেও দেখা যেতে পারে:

> যেমন বলা হয়েছে, স্বর্গীয় সত্য সেই ব্যক্তির জন্যে অপেক্ষা করে যাদের সংস্পর্শে তা আসে এবং যার সঙ্গে নিজেকে সে সংযুক্ত করে, যেন সে ঐ ব্যক্তির ঈশ্বরে পরিণত হতে পারে, পয়গম্বর ও সাধুদের বেলায় যেমনটা ঘটেছে এটা ঠিক আত্মার মতো ভ্রূণে প্রবেশ করার অপেক্ষায় থাকে, যতক্ষণ না শেষোক্তটির প্রাণশক্তি সত্তার এই উচ্চতর রূপকে গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠার জন্যে পর্যাপ্তভাবে পরিপূর্ণ হয়। এটা ঠিক অপেক্ষমান প্রকৃতির মতো, যা এমন এক তাপমাত্রা ও জলবায়ুর অপেক্ষায় থাকে যাতে সে মাটির ওপর প্রয়াস চালিয়ে গাছপালার জন্ম দিতে পারে।[১৬]

সুতরাং ঈশ্বর অজ্ঞাত, অনুপ্রবেশকারী কোনও সত্তা নন, আর ইহুদিও ঐশীজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন কোনও সত্তা নয়। ঈশ্বরকে–আবারও– মানবতার পূর্ণতা, পুরুষ বা নারীর সম্ভাবনার পরিপূরণ হিস্যাবে দেখা যেতে পারে; এছাড়াও, তাঁর অভিজ্ঞতার 'ঈশ্বর' একান্তই তার নিজস্ব; এ ধারণাটি পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করব। হালেভি স্বয়ং ঈশ্বরের সত্তা ও ইহুদিরা যে ঈশ্বরকে অনুভব করতে সক্ষম তার মাঝে পার্থক্য করার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। পয়গম্বর ও সাধুগণ যখন 'ঈশ্বর' কে প্রত্যক্ষ করার দাবি করেছেন, তখন তিনি স্বয়ং যেমন ঠিক সেভাবে তাঁকে জানতে পারেননি তাঁরা, কেবল তাঁর ঐশী ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই তাঁকে চিনেছেন যাকে অনেকটা দুর্জ্ঞেয় অগম্য সত্তার আলোকচ্ছটা বলা যেতে পারে।

AMARBOI.COM

আল-গাযযালির যুক্তির ভারে ফালসাফাহ অবশ্য পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়নি। কর্দোবার বিশিষ্ট মুসলিম দার্শনিক আবার এর পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এটা ছিল ধর্মের সর্বোচ্চ রূপ। ইউরোপে আভেরস নামে পরিচিত আবু আল-ওয়ালিদ ইবন আহমাদ ইবন রূশদ (১১২৬-১১৯৮) পশ্চিমে ইহুদি ও ক্রিশ্চান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই বিশেষজ্ঞে পরিণত হয়েছিলেন। ত্রায়োদশ শতাব্দীতে তাঁর রচনাবলী হিব্রু ও লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং অ্যারিস্টটলের ওপর তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মায়মোনিদস, আকুইনাস ও আলবার্ট দ্য গ্রেটের মতো ধর্মতাত্ত্বিকদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর্নেস্ট রেনান মুক্তচিন্তাবিদ এবং অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদের প্রতীক হিসাবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইসলামি জগতে অবশ্য আবু রূশদ অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক চরিত্র ছিলেন। তার জীবদ্দশায় ও মরণোত্তর প্রভাবের প্রেক্ষিতে আমরা ঈশ্বরের

ধারণার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভক্তি দেখতে পাই। ফালাসাফাহ্‌র বিরুদ্ধে আল-গাযযালির নিন্দা ও নিগূঢ় বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনার জোরাল বিরোধিতা করেছেন আবু রূশদ। পূর্বসুরি আল-ফারাবি ও ইবন সিনার বিপরীতে তিনি ছিলেন একজন কাজী, শরীয়াহ্ আইনের জুরিস্ট আর দার্শনিকও। উলেমা*রা* আগাগোড়া ফালসাফাহ্ ও তাদের ভিন্নতর ঈশ্বরের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু ইবন রূশদ অধিকতর প্রথাগত ইসলামী ধর্মানুরাগের সঙ্গে অ্যারিস্টটলকে মেলাতে সক্ষম হন। তিনি ভেবেছিলেন, ধর্ম ও যুক্তিবাদের ভেতর কোনও বিরোধ নেই। দুটো ভিন্নভাবে একই সত্য প্রকাশ করে; একই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। সবাই অবশ্য দার্শনিক চিন্তার ক্ষমতা রাখে না, সুতরাং ফালসাফাহ্ ছিল কেবল বুদ্ধি বা মেধার দিক দিয়ে উচ্চতরদের জন্যে। এটা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, তাতে ভুলের শিকার হয়ে পরজীবনে উদ্ধার প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে। এখানেই এসব নিগূঢ় বিশ্বাসের গুরুত্ব যা এগুলোকে বিপজ্জনক মতবাদ গ্রহণে অক্ষমের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এটা ছিল সুফীবাদ ও ইসমায়েলিদের *বাতিনি* গবেষণার মতোই। অযোগ্য কেউ এসব মানসিক অনুশীলনের প্রয়াস পেলে সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে মনোবৈকল্যের শিকার হতে পারে। কালামও একই রকম বিপজ্জনক ছিল। এটা প্রকৃত ফালসাফাহ্ না হওয়ায় মানুষকে এমন ভ্রান্ত ধারণা দিয়েছে যে, তারা বুঝি যৌক্তিক আলোচনায় নিয়োজিত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না। পরিণতিতে এটা কেবল অর্থহীন তাত্ত্বিক-বিরোধের জন্ম দিয়েছে, যা অশিক্ষিত মানুষের বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়ে তাদের উদ্বেগেই নিক্ষেপ করতে পারে।

AMARBOI.COM

ইবন রূশদ বিশ্বাস করতেন, বিশেষ কিছু সত্যকে মেনে নেওয়া নিষ্কৃতি লাভের জন্যে আবশ্যক–ইসলামি বিশ্বের এক চমৎকার ধারণা। ফায়সাসুফরা মতবাদের ক্ষেত্রে প্রধান কর্তৃত্বের অধিকারী: কেবল তারাই ছিল ঐশীগ্রন্থ ব্যাখ্যায় সক্ষম ও এবং কোরানে বর্ণিত 'গভীর রোধসম্পন্ন'[১৭] ব্যক্তি। বাকি সবার উচিত হবে কোরানকে প্রাপ্ত রূপে গ্রহণ করা এবং আক্ষরিক অর্থে পাঠ করা। কিন্তু ফায়লাসুফরা প্রতীকী ব্যাখ্যার প্রয়াস পেতে পারে। কিন্তু এমনকি ফায়লাসুফদেরও অবশ্য পালনীয় 'বিশ্বাস' (Creed) মানতে হবে, ইবন রূশদ যার তালিকা দিয়েছেন এভাবে:

১. বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস।
২. ঈশ্বরের একত্ব।
৩. সমগ্র কোরানে ঈশ্বরকে প্রদত্ত জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা, জ্ঞান, দেখা এবং বলার যেসব গুনের কথা উল্লেখ আছে।

৪. ঈশ্বরের অনন্যতা এবং তুলনাহীনতায় বিশ্বাস, কোরান ৪২: ৯-এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে: 'তার মতো আর কিছুই নেই।'
৫. ঈশ্বরই কর্তৃক বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি।
৬. পয়গম্বরত্বের বৈধতা।
৭. ঈশ্বরের ন্যায় বিচার।
৮. শেষ বিচারের দিনে পুনরুত্থান।[১৮]

কোরান যেহেতু এ বিষয়ে একেবারেই দ্ব্যর্থহীন, সুতরাং ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাগুলো *অক্ষরে অক্ষরে* মেনে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ফালসাফাহ্ সব সময় বিশ্ব সৃষ্টির বিশ্বাস মেনে নেয়নি, সুতরাং এটা পরিষ্কার নয় যে কোরানের এ ধরনের মতবাদ কীভাবে বোঝা যেতে পারে। যদিও কোরান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে যে, ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি *কীভাবে* তা করেছেন বা বিশেষ কোন মুহূর্তে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা তা বলছে না। এতে করে ফায়লাসুফদের পক্ষে যুক্তিবাদীদের বিশ্বাস গ্রহণের অবকাশ সৃষ্টি হয়। আবার, কোরান বলছে যে, ঈশ্বরের জ্ঞানের মতো গুণাবলী রয়েছে, কিন্তু আমরা এর অর্থ সঠিকভাবে জানি না, কারণ জ্ঞান সম্পর্কিত আমাদের ধারণা অতি-অবশ্য মানবীয় এবং অপূর্ণ। সুতরাং কোরান যখন বলে যে আমরা যা জানি তার সবই জানেন ঈশ্বর, তখন আবশ্যিকভাবে তা দার্শনিকদের বিরোধিতা করে না।

ইসলামি বিশ্বে অতিন্দ্রীয়বাদের গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে ইবন রুশদের সম্পূর্ণ যৌক্তিক ধর্মতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। ইসলামে ইবন রুশদ সম্মানিত হলেও গৌণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যে যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন তিনি, যে জগৎ তাঁরই মাধ্যমে অ্যারিস্টটলকে আবিষ্কার করে এবং ঈশ্বর সম্পর্ক অধিকতর যৌক্তিক ধারণা গড়ে তোলে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা ছিল। তাঁরা ইবন রুশদ পরবর্তী সময়ের দার্শনিক অগ্রগতি সম্পর্কে অজ্ঞই ছিলেন; এ কারণেই প্রায়শঃ মনে করা হয় যে, ইবন রুশদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামি দর্শনেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে ইবন রুশদের জীবৎকালেই দুজন বিশিষ্ট ইসলামি দার্শনিক ইরাক ও ইরানে তাঁদের সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত ছিলেন যাঁরা ইসলামি বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করবেন। ইয়াহিয়া সুহরাওয়ার্দি এবং মুঈদ-আদ-দিন ইবন আল-আরাবী দুজনই ইবন রুশদের বদলে ইবন সিনার পথ অনুসরণ করেন এবং দর্শনকে অতিন্দ্রীয় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে একীভূত করার প্রয়াস পান। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাদের অবদান পর্যালোচনা করব।



AMARBOI.COM

ইবন রুশদ-এর মহান অনুসারী ইহুদি সম্প্রদায়ের মহান তালমুদ বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক র‍্যাবাই মোজেস ইবন মায়মন (১১৩৫-১২০৪) –সাধারণভাবে ইনি মায়মোনিদস নামে পরিচিত। ইবন রুশদের মতো মায়মোনিদসও মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্দোবার নাগরিক ছিলেন। এখানে ঈশ্বরের গভীর অনুভূতি লাভের জন্যে এক ধরনের দর্শনের প্রয়োজন বলে ক্রমবর্ধমান ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আলমোরাভিয় ধর্মান্ধ বারবার গোষ্ঠী ইহুদিদের ওপর তীব্র নির্যাতন চালানোর সময় তিনি স্পেন থেকে পালাতে বাধ্য হন। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার সঙ্গে দুঃখজনক বিরোধ বা সংঘর্ষ মায়মোনিদসকে পুরোপুরি ইসলামের প্রতি বৈরী করে তোলেনি। অভিভাবকদের সঙ্গে মিশরে স্থায়ী হন তিনি, সেখানে তিনি সরকারী উচ্চ পদমর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন, এমনকি সুলতানের চিকিৎসকের দায়িত্বও পালন করেছেন। এখানে বিখ্যাত নিবন্ধ *দ্য গাইড ফর দ্য পারপ্লেক্সড* রচনা করেন তিনি, যেখানে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইহুদি ধর্মবিশ্বাস কোনও খেয়ালিপূর্ণ মতাবাদের মিশেল নয়, বরং সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইবন রুশদের মতো মায়মোনিদসের বিশ্বাস ছিল, ফালসাফাহ্ ধর্মীয় জ্ঞানের সবচেয়ে অগ্রসর রূপ ও ঈশ্বরকে লাভ করার রাজকীয় পথ, যা অবশ্যই সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া ঠিক হবে না, বরং দার্শনিক অভিজাত শ্রেণীর জন্যে তুলে রাখতে হবে। অবশ্য ইবন রুশদের বিপরীতে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ মানুষকেও প্রতীকী উপায়ে ঐশীগ্রন্থ ব্যাখ্যা করার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যাতে তাঁরা ঈশ্বরকে মানবীয় রূপে কল্পনা করে না বসে। নিস্তার লাভের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তায়ও বিশ্বাস ছিল তাঁর। তেরটি ধারার এক ক্রীড প্রকাশ করেছিলেন তিনি যা আশ্চর্যজনকভাবে ইবন রুশদের সমরূপ:

১. ঈশ্বরের অস্তিত্ব।
২. ঈশ্বরের একত্ব।
৩. ঈশ্বরের নিরাকারত্ব।
৪. ঈশ্বরের অনন্ততা।
৫. প্রতিমা উপাসনায় নিষেধাজ্ঞা।
৬. পয়গম্বরত্বের বৈধতায় বিশ্বাস।
৭. মোজেস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর।
৮. সত্যের ঐশী উৎস।
৯. তোরাহ্‌র চিরন্তন বৈধতা।
১০. ঈশ্বর মানুষের সব কাজের খবর রাখেন।

AMARBOI.COM

১১. তিনি সেগুলোর সঠিক বিচার করেন।

১২. তিনি একজন মেসায়াহ্ প্রেরণ করবেন।

১৩. মৃতের পুনরুত্থান।[১৯]

ইহুদিবাদে এটা ছিল নতুন সংযোজন; কখনওই তা পুরোপুরিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। ইসলামের মতো অর্থডক্সির ধারণা (অর্থপ্র্যাক্সির বিপরীতে) ইহুদি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ছিল অচেনা। ইবন রুশদ ও মায়মোনিদসের ক্রীড বোঝায় যে, ধর্ম উপলব্ধি করার যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ডগম্যাটিজম এবং 'বিশ্বাস'-এর সঙ্গে 'সঠিক আস্থা'-কে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতার জন্ম দেয়।

কিন্তু তারপরেও মায়মোনিদস ঈশ্বর যে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উপলব্ধির অতীত ও মানবীয় যুক্তির অগম্য, একথা সযত্নে ধারণ করে গেছেন। অ্যারিস্টটল ও ইবন সিনার যুক্তির সাহায্য নিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন, তিনি, কিন্তু জোর দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর তাঁর পরম সারল্যের কারণে অনির্বচনীয় ও বর্ণনার অতীত রয়ে যান। স্বয়ং পয়গম্বরগণ রূপকের ব্যবহার করেছেন এবং আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে কেবল প্রতীক নির্ভর, পরোক্ষ ভাষাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ বা বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি যে, ঈশ্বরকে অস্তিত্বমান কোনও বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সুতরাং আমরা যখন তাঁকে বর্ণনা করার প্রয়াস পাই তখন নেতিবাচক পরিভাষা ব্যবহার করাই শ্রেয়। 'তিনি আছেন' না বলে আমাদের উচিত তাঁর অন-অস্তিত্ব অস্বীকার করা, ইত্যাদি। ইসমায়েলিদের মতো নেতিবাচক ভাষার ব্যবহার একটা অনুশীলন যা ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি বাড়িয়ে দেবে, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমরা সামান্য মানুষ তাঁকে যতটা বুঝতে পারি তিনি তাঁর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা এমনকি ঈশ্বরকে 'ভালো'ও বলতে পারি না, কারণ 'ভালোত্ব' দিয়ে আমরা যা বোঝাতে পারি তিনি তাঁর চেয়ে উন্নত। এভাবে আমরা আমাদের ঘাটতিসমূহ হতে ঈশ্বরকে বাদ দিতে পারি, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর ওপর স্থাপন হতে নিজেদের বিরত রাখতে পারি। সেটা আমাদের নিজস্ব ভাবমূর্তি ও অনুরূপ ঈশ্বর গড়ে তুলবে। আমরা অবশ্য ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু ইতিবাচক ধারণা গড়ে তোলার জন্যে VIA NAGATIVA ব্যবহার করতে পারি। এভাবে আমরা যখন বলব যে ঈশ্বর 'অক্ষম-নন' (তিনি শক্তিমান না বলে), তখন যৌক্তিকভাবেই বোঝা যাবে ঈশ্বর অবশ্যই কোনও কাজে সক্ষম। যেহেতু ঈশ্বর 'অসম্পূর্ণ নন,' সুতরাং তাঁর কর্মধারা নিখুঁত হতে বাধ্য। আমরা যখন বলি যে, ঈশ্বর 'অজ্ঞ নন' (তিনি প্রাজ্ঞ বোঝাতে), তখন ধরে নিতে পারব

AMARBOI.COM

যে, তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রাজ্ঞ ও সম্পূর্ণ জ্ঞাত। এসব সিদ্ধান্ত কেবল ঈশ্বরের কর্ম সম্পর্কেই গ্রহণ করা যাবে, আমাদের বুদ্ধির অতীত সত্তা সম্পর্কে নয়।

বাইবেলের ঈশ্বর ও দার্শনিকদের ঈশ্বরের মাঝে পছন্দের প্রশ্নে মাইমোনিদস বরাবর প্রথমটিকে বেছে নিয়েছেন। যদিও শূন্য হতে সৃষ্টির তত্ত্ব দার্শনিকভাবে অর্থডক্স নয় এবং মায়মোনিদস প্রচলিত বাইবেলিয় মতবাদই আঁকড়ে থেকেছেন এবং উৎসারণের দার্শনিক ধারণা বাদ দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি ছিল, শূন্য হতে সৃষ্টি কিংবা উৎসারণের মতবাদের কোনওটিই কেবল যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না। আবার, পয়গম্বরত্বকে তিনি দর্শনের ওপরে স্থান দিয়েছেন। পয়গম্বর ও দার্শনিকগণ একই ঈশ্বরের কথা বলেছেন, কিন্তু পয়গম্বর অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনাশক্তির দিক থেকে উন্নত ছিলেন। ঈশ্বর সম্পর্কে খেয়ালি যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর সরাসরি ও সহজাত জ্ঞান ছিল তাঁর। মায়মোনিদস স্বয়ং যেন এক ধরনের অতিন্দ্রীয়বাদী ছিলেন। এ ধরনের সহজাত ঈশ্বরবোধের সঙ্গে গা-কাঁপানো উত্তেজনার কথা বলেছেন তিনি, এক ধরনের আবেগ যা 'কল্পনা-শক্তির পরিপূর্ণতা লাভের পরিণতি।'[২০] যুক্তিবাদের ওপর গুরুত্ব দান সত্ত্বেও মায়মোনিদস বিশ্বাস করতেন, কেবল বুদ্ধি দিয়ে অর্জিত ঈশ্বরজ্ঞানের চেয়ে কল্পনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ঈশ্বরের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

দক্ষিণ ফ্রান্স ও স্পেনের ইহুদিদের মাঝে তাঁর ধারণাসমূহ ছড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনা নাগাদ এ অঞ্চলে ইহুদিদের মাঝে দার্শনিক আলোকনের মতো সাড়া পড়ে যায়। এইসব ইহুদি ফায়লাসুফদের কেউ কেউ মায়মোনিদসের চেয়েও বেশি যুক্তিবাদী ছিল। এভাবে দক্ষিণ ফ্রান্সের বাগনলসবাসী লেভাই বেন গারশম (১২৮৮-১৩৪৪) ঈশ্বরের জাগতিক বিষয়ের জ্ঞান থাকার কথা অস্বীকার গেছেন। তাঁর ঈশ্বর ছিলেন দার্শনিকদের ঈশ্বর, বাইবেলের ঈশ্বর নন। অনিবার্যভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা যেমন দেখব, কোনও কোনও ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে কাব্বালাহ নামে এক নিগূঢ় অনুশীলন সূচিত করেছিল। অন্যরা বিপদের সময় সমবেদনা মেলে না দেখে ফায়লাসুফদের দূরবর্তী ঈশ্বরের দর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে পুনর্দখলের খৃস্টিয় যুদ্ধগুলোর ফলে স্পেনে ইসলামের সীমান্ত সংকুচিত হতে শুরু করে এবং পশ্চিম-ইউরোপের অ্যান্টি-সেমিটিজম পেনিনসুলায় নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এর ফলে স্প্যানিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের বিনাশ ঘটে ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহুদিরা ফালাসাফাহ্ ছেড়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তির বদলে মিথলজি অনুপ্রাণিত ঈশ্বর সম্পর্কিত সম্পূর্ণ নতুন এক ধারণা গড়ে তোলে।

AMARBOI.COM

পশ্চিমের খৃস্ট-সাম্রাজ্যের ক্রুসেডিয় ধর্ম একে অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ১০৯৬-৯৯ সময়কালে সংঘটিত প্রথম ক্রুসেড ছিল নতুন পশ্চিমের প্রথম সম্মিলিত প্রয়াস, ইউরোপের অন্ধকার যুগ হিসাবে পরিচিত বর্বরতার দীর্ঘ পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত ছিল এটা। উত্তর ইউরোপের ক্রিশ্চান জাতিগুলোর সমর্থনপুষ্ট নয়া রোম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ফিরে আসার জন্যে লড়ছিল। কিন্তু অ্যাংলো স্যাক্সন ও ফ্রাঙ্কদের খৃস্ট ধর্ম ছিল অবিকশিত। আগ্রাসী ও যোদ্ধা জাতি ছিল বলে আগ্রাসী ধর্মের আকাঙ্ক্ষা করেছিল তারা। একাদশ শতাব্দীতে অ্যাবি অভ ক্লুনির বেনেডিক্টাইন মঙ্করা ও এর অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সামরিক চেতনা গির্জায় সীমিত রাখার এবং তীর্থযাত্রার মতো ভক্তিমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত ক্রিশ্চান মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। প্রথম ক্রুসেডার বাহিনী তাদের নিকট-প্রাচ্য অভিযানকে পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রা হিসাবেই দেখেছিল, কিন্তু তখনও তাদের ঈশ্বর ও ধর্ম বিষয়ে ধারণা ছিল খুবই আদিম পর্যায়ের। সেইন্ট জর্জ, সেইন্ট মারকারি ও সেইন্ট দেমিত্রিয়াসের মতো সৈনিক-সাধুরা তাদের ধর্মাচরণে ঈশ্বরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন; বাস্তব ক্ষেত্রে পৌত্তলিক দেবতাদের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য ছিল না তাঁদের। জেসাসকে মানবরূপী লোগোসের চেয়ে বরং ক্রুসেডারদের সামন্ত প্রভু হিসাবেই দেখা হয়েছে: পৈত্রিক সম্পত্তি–পবিত্র ভূমি–শয়তানদের কবল হতে উদ্ধার করার জন্যে নাইটদের তলব করেছেন তিনি। অভিযান শুরু করার পর ক্রুসেডারদের কেউ কেউ রাইন উপত্যকাবাসী ইহুদিদের নির্বিচারে হত্যা করে জেসাসের মৃত্যুর বদলা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ক্রুসেডের আহ্বান জানানোর সময় পোপ দ্বিতীয় আরবানের মূল পরিকল্পনায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ৩,০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেক ইহুদির কাছেই বিসদৃশ ঠেকেছে, বিশেষ করে মুসলিমদের সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানা ছিল না তাদের; সেখানে যে জাতির লোকেরা–কিংবা ওরা যেমন ভেবেছিল–ক্রাইস্টকে হত্যা করেছে তারা যেখানে বাড়ির কাছেই আছে। জেরুজালেমমুখী দীর্ঘ কষ্টকর যাত্রায় ক্রুসেডাররা যখন একবার অল্পের জন্যে একেবারে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল, নিজেদের অলৌকিক উদ্ধার প্রাপ্তিকে তারা ঈশ্বরের মনোনীত জাতির প্রতি ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ নিরাপত্তার ফল ধরে নিয়েছিল। প্রাচীন কালের ইসরায়েলিদের যেভাবে পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, ঠিক সেভাবে ওদেরও সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে, তাদের ঈশ্বর কিন্তু তখনও বাইবেলের প্রথম দিকের পুস্তকে বর্ণিত আদিম গোত্রীয় উপাস্যই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১০৯৯ সালের গ্রীষ্মে জেরুজালেম অধিকার করার পর ওরা জোশুয়ার উন্মাদনা নিয়ে নগরীর ইহুদি

AMARBOI.COM

ও মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর হামলে পড়ে এবং এমন নিষ্ঠুর নৃশংসতার সঙ্গে হত্যালীলা চালায় যা দেখে এমনকি তাদের সমসাময়িকেরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এরপর থেকে ইউরোপিয় ক্রিশ্চানরা ইহুদি ও মুসলিমদের ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ ধরে নেয়: বাইয়ান্তিয়ামের গ্রিক অর্থডক্স ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন গভীর বৈরী মনোভাব পোষণ করেছিল তারা; যারা ওদের বর্বর আর তুচ্ছ মনে করেছিল।[২১] ব্যাপারটা আগাগোড়া এরকম ছিল না। নবম শতাব্দীতে পশ্চিমের অধিকতর শিক্ষিত ক্রিশ্চানরা গ্রিক ধর্মতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। এভাবে কেলটিক দার্শনিক দানস্ স্কতাস এরিজেনা (৮১০-৮৭৭) পশ্চিম ফ্রাংকদের রাজা চার্লস দ্য বোল্ডের দরবারে কাজ করার জন্যে স্বদেশ আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, পশ্চিমের ক্রিশ্চানদের জন্যে লাতিন ভাষায় গ্রিক ফাদারস অভ দ্য চার্চের বিশেষ করে ডেনিস দ্য আরোপাগাইতের রচনাবলীসহ বহু রচনা অনুবাদ করেছিলেন। এরিজেনা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বাস ও যুক্তি পরস্পর বিরোধী নয়। ইহুদি ও মুসলিম ফায়লাসুফদের মতো দর্শনকে তিনি ঈশ্বর লাভের রাজকীয় পথ হিসাবে দেখেছেন। যারা ক্রিশ্চান ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাবি করেছে, তাদের গুরু ছিলেন অ্যারিস্টটল ও প্লেটো। ঐশীগ্রন্থ ও ফাদারদের রচনাবলী যৌক্তিক অনুসন্ধানের অনুশীলনের মাধ্যমে আলোকিত করে তোলা যেতে পারে, কিন্তু তার মানে আক্ষরিক ব্যাখ্যা ছিল না: ঐশীগ্রন্থের কিছু কিছু অনুচ্ছেদ প্রতীকী উপায়ে ব্যাখ্যা করতেই হবে। কারণ, এরিজেনা তাঁর *এক্সপোজিশন অভ ডেনিস'স সেলেস্টিয়াল হায়ারারকি*-তে ব্যাখ্যা করেছেন, ধর্মতত্ত্ব 'এক ধরনের কবিতা।'[২২]

AMARBOI.COM

ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনায় এরিজেনা ডেনিসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, কেবল প্যারাডক্সের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা আমাদের মানবীয় উপলব্ধির সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঈশ্বর সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় মনোভাবই বৈধ। ঈশ্বর উপলব্ধির অতীত: এমনকি দেবদূতরাও তাঁর আবশ্যকীয় প্রকৃতি জানে না বা বোঝে না: কিন্তু 'ঈশ্বর প্রাজ্ঞ,' ধরনের ইতিবাচক মন্তব্য গ্রহণযোগ্য, কারণ আমরা শব্দটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সময় আমাদের জানা থাকে যে এর প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছি। একটা নেতিবাচক মন্তব্য, যেমন 'ঈশ্বর প্রাজ্ঞ *নন*,' করে আমরা এ বিষয়টি নিজেদের স্মরণ করিয়ে দিই। এই বৈপরীত্য ঈশ্বর আলোচনায় আমাদের ডেনিসের তৃতীয় পথের দিকে *ঠেলে* দেয়, আমরা উপসংহারে পৌঁছাই: 'ঈশ্বর প্রাজ্ঞেয় চেয়ে *বেশি* কিছু।' একেই গ্রিকরা বলেছে অ্যাপোফ্যাটিক মন্তব্য, কারণ 'প্রাজ্ঞের চেয়ে বেশি কিছু' দিয়ে কী বোঝায়

আমরা বুঝি না। এটা কেবল কথার খেলা নয়, বরং এক ধরনের অনুশীলন যা পরস্পর বিরোধী দুটো বিবৃতিকে পাশাপাশি স্থাপন করে আমাদের 'ঈশ্বর' শব্দের উপস্থাপিত রহস্য অনুভব করার উপযোগি করে তোলে, কেননা তুচ্ছ মানবীয় বোধ দিয়ে একে কখনও সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

এরেজিনা এ পদ্ধতিটি 'ঈশ্বর আছেন' বিবৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে স্বভাবতই সিদ্ধান্তে (Synthesis) পৌছেছেন: 'ঈশ্বর অস্তিত্বের চেয়েও বেশি কিছু।' ডেনিস যেমন উল্লেখ করেছেন, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মতো বিরাজ করেন না ও সেসবের পাশাপাশি অবস্থিত স্রেফ আরেকটা বস্তুও নন। এটা আবার দুর্বোধ্য বক্তব্য, কারণ, এরেজিনা মন্তব্য করছেন 'সত্তার'র চেয়ে বেশি কিছুটা কী এখানে সেটা প্রকাশ পায় না; কারণ এখানে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর আর সব বস্তুর মতো নন, বরং বস্তুসমূহের চেয়ে বেশি কিছু, কিন্তু এই 'কিছু'টা কী, এখানে তার কোনও সংজ্ঞা নেই।[২৩] প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর 'কিছু না'। এরিজেনা জানতেন কথাটা হতবুদ্ধিকর, তাই পাঠকদের আতঙ্কিত না হতে বলেছেন। ঈশ্বর কোনও বস্তু নন বোঝানোই ছিল তাঁর পদ্ধতির উদ্দেশ্য, আমরা যেভাবে বুঝি তিনি সেভাবে কোনও 'সত্তা' ধারণ করেন না। ঈশ্বর তিনি, 'যিনি সত্তার অতিরিক্ত' (*aliquo modo superesse*)।[২৪] তাঁর অস্তিত্বের ধরণ আমাদের অস্তিত্বের ধরণের চেয়ে আলাদা, যেমন আমাদের ধরণ পশুদের চেয়ে ভিন্ন আর পশুর ধরণ পাথরের চেয়ে আলাদা। কিন্তু ঈশ্বর 'কিছু না', হলে তিনি আবার 'সবকিছু'ও। কারণ এই 'অতি-অস্তিত্ব' বোঝায় যে কেবল ঈশ্বরেরই প্রকৃত সত্তা আছে; তিনি এর সমস্ত কিছুর মূল সত্তা। সুতরাং, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি প্রাণীই এক একটি থিওফ্যানি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিদর্শন। এরিজেনার কেলটিক ধর্মানুরাগ-সেইন্ট প্যাট্রিকের বিখ্যাত প্রার্থনায় অঙ্গীভূত: 'ঈশ্বর যেন আমার মস্তিষ্ক ও উপলব্ধিতে থাকেন'–তাঁকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপীতার ওপর জোর দেওয়ার দিকে নিয়ে গেছে। নিওপ্লেটোনিক প্রকল্পে গোটা সৃষ্টির ধারক মানুষ হচ্ছে এইসব থিওফ্যানির সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ নমুনা, এবং সেইন্ট অগাস্তিনের মতো এরিজেনাও শিক্ষা দিয়েছেন, কিছুটা অস্বচ্ছভাবে হলেও আমরা নিজেদের মাঝেই ট্রিনিটি আবিষ্কার করতে পারি।

এরিজেনার বৈপরীত্যমূলক ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বর একাধারে সবকিছু এবং কিছু না; দুটো সংজ্ঞা পস্পরকে ভারসাম্য দেয় ও আমাদের 'ঈশ্বর' শব্দটি প্রতীকায়িত করতে পারে এমন রহস্য বোঝাতে এক সৃজনশীল চাপ সৃষ্টি করে। এভাবে জনৈক ছাত্র যখন জানতে চেয়েছিল যে ঈশ্বরকে 'কিছু না' ডাকেন বলে ড্যানিস কী বুঝিয়েছেন, এরিজেনা জবাব দিয়েছিলেন যে, ঐশীসত্তা উপলব্ধির অতীত, কারণ এটা 'অতি আবশ্যক'-অর্থাৎ স্বয়ং ভালোত্বের চেয়েও বেশি–এবং 'অতিপ্রাকৃত'।

AMARBOI.COM

> সুতরাং যখন এটা নিজেকে নিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হয় [এটা] নেই, ছিল না, থাকবেও না, কারণ একে অস্তিত্বমান কোনও জিনিস ধরে নেওয়া যাবে না, কারণ এটা সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়; কিন্তু যখন নির্দিষ্ট অনির্বচনীয়ভাবে কোনও বস্তুতে অবতীর্ণ হয়, তখন মানসচক্ষে ধরা পড়ে, কেবল এটাই সকল বস্তুতে দেখা যায় এবং এটা থাকে, ছিল ও থাকবে।[২৫]

সুতরাং আমরা যখন ঐশীসত্তাকেই বিবেচনা করি, 'একে অযৌক্তিকভাবে "কিছু না" বলা হয় না,' কিন্তু যখন এই ঐশী শূন্যতা 'কিছু না হতে কিছুতে' অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, এর অনুপ্রাণিত প্রত্যেকটা জিনিসকে 'থিওফ্যানি, অর্থাৎ স্বর্গীয় আবির্ভাব বলা যেতে পারে।'[২৬] ঈশ্বর স্বয়ং যেমন আমরা যেভাবে তাঁকে দেখতে পাব না, কেননা এই ঈশ্বর কার্যত অস্তিত্বহীন। আমরা কেবল সেই ঈশ্বরকে দেখি যিনি সৃষ্ট জগতকে সঞ্চালন করেন এবং ফুল, পাখি, গাছ-পালা ও অন্যান্য মানবরূপে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা আছে। অশুভ সম্পর্কে কী বলা যাবে? হিন্দুরা যেমন বলে থাকে, এটাও কি জগতে ঈশ্বরেরই ভিন্ন প্রকাশ? এরিজেনা যথেষ্ট বিশদভাবে অশুভের সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাননি, তবে পরবর্তীকালে ইহুদি কাব্বালিস্টরা ঈশ্বরের মাঝেই অশুভকে আবিষ্কার করার প্রয়াস পাবেঃ তারা ঈশ্বরের কিছু না হতে কিছু হবার প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্যে এমন এক ধর্মতত্ত্বের অবতারণা করেছিল যা লক্ষণীয়ভাবে এরিজেনার বর্ণনার অনুরূপ, যদিও কাব্বালিস্টদের কেউ তাঁর রচনা পাঠ করেছিল—এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ।

এরিজেনা দেখিয়েছেন, গ্রিকদের কাছ থেকে লাতিনদের শেখার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু ১০৫৪ সালে এক বিরোধের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চার্চের সম্পর্কচ্যুতি ঘটে, যা পরে স্থায়ী রূপ নেয়—যদিও তখন এমন উদ্দেশ্য ছিল না কারওই। বিরোধের একটা রাজনৈতিক দিক ছিল, যা আমি আলোচনা করব না, তবে ট্রিনিটি সক্রান্ত বিরোধও এর মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। ৭৯৬ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের ফ্রেইসে পাশ্চাত্য বিশপদের এক সিনদ অনুষ্ঠিত হয়; এ সম্মেলনে নাইসিন ক্রিডে নতুন একটি ধারা যোগ করা হয়েছিল। এ ধারায় বলা হয়, পবিত্র আত্মা কেবল পিতা নয়, পুত্র (*filioque*) হতেও অগ্রসর হয়েছিলেন। লাতিন বিশপদের কেউ কেউ আরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হওয়ায় পিতা ও পুত্রকে সমমর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন আত্মা পিতা ও পুত্র উভয়ের নিকট হতে আবির্ভূত হয়ে থাকলে তাঁদের সমমর্যাদা নিশ্চিত হবে। অচিরেই পশ্চিমের সম্রাটে পরিণত হতে চলা শার্লামেইন ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়াদি খুব একটা না বুঝলেও এই নতুন ধারা

AMARBOI.COM

অনুমোদন করেন। গ্রিকরা অবশ্য এর নিন্দা জানিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও লাতিনরা অনড় থাকে ও তাদের *নিজস্ব* ফাদাররা এই শিক্ষাই দিয়েছেন বলে দাবি করে। এভাবে সেইন্ট অগাস্তিন পবিত্র আত্মাকে ট্রিনিটির মূল শর্ত হিসাবে দেখেছেন, তবে তাঁকে পিতা ও পুত্রের মাঝে ভালোবাসা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এটা বলা যায়, আত্মা উভয়ের কাছ থেকেই এসেছে। নতুন ধারাটি তিনটি ব্যক্তিত্বের অত্যাবশ্যক অখণ্ডতার উপর জোর দিয়েছে।

কিন্তু গ্রিকরা বরাবর অগাস্তিনের ত্রিত্ববাদী ধর্মতত্ত্বকে অবিশ্বাস করে আসছিল, কারণ এটা বড় বেশি মানবরূপী। পাশ্চাত্যে যেখানে ঈশ্বরের একত্বের ধারণা দিয়ে শুরু করে পরে সেই একত্বের সঙ্গে তিনটি ব্যক্তিত্ব বিবেচনা করে করেছিল, গ্রিকরা সেখানে সবসময় তিন *hypostases* দিয়ে শুরু করার পর ঈশ্বরের একত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেছে, তাঁর সত্তা আমাদের নাগালের বাইরে। লাতিনরা ট্রিনিটিকে বড্ড বেশি বোধগম্য করে ফেলেছে বলে ভেবেছিল তারা আর এও সন্দেহ করেছিল যে এইসব ত্রিত্ববাদী ধ্যান-ধারণাকে পর্যাপ্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করার যোগ্যতা লাতিন ভাষার নেই। গ্রিকরা যুক্তি দেখিয়েছে, *Filioque* ধারা ঈশ্বরের অত্যাবশ্যক দুর্বোধ্যতার দিকে নজর না দিয়ে তিন ব্যক্তির ওপর বেশি জোর দিয়েছে। নতুন সংযোজন ট্রিনিটিকে বড় বেশি যৌক্তিক রূপ দিয়ে ফেলেছে। ঈশ্বরকে এটা তিন বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট বা অবস্থানের একটি সত্তায় পরিণত করেছে। প্রকৃতপক্ষে লাতিন ধারণায় ধর্মবিরোধী কিছু ছিল না, যদিও তা গ্রিকদের অ্যাপোফ্যাটিক আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে খাপ খায়নি। শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা থাকলে এই বিরোধের অবসান ঘটানো যেতো, কিন্তু বিশেষ করে ১২০৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেডাররা বাইযান্তাইন রাজধানী কন্সতান্তিনোপলের অবসান ঘটিয়ে গ্রিক সাম্রাজ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলে ক্রুসেডসমূহের সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। *Filioque* ভাঙন আসলে গ্রিক ও লাতিনদের ঈশ্বর সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা গড়ে তোলার ব্যাপারটি উন্মোচিত করেছিল। ট্রিনিটি যেভাবে গ্রিকদের কাছে আধ্যাত্মিকতার মৌল বিষয়ে রয়ে গিয়েছিল, পশ্চিমের ক্রিশ্চানদের কাছে তা কখনওই ছিল না। গ্রিকরা মনে করেছিল, এভাবে ঈশ্বরের একত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে পশ্চিমারা স্বয়ং ঈশ্বরকে এমন এক 'তুচ্ছ সত্তার' সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছে যা দার্শনিকদের ঈশ্বরের মতো সংজ্ঞায়িত ও আলোচনার বিষয় হতে পারে।[২৭] পরবর্তী অধ্যায়গুলোয় আমরা দেখব, পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চানরা ট্রিনিটি মতবাদ নিয়ে বরাবর অস্বস্তি বোধ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকনের সময় অনেকেই এ মতবাদ সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে। কার্যতঃ বহু পাশ্চাত্য ক্রিশ্চান মোটেই ত্রিত্ববাদী নয়। তারা বলে থাকে



AMARBOI.COM

একজন ঈশ্বরের মাঝে তিন ব্যক্তির মতবাদ বোধের অতীত, এটা বোঝেনি যে, গ্রিকদের কাছে এটাই ছিল মোদ্দা কথা।

বিরোধের পর গ্রিক ও লাতিনরা ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করে। গ্রিক অর্থডক্সিতে ঈশ্বর সম্পর্কিত গবেষণা *থিওলোজিয়া* ঠিক এরকমই রয়ে যায়। ট্রিনিটি ও অবতারবাদের অত্যাবশ্যকীয় অতিন্দ্রীয় মতবাদের মাঝে ঈশ্বর সম্পর্কিত সকল ভাবনা সীমিত হয়ে পড়ে। তারা 'থিওলজি অভ গ্রেস' বা 'থিওলজি অভ দ্য ফ্যামিলি'র পরস্পর বিরোধী ধারণা আবিষ্কার করে: আসলে তারা গৌণ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় ও সংজ্ঞায়িতকরণে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। পশ্চিম অবশ্য এই সমস্ত প্রশ্ন বোঝার জন্যে ক্রমশঃ উৎসাহী হয়ে উঠেছিল; সবার জন্যে প্রযোজ্য একটা সঠিত সত্য খুঁজে বের করার প্রয়াস পাচ্ছিল। যেমন, সংস্কার খৃস্টিয় জগতকে আরও বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছিল, কারণ ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টরা *কীভাবে* নিষ্কৃতি সম্ভব হয়েছিল এবং ইউক্যারিস্ট *আসলে* কী ছিল এ বিষয়ে একমত হতে পারেনি। পাশ্চাত্য ক্রিশ্চনরা বারবার এসব প্রশ্নে মতামত দেবার জন্যে চ্যালেঞ্জ করলেও গ্রিকরা এগিয়ে আসেনি আর জবাব দিলেও তাদের উত্তর জোড়াতালি দেওয়া মনে হয়েছে। আবশ্যিকভাবে যুক্তি এবং ধারণার অতীত একজন ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনার উপায় হিসাবে জুৎসই নয় বোঝার পর যুক্তিবাদের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল তারা। সেক্যুলার গবেষণায় মেটাফিজিক্স গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু এটা ধর্মবিশ্বাসকে বিপদাপন্ন করতে পারে বলে ক্রমবর্ধমান হারে ধারণা করেছিল গ্রিকরা। এটা বাকসর্বস্ব মনের ব্যস্ত অংশের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে, অথচ *থিওরিয়া* কোনও বুদ্ধিবৃত্তিক মতামত নয়, বরং ঈশ্বর সকাশে এক নীরব অনুশীলন, যাকে কেবল ধর্মীয় ও অতিন্দ্রীয় অনুভূতি দিয়েই জানা যেতে পারে। ১০৮২ সালে দর্শনের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ ও সৃষ্টির নিওপ্লেটোনিক ধারণা প্রকাশের অপরাধে দার্শনিক ও মানবতাবদী জন ইতালোসকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। দর্শন হতে এই স্বতঃপ্রণোদিত প্রত্যাহারের ঘটনাটা ঘটেছিল বাগদাদে আল-গাযযালির অসুস্থ হয়ে কালাম ছেড়ে সুফী হবার অল্প কিছুদিন আগে।

সুতরাং, এটা নিয়তির পরিহাস ও দুঃখজনক যে পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা এমন একটা সময় ফালসাফাহ্‌র দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল যখন গ্রিক ও মুসলিমরা এর ওপর আস্থা হারাচ্ছিল। অন্ধকার যুগে লাতিন ভাষায় প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনাবলী সুলভ ছিল না, সুতরাং অনিবার্যভাবে পশ্চিম পেছনে পড়ে গিয়েছিল। দর্শনের আবিষ্কার ছিল অনুপ্রেরণাদায়ী উত্তেজনাকর। একাদশ শতাব্দীর ধর্মতাত্ত্বিক অ্যানসেল্‌ম অভ ক্যান্টারবারি, আতারবাদ সম্পর্কে যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, যেন মনে করতেন যে

AMARBOI.COM

কোনও কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব। তার ঈশ্বর 'কিছু না' হলেও সকল সত্তার সর্বোত্তম ছিলেন। এমনকি আবিশ্বাসীও এক সর্বোচ্চ সত্তার ধারণা গঠন করতে পারে, যা 'একক প্রকৃতি, সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম, অনন্ত স্বর্গবাসে নিজেই সম্পূর্ণ।'[২৮] কিন্তু তিনি এও জোর দিয়ে বলেছেন যে, একমাত্র বিশ্বাস দিয়েই ঈশ্বরকে জানা যেতে পার। যেমন মনে হয় আসলে এটা তেমন স্ববিরোধী কথা নয়। অ্যানসেল্ম তাঁর বিখ্যাত প্রার্থনায় ইসায়াহ্‌র 'যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে বুঝবে না' এ কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করেছেন :

> আমি আমার হৃদয়ের বিশ্বাস ও ভালোবাসায় তোমার সত্যের খানিকটা পরিচয় উপলব্ধি করতে চাইছি। কারণ বিশ্বাস করার জন্যে বুঝতে চাই না আমি, বরং আমার বিশ্বাস আছে বোঝার *(Credo ut intellegam)*। কারণ আমি এও বিশ্বাস করি: আমার বিশ্বাস না থাকলে বুঝব না।[২৯]

প্রায়শঃ উচ্চারিত *credo ut intellegam* বুদ্ধিবৃত্তি বিসর্জন নয়। ভবিষ্যতে কোনও এক সময় অর্থ বোঝা যাবে, এ আশায় অন্ধের মতো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার দাবি করেননি আনসেল্ম। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঘোষণা এভাবে অনূদিত হওয়া উচিত: 'হয়তো বুঝতে পারব জেনে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি।' এই পর্যায়ে *credo* শব্দটির তখনও বর্তমানের 'বিশ্বাস' (*belief*) শব্দটির বুদ্ধিবৃত্তিক ঝোঁক ছিল না, তবে এক ধরনের আস্থা ও আনুগত্যের মনোভাব প্রকাশ করত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রাথমিক জোয়ারের সময়ও ঈশ্বরের ধর্মীয় অনুভূতিই মুখ্য রয়ে গিয়েছিল।

AMARBOI.COM

তা সত্ত্বেও, মুসলিম ও ইহুদি ফায়লাসুফদের মতো আনসেল্ম বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে; তিনি নিজস্ব প্রমাণও হাজির করেছিলেন যাকে সাধারণত 'অন্টোলজিক্যাল' যুক্তি বলা হয়। আনসেল্ম ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবে, 'এমন কিছু যার চেয়ে মহান কিছু কল্পনা করা যায় না' (*aliquid quo nihil maius cogitari possit*)।'[৩০] এখানে ঈশ্বরকে চিন্তার বিষয়বস্তু হিসাবে দেখার অবকাশ থাকায় এটাই বোঝায় যে, মানুষের মনের পক্ষে তাঁকে ধারণ ও অনুধাবন সম্ভব! আনসেল্ম যুক্তি দেখিয়েছেন, এই 'এমন কিছু'র অস্তিত্ব থাকতে বাধ্য। যেহেতু অস্তিত্ব অস্তিত্বহীনতার চেয়ে অনেক বেশি 'নিখুঁত' বা সম্পূর্ণ, সেহেতু আমাদের কল্পনার সম্পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব থাকতেই হবে নইলে তা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আনসেল্মের প্রমাণ প্লেটোনিক ধ্যান-ধারণার অনুসারীদের মাঝে অসাধারণ এবং কার্যকর, যেখানে চিরকালীন আদি আদর্শের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করাই ধারণার উদ্দেশ্য বলে বিশ্বাস করা হতো। এর পক্ষে আজকের সংশয়বাদীকে

সন্তুষ্ট করার সম্ভাবনা নেই বলা যায়। ব্রিটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ জন ম্যাককারি যেমন বলেছেন, 'আপনার কাছে ১০০ ডলার আছে ভাবতে পারেন, কিন্তু দুঃখজনক হলো তাতে টাকাটা বাস্তবে আপনার পকেটে আসবে না।'[৩১]

সুতরাং আনল্মোসের ঈশ্বর ছিলেন 'সত্তা,' ডেনিস ও এরিজেনা বর্ণিত 'কিছু না' নন। অতীতের যে কোনও ফায়লাসুফের তুলানায় আনসেল্ম অনেক বেশি ইতিবাচক ভাষায় ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি *Via Negativa* অনুশীলনের প্রস্তাব করেননি, বরং সম্ভবত স্বাভাবিক যুক্তি দিয়েই ঈশ্বর সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা সম্ভব বলে ভেবেছিলেন। পশ্চিমের ধর্মতত্ত্বের ঠিক এ জিনিসটাই গ্রিকদের সবসময় দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। আপন সন্তুষ্টি মোতাবেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পর আনল্মেস অবতারবাদ ও ট্রিনিটির মতবাদসমূহ প্রমাণে মনোযোগি হন। গ্রিকরা সবসময় যেগুলোকে জোর দিয়ে যুক্তি ও ধারণাগুলোর অতীত দাবি করেছে। *হোয়াই গড বিকেম ম্যান* শীর্ষক নিবন্ধে, চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যার আলোচনা করেছি, তিনি প্রত্যাদেশের চেয়ে যুক্তি ও যৌক্তিক চিন্তার ওপর বেশি নির্ভর করেছেন—আমরা দেখেছি, তাঁর দেওয়া বাইবেল ও ফাদারদের উদ্ধৃতিগুলোকে যুক্তির ধারার প্রেক্ষিতে পুরো প্রাসঙ্গিক মনে হয়, যা ঈশ্বরে মানবীয় অনুপ্রেরণা যোগ করেছে। যৌক্তিক ভিত্তিতে ঈশ্বরের রহস্য ব্যাখ্যার প্রয়াস একা আনসেল্মই নেননি। তাঁর সমসাময়িক প্যারিসের ক্যারিশম্যাটিক দার্শনিক পিটার আবেলার্দ (১০৭৯-১১৪৭) ট্রিনিটির একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন যেখানে 'তিন ব্যক্তি'র পার্থক্য সৃষ্টি করে স্বর্গীয় একত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের রহস্যেরও একটা বিশেষ এবং আবেগময় যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি: আমাদের মাঝে সমবেদনা জাগিয়ে তোলার জন্যে ক্রাইস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে; এভাবেই তিনি পরিণত হয়েছেন ত্রাণকর্তায়।

আবেলার্দ অবশ্য প্রধানত দার্শনিক ছিলেন। তাঁর ধর্মতত্ত্ব মোটামুটিভাবে গতানুগতিক। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি, প্রচুর অনুসারী পেয়েছিলেন। এতে করে বারগান্ডির ক্যারিশমাটি অ্যাবট বার্নার্ড সিস্টেরসিয়ান অ্যাবি অভ ক্লেয়ারভার সঙ্গে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়। তিনি তখন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে কথিত ছিলেন। পোপ দ্বিতীয় ইউজিন এবং ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুইস দুজনই ছিলেন বার্নার্ডের পকেটে; তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা ইউরোপে সন্ত বিপ্লবের সূচনা করেছিল: অগুনতি ক্রিশ্চান যুবা সিস্টারসিয়ান মতবাদে দীক্ষা নিতে ঘরবাড়ি ছেড়ে তাঁর দলে যোগ দিয়েছে। সিস্টারসিয়ান মতবাদ পুরোনো বেনেডিক্টাইন ধর্মীয় জীবন আচারের ক্লুনিয়াক ধরনের সংস্কার চেয়েছিলেন। ১১৪৬ সালে বার্নার্ড দ্বিতীয় ক্রুসেডের প্রচারণা শুরু করলে ফ্রান্স

AMARBOI.COM

ও জার্মানীর জনগণ–এর আগে পর্যন্ত যারা অভিযান সম্পর্কে কিছুটা বৈরিভাবাপন্ন ছিল–বলতে গেলে প্রবল উৎসাহে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার যোগাড় করেছিল, এমন বিপুল সংখ্যায় সেনা দলে যোগ দিতে ভিড় করেছিল যে শেষ পর্যন্ত বার্নার্ড আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে পোপকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, গোটা দেশ জনশূন্য বলে মনে হচ্ছে। বুদ্ধিমান ছিলেন বার্নার্ড, বলা যায় পশ্চিম ইউরোপের বাহ্যিক ধর্মপরায়ণতাকে এক নতুন অভ্যন্তরীণ মাত্রা দান করেছিলেন তিনি। সিস্টেরসিয়ান ধর্মানুরাগ হলি গ্রেইলের কিংবদন্তীকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়–এখানে এক কাল্পনিক শহরে যাত্রার বিবরণ রয়েছে যা এই পৃথিবীর কোনও স্থান নয় বরং ঈশ্বরের দর্শনকেই তুলে ধরে। বার্নার্ড অবশ্য আন্তরিকভাবে আবেলার্দের মতো পণ্ডিতদের বুদ্ধিমত্তাকে অবিশ্বাস করতেন; তিনি তাঁর মুখ বন্ধ করার শপথ নিয়েছিলেন। আবেলার্দের বিরুদ্ধে, 'মানবীয় যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যাবে বলে তিনি ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাসের মূল্যকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রয়াস পাওয়ার'[৩২] অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। সেইন্ট পলের চ্যারিটির হাইমের উল্লেখ করে বার্নার্ড দাবি করেছেন যে, দার্শনিকের ক্রিশ্চান ভালোবাসার ঘাটতি রয়েছে: 'কোনও কিছুকেই তাঁর হেয়ালি মনে হয় না, আর্শীর মতো কিছুই নয়, বরং সবকিছু সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করেন।'[৩৩] সুতরাং ভালোবাসা ও যুক্তিচর্চা পরস্পর বেমানান। ১১৪১ সালে বার্নার্ড কাউন্সিল অভ সেন্স-এর সামনে হাজির হওয়ার জন্যে আবেলার্দকে তলব করেন। কাউন্সিলের সবাই বার্নার্ডের সমর্থক ছিলেন। এদের কেউ কেউ আবেলার্দের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বাইরে অবস্থান করেছেন। কাজটা খুব কঠিন হয়নি, কারণ ততদিনে আবেলার্দের সম্ভবত পারকিনসনস' ডিসিজ দেখা দিয়েছিল। বার্নার্ড তাঁকে এমন জোরাল ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন যে স্রেফ ভেঙে পড়ে পরের বছরই মারা যান তিনি।

এক প্রতীকী মুহূর্ত ছিল এটা, যা মন এবং হৃদয়ের 'বিচ্ছেদ' সূচিত করেছিল। অগাস্তিনের ত্রিত্ববাদে মন ও হৃদয় ছিল অবিচ্ছেদ্য। ইবন সিনা ও আল গাযযালির মতো মুসলিম ফায়লাসুফগণ হয়তো মনে করেছিলেন যে কেবল বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুজনই এমন এক দর্শনের প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন যা ভালোবাসার আদর্শ ও অতিন্দ্রীয়বাদের অনুশীলনের মিশেল। আমরা দেখব, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বের প্রধান চিন্তাবিদগণ মন ও হৃদয়কে সমন্বিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং দর্শনকে সুফীদের প্রচারিত ভালোবাসা ও কল্পনার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হিসাবে দেখেছেন। অবশ্য বার্নার্ডকে যেন বুদ্ধিমত্তার প্রতি ভীত মনে হয়েছে; তিনি একে মনের অধিকতর

AMARBOI.COM

আবেগময় অনুভূতিপ্রবণ এলাকা হতে আলাদা রাখতে চেয়েছেন। বিপজ্জনক ছিল ব্যাপারটা: এতে আবেগ অনুভূতির সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর বিচ্ছেদ জন্ম নিতে পারে যা যুক্তিবাদের মতোই বিরস একটা ব্যাপার। বার্নার্ড প্রচারিত ক্রুসেড ছিল একটা বিপর্যয়। এর আংশিক কারণ এটা এমন এক আদর্শের উপর নির্ভরশীল ছিল যা কিনা সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে বেমানান এবং এখানে ক্রিশ্চানদের সহমর্মিতার নীতি মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।[৩৪] এভাবে, আবেলার্দের প্রতি বার্নার্ডের আচরণে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে মায়ামমতার ঘাটতি ছিল। ক্রিশ্চানদের প্রতি পাপীদের হত্যা করার মাধ্যমে খৃস্টের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি, তাদের পবিত্র ভূমি হতে উচ্ছেদ করতে বলেছেন। বার্নার্ড ঠিক করেছিলেন, ঈশ্বরের রহস্য ব্যাখ্যায় উদ্যোগি কোনও যুক্তিবাদ ভয়ংকর, এতে ধর্মের আতঙ্ক ও বিস্ময়ের বোধ হালকা হওয়ার ঝুঁকি ছিল; কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টিতে কুসংস্কার যাচাই করার ক্ষেত্রে লাগামহীন বিষয়ানুগতার ব্যর্থতা ধর্মকে অতি নীচে নামিয়ে ফেলতে পারে। আসলে যা প্রয়োজন ছিল, তা হচ্ছে সজাগ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়মুখীতা, 'ভালোবাসা'র আবেগময়তা নয়; যা বুদ্ধিকে প্রবলভাবে দমিত করে ও সমবেদনাকে পরিত্যাগ করে, যার কিনা ঈশ্বরের ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ার কথা।

পশ্চিমের খৃস্টবাদে খুব কম ব্যক্তিই তোমাস আকুইনাসের (১২২৫-৭৪) মতো এত দীর্ঘস্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সেইন্ট অগাস্তিনের মতবাদের সঙ্গে পশ্চিমে সম্প্রতি আগত গ্রিক দর্শনের সংশ্লেষ ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপিয় পণ্ডিতগণ স্পেনে ভিড় জমিয়েছিলেন, এখানে মুসলিম পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন তাঁরা। মুসলিম ও ইহুদি বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় এই মেধা-সম্পদকে পশ্চিমে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক অনুবাদ প্রকল্পে হাত দেন তাঁরা। প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং প্রাচীন বিশ্বের অন্যান্য দার্শনিকদের আরবী ভাষায় প্রাপ্য অনুবাদ এবার লাতিনে অনূদিত হয়ে প্রথমবারের মতো উত্তর ইউরোপের জনগণের নাগালের মধ্যে চলে আসে। অনুবাদকগণ ইবন রূশদ ও সাম্প্রতিক মুসলিম পণ্ডিতদের রচনাবলীসহ অপরাপর আরব বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের আবিষ্কার তাঁদের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। একই সময়ে কিছু ইউরোপিয় ক্রিশ্চান নিকট প্রাচ্যে যখন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল, তখন স্পেনের মুসলিমরা পশ্চিমকে আপন সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করছিল। তোমাস আকুইনাসের *সাম্মা থিওলজিয়া* ছিল নতুন দর্শনকে পশ্চিমের ক্রিশ্চান ধর্মের সঙ্গে সমন্বিত করার প্রয়াস। আকুইনাস বিশেষভাবে ইবন রূশদের অ্যারিস্টটলের প্রয়োগে অভিভূত হয়েছিলেন। তথাপি আনসেল্ম ও আবেলার্দের বিপরীতে তিনি

AMARBOI.COM

ট্রিনিটি রহস্যগুলো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করেননি। তিনি সযত্নে ঈশ্বরের অনির্বচনীয়তা ও তাঁর সম্পর্কিত মানবীয় মতবাদসমূহের মাঝে পার্থক্য টেনেছেন। ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ যে মানব মনের অগম্য, ডেনিসের এ ধারণার সঙ্গে তিনি একমত প্রকাশ করেছেন: 'সুতরাং শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষ যা জানে সেটা হলো সে তাঁকে চেনে না এটা জানা, কেননা সে জানে ঈশ্বর আমরা তাঁর সম্পর্কে যতটা বুঝতে পারি তাকে ছাপিয়ে যান।'[৩৫] একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, *সাম্মার* শেষ বাক্যের তিনি শ্রুতিলেখার সময় আকুইনাস বিষণ্ণতার সঙ্গে হাতের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রুতিলেখক যখন ব্যাপার কী জানতে চাইল, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তিনি যা কিছু দেখেছেন তার তুলনায় শ্রুতিলেখকের লিখিত অংশটি খড়কুটো মাত্র।

নতুন দর্শনের প্রেক্ষাপটে নিজের ধর্মীয় অনুভূতিকে স্থাপন করার আকুইনাসের প্রয়াস অন্যান্য বাস্তবতার সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিল, একে নিজস্ব বলয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পর্যবসিত করা নয়। বুদ্ধিবৃত্তির অতিপ্রয়োগ ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু ঈশ্বরকে যদি আমাদের নিজস্ব অহমবোধের ইচ্ছা পূরণের প্রকাশ হতে না হয়, তাহলে ধর্মীয় অনুভূতিকে অবশ্যই এর বিষয়বস্তুর সঠিক মূল্য নির্ধারণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে। আকুইনাস মোজেসকে দেওয়া স্বয়ং ঈশ্বরের সংজ্ঞার শরণাপন্ন হয়ে ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন: 'আমি যা আমি তাই।' অ্যারিস্টটল বলেছিলেন ঈশ্বর 'প্রয়োজনীয় সত্তা'; আকুইনাস যথারীতি দার্শনিকদের ঈশ্বরের সঙ্গে বাইবেলের ঈশ্বরকে 'তিনি যিনি আছেন' বলে সম্পর্কিত করেছিলেন। তিনি অবশ্য এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর আমাদের মতো স্রেফ আরেকটি সত্তা নন। স্বয়ং সত্তা হিসাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞা যথাযথ, 'কারণ এটা (সত্তার) কোনও নিশেষ ধরণকে তুলে ধরে না, বরং স্বয়ং সত্তাকেই বোঝায় (*esse seipsum*)।'[৩৬] পরবর্তীকালে পশ্চিমে গড়ে ওঠা ঈশ্বরের যুক্তিভিত্তিক ধারণার জন্যে আকুইনাসকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না।

অবশ্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে আকুইনাস সাধারণ দর্শন হতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে আলোচনা শুরু করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে অন্যান্য দার্শনিক ধ্যান-ধারণা বা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মতো আলোচনা করা যেতে পারে বলে ধারণা দিয়েছেন। এটা বোঝায় যে অন্যান্য জাগতিক বাস্তবতার মতো করেই আমরা ঈশ্বরকে চিনতে পারি। আকুইনাস ঈশ্বরের অস্তিত্বের পাঁচটি 'প্রমাণ' লিপিবদ্ধ করেছেন, যেগুলো পরে ক্যাথলিক বিশ্বে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ও প্রটেস্ট্যান্টরাও এর প্রয়োগ করবে:

AMARBOI.COM

১. প্রাইম মুভারের সপক্ষে অ্যারিস্টটলের যুক্তি।
২. একই ধরনের আরেকটা 'প্রমাণ,' যেখানে বলা হয়েছে সীমাহীন কারণ থাকতে পারে না! একটা সুচনা থাকতে বাধ্য।
৩. ইবন সিনার প্রস্তাবিত অনিশ্চয়তার যুক্তি যেখানে একটা 'প্রয়োজনীয় সত্তা'র অস্তিত্ব দাবি করা হয়েছে।
৪. অ্যারিস্টটলের *ফিলোসফি* হতে যুক্তি, যেখানে বলা হয়েছে এই বিশ্বের ক্রমোন্নত ধারা এক সর্বোত্তম সম্পূর্ণতা বোঝায়।
৫. পরিকল্পনা হতে নেওয়া যুক্তি, যেখানে বলা হয়েছে মহাবিশ্বে আমাদের প্রত্যক্ষ করা নিয়ম আকস্মিক ঘটনাচক্রের ফল হতে পারে না।

আজকের দিনে এসব প্রমাণ ধোপে টেকে না। এমনকি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এগুলো সন্দেহজনক, যেহেতু পরিকল্পনায় যুক্তির ব্যতিক্রম বাদে প্রত্যেকটা প্রমাণই পরোক্ষে বোঝায় যে 'ঈশ্বর' স্রেফ আর-একটি-সত্তা, অস্তিত্বের ধারায় আরও একটি সংযোগ। তিনি 'সর্বোচ্চ সত্তা', 'প্রয়োজনীয় সত্তা,' 'সবচেয়ে নিখুঁত সত্তা'। এখন এটা ঠিক 'আদি কারণ' বা 'প্রয়োজনীয় সত্তা'র মতো পরিভাষাগুলো বোঝায় যে ঈশ্বর আমাদের চেনা-জানা সত্তাসমূহের মতো হতে পারেন না, বরং এদের অস্তিত্বের ভিত্তি বা শর্ত। নিঃসন্দেহে এটাই আকুইনাসের উদ্দেশ্য ছিল। তা সত্ত্বেও *সাম্মা'র* পাঠকগণ সবসময় এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য টানেননি এবং ঈশ্বর প্রসঙ্গে এমনভাবে আলোচনা করেছেন যেন তিনি সকল সত্তার সর্বোত্তম'। এটা হাস্যকর এবং মহাসত্তাকে আমাদের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত মূর্তিতে পরিণত করতে পারে, সহজেই রূপান্তরিত করতে পারে স্বর্গীয় মহা অহমে। এটা বলা হয়তো ভুল হবে না যে পশ্চিমে অনেকেই ঈশ্বরকে এভাবে একটি 'সত্তা' হিসাবে দেখে।

AMARBOI.COM

ইউরোপে নতুন অ্যারিস্টটলবাদের সঙ্গে ঈশ্বরকে সম্পর্কিত করার প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফায়লাসুফরাও ঈশ্বরের ধারণাকে সমায়ানুগ রাখার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিল যাতে তা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হতে না পারে। প্রত্যেক প্রজন্মে নতুন করে ঈশ্বরের ধারণা ও বোধ গড়ে তুলতে হয়। অবশ্য অধিকাংশ মুসলিমই–বলা যেতে পারে–পায়ের সাহায্যে ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ঈশ্বর পর্যালোচনায় অ্যারিস্টটলের দেওয়ার মতো কিছু ছিল না, যদিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো অন্যান্য বলয়ে তাঁর ব্যাপক উপযোগিতা ছিল। আমরা দেখেছি, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কিত অ্যারিস্টটলের আলোচনাকে তাঁর রচনাবলীর সম্পাদকবৃন্দ *meta ta physica* ('After the Physics') আখ্যা দিয়েছিলেন: তাঁর ঈশ্বর ছিলেন স্রেফ ভৌত বাস্তবতার ধারাবাহিকতা মাত্র, একেবারে ভিন্ন মাত্রার কোনও সত্তা নন। সুতরাং মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যতের

অধিকাংশ ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে দর্শনের সঙ্গে অতিন্দ্রীয়বাদের মিশেল ঘটানো হয়েছে। আমরা যে সত্তাকে 'ঈশ্বর' বলি কেবল যুক্তি দিয়ে তাঁর ধর্মীয় উপলব্ধিতে পৌঁছানো সম্ভব নয়, কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিকে যদি এলোমেলো, অসংযত–বা এমনকি বিপজ্জনক–আবেগে পরিণত না হতে হয়, সমালোচনাসুলভ বুদ্ধিমত্তা এবং দর্শনের চর্চা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হয়।

আকুইনাসের ফরাসি সমসাময়িক বোনাভেঞ্চার (১২১৭-৭৪)-এরও মোটামুটি একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনিও উভয় ক্ষেত্রের উন্নতির সুবিধার লক্ষ্যে দর্শনকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেশানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন। '*দ্য থ্রিফোল্ড ওয়ে*-তে তিনি অগাস্তিনের অনুসরণে সৃষ্টির সর্বত্র 'ট্রিনিটি' প্রত্যক্ষ করেছেন ও তাঁর '*দ্য জার্নি অভ দ্য মাইন্ড টু গড*-এর সূচনা-বিন্দু হিসাবে এই প্রাকৃতিক ত্রিত্ববাদকে গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করতেন যে, কেবল প্রাকৃতিক যুক্তি দিয়েই ট্রিনিটি প্রমাণ করা সম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের ধারণার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অনুভূতির গুরুত্বকে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে জোর দিয়ে যুক্তিভিত্তিক অহংত্বের বিপদ এড়িয়ে গেছেন। তিনি ক্রিশ্চানের জীবনের আদর্শ হিসাবে তাঁর মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রান্সিস অভ অসিসিকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করার মাধ্যমে তাঁর মতো একজন ধর্মবিদ চার্চের মতবাদসমূহের প্রমাণ খুঁজে পেতে পারেন। তুসানের কবি দান্তে আলিগেরি (১২৬৫-১৩২২) দেখেছিলেন যে কোনও একজন সতীর্থ মানব সন্তান দান্তের ক্ষেত্রে ফ্লোরেন্স বিয়েত্রিস পোর্তিনারি ঈশ্বরের— এপিফ্যানি হতে পারে। ঈশ্বর সম্পর্কে এই ব্যক্তিরূপ মনোভাব সেইন্ট অগাস্তিনকে মনে করিয়ে দেয়।

ফ্রান্সিসকে এপিফ্যানি হিসাবে উপস্থাপনের আলোচনায় বোনাভেঞ্চার ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে আনসেল্মের তাত্ত্বিক প্রমাণ ব্যবহার করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, ফ্রান্সিস জীবনে এমন সাফল্য অর্জন করেছেন যাকে মানবীয়র চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়, সুতরাং এই মর্ত্যে বসবাস করেও আমাদের পক্ষে 'যার চেয়ে শ্রেয়তর আর কিছু কল্পনা করা যায় না তাই "শ্রেষ্ঠ" হচ্ছে সেটা দেখা ও বোঝা।'[৩৭] আমরা যে 'শ্রেষ্ঠ'-এর মতো একটা ধারণা করতে পারি সেটাই প্রমাণ করে, এটা অবশ্যই ঈশ্বরে সর্বোত্তম পরিপূর্ণতায় অস্তিত্বমান। প্লেটো ও অগাস্তিনের পরামর্শ মতো নিজেদের মাঝে প্রবেশ করলে আমরা 'আমাদের নিজস্ব অন্তর্জগতে'[৩৮] ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখতে পাব। এই অন্তক্ষেপ আবশ্যক। চার্চের শাস্ত্রাচারে অংশ নেওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একজন ক্রিশ্চানকে আগে নিজের সত্তার গভীরে ডুব দিতে হবে, সেখানে সে 'বুদ্ধিমত্তার উর্ধ্বে এক পরমানন্দের দেখা পাবে' ও আমাদের সীমিত মানবীয় ধারণার অতীত ঈশ্বরের দর্শন পাবে।[৩৯]

বোনাভেঞ্চার ও আকুইনাস উভয়ই ধর্মীয় অনুভূতিকে মুখ্য হিসাবে

AMARBOI.COM

দেখেছেন। তাঁরা ফালসাফাহর ঐতিহ্যে আস্থাশীল ছিলেন, কেননা ইহুদিধর্ম এবং ইসলাম, এ দুই ধর্মেই দার্শনিককে প্রায়শঃই অতিন্দ্রীয়বাদী হাত দেখা গেছে, যাঁরা ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রবলভাবে সচেতন ছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস খাপ খাওয়াতে তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের যৌক্তিক প্রমাণ খাড়া করেছেন, অন্যান্য সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গেও একে যুক্ত করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন না। অনেকেই তাঁদের সাফল্যের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে যথার্থভাবে সজাগও ছিলেন। অবিশ্বাসীদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে এসব প্রমাণ খাড়া করা হয়নি, কেননা তখনও আমাদের আধুনিক অর্থে নাস্তিকের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং এই প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব ধর্মীয় অনুভূতির পূর্বশর্ত ছিল না, বরং ছিল সহগামী: ফায়লাসুফরা এটা মনে করত না যে অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের আগে আপনাকে যৌক্তিকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে, বরং ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। ইহুদি, মুসলিম ও গ্রিক অর্থডক্স জগতে দার্শনিকদের ঈশ্বরকে খুব দ্রুত অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন।

AMARBOI.COM

# ৭.

# অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর

ইহুদিবাদ, খৃস্টধর্ম এবং–কিছুটা সীমিত পরিসরে–ইসলাম, সকল ধর্মই ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা গড়ে তুলেছে; সুতরাং, আমরা একথা ভাবতে পারি যে, এই আদর্শই ধর্মকে সবচেয়ে চমৎকারভাবে তুলে ধরে। ব্যক্তিক ঈশ্বর একেশ্বরবাদীদের ব্যক্তির পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকে মূল্য দিতে এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি অর্জনে সাহায্য করেছে। এভাবে জুদো-ক্রিশ্চান ঐতিহ্য পশ্চিমকে উদারবাদী মানবতাবাদের আদর্শ অর্জনে সাহায্য করেছে, যেটাকে তাঁরা এত গুরুত্ব দেয়। এসব মূল্যবোধ আদিতে একজন ব্যক্তিক ঈশ্বরের মাঝে আরোপ করা হয়েছিল, যিনি মানুষ যা যা করে তার সবই করে থাকেন: তিনি আমাদের মতো ভালোবাসেন, বিচার করেন, শাস্তি দেন, দেখেন, শোনেন, সৃজন করেন ও ধ্বংস করেন। ইয়াহ্ওয়েহ্র শুরু হয়েছিল মানুষের মতো প্রবল পছন্দ-অপছন্দ সম্বলিত ব্যক্তিরূপ উপাস্য হিসাবে। পরে দুর্জ্ঞেয় সত্তার প্রতীকে পরিণত হন তিনি, যাঁর চিন্তা আমাদের চিন্তা ছিল না এবং যাঁর পথ আমাদের পথ থেকে অনেক উর্ধ্বে, যেমন স্বর্গ পৃথিবীর চেয়ে দূরে। ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণা এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দর্শন প্রকাশ করে: কোনও চরম মূল্যবোধ মানুষের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হতে পারে না। এভাবে ব্যক্তিবাদ ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য পর্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ তাঁদের নিজস্ব আবেগ ও কামনা-বাসনা ঈশ্বরে আরোপ করেছিলেন; বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের সর্বোত্তম সত্তায় ভক্তি দেখাতে *অবতার*দের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়েছে। খৃস্টধর্ম একজন ব্যক্তিকে এমনভাবে ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে ধর্মের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন: এটা ইহুদিবাদের সহজাত ব্যক্তিবাদকে চরম পর্যায়ে

AMARBOI.COM

নিয়ে গেছে। এমন হতে পারে যে, এ ধরনের মিশ্রণ ও একাত্ম হওয়ার একটা মাত্রা ছাড়া হয়তো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তারপরেও ব্যক্তিক ঈশ্বর বিরাট দায়ে পরিণত হতে পারেন। আমাদের নিজস্ব কল্পনায় খোদাই করা তুচ্ছ এক মূর্তি আমাদের সীমাদ্ধ চাহিদা, আতঙ্ক ও আকাঙ্ক্ষারও অভিক্ষেপে পরিণত হতে পারেন তিনি। আমরা ধরে নিতে পারি যে আমরা যা ভালোবাসি তিনি তাই ভালোবাসেন এবং আমাদের ঘৃণার বস্তু তাঁরও ঘৃণার বস্তু, সংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠায় বাধ্য করার বদলে সংস্কারের পক্ষে দাঁড় করাতে পারেন। যখন তিনি কোনও দুর্যোগ ঠেকাতে ব্যর্থ হন কিংবা মনে হয় যে বিপদ ঘটানোর ইচ্ছা করছেন, তখন তাঁকে খুবই শীতল ও নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। বিপদ-আপদ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে, এরকম সহজ বিশ্বাস আমাদেরকে মৌলিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বিষয় মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে। ব্যক্তি রূপে ঈশ্বরের লিঙ্গ আছে, এ সত্যটিও তাঁকে সীমাবদ্ধ করে দেয়: এর মানে নারীদের বাদ দিয়ে মানবজাতির অর্ধেকাংশের যৌন পরিচয় পবিত্র রূপ দেওয়া হয়েছে এবং তাতে মানুষের যৌন আচরণে এক ধরনের বিকৃত ও অসম্পূর্ণ ভারসাম্যহীন অবস্থা দেখা দিতে পারে। সুতরাং একজন ব্যক্তিক ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারেন বিপজ্জনক। সীমাবদ্ধতা হতে উদ্ধার করার বদলে 'তিনি' আমাদের সেই সীমাবদ্ধতার মাঝেই আত্মতুষ্টির সঙ্গে রয়ে যেতে উৎসাহ যোগাতে পারেন; আমাদের 'তিনি' নিষ্ঠুর করে তুলতে পারেন, করতে পারেন শীতল, আত্ম-সন্তুষ্ট ও পক্ষপাতদুষ্ট। যে সহমর্মিতার অনুভূতি সকল উন্নত অগ্রসর ধর্মের বৈশিষ্ট্য হওয়ার কথা, আমাদের মাঝে সেটা জাগিয়ে তোলার বদলে 'তিনি' আমাদের বিচার করতে, নিন্দা জানাতে ও এক পাক্ষিক হতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। সুতরাং, এটা মনে হয় যে ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা আমাদের ধর্মীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা পর্যায় হতে পারে মাত্র। বিশ্বের সকল প্রধান ধর্ম যেন এই বিপদকে শনাক্ত করতে পেরেছে এবং মহান সত্তার ব্যক্তিক ধারণার ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছে।

পরিমার্জনার ইতিহাস হিসাবে ও পরবর্তীকালে ইয়াহওয়েহ্‌র গোত্রীয় ও ব্যক্তিক রূপ ত্যাগ করে YHWH হয়ে ওঠার কাহিনী হিসাবেও ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা যেতে পারে। তর্ক সাপেক্ষে একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিক ধর্ম বিশ্বাস খৃস্টধর্ম ট্রিনিটির অতিব্যক্তিক মতবাদের সাহায্যে দেহধারী ঈশ্বরের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছে। মুসলিমরা অচিরেই কোরানের যেসব অনুচ্ছেদে ঈশ্বর 'দেখেন', 'শোনেন' এবং 'বিচার করেনে'র মতো মানবীয় কাজের কথা বুঝিয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্র সমস্যা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মই অতিন্দ্রীয়বাদী ধারার জন্ম দিয়েছে যা তাদের ঈশ্বরকে ব্যক্তি পর্যায়ের ঊর্ধ্বে

তুলে নির্বাণ ও ব্রহ্ম-আত্মার অনুরূপ নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় পরিণত করতে সাহায্য করেছে। খুব নগণ্য সংখ্যক মানুষই প্রকৃত অতিন্দ্রীয়াবাদের চর্চার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু তিনটি ধর্ম বিশ্বাসেই (পাশ্চাত্য খৃস্টধর্ম বাদে) অতিন্দ্রীয়বাদের উপলব্ধির ঈশ্বরই অতিসাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিশ্বাসীদের মাঝে শেষমেষ আদর্শ বিবেচিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক একেশ্বরবাদ আদিতে অতিন্দ্রীয়বাদী ছিল না। আমরা বুদ্ধের মতো ধ্যানী ও পয়গম্বরদের অভিজ্ঞতার পার্থক্য আলোচনা করেছি। ইহুদিবাদ, খৃস্টধর্ম ও ইসলাম আবশ্যিকভাবেই সক্রিয় ধর্ম এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, স্বর্গের মতোই পৃথিবীতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে। পয়গম্বর আনীত এইসব ধর্মের কেন্দ্রীয় মটিফ হচ্ছে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বা সংঘাত। এই ঈশ্বর কর্মের আদেশ রূপে অনুর্ভূত হন; তিনি আমাদের নিজের দিকে আহ্বান করেন; আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসা ও মনোযোগ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ দেন। নীরব ধ্যানের বদলে এই ঈশ্বর সংলাপের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হন। তিনি এক 'বাণী' উচ্চারণ করেন যা ভক্তির মূলবিন্দুতে পরিণত হয়, যাকে পার্থিব জীবনের ক্রুটিময় ও করুণ অবস্থার সঙ্গে অত্যন্ত কষ্টকর প্রয়াসে বাস্তবায়িত করতে হয়। তিনটি ধর্মের মাঝে সবচেয়ে ব্যক্তিরূপ খৃস্টধর্মে ভালোবাসা দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ককে বৈশিষ্ট্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসার শর্ত হলো কিছু মাত্রায় অহমবোধকে বিনাশ করতে হবে। সংলাপ বা ভালোবাসা, উভয়ক্ষেত্রেই অহমবোধ একটা চিরন্তন সম্ভাবনা। খোদ ভাষাই একটা সীমিতকারী বিষয় হতে পারে, যেহেতু এটা আমাদের পার্থিব অভিজ্ঞতার ধ্যান-ধারণায় আমাদের আবদ্ধ রাখে।

AMARBOI.COM

পয়গম্বরগণ মিথলজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন: মিথের পবিত্র আদিমকালে নয়, বরং তাঁদের ঈশ্বর ইতিহাস এবং চলতি ঘটনাপ্রবাহে সক্রিয় ছিলেন। অবশ্য একেশ্বরবাদীরা যখন অতিন্দ্রীয়বাদের শরণাপন্ন হয় তখন মিথলজি ধর্মীয়বোধের প্রধান বাহনের স্থান নতুন করে দখল করে নেয়। 'মিথ' (myth), অতিন্দ্রীয়বাদ (mysticism) ও 'রহস্য' (mystery) শব্দ তিনটির মাঝে ভাষাগত সম্পর্ক রয়েছে। সবগুলো শব্দই এসেছে গ্রিক ক্রিয়াপদ *মাস্তেইয়ন* (*musteion*) হতে: যার অর্থ মুখ বা চোখ বন্ধ করা। সুতরাং তিনটি শব্দই অন্ধকার ও নৈঃশব্দ্যের অনুভূতির মাঝে প্রোথিত।[১] আজকের পশ্চিমে এগুলো জনপ্রিয় শব্দ নয়। উদাহরণস্বরূপ, মিথ শব্দটি প্রায়শঃ মিথ্যার সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়: চলতি কথায় মিথ হচ্ছে এমন কিছু যা সত্য নয়। কোনও রাজনীতিক বা চিত্রতারকা তাদের নামে রটনা বা সংবাদকে 'মিথ' বলে নাকচ করে দেবেন এবং পণ্ডিতগণ অতীত সম্পর্ক ভ্রান্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে

পৌরাণিক (*mythical*) বলে উল্লেখ করবেন। আলোকন পর্বের পর থেকে, 'রহস্য'কে উদ্ঘাটনযোগ্য বিষয় হিসাবে দেখা হয়েছে। প্রায়শঃ একে স্থবির চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা কাহিনীকে বলা হয় 'রহস্য' (mystery) এবং এই ঘরানার মূল কথা হচ্ছে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান বের করা। আমরা দেখব, এমনকি আলোকন পর্বের সময় ধার্মিক ব্যক্তিরা 'রহস্য'কে বাজে শব্দ হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল। একইভাবে অতিন্দ্রীয়বাদকে বাতিক, জোচচুরি বা অসংঙ্গত সুখানুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। পশ্চিমা জগৎ যেহেতু কখনওই, এমনকি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে এর জোয়ারের সময়ও না, অতিন্দ্রীয়বাদে ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না, সেজন্যে এ ধরনের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বুদ্ধিমত্তা ও অনুশীলনের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা এখানে নেই।

তারপরেও লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, হয়তো স্রোত ঘুরছে। ১৯৬০ দশকের দিক থেকে পাশ্চাত্যের জনগণ বিশেষ ধরনের যোগ ও বুদ্ধ ধর্মের মতো ধর্মের বিশেষ সুবিধা বা উপকার সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে শুরু করেছে, যেগুলোর অপর্যাপ্ত ঈশ্বরবাদ দুষিত না হওয়ার সুবিধা রয়েছে। ফলে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে তা। মিথলজি নিয়ে প্রয়াত আমেরিকান পণ্ডিত জোসেফ ক্যাম্পবেলের রচনাবলী সম্প্রতি কদর পেয়েছে। পশ্চিমে সাম্প্রতিকালের সাইকোঅ্যানালিসেসের প্রতি প্রবল উৎসাহকে অতিন্দ্রীয়বাদের প্রতি এক ধরনের ঝোঁক হিসাবে দেখা যেতে পারে, কারণ এ দুটো বিষয়ের মাঝে আমরা লক্ষণীয় সাদৃশ্য লক্ষ করব। মিথলজিকে প্রায়ই মনের অন্তস্থ অবস্থা ব্যাখ্যা করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফ্রয়েড এবং জাং উভয়ই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাঁদের নতুন বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করার জন্যে গ্রিক কাহিনী ঈদিপাস-এর মতো প্রাচীন মিথের সহায়তা নিয়েছেন। পশ্চিমের জনগণ হয়তো জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিখাঁদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে একটা বিকল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে।

AMARBOI.COM

অতিন্দ্রীয়বাদী ধর্ম অনেক প্রত্যক্ষ ও অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্ম বিশ্বাসের চেয়ে দুঃসময়ে বেশি কাজে আসে। অতিন্দ্রীয়বাদ অনুশীলন শিক্ষার্থীকে আদি সূচনা 'দ্য ওয়ানে'র দিকে প্রত্যাবর্তনে ও স্বর্গীয় সত্তার অব্যাহত বোধ জাগাতে সাহায্য করে। কিন্তু তারপরেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে গড়ে ওঠা প্রাথমিক ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদ ইহুদিদের পক্ষেও বেশ কঠিন ছিল, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে ব্যবধানের দিকেই যেন জোর দিয়েছিল তা। ইহুদিরা যে পৃথিবীতে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আরও শক্তিশালী স্বর্গীয় জগতে যেতে চেয়েছিল। ঈশ্বরকে এক পরাক্রমশালী রাজা হিসেবে দেখেছে তারা। সপ্তম আকাশে বিপদসঙ্কুল যাত্রার ভেতর দিয়েই কেবল যাঁর দিকে অগ্রসর

হওয়া যেতে পারে। র‍্যাবাইদের সহজ প্রত্যক্ষ কৌশল ব্যবহারের বদলে নিজেদের প্রকাশ করার জন্যে অতিন্দ্রীয়বাদীরা সুললিত অলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করেছে। র‍্যাবাইরা এই আধ্যাত্মিকতাকে ঘৃণা করেছেন ও অতিন্দ্রীয়বাদীরা র‍্যাবাইদের বৈরী না করে তোলার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিল। তবুও এই 'থ্রোন মিস্টিসিজম', যেভাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনও চাহিদা মিটিয়েছিল, কারণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শেষ পর্যন্ত নতুন ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদের কাব্বালাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে মহান র‍্যাবাইনিয় একাডেমিগুলোর পাশাপাশি এর বিকাশ অব্যাহত ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলনে সম্পাদিত থ্রোন মিস্টিসিজমের ক্লাসিক বিবরণ বোঝায়, নিজেদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সংযত অতিন্দ্রীয়বাদীরা র‍্যাবাইদের বিবরণের সঙ্গে জোরাল নৈকট্য অনুভব করত, যেহেতু তারাও র‍্যাবাই আকিভা, র‍্যাবাই ইশমায়েল ও র‍্যাবাই ইয়োহান্নানের মতো মহান *তান্নাইম*দের আধ্যাত্মিকতার গুরু বানিয়েছে। আপন জাতির পক্ষে ঈশ্বরমুখী এক নতুন পথ নির্মাণে ইহুদি চেতনার নতুন চরম পন্থা বের করেছিলেন তাঁরা।

আমরা যেমন দেখেছি, র‍্যাবাইদের বেশ উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ছিল। র‍্যাবাই ইয়োহান্নান ও তাঁর অনুসারীদের ওপর অগ্নিরূপে স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে স্পষ্টতই তাঁরা ইযেকিয়েলের ঈশ্বরের রথের অদ্ভুত দিব্যদর্শনের অর্থ নিয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। রথ ও সিংহাসনে আসীন যে অবয়বকে ইযেকিয়েল দেখেছিলেন সেটাই যেন প্রাথমিককালের নিগূঢ় ভাবনা বা অনুমানের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রথ সম্পর্কিত গবেষণাকে (*Ma'aseh Merkavah*) প্রায়ই সৃষ্টির কাহিনীর (*Ma'aseh Bereshit*) সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। সর্বোচ্চ স্বর্গে অবস্থিত ঈশ্বরের সিংহাসনে পৌঁছার অতিন্দ্রীয়বাদী অভিজ্ঞতার প্রাচীন যে বিবরণ আমরা পাই সেখানে এই আধ্যাত্মিক যাত্রার অপরিসীম বিপদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে:

> র‍্যাবাইগণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন: চারজন এক উদ্যানে প্রবেশ করলেন এবং এঁরা হলেন: বেন আযযাই, বেন যোমা, আহের এবং র‍্যাবাই আকিভা। র‍্যাবাই আকিভা তাদের বললেন: 'আপনারা খাঁটি মর্মর পাথরের কাছে পৌঁছে "পানি পানি!" বলে চিৎকার করবেন না, কারণ বলা হয়: যে ব্যক্তি অসত্য উচ্চারণ করে সে আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।' 'বেন আযযাই তাকালেন এবং প্রাণ হারালেন। ঐশীগ্রন্থ তাঁর সম্পর্কে বলছে: 'প্রভুর দর্শন লাভের পর মৃত্যু সাধুদের জন্যে অপরিসীম মূল্যবান।' বেন যোমা তাকালেন এবং আঘাত পেলেন। ঐশীগ্রন্থ তাঁর সম্পর্কে বলছে: 'তুমি কী মধু পেয়েছ? তোমার যতটা প্রয়োজন খেয়ে

AMARBOI.COM

নাও, কিন্তু বেশি খেয়ে বমি করো না।' আহের ধারা বন্ধ করে দিলেন [অর্থাৎ ধর্মদ্রোহী হয়ে গেলেন]। র‍্যাবাই আকিভা শান্তিতে বিদায় নিলেন।[২]

একমাত্র র‍্যাবাই আকিভাই অতিন্দ্রীয়বাদী পথে কোনও রকম ক্ষতির শিকার না হয়ে রক্ষা পেয়েছেন। মনের গভীরতম প্রদেশে অভিযাত্রায় অনেক বড় ধরণের ব্যক্তিগত ঝুঁকি জড়িত, কারণ ওখানে আমরা যার দেখা পাব সেটা সহ্যের অতীত হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ কারণেই সকল ধর্ম অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করতে পারবেন, বিপদসঙ্কুল এলাকাসমূহ অতিক্রমে শিক্ষানবীশকে সাহায্য করবেন এবং সে নিজের সাধ্য পেরিয়ে গিয়ে বেন আযযাইয়ের মতো মৃত্যুবরণ বা বেন যোমার মতো পাগল হয়ে যাবেন না, এমন একজন বিশেষজ্ঞের অধীনে অতিন্দ্রীয় যাত্রা শুরু করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। অতিন্দ্রীয়বাদীদের সকলেই বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক স্থৈর্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। জেন (Zen) গুরুরা বলেন, কোনও মস্তিষ্ক বিকৃত লোকের পক্ষে ধ্যানের মাধ্যমে সুস্থতার সন্ধান করা অর্থহীন, কারণ এতে সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। অতিন্দ্রীয়বাদী হিসাবে সম্মানিত কয়েকজন ইউরোপিয় ক্যাথলিক সেইন্টের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আচরণকে অবশ্যই ভ্রান্তি হিসাবে দেখতে হবে। তালমুদের সাধুদের এই প্রতীকী কাহিনী দেখায়, ইহুদিরা গোড়া থেকেই বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিল: পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ সাবালক হয়ে ওঠার আগে তরুণদের আর কাব্বালাহ্‌র চর্চায় যোগ দিতে দেয়নি তারা। একজন অতিন্দ্রীয়বাদীকে অবশ্যই বিবাহিত হতে হতো, যৌনজীবনে তার সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্যে।

AMARBOI.COM

পৌরাণিক সাতটি স্বর্গের রাজ্য দিয়ে অতিন্দ্রীয়বাদীকে ঈশ্বরের আসনের দিকে যাত্রা করতে হতো। কিন্তু সম্পূর্ণই কাল্পনিক যাত্রা ছিল সেটা। একে কখনও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয়নি, বরং মনের রহস্যময় অঞ্চলে প্রতীকী উর্ধ্বারোহণ হিসাবে দেখা হয়েছে। র‍্যাবাই আকিভার 'খাঁটি মর্মর পাথর' সম্পর্কিত সাবধানবাণী সম্ভবত অতিন্দ্রীয়বাদীর কাল্পনিক যাত্রার বিভিন্ন জটিল পর্যায়ে উচ্চারণ করার সাংকেতিক শব্দের প্রতিই ইঙ্গিত করে। এক বিশদ অনুশীলনের অংশ হিসাবে এসব ইমেজ কল্পনা করা হতো। আজকাল আমরা জানি যে অবচেতন মন অসংখ্য ইমেজারিতে পূর্ণ যা স্বপ্ন, দৃষ্টি বিভ্রম ও অস্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক বা মস্তিষ্ক বিকৃতি, যেমন মৃগী রোগ বা সেযোফ্রেনিয়ার সময় প্রকাশ পায়। ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদীরা 'সত্যি সত্যি আকাশের ভেতর দিয়ে ওড়া বা ঈশ্বরের প্রাসাদে প্রবেশের কথা কল্পনা করেনি, বরং এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল উপায়ে তাদের মনে জেগে ওঠা ধর্মীয় ইমেজকে বিন্যস্ত করছিল। এর জন্যে চরম দক্ষতা ও নির্দিষ্ট মাত্রার মেজাজ ও প্রশিক্ষণের

প্রয়োজন ছিল। জেন (Zen) বা যোগ অনুশীলনের মতো এখানেও একই রকম মনোসংযোগের প্রয়োজন, শিক্ষাব্রতীকে যা মনের গোলকধাঁধার মতো পথে সঠিকভাবে অগ্রগর হতেও সাহায্য করে। বাবিলনিয় সাধু হাই গাওন (৯৩৯-১০৩৮) তুলনামূলক অতিন্দ্রীয়বাদী চর্চার সাহায্যে চার জন সাধুর কাহিনীর ব্যাখ্যা করেছেন: 'উদ্যান' ঈশ্বরের প্রাসাদের 'স্বর্গীয় কক্ষসমূহে' (*bekhalot*) আত্মার অতিন্দ্রীয়বাদী আরোহণের কথা বোঝায়। ঈশ্বর যাত্রায় আগ্রহী যে কাউকে অবশ্যই 'উপযুক্ত' এবং 'বিশেষ গুনে গুনান্বিত' হতে হবে, যদি সে 'স্বর্গীয় রথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চায় এবং স্বর্গের উর্ধ্বের যেবেদূতদের দরবার দেখতে চায়।' এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে না। তাকে এমন নির্দিষ্ট কিছু অনুশীলন করতে হবে যা সারা বিশ্বের যোগি ও ধ্যানীদের অনুশীলনের অনুরূপ:

> তাঁকে অবশ্যই নির্দিষ্ট কিছু দিন উপবাস পালন করতে হবে, অবশ্যই দুহাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে মাটির দিকে মুখ করে আপনমনে নিচু কণ্ঠে ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। এর ফল হিসাবে সে আপন হৃদয়ের অন্তস্তলে দৃষ্টি দিতে পারবে, তার মনে হবে যেন নিজ চোখে সে সাতটি দরবার দেখতে পাচ্ছে, দরবার হতে দরবারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও সেখানে যা কিছু আছে দেখছে।[৩]

AMARBOI.COM

যদিও এই 'থ্রোন মিস্টিসিজম'-এর সবচেয়ে প্রাচীন টেক্সটের সময়কাল দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী বলে বিবেচিত, কিন্তু এই ধরনের ধ্যান-কৌশল সম্ভবত আরও প্রাচীন। এভাবে সেইন্ট পল 'মেসায়াহর অধীন' এক বন্ধুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, যিনি মোটামুটি চৌদ্দ বছর আগে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। এই দিব্য দর্শনকে ব্যাখ্যা করার উপায় বুঝতে পারেননি সেইন্ট পল, কিন্তু বিশ্বাস করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি 'স্বর্গে আটকা পড়েছিলেন আর এমন কিছু শুনেছেন যা মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না এবং করা সম্ভব নয়।'[৪]

দিব্যদর্শনগুলোই শেষ কথা নয় বরং এক অনির্বচনীয় ধর্মীয় অনুভূতির উপায় যা স্বাভাবিক ধারণাকে অতিক্রম করে যায়। এখনও অতিন্দ্রীয়বাদী নির্দিষ্ট ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে একজন ইহুদি দিব্যদ্রষ্টা সপ্ত-স্বর্গের দৃশ্য দেখবে, কারণ তাঁর ধর্মীয় কল্পনার রাজ্য এসব বিশেষ প্রতীকে পরিপূর্ণ। বৌদ্ধরা বুদ্ধ এবং *বোধিসত্তাদের* নানা রকম প্রতিরূপ দেখে; ক্রিশ্চানরা দেখে ভার্জিন মেরিকে। এসব মানসিক অপচ্ছায়াগুলোকে বস্তুগত বা দুর্জ্ঞেয় প্রতীকের অতিরিক্ত কিছু হিসাবে দেখা দিব্যদ্রষ্টার পক্ষে ভুল হবে। দৃষ্টিবিভ্রম যেহেতু অস্বাভাবিক অবস্থা, তাই গভীর ধ্যান ও আত্মবিশ্লেষণের সময় আবির্ভূত

প্রতীকসমূহকে সামাল দেওয়া ও ব্যাখ্যা করার জন্যে বিশেষ ক্ষমতা ও মানসিক ভারসাম্য দরকার।

এইসব প্রাথমিক ইহুদি দিব্যদর্শনের সবচেয়ে বিচিত্র এবং সর্বাধিক বিতর্কিতটির দেখা মেলে পঞ্চম শতাব্দীর টেক্সট *শিউর কোমাহয়* (The Measurement of the Height) যেখানে ঈশ্বরের আসনে ইযেকিয়েলের দেখা অবয়বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। *শিউর কোমাহ* এই সত্তাকে *ইয়াতযরেনু:* 'আমাদের স্রষ্টা' বলছে। এই ঈশ্বর দর্শনের অদ্ভুত বিবরণ সম্ভবত র‍্যাবাই আকিভার সবচেয়ে প্রিয় বাইবেলিয় টেক্সট সং অভ *সংস*-এর একটি অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে রচিত। নববধূ তার প্রেমিকের বর্ণনা দিচ্ছে:

> আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ;
> তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য,
> তাহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়,
> তাহার কেশপাশ কুঞ্চিত ও দাঁড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।
> তাহার নয়নযুগল জলপ্রণালীর তীরস্থ
> কপোত যুগলের ন্যায়,
> যাহারা দুগ্ধে স্নাত ও পয়ঃপূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট।
> তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ওষধির চৌকা ও আমোদকারী লতার স্তম্ভস্বরূপ,
> তাঁহার ওষ্ঠাধর শোশন পুষ্পের ন্যায়,
> দ্রব গন্ধরস ক্ষরণকারী।
> তাঁহার হস্ত বৈদূর্য্যমণিতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীয় স্বরূপ;
> তাঁহার কায় নীলকান্ত মণিতে খচিত গজদন্তময় শিল্পকর্মের ন্যায়।
> তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেত প্রস্তরময়
> স্তম্ভ দ্বয়ের ন্যায়,
> তাঁহার দৃশ্য লিবানোনের সদৃশ,
> এরস বৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট।[৫]

কেউ কেউ একে ঈশ্বরের বর্ণনা হিসাবে দেখেছে: ইহুদিদের প্রজন্মান্তরের আতঙ্ক সত্ত্বেও *শিউর কোমাহ্* এখানে উল্লিখিত ঈশ্বরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিমাপ করে গেছে। এই অদ্ভুত টেক্সটে ঈশ্বরের পরিমাপসমূহ হতবুদ্ধিকর। মন কুলিয়ে উঠতে পারে না। 'পারাসাং' (প্রাচীন পারসিয় মাপের একক)—মূল একক—১৮০ ট্রিলিয়ন 'ফিংগার'-এর সমান এবং প্রতি 'ফিংগার' পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুবিশাল মাত্রা মনকে স্তম্ভিত করে দেয় যা আর সামনে বাড়তে পারে না, এমন বিশাল আকারের

AMARBOI.COM

কোনও কিছু বুঝতে পারে না। এটাই মূল কথা। *শিউর কোমাহ* আমাদের বলার চেষ্টা করছে যে, ঈশ্বরকে পরিমাপ করা বা মানবীয় পরিভাষায় ধারণ অসম্ভব। তেমন কিছু করার সামান্য প্রয়াসই উদ্যোগের অসম্ভাব্যতা দেখিয়ে দেয় এবং ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তা সম্পর্কে আমাদের নতুন বোধ যোগায়। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বহু ইহুদিই সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ঈশ্বরকে পরিমাপের বেমানান প্রয়াসকে ব্লাসফেমাস হিসাবে আবিষ্কার করেছে। এ কারণেই *শিউরের* মতো একটা নিগূঢ় রচনা অসতর্কদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে সঠিক প্রেক্ষিতে *শিউর কোমাহ্* আধ্যাত্মিক নির্দেশকের পরিচালনায় সঠিকভাবে অগ্রসর হতে প্রস্তুতি নেওয়া নবীশদের সকল মানবীয় মান ছাড়িয়ে যাওয়া ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তা সম্পর্কে এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি যোগাবে। এটা অবশ্যই আক্ষরিত অর্থে গ্রহণ করার জন্যে বোঝানো হয়নি; নিশ্চিতভাবেই কোনও গোপন তথ্যও জানায় না। এটা স্বেচ্ছায় মনের এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি যা বিস্ময় ও আতঙ্কের একটা বোধ সৃষ্টি করে।

*শিউর* ঈশ্বরের অতিন্দ্রীয় প্রতিকৃতির দুটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় যা তিনটি ধর্ম বিশ্বাসেই দেখা যায়। প্রথমত, এটা আবশ্যিকভাবে কল্পনা-নির্ভর; দ্বিতীয়ত, এটা অনির্বচনীয়। *শিউর-এ* বর্ণিত অবয়ব ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, অতিন্দ্রীয়বাদীরা যাকে তাদের উর্ধ্বারোহণের শেষ পর্যায়ে সিংহাসনে আসীন অবস্থায় দেখতে পায়। এই ঈশ্বরের মাঝে কোমল, ভালোবাসা বা ব্যক্তিগত কিছু নেই; প্রকৃতপক্ষে তাঁর পবিত্রতাকে দূরবর্তী মনে হয়। অবশ্য তাঁকে প্রত্যক্ষ করার পর অতিন্দ্রীয়বাদী গান গেয়ে উঠে যা ঈশ্বর সম্পর্কে খুব সামান্যই জানায় আমাদের, তবে প্রভাব রেখে যায়:

> পবিত্রতার গুণ, ক্ষমতার গুণ, এক আতঙ্কময় গুণ, এক শাপময় গুণ, ভয়ের গুণ, এক ভীতির গুণ, এক ত্রাসের গুণ, স্রষ্টা, আদোনাই, ইসরায়েলের ঈশ্বরের পোশাকের গুণ, যিনি মাথায় মুকুট পরে আপন প্রতাপের সিংহাসনে আসেন;
>
> তাঁর পোশাকের ভেতর বাইরে খোদাই করা আর YHWH, YHWH দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা।
>
> একে ধারণ করার ক্ষমতা কোনও চোখের নেই, সে চোখ রক্ত মাংসের হোক, বা তার দাসদের চোখই হোক।[৬]

আমরা ইয়াহওয়েহর আলখেল্লা কেমন সেটাই কল্পনা করতে না পারলে ঈশ্বরকে ধারণ করার চিন্তা করব কীভাবে?

পঞ্চম শতাব্দীর *সেফার ইয়েযিরাহ* (দ্য বুক অভ ক্রিয়েশন)ই সম্ভবত

AMARBOI.COM

প্রাথমিককালের ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদী টেক্সটের ভেতর সবচেয়ে বিখ্যাত। এখানে বাস্তবানুগভাবে ইহুদি সৃজনশীল প্রক্রিয়া বর্ণনার কোনও প্রয়াস নেই; বিবরণ সঙ্কোচহীনভাবে প্রতীকী এবং সেটা দেখায় যে, ঈশ্বর ভাষা দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টি করছেন, যেন কোনও গ্রন্থ লিখছিলেন তিনি। কিন্তু ভাষা আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নিয়েছে; সৃষ্টির বাণী আর স্পষ্ট নেই। হিব্রু বর্ণমালার প্রত্যেকটা অক্ষরকে একটা করে সংখ্যা মূল্য দেওয়া হয়েছে: হরফগুলোকে পবিত্র সংখ্যার সঙ্গে সমন্বিত করে অতিন্দ্রীয়বাদী সেগুলোর সীমাহীন বিন্যাসের ভেতর দিয়ে বিশ্বের স্বাভাবিক সুর হতে নিজের মনকে সরিয়ে নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধিবৃত্তিকে পাশ কাটানো ও ইহুদিদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, কোনও শব্দ বা ধারণা ঈশ্বর নামের বাস্তবতার প্রতিনিধিকত্ব করতে পারে না। আবার ভাষাকে এর শেষ সীমায় ঠেলে দেওয়া ও একে ভাষাবিহীন তাৎপর্য সৃষ্টিতে বাধ্য করায় ঈশ্বরের অনন্যতার একটা অনুভূতি সৃষ্টি হতো। সহানুভূতিশীল বন্ধু ও পিতা হিসাবে নয় বরং এক অদম্য পবিত্র রূপ হিসাবে দেখা ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনে লিপ্ত হতে চায়নি অতিন্দ্রীয়বাদীরা।

থ্রোন মিস্টিসিজম অন্যান্য কোনও ব্যাপার ছিল না। পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) আরব থেকে জেরুজালেমের টেম্পল মাউন্টে 'রাত্রি যাত্রা' করার সময়ও ঠিক একই রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় জিব্রাইল কর্তৃক স্বর্গীয় ঘোড়ায় করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। টেম্পল মাউন্টে পৌঁছানোর পর আব্রাহাম, মোজেস, জেসাস ও অন্য পয়গম্বররা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। মুহাম্মদকে (স) তাঁর পয়গম্বরত্বের জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এরপর জিব্রাইল ও মুহাম্মদ (স) সাত স্বর্গের ভেতর দিয়ে একটা মই (*মিরাজ*) বেয়ে বিপদ সঙ্কুল উর্ধ্বারোহণ শুরু করেন, যার প্রতিটির দায়িত্বে ছিলেন একজন করে পয়গম্বর। অবশেষে স্বর্গীয় বলয়ে পৌঁছান মুহাম্মদ (স)। প্রাথমিক সূত্রগুলো সশ্রদ্ধভাবে চূড়ান্ত দর্শন সম্পর্কে নীরবতা বজায় রেখেছে, কোরানের নিচে উল্লেখ করা পঙক্তিগুলোয় ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়:

> নিশ্চয়ই সে তাহাকে* আরেকবার দেখিয়াছিল অন্তবর্তী বদরীয় বৃক্ষের নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান**।

---

* রাসুলুল্লাহ (স) দ্বিতীয়বার মিরাজে জিব্রাঈল (আ) কে দেখেছিলেন তাঁর পূর্ণ অবয়বে ষষ্ঠ বা সপ্তম আকাশে কুল গাছের কাছে। সূত্র, পবিত্র কুরআনুল করীম : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

** অবস্থানের জায়গায়, বেহেশত, মুমিনদের বাসস্থান-বাগানবাড়ি, তাই বাসোদ্যান। সূত্র: পবিত্র কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।



AMARBOI.COM

যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার, তা দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত*** । তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই। দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই। সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।[৭]

মুহাম্মদ (স) স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখেননি, কেবল স্বর্গীয় সত্তাকে নির্দেশকারী প্রতীকসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন। হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসে লোত বৃক্ষ যৌক্তিক চিন্তার শেষসীমা নির্দেশ করে। চিন্তা বা ভাষার স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ঈশ্বর দর্শনের আবেদন সৃষ্টি করার মতো সুযোগ নেই। স্বর্গ আরোহন মানবীয় চেতনার দূরতম বিন্দুর প্রতীক, যা পরম অর্থের নৈকট্য নির্দেশ করে।

ঊর্ধ্বারোহণের ইমেজারি খুব সাধারণ। সেইন্ট অগাস্তিন অস্টিয়ায় মায়ের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, প্লটিনাসের ভাষায় যার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি:

> স্বয়ং চিরন্তন সত্তার দিকে এক প্রবল আকর্ষণে আমাদের মন উত্থিত হয়েছিল। ধাপের পর ধাপ বেয়ে আমরা সকল সংশ্লিষ্ট বস্তু ও স্বর্গ অতিক্রম করে গেলাম যেখানে সূর্য, চাঁদ, তারা পৃথিবীতে আলো বিতরণ করে। আরও ওপরে উঠে গেলাম আমরা। মনের ভাবনা ও কথোপকথন এবং আপনার সৃষ্টির বিস্ময়ে আরও উপরে উঠলাম এবং প্রবেশ করলাম আমাদের মনের গভীরে।[৮]

AMARBOI.COM

অগাস্তিনের মন সাত স্বর্গের সেমেটিক ইমেজের জায়গায় সত্তার অসীম ধারাবাহিকতার গ্রিক ইমেজারিতে পূর্ণ ছিল। এটা 'মহাশূন্যে'র কোনও ঈশ্বরের দিকে শূন্যের ভেতর দিয়ে আক্ষরিক অর্থে কোনও অভিযাত্রা ছিল না, বরং ছিল অন্তরের সত্তার দিকে মানসিক আরোহণ। আনন্দময় যাত্রা যেন কোনও কিছু ছাড়াই একটা কিছু দিয়েছে মনে হয় যখন তিনি বলেন, 'আমাদের মন উত্থিত হয়েছিল' যেন মনিকা এবং তিনি আশীর্বাদের নিষ্ক্রিয় গ্রাহক, কিন্তু 'চিরন্তন সত্তা'র দিকে ক্রমারোহণে এক ধরনের বিবেচনা রয়েছে। একই রকম কল্পনিক ঊর্ধ্বরোহণের কথা 'সাইবেরিয়া হতে তিয়েরা দেল ফুয়েগো' পর্যন্ত অঞ্চলের শামানদের ঘোরের অভিজ্ঞতার মাঝে উল্লেখ আছে, জোসেফ ক্যাম্পবেল যেমন বলেছেন।[৯]

ঊর্ধ্বরোহণের প্রতীক ইঙ্গিত করে যে, জাগতিক অনুভূতি পেছনে ফেলে

---

*** কুল গাছ আল্লাহর নূরে আচ্ছাদিত। সূত্রঃ পবিত্র কুরআনুল করীম, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

আসা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অর্জিত ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা চরমভাবে বর্ণনার অতীত, কেননা স্বাভাবিক ভাষার প্রয়োগ আর চলে না। ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদীরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবকিছুরই বিবরণ দেয়। তারা ঈশ্বরের আলখেল্লাা, তাঁর প্রাসাদ, স্বর্গীয় দরবার এবং যে আবরণ তাঁকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখে যা তাঁর চিরন্তন আদি রূপের প্রকাশ করে, সেসবের কথা বলে। যেসব মুসলিম মুহাম্মদের (স) স্বর্গ অভিমুখে যাত্রা সম্পর্কে ভাবে তারা চূড়ান্ত ঈশ্বর দর্শনের স্ববিরোধী প্রকৃতির গুরুত্ব দিয়ে থাকে: তিনি স্বর্গীয় সত্তাকে দেখেছেন আবার দেখেননি।[১০] অতিন্দ্রীয়বাদী যখন নিজের মনের ইমেজারির জগৎ অতিক্রম করে যায়, তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে ধারণা বা কল্পনা কোনওটিই তাকে আর দূরে নিয়ে যেতে পারে না। অগাস্তিন ও মনিকা উভয়ই তাঁদের যাত্রার ক্লাইমেক্স সম্পর্কে সংযত, এর স্থান, কাল ও সাধারণ জ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থানের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা ঈশ্বরের জন্যে 'কথা বলেছেন এবং হাঁপিয়েছেন' এবং 'হৃদয়ের সামগ্রিক একাগ্রতার মুহূর্ত দিয়ে অল্প মাত্রায় একে স্পর্শ করেছেন।'[১১] তারপর স্বাভাবিক ভাষায় ফিরে আসতে হয়েছে তাঁদের যেখানে একটি বাক্যের শুরু, মধ্যাংশ ও সমাপ্তি আছে:

> সুতরাং আমরা বললাম: যদি কারও জন্যে দেহের কম্পন স্তব্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, যদি মাটি, জল ও বাতাসের ইমেজসমূহ স্থির থাকে, যদি স্বর্গসমূহ আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়, এবং যদি খোদ আত্মা কোনও শব্দ না করে এবং নিজ সম্পর্কে চিন্তা বাদ দিয়ে একে অতিক্রম করে, যদি কল্পনায় সকল স্বপ্ন আর দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়, যদি সকল ভাষা ও ক্ষণস্থায়ী সবকিছু নীরব থাকে—কারণ এরপর যদি কেউ এটা শুনতে পায়, তাহলে এদের সবাই বলবে, 'আমরা আমাদের সৃষ্টি করিনি, আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যিনি চিরকাল আছেন।' (শ্লোক ৭৯ : ৩, ৫) ...এভাবেই যখন আমরা আমাদের সাধ্য প্রসারিত করলাম তখন মানসিক শক্তির এক ঝলকে সকল সত্তার অতীত চিরকালীন এক প্রজ্ঞা অর্জন করলাম।[১৩]

AMARBOI.COM

এটা কোনও ব্যক্তিক ঈশ্বরের স্বাভাবিক দর্শন ছিল না: বলা যায়, তাঁরা প্রাকৃতিক যোগাযোগের স্বাভাবিক কোনও পদ্ধতিতে সাধারণ কণ্ঠে, দেবদূতের কণ্ঠে, প্রকৃতির মাধ্যমে বা কোনও স্বপ্নের প্রতীকে তাঁর কণ্ঠস্বর 'শোনেননি', তারা সকল সত্তার অতীত বাস্তবতাকে 'স্পর্শ' করেছেন বলে মনে হয়।

এটা স্পষ্টতই সংস্কৃতির শর্তাধীন হলেও এ ধরনের 'ঊর্ধ্বারোহণ'কে জীবনের তর্কাতীত সত্য বলেই মনে হয়। আমরা একে যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, সারা বিশ্বের ও ইতিহাসের সকল পর্যায়ে মানুষ এই ধরনের ধ্যানমুখী অভিজ্ঞতার

দেখা পেয়েছে। একেশ্বরবাদীরা এই পরম অন্তর্দৃষ্টিকে 'ঈশ্বরের দর্শন' আখ্যায়িত করেছে। প্লাটিনাস একে 'দ্য ওয়ানে'র উপলব্ধি ধরে নিয়েছেন, বুদ্ধরা একে বলবে নির্বাণের দর্শন লাভ। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে এটা এমন কিছু যা বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি সবসময়ই অর্জন করতে চেয়েছে। ঈশ্বর সংক্রান্ত অতিন্দ্রীয়বাদী অভিজ্ঞতার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সকল ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এক রকম। এটা সত্তার বাইরে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা নয়, বরং এক ধরনের ভক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞতা যার জন্যে অন্তরে যাত্রা করার প্রয়োজন হয়। মনের চিত্রকল্প গঠনকারী অংশের সাহায্যে এই প্রক্রিয়াটি অনুসৃত হয়–প্রায়শঃই যাকে বলা হয় কল্পনা–অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিক অংশ দিয়ে নয়। এবং শেষ পর্যন্ত এটা এমন কিছু যা অতিন্দ্রীয়বাদী নারী বা পুরুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ সত্তায় সৃষ্টি করে থাকে: নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক বা মানসিক অনুশীলন চরম দর্শন লাভ ঘটায়; আচমকা কারও ওপর ঘটে যায় না।

অগাস্তিন সম্ভবত ধারণা করেছিলেন যে, বিশেষ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা কখনও কখনও জীবদ্দশায়ই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতে পারে। মোজেস ও সেইন্ট পলকে উদাহরণ হিসাব উল্লেখ করেছেন তিনি। আধ্যাত্মিক জীবনের স্বীকৃত গুরু এবং ক্ষমতাশালী প্রধান যাজক পোপ গ্রেগরি দ্য গ্রেট (৫৪০-৬০৪) দ্বিমত পোষণ করেছেন। বুদ্ধিজীবী ছিলেন না তিনি, বরং টিপিক্যাল রোমান হিসাবে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের সার্বিক অস্পষ্টতা বোঝাতে মেঘ, কুয়াশা বা অন্ধকারের উপমা ব্যবহার করেছেন। তাঁর ঈশ্বর দুর্ভেদ্য অন্ধকারে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গিয়েছেন, এই অন্ধকার গ্রিক ক্রিশ্চান গ্রেগরি অভ নাইসা ও ডেনিসের মেঘের দুর্বোধ্য অনুভূতির চেয়ে ঢের কষ্টকর। গ্রেগরির বেলায় ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা ছিল হতাশাজনক। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ দুরূহ। আমাদের পক্ষে তাঁর সম্পর্কে পরিচিতের মতো কোনও কিছু উচ্চারণ করার জো নেই। এমন নয় যে, আমাদের সঙ্গে তাঁর কোনও মিল আছে। আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমরা মানুষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে ঈশ্বরের আচরণ সম্পর্কে কোনওরকম পূর্ব ধারণাই করতে পারি না: 'তো যখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের পক্ষে ঈশ্বর সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে কিছু জানা সম্ভব নয়, একমাত্র তখনই তাঁর বিষয়ে আমরা সত্যের কাছাকাছি থাকি।'[১৪] গ্রেগরি ক্রমাগত ঈশ্বরকে লাভ করার প্রয়াস ও বেদনার কথা বলেছেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে ধ্যানের আনন্দ উপভোগ করা যেতে পারে। ঈশ্বরের মধুর স্বাদ পাওয়ার আগে আত্মাকে এর স্বাভাবিক উপাদান অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে লড়াই করতে হয়: এটা

> নিজের মাঝে চকিত দৃষ্টিতে যে জিনিসটা দেখেছে তার ওপর দৃষ্টি স্থির রাখতে পারে না, কারণ আপন স্বভাবের কারণেই এটা নিমজ্জিত হতে বাধ্য হয়। নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে এটা হাঁপায়, সংগ্রাম করে, বারবার প্রয়াস পায়, কিন্তু আবার ডুবে যায়, ক্লান্তির ভারে চিরচেনা অন্ধকারে।[১৫]

কেবল মনের প্রবল প্রয়াসের পরেই ঈশ্বরকে লাভ করা যেতে পারে, মনকে তাঁর সঙ্গে যুঝতে হয়; যেভাবে জ্যাকব যুদ্ধ করেছিলেন দেবদূতের সঙ্গে। ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ অপরাধ, অশ্রু ক্লান্তিময়; মন তাঁর নিকটবর্তী হলে, কান্না ছাড়া আর কিছু করার থাকে না আত্মার। ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় 'নিপীড়িত' আত্মা কেবল 'ক্লান্ত হয়ে অশ্রুতেই শান্তি খুঁজে পায়।'[১৬] দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক ছিলেন গ্রেগরি; স্পষ্টতই পশ্চিমের বাসিন্দারা ঈশ্বরকে চাপ হিসেবেই আবিষ্কার করে গেছে।

প্রাচ্যে ঈশ্বর সম্পর্কিত ক্রিশ্চানদের অভিজ্ঞতা অন্ধকারের বদলে আলোর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। গ্রিকরা এক ভিন্ন ধরনের অতিন্দ্রীয়বাদ গড়ে তুলেছিল, যা সারা বিশ্বে দেখা যায়। এ পদ্ধতি ইমেজারি ও দিব্য দর্শনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, বরং ডেনিস দ্য আরোপাগাইতের উল্লেখ করা অ্যাপোফ্যাটিক বা নীরব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ছিল। স্বভাবতই ঈশ্বরের সকল যৌক্তিক ধারণাই ছড়িয়ে গেছে সেসব। *কমেন্টারি অন দ্য সং অভ সংস*-এ গ্রেগরি অভ নাইসা যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন: 'অনুসন্ধিৎসুর সন্ধানের পথে মনে আঁকড়ে রাখা প্রত্যেকটা ধারণা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ধ্যানীর লক্ষ্য সকল ধারণার ঊর্ধ্বে যাওয়া তো বটেই, সেই সঙ্গে যেকোনও রকম ইমেজের অতীতে পৌঁছানো, কারণ এগুলো বিক্ষেপের কারণ সৃষ্টি করতে পারে। এরপর 'একটা বিশেষ উপস্থিতির অনুভূতি' অর্জন করবে সে, যা সংজ্ঞাতীত এবং নিঃসন্দেহে অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের যে অনুভূতি তার অতীত।[১৭] এই মনোভাবকে বলা হয়েছে *'হেসিচিয়া'* 'প্রশান্তি' বা 'অন্তরের নীরবতা'। যেহেতু ভাষা, ধারণা এবং বিভিন্ন ইমেজ আমাদের কেবল জাগতিক বিশ্বে স্থান ও কাল আটকে রাখে, সুতরাং মনকে অবশ্যই মনোনিবেশের কৌশল প্রয়োগ করে স্বেচ্ছায় অটল করতে হয়, যাতে তা অপেক্ষমান নৈঃশব্দ্য গড়ে তুলতে পারে। কেবল তাহলেই এটা এমন এক সত্তার আকাঙ্ক্ষা করার আশা করতে পারবে যা এর ধারণার যেকোনও কিছুর ঊর্ধ্বে।

দুর্বোধ্য একজন ঈশ্বরকে জানা সম্ভব ছিল কীভাবে? গ্রিকরা এ ধরনের প্যারাডক্স ভালোবাসত এবং হেসিচ্যাস্টরা ঈশ্বরের সত্তা (*Ousia*) ও তাঁর 'শক্তি' (*energeiai*) বা জগতে তাঁর ক্রিয়াকর্মের সেই প্রাচীন পার্থক্যে ফিরে

AMARBOI.COM

গেছে যা আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুটা জানতে সক্ষম করেছে। আমরা ঈশ্বরকে যেহেতু তাঁর আপন সত্তায় কখনওই জানতে পারব না, সেহেতু প্রার্থনার সময় আমরা আসলে তাঁর 'শক্তি'কে অনুভব করি, 'সত্তা'কে নয়। একে পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলা ঈশ্বর হতে বর্ষিত 'রশ্মি' হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে; কিন্তু সূর্য রশ্মি যেমন সূর্য হতে আলাদা তেমনি এগুলোকেও ঈশ্বর হতে আলাদা স্বর্গীয় সত্তার । এগুলো এক চরম নীরব ও দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। সেইন্ট বাসিল যেমন বলেছিলেন: 'শক্তির সাহায্যে আমরা আমাদের ঈশ্বরকে জানতে পারি, আমরা তাঁর সত্তার নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলি না, কারণ তাঁর শক্তি আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু সত্তা দুর্গম রয়ে যায়।'[১৮] ওল্ড টেস্টামেন্টে এই স্বর্গীয় 'শক্তি'কে ঈশ্বরের 'প্রতাপ' (*কভোদ*) বলা হয়েছে। নিউ টেস্টামেন্টে তাবর পর্বতে ব্যক্তি ক্রাইস্টের মানবরূপ স্বর্গীয় রশ্মি দিয়ে বদলে যাওয়ার সময় (Transfigured) দেদীপ্যমান হয়েছিল। এবার সেই রশ্মি সারা বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে পড়ে রক্ষাপ্রাপ্তদের দেবত্ব দান করেছিল। 'শক্তি' বা *'এনার্জিয়াই'* শব্দটি যেমন বোঝায়, এটা ঈশ্বর সম্পর্কিত সক্রিয় ও গতিময় ধারণা ছিল। পশ্চিমে যখন ঈশ্বরকে তাঁর চিরন্তন গুণাবলী–তাঁর মহত্ত্ব বিচার, প্রেম ও সর্বশক্তিমত্তা–দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে দেখবে, তখন গ্রিকরা ঈশ্বরকে বিরামহীন তৎপরতার মাঝে কোনওভাবে উপস্থিত থাকার ভেতর দিয়ে নিজেকে দৃশ্যমান করে তুলতে দেখেছে।

সুতরাং, আমরা যখন প্রার্থনায় 'শক্তি'সমূহকে অনুভব করি, তখন এক অর্থে সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করি, যদিও জ্ঞানাতীত সত্তা স্বয়ং অস্পষ্টতার ঘেরাটোপে রয়ে যান। নেতৃস্থানীয় *হেচিসচ্যাস্ট* ইভাগ্রিয়াস পন্তাস (মৃত্যু. ৩৯৯) জোর দিয়ে বলেছেন, প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের যেটুকু জ্ঞান লাভ করি তাঁর সঙ্গে ধারণা বা ইমেজের কোনওই সম্পর্ক নেই, বরং এসবের অতীত এক প্রত্যক্ষ স্বর্গীয় অনুভূতি। সুতরাং, হেসিচ্যাস্টদের পক্ষে আত্মাকে উন্মুক্ত করে তোলা অত্যন্ত জরুরি ছিল: 'প্রার্থনা করার সময়,' সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে বলেছেন তিনি, 'নিজের ভেতর উপাস্যের কোনও রূপ গড়ে তুলবে না, আবার মনকে কোনও রূপ দিয়ে আকৃতি গড়তেও দেবে না।' বরং তার বদলে তাদের উচিত হবে 'অবস্তুগতভাবে অবস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়া।'[১৯] ইভাগ্রিয়াস অনেকটা ক্রিশ্চান যোগের প্রস্তাব রাখছিলেন। এটা চিন্তার কোনও প্রক্রিয়া ছিল না; প্রকৃতপক্ষে, 'প্রার্থনার মানে হচ্ছে চিন্তা দূর করা।'[২০] এটা বরং ঈশ্বরের সহজাত উপলব্ধি ছিল। এর ফলে সকল বস্তুর ঐক্যের বোধ সৃষ্টি হবে, বিক্ষোভ ও জটিলতা হতে নিস্তার মিলবে এবং অহমের বিনাশ ঘটবে–এই অভিজ্ঞতা বুদ্ধ মতবাদের মতো নিরীশ্বরবাদী ধর্মসমূহের ধ্যানের মাধ্যমে সৃষ্ট অভিজ্ঞতার মতো। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে অহংস্কার, লোভ, বিপদ বা

ক্রোধ এর মতো 'প্রবল আবেগ' যা তাদের অহমের সঙ্গে আটকে রাখে তা থেকে মনকে সরিয়ে এনে হেসিচ্যাস্টরা নিজেদের অতিক্রম করে যাবে এবং ঐশী 'শক্তি'তে তাবর পাহাড়ে রূপান্তরিত জেসাসের মতো একই রকম দেবত্ব লাভ করবে।

পঞ্চম শতাব্দীর ফটিসের বিশপ দিওদোকাস জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই দেবত্ব প্রাপ্তি পরকালের জন্যে অপেক্ষা করে না, বরং সচেতনভাবে ইহজগতেই অর্জন করা যেতে পারে। তিনি মনোসংযোগের একটা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন যার সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্পর্ক ছিল: শ্বাস গ্রহণের সময় হেসিচ্যাস্টরা প্রার্থনা করবে: 'জেসাস ক্রাইস্ট, ঈশ্বর-পুত্র'; শ্বাস ত্যাগ করতে করতে উচ্চারণ করতে হবে: 'আমাদের মার্জনা করুন।' পরবর্তীকালের হেসিচ্যাস্টরা এই অনুশীলনের পরিমার্জনা করে: ধ্যানীকে কাঁধ মাথা নিচু করে বুক বা নাভীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। মনের গভীরে হৃৎপিণ্ডের মতো নির্দিষ্ট কোনও শারীরিক অংশের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্যে খুব ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হবে। খুব কঠিন অনুশীলন ছিল এটি, অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে; একমাত্র অভিজ্ঞ গুরুর অধীনেই নিরাপদে এর চর্চা করা যেতে পারে। ক্রমে কোনও বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতো হেসিচ্যাস্ট নারী বা পুরুষ আবিষ্কার করবে যে সে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা আস্তে করে এক পাশে সরিয়ে রাখতে পারছে: মনে ভিড় জমানো ইমেজারি মিলিয়ে যাবে এবং হেসিচ্যাস্ট প্রার্থনায় বিলীন হয়ে স্থিরতার বোধ পাবে। গ্রিক ক্রিশ্চানরা নিজেরাই এমন কৌশল আবিষ্কার করেছিল যা প্রাচ্য দেশীয় ধর্মগুলোয় শত শত বছর ধরে অনুসৃত হয়ে আসছিল। প্রার্থনাকে তারা মানসিক বিকারজাত শারীরিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছে, অন্যদিকে অগাস্তিন ও গ্রেগরির মতো পাশ্চাত্যবাসীরা মনে করেছেন প্রার্থনায় শরীর হতে আত্মার মুক্তিলাভ ঘটা উচিত। ম্যাক্সিমাস দ্য কনফেসর জোর দিয়েছেন: 'সম্পূর্ণ মানুষকে ঈশ্বরে পরিণত মানুষের কৃপায় ঈশ্বরে পরিণত হতে হবে, প্রকৃতিগত দিক দেহ-আত্মায় সম্পূর্ণ মানুষ, প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পরিণত হবে সম্পূর্ণ মানুষ, আত্মা আর দেহ।'[২১] এমন শক্তিশালী ও জোরাল শক্তি আর স্পষ্টতার অনুভূতি লাভ করবে হেসিচ্যাস্ট যা ঐশ্বরিক না হয়ে পারে না। আমরা যেমন দেখেছি, গ্রিকরা এই 'দেবত্বপ্রাপ্তি'কে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক আলোকন হিসাবে দেখেছে। তাবর পর্বতে রূপান্তরিত ক্রাইস্টের মাঝে অনুপ্রেরণার সন্ধান পেয়েছিল তারা, ঠিক বৌদ্ধরা যেমন মানব সত্তার পূর্ণাঙ্গ বোধ লাভকারী বুদ্ধের প্রতিমূর্তি দেখে অনুপ্রাণিত হয়। প্রাচ্যের অর্থডক্স চার্চসমূহের ক্ষেত্রে রূপান্তরের দ্য ফিস্ট অভ ট্রান্সফিগারেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একে এপিফ্যানি, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বলা হয়। পশ্চিমের সতীর্থদের বিপরীতে গ্রিকরা ঈশ্বর-অনুভূতি লাভের ক্ষেত্রে মানসিক চাপ, শুষ্কতা ও

নৈঃসঙ্গকে অনতিক্রম্য পূর্বশর্ত হিসাবে দেখেনি: এগুলো তুচ্ছ বিকৃতি মাত্র এবং অবশ্যই নিরাময় করতে হবে। গ্রিকদের মাঝে আত্মার কৃষ্ণপক্ষের কোনও বিশ্বাস ছিল না। গেথসেমেন বা/এবং ক্যালভারি নয়, জোরাল মোটিফটি ছিল তাবর।

অবশ্য সবার পক্ষে এই সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো সম্ভব নয়, তবে প্রতিমার মাঝে অন্য ক্রিশ্চানরা এই অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতার খানিক ছটা দেখতে পাবে। পাশ্চাত্যে ধর্মীয় শিল্পকর্ম প্রবলভাবে প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে উঠছিল: জেসাস বা সাধুদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরছিল তা। অবশ্য, বাইযান্তিয়ামে ইহজগতের কোনও বিষয়কে তুলে ধরার জন্যে মূর্তি ব্যবহার করা হতো না, বরং অতিন্দ্রীয়বাদীদের অনুপ্রাণিত করার জন্যে হেসিচ্যাস্টদের অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা চিত্রায়িত করার প্রয়াস ছিল এটা। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ পিটার ব্রাউন যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, 'গোটা প্রাচ্য ক্রিশ্চান জগতে প্রতিমা ও দিব্যদর্শন একে অপরটিকে বৈধতা দান করেছে...সমন্বিত কল্পনার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে গভীর সন্নিবেশ...ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ অনির্বচনীয়তা একটা স্পষ্ট চেহারা লাভ করে, স্বপ্নে ও প্রতিটি মানুষের কল্পনায় যেখানে সাধারণভাবে এটা শিল্পে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিমা এক বাস্তবায়িত স্বপ্নের বৈধতা ছিল।'[২২] প্রতিমাসমূহ বিশ্বাসীকে উপদেশ দেওয়া বা কোনও তথ্য, ধারণা বা মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ছিল না। এগুলো ছিল ধ্যানের (*থিয়োরিয়া*) একটা কেন্দ্রবিন্দু, বিশ্বাসীকে স্বর্গীয় জগতের এক ধরনের জানালার ব্যবস্থা করে দিত।

AMARBOI.COM

অবশ্য অষ্টম শতাব্দী নাগাদ ঈশ্বরের বাইযান্তানীয় অভিজ্ঞতা এমন মূল বিষয়ে পরিণত হয় যে, সেগুলো গ্রিক চার্চে মতবাদ বিষয়ের প্রবল বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লোকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল যে, ক্রাইস্টকে আঁকতে গিয়ে শিল্পী আসলে ঠিক কী ওঁকেছেন। তাঁর ঐশ্বরিকতাকে তুলে ধরা অসম্ভব, কিন্তু শিল্পী যদি দাবি করেন যে, তিনি কেবল মানুষ জেসাসকে আঁকছেন, তাহলে নেস্টরিয়বাদের দোষে অপরাধী হবেন তিনি জেসাসের মানব ও স্বর্গীয় প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই ধর্মদ্রোহী বিশ্বাস। প্রতিমা বিরোধীরা সব রকম প্রতিমা ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু নেতৃস্থানীয় দুজন সাধু বেথেলহেমের নিকটবর্তী মার সাব্বাস মঠের জন অভ দামাস্কাস (৬৫৬-৭৪৭) ও কন্সতান্তিনোপলের নিকটস্থ স্তাদিয়াস মঠের থিয়োদর (৭৫৯-৮২৬) প্রতিমার পক্ষে দাঁড়ান। ক্রাইস্টের মূর্তি গড়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিমা বিরোধীর প্রয়াস ভুল বলে যুক্তি দেখান তাঁরা। আবতার পর্বের পর বস্তুজগৎ ও মানবদেহকে স্বর্গীয় মাত্রা দান করা হয়েছে। সুতরাং, শিল্পী এই নতুন ধরনের দেবত্বপ্রাপ্ত মানুষকে আঁকতে পারেন। ক্রাইস্ট দ্য

লগোস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। সুতরাং, শিল্পী ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিও আঁকছেন। ভাষা বা মানবীয় ধ্যান-ধারণায় ঈশ্বরকে তুলে ধরা সম্ভব নয়, কিন্তু শিল্পীর কলম বা শাস্ত্রের প্রতীকী ভঙ্গিতে তাঁকে 'বর্ণনা' করা যেতে পারে।

গ্রিকদের ধর্মানুরাগ প্রতিমার ওপর এত বেশি নির্ভরশীল ছিল যে ৮২০ সাল নাগাদ প্রতিমা বিরোধীরা জনতার কাছে পরাস্ত হয়েছিল। তবে ঈশ্বর এক অর্থে বর্ণনাযোগ্য ঘোষণা ডেনিসের অ্যাপেফ্যাটিক ধর্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যান ছিল না। *গ্রেটার অ্যাপলজি ফর দ্য হলি ইমেজেস*-এ সাধু নিসেফোরাস দাবি করেন প্রতিমাসমূহ 'ঈশ্বরের নীরবতার প্রকাশক, নিজেদের মাঝে সত্তার উর্ধ্বের এক রহস্যের অনিবর্চনীয়তাকে তুলে ধরে রুদ্ধ না হয়ে বক্তব্যহীন থেকে ধর্মতত্ত্বের তিনগুণ অলৌকিক সুরে ঈশ্বরের মহানুভবতার প্রশংসা করে।'[২৩] বিশ্বাসীকে চার্চের ডগমার অধীনস্ত হবার নির্দেশ দেওয়ার বদলে আপন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সাবলীল ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্যে প্রতিমাসমূহ তাদের এক রহস্যময়তার ভেতর ধরে রাখে। এইসব ধর্মীয় চিত্রকলার প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে নিসেফোরাস এর সঙ্গে কেবল সঙ্গীতেরই তুলনা টানতে পেরেছেন যা শিল্পকলার সবচেয়ে অনির্বচনীয় ও সম্ভবত সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ধরণ। সঙ্গীতের মাধ্যমে আবেগ ও অনুভূতি এমনভাবে প্রকাশিত হয় যা ভাষা ও ধারণাকে পাশ কাটিয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াল্টার প্যাটার উল্লেখ করেছিলেন, সকল চিত্রকলা সঙ্গীতের মতো অবস্থা সৃষ্টি করে; নবম শতাব্দীতে বাইযান্তিয়ামে গ্রিক ক্রিশ্চানরা ধর্মতত্ত্বকে মূর্তিবিদ্যার অনুরূপ হিসাবে দেখেছে। তারা দেখেছে যে, যৌক্তিক আলোচনার চেয়ে শিল্পকর্মেই বরং ঈশ্বরকে ভালোভাবে তুলে ধরা যায়। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর চরম ভাষানির্ভর খৃস্টতত্ত্বীয় বিতর্কের পর তারা ক্রিশ্চানদের কল্পনানির্ভর অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল এক ঈশ্বরের অবয়ব গড়ে তুলছিল।

এ বিষয়টির সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন কন্সতান্তিনোপলের ক্ষুদে মঠ সেইন্ট ম্যাকবাস এর অ্যাবট সিমিয়ন (৯৪৯-১০২২)। 'নিউ থিয়োলজিয়ান' হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। নতুন ধরনের এই ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরের সংজ্ঞা দেওয়ার কোনও প্রয়াস ছিল না। এটা, জোর দিয়ে বলেছেন সিমিয়ন, ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যাপার হবে। প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বর সম্পর্কে যেভাবেই যা কিছু বলা হোক না কেন, তাতে বোঝাবে যে, 'যা দুর্বোধ্য তা আসলে বোধগম্য।'[২৪] ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে যৌক্তিক বক্তব্য রাখার বদলে 'নতুন' ধর্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুভূতির উপর নির্ভর করেছে। ধারণাগতভাবে ঈশ্বরকে জানা অসম্ভব, যেন তিনি আরেকটি সত্তা মাত্র যার সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। ঈশ্বর এক রহস্য। ক্রাইস্টের রূপান্তরিত মানবদেহে নিজেকে

AMARBOI.COM

প্রকাশকারী ঈশ্বরের সচেতন অনুভূতি লাভকারী ব্যক্তিই প্রকৃত ক্রিশ্চান। সিমিয়ন পার্থিব জীবন থেকে আকস্মিকভাবে পাওয়া এক অভিজ্ঞতার সাহায্যে ধ্যানের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। প্রথমে কী ঘটছে সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই করতে পারেননি তিনি, কিন্তু ক্রমে বুঝতে পেরেছেন, তাঁর মাঝে পরিবর্তন ঘটছে, আলোয় বিলীন হয়ে যাচ্ছেন তিনি, যা আসলে স্বয়ং ঈশ্বর। এ আলো অবশ্যই আমাদের চেনা আলো নয়, এটা 'আকার, ইমেজ বা উপস্থাপনের' অতীত; 'কেবল প্রার্থনার মাধ্যমে সহজাতভাবে অনুভব করা সম্ভব।'[২৫] কিন্তু এই অভিজ্ঞতা কেবল অভিজাত বা সাধু শ্রেণীর জন্যে ছিল না; ফলে ক্রাইস্ট ঘোষিত রাজ্য হচ্ছে ঈশ্বরের বিলীন হওয়া যা পরকালের জন্যে অপেক্ষা না করেই সবাই ইহজগতেই অর্জন করতে পারে।

সুতরাং, সিমিয়নের কাছে ঈশ্বর জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, কাছের ও দূরের। কেবল 'ভাষার সাহায্যে অনিবর্চনীয় বিষয়কে'[২৬] বর্ণনার করার দুঃসাধ্য প্রয়াসের বদলে তিনি সাধুদের প্রতি নিজস্ব আত্মায় যা পরিবর্তনশীল সত্তা হিসাবে অনুভব করা সম্ভব সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এক দিব্যদর্শনের সময় ঈশ্বর সিমিয়নকে যেমন বলেছিলেন: 'হ্যাঁ, আমিই ঈশ্বর, যে তোমাদের সাথেই মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর দেখ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, যেমন দেখতে পাচ্ছ; আর আমি তোমাকে ঈশ্বরে পরিণত করব।'[২৭] ঈশ্বর বাহ্যিক, বস্তুগত সত্য নন বরং আবশ্যিকভাবে অন্তরের এবং ব্যক্তিগত আলোকপ্রাপ্তি ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনায় অস্বীকৃতির কারণে সিমিয়নের সঙ্গে অতীতের ধর্মতত্ত্বীয় দর্শনের বিচ্ছেদ ঘটেনি। তাঁর 'নতুন' ধর্মতত্ত্ব ফাদার্স অভ দ্য চার্চ-এর শিক্ষার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। *হইমস অভ ডিভাইন লাভ*-এ সিমিয়ন আথানাসিয়াস ও ম্যাক্সিমাস বর্ণিত মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তির গ্রিক মতবাদ প্রকাশ করেছেন:

> হে আলো, কেউ যার নাম বলতে পারে না, কারণ এর কোনও নামই নেই।
> হে আলো, বহু নামধারী, কারণ এটা সব বস্তুতেই ক্রিয়াশীল...
> ঘাসের সঙ্গে কীভাবে মেলাও তুমি নিজেকে?
> কীভাবে, অপরিবর্তিত থেকে একেবারে দুর্গম হয়ে ঘাসের ধর্ম অটুট রাখ তুমি?[২৮]

এই পরিবর্তন সম্পাদনকারী ঈশ্বরের সংজ্ঞা দেওয়া অর্থহীন, কারণ তিনি ভাষা ও বর্ণনার অতীত। তারপরেও মানুষের অখণ্ডতাকে অটুট রেখে তাঁকে পরিপূর্ণ ও বদলে দেওয়া অভিজ্ঞতা হিসাবে 'ঈশ্বর' এক তর্কাতীত বাস্তবতা। গ্রিকরা

ঈশ্বর সম্পর্কে ট্রিনিটি ও ইনকারনেশনের মতো ধারণা গড়ে তুলেছিল যা তাদের অন্য একেশ্বরবাদীদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। তাসত্ত্বেও তাদের অতিন্দ্রীয়বাদীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইহুদি ও মুসলিমদের অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতার প্রচুর মিল ছিল।

এমনকি পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) প্রধানত একটা ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগি ছিলেন, কিন্তু তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের কয়েকজন অতিন্দ্রীয়বাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। মুসলিমরা খুব দ্রুত নিজস্ব আলাদা অতিন্দ্রীয়বাদী ট্র্যাডিশন গড়ে তুলেছিল। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ইসলামের অন্যান্য গোষ্ঠীর পাশাপাশি একটা ভাববাদী রূপও বিকাশ লাভ করেছিল; এই ভাবাবাদীরা রাজদরবারের জাঁক ও উম্মাহর প্রাথমিককালের কৃচ্ছ্রতার অনুশীলন ত্যাগের ব্যাপারে মুতাযিলি ও শিয়াহদের মতোই উদ্বিগ্ন ছিল। পয়গম্বরের পছন্দ বলে কথিত উলের [আরবী সফ (SWF)] তৈরি কর্কশ পোশাকে মদীনার আদি মুসলিমদের সরল জীবন ধারায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস পেয়েছে তারা। পরবর্তীকালে এরাই 'সুফী' নামে পরিচিতি পায়। সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যাপারটি এদের ধর্মানুরাগের মূল বিষয় রয়ে যায়, প্রয়াত ফরাসি পণ্ডিত লুই ম্যানিন যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> অতিন্দ্রীয় আহ্বান নিয়ম হিসাবে সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিবেকের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফল, কেবল অন্যদের নয়, বরং প্রধানত ও বিশেষভাবে নিজের অপরাধের বিরুদ্ধে, অন্তরের পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে যেকোনও মূল্যে ঈশ্বরকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় যা জোরদার হয়ে ওঠে।[২৯]

AMARBOI.COM

শুরুর দিকে অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সুফীদের অনেক মিল ছিল। এভাবে বিশিষ্ট মুতাযিলি যুক্তিবাদী ওয়াসিল ইবন আতা (মৃত্যু. ৭৪৮) পরবর্তীকালে সুফীবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিগণিত মদীনার দরবেশ হাসান আল-বসরির (মৃত্যু. ৭২৮) শিষ্য ছিলেন।

উলেমাগণ ইসলামকে একক ও সত্য ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করে একে অন্যান্য ধর্ম হতে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিচ্ছিলেন, কিন্তু সুফীগণ সঠিক পথে পরিচালিত সকল ধর্মের ঐক্যের কোরানের দর্শন মোটামুটি অনুসরণ করে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, জেসাস বহু সুফীর অভ্যন্তরীণ জীবনের পয়গম্বর হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। কেউ কেউ এমনকি 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও প্রভু নেই এবং জেসাস তাঁর বার্তাবাহক,' উচ্চারণ করার জন্যে বিশ্বাসের ঘোষণা শাহাদা পরিবর্তন করেছে যা কৌশলগত দিক থেকে শুদ্ধ কিন্তু

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তর্কোদ্দীপক। কোরান যেখানে আতঙ্ক ও ভয় জাগানো ন্যায়বিচারের ঈশ্বরের কথা বলে, সেখানে প্রাথমিক ভাববাদী নারী রাবিয়াহ (মৃত্যু. ৮০১) এমনভাবে ভালোবাসার কথা বলেছেন, ক্রিশ্চানরা তাঁকে পরিচিত আবিষ্কার করত:

দুভাবে আমি তোমায় ভালোবাসি: স্বার্থপরের মতো,
এবং তারপর, যা তোমার উপযুক্ত।
আমার ভালোবাসা স্বার্থপর ভালোবাসা নয়,
কেবল সারাক্ষণ আমি তোমারই কথা ভাবি।
নিখাদ এই ভালোবাসা যখন তুমি তুলে ধর
আমার বিমুগ্ধ দৃষ্টির আবরণ।
সেখানে বা এতে আমার প্রশংসা নেই:
উভয় প্রশংসাই তোমার, আমি বিশ্বাস করি।[৩০]

এটা তাঁর সুবিখ্যাত প্রার্থনার কাছাকাছি: 'হে প্রভু, যদি আমি নরকের শাস্তির ভয় থেকে তোমার উপাসনা করি, আমাকে নরকের আগুনে পুড়িয়ো; যদি স্বর্গের প্রলোভনে উপাসনা করি, আমাকে স্বর্গ হতে বঞ্চিত করো, কিন্তু যদি কেবল তোমার জন্যেই উপাসনা করি, তোমার চিরন্তন সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করে রেখো না।'[৩১] ঈশ্বর-প্রেম সুফীবাদের মূল সুরে পরিণত হয়েছে। সুফীরা হয়তো বা নিকট প্রাচ্যের ক্রিশ্চান ভাববাদীদের দ্বারা ভালোভাবেই প্রভাবিত হয়ে থাকবে, তবে মুহাম্মদ (স) ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী হিসাবে রয়ে গেছেন। প্রত্যাদেশ পাওয়ার সময় মুহাম্মদের (স) যেমন অনুভূতি হয়েছিল অবিকল সেই অনুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছে তারা। স্বাভাবতই, তাঁর অতিন্দ্রীয় স্বর্গারোহণের ঘটনার দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন তারা, যা তাদের ঈশ্বর বোধের আদর্শে পরিণত হয়।

AMARBOI.COM

সচেতনতার এক বিকল্প অবস্থা অর্জনে গোটা দুনিয়ার অতিন্দ্রীয়বাদীদের সাহায্যকারী কৌশল ও অনুশীলনও আবিষ্কার করেছে তারা। মুসলিম আইনের মৌল চাহিদার অতিরিক্ত উপবাসের রেওয়াজ, রাত্রি জাগরণ ও মন্ত্রের মতো স্বর্গীয় নাম জপার বিষয় যোগ করেছে। এইসব চর্চার ফলে মাঝে মাঝে এমন সব আচরণের সৃষ্টি হতো যাকে অদ্ভুত ও অনিয়ন্ত্রিত মনে হতো। এসব অতিন্দ্রীয়বাদীরা 'মাতাল' সুফী হিসাবে পরিচিত ছিল। এদের মাঝে সর্বপ্রথমজন ছিলেন আবু ইয়াযিদ বিস্তামি (মৃত্যু. ৮৭৪), রাবিয়াহ্‌র মতো প্রেমিক রূপে ঈশ্বরের নৈকট্য প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানবীয় প্রেমের ক্ষেত্রে নারীকে খুশী করার মতোই আল্লাহকে খুশি করতে

প্রয়াস পেতে হবে যাতে নিজের সমস্ত প্রয়োজন ও চাহিদা বিসর্জন দিয়ে প্রেমাস্পদের মাঝে বিলীন হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু অর্জনের জন্যে যে অন্তর্মুখী অনুশীলনের আবিষ্কার করেছিলেন সেটা তাঁকে তার ব্যক্তিরূপ ঈশ্বরের ধারণার ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। আপন পরিচয়ের অন্তস্তলে পৌঁছে আবিষ্কার করেছেন যে, ঈশ্বর ও তাঁর মাঝে কোনও বাধা নেই; প্রকৃতপক্ষে যা কিছু তিনি 'সত্তা' হিসাবে জানতেন, তা যেন বিলীন হয়ে গেছে:

> সত্যের চোখ দিয়ে আমি [আল্লাহর দিকে] তাকালাম এবং তাঁকে বললাম: 'কে এটা?' তিনি বললেন: 'আমিও নই, আবার আমি ছাড়া অন্য কেউও নয়। আমি ছাড়া আর কোনও প্রভু নেই।' তারপর আমাকে আমার পরিচয় হতে পরিবর্তিত করে তাঁর সত্তায় গ্রহণ করলেন....তারপর আমি তাঁর মুখের জিহ্বার সাহায্যে তাঁর সঙ্গে ভাব বিনিময় করলাম, বললাম: 'আমার সঙ্গে তোমার কী ঘটেছে?' তিনি বললেন, 'তোমার মাঝেই আমি; তুমি ছাড়া আর কোনও প্রভু নেই।'[৩২]

কিন্তু আবারও, মানবজাতির 'মহাকাশে' বাহ্যিক কোনও উপাস্য ছিল না এটা। ঈশ্বর রহস্যজনকভাবে গভীরতম সত্তার সঙ্গে একীভূত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছেন। অহমবোধের পদ্ধতিগত বিনাশ এক বৃহৎ অনির্বচনীয় সত্তায় বিলীন হওয়ার অনুভূতির দিকে নিয়ে যায়। বিলীন (*ফানা*) হয়ে যাবার এই অবস্থাটি সুফী আদর্শের মূল বিষয়ে পরিণত হয়। অন্য বহু মুসলিম কোরান নির্দেশিত প্রকৃত ইসলামের উপলব্ধি হিসাবে স্বীকার করে না নিলে বিস্তামি যেভাবে শাহাদার নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন তাকে ব্লাসফেমাস বলেই অভিহিত করা হতে পারত।

AMARBOI.COM

'সোবার' সুফী বলে পরিচিত অপর অতিন্দ্রীয়বাদীরা অপেক্ষাকৃত কম কোলাহলময় আধ্যাত্মিকতার পক্ষপাতি ছিল। ভবিষ্যতের সকল ইসলামি অতিন্দ্রীয়বাদীদের মূল নকশা প্রণয়নকারী বাগদাদের আল জুনায়েদ (মৃ. ৯১৯) বিশ্বাস করতেন যে, বিস্তামির চরম পন্থা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে *ফানা* (বিলীন) কে অবশ্য *বাকা*–এক বর্ধিত সত্তায় প্রত্যাবর্তন করা–দ্বারা অনুসৃত হতে হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনে আমাদের স্বাভাবিক ক্ষমতাবলী ধ্বংস হওয়া চলবে না, বরং তা সম্পূর্ণতা পাবে: আপন সত্তার গভীর মর্মমূলে স্বর্গীয় সত্তা আবিষ্কার করার জন্যে প্রতিবন্ধক অহমবোধকে ছিন্নভিন্নকারী একজন সুফীর বাড়তি আত্মোপলব্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণবোধের অধিকারী হওয়ার কথা। সে আরও বেশি করে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। সুতরাং, সুফীরা যখন '*ফানা ও বাকা*'র অনুভূতি তর্জন করেছে তখন এমন এক অবস্থা অর্জন করেছিল গ্রিক ক্রিশ্চানরা যাকে

'দেবত্বপ্রাপ্তি' বলবে। আল জুনায়েদ গোটা সুফী অনুসন্ধানকে সৃষ্টির মুহূর্তে মানুষের আদিম রূপে প্রত্যাবর্তন হিসাবে দেখেছেন: সে ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ মানব সত্তায় ফিরে যাচ্ছে। আপন সত্তা বা অস্তিত্বের উৎসেও ফিরে যাচ্ছে সে। প্লোটোনিক বা নস্টিক অভিজ্ঞতার মতো বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং দূরত্ব সৃষ্টি সুফীদের কাছেও মৌলিক বিষয় ছিল: এটা সম্ভবত আজকাল ফ্রয়েডিয় ও ক্লিনিয়রা যে 'বিচ্ছিন্নতা'র কথা বলে তা থেকে আলাদা নয়, যদিও সাইকোঅ্যানালিস্টরা এর পেছনে নিরীশ্বরবাদী উৎসের কথা বলেন। আল-জুনায়েদ শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর মতো 'অভিজ্ঞ' ও দক্ষ সুফী শিক্ষকের (*পির*) তত্ত্বাবধানে একজন মুসলিম স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, কোরান অনুসারী যে অভিজ্ঞতা আদমের কুঁচকি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার সময় সে অর্জন করছিল। এটা বিচ্ছিন্নতা ও বিষাদের সমাপ্তি। এটা গভীর সত্তার সঙ্গে মিলন, যে সত্তা বিশেষ নারী বা পুরুষটির হওয়ার কথা ছিল। ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন বাহ্যিক কোনও সত্তা ও বিচারক নন, বরং কোনওভাবে প্রতিটি সত্তার মূলে একীভূত:

এখন আমি জানতে পেরেছি, হে প্রভু,
কী আছে আমার অন্তরে;
গোপনে, গোটা জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন
আমার জিভ আমার পূজনীয়র সাথে কথা বলেছে।
সুতরাং, এক অর্থে আমরা
আমরায় একীভূত, এবং এক;
কিন্তু অন্যভাবে বিচ্ছেদ
আমাদের চিরকালীন অবস্থা।

যদিও আমার দৃষ্টির সামনে
থেকে তোমার সত্তার গভীর আতঙ্ক আড়াল করে রেখেছ,
বিস্ময়ভরা ও প্রবল ভারময় আশীর্বাদে
আমি অনুভব করি আমার গভীর ভিত্তি ছুঁয়েছ তুমি।[৩৩]

AMARBOI.COM

একত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ কোরানের *তৌহীদের* আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: আপন তুচ্ছ অমোঘ মত্ত সত্তাকে নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যক্তিগত সংহতিতে স্বর্গীয় সত্তা অনুভব করবে।

অতিন্দ্রীয়বাদের বিপদ সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন আল-জুনায়েদ। *পিরের* পরামর্শ লাভ করেনি ও কঠিন সুফী প্রশিক্ষণবিহীন ব্যক্তিদের

পক্ষে অতিন্দ্রীয়বাদী পরমানন্দের অনুভূতিকে ভুল বোঝা খুবই সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারে; নিজেকে তখন ঈশ্বরের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে হয়তো খুব সরল অর্থ করে বসবে সে। আল-বিস্তামির মতো ব্যক্তিদের অসংজত দাবি নিঃসন্দেহে শাসকযন্ত্রের বিরক্তি সৃষ্টি করেছিল। একেবারে গোড়ার দিকে সুফীবাদ একটি সংখ্যালঘু আন্দোলনে সীমিত ছিল। *উলেমা*গণ প্রায়ই একে অসত্য আবিষ্কার হিসাবে বিবেচনা করেছেন। জুনায়েদের বিখ্যাত শিষ্য হুসেইন ইবন মনসুর (সাধারণভাবে ইনি আল-হাল্লাজ বা উল-কার্ডার নামে পরিচিত) অবশ্য সকল সাবধানতা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন; পরিণত হয়েছিলেন অতিন্দ্রীয়বাদী বিশ্বাসের শহীদ। খেলাফতের উৎখাত ও এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে গোটা ইরাক ঘুরে বেড়াতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের হাতে প্রথমে বন্দি এবং পরে তাঁর আদর্শ জেসাসের মতো ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জীবন দিয়েছিলেন তিনি। পরমানন্দের মুহূর্তে আল-হাল্লাজ চিৎকার করে বলে উঠছিলেন: 'আমিই সত্য।' গস্পেলসমূহের বিবরণ অনুযায়ী জেসাসও নিজেকেই পথ, সত্য ও জীবন বলে আখ্যা দিয়ে একই দাবি করেছিলেন। ক্রাইস্টের দেহে ঈশ্বরের অবতারের খৃস্টিয় বিশ্বাসকে কোরান বারবার ব্লাসফেমাস বলে নিন্দা জানিয়েছে, সুতরাং আল-হাল্লাজের আনন্দ-চিৎকারে মুসলিমদের আশঙ্কিত হয়ে ওঠাটা বিচিত্র কিছু নয়। *আল-হক* আল্লাহ্‌র অন্যতম নাম, তুচ্ছ মরণশীল কারও পক্ষে এ উপাধি দাবি করাটা বহুঈশ্বরবাদীতার শামিল। আর-হাল্লাজ আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর একীভূত হওয়ার অনুভূতিকে প্রকাশ করেছিলেন যাকে কিনা নিজের তাঁর একীভূত হওয়ার মতো মনে হয়েছিল। তিনি তাঁর এক কবিতায় যেমন বলেছেন:

> আমিই সে যাঁকে আমি ভালোবাসি, এবং আমি যাঁকে ভালোবাসি সে আমি:
> আমরা এক দেহে দুটি আত্মা।
> যদি তুমি আমাকে দেখ, তাকে দেখতে পাবে,
> যদি তাকে দেখতে পাও, তাহলে আমাদের দুজনকেই দেখবে।[৩৪]

গুরু আল-জুনায়েদ সত্তার বিলোপ ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনুভূতিকে *ফানা* আখ্যায়িত করেছেন, এটা তাঁরই দুঃসাহসী প্রকাশ। ব্লাসফেমির অভিযোগে অভিযুক্ত আল-হাল্লাজ তাঁর দাবি প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রকৃত সন্ন্যাসীর মৃত্যুকে বেছে নেন।

> ক্রুশবিদ্ধ করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলে ক্রুশ ও শূল দেখার পর সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে তিনি এক প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করেন, যার

> সমাপ্তিটুকু ছিল এরকম: 'আর তোমার যেসব দাস তোমার ধর্মের রক্ষায় ও তোমার করুণা লাভের উদ্দেশ্যে আমাকে কতল করবে বলে সমবেত হয়েছে, হে প্রভু, তোমার করুণায় তাদের ক্ষমা করে দাও, তাদের ওপর দয়া বর্ষণ কর; কারণ নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছ সেভাবে ওদের সামনে প্রকাশিত হলে, ওরা যা করেছে তা করতে পারত না; আজ ওদের কাছে যা গোপন রেখেছ তা যদি তুমি আমার কাছেও গোপন রাখতে তাহলে আমাকে এই দুর্দশার মুখোমুখি হতে হতো না। তোমার সকল কাজই মহিমান্বিত এবং তোমার সকল ইচ্ছাই মহান।'[৩৫]

আল-হাল্লাজের উচ্চারণ *আনা আল-হক:*—'আমিই সত্য!'—দেখায় যে, অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর বস্তুগত সত্তা নন বরং গভীরভাবে ভক্তিমূলক। পরে আল-গাযযালি যুক্তি দেখিয়েছেন, আল-হাল্লাজ ব্লাসফেমি করেননি, বরং অনভিজ্ঞদের বিভ্রান্ত করতে পারে এমন একটি নিগূঢ় সত্য প্রকাশ করে অপরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। যেহেতু আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও সত্তা নই—*শাহাদাহ্* যেমনটি বুঝিয়ে থাকে—সকল মানুষই অত্যাবশ্যকীয়ভাবে স্বর্গীয়। কোরান শিক্ষা দিয়েছে, ঈশ্বর তাঁর অবিকল প্রতিমূর্তিতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি আয়নায় নিজেকে দেখার মতো করে ধ্যানমগ্ন হতে পারেন।[৩৬] সেকারণেই তিনি ফেরেশতাদের প্রথম মানুষের সামনে মাথা নত করে উপাসনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুফীরা যুক্তি দেখিয়েছে যে, ক্রিশ্চানরা মাত্র একজন ব্যক্তিকে গোটা স্বর্গীয় সত্তা ধারণকারী হিসাবে গ্রহণ করে ভুল করেছিল। আপন সত্তার মাঝে ঈশ্বরের মূল দর্শন আবিষ্কারকারী অতিন্দ্রীয়বাদী সৃষ্টির প্রথম দিনে যেমন ছিল নিজের মাঝেই তেমনি নতুন করে স্বর্গীয় ইমেজ আবিষ্কার করছে। সুফীদের অত্যন্ত পছন্দের পবিত্র বিবরণী *হাদিসে কুদসি* দেখায়, ঈশ্বর মুসলিমদের এমনভাবে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন যে মনে হয় তিনি তাঁর প্রত্যেক দাসের মাঝে স্থান করে নিয়েছেন: 'আমি যখন তাঁকে ভালোবাসি, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে, চোখ হই যা দিয়ে সে দেখে, হাতে পরিণত হই যা দিয়ে সে ধরে এবং পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে।' আল-হাল্লাজের কাহিনী অতিন্দ্রীয়বাদী ও ধর্মীয় প্রশাসনের সম্ভাব্য গভীর বৈরিতাকেও তুলে ধরে, যাদের ঈশ্বর ও প্রত্যাদেশ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা রয়েছে। অতিন্দ্রীয়বাদীর কাছে প্রত্যাদেশ এমন একটি ঘটনা যা তার আপন আত্মায় সংঘটিত হয়, কিন্তু প্রথাগত ধারণায় যারা বিশ্বাসী, যেমন *উলেমাহদের* বেলায় এ ঘটনা সম্পূর্ণই অতীতের ব্যাপার। কিন্তু আমরা দেখেছি, একাদশ শতাব্দীতে ইবন সিনা ও স্বয়ং আল-গাযযালির মতো মুসলিম দার্শনিকরা ঈশ্বরের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ অসন্দোষজনক

AMARBOI.COM

আবিষ্কার করে অতিন্দ্রীয়বাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। আল-গাযযালি সুফীবাদকে এস্টাবলিশমেন্টের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন; দেখিয়েছিলেন যে, এটাই মুসলিম আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে খাঁটি রূপ। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইরানী দার্শনিক ইয়াহিয়া সুহরাওয়ার্দি এবং স্প্যানিশ বংশোদ্ভুত মুঈদ আদ-দিন ইবন আল-আরাবী ইসলামি ফালসাফাহকে অতিন্দ্রীয়বাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে ইসলামি সাম্রাজ্যের বহু স্থানেই অতিন্দ্রীয়বাদীদের অনুভূত ঈশ্বরকে সাধারণ মাপকাঠিতে পরিণত করেন। অবশ্য আল-হাল্লাজের মতো সুহরাওয়ার্দিও ১১৯১ সালে আলেপ্পোতে অস্পষ্ট কারণে *উলেমাদের* হাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষায় আদি 'প্রাচ্য' ধর্মকে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এভাবে ইবন সিনা প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমাপ্তি টানতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি ছিল প্রাচীন কালের সকল সাধুই একটিমাত্র মতবাদ প্রচার করে গেছেন। আদিতে হারমিসের–সুহরাওয়ার্দী যাঁকে কোরানে উল্লেখিত পয়গম্বর ইদ্রিস এবং বাইবেলে বর্ণিত ইনোক বলে শনাক্ত করেছেন—কাছে প্রকাশিত হয়েছিল; গ্রিক বিশ্বে প্লেটো ও পিথাগোরাস এবং মধ্যপ্রাচ্যে যরোস্ট্রীয় ম্যাজাইদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। অবশ্য অ্যারিস্টটলের পরবর্তী সময় থেকে এটা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও মস্তিষ্কজাত দর্শনের ফলে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল-বিস্তামি ও আল-হাল্লাজ হয়ে স্বয়ং সুহরাওয়ার্দির কাছে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সাধু পরম্পরায় গোপনে বাহিত হয়ে আসছিল। এই চিরন্তন দর্শন অতিন্দ্রীয়বাদী ও কল্পনানির্ভর কিন্তু যুক্তিকে বিসর্জন দিতে বলেনি। সুহরাওয়ার্দি বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে আল-ফারাবির মতোই কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তেমনি আবার সত্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অনুভূতির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। কোরান যেমন শিক্ষা দিয়েছে: সকল সত্য ঈশ্বর হতে আগত এবং সর্বত্রই সত্যের সন্ধান করা উচিত। একেশ্বরবাদের মতো পৌত্তলিকতাবাদ ও যরোস্ট্রিয়বাদেও এর দেখা মিলতে পারে। গোঁড়া ধর্মের বিপরীতে, নিজেকে যা গোত্রীয় বিরোধের দিকে ঠেলে দেয়, অতিন্দ্রীয়বাদ প্রায়শঃই দাবি করে যে, মানুষের মতো ঈশ্বরের কাছে যাবারও অসংখ্য পথ রয়েছে। সুফীবাদ বিশেষ করে অন্যদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অসাধারণ উপলব্ধি গড়ে তুলেছে।

সুহরাওয়ার্দিকে প্রায়শঃই শেখ আল-ইশরাক বা আলোকনের গুরু আখ্যায়িত করা হয়। গ্রিকদের মতো আলো রূপে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তিনি। আরবী ভাষায় *ইশরাক* বলতে পুব আকাশে দেখা দেওয়া ভোরের প্রথম আলো ও আলোকন বোঝায়: সুতরাং প্রাচ্য ভৌগলিক কোনও

স্থান নয়, বরং আলো ও শক্তির উৎস। সুতরাং সুহরাওয়ার্দির প্রাচ্য ধর্ম বিশ্বাসে মানুষ অস্পষ্টভাবে আপন উৎসকে স্মরণ করতে পারে, এই ছায়াচ্ছন্ন জগতে অস্বস্তিবোধ করে সে এবং আদি-আশ্রয়ে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষায় থাকে। সুহরাওয়ার্দি দাবি করেছেন যে, তাঁর দর্শন মুসলিমদের কল্পনার সাহায্যে চিরন্তন প্রজ্ঞাকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে সত্য অবস্থান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

সুহরাওয়ার্দির অসম্ভব জটিল দর্শন বা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল গোটা বিশ্বের সকল ধর্মীয় দর্শনকে একটি মাত্র আধ্যাত্মিক ধর্মে সংযুক্ত করা। যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই সত্যের সন্ধান করতে হবে। পরিণামে তাঁর দর্শন ইসলাম-পূর্ব ইরানি সৃষ্টিতত্ত্বকে টলেমিয় প্ল্যানেটারি সিস্টেম ও উৎসারণের নিওপ্লেটোনিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও অন্য কোনও ফায়লাসুফ এত ব্যাপকভাবে কোরান হতে উদ্ধৃতি দান করেনি। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনার সময় সুহরাওয়ার্দি প্রাথমিকভাবে বিশ্বজগতের বস্তুগত উৎস সম্পর্কে আগ্রহ দেখাননি। তাঁর অসাধারণ রচনা *দ্য উইজডম অভ ইল্লিউমিনেশন*-এ সুহরাওয়ার্দি পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, কিন্তু সেটা ছিল কেবল তাঁর রচনার অতিন্দ্রীয়বাদী অংশের ভূমিকা মাত্র। ইবন সিনার মতো তিনিও ফালসাফাহ্‌র সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠতায় অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, যদিও সামগ্রিক সত্তার অনুধাবনে যৌক্তিক ও মেটাফিজিক্যাল আঁচ অনুমানের স্থান আছে বলে মনে করতেন তিনি। তাঁর মতে একজন প্রকৃত সাধু দর্শন ও অতিন্দ্রীয়বাদ উভয় ক্ষেত্রেই সফল। পৃথিবীতে এমন একজন সাধু সবসময়ই থাকেন। শিয়াহ্‌দের ইমামবাদের খুব কাছাকাছি এক তত্ত্বে সুহরাওয়ার্দি তাঁর বিশ্বাস তুলে ধরেছেন যে, এই আধ্যাত্মিক নেতাই প্রকৃত খুঁটি যার উপস্থিতি ছাড়া এই পৃথিবী টিকে থাকতে পারত না, যদি তিনি আড়ালেও থাকেন। সুহরাওয়ার্দির *ইশরাকি* অতিন্দ্রীয়বাদের চর্চা এখনও ইরানে চালু আছে। বিশেষ ধরনের বলেই নিগূঢ় ব্যবস্থা নয় এটি বরং এতে ইসমায়েলি ও সুফীদের মতো বিশেষ আধ্যাত্মিক ও কল্পনানির্ভর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

গ্রিকরা হয়তো সুহরাওয়ার্দির পদ্ধতিকে *কোরিগম্যাটিক* না বলে *ডগম্যাটিক* আখ্যায়িত করত। তিনি সকল ধর্ম ও দর্শনের মূলে লুকায়িত কল্পনানির্ভর মূল বিষয়টি আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছিলেন। যদিও যুক্তিকে যথেষ্ট মনে করেননি, তবুও গভীরতম রহস্যসমূহ নিয়ে অনুসন্ধানের অধিকার অস্বীকার যাননি কখনও। নিগূঢ় অতিন্দ্রীয়বাদের মতো বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদেও সত্যের সন্ধান করতে হবে। সমালোচনামূলক বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে অনুভূতিকে জ্ঞাত ও অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে।

AMARBOI.COM

নাম হতে যেমন বোঝায়, ইশরাকি দর্শন মূল বিষয় আলোর প্রতীক যাকে ঈশ্বরের নিখুঁত সমার্থক হিসাবে দেখা হয়েছে। এটা (অন্তত দ্বাদশ শতাব্দীতে) অবস্তুগত ও সংজ্ঞাতীত ছিল, কিন্তু তারপরও জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যও ছিল: সম্পূর্ণভাবে স্বপ্রকাশিত; এর সংজ্ঞা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু জীবন ধারণ সম্ভব করে তোলা উপাদান হিসাবে সবার উপলব্ধিতে ছিল। এটা ছিল সর্বব্যাপী: বস্তুর সমস্ত ঔজ্জ্বল্য সরাসরি তাদের বহিস্থ এক উৎস আলোর কাছ থেকে পাওয়া। সুহরাওয়ার্দি উৎসারণবাদী সৃষ্টিতত্ত্বে আলো সমূহের আলো ফায়লাসুফদের প্রয়োজনীয় সত্তার সমার্থক, যা অবিমিশ্র সরল। এটা নিম্নমুখী ধারাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নতর আলো তৈরি করে; প্রতিটি আলো আলোসমূহের আলোর ওপর নিজের নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করে একটা ছায়া-সত্তা গঠন করে যা টলেমিয় বলয়সমূহের অনুরূপ বস্তুজগতের উৎস। এটা ছিল মানুষের দুর্দশার এক উপমা। আমাদের সবার মাঝেই এরকম আলো-আঁধারের সমাবেশ রয়েছে। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে (ইবন সিনার প্রকল্পে আমাদের জগতের আলো জিব্রাইল ফেরেশতা বলেও পরিচিত) ভ্রূণে আলো বা আত্মা প্রবিষ্ট করানো হয়। আত্মার আলোর সর্বোচ্চ জগতের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে কুতব (সাধু) বা তাঁর কোনও শিষ্যের হাতে সঠিকভাবে নির্দেশনা লাভ করলে ইহজগতেই তার পক্ষে এর একটা আভাস লাভ সম্ভব।

সুহরাওয়ার্দি *হিকমাত*-এ তাঁর আপন আলোকনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন তিনি, কিন্তু কোনও সুরাহা খুঁজে পাচ্ছিলেন না; অর্জিত বিদ্যা হতে কিছুই জানতে পারেননি। তখন সহসা ইমাম, বা কুতব, আত্মার আরোগ্যকারীর দর্শন লাভ করেন।

> সহসা কোমলতায় আবৃত হলাম আমি; চোখ ধাঁধানো ঝলক দেখলাম, তারপর মানুষের মতো স্বচ্ছ আলো চোখে পড়ল। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম আমি, এবং ওই যে তিনি...আমার কাছে এগিয়ে এলেন তিনি, এত কোমলভাবে স্বাগত জানালেন যে আমার বিস্ময়ানুভূতি মুছে গেল, আমার ভয় পরিচয়ে রূপ নিল। তারপর আমি জ্ঞানের ব্যাপারে, সমস্যার ব্যাপারে তাঁর কাছে অভিযোগ তুললাম।
>
> 'নিজেকে জাগিয়ে তোল,' আমাকে বললেন তিনি, 'তোমার সমস্যা মিটে যাবে।'[৩৭]

সজাগ বা আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া পয়গম্বরত্ব লাভের কষ্টকর প্রবল অনুপ্রেরণা হতে একেবারেই আলাদা। এর সঙ্গে বুদ্ধের শান্ত আলোকনের বরং

অনেক বেশি মিল ছিল: অতিন্দ্রীয়বাদ ঈশ্বরের ধর্মে অপেক্ষাকৃত শান্ত আধ্যাত্মিকতার সূচনা করছিল। বাহ্যিক কোনও সত্তার সঙ্গে সংঘাতের বদলে স্বয়ং অতিন্দ্রীয়বাদীর অন্তর হতে আলোকপ্রাপ্তি ঘটবে। এখানে সত্য অবহিত করার কোনও ব্যাপার ছিল না। তার বদলে মানবীয় কল্পনার অনুশীলন মানুষকে *আলাম আল-মিথাল*–খাঁটি প্রতিরূপের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম করে তুলবে।

সুহরাওয়ার্দি ইরানের প্রাচীন স্বর্গীয় আদি আদর্শ জগতের বিশ্বাসে ফিরে গিয়েছেন, যেখানে *গেতিক* (জাগতিক, বস্তুগত পৃথিবী)-এর প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুর আবার *মেনকে* (স্বর্গীয় রাজ্য) অবিকল মূর্তি রয়েছে। অতিন্দ্রীয়বাদ ঈশ্বর-ধর্মসমূহ কর্তৃক পরিত্যক্ত প্রাচীন মিথলজিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। সুহরাওয়ার্দি প্রকল্পে *আলাম আল-মিথাল*-এ পরিণত *মেনক* এখন আমাদের জগৎ ও ঈশ্বরের মাঝে অবস্থিত মধ্যবর্তী এক জগৎ। যুক্তি বা ইন্দ্রিয় বোধ দিয়ে একে বোঝা যাবে না। সৃজনশীল কল্পনার গুণই আমাদেরকে গুপ্ত আদর্শজগৎ আবিষ্কারে সক্ষম করে তুলেছে, ঠিক কোরানের প্রতীকী ব্যাখ্যা যেভাবে এর প্রকৃত আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশ করেছে। *আলাম আল-মিথাল* ইসলামের আধ্যাত্মিক ইতিহাস সম্পর্কে ইসমাইলিদের ধারণা কিংবা ইবন সিনার দেবদূতবিদ্যার কাছকাছি, আগের অধ্যায়ে আমরা এনিয়ে আলোচনা করেছি: যা জাগতিক ঘটনাবলীর প্রকৃত অর্থ বহন করে। ইসলামের পরবর্তীকালে অতিন্দ্রীয়বাদীদের জন্য তাদের অভিজ্ঞতা ও দিব্যদর্শনের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুহরাওয়ার্দি এমন সব দিব্যদর্শন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন যা অসংখ্য এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির শামান, অতিন্দ্রীয়বাদী বা দরবেশ যেই প্রত্যক্ষ করে থাকুক না কেন বিস্ময়করভাবে একরকম। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়টিকে ঘিরে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। জাং-এর সম্মিলিত চেতনাহীনতার ধারণাটি মানুষের এই সাধারণ কল্পনা নির্ভর অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার সবচেয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রয়াস। রোমানীয়-আমেরিকান ধর্মীয় দার্শনিক মির্চা এলিয়াদের মতো অন্য পণ্ডিতগণ দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন কীভাবে প্রাচ্যীয় কবিদের মহাকাব্য এবং বিশেষ ধরণের কিছু রূপকথা ভাববাদী অভিযাত্রা ও অতিন্দ্রীয়বাদী যাত্রা হতে নেওয়া হয়েছে।[৩৮]

সুহরাওয়ার্দি জোর দিয়ে বলেছেন যে, অতিন্দ্রীয়বাদীদের দিব্যদর্শন ও ঐশীগ্রন্থের প্রতীকসমূহ–যেমন, স্বর্গ, নরক ও শেষ বিচার–আমাদের এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতার মতোই বাস্তব, তবে একই রকম নয়। এগুলো প্রথাগতভাবে প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু কল্পনার ক্ষমতা দিয়ে বোঝা যাবে, দিব্যদ্রষ্টাকে যা জাগতিক ঘটনাবলীর আধ্যাত্মিক মাত্রা দেখায় সক্ষম করে



AMARBOI.COM

তোলে। যাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেই তারা এই অভিজ্ঞতা বোধ করতে পারে না, ঠিক যেমন প্রয়োজনীয় নৈতিক ও মানসিক অনুশীলনে অভ্যস্ত হওয়ার পরেই কেবল বৌদ্ধদের আলোকন লাভ সম্ভব। আমাদের সকল চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও দর্শন *আলম-আল মিথালের* বাস্তবতার অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ, পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) রাত্রি দর্শনের সময় এই মধ্যবর্তী জগৎ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন, যা তাঁকে ঐশী জগতের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। সুহরাওয়ার্দি হয়তো এও দাবি করতেন যে, ইহুদিদের থ্রোন মিস্টিকদের দিব্যদর্শনও তাদের মনোসংযোগের আত্মিক অনুশীলনের সময় *আলম-আল মিথালে* প্রবেশ করতে শেখার পরেই ঘটেছিল। সুতরাং ফায়লাসুফরা যেমন ভেবেছিল, ঈশ্বরের পথ কেবল যুক্তির মাঝেই নিহিত ছিল না, বরং সৃজনশীল কল্পনার মাধ্যমে অতিন্দ্রীয়বাদীর জগৎও সেই পথ বটে।

আজকের দিনে নেতৃস্থানীয় কোনও ধর্মতাত্ত্বিক যদি বলেন যে, গভীর অর্থে ঈশ্বর কল্পনারই সৃষ্টি, তাহলে পশ্চিমের বহু লোকই শঙ্কিত হয়ে পড়বে। কিন্তু এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কল্পনা হচ্ছে প্রধান ধর্মীয় গুণ। জাঁ-পল সার্ত্র একে '*যা নেই তা চিন্তা করার ক্ষমতা*'[৩৯] আখ্যায়িত করেছেন। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে অনুপস্থিত কোনও কিছু বা এই মুহূর্তে যার অস্তিত্ব নেই অথচ সম্ভব হতে পারে এমন কিছু কল্পনা করার ক্ষমতা রাখে। এভাবে শিল্পকলা ও ধর্মের মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আমাদের প্রধান প্রধান সাফল্যের পেছনে আমাদের কল্পনাশক্তি কারণ হিসাবে কাজ করেছে। ঈশ্বরের ধারণা, একে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক, সম্ভবত অনুপস্থিত সত্তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, যিনি সহজাত সমস্যাদি সত্ত্বেও হাজার হাজার বছর ধরে নারী ও পুরুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। অনুভূতি ও যুক্তি-নির্ভর প্রমাণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অবস্থানকারী ঈশ্বরকে বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রতীক। একে ব্যাখ্যা করা কল্পনাপ্রবণ মনের প্রধান কাজ। সুহরাওয়ার্দি মানব জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী প্রতীকসমূহের কল্পনা-নির্ভর ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যদিও সেগুলো যে বাস্তবতার কথা বলে সেগুলো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। প্রতীককে আমাদের অনুভূতি দিয়ে বোধগম্য বা মন দিয়ে ধারণযোগ্য এমন এক বস্তু বা ধারণা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যার মাঝে ঐ বস্তুটির চেয়ে অতিরিক্ত কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি। কেবল যুক্তি আমাদেরকে কোনও বিশেষ পার্থিব বস্তুতে বিশ্বজনীন বা বিশেষভাবে চিরন্তনকে অনুধাবনে সক্ষম করে তুলতে পারবে না। এটা সৃজনশীল কল্পনার কাজ যাতে শিল্পীদের মতো অতিন্দ্রীয়বাদীরা তাদের অন্তর্দৃষ্টি স্থাপন করে। শিল্পকর্মের মতো সবচেয়ে কার্যকর ধর্মীয় প্রতীকসমূহ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও মানুষের অবস্থা উপলব্ধি দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে

AMARBOI.COM

থাকে। অসাধারণরকম চমৎকার আরবী ভাষায় রচনাকারী সুহরাওয়ার্দি যুগপৎ একজন অতি দক্ষ মেটাফিজিশিয়ান ও অতিন্দ্রীয়বাদী ও সৃজনশীল শিল্পী ছিলেন। দৃশ্যতঃ সম্পর্কহীন বিষয়াদিকে মিলিয়ে–অতিন্দ্রীয়বাদের সঙ্গে বিজ্ঞান, একেশ্বরবাদী ধর্মের সঙ্গে পৌত্তলিক দর্শন–তিনি মুসলিমদের নিজস্ব প্রতীক সৃষ্টিতে এবং জীবনের নতুন অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

সুহরাওয়ার্দির চেয়ে আরও বেশি প্রভাবশালী ছিলেন মুঈদ আদ-দীন ইবন আরাবী (১১৬৫-১২৪০), যাঁর জীবনকে আমরা সম্ভবত প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের ভিন্ন পথে যাত্রার প্রতীক হিসাবে দেখতে পারি। তাঁর পিতা ছিলেন ইবন রুশদের বন্ধু। একবার দুজনের সাক্ষাৎকালে তরুণের ধর্মানুরাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন রুশদ। অবশ্য এক কঠিন অসুখের সময় ইবন আল-আরাবী সুফীবাদের দীক্ষা নেন ও ত্রিশ বছর বয়সে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে ইউরোপ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি হজব্রত পালন করে কাবাহ্য় প্রার্থনা ও ধ্যানে দুটি বছর পার করে দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউফ্রেতিসের তীরে মালাতিয়ায় থিতু হন। প্রায়শঃ শেখ আল-আকবাহ–'মহা গুরু'–নামে আখ্যায়িত আল-আরাবী ঈশ্বর সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা পাশ্চাত্যকে প্রভাবিত করেনি। ইবন রুশদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম দর্শন শেষ হয়ে গেছে বলে ধারণা ছিল। পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চান জগৎ ইবন রুশদের অ্যারিস্টটলিয় ঈশ্বরকে কাছে টেনে নেবে এবং অন্যদিকে ইসলামি রাজ্যের অধিকাংশই অতি সাম্প্রতিকাল পর্যন্ত অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বরের পক্ষে মত দিয়ে এসেছে।

১২০১ সালে কাবাহ্ ঘিরে প্রদক্ষিণের সময় ইবন আল-আরাবী এক দিব্যদর্শন লাভ করেন যা তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব রেখে গিয়েছে: স্বর্গীয় আভায় পরিবেষ্টিত নিযাম নামের এক কিশোরীকে দেখতে পান তিনি এবং উপলব্ধি করেন যে, মেয়েটি স্বর্গীয় প্রজ্ঞা সোফিয়ার অবতার। এই এপিফ্যানি তাঁকে উপলব্ধি করতে শেখায় যে, কেবল দর্শনের যৌক্তিক আলোচনায় নির্ভর করে থাকলে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরকে ভালোবাসা সম্ভব হবে না। ফালসাফাহ্ আল্লাহর চরম অবোধ্যতার ওপর জোর দিয়েছে ও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, কোনও কিছুর পক্ষেই তাঁর সমরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এমন দূরবর্তী এক সত্তাকে কী করে ভালোবাসতে পারি আমরা? কিন্তু তারপরেও তাঁর সৃষ্ট প্রাণীতে দেখা ঈশ্বরকে আমরা ভালোবাসতে পারি: 'যদি সৌন্দর্যের জন্যে তুমি কোনও সত্তাকে ভালোবাস, তাহলে সেটা ঈশ্বরকেই ভালোবাসা, কেননা তিনিই 'সুন্দরতম সত্তা,'–*ফুতুহাত আল-মাক্কিয়াহ্*-এ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। 'এভাবে সবদিক থেকেই একমাত্র ঈশ্বরই ভালোবাসার লক্ষ্য।'[৪০] *শাহাদাহ* আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনও





AMARBOI.COM

প্রভু বা কোনও পরম সত্তা নেই। পরিণামে তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও সৌন্দর্যও নেই। স্বয়ং ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু নিযামের মতো বেছে নেওয়া সৃষ্ট প্রাণীতে নিজেকে যেভাবে তিনি প্রকাশ করেন সেটা দেখতে পাই, আমাদের হৃদয়ে যা ভালোবাসা সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষেই নিযামের মতো একটি মেয়েকে প্রকৃত অবয়বে দেখার জন্যে অতিন্দ্রীয়বাদীদের নিজস্ব এপিফ্যানি সৃষ্টি করার দায়িত্ব রয়েছে। ভালোবাসা আবশ্যিকভাবে অনুপস্থিত কোনও কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা, এ কারণেই মানুষের ভালোবাসার অনেকাংশই হতাশাব্যঞ্জক হয়ে থাকে। নিযাম 'আমার অনুসন্ধান ও আমার আশার বস্তু সবচেয়ে সাধ্বি কুমারীতে পরিণত হয়েছিল।' প্রেমের কবিতার সংকলন *দ্য দিওয়ান*-এর ভূমিকার তিনি যা ব্যাখ্যা করেছেন:

> বর্তমান গ্রন্থের জন্য রচিত আমার পঙক্তিসমূহে মুহূর্তের জন্যও আমি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা, আধ্যাত্মিক আবির্ভাব, দেবদূতদের বুদ্ধিমত্তার জগতের সঙ্গে [আমাদের জগতের] যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষা হতে বিরত থাকিনি। এখানে প্রতীকের ভিত্তিতে আমার স্বভাবজাত চিন্তা করেছি, কারণ বাস্তব জীবনের বিষয়াদির চেয়ে অদৃশ্য জগতের বস্তুসমূহই আমাকে বেশি টানে; কারণ এই কিশোরীটি ঠিক জানে আমি কিসের কথা বোঝাচ্ছি।[৪১]

AMARBOI.COM

সৃজনশীল কল্পনা নিযামকে ঈশ্বরের অবতারে পরিণত করেছিল।

মোটামুটি আশি বছর পর তরুণ দান্তে আলিগিরি ফ্রান্সে বিয়েত্রিস পাতিনারিকে দেখার পর একই রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। মেয়েটিকে দেখামাত্রই আত্মার প্রবল কম্পন অনুভব করেন তিনি এবং যেন তাঁর চিৎকার শুনতে পান: 'আমার চেয়ে শক্তিশালী এক দেবতাকে দেখ যে আমাকে জয় করতে আসছে।' সেই মুহূর্ত হতে দান্তে বিয়েত্রিসের জন্যে তাঁর ভালোবাসায় নিয়ন্ত্রিত হতে থাকেন, যা 'আমার কল্পনার দেওয়া ক্ষমতার সুবাদে'[৪২] প্রবল হয়ে উঠেছিল। দান্তের বেলায় বিয়েত্রিস স্বর্গীয় ভালোবাসার প্রতিরূপ রয়ে গিয়েছিলেন এবং *দ্য ডিভাইন কমেডিতে* তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে নরক ও স্বর্গের ভেতর দিয়ে কাল্পনিক যাত্রার পর এটা তাঁকে ঈশ্বরের দর্শন করিয়ে দিয়েছিল। দান্তের কবিতার পেছনে মুহাম্মদের (স) স্বর্গারোহণের মুসলিম বিবরণের অনুপ্রেরণা ছিল; নিঃসন্দেহে সৃজনশীল কল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইবন আল-আরাবীর মতো। অ্যারিস্টটল যেমন বলেছিলেন, *ইমাজিনেতিভা* স্রেফ জাগতিক বিশ্ব থেকে নেওয়া ইমেজের সংমিশ্রণ নয়, বলে যুক্তি দেখিয়েছেন দান্তে, বরং এটা ঈশ্বর হতে আগত অনুপ্রেরণারই অংশ:

ও ফ্যান্টাসি (*ইমাজিনেতিভা*), দ্যাট রীভ'স্ট আস অফট অ্যাওয়ে
সো ফ্রেম আওয়ারসেলভস্ দ্যাট উই রিমেইন ডিসট্রট,
ডেফ দো আ থাউজ্যান্ড ট্রামপেটস রাউন্ড আস ব্রে.
হোয়াট মুভস দী হোয়েন দ্য সেনসেস শোউ দী নট?
লাইট মুভস দী, ফর্মড ইন হেভন, বাই উইল মেবী
অভ হিম হু সেন্ডস ইট ডাউন, অর এলস সেলফ-রট।[৪৩]

গোটা কবিতায় দান্তে ইন্দ্রিয়গত ও দৃশ্যমান ইমেজোরি ক্রমশঃ একীভূত করেছেন। নরকের বিস্তারিত বাস্তব বিবরণ পারগেটরি পাহাড়ে আবেগগত আরোহণের কষ্টকর পর্বের পর পার্থিব স্বর্গে পৌঁছার পথ খুলে দেয় যেখানে বিয়েত্রিস তাঁকে শারীরিকভাবে শেষ হওয়া সত্তা হিসেবে দেখার জন্যে ভর্ৎসনা করে: বরং তাঁকে প্রতীক বা *অবতার* হিসাবে দেখা উচিত ছিল তাঁর, যা তাঁকে জগৎ থেকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করেছে। স্বর্গের বাস্তব বর্ণনা নেই বললেই চলে; এমনকি আশীর্বাদপ্রাপ্ত আত্মাসমূহও দূরবর্তী–আমাদের মনে করিয়ে দেয় কোনও মানুষই তার আকাঙ্ক্ষার পরম বস্তুতে পরিণত হতে পারে না। সবশেষে, শীতল বুদ্ধিবৃত্তি ইমেজারি সকল কল্পনার অতীত ঈশ্বরের চরম দুর্জ্ঞেয়তা প্রকাশ করে। দান্তের বিরুদ্ধে *প্যারাদিসো*-তে ঈশ্বরের ঠাণ্ডা প্রতিকৃতি অংকনের অভিযোগ উঠেছে, কিন্তু বিমূর্ত দিকটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

ইবন আল-আরাবীও বিশ্বাস করতেন যে, কল্পনা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা। কোনও অতিন্দ্রীয়বাদী নিজস্ব এপিফ্যানি সৃষ্টি করার সময় আসলে সে আদি আদর্শ জগতে আরও নিখুঁতভাবে অবস্থানকারী একটা সত্তাকে পুণর্জন্ম দেয়। আমরা অন্য মানুষের মাঝে ঐশী সত্তাকে দেখার সময় আসলে প্রকৃত সত্তাকে উন্মোচন করার কল্পনা নির্ভর প্রয়াসে লিপ্ত হই: 'ঈশ্বর আবরণের মতো প্রাণীসমূহকে সৃষ্টি করেছেন,' ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি, 'যে ওগুলোকে সেভাবে চেনে সে আবার তাঁর দিকে ধাবিত হয় আর সে ওগুলোকে বাস্তব হিসাবে ধরে নেয় সে তাঁর সত্তা থেকে বঞ্চিত হয়।'[৪৪] এভাবে–সুফীবাদের পথ হিসাবে বিবেচিত–যা মানুষের ওপর নিবেদিত সম্পূর্ণ ব্যক্তিরূপী আধ্যাত্মিকতা হিসাবে সূচিত হয়েছিল সেটাই ইবন আল-আরাবীকে ঈশ্বরের ব্যক্তির অতীত ধারণার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। নারীর প্রতিকৃতি তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নারীই স্বর্গীয় প্রজ্ঞা সোফিয়ার সবচেয়ে কার্যকর অবতার, কারণ তারা পুরুষদের মনে এমন এক ভালোবাসার অনুপ্রেরণা যোগায় যা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করে। অনস্বীকার্য যে এটা একেবারে পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু ঈশ্বরের ধর্মে একটা নারী-মাত্রা

AMARBOI.COM

আনার প্রয়াসও ছিল এটা, যে ঈশ্বরকে প্রায়শঃই পরিপূর্ণভাবে পুরুষ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

ইবন আল-আরাবী বিশ্বাস করতেন না যে তাঁর জানা ঈশ্বরের বস্তুগত অস্তিত্ব আছে। যদিও দক্ষ মেটাফিজিশিয়ান ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় বলে বিশ্বাস করেননি। নিজেকে খিজর-এর শিষ্য দাবি করতেন তিনি, এ নামটি কোরানে বাহ্যিক আইন পৌঁছে দেওয়া মোজেসের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে আবির্ভূত এক রহস্যময় চরিত্রকে দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বর খিজরকে তাঁর সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলেন, সে জন্যে মোজেস তাঁর কাছে নির্দেশনা প্রার্থনা করছেন, কিন্তু খিজর তাঁকে বলেছেন যে, তাঁর পক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব হবে না, কারণ এটা তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বাইরে অবস্থান করছে।[৪৫] যে ধর্মীয় 'তথ্যে'র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের নেই সেটা বোঝার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। 'খিজর' নামটি 'সবুজ জন' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেন তাঁর জ্ঞানের চিরনতুন ও চিরন্তনভাবে নবায়নযোগ্যতার ইঙ্গিতবহ। এমনকি মোজেসের মতো বড় মাপের একজন পয়গম্বরও যে ধর্মের কিছু কিছু নিগূঢ় বিষয়াদি উপলব্ধি করতে পারবেন তা নয়, কারণ কোরানে প্রকৃতই খিজরের কৌশলের সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারছেন না বলে আবিষ্কার করেছেন তিনি। এই অদ্ভুত পর্বটি যেন বোঝাতে চায়, ধর্মের বাহ্যিক সৌন্দর্য বা বিষয়াদি যে সবসময়ই এর আধ্যাত্মিক বা অতিন্দ্রীয় উপাদানের সঙ্গে মিলে যাবে এমন নয়। *উলেমাদের* মতে মানুষেরা হয়তো ইবন আল-আরাবীর মতো সুফীর ইসলামকে নাও বুঝতে পারেন। মুসলিম ঐতিহ্য খিজরকে অতিন্দ্রীয় সত্য-সন্ধানীদের গুরুতে পরিণত করেছে, যা উৎপত্তিগতভাবেই আক্ষরিক, বাহ্যিক রূপের চেয়ে একেবারে আলাদা ও উন্নত। ঈশ্বর সম্পর্কে আর দশ জন সাধারণ মানুষের যেমন ধারণা তিনি আপন অনুসারীদের ঈশ্বর সম্পর্কে সে রকম ধারণা গড়ে তোলায় উৎসাহিত করেননি, বরং এমন এক ঈশ্বরের কথা বুঝিয়েছেন যিনি গভীরভাবে আধ্যাত্মিক।

ইসমায়েলিদের কাছেও খিজর গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। ইবন আল-আরাবী সুফী হলেও তাঁর শিক্ষা ইসমায়েলিদের মতবাদের অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল শেষ পর্যন্ত যা তাঁদের ধর্মতত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতিন্দ্রীয়বাদী ধর্ম যে গোষ্ঠীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, এটা তার আরেকটা উদাহরণ। ইসমায়েলিদের মতো ইবন আল-আরাবী দার্শনিকদের ঈশ্বরের আপাথিয়ার ঘোরতর বিপরীত ঈশ্বরের করুণরসের ওপর জোর দিয়েছেন। অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবকূলের মাধ্যমে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ইসমায়েলিরা বিশ্বাস করত যে, বিশেষ্য পদ *ইলাহ*–প্রভু–এসেছে আরবী *WLH* মূল হতে: বিষণ্ণ হওয়া, দুঃখ করা।[৪৬] পবিত্র হাদিসে ঈশ্বরকে দিয়ে বলানো হয়েছে:

AMARBOI.COM

'আমি গুপ্তধন ছিলাম এবং আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা করেছি। তারপর প্রাণীকূল সৃষ্টি করেছি ওদের মাধ্যমে পরিচিত হব বলে।' ঈশ্বরের বিষণ্ণতার যৌক্তিক কোনও প্রমাণ নেই; আমরা কেবল আমাদের গভীরতম প্রত্যাশা পূরণের জন্যে একটা কিছুর প্রতি প্রত্যাশা ও জীবনের যন্ত্রণার ও করুণ দিক ব্যাখ্যা করার ইচ্ছার মাঝে তা বুঝতে পারি। আমাদের যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই সর্বোত্তম আদর্শ ঈশ্বরকেই প্রতিবিম্বিত করি। সুতরাং 'ঈশ্বর' বলে যে সত্তাকে পাওয়ার জন্যে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি সে আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের বিষণ্ণতারই প্রতিনিধিত্ব করে। ইবন আল-আরাবী একক ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন বলে কল্পনা করছেন, কিন্তু এই দীর্ঘশ্বাস (*নাফাস রাহমানি*) আত্ম-করুণার বিচলিত প্রকাশ নয়। এর একটা সক্রিয়, সৃজনশীল শক্তি ছিল যা আমাদের গোটা মহাবিশ্বকে অস্তিত্ব দিয়েছে, এর ফলে মানুষও এসেছে, যারা পরিণত হয়েছে *লোগোই*তে, যে ভাষায় ঈশ্বর নিজের প্রকাশ করেন। এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষই লুকায়িত ঈশ্বরের অনন্য এপিফ্যানি, এক বিশেষ ও পুনরাবৃত্তির অতীত উপায়ে তাঁকে প্রকাশ করছে।

এইসব স্বর্গীয় *লোগোই*-এর প্রতিটি ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে যে নামে সম্বোধন করেন সেই নাম, এভাবে নিজেকে নিজের প্রতি এপিফ্যানিতে সামগ্রিকভাবে উপস্থিত করেন তিনি। স্বর্গীয় সত্তা যেহেতু প্রকাশের অতীত, সেহেতু একটি মাত্র মানবীয় প্রকাশ ভঙ্গি দিয়ে তাঁকে তুলে ধরা যাবে না। এখানে আরও বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মাঝে যা প্রকাশ করেছেন তা অনন্য, আরও অসংখ্য নারী ও পুরুষের জ্ঞান ঈশ্বরের চেয়ে ভিন্ন যারা তাঁর *লোগোই*-ও বটে। আমরা কেবল আমাদের নিজস্ব 'ঈশ্বর'কেই চিনতে পাবি, কেননা তাঁকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুভব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, অন্যকারও মতো করেও তাঁকে জানা অসম্ভব। ইবন আল-আরাবী যেমন বলেছেন: 'প্রত্যেক সত্তার তার বিশেষ প্রভুই ঈশ্বর হিসাবে আছেন; গোটা ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে সম্ভব নয়।' তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দিতে পছন্দ করতেন: 'ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধ্যান করো, কিন্তু তাঁর মূল সত্তাকে নিয়ে নয়।'[৪৭] ঈশ্বরের সমগ্র সত্তা জ্ঞানের অতীত, আমাদের অবশ্যই আপন সত্তা উচ্চারিত বিশেষ শব্দের দিকে দিকে মনোযোগ দিতে হবে। ইবন আল-আরবী ঈশ্বরকে তার অগম্যতার ওপর জোর দেওয়ার জন্যে *আল-আমা* অর্থাৎ 'মেঘ' বা 'অন্ধত্ব' ডাকতেও ভালোবাসতেন'[৪৮] কিন্তু এসব মানব *লোগোই* গোপন ঈশ্বরকে তার *নিজের* সামনেও তুলে ধরে। এটা একটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া: ঈশ্বর জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এবং যাদের মাঝে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন তাদের মাধ্যমেই নিঃসঙ্গতা হতে মুক্তি পান। অজ্ঞাত ঈশ্বরের দুঃখ প্রত্যেক মানুষের

AMARBOI.COM

মাঝে প্রকাশিত ঈশ্বর দিয়ে প্রশমিত হয়, যারা তাঁকে নিজের কাছে তুলে ধরে; আবার এটাও সত্যি যে প্রকাশিত ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে অবস্থান করার সময় আমাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা এক ঐশী স্মৃতি তাড়নায় আবার মুল উৎসে ফিরে যেতে চান।

এভাবে ঈশ্বর ও মানুষ স্বর্গীয় জীবনের দুটো বৈশিষ্ট্য যা গোটা বিশ্বজগৎ বা সৃষ্টিকে সজীব করেছে। এই দর্শনটি জেসাসের দেহে ঈশ্বরের অবতারের উপলব্ধির চেয়ে খুব ভিন্ন ছিল না, কিন্তু ইবন আল-আরাবী এটা মেনে নিতে পারেননি যে, একজন মাত্র ব্যক্তি, তা তিনি যত পবিত্রই হোন না কেন, ঈশ্বরের অসীম সত্তাকে প্রকাশ করতে পারেন। তার বদলে তিনি প্রত্যেক মানুষকে একেকটি অনন্য স্বর্গীয় *অবতার* বলে বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি 'পূর্ণাঙ্গ মানুষের' (*ইনসান ই-কামিল*) একটা প্রতীক সৃষ্টি করেছেন যিনি কিনা সমসাময়িকদের উপকারের জন্যে প্রতি প্রজন্মের প্রকাশিত ঈশ্বরকে ধারণ করেন; যদিও অবশ্যই তিনি ঈশ্বরের সমগ্র সত্তা বা তাঁর ব্যাপক সত্তাকে ধারণ করেন না। পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) ছিলেন তাঁর সময়ের পূর্ণাঙ্গ মানুষ, কার্যকর ঐশী প্রতীকও ছিলেন তিনি।

এই অন্তর্মুখী কল্পনা নির্ভর অতিন্দ্রীয়বাদ সত্তার গভীরে অস্তিত্বের ভিত্তির অনুসন্ধান ছিল। এটা অতিন্দ্রীয়বাদীকে ধর্মে গোঁড়া রূপের কিছু নিশ্চয়তা হতে বঞ্চিত করেছে। যেহেতু প্রত্যেক নারী ও পুরুষের ঈশ্বর সংক্রান্ত অনন্য অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে বলা চলে যে কোনও একটি ধর্ম সমগ্র স্বর্গীয় রহস্যকে তুলে ধরতে পারবে না। সবার মেনে নেওয়ার মতো ঈশ্বর সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ কোনও সত্যি নেই, যেহেতু এই ঈশ্বর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী অতিক্রম করে যান এবং তাঁর আচরণ বা ঝোঁক সম্পর্কে পূর্বানুমান অসম্ভব। সুতরাং, অন্যের ধর্মের বিপরীতে কারও নিজ ধর্ম নিয়ে অহংকার প্রকাশ নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য, কারণ কোনও বিশেষ একটি ধর্ম ঈশ্বরের সমগ্র সত্যকে ধারণ করে না। ইবন আল-আরাবী অন্য ধর্মের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলেছিলেন যা কোরানেও দেখা যায়, এবং একে সহনশীলতার নতুন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন:

AMARBOI.COM

আমার মন সকল রূপ ধারণেই সক্ষম।
ভিক্ষুর জন্যে মঠ, মূর্তির জন্যে মন্দির,
হরিণের জন্যে চারণভূমি, বিশ্বাসীর কাবাহ্
তোরাহ্র ফলক, কোরান।
আমার ধর্ম ভালোবাসা: আমি যেদিকেই ফিরি
তাঁর উট, তবু এমাত্র সত্য ধর্মটি আমার।[৪৯]

ঈশ্বরে বিশ্বাসী সিনাগগ, মন্দির, গির্জা ও মসজিদে সমান স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, কেননা সবগুলোই ঈশ্বরের একটা বৈধ উপলব্ধি দিয়ে থাকে। ইবন আল-আরাবী প্রায়শঃ 'বিশ্বাসের সৃষ্টি ঈশ্বর' (*খালক আল-হাক্ক ফি'ল-ইতিকাদ*) বাক্যটি ব্যবহার করতেন। একটি বিশেষ ধর্মের নারী-পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট অবতারকে স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা অসমীচিন হতে পারে, এতে কেবল অসহিষ্ণুতা আর ধর্মান্ধতা জন্ম নেবে। এই ধরনের বহুঈশ্বরবাদীতার বদলে ইবন আল-আরাবী এই পরামর্শ দিয়েছেন:

> কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাসের (Creed) সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে সংযুক্ত করো না যাতে অন্যগুলোকে তুমি অবিশ্বাস কর: সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আসল সত্য উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হবে। সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কোনও একটি ধর্মে সীমাবদ্ধ নন, কারণ তিনি বলেছেন, 'তুমি যেদিকেই তাকাবে, সেখানে আল্লাহ্ মুখায়ব ।' (কোরান ২: ১০৯)। সবাই যার যার বিশ্বাসের স্তুতি গায়; তার ঈশ্বর তার নিজস্ব সৃষ্টি, প্রশংসা করতে গিয়ে সে আত্মপ্রশংসা করে। পরিণতিতে অন্যদের বিশ্বাসকে দোষারোপ করে, ন্যায় আচরণ করলে এমনটি সে করতে পারত না, কিন্তু তাঁর অপছন্দের মূলে রয়েছে অজ্ঞতা।[৫০]

আমাদের প্রত্যেকের মাঝে প্রকাশিত ও নিরেট অস্তিত্ব দেওয়া ব্যক্তিগত নাম ছাড়া আমরা আর কোনও ঈশ্বরকে দেখতে পাই না: অনিবার্যভাবে আমাদের ব্যক্তিগত প্রভু সম্পর্কে উপলব্ধি আমরা যে ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি সেই ধর্মের ধর্মীয় ঐতিহ্য দিয়েই রঞ্জিত। কিন্তু অতিন্দ্রীয়বাদী (*আরিফ*) জানে যে, আমাদের এই 'ঈশ্বর' একজন 'দেবদূত' বা স্বর্গীয় কোনও বিশেষ প্রতীক মাত্র, যাঁকে কোনওভাবেই স্বয়ং অদৃশ্য সত্তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। পরিণামে সে একই ধর্মকে বৈধ থিওফ্যানি হিসাবে দেখে। অধিকতর গোঁড়া ধর্মসমূহের ঈশ্বর যেখানে মানুষকে বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করেন, অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর সেখানে এক ঐক্যবদ্ধকারী শক্তি।

একথা সত্যি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যক মুসলিমের জন্যে আল-আরাবীর শিক্ষা বড্ড বেশি দুর্বোধ্য ছিল, তবু তা বহু সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুফীবাদ আর সংখ্যালঘু আন্দোলনে সীমিত থাকেনি। মুসলিম সাম্রাজ্যের বহু স্থানেই তা প্রভাবশালী ইসলামি ধারায় পরিণত হয়েছিল। এই সময়ের বিভিন্ন সুফী পদ্ধতি বা *তুরিকা*

AMARBOI.COM

প্রতিষ্ঠিত হয় যাদের প্রত্যেকটির অতিন্দ্রীয়বাদী বিশ্বাস সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল। সুফী শেখগণের সাধারণ মানুষের ওপর ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং প্রায়শঃই শিয়াহ্ ইমামদের মতোই সম্মান লাভ করতেন তাঁরা। রাজনৈতিক সংঘাতের কাল ছিল এটাঃ বাগদাদের খেলাফতের ক্ষয় চলছিল এবং মঙ্গোল দস্যুরা একের পর এক মুসলিম নগরীতে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ মানুষ ফায়লাসুফদের দূরবর্তী ঈশ্বর ও *উলেমাদের* আইননিষ্ঠ ঈশ্বরের চেয়ে অধিকতর নিকটবর্তী ও সহানুভূতিশীল এক ঈশ্বরের কামনা করছিল। সুফীদের পরম আবেশ সৃষ্টির জন্যে জিকির অনুশীলন মন্ত্রের মতো স্বর্গীয় নাম উচ্চারণ, *তুরিকার* সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস ও আসন গ্রহণের নির্দেশিত বিশেষ ভঙ্গির মনোসংযোগের সুফী অনুশীলন মানুষকে নিজের মাঝেই এক দুর্জ্ঞেয় সত্তার বোধ জাগাতে সাহায্য করেছিল। সবারই অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এইসব আধ্যাত্মিক অনুশীলন মানুষকে ঈশ্বর সম্পর্কে সাধারণ ও মানবীয় ধারণা ত্যাগ করে নিজের মাঝে তাঁর উপস্থিতি অনুভবে সাহায্য করেছে। কোনও কোনও পদ্ধতি মনোসংযোগ গভীর করার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত ও নাচের ব্যবহার করত। তাদের *পিরগণ* সাধারণ মানুষের চোখে নায়ক হয়ে উঠেছিলেন।

সুফীদের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল *মাওলাবিওয়াহ*, পশ্চিমে যাদের সদস্যরা 'ঘূর্ণায়মান দরবেশ' হিসাবে পরিচিত। এদের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ নাচ মনোসংযোগের এক ধরনের কৌশল বা পদ্ধতি ছিল। ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে নাচের মাঝে মিশে যাওয়ার সময় সুফী অনুভব করে, সত্তার সব সীমানা মুছে যাচ্ছে, যা তাকে *ফানা*'র বিলীন হবার আগাম স্বাদ দিত। এ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা জালাল আদ-দীন রুমি (১২০৭-৭৩) শিষ্যদের কাছে *মাওলানা* বা আমাদের গুরু নামে পরিচিত ছিলেন। মধ্য এশিয়ার খুরাশানে জন্মগ্রহণ করেন তিনি, কিন্তু অগ্রসরমান মঙ্গোল বাহিনী পৌঁছার আগেই আধুনিক তুরস্কের কনিয়ায় পালিয়ে যান। তাঁর অতিন্দ্রীয়বাদকে এই তাণ্ডবলীলার প্রতি মুসলিমদের সাড়া হিসাবে দেখা যেতে পারে যার পরিণতিতে বহু মুসলিম আল্লাহয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। রুমির ধারণার সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক ইবন আল-আরাবীর চিন্তাধারার মিল আছে, কিন্তু তাঁর কাব্য সুফী বাইবেল বলে পরিচিত *মাসনবী*র জনপ্রিয়তা ঢের বেশি এবং সুফী নয় এমন সাধারণ মানুষের কাছেও অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বরকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। ১২৪৪ সালে ভ্রাম্যমাণ দরবেশ শামস আদ-দিনের প্রভাব বলয়ে আসেন রুমি, তিনি তাঁকে তাঁর প্রজন্মের পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হিসেবে দেখেছেন। প্রকৃতপক্ষেই শামস আদ-দিন নিজেকে পয়গম্বরের পুনরাবির্ভাব বলে বিশ্বাস

AMARBOI.COM

করতেন এবং তাঁকে 'মুহাম্মদ' সম্বোধন করার প্রতি জোর দিতেন। সন্দেহজনক খ্যাতি ছিল তাঁর। জানা যায় নিজেকে নিয়ম-কানুনের মতো তুচ্ছ বিষয়ের উর্ধ্বে ভেবে শরীয়াহ্ বা ইসলামের সর্বোচ্চ আইন পালন করতেন না। রুমির অনুসারীরা তাদের গুরুর স্পষ্ট মোহাচ্ছন্নতায় বোধগম্য কারণেই উদ্বিগ্ন ছিল। এক দাঙ্গায় শামস নিহত হলে সান্ত্বনার অতীত হয়ে পড়ে অতিন্দ্রীয়বাদী সঙ্গীত আর নাচে আরও বেশি সময় অতিবাহিত করতে থাকেন রুমি। প্রবল শোককে কাল্পনিকভাবে ঈশ্বরের জন্যে ভালোবাসার প্রতীকে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন তিনি–মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহর জন্যে মানুষের কামনা। জেনে হোক বা না জেনে, প্রত্যেকেই অনুপস্থিত ঈশ্বরের সন্ধান করছে, আবছাভাবে সচেতন যে অস্তিত্বের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সে।

> নলখাগড়ার কথা শোন, কীভাবে গল্প বলছে সে, বিচ্ছিন্নতার অনুযোগ করছে। খড়ের ক্ষেত থেকে তুলে আনার পর থেকেই আমার বিলাপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে নারী-পুরুষ। বিচ্ছিন্নতায় ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক সুহৃদ চাই আমি, যাতে আমি [এমন একজনের কাছে] প্রেম-ইচ্ছার শক্তি তুলে ধরতে পারি: আপন উৎস হতে বিচ্ছিন্ন প্রত্যেকে যখন সে সঙ্গে ছিল সেই সময়ে ফিরে যেতে চায়।[৫১]

AMARBOI.COM

পূর্ণাঙ্গ পুরুষ অধিকতর সাধারণ স্মরণশীলকে ঈশ্বর সন্ধানে অনুপ্রাণিত করে বলে বিশ্বাস করা হয়েছে। রুমির মাঝে *মসনাবীর* কাজের দরজা খুলে দিয়েছিলেন শামস আদ-দিন, যা এই বিচ্ছেদের বেদনাকেই তুলে ধরেছে।

অন্যান্য সুফীর মতো রুমিও বিশ্বজগতকে ঈশ্বরের অযুত নামের একটা থিওফ্যানি হিসাবে দেখেছেন। এসব নামের কোনও কোনওটি ঈশ্বরের ক্রোধ বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, অন্যদিকে বাকিগুলো স্বর্গীয় প্রকৃতির সহজাত কল্পনার গুণ প্রকাশ করে। অতিন্দ্রীয়বাদী সকল বস্তুতে ঈশ্বরের সহমর্মিতা, প্রেম ও সৌন্দর্য চিহ্নিত করার বিরামহীন সংগ্রাম (*জিহাদে*) নিয়োজিত; যাতে অন্য সবকিছু ঝরে পড়ে। *মাসনাবী* মানব জীবনে দুর্জ্ঞেয় মাত্রা আবিষ্কার ও চেহারা ভেদ করে নিজের মাঝে গুপ্ত সত্তাকে দেখার চ্যালেঞ্জ করেছে। অহমবোধ আমাদের সকল বস্তুর অন্তস্থ রহস্য সম্পর্কে অন্ধ করে রাখে, কিন্তু একবার যদি আমরা তা অতিক্রম করে যেতে পারি তখন আর বিচ্ছিন্ন আলাদা সত্তা থাকবে না, বরং সকল অস্তিত্বের 'ভিত্তি'র সঙ্গে এক হয়ে যাবে। আবার, রুমি জোর দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর কেবল অন্তরের অনুভূতি হাত পারেন। ঈশ্বর সম্পর্কে অন্যদের ধারণা বা বিশ্বাসকে অবশ্যই সম্মান জানানো উচিত বোঝাতে

মোজেস ও রাখাল বালকের মজার এক কাহিনী শুনিয়েছেন তিনি। মোজেস একদিন শুনতে পেলেন রাখাল ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত ঢঙে কথা বলছে: ঈশ্বরকে সাহায্য করতে চায় সে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন–তাঁর পোশাক ধোয়া, উকুন বাছা, শোয়ার সময় হাত পায়ে চুমু দেওয়া। 'তোমাকে স্মরণ করে আমি কেবল বলতে পারি,' প্রার্থনা শেষ হলো, 'আইইইই ও আহহহহহহহ।' শঙ্কিত বোধ করলেন মোজেস। রাখাল কার সঙ্গে কথা বলছে বলে ভেবেছে? স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা? শুনে তো মনে হচ্ছে চাচার সঙ্গে আলাপ করছে! রাখাল বালক অনুশোচনা করে হতাশ মনে মরু প্রান্তরের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু মোজেসকে ভর্ৎসনা করলেন ঈশ্বর। তিনি অর্থডক্স বাক্যাবলী শুনতে চাননি, প্রবল ভালোবাসা ও নম্রতা চেয়েছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলার সঠিক কোনও পথ নেই:

তোমার কাছে যা ভুল মনে হচ্ছে ওর জন্যে তা ঠিক,
একজনের জন্যে যা বিষ, আরেকজনের কাছে তা মধু।
পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, উপাসনায় শৈথিল্য ও পরিশ্রম
আমার কাছে এসবের কোনও অর্থ নেই।
আমি এসব কিছু হতে আলাদা।
উপাসনার উপায়সমূহকে একটি ওপরটির চেয়ে উন্নত বা
নিম্নমানের হিসাবে দেখা যাবে না।

হিন্দুরা হিন্দুদের মতো করে।
ভারতের দ্রাবিড় মুসলিমরা তাদের মতো।
এসবই প্রশংসা, এসবই ঠিক।

উপাসনার কায়দায় আমি মহিমান্বিত হই না।
মহিমান্বিত হয় উপাসকরা! আমি কোনও কথা শুনি না।
যা তারা বলে। আমি নম্রতার অভ্যন্তরে দেখি।
এই উন্মুক্ত–ভাঙা নম্রতাই আসল সত্তা,
ভাষা নয়! অলঙ্কারময় ভাষা ভুলে যাও।
আমি চাই দাহ, *দাহ*।
আপন দাহর বন্ধু হয়ে যাও। তোমার চিন্তা
আর অভিব্যক্তির রূপকে পুড়িয়ে দাও![৫২]

AMARBOI.COM

রাখালের কথার মতোই ঈশ্বর সম্পর্কে যে কোনও রক্তব্যই অবাস্তব, কিন্তু একজন বিশ্বাসী যখন পর্দা ভেদ করে বস্তুসমূহের প্রকৃত রূপ দেখতে পাবে তখন সে বুঝবে এটা মানুষের সকল ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

ইতিমধ্যে ট্রাজিডি ইউরোপের ইহুদিদেরও ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন ধারণা গঠনে সাহায্য করেছিল। পশ্চিমের ক্রুসেডিং-অ্যান্টি সেমিটিজম ইহুদি জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণকে অতীষ্ঠ করে তুলেছিল; অনেকেই থ্রোন মিস্টিকদের অনুভূত দূরবর্তী উপাস্যের চেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তিক ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করছিল। নবম শতাব্দীতে কালোনিমোস পরিবার দক্ষিণ ইতালি থেকে জার্মানিতে পাড়ি জমানোর সময় সঙ্গে করে কিছু অতিন্দ্রীয়বাদী সাহিত্য নিয়ে যায়। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ নির্যাতন-নিপীড়ন আশকেনাযি ধর্মানুরাগে এক নতুন নৈরাজ্যবাদ যোগ করে। কালোনিমোস পরিবারের তিনজন সদস্যের রচনায় তা প্রকাশ পেয়েছে। স্যামুয়েল দ্য এল্ডার, যিনি ১১৫০-এর দিকে *সেফার হা-ইরাহ* শীর্ষক ক্ষুদে নিবন্ধ রচান করেছেন: র‍্যাবাই জুদাহ দ্য প্রিস্ট *সেফার হাসিদিম* (দ্য বুক অভ দ্য প্রিস্টস্) এবং তাঁর কাজিন র‍্যাবাই এলিয়েদার বেন জুদাহ অভ ওয়র্মস (মৃ: ১২৩০), যিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ ও অতিন্দ্রীয়বাদী টেক্সট সম্পাদনা করেছেন। এঁরা দার্শনিক নিয়মনিষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন না, তাঁদের রচনাবলী দেখায় যে, তাঁরা বিভিন্ন উৎস হতে ধারণা গ্রহণ করেছেন যেগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঠেকতে পারে। তারা নিরস ফায়লাসুফ সা'দিয়া ইবন জোসেফের রচনায় দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন, যাঁর গ্রন্থাবলী হিব্রুতে অনূদিত হয়েছিল, ও ফ্রান্সিস অভ আসিসির মতো ক্রিশ্চান অতিন্দ্রীয়বাদীদের রচনা দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রের এই বিচিত্র মিশেল হতে তাঁরা এমন এক আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ফ্রান্স ও জার্মানির ইহুদিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গিয়েছে।

স্মরণযোগ্য, র‍্যাবাইগণ ঈশ্বরের সৃষ্টি আনন্দকে অস্বীকার করা পাপ হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু জার্মান পিয়েটিস্টরা এমন এক ত্যাগের শিক্ষা প্রচার করলেন যা ক্রিশ্চান সংযমবাদের অনুরূপ। একজন ইহুদি আনন্দ থেকে মুখ ফিরিয়ে পশু-পাখি পোষা, বাচ্চাদের সাথে খেলে সময় কাটানো বাদ দিলেই কেবল পরকালে *শেকিনাহ্*র দেখা পাবে। ইহুদিদের উচিত ভর্ৎসনার অপমানে নির্লিপ্ত থেকে ঈশ্বরের *আপাথিয়া* গড়ে তোলা। তবে ঈশ্বরকে বন্ধুর মতো সম্বোধন করা যেতে পারে। এলিয়েযারের মতো কোনও থ্রোন-সিস্টিক ঈশ্বরকে 'তুমি' সম্বোধন করার কথা স্বপ্নের ভাবতে পারেনি। এই পরিচয় রূপ শাস্ত্রে অনুপ্রবেশ করেছে ও

AMARBOI.COM

এমন এক ঈশ্বরকে তুলে ধরেছে যিনি আবার সর্বত্র বিরাজমান; খুব নিবিড়ভাবে উপস্থিত দুর্জ্ঞেয়:

> সবকিছুই তোমার মাঝে আর সবকিছুর মাঝে তুমি; তুমি সবকিছু জুড়ে থাক আর ঘিরে থাক; যখন সবকিছু সৃষ্টি হলো, সবকিছুতে তুমি ছিলে, সবকিছু সৃষ্টির আগে তুমিই ছিলে সব।[৫৩]

এই সর্বব্যাপীতোকে তাঁরা বিশেষ রূপ দিয়েছিলেন এভাবে যে, কারও পক্ষেই স্বয়ং ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব নয়; তবে তিনি তাঁর প্রতাপের (*কাভোদ*) বা 'শেকিনাহ নামের মহাব্যাপ্তিতে' নিজেকে যতটা প্রকাশ করেন কেবল তারই নৈকট্য লাভ করা যায়। পিয়েটিস্টরা আপাত অসামঞ্জস্যতায় উদগ্রীব ছিল না। তারা ধর্মতাত্ত্বিক সৌন্দর্যের বদলে বরং ব্যবহারিক বিষয়ের দিকে বেশি জোর দিয়েছে, সতীর্থ ইহুদিদের মনোসংযোগের পদ্ধতি (*কাওয়ানাহ*) ও অঙ্গভঙ্গির শিক্ষা দান করেছে যা ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে তাদের অনুভূতিকে জোরাল করে তুলবে। নীরবতার আবশ্যকতা ছিল; একজন পিয়েটিস্টকে শক্ত করে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, বিচ্যুতি এড়াতে প্রার্থনার চাদরে মাথা ঢাকতে হবে, পেট ভেতরে টেনে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রাখতে হবে। তারা 'ড্রয়িং আউট প্রেয়ার'-এর বিশেষ কায়দা আবিষ্কার করেছিল যাতে এই বোধ উৎসাহিত হতে দেখা গেছে। শাস্ত্রের বাক্যাবলীর বুলি পুনরাবৃত্তির বদলে পিয়েটিস্টকে প্রত্যেক শব্দের অক্ষরগুলো গুনতে হবে, ওগুলোর সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্য হিসাব করে ভাষার আক্ষরিক অর্থের ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে হবে। তাকে অবশ্যই এক উন্নত সত্তার অনুভূতি জোরাল করতে ওপরের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

ইসলামি সাম্রাজ্যের যেসব স্থানে অ্যান্টি-সেমিটিক নির্যাতনের অস্তিত্ব ছিল না সেসব জায়গায় ইহুদিদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো ছিল। তাদের এই আশকেনাযিয় ধর্মানুরাগের প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য মুসলিমদের অগ্রগতির প্রতি সাড়া হিসাবে এক নতুন ধরনের ইহুদিবাদ গড়ে তুলছিল তারা। ইহুদি ফায়লাসুফরা যেমন বাইবেলের ঈশ্বরকে দর্শনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছিল, ঠিক তেমনি অন্য ইহুদিরাও তাদের ঈশ্বরকে অতিন্দ্রীয় প্রতীকী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। গোড়াতে এই অতিন্দ্রীয়বাদীরা একেবারে সংখ্যালঘু একটা গোষ্ঠী ছিল। এদের অনুশীলন ছিল নিগূঢ় অনুশীলন, তাত্ত্বিক গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হতো: একে তারা বলত কাব্বালাহ বা 'উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্য'। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাব্বালাহর ঈশ্বর সিংহভাগ মানুষকে আগ্রহী করে তুলবে ও ঈশ্বর সম্পর্কে ইহুদিদের

AMARBOI.COM

দৃষ্টিভঙ্গিকে এমনভাবে ধারণ করবে যা দার্শনিকদের ঈশ্বরের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। দর্শন ঈশ্বরকে দূরবর্তী বিমূর্ত অস্তিত্বে পর্যবসিত করার হুমকি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু অতিন্দ্রীয়বাদের ঈশ্বর যুক্তির গভীরে অবস্থিত আতঙ্ক ও উদ্বেগকে স্বপর্শ করতে সক্ষম ছিলেন। থ্রোন মিস্টিকরা যেখানে বাহ্যিকভাবে ঈশ্বরের 'প্রতাপ' লক্ষ করেই সন্তুষ্ট ছিল, কাব্বালিস্টরা সেখানে ঈশ্বরের অন্তস্থ জীবন ও মানুষের চৈতন্যকে ভেদ করার প্রয়াস পেয়েছে। ঈশ্বরের রূপ নিয়ে যুক্তির ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া ও জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমস্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোর বদলে কাব্বালিস্টরা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিল।

সুফীদের মতো কাব্বালিস্টরাও ঈশ্বরের মূল সত্তা এবং প্রত্যাদেশ ও সৃষ্টিতে আমরা যে ঈশ্বরের দেখা পাই এ দুয়ের মাঝে নস্টিক ও নিওপ্লেটোনিক পার্থক্যের ব্যবহার করেছে। স্বয়ং ঈশ্বর অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জ্ঞানের অতীত, দুর্বোধ্য ও নৈর্ব্যক্তিক। গুপ্ত ঈশ্বরকে তারা এন সফ অভিহিত করত (আক্ষরিক অর্থে 'অন্ত হীন')। *এন সফ* সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না: এমনকি বাইবেল বা তালমুদে তাঁর নামোচ্চারিত হয়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অজ্ঞাতনামা এক লেখক লিখেছেন, এন সফ মানুষের কাছে প্রকাশিত হওয়ার মতো বিষয়ে পরিণত হতে অপারগ।[৫৪] YHWH'র বিপরীতে এন সফের দালিলিক কোনও নাম ছিল না; 'তিনি' কোনও ব্যক্তি নন। প্রকৃতপক্ষে গডহেডকে বোঝাতে 'এটা' বলাই অধিকতর সঠিক। এটা বাইবেল ও তালমুদের প্রবলভাবে ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা হতে মারাত্মক বিচ্যুতি। কাব্বালিস্টরা নির্দিষ্ট ধর্ম বিরোধিতার দিকে না গিয়ে এন সক ও YHWH'-র মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্যে ধর্মীয় চৈতন্যের এক নতুন জগতে পদচারণার জন্যে নিজস্ব মিথলজির জন্ম দিয়েছে; যেখানে বলা হচ্ছে, এরা দুটো আলাদা সত্তা। কাব্বালিস্টরা ঐশীগ্রন্থ পাঠের এক প্রতীকী পদ্ধতির আবিষ্কার করে। সুফীদের মতো তারা এমন একটা প্রক্রিয়ার কথা কল্পনা করেছে যার মাধ্যমে গুপ্ত ঈশ্বর মানুষের সামনে হাজির হন। এন সফ দশটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা *সেফিরদ* অর্থাৎ সংখ্যায় ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদীদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করেন, এই সংখ্যাগুলো জ্ঞানের অতীত গডহেডের অজ্ঞাত গভীরতা থেকে উৎসারিত স্বর্গীয় সত্তার অংশ। প্রতিটি *সেফিরাহ* এন সফের প্রকাশের এক একটি স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে; এর নিজস্ব প্রতীকী নাম আছে, কিন্তু এইসব স্বর্গীয় বলয়ের প্রতিটিই একেকটি বিশেষ শিরোনামের অধীনে ঈশ্বরের রহস্যের সম্পূর্ণটুকুই ধারণ করে। কাব্বালিস্টিক ব্যাখ্যায় বাইবেলের প্রতিটি শব্দ দশটি *সেফিরদের* কোনও একটিকে নির্দেশ করে: প্রতিটি পঙক্তি এমন এক ঘটনা বা বিষয়ের বর্ণনা করে যার অনুরূপ স্বয়ং ঈশ্বরের অন্তর্গত জীবনে অস্তিত্বমান ছিল।

AMARBOI.COM

ইবন আল-আরাবী ঈশ্বরের সহমর্মিতার নিদর্শন দেখেছিলেন, যা তাঁকে মানবজাতির সামনে প্রকাশ করেছে, বিশ্বজগতকে সৃজনকারী বাণী হিসাবে। মোটামুটি ঠিক একইভাবে *সেফিরদ* ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে যে নামসমূহ দিয়েছেন আর যা দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এ দুটোই। এই দশটি নাম এক হয়ে তাঁর একটি মহানাম সৃষ্টি করেছে, যা মানুষ জানে না। এগুলো এন সফের নিঃসঙ্গ অগম্য অবস্থান থেকে পার্থিব জগতে অবতরণ করার পর্যায়গুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলো সাধারণত এভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়:

১. কেদার ইলিয়নঃ 'সর্বোত্তম মুকুট'
২. হোখমাহ্: 'প্রজ্ঞা'
৩. বিনাহঃ 'বুদ্ধিমত্তা'
৪. হেসেদঃ 'প্রেম' বা 'করুণা'
৫. দিনঃ 'ক্ষমতা' (সাধারণভাবে কঠিন বিচারে প্রকাশ পায়)।
৬. রাখামিমঃ 'সহমর্মিতা', অনেক সময় 'তিফারেদ': 'সৌন্দর্য' বলা হয়।
৭. নেতসাখঃ 'দীর্ঘস্থায়ী'
৮. হদঃ 'আভিজাত্য'
৯. ইয়েসদঃ 'ভিত্তি'
১০. মালকুদঃ 'রাজ্য'; 'শেকিনাহ'ও বলা হয়।

AMARBOI.COM

অনেক সময় উপর হতে নিচের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গাছের মতো করেও *সেফিরদকে* উপস্থাপন করা হয়, এর শেকড় এন সফের দুর্বোধ্য গভীরতায় প্রোথিত [চিত্র দেখুন] এবং এর সর্বোচ্চ বিন্দু শেকিনাহ্য়, জগতে। এই কাঠামোগত ইমেজ কাব্বালিস্টিক প্রতীকের ঐক্য প্রকাশ করে। এন এফ হচ্ছেন গাছের শাখাপ্রাশাখা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের জীবন দানকারী প্রাণরস যা এক রহস্যময় জটিল সত্তায় একীভূত করে দেয়। যদিও এন এফ ও তাঁর নামের জগতের ভেতর পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয়ই কয়লা আর আগুনের মতো এক। *সেফিরদ* এন সফের দুর্ভেদ্য অস্পষ্টতায় বিরাজমান অন্ধকারকে প্রকাশকারী আলোর জগতকে তুলে ধরে। আমাদের ধারণাসমূহ যে পুরোপুরি 'ঈশ্বর'কে প্রকাশ করতে পারে না সেটা দেখানোরই আরেকটি উপায় এটা।

অবশ্য *সেফিরদের* জগৎ গডহেড ও পৃথিবীর মাঝখানে 'মহাশূন্যের' বিকল্প কোনও বাস্তবতা নয়। এগুলো স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী কোনও মইয়ের ধারা নয়, বরং আমাদের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করা পৃথিবীর ভিত্তি।

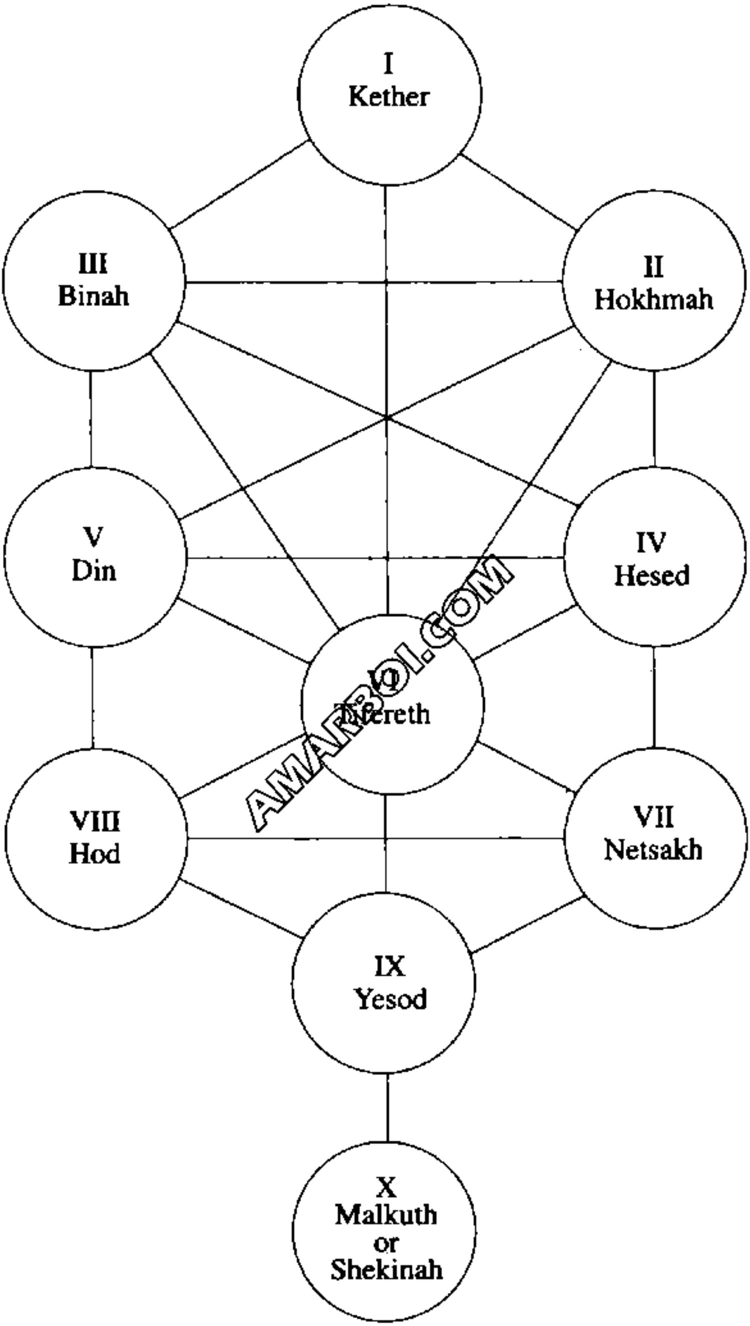


*The Tree of the Sefiroth*

AMARBOI.COM

ঈশ্বর যেহেতু সর্বেসর্বা, *সেফিরদ* অস্তিত্বময় এমন সমস্ত কিছুতেই উপস্থিত এবং সক্রিয়। এগুলো মানুষের চেতনার পর্যায়গুলোও বোঝায় যার মাধ্যমে অতিন্দ্রীয়বাদীরা আপন মনে অবতরণ করে ঈশ্বরের দিকে আরোহণ করে থাকে। আবার ঈশ্বর ও মানুষকে অবিচ্ছেদ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনও কোনও কাব্বালিস্ট *সেফিরদ*'কে ঈশ্বর পরিকল্পিত আদি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসাবেও দেখেছে। মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বাইবেল একথাই বোঝাতে চেয়েছিল: পার্থিব বাস্তবতা স্বর্গীয় জগতের আদি আদর্শ বাস্তবতার অনুরূপ। গাছ বা মানুষের মতো ঈশ্বরের ইমেজসমূহ এমন এক সত্তার কল্পনা যা যৌক্তিক সূত্রবদ্ধকরণ অস্বীকার করে। কাব্বালিস্টরা ফালসাফাহর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল না—তাদের অনেকেই সা'দিয়া, গাওন এবং মায়মোনিদসের মতো ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করত—কিন্তু ঈশ্বরের রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে মেটাফিজিক্সের চেয়ে প্রতীকীবাদ ও মিথলজিই অধিকতর সন্তোষজনক হিসাবে আবিষ্কার করেছিল তারা।

কাব্বালিস্টিক সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনা ছিল *দ্য যোহার:* সম্ভবত ১২৭৫-এ স্পেনের অতিন্দ্রীয়বাদী মোজেস অভ লিয়নের রচনা। তরুণ বয়সে মায়মোনিদসের রচনা পাঠ করলেও আস্তে আস্তে কাব্বালাহর নিগূঢ় তত্ত্ব অতিন্দ্রীয়বাদে আকৃষ্ট হয়ে উঠেন তিনি। *দ্য যোহার* অনেকটা অতিন্দ্রীয়বাদী উপন্যাসের মতো, যেখানে তৃতীয় শতাব্দীর তালমুদ বিশেষজ্ঞ সিমিয়ন বেন ইয়োহাই পুত্র এলিয়েযারকে নিয়ে প্যালেস্তাইনের আশপাশে ঘুরে ঘুরে অনুসারীদের সঙ্গে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানব জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট কোনও কাঠামো বা ধারণা কিংবা অনুমানের ধারাবাহিক কোনও বিকাশ নেই। এমন কোনও পদ্ধতি *দ্য যোহারের* চেতনার সঙ্গে বেমানান হতো, তাঁর ঈশ্বর চিন্তার যেকোনও বিন্যাস্ত পদ্ধতি প্রতিহত করে থাকেন। ইবন আল-আরাবীর মতো মোজেস অভ লিয়ন বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর প্রত্যেক অতিন্দ্রীয়বাদীকে অনন্য ও ব্যক্তিগত দর্শন দিয়ে থাকেন, সুতরাং তোরাহ্‌কে ব্যাখ্যা করার উপায়ের কোনও সীমা পরিসীমা নেই: কাব্বালিস্ট যখন অগ্রসর হয়, পরতের পর পরত তাৎপর্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে। *দ্য যোহার* দশটি *সেফিরদের* রহস্যময় উৎসারণকে এমন এক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখিয়েছে যার মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক এন এফ একজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। সর্বোচ্চ তিনটি *সেফিরদে*—কেদার, হোখমাহ্‌ এবং বিনাহ্‌—যখন, যেমন মনে করা হয়, এন সফ কেবল নিজেকে প্রকাশ করার 'সিদ্ধান্ত নিয়েছেন' তখন ঐশীসত্তাকে 'তিনি' বলা হয়। 'তিনি' যখন মধ্যবর্তী *সেফিরদ* হেসেদ, দিন, তিফারেদ, নেতসাখ, হোদ, ইয়েসদ—হয়ে অবতরণ করেন, তখন 'তিনি' পরিণত হন, 'তুমি'তে। সবশেষে ঈশ্বর যখন 'শেকিনাহ'য়, এই পৃথিবীতে উপস্থিত হন,

'তিনি' নিজেকে বলেন 'আমি'। এই পর্যায়ে, যেমন মনে করা হয়, ঈশ্বর একজন ব্যক্তিতে পরিণত হন, তাঁর আত্ম-প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। মানুষ তখন তার অতিন্দ্রীয়বাদী যাত্রা শুরু করতে পারে। অতিন্দ্রীয়বাদী আপন গভীরতম সত্তার উপলব্ধি অর্জন করার পর নিজের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে আরও সজাগ হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিত্ব ও অহমের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অধিকতর নৈর্ব্যক্তিক বলয়ে আরোহণ করতে পারে। এটা আমাদের সত্তার কল্পনাতীত উৎস ও অসৃষ্ট বাস্তবতার গুপ্ত জগতে প্রত্যাবর্তন। এই অতিন্দ্রয়ীবাদী দৃষ্টিকোণে, আমাদের অনুভূতি প্রকাশক জগৎ ঐশীসত্তার শেষ এবং বহিস্থঃ খোলস মাত্র।

সুফীবাদের মতো কাব্বালাহ্ সৃষ্টির মতবাদে মহাবিশ্বের বস্তুগত উৎপত্তি নিয়ে মাথা ঘামায় না। *দ্য যোহার* জেনেসিসের বিবরণকে এন সফের অন্তস্থ সংকটের প্রতীকী ভাষ্য হিসাবে দেখে, যার ফলে গডহেড তাঁর অতলান্ত অন্তর্মুখীনতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। *দ্য যোহার* যেমন বলেছে:

> আদিতে রাজার ইচ্ছা যখন কার্যকর হতে শুরু করল, স্বর্গীয় প্রভায় চিহ্ন খোদাই করলেন তিনি। এন সফের গভীরতম অন্তর হতে এক গাঢ় শিখা জ্বলে উঠল, স্বর্গীয় প্রভার বলয়ে ছিটকা পড়া নিরাকার হতে জমে ওঠা কুয়াশার মতো, শাদাও নয়, কালোও, লাল নয়, সবুজও নয়, কোনও রঙেরই নয়।[৫৫]

AMARBOI.COM

জেনেসিসে ঈশ্বরের প্রথম সৃজনশীল বাণীটি ছিল: 'লেট দেয়ার বি লাইট!' *দ্য যোহার* প্রদত্ত জেনেসিসের বিবরণের (হিব্রু ভাষায় বলা হয় *রেরেশিত*), সুচনার 'আদিতে' শব্দের পরে), এই 'গাঢ় শিখা' হলো প্রথম *সেফিরাহ:* কেদার এলিয়ন, ঈশ্বরের সর্বোত্তম মুকুট। এর কোনও রঙ বা আকার নেই: অন্য কাব্বালিস্টরা একে কিছু না (*আইন*) বলতে পছন্দ করে। মানুষের উপলব্ধিতে আসতে পারে ঐশীরূপের এমন সর্বোচ্চ ধরণকে শূন্যতার সঙ্গে মেলানো হয়েছে, কারণ এর সঙ্গে অস্তিত্ব আছে এমন কোনও কিছুর কোনও তুলনা হয় না। সুতরাং বাকি সব *সেফিরদ* শূন্যতার গর্ত থেকে আবির্ভূত হয়েছে। এটা শূন্য হতে সৃষ্টির প্রথাগত মতবাদের একটি অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যাখ্যা। গডহেডের আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া আলোর বিস্তারের সঙ্গে অব্যাহত থাকে, যা অধিকতর ব্যাপক বলয়ে ছড়িয়ে পড়ে। *দ্য যোহার* বলছে:

> কিন্তু এই শিখাটি আকৃতি আর বিস্তৃতি নিতে শুরু করলে উজ্জ্বল বর্ণের সৃষ্টি করে। কারণ একেবারে অন্তস্থ কেন্দ্রে এক গহ্বর জেগে ওঠে যেখান

থেকে নিচের যা কিছু এন সফের রহস্যময় গোপনীয়তায় লুকায়িত সমস্ত কিছুর ওপর অগ্নি ঝরায়। গহ্বর ভেঙে যায়, কিন্তু এর চারপাশের চিরন্তন প্রভাকে পুরোপুরিভাবে ভেদ করে না। ভাঙনের প্রভাবে আসার আগে পর্যন্ত পুরোপুরি শনাক্তযোগ্য থাকে এটা, একটা গোপন স্বর্গীয় বিন্দু আবির্ভূত হয়। এই বিন্দুর অতীত কোনও কিছু জানা বা বোঝা নাও যেতে পারে এবং একে বলে বেরেশিত, সূচনা; সৃষ্টির প্রথম বাণী।[৫৬]

এই 'বিন্দু'টি হচ্ছে দ্বিতীয় *সেফিরাহ হোখমাহ* (প্রজ্ঞা), যা সকল সৃষ্ট বস্তুর আদর্শ আকার ধারণ করে। বিন্দুটি এক রাজপ্রাসাদ বা দালানে পরিণত হয়, যা তৃতীয় *সেফিরাহ* অর্থাৎ 'বিনাহ্য়' রূপান্তরিত হয়। এই তিন সর্বোচ্চ *সেফিরদ* মানুষের উপলব্ধির সীমানা প্রকাশ করে। কাব্বালিস্টরা বলে যে, ঈশ্বর *বিনাহর* মহান 'কে?' (Mi) রূপে অবস্থান করেন, যা প্রত্যেক জিজ্ঞাসার শুরুতে থাকে। কিন্তু জবাব পাওয়া সম্ভব নয়। যদিও এন সফ ক্রমশঃ নিজেকে মানবীয় সীমাবদ্ধতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের জানার কোনও উপায় নেই তিনি 'কে?' আমরা যতই ওপরে উঠি, ততই অন্ধকার আর রহস্যে আবৃত্ত রয়ে যান।

পরবর্তী সাতটি *সেফিরদ* জেনেসিসের সৃষ্টির সাত দিনের অনুরূপ বলে বর্ণিত। বাইবেলিয় আমলে YHWH শেষ পর্যন্ত কানানের প্রাচীন দেবী এবং তাদের ইরোটিক কাল্টসমূহের বিপক্ষে বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু কাব্বালিস্টরা ঈশ্বরের রহস্য প্রকাশের কঠোর প্রয়াস পাওয়ার সময় খানিকটা ভিন্ন রূপে হলেও প্রাচীন মিথলজিগুলো আবার নিজস্ব জায়গা করে নেয়। *দ্য যোহার বিনাহ্কে* 'ঐশী মাতা' হিসাবে বর্ণনা করেছে, যার গর্ভ গাঢ় শিখা ছেদ করে নিম্নস্থ সাতটি *সেফিরদকে* জন্ম দেওয়ার জন্যে। আবার নবম *সেফিরাহ ইয়েসদ* এক ধরনের ধর্মীয় লিঙ্গের কল্পনা অনুপ্রাণিত করে: একে একটা সুড়ঙ্গ বা পথ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ভেতর দিয়ে অতিন্দ্রীয় প্রসবের মতো স্বর্গীয় প্রাণ মহাবিশ্বে বর্ষিত হয়। তবে দশ *সেফিরাহ* শেকিনাহ্তেই সৃষ্টির যৌন প্রতীক ও থিওগোনি স্পষ্টতরভাবে উপস্থিত। তালমুদে শেকিনাহ্ নিরপেক্ষ চরিত্র: এর কোনও লিঙ্গ বা যৌনতা ছিল না। কিন্তু কাব্বালাহ্য় শেকিনাহ্ ঈশ্বরের নারীরূপে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক যুগের অন্যতম কাব্বালিস্ট টেক্সট *বাহির*-এ (ca. ১২০০) শেকিনাহ্কে নাস্টিক চরিত্র প্লেরোমা হতে পতিত বর্তমানে ঘুরে বেড়ানো জগতের মাধ্যমে গডহেড হতে বিচ্যুত স্বর্গীয় উৎসারণের শেষটি অর্থাৎ সোফিয়ার সঙ্গে মেলানো হয়েছে। *দ্য যোহার* 'শেকিনাহর এই নির্বাসন'কে জেনেসিসে বর্ণিত আদমের পতনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এটা বলছে যে, আদমকে 'জীবন বৃক্ষে'র 'মধ্য *সেফিয়দ*' ও

'জ্ঞানবৃক্ষের' শেকিনাহকে দেখানো হয়েছিল। সাতটি *সেফিরদকে* একসঙ্গে উপাসনা করার বদলে তিনি কেবল শেকিনাহকে উপাসনার জন্যে বেছে নিয়ে জীবনকে জ্ঞান হতে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং *সেফিরদের* ঐক্য নষ্ট করেছেন। স্বর্গীয় উৎস হতে বিচ্ছিন্ন স্বর্গীয় জ্ঞান আর বাধাহীনভাবে পৃথিবীতে প্রবাহিত হতে পারেনি। কিন্তু তোরাহ্ অনুসরণের মাধ্যমে ইসরায়েলের জনগোষ্ঠী শেকিনাহ্‌র নির্বাসনের অবসান ঘটিয়ে ফের গডহেডের জগতের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বহু গোঁড়া তালমুদ অনুসারী এ ধারণাকে ঘৃণার্হ মনে করেছে, কিন্তু শেকিনাহর নির্বাসন, যা কিনা ঐশীজগৎ হতে দূরে ঘুরে বেড়ানো দেবীদের কিংবদন্তীর প্রতিধ্বনি, কাব্বালাহ্‌র অত্যন্ত জনপ্রিয় উপাদানে পরিণত হয়েছিল। নারী শেকিনাহ্ প্রবলভাবে পুরুষবাচক অর্থের দিকে ঝুঁকে থাকা ঈশ্বরের ধারণায় কিছুটা যৌন-ভারসাম্য এনেছিলঃ এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রয়োজনও মিটিয়েছে।

স্বর্গীয় নির্বাসনের ধারণা মানুষের বহু উদ্বেগের কারণ বিচ্ছেদের অনুভূতিকেও প্রকাশ করেছে। *দ্য যোহার* অব্যাহতভাবে অশুভকে এমন কিছু হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে যা বিচ্ছিন্ন হয়েছে বা যা এমন এক সম্পর্ক স্থাপন করেছে যার সঙ্গে এটা খাপ খায় না। নৈতিকতাবাদী একেশ্বরবাদের অন্যতম সমস্যা হলো এটা অশুভকে পৃথক করে দেয়। আমরা যেহেতু আমাদের ঈশ্বরের মাঝে অশুভের অবস্থানের ধারণা গ্রহণ করতে পারি না, সেহেতু আমাদের নিজেদের মাঝেও একে স্বীকার করতে না পারার এক ধরনের বিপদ আছে। তখন এটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে দানবীয় ও অমানবিক করে ফেলা হতে পারে। পশ্চিমের খ্রিস্টান জগতে ভীতিকর শয়তানের ইমেজ এমনি এক বিকৃত অভিক্ষেপ। *দ্য যোহার* পঞ্চম *সেফিরাহ* 'দিন' বা 'কঠিন বিচারে' স্বয়ং ঈশ্বরের মাঝে অশুভের মুল আবিষ্কার করেছে। *দিনকে* ঈশ্বরের বাম হাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, *হেসেদ* (করুণা) তাঁর ডান হাত *দিন* যতক্ষণ স্বর্গীয় করুণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কার্যকর থাকে ততক্ষণ এটা ইতিবাচক ও উপকারী। কিন্তু অন্যান্য সেফিরদ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে গেলে অশুভও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি কীভাবে হয় *দ্য যোহার* সেটা আমাদের বলে না। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব, পরবর্তী সময়ের কাব্বালিস্টরা অশুভের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখেছে যে, 'অশুভ' হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের একেবারে গোড়ার দিকে কোনও ধরনের আদিম 'দুর্ঘটনা'র ফল। আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে গেলে কাব্বালাহ তেমন কোনও অর্থ প্রকাশ করে না, কিন্তু এর মিথলজি মনস্তাত্ত্বিকভাবে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্প্যানিশ ইহুদি সম্প্রদায়কে যখন দুর্যোগ-দুর্দশায় গ্রাস করে তখন কাব্বালিস্ট ঈশ্বরই তাদের দুর্ভোগের একটা তাৎপর্য খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন।

AMARBOI.COM

আমরা স্প্যানিশ অতিন্দ্রীয়বাদী আব্রাহাম আবুলাফিয়ার (১২৪০-১২৯১ এর পর) রচনাবলীতে কাব্বালাহ্‌র মনস্তাত্ত্বিক তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাই। মোটামুটি *দ্য যোহারের* সমসাময়িককালেই তাঁর অধিকাংশ রচনা প্রকাশ পেলেও আবুলাফিয়া স্বয়ং ঈশ্বরের রূপ বা প্রকৃতির পরিবর্তে বরং ঈশ্বরের বোধ অর্জনের ব্যবহারিক কৌশল আবিষ্কারের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। এসব পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানকালের সাইকোঅ্যানালিস্টদের ব্যবহৃত আলোকনের জন্যে সেকুলার অনুসন্ধান পদ্ধতির মিল রয়েছে। সুফীরা যেমন মুহাম্মদের (স) মতো ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করতে চেয়েছে, তেমনি আবুলাফিয়া পয়গম্বরসুলভ অনুপ্রেরণা লাভের উপায় বের করার দাবি করেছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস, মন্ত্রোচ্চারণ ও চৈতন্যের বিকল্প একটা অবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ ভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে যোগের ইহুদি ধরণ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। আবুলাফিয়া ব্যতিক্রমী কাব্বালিস্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। তোরাহ্, তালমুদ ও ফালসাফাহ্ পাঠের পর একত্রিশ বছর বয়সে এক অদম্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ফলে অতিন্দ্রীয়বাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। নিজেকে কেবল ইহুদি নয় বরং ক্রিশ্চানদেরও মেসায়াহ বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। সে হিসাবে গোটা স্পেন এমনকি নিকট প্রাচ্য পর্যন্ত সফর করে অনুসারী সংগ্রহ করেছেন। ১২৮০ সালে ইহুদি দূত হিসাবে পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যদিও আবুলাফিয়া খৃস্টধর্মের সমালোচনার বেলায় যারপরনাই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, তা সত্ত্বেও কাব্বালিস্টিক ঈশ্বর ও ট্রিনিটির ধর্মতত্ত্বের মিল উপলব্ধি করেছিলেন। সর্বোচ্চ তিনটি সেফিরদ ঈশ্বরের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার স্মারক লোগোস ও আত্মার যা অগম্য আলোয় হারিয়ে যাওয়া কিছু না বা পিতা হতে অগ্রসর হয়েছে। আবুলাফিয়া স্বয়ং ট্রিনিটির কায়দায় ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা পছন্দ করতেন।

এই ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যে আবুলাফিয়া 'আত্মাকে উন্মুক্ত করতে একে বেঁধে রাখা গিঁটগুলো খোলার প্রয়োজনের' শিক্ষা দিয়েছিলেন। 'গিঁট খোলার' কথা তিব্বতিয় বুদ্ধ মতবাদেও দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী অতিন্দ্রীয়বাদীদের মৌলিক মিলের আরেকটা ইঙ্গিত এটা। বর্ণিত প্রক্রিয়াকে রোগির মানসিক গঠনকে ব্যাহতকারী জটিলতাসমূহ উন্মুক্ত করার সাইকোঅ্যানালিটিক প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কাব্বালিস্ট হিসাবে আবুলাফিয়া সমগ্র সৃষ্টিকে সচলকারী স্বর্গীয় শক্তির ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন আত্মা যা ধারণ করতে পারে না। আমরা যতক্ষণ ইন্দ্রিয় ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্ট মতামত দিয়ে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখব ততক্ষণ জীবনের দুর্জ্ঞেয় উপাদান আলাদা করা দুরূহ। আবুলাফিয়া অনুসারীদের যোগানুশীলনের মাধ্যমে এক নতুন জগৎ আবিষ্কারের জন্যে স্বাভাবিক চেতনার উর্ধ্বে যাবার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর

AMARBOI.COM

পদ্ধতিসমূহের অন্যতম ছিল *হোখমাহ হা-ত্ সেরুফ* যা ঈশ্বরের নামের ধ্যানের রূপ নিয়েছিল। একজন কাব্বালিস্টকে অধিকতর বিমূর্ত এক ধারণায় মনোসংযোগের লক্ষ্যে নিরেট বিষয়বস্তু হতে মনকে সরিয়ে আনতে ঈশ্বরের নামগুলোকে বিভিন্নভাবে সাজানোর প্রয়োজন হতো। এই অনুশীলনের প্রভাব–বহিরাগত কারও চোখে খুবই নৈরাজ্যজনক মনে হতে পারে–অসাধারণ ছিল বলেই ধারণা হয়। আবুলাফিয়া স্বয়ং একে সঙ্গীতের মূর্ছনা শোনার অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করেছেন, বর্ণমালার অক্ষরগুলো স্কেলের বিভিন্ন সুরের স্থান অধিকার করে নিচ্ছে। বিভিন্ন ধারণাকে একীভূত করার একটি প্রক্রিয়াও সৃষ্টি করেছিলেন তিনি যার নাম দিয়েছেন *দিল্লাগ* (লাফানো) এবং *কেফিতসাহ* (স্কিপিং), যা স্পষ্টই আধুনিক ফ্রী অ্যাসোসিয়েশনের অ্যানালিটিক্যাল অনুশীলনের অনুরূপ। আবার, এটাও বিস্ময়কর ফল বহন করত বলে কথিত আছে। আবুলাফিয়া যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, এতে গোপন মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া আলোর দিকে আসে ও কাব্বালিস্টকে 'স্বাভাবিক বলয়সমূহের কারাগার হতে' মুক্ত করে 'স্বর্গীয় বলয়ের সীমানায় নিয়ে যায়।'[৫৭] এইভাবে আত্মার 'বন্ধনসমূহ' মুক্ত হয়ে শিক্ষাব্রতী মানসিক শক্তির উৎস আবিষ্কার করে যা তার মনকে আলোকিত করে হৃদয়ের বেদনা দূর করে।

সাইকোঅ্যানালিটিক রোগির যেমন তার থেরাপিস্টের নির্দেশনার প্রয়োজন হয়, অনেকটা ঠিক সে রকম, আবুলাফিয়া জোর দিয়ে বলেছেন, মনের গভীরে অতিন্দ্রীয় যাত্রা কেবল কোনও কাব্বালাহ্ গুরুর তত্ত্বাবধানেই শুরু করা যাবে। বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিলেন তিনি, কারণ তরুণ বয়সে তিনি স্বয়ং এক ভয়ঙ্কর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন যা তাঁকে প্রায় হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। আজকের দিনে রোগিরা প্রায়শঃই তার শক্তি বা স্বাস্থ্যকে যথাযথ করার লক্ষ্যে অ্যানালিস্টের ব্যক্তিত্বকে আত্মস্থ করে নেয়। একইভাবে আবুলাফিয়া লিখেছেন যে, কাব্বালিস্ট প্রায়ই তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর সত্তাকে 'দেখবে' বা তার কথা 'শুনবে,' যিনি তার 'ভেতর থেকে পরিচালকে' পরিণত হয়েছেন, 'যিনি তার সঙ্গে বদ্ধ দরজা খোলেন'। শক্তির এক নতুন স্রোত ও এক অদম্য অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন টের পাবে সে যা ঐশী উৎস হতে আগত বলে মনে হবে। আবুলাফিয়ার একজন অনুসারী পরমানন্দের অবস্থার ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন: অতিন্দ্রীয়বাদী, বলেছেন তিনি, নিজের মেসায়াহ্য় পরিণত হয়। পরম মোহাবিষ্ট আনন্দের অবস্থায় আপন মুক্ত ও আলোকপ্রাপ্ত সত্তার দর্শনের মুখোমুখি হয় সে:

> স্মারণ রাখবে, পয়গম্বরের জন্যে পয়গম্বরত্বের সম্পূর্ণ চেতনা হচ্ছে সহসা সে আপন সত্তাকে নিজের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পায় এবং আপন সত্তা বিস্মৃত হয়; সেখান হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়...এবং

AMARBOI.COM

> এই গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে আমাদের শিক্ষকগণ তালমুদে বলেছেন: 'পয়গম্বরদের শক্তি অসাধারণ, "তাঁর" আকারের তুলনা করে যিনি এর আকার দিয়েছেন।' [অর্থাৎ, 'যিনি মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করেন।'][৫৮]

ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদীরা সবসময় ঈশ্বরের সঙ্গে বিলীন হওয়ার দাবি তুলতে অনীহ ছিল। আবুলাফিয়া ও তাঁর অনুসারীরা শুধু বলতেন যে, একজন আধ্যাত্মিক গুরুর সঙ্গে একীভূত হওয়ার অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত মুক্তি অর্জন লাভ করে কাব্বালিস্ট পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করত। মধ্যযুগীয় অতিন্দ্রীয়বাদের সঙ্গে আধুনিক সাইকোথেরাপির অবশ্যই সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে, কিন্তু দুটো শাস্ত্রই আরোগ্য ও ব্যক্তিগত সংহতি অর্জনের একই ধরনের কৌশল আবিষ্কার করেছে।

পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা অতিন্দ্রীয়বাদী ঐতিহ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধীরগতি ছিল। বাইযান্তানিয় ও ইসলামি সাম্রাজ্যর একেশ্বারবাদীদের পেছনে পড়ে গিয়েছিল তারা এবং সম্ভবত এই অভিনব পরিবর্তনের জন্যে তৈরি ছিল না। অবশ্য, চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশেষ করে উত্তর ইউরোপে অতিন্দ্রীয়বাদী ধর্মের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছিল। বিশেষত জার্মানিতে অতিন্দ্রীয়বাদীদের এক ঝাঁক জন্ম দিয়েছিল যেন: মেইস্তার একহার্ত (১২৬০-?১৩২৭), জোহানেস তাওলার (১৩০০-৬১), গারত্রুদ দ্য গ্রেট (১২৫৬–১৩০২) ও হেনরি সুসো (ca. ১২৯৫-১৩৬৬)। পশ্চিমের এই পরিবর্তনে ইংল্যান্ডও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে এবং এমন কয়েকজন অতিন্দ্রীয়বাদীর জন্ম দেয় যাঁরা নিজ দেশের পাশাপাশি গোটা মহাদেশেও অত্যন্ত দ্রুত অনুসারী লাভ করেছিলেন: হ্যামপোলো রিচার্ড রোলে (১২৯০-১৩৪৯), *দ্য ক্লাউড অভ আননোউইং*-এর অজ্ঞাত লেখক, ওয়াল্টার হিল্টন (মৃত্যু. ১৩৪৬) ও নরউইচের ডেম জুলিয়ান (ca. ১৩৪২-১৪১৬। এই অতিন্দ্রীয়বাদীদের কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বেশ অগ্রসর ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, রিচার্ড রোলে যেন অদ্ভুত শিহরণের ফাঁদে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন; আধ্যাত্মিকতাকে এক ধরনের অহমবোধে বৈশিষ্টায়িত করা হয়েছে। কিন্তু সবার সেরা যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজেদের জন্যে ইতিমধ্যে গ্রিক, সুফী ও কাব্বালিস্টদের অর্জিত দর্শনসমূহের অনেকগুলোই ফের আবিষ্কার করেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, মেইস্তার একহার্ত যদিও তাওলার ও সুসোর ওপর প্রভাব ফেলেছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং ডেনিস দ্য আরোপ্যাগাইত ও মায়মোনিদসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী দোমিনিকান ফ্রায়ার ছিলেন তিনি। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যারিস্টটলিয় দর্শনের ওপর লেকচার দিতেন।

AMARBOI.COM

অবশ্য ১৩২৫ সালে অতিন্দ্রীয় শিক্ষার কারণে তাঁর সঙ্গে আর্চ বিশপ অভ কোলনের বিরোধ সৃষ্টি হয়; বিশপ তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনেন: তাঁর বিরুদ্ধে স্বয়ং ঈশ্বর আত্মায় জন্ম নিয়েছেন ও বিশ্ব সংসারের অনন্ততার প্রচার করে ঈশ্বরের মহানুভবতা অস্বীকার করার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু তারপরেও একহার্তের তীব্র সমালোচকদের কেউ কেউ তাঁকে অর্থডক্স বলে বিশ্বাস করতেন: ভুল হয়েছে তাঁর কিছু কিছু মন্তব্যকে প্রতীকের বদলে আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করায়, যেটা প্রত্যাশিত ছিল না। একহার্ত কবি ছিলেন, প্যারাডক্স ও উপমা দারুণ উপভোগ করতেন। যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের বিশ্বাস করাটা যৌক্তিক, কিন্তু কেবল যুক্তি দিয়ে ঐশী প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব বলে মানতেন না: 'কোনও বোধগম্য জিনিসের প্রমাণ অনুভূতি বা বুদ্ধিতে মেলে,' যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, 'কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানের বেলায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির অবকাশ নেই, কারণ যেহেতু তিনি নিরাকার, তেমনি বুদ্ধি দিয়েও বোঝা সম্ভব নয়, যেহেতু আমাদের পরিচিত কোনও রূপ তিনি ধারণ করেন না।'[৫৯] ঈশ্বর আর সব জিনিসের মতো নন যে তাঁর অস্তিত্ব চিন্তার স্বাভাবিক বিষয়বস্তুর মতো প্রমাণ করা যাবে।

ঈশ্বর, ঘোষণা দিয়েছেন একহার্ত, কিছু না।[৬০] তার মানে এই নয় যে, তিনি এক বিভ্রম, বরং ঈশ্বর আমাদের জ্ঞাত অস্তিত্বের চেয়ে সমৃদ্ধ, পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের অধিকারী। ঈশ্বরকে তিনি 'অন্ধকার'ও বলেছেন, আলোর অনুপস্থিতি বোঝাতে নয়, বরং উজ্জ্বলতর কোনও কিছুর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্যে। একহার্ত নেতিবাচক ভাষায় সবচেয়ে চমৎকারভাবে বর্ণনাযোগ্য, যেমন, 'মরুভূমি,' 'বিরান অঞ্চল,' 'অন্ধকার' ও 'কিছু না' 'গডহেড'র সঙ্গে পিতা, পুত্র ও আত্মা হিসাবে আমাদের পরিচিত ঈশ্বরের পার্থক্যও করেছেন।[৬১] পাশ্চাত্যবাসী হিসাবে একহার্ত মানব মনে ট্রিনিটির মিল সম্পর্কিত অগাস্তিনের মত ব্যবহার করতে পছন্দ করেছেন; তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, যদিও ট্রিনিটির মতবাদ যুক্তির সাহায্যে জানা সম্ভব নয়, কেবল বুদ্ধিমত্তাই ঈশ্বরকে তিনটি সত্তায় ধারণ করতে পারে: অতিন্দ্রীয়বাদী ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলে সে তাঁকে একজন হিসাবে দেখে। গ্রিকরা হয়তো বা এমন ধারণা মেনে নিত না, কিন্তু ট্রিনিটি যে অত্যবশ্যকীয়ভাবে অতিন্দ্রীয়বাদী ধারণা, এ ব্যাপারে একহার্ত ওদের সঙ্গে হয়তো বা একমত হতেন। তিনি মেরি তাঁর গর্ভে ক্রাইস্টকে ধারণ করার বদলে পিতা আত্মায় পুত্রকে জন্ম দিয়েছেন আলোচনা পছন্দ করতেন। রুমীও অতিন্দ্রীয়বাদীর হৃদয়ে আত্মার জন্ম লাভের প্রতীক হিসাবে পয়গম্বর জেসাসের 'ভার্জিন বার্থ' দেখেছিলেন। এটা, একহার্ত জোর দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সহযোগিতার এক রূপক প্রকাশ।

AMARBOI.COM

কেবল অতিন্দ্রীয়বাদী অভিজ্ঞতা দিয়েই ঈশ্বরকে জানা সম্ভব। মায়মোনিদস যেমন পরামর্শ দিয়েছেন: নেতিবাচক পরিভাষায়ই তাঁর সম্পর্কে কথা বলা শ্রেয়। প্রকৃতপক্ষেই আমাদের হাস্যকর পূর্ব ধারণা ও মানবরূপ ইমেজারি হতে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। এমনকি খোদ 'ঈশ্বর' শব্দটির ব্যবহারও এড়িয়ে যাওয়া উচিত। একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন একহার্ত যখন তিনি বলেছেন: 'মানুষের সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ বিচ্ছেদ হচ্ছে যখন সে ঈশ্বরের স্বার্থে ঈশ্বর হতে বিদায় নেয়।'[৬২] এটা এক যন্ত্রণাময় প্রক্রিয়া। ঈশ্বর যেহেতু কিছু না, আমাদেরও তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে 'কিছু না' হবার প্রস্তুতি নিতে হবে। সুফীদের বর্ণিত '*ফানা*'র মতো মোটামুটি একই রকম এক প্রক্রিয়ায় একহার্ত 'বিচ্ছেদ' বা বলা যায় বিচ্ছিন্নতা (*Abgeschiedenheit*)-এর কথা বলেছেন।'[৬৩] মুসলিমরা যেভাবে স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কারও উপাসনা করাকে বহুঈশ্বরবাদ (*শিরক*) বিবেচনা করে তেমনি একহার্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন যে অতিন্দ্রীয়বাদী অবশ্যই ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও সীমাবদ্ধ ধারণার নিগড়ে বাঁধা পড়তে পারবে না। একমাত্র এভাবেই সে ঈশ্বরের সঙ্গে একতা লাভ করতে পারবে, যার ফলে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমার অস্তিত্বে এবং ঈশ্বরের সত্তা (*ইস্তিগকেইত*) আমার সত্তা হবে।'[৬৪] ঈশ্বর যেহেতু সত্তার ভিত্তি, সুতরাং 'মহাশূন্যে' তাঁকে খোঁজার কোনও দরকার নেই, প্রয়োজন নেই আমাদের পরিচিত জগতের ঊর্ধ্বে কোথাও আরোহণের কথা ভাবা।

'আমিই সত্য' বলে উলেমাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন আল-হাল্লাজ এবং একহার্তের অতিন্দ্রীয়বাদী এই মতবাদ জার্মানির বিশপদের হতচকিত করে দিয়েছিল: একজন সামান্য নারী বা পুরুষের ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে? চতুর্দশ শতাব্দীতে গ্রিক ধর্মতাত্ত্বিকগণ এ প্রশ্নে তীব্র বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। ঈশ্বর যেহেতু অত্যাবশ্যকভাবে অগম্য তাহলে কীভাবে তিনি মানবজাতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন? ঈশ্বরের সত্তা এবং তাঁর 'কর্মকাণ্ড' বা 'শক্তিসমূহে'র সত্যিই কোনও পার্থক্য থাকলে, ফাদারগণ যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, নির্ঘাৎ একজন ক্রিশ্চান প্রার্থনায় যে 'ঈশ্বরে'র মুখোমুখি হয় তাঁর সঙ্গে স্বয়ং ঈশ্বরের তুলনা করা ব্লাসফেমাস হবে? আর্চ বিশপ অভ সালোনিকি গ্রেগরি পালামাস শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ববিরোধী মনে হলেও কোনও ক্রিশ্চানই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সত্য যে, ঈশ্বরের 'সত্তা' সবসময় আমাদের নাগালের বাইরে, কিন্তু তাঁর 'শক্তিসমূহ' ঈশ্বর হতে আলাদা নয় এবং একে তুচ্ছ স্বর্গীয় প্রভাব বিবেচনা করা যাবে না। কোনও ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদী হয়তো একমত হতো: ঈশ্বর এন এফ সবসময়ই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বিরাজ করবেন, কিন্তু তাঁর *সেফিরদ* (যার সঙ্গে গ্রিক

AMARBOI.COM

'শক্তিসমূহে'র মিল আছে) সমূহ স্বর্গীয়, একেবারে গডগেডের অন্তর হতে চিরন্তনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। কখনও কখনও নারী-পুরুষ এসব 'শক্তি' সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন বা অনুভব করতে পারে, বাইবেল যখন বলে যে, ঈশ্বরের 'প্রতাপ' অবির্ভূত হয়েছিল। কেউ কখনও ঈশ্বরের সত্তা দেখেনি। কিন্তু তার মানে এই ছিল না যে, স্বয়ং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। এই মনোভাব স্ববিরোধী হলেও পালামাসকে তা মোটেও হতাশ করতে পারেনি। গ্রিকরা বহু আগেই একমত হয়েছিল যে, ঈশ্বর সম্পর্কিত যেকোনও বক্তব্য স্ববিরোধী হতে *বাধ্য*। একমাত্র এভাবেই মানুষ তাঁর সম্পর্কে রহস্য ও অনির্বচনীয় বোধ বজায় রাখতে পারবে। পালামাস বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেছেন:

> আমরা স্বর্গীয় প্রকৃতিতে অংশ গ্রহণ করি আবার একই সময়ে এটা সম্পূর্ণ অগম্য রয়ে যায়। আমাদেরকে যুগপৎ দুটোই স্বীকার করে নিতে হয় আর *সঠিক মতবাদের এক বৈশিষ্ট্য হিসাবে এর প্রতীক রক্ষা করতে হয়।*[৬৫]

পালামাসের মতবাদে নতুন কিছু ছিল না। একাদশ শতাব্দীতে নিউ থিয়োলজিয়ান সিমিয়ন এর রূপরেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু বারলাম দ্য কালোব্রিয়ান পালামাসকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। বারলাম ইতালিতে পড়াশোনা করেছেন এবং তোমাস আকুইনাসের যুক্তিবাদী অ্যারিস্টটলবাদে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। পালামাসের বিরুদ্ধে ঈশ্বরকে দুটো আলাদা অংশে ভাগ করার অভিযোগ তুলে ঈশ্বরের 'সত্তা' ও তাঁর 'শক্তিসমূহে'র বিবেচিত প্রচলিত গ্রিক পার্থক্যের বিরোধিতা করেছেন। বারলাম ঈশ্বরের একটা সংজ্ঞার প্রস্তাব রাখেন যা প্রাচীন গ্রিক যুক্তিবাদীদের সংজ্ঞার পুনরাবৃত্তি ও ঈশ্বরের পরম সারল্যের ওপর জোর দেয়। অ্যারিস্টটলের মতো গ্রিক দার্শনিকরা, বারলাম দাবি করেছেন, ঈশ্বর কর্তৃক বিশেষভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, শিক্ষা দিয়েছেন যে ঈশ্বর পৃথিবী হতে বহু দূরের ও জ্ঞানের অতীত। সুতরাং নারী ও পুরুষের পক্ষে ঈশ্বরকে 'দেখা' অসম্ভব: মানুষ পরোক্ষভাবে ঐশীগ্রন্থ বা সৃষ্টির বিস্ময়ে তাঁর প্রভাব অনুভব করতে পারে। ১৩৪১ সালে অর্থডক্স চার্চের এক কাউন্সিল বারলামের নিন্দা জানায়, কিন্তু আকুইনাস প্রভাবিত অন্য সাধুরা তাঁকে সমর্থন জানান। মূলত এটা অতিন্দ্রীয়বাদী ও দার্শনিকদের ঈশ্বরের এক বিরোধে পরিণত হয়েছিল। বারলাম ও তাঁর সমর্থকবৃন্দ গ্রেগরি আকিনদিনোস (যিনি *Summa Theologiae*-এর গ্রিক ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে পছন্দ করতেন), নিসেফোরাস গ্রেগোরাস ও দ্য তোমিস্ত প্রকরস সিনেস নীরবতা, স্ববিরোধিতা ও রহস্যের ওপর গুরুত্ব আরোপকারী বাইযান্তানিয় অ্যাপোফ্যাটিক

AMARBOI.COM

ধর্মতত্ত্ব হতে সরে এসেছিলেন। এঁরা পশ্চিম ইউরোপের অধিকতর ইতিবাচক ধর্মতত্ত্ব পছন্দ করতেন যা ঈশ্বরকে 'কিছু না'র বদলে 'সত্তা' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ডেনিস, সিমিয়ন ও পালামাসের রহস্যময় উপাস্যের বিপরীতে তাঁরা এমন একজন ঈশ্বরকে অধিষ্ঠিত করেন যাঁর সম্পর্কে বক্তব্য রাখা যেত। গ্রিকরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার এই প্রবণতাকে বরাবর বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেছে। যুক্তিভিত্তিক লাতিন ধারণার এই অনুপ্রবেশের মুখে পালামাস প্রাচ্যের অর্থডক্সি ধর্মতত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করেন। মানবীয় ভাষায় প্রকাশযোগ্য কোনও ধারণায় ঈশ্বরকে অবনমিত করা যাবে না। ঈশ্বর যে জ্ঞানাতীত, এ ব্যাপারে বারলামের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন তিনি, কিন্তু তারপরেও জোর দিয়ে বলেছেন নারী ও পুরুষ তাঁর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তাবর পর্বতে জেসাসের মানব দেহকে রূপান্তরিতকারী আলো ঈশ্বরের সত্তা ছিল না, কোনও মানুষ যা প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু কোনও রহস্যময় উপায়ে স্বয়ং ঈশ্বরই ছিলেন। গ্রিক ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী অর্থডক্স মতকে স্থাপনকারী শাস্ত্র দাবি করে যে তাবরে: 'আমরা পিতাকে আলো হিসাবে এবং আত্মাকে আলো হিসাবে দেখেছি।' এটা ছিল 'আমরা যা ছিলাম এবং আমরা যা হব' তার প্রকাশ; যখন, ক্রাইস্টের মতো দেবত্ব লাভ করব।[৬৬] আবার, এই জীবনে ঈশ্বরের ধ্যান করে যা দেখি সেটা ঈশ্বরের বিকল্প নয় বরং কোনওভাবে স্বয়ং ঈশ্বর। এটা অবশ্যই স্ববিরোধী, কিন্তু ক্রিশ্চান ঈশ্বর তো *প্যারাডক্স* ছিলেন: প্রতীক ও নীরবতা কেবল আমরা যাঁকে 'ঈশ্বর' বলি তাঁর রহস্যের ক্ষেত্রে একমাত্র সঠিক ভঙ্গি–দার্শনিক কোনও অহমিকা নয়—যা অসুবিধাসমূহ দূর করার প্রয়াস পায়।

বারলাম ঈশ্বরের ধরনটিকে বড় বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন: তাঁর মতে হয় ঈশ্বরকে তাঁর সত্তার সঙ্গে একীভূত করতে হবে নয়তো যাবে না। তিনি ঈশ্বরকে তাঁর সত্তায় সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং একথা বলতে চেয়েছেন যে নিজ 'শক্তি'র বাইরে তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে এমন চিন্তা করার মানে তাঁকে অন্য কোনও ঘটনার মতো দেখা, যা কী সম্ভব আর সম্ভব নয় তার সম্পূর্ণ মানবীয় ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পালামাস জোর দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরের দর্শন একটা দ্বিপাক্ষিক পরমানন্দ: নারী ও পুরুষ নিজেদের অতিক্রম করে যায় *কিন্তু* ঈশ্বরও আপন সৃষ্টির কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে 'নিজের' ঊর্ধ্বে গিয়ে এক পরমানন্দ লাভ করেন: 'ঈশ্বরও আপন সত্তা হতে বেরিয়ে আসেন এবং সদয় অবতরণের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে একীভূত হন।'[৬৭] চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রিক যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে অর্থডক্স খৃস্টধর্মের আদর্শ হিসাবে রয়ে যাওয়া পালামাসের ধর্মতত্ত্বের বিজয় সকল একেশ্বরবাদী ধর্মের অতিন্দ্রীবাদের বৃহত্তর বিজয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। একাদশ শতাব্দী থেকেই মুসলিম

AMARBOI.COM

দার্শনিকগণ সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে যুক্তি–যা ওষুধ বা বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য–ঈশ্বরের গবেষণায় একেবারেই অপর্যাপ্ত। কেবল যুক্তির ওপর নির্ভর করার মানে দাঁড়াবে কাঁটা চামচ দিয়ে স্যুপ খাওয়ার মতো।

ইসলামি সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ স্থানে সূফীদের ঈশ্বর দার্শনিকদের ঈশ্বরের উর্ধ্বে স্থান করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব, ষোড়শ শতাব্দীতে কাব্বালিস্টদের ঈশ্বর ইহুদি আধ্যাত্মিকতায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। অতিন্দ্রীয়বাদ অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিক বা যৌক্তিক ধরনের ধর্মের চেয়ে গভীরভাবে মানুষের মনে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম করেছিল। অতিন্দ্রীয়রাদের ঈশ্বর অধিকতর আদিম আশা, আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার সমাধানে সক্ষম, যেখানে দার্শনিকদের ঈশ্বর অক্ষম। চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ পাশ্চাত্য নিজস্ব অতিন্দ্রীয়বাদী ধর্মের সূচনা ঘটায় যার শুরু ছিল অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল। কিন্তু পশ্চিমের অতিন্দ্রীয়বাদ কখনওই অপরাপর ধর্মের মতো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি। ইংল্যান্ডে, জার্মানি ও লোল্যান্ডসে বিশেষ ধরনের অতিন্দ্রীয়বাদীদের জন্ম ঘটলেও ষোড়শ শতাব্দীতে প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকগণ একে বাইবেল বিরোধী আধ্যাত্মিকতা হিসাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রোমান ক্যাথলিক চার্চে সেইন্ট তেরেসা অভ আভিলার মতো নেতৃস্থানীয় অতিন্দ্রীয়বাদীগণ প্রায়শঃ কাউন্টার-রিফরমেশনের ইনকুইজিশনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। সংস্কারের পরিণতিতে ইউরোপ আরও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরকে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল।

AMARBOI.COM

# ৮.

# সংস্কারকদের ঈশ্বর

ঈশ্বরের সকল জাতির ক্ষেত্রে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী ছিল চরম সিদ্ধান্ত মুলক। পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চানদের জন্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা পর্যায় ছিল এটা, যারা কেবল ওইকুমিনের অপরাপর সংস্কৃতির সঙ্গে তালই মেলায়নি বরং তাদের অতিক্রম করে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এই দুই শতাব্দী ইতালিতে অতি দ্রুত উত্তর ইউরোপের বিস্তার লাভ করা রেনেসাঁ, নতুন বিশ্বের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা প্রত্যক্ষ করেছে যা বাকি বিশ্বের নিয়তির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পশ্চিম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এক সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটাতে যাচ্ছিল। সুতরাং, এটা ছিল ক্রান্তিকাল, যার ফলে সাফল্য ও উদ্বেগ ছিল এ সময়ের বৈশিষ্ট্য। এ সময়ের পশ্চিমে ঈশ্বর সংক্রান্ত ধ্যানধারণার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে আছে। সেক্যুলার সাফল্য সত্ত্বেও ইউরোপের জনগণ অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে তাদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিল। সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে ধর্মের মধ্যযুগীয় চরিত্র নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল, কেননা তা নতুন বিশ্বের সমস্যা বা প্রয়োজন মেটাতে পারছিল না। মহান সংস্কাররকগণ এই অসন্তোষকে ভাষা দান করেন এবং ঈশ্বর ও মুক্তিলাভকে বিবেচনা করার নতুন উপায় আবিষ্কার করেন। ফলে ইউরোপ দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে—ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট—যারা কখনও পারস্পরিক ঘৃণা ও সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সংস্কারকালীন সময়ে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারবাদীরা বিশ্বাসীদের প্রতি সাধু-সন্ন্যাসী ও দেবদূতদের ওপর প্রান্তিক ভক্তিবাদ ছেড়ে কেবল ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করার তাগিদ দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষেই ইউরোপে যেন ঈশ্বর-উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কেউ

AMARBOI.COM

কেউ 'নাস্তিক্যবাদ' নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিয়েছিল। এর মানে কি তবে তারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল?

গ্রিক, ইহুদি ও মুসলিমদের জন্যেও এক সঙ্কট কাল ছিল এটা। ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কীরা ক্রিশ্চান রাজধানী কন্সতান্তিনোপল অধিকার করে ও বাইযান্তিয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়। এরপর থেকে রুশ ক্রিশ্চানরা গ্রিক উদ্ভাবিত প্রথা ও আধ্যাত্মিকতা অনুসরণ অব্যাহত রাখে। ক্রিস্টোফার কলোম্বাসের নতুন বিশ্ব আবিষ্কারের বছর, ১৪৯২ সালে ফের্নিনান্দ ও ইসাবেলা ইউরোপের শেষ মুসলিম শক্ত ঘাঁটি স্পেনের গ্রানাদা অধিকার করে নেন: পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের বাসভূমি ইবেরিয় পেনিনসুলা থেকেও উচ্ছেদ করা হয়। স্পেনের মুসলিমদের বিনাশ ইহুদিদের জন্যে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। গ্রানাদা দখল করার কয়েক সপ্তাহ পার হওয়ার পর ১৪৯২ সালের মার্চ মাসে ক্রিশ্চান শাসকগণ ইহুদিদের খৃস্টধর্ম গ্রহণ বা নির্বাসনের যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন। স্প্যানিশ ইহুদিদের অনেকেরই দেশের প্রতি এত প্রবল টান ছিল যে, তারা ক্রিশ্চান হয়ে গেলেও কেউ কেউ ইসলাম হতে ধর্মান্তরিত *মরিসকোস*দের মতো গোপনে ধর্মচর্চা অব্যাহত রাখে: এই ইহুদি ধর্মান্তরিতদের পরে ধর্মদ্রোহী সন্দেহ করে ইনকুইজিশন তাড়া করে বেড়িয়েছিল। অবশ্য প্রায় ১৫০,০০০ ইহুদি খৃস্টধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়; তাদের জোরপূর্বক স্পেন ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এরা তুরস্ক, বালকান অঞ্চল ও উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় নেয়। স্পেনের মুসলিমরা ডায়াসপোরার ইহুদিদের জন্যে সেরা বাসভূমি গড়ে দিয়েছিল; ফলে স্প্যানিশ ইহুদিদের বিনাশকে গোটা পৃথিবীর ইহুদিরা সিই ৭০-এ মন্দির ধ্বংসের পর তাদের জাতির ওপর নেমে আসা ভয়ঙ্করতম দুর্যোগ হিসাবে দেখেছে। অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে আরও গভীরভাবে ইহুদিদের ধর্মীয় চেতনায় নির্বাসনের বোধ স্থান করে নেয়: ফলে এক নতুন ধরনের কাব্বালাহ জন্ম লাভ করে, ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়।

AMARBOI.COM

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মুসলিমদের জন্যেও জটিল সময় ছিল এটা। মঙ্গল আক্রমণ পরবর্তী শতাব্দীগুলোয়—সম্ভবত অনিবার্যভাবে—এক নতুন ধরনের রক্ষণশীলতা গড়ে উঠেছিল, জনগণ যেন এতে সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলামি বিদ্যাপীঠ *মাদ্রাসার* সুন্নী *উলেমাগণ* ঘোষণা করেন যে, *ইজতিহাদের* (স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগ) পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন থেকে মুসলিমদের অতীতের মহান, বিশেষ করে শরীয়াহ বা পবিত্র আইনের জ্ঞানী ব্যক্তিদের 'অনুসরণ' (*তাকলিদ*) করতে হবে। এ রকম রক্ষণশীল আবহে ঈশ্বর বা সত্যি বলতে অন্য কিছু সম্পর্কে নতুন ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠা অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হয়ে উঠবে। তা সত্ত্বেও পশ্চিম

ইউরোপিয়রা যেমন মনে করে থাকে, এ সময়কালকে ইসলামের পতনের সূচনা লগ্ন বললে ভুল হবে। মার্শাল জি. এস. হজসন তাঁর *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম: কনশিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, এ রকম ঢালাও সরলীকরণ করার মতো এ সময় সম্পর্কিত যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। উদাহরণ স্বরুপ, এই সময়ে মুসলিমদের বিজ্ঞান চর্চায় ভাটা পড়েছিল ভেবে নেওয়াটা ভুল হবে, কেননা আমাদের কাছে কোনও পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।

চতুর্দশ শতাব্দীতে দামাস্কাসের আহমেদ ইবন তাঈমিয়াহ (মৃত্যু. ১৩২৮) এবং তাঁর শিষ্য ইবন আল-কাঈন আল-জওযিয়াদের মতো শরীয়াহ্ অনুসারীদের হাতে রক্ষণশীল প্রবণতা জন্ম লাভ করেছিল। মুসলিমরা যেন সম্ভাব্য সবরকম পরিস্থিতিতে শরীয়াহ্ প্রয়োগ করতে পারে সেভাবে একে বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন জনপ্রিয় ইবন তাঈমিয়াহ। একে নির্যাতনমূলক অনুশীলন হিসাবে গড়ে তোলার কোনও ইচ্ছা ছিল না; তিনি পুরোনো অচল নিয়ম বা বিধিগুলোকে বাদ দিয়ে শরীয়াহকে এই সংকট-সময়ের মুসলিমদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূর করার উপযোগি প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় সমস্যাদির স্পষ্ট যৌক্তিক জবাব শরীয়াহ্ হতে পাওয়া উচিত। কিন্তু শরীয়াহ্র প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে তাঈমিয়াহ্ কালাম, ফালসাফাহ্, এমনকি আশারিয়াদের ওপরও চড়াও হয়ে বসেন। যে কোনও সংস্কারকের মতো তিনি উৎসে—কোরান এবং *হাদিসে* (যার ওপর ভিত্তি করে শরীয়াহ্র সৃষ্টি)—প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন এবং চেয়েছিলেন পরবর্তীকালের সমস্ত সংযুক্তি ঝেড়ে ফেলতে: 'আমি সকল ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখেছি। এসব রোগ উপশম বা তৃষ্ণা নিবারণে অক্ষম। আমার কাছে কোরানের পথই সর্বশ্রেষ্ঠ।'[1] তাঁর শিষ্য আল-জাওযিয়াহ্ উদ্ভাবনের তালিকায় সুফীবাদকে যোগ করেন এবং ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর জোর দেন; তাঁর ওপর সুফী সাধকদের কাল্টকে এমনভাবে নিন্দা জানান যার সঙ্গে পরবর্তীকালের ইউরোপের প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারবাদীদের খুব বেশি অমিল ছিল না। লুথার ও কালভিনের মতো ইবন তাঈমিয়াহ্ ও আল-জাওযিয়াহ্ তাঁদের সমসাময়িকদের চোখে সেকেলে বিবেচিত হননি: তাঁদের বরং প্রগতিশীল মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ সময়ের তথাকথিত রক্ষণশীলতাকে 'স্থবিরকাল' হিসাবে নাকচ না করার জন্যে আমাদের সতর্ক করেছেন হজসন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, আমাদের আগে আর কোনও সমাজ আমরা এখন যে মাত্রায় প্রগতিকে উপভোগ করছি সেভাবে দেখতে বা বহন করার উপযোগি ছিল না।[2] পশ্চিমের পণ্ডিতগণ প্রায়শঃই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিমদের ইতালিয় রেনেসাঁকে বিবেচনায় নেওয়ার ব্যর্থতার জন্যে ভর্ৎসনা

AMARBOI.COM

করে থাকেন। ইতিহাসের এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিকাশের পর্যায় ছিল এটা, সত্যি, কিন্তু এর সঙ্গে, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, চীনের সুং রাজবংশের খুব একটা তারতম্য ছিল না, যা দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলিমদের প্রেরণার উৎস ছিল। পশ্চিমের জন্যে রেনেসাঁ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি-যুগের আবির্ভাব বুঝতে পারেনি কেউ, যদিও পেছনে তাকিয়ে আমরা এর আগমনের আভাস দেখতে পাই। মুসলিমরা এই পশ্চিমা রেনেসাঁর প্রতি যদি সাড়া নাও দিয়ে থাকে সেজন্যে একে দুরতিক্রম্য সাংস্কৃতিক অপুর্ণতা হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, মুসলিমরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাদের নিজস্ব উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে ইসলাম ছিল বিশ্বের পরাশক্তি; পশ্চিম ইউরোপ দোরগোড়ায় এর উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পর্ক সচেতন ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে তিনটি নতুন ইসলামি সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটে: এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ইউরোপে অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্য, ইরানে সাফাভিয়দের সাম্রাজ্য ও ভারতে মুঘোলদের সাম্রাজ্য। নয়া এই প্রয়াসগুলো দেখায় যে, ইসলামি চেতনা কোনও অর্থেই মরণোন্মুখ ছিল না বরং দুর্যোগ ও ধ্বংসের পর মুসলিমদের আবার সফল হওয়ার প্রেরণা জাগানোর ক্ষমতা এর রয়েছে। প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যই যার যার নিজস্ব পরিমণ্ডলে সাংস্কৃতিক বিকাশ অর্জন করেছিল: ইরান ও মধ্য এশিয়ার সাফাভিয় রেনেসাঁ লক্ষণীয়ভাবে ইতালিয় রেনেসাঁর অনুরূপ ছিল: উভয় সংস্কৃতিই চিত্রকলায় নিজেদের তুলে ধরেছে ও সৃজনশীলতার সঙ্গে আবার তাদের সংস্কৃতির পৌত্তলিক উৎসে ফিরে যাবার অনুভুতি বোধ করেছে। অবশ্য এ তিনটি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও যাকে বলা হয় রক্ষণশীল চেতনা অব্যাহত রয়ে গিয়েছিল। আল-ফারাবী ও ইবন-আল-আরাবীর মতো পূর্ববর্তীকালের অতিন্দ্রীয়বাদী ও দার্শনিকরা যেখানে নতুন জগৎ আবিষ্কারের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, যেখানে এই পর্যায়ে প্রাচীন চিন্তা বা থিমেরই সূক্ষ্ম ও জটিল পুনরুত্থান ঘটতে দেখা গেছে। ফলে পশ্চিমাদের পক্ষে বিষয়টি বোঝা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ আমাদের পণ্ডিতগণ এসব আধুনিক ইসলামি প্রয়াসকে দীর্ঘদিন করে উপেক্ষা করে এসেছেন। এছাড়াও, দার্শনিক ও কবিগণ আশা করেন তাঁদের পাঠকদের মন অতীতের ইমেজ আর ধারণায় পরিপুর্ণ।

অবশ্য, পাশ্চাত্যের পরিবর্তনের সমান্তরাল অগ্রগতির নজীরও ছিল। সাফাভিয়দের অধীনে এক নতুন ধরনের দ্বাদশবাদী শিয়াহ্‌বাদ ইরানের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়েছিল; এর ফলে নজীরবিহীনভাবে শিয়াহ্‌ ও সুন্নীদের মাঝে সূচিত হয়েছিল বৈরিতার। এতদিন পর্যন্ত অধিকতর বুদ্ধিজীবী বা অতিন্দ্রীয়বাদী সুন্নীদের সঙ্গে শিয়াহ্‌দের বহু ক্ষেত্রেই মিল ছিল। কিন্তু ষোড়শ



AMARBOI.COM

শতাব্দীতে এরা দুটি বিবদমান শিবির গড়ে তোলে যার সঙ্গে একই সময়ে ইউরোপে সংঘটিত ধর্মীয় গোষ্ঠীগত সংঘাতের দুঃখজনক সাদৃশ্য রয়েছে। সাফাভিয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ ইসমাইল ১৫০৩ সালে আযেরবাইজানের ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং পশ্চিম ইরান ও ইরাকে ক্ষমতার বিস্তার ঘটান। সুন্নী মতবাদ উচ্ছেদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রজাদের ওপর শিয়াহ্ মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যা আগে বিরল ছিল। নিজেকে প্রজন্মের ইমাম মনে করেছেন তিনি। এই আন্দোলনের সঙ্গে ইউরোপের প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারের মিল ছিলঃ উভয়ের মূলে ছিল প্রতিবাদ, উভয়ই আভিজাত্যবাদের বিরুদ্ধে ছিল এবং জড়িত ছিল রাজকীয় সরকার গঠনের সঙ্গে। শিয়াহ্রা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলসমূহ থেকে এমনভাবে সুফী *তরিকাসমূহের* উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল যা প্রটেস্ট্যান্টদের মঠ বিলুপ্ত করার কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এর ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের সুন্নীদের মাঝেও এক নিরাপোস মনোভাব জেগে ওঠেছিল, যারা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার শিয়াহ্দের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল। ক্রুসেডে লিপ্ত পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের পবিত্র ধর্ম-যুদ্ধের একেবারে প্রথম কাতারে আবিস্কার করে অটোমানরা তাদের ক্রিশ্চান প্রজাদের বিরুদ্ধেও এক নতুন অসহিষ্ণু মনোভাব গড়ে তোলে। তবে গোঁড়া ইরানি প্রশাসনকে ধর্মান্ধ বিবেচনা করা ভুল হবে। ইরানের শিয়াহ্ উলেমাগণ এই সংস্কৃত শিয়াহ্দের তীর্যক দৃষ্টিতে দেখেছেনঃ সুন্নী প্রতিপক্ষের বিপরীতে তারা *'ইজাতিহাদের* পথ বন্ধ' করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ও শাহ্দের নিকট থেকে স্বাধীনতাকে ইসলামকে ব্যাখ্যা করার অধিকারের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা সাভাভিয় এবং পরে কাজার বংশকে ইমামদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তার বদলে শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং ইস্পাহান এ পরে তেহ্রানে রাজকীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে *উন্মাহ্র* নেতায় পরিণত হয়েছেন। শাহ্দের অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বণিক সমাজ ও দরিদ্র জনসাধারণের অধিকার রক্ষার এক রেওয়াজ গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা যা তাঁদের ১৯৭৯ সালে শাহ মুহাম্মদ রেযা পাহ্লভীর বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে সক্ষম করে তুলেছিল।

ইরানের শিয়াহ্রাও নিজস্ব ফালসাফাহ গড়ে তুলেছিল, যা সুহরাওয়ার্দির অতিন্দ্রীয়বাদী ধারা অব্যাহত রাখে। শিয়াহ্ ফালসাফাহ্র প্রতিষ্ঠাতা মির দামাদ (মৃত্যু. ১৬৩১) একাধারে বিজ্ঞানী ও ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন। ঐশী আলোকে তিনি মুহাম্মদ (স) এবং ইমামদের মতো প্রতীকী চরিত্রের আলোকনের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। সুহরাওয়ার্দির মতো তিনিও ধর্মীয় অনুভূতির অবচেতন মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তবে এ ইরানি মতবাদের মূল

AMARBOI.COM

রূপকার ছিলেন মির দামাদের শিষ্য সদর আলদিন রাযি, সাধারণভাবে যিনি মোল্লা সদরা (১৫৭১-১৬৪০) নামে পরিচিত। আজকের দিনে বহু মুসলিম তাঁকে সর্বমহান ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে, তারা মনে করে, তিনি মুসলিম দর্শনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত মেটাফিজিক্স ও আধ্যাত্মিকতার সংশ্লেষ ঘটাতে পেরেছিলেন। অবশ্য পশ্চিমে সবে তিনি পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করেছেন এবং এই গ্রন্থ রচনার সময় তাঁর মাত্র একটি নিবন্ধ ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

সুহরাওয়ার্দির মতো মোল্লা সদরাও বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞান কেবল তথ্য আহরণ নয় বরং পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। সুহরাওয়ার্দির *আলম আল মিথাল* তাঁর চিন্তাধারায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল: তিনি স্বয়ং স্বপ্ন ও দিব্য দর্শনকে সত্যের সর্বোচ্চ রূপ হিসাবে দেখেছেন। সুতরাং ইরানি শিয়াহ্‌বাদ তখনও সাধারণ বিজ্ঞান ও মেটাফিজিক্সের চেয়ে অতিন্দ্রীয়বাদকেই ঈশ্বরকে জানার সবচেয়ে জুৎসই উপায় হিসাবে দেখছিল। মোল্লা সদরা শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ বা *ইমেটিশিও দেই* (*imitatio dei*) দর্শনের লক্ষ্য এবং একে কোনও বিশেষ ক্রীড বা ধর্ম বিশ্বাসে সীমিত রাখা যাবে না। ইবন সিনা যেমন দেখিয়েছিলেন, কেবল পরম সত্তা ঈশ্বরেরই প্রকৃত অস্তিত্ব (*উজ্যুদ*) রয়েছে এবং এই একক সত্তাটি স্বর্গীয় জগৎ হতে শুরু করে বালু কণা পর্যন্ত সকল সত্তার গোটা ধারাবাহিকতাকে অনুপ্রাণিত করেন। মোল্লা সদরা সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন না। তিনি স্রেফ ঈশ্বরকে অস্তিত্বমান সকল বস্তুর উৎস হিসেবে দেখেছেন: আমরা যেসব বস্তু বা সত্তা দেখি বা অনুভব করি সেগুলো সীমিত পরিসরে ঐশী আলোক বহনকারী মাত্র। তারপরেও ঈশ্বর পার্থিব বাস্তবতার উর্ধ্বে। সকল বস্তুর ঐক্য এটা বোঝায় না যে, কেবল ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব রয়েছে বরং এর সঙ্গে সূর্য ও বিকিরিত রশ্মির ঐক্যের মিল রয়েছে। ইবন আল-আরাবীর মতো মোল্লা সদরা ঈশ্বরের সত্তা বা তাঁর 'অন্ধত্বকে এর বিভিন্ন অভিব্যক্তি হতে আলাদাভাবে দেখেছেন। তাঁর দর্শনের সঙ্গে গ্রিক হেসিচ্যাস্ট কাব্বালিস্টদের ধ্যান-ধারণার খুব একটা অমিল নেই। গোটা সৃষ্টির জগতকে 'অন্ধত্ব' হতে বিকিরিত হয়ে বহু স্তর বিশিষ্ট 'একটা রত্ন'-এর গঠন হিসাবে দেখেছেন তিনি যাকে আবার ঈশ্বরের তাঁর গুণাবলী বা 'নিদর্শন সমূহের' (*আয়াত*) মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর্যায়ক্রম হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। এগুলো অস্তিত্বের উৎসে প্রত্যাবর্তনে মানুষের বিভিন্ন পর্যায়েরও প্রতিনিধিত্ব করে।

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাপারটি পরকালের জন্যে সংরক্ষিত নয়। *হেসিচ্যাস্টদের* কারও কারও মতো মোল্লা সদরা বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানের মাধ্যমে ইহজগতেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব। বলাবাহুল্য, তিনি কেবল

AMARBOI.COM

বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিক জ্ঞানের কথা বোঝাননি: ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বারোহণের সময় অতিন্দ্রীয়বাদীকে দিব্যদর্শন ও কল্পনার জগৎ *আলম আল-মিথাল*-এর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। ঈশ্বর বস্তুনিষ্ঠভাবে জানার মতো কোনও সত্তা নন, কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমের কল্পনা-প্রবণ গুণের মাঝেই তাঁকে পাওয়া যাবে। কোরান বা *হাদিস* যখন স্বর্গ, নরক বা ঈশ্বরের আসনের কথা বলে, তখন এগুলো অন্যত্র অবস্থিত কোনও বাস্তবতার কথা বোঝায় না বরং বোধগম্য আড়ালে লুক্কায়িত এক অন্তর্জগতের কথা বোঝায়:

> মানুষ যা কিছু কামনা করে, যা কিছু আশা করে, সঙ্গে সঙ্গে তা তার কাছে উপস্থিত হয় বা বলা উচিত তার ইচ্ছাকে রূপ দেওয়াই এর বস্তুর প্রকৃত উপস্থিতির অভিজ্ঞতা। কিন্তু মিষ্টতা ও আনন্দ হচ্ছে স্বর্গ ও নরক, শুভ ও অশুভ এর প্রকাশ, যা পরকালের জগতের শাস্তিস্বরূপ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে, মানুষের অত্যাবশ্যকীয় 'অমিত্ব' ছাড়া যার আর কোনও উৎস নেই, যার গঠনের মূলে রয়েছে তার ইচ্ছা ও অভিক্ষেপ, অন্তর্গত বিশ্বাসসমূহ আর তার আচরণ।[৩]

ইবন আল-আরাবীকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন মোল্লা সদরা, তিনি তাঁর মতো ঈশ্বরকে ভিন্ন এক জগতে অবস্থানরত বহিস্তঃ স্বর্গীয় সত্তা হিসাবে দেখেননি যাঁর কাছে বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন করবে। নিজের মাঝেই ব্যক্তিগত *আলম-আল মিথালে*, স্বর্গ ও ঐশী জগতকে আবিষ্কার করতে হবে, যা প্রতিটি মানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেকজন ব্যক্তির স্বর্গ বা ঈশ্বর হুবহু এক রকম হবে না।

AMARBOI.COM

সুন্নী, সুফী ও গ্রিক দার্শনিকদের মতো শিয়াহ্ ইমামদেরও শ্রদ্ধাকারী মোল্লা সদরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ইরানের শিয়াহ্ মতবাদ সবসময় বিশেষ ধরনের ও ধর্মান্ধ ছিল না। ভারতের বহু মুসলিম অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি অনুরূপ সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে তুলেছিল। যদিও মুঘল ভারতে সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু হিন্দুধর্মও গুরুত্বপুর্ণ ও সৃজনশীল রয়ে গিয়েছিল; মুসলিম ও হিন্দুদের কেউ কেউ শিল্পকলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশ বহুদিন আগে থেকেই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা হতে মুক্ত ছিল। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মমতের সর্বাধিক সৃজনশীল ধারা ধর্মীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার একতার ওপর জোর দিয়েছে: সকল পথই বৈধ, যদি একক ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে গুরুত্ব দেয়। এর সঙ্গে সুফীবাদ ও ফালসাফাহ্‌র স্পষ্ট মিল রয়েছে যা ভারতে ইসলামের সবচেয়ে প্রাধান্য বিস্তারকারী ধরণ ছিল। মুসলিম ও

হিন্দুদের কেউ কেউ আন্তঃধর্মীয় সমাজ গড়ে তুলেছিল। এগুলোর মাঝে পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুরু নানক প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্মমত সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হয়ে ওঠে। এ নতুন ধরনের একেশ্বরবাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ ও হিন্দুদের ঈশ্বর একই। মুসলিমদের দিক থেকে মির দামাদ এবং মোল্লা সদরার সমসাময়িক ইরানি পণ্ডিত মির আবু আল-কাসিম ফিন্দিরিস্কি (মৃত্যু. ১৬৪১) ইস্পাহানে ইবন সিনার রচনাবলী শিক্ষা দান করলেও ভারতে হিন্দু ধর্মমত ও যোগ সাধনা নিয়ে গবেষণায় প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন। এ সময় তোমাস আকুইনাসের ওপর কোনও বিশেষজ্ঞ রোমান ক্যাথলিকেরা আব্রাহামের ঐতিহ্য বহন করছে না এমন এক ধর্মের প্রতি একইরকম আগ্রহ দেখানোর কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণকারী তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবরের ১৫৬০ থেকে ১৬০৫ পর্যন্ত রাজত্বকালে সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতার এই চেতনা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁর নীতিমালায় প্রকাশ পায়। হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি থেকে তিনি নিরামিষভোজীতে পরিণত হন; শিকার ছেড়ে দেন–অথচ এই ক্রীড়াটি অত্যন্ত পছন্দের ছিল–তাঁর জন্মদিনে বা হিন্দুদের পবিত্র স্থানসমূহে পশু উৎসর্গ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫৭৫ সালে একটি উপাসনা গৃহ স্থাপন করেছিলেন তিনি যেখানে সকল ধর্মমতের পণ্ডিতগণ ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনার জন্যে সমবেত হতে পারতেন। এখানে স্পষ্টতঃই ইউরোপ থেকে আগত জেস্যুইট মিশনারিরাই সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় একেশ্বরবাদের (*তাওহীদ-ই-ইলাহি*) প্রতি নিবেদিত নিজস্ব সুফী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা সঠিক পথে পরিচালিত যেকোনও ধর্মে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন এমন এক রেডিক্যাল বিশ্বাস ঘোষণা করেছিল। আবুল ফজল আল্লামি (১৫৫১-১৬০২)-এর *আকবার নামাহয়* (দ্য বুক অভ আকবর) আকবরের জীবনকে মহীয়ান করে তোলা হয়েছে, এই গ্রন্থটিতে সুফীবাদের নীতিমালাকে সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যায় প্রয়োগের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আল্লামি আকবরকে ফালসাফাহ্‌র আদর্শ শাসক ও তাঁর সময়ের আদর্শ বা সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে দেখেছেন। আকবরের মতো কোনও শাসক যখন একটি উদার, মহৎ সমাজ গড়ে তোলেন, অসম্ভব করে তোলেন গোঁড়ামিকে, তখন সভ্যতা সর্বজনীন শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ঈশ্বরের কাছে 'আত্মসমর্পণের' ইসলামের যে মুল অর্থ সেটা যেকোনও ধর্মের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে: তিনি তাঁর সময় 'মুহাম্মদের (স) ধর্মে'র ঈশ্বরের ওপর একচেটিয়া অধিকার না থাকার দাবি করেছেন। অবশ্য সব মুসলিম আকবরের সঙ্গে একমত পোষণ করেনি; তাঁকে ধর্মের প্রতি হুমকি মনে করেছে। মুঘলরা যতদিন শক্তিশালী অবস্থানে ছিল

ততদিনই কেবল তাঁর সহিষ্ণুতার নীতি স্থায়িত্ব পেয়েছে। ক্ষমতার অবনতি ঘটতে শুরু করলে মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী বিদ্রোহ ঘোষণা শুরু করে, ফলে মুসলিম, হিন্দু ও শিখদের মাঝে ধর্মীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেড়ে ওঠে। সম্রাট আওরেঙযেব (১৬১৮-১৭০৭) হয়তো ভেবেছিলেন মুসলিম শিবিরে অধিকতর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে ঐক্য ফিরিয়ে আনা যাবে: তাই মদ্যপানের মতো বিভিন্ন শৈথিল্যের বিরুদ্ধে আইন জারি করেন তিনি, হিন্দুদের সাথে মেলামেশা অসম্ভব করে তোলেন, হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস করেন এবং হিন্দু-বণিকদের ওপর করের হার দ্বিগুণ করে দেন। তাঁর সম্প্রদায়িক নীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ছিল ব্যাপক হারে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস। আকবরের সহিষ্ণু নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত এই নীতিমালা আওরেঙযেবের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্য আর কখনওই তাঁর সৃষ্ট ধ্বংসাত্মক গোঁড়ামি ও ঈশ্বরের নামে পবিত্রকরণের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

আকবরের জীবদ্দশায় তাঁর প্রবলতম প্রতিপক্ষ অসাধারণ পণ্ডিত শেখ আহমেদ শিরহিন্দি (১৫৬৪-১৬২৪) সুফী ছিলেন। শিষ্যরা তাঁকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করত। শিরহিন্দি সরাসরি ইবনে আল-আরাবীর অতিন্দ্রীয়বাদী ধারণার বিরোধিতা করেছেন। যাঁর অনুসারীরা ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্তা বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। আমরা যেমন দেখেছি, মোল্লা সদরা অস্তিত্বের একত্বের *ওয়াহদাত আল উজুদ* ধারণার কথা বলেছেন। এটা *শাহাদার* অতিন্দ্রীয়বাদী ঘোষণা: আল্লাহ ছাড়া আর কোনও সত্তা নেই। অন্যান্য ধর্মের অতিন্দ্রীয়বাদীদের মতো সুফীগণ এক একত্বের অনুভূতি লাভ করেছে এবং গোটা অস্তিত্বের সঙ্গে একত্ব বোধ করেছিল। কিন্তু শিরহিন্দি অগম্য এই ধারণাকে পুরোপুরি মনের কল্পনা বলে বাতিল করে দিয়েছেন। অতিন্দ্রীয়বাদী যখন কেবল ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করে তখন অন্য সবকিছু তার চেতনা হতে সরে যেতে শুরু করে, কিন্তু এর সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ কোনও সত্তার মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ও জগতের মাঝে কোনও রকম ঐক্য বা যোগাযোগের কথা বলতে যাওয়াটা সম্পূর্ণই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা। আসলে, ঈশ্বরের সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তিনি পবিত্রজন, নাগালের বাইরে, আবার নাগালের বাইরে, আবার নাগালের বাইরে।'[4] প্রকৃতির 'নিদর্শনসমূহ' নিয়ে ধ্যানের পরোক্ষ উপায় ছাড়া জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সরাসরি কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। শিরহিন্দি ইবন আল-আরাবীর মতো অতিন্দ্রীয়বাদীদের চেয়েও উচ্চতর এবং অধিকতর শান্ত চেতনা স্তরে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দার্শনিকদের দূরবর্তী ঈশ্বরে বিশ্বাস পুনঃস্থাপিত করার জন্যে অতিন্দ্রীয়বাদ ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার

AMARBOI.COM

করেছেন; যিনি বস্তুনিষ্ঠ কিন্তু অগম্য সত্তা। অনুসারীরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা তা করেনি, তারা অতিন্দ্রীয়বাদীদের সর্বব্যাপী অন্তস্থঃ ঈশ্বরে বিশ্বাসী রয়ে গেছে।

ফিন্দিরিস্কি ও আকবরের মতো মুসলিমরা যখন অপরাপর ধর্মের মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়াস পাচ্ছিলেন তখন, ১৪৯২ সালে, পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা দেখিয়ে দেয় যে, আব্রাহামের অপর দুটি ধর্মের নৈকট্য তাদের সহ্যের অতীত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে জুড়ে অ্যান্টি-সেমিটিজম বেড়ে ওঠে; ইহুদিদের একের পর এক শহর হতে বিতাড়িত করা হয়। ১৪২১ সালে লিনয ও ভিয়েনা হতে, ১৪২৪ সালে (আবার ১৪৫০ সালেও) বাভারিয়া থেকে এবং ১৪৫৪ সালে মোরাভিয়া হতে, ১৪৮৫ সালে পেরুগিয়া, ১৪৮৬ ভিসেনযা, ১৪৮৮ সালে পরমা, ১৪৮৯ সালে লুক্কা ও মিলান এবং ১৪৯৪ সালে তোসকানি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। স্পেন হতে সেফার্দিক ইহুদিদের বিতাড়নের বিষয়টিকে অবশ্য বৃহত্তর ইউরোপিয় প্রবণতার প্রেক্ষিতে দেখতে হবে। অটোমান সাম্রাজ্যে বসবাসকারী স্প্যানিশ ইহুদিরা বেঁচে থাকার জন্যে এক ধরনের অযৌক্তিক অথচ গভীর অপরাধবোধের পাশাপাশি স্থানচ্যুতির বোধে ভুগছিল। এটা সম্ভবত নাৎসি হলোকাস্ট থেকে বেঁচে যাওয়া ইহুদিদের অপরাধ বোধ হতে ভিন্ন কিছু নয়; সুতরাং বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইহুদি যে ষোড়শ শতাব্দীতে সেফার্দিক ইহুদিদের হাতে বিকশিত আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট হচ্ছে সেটা তাৎপর্যপূর্ণ। ইহুদিরা নির্বাসনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে এই আধ্যাত্মিকতার জন্ম দিয়েছিল।

AMARBOI.COM

কাব্বালিজমের এই নতুন ধরণ সম্ভবত অটোমান সাম্রাজ্যের বালকান অঞ্চলে সূচিত হয়েছিল, যেখানে বহু সেফার্দিম বসতি গড়ে তুলেছিল। ১৪৯২ সালের ট্র্যাজিডি যেন পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণীর ইসরায়েলের নিষ্কৃতির জন্যে ব্যাপক আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল। জোসেফ কারো ও সলোমন আলকাবায-এর নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক ইহুদি গ্রিস হতে ইসরায়েলের মাতৃভূমি প্যালেস্তাইনে অভিবাসী হয়। ইহুদি ও তাদের ঈশ্বরের ওপর চাপানো অপমান দূর করতে চেয়েছে তাদের আধ্যাত্মিকতা। তারা তাদের ভাষায় 'ধুলি হতে আবার শেকিনাহর উত্থান চেয়েছে।' কিন্তু রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেনি কিংবা প্রতিশ্রুত ভূমিতে ইহুদিদের ব্যাপক হারে প্রব্যার্তনও আশা করেনি। তারা গালিলির সাফেদে বসতি করে এমন উল্লেখযোগ্য এক অতিন্দ্রীয়বাদী পুনর্জাগরণের সৃষ্টি করে যা তাদের আবাসভূমিহীনতায় এক গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার করেছিল। এতদিন পর্যন্ত কাব্বালাহার আবেদন ছিল কেবল অভিজাত শ্রেণীর কাছে, কিন্তু বিপর্যয়ের পর সারা দুনিয়ার ইহুদিরা আরও অধিকতর অতিন্দ্রীয় আধ্যাত্মিকতার দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। এ সময়

দর্শনের সান্ত্বনাকে যেন ফাঁকা মনে হয়েছে। অ্যারিস্টটলকে মনে হয়েছে বিরস ও তাঁর ঈশ্বরকে দূরবর্তী, অগম্য। প্রকৃতপক্ষেই অনেকেই বিপর্যয়ের জন্যে ফালসাফাহকে দায়ী করে দাবি তোলে যে এর ফলে ইহুদিবাদ দুর্বল হয়ে পড়েছে ও ইসরায়েলের ভিন্ন মর্যাদাবোধ হাল্কা হয়েছে। এর বিশ্বজনীনতা ও জেন্টাইল দর্শনকে স্থান দেওয়ায় বহু ইহুদি ব্যাপ্টিজম গ্রহণ করেছিল। ফালসাফাহ আর কখনও ইহুদিবাদের পরিসীমায় গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা হয়ে উঠতে পারেনি।

মানুষ আরও প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করতে চেয়েছে। সাফেদে এই আকাঙ্ক্ষা প্রায় অদম্য প্রাবল্য অর্জন করেছিল। কাব্বালিস্টরা প্যালেস্তাইনের পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে বিখ্যাত তালামুদিস্টদের কবরে শুয়ে নিজেদের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জীবনের তাদের দর্শন আত্মস্থ করার আকাঙ্ক্ষা করত। ব্যর্থ প্রেমিকের মতো নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে ঈশ্বরের নামে প্রেমের গান গাইত ও প্রিয় সব নামে তাঁকে ডাকত। তারা আবিষ্কার করে যে, মিথলজি ও কাব্বালাহর অনুশীলন তাদের বাধা ভেদ করে এমনভাবে আত্মার বেদনাস্থল ছুঁয়েছে যেটা মেটাফিজিক্স বা তালমুদ পাঠে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু তাদের অবস্থা যেহেতু *দ্য যোহারের* রচয়িতা মোজেস অভ লিওনের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন ছিল, সেজন্য স্প্যানিশ নির্বাসিতদের নিজেদের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সেই দর্শনকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। তারা এমন এক অসাধারণ রকম কল্পনানির্ভর সমাধানে পৌঁছেছিল যা পুরোপুরি উন্মূল অবস্থাকে পরম ঈশ্বরপূর্ণতার সঙ্গে এক করে দিয়েছে। ইহুদিদের নির্বাসন সকল অস্তিত্বের একবারে মূলে চরম স্থানচ্যুতিকে প্রতীকায়িত করে। কেবল গোটা সৃষ্টি জগৎ যে স্থানচ্যুত হয়েছে তাই নয়, স্বয়ং ঈশ্বরও নিজের কাছ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। সাফেদের নতুন কাব্বালাহ রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করে এমন এক গণআন্দোলনের রূপ নেয় যা কেবল সেফার্দিমদেরই অনুপ্রাণিত করেনি বরং ইউরোপের অ্যাশকানিজমের জগতে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল–যারা খৃস্টধর্ম জগতে তাদের কোনও স্থায়ী শহর না থাকার ব্যাপারটি আবিষ্কার করেছিল। এই অসাধারণ সাফল্য দেখায় যে, অচেনা ও বহিরাগতের চোখে বিসদৃশ সাফেদের মিথের ইহুদিদের অবস্থা তুলে ধরার ক্ষমতা ছিল। এটা ছিল সর্বজনগ্রাহ্য শেষ ইহুদি আন্দোলন যা বিশ্বের ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনায় গভীর পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। কাব্বালাহর বিশেষ অনুশীলন কেবল একজন অভিজাত শিক্ষাব্রতীর জন্যে ছিল–কিন্তু এর ধারণা ও ঈশ্বর সংক্রান্ত এর মতবাদ–ইহুদিদের ধর্মানুরাগের ক্ষেত্রে প্রমিত মানে পরিণত হয়েছিল।

ঈশ্বর সংক্রান্ত এই নতুন দর্শনের প্রতি সুবিচার করার জন্যে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এইসব মিথকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার কথা

AMARBOI.COM

বোঝানো হয়নি। সাফেদ কাব্বালিস্টরা তাদের ব্যবহৃত ইমেজারিগুলো অত্যন্ত বেপরোয়া হওয়ার বেলায় সজাগ ছিল, তাই এগুলোর সঙ্গে সবসময় 'যেমন বলা হয়' বা 'যে কেউ ভাবতে পারে' ধরনের অভিব্যক্তি জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে যেকোনও ধরনের আলোচনাই সমস্যাপূর্ণ, বিশ্ব সৃষ্টির বাইবেলিয় মতবাদও কম নয়। কাব্বালিস্টরাও ঠিক ফায়সালুফদের মতোই এক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। উভয় দলই উৎসারণের প্লেটোনিক উপমা বেছে নিয়েছিল যেখানে মনে করা হয় যে, বিশ্বজগৎ চিরন্তনভাবে ঈশ্বরের নিকট হতে প্রবাহিত হচ্ছে। পয়গম্বরগণ ঈশ্বরের পবিত্রতা ও বিশ্বজগৎ হতে তাঁর বিচ্ছিন্নতার ওপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু *দ্য যোহার* মত প্রকাশ করেছে যে, ঈশ্বরের *সেফিরদের* জগৎ সমগ্র সত্তা দিয়ে সংগঠিত। তিনি সর্বেসর্বা হলে বিশ্বজগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হবেন কী করে? সাফেদের মোজেস বেন জেকব কর্দাভেরো (১৫২২-১৫৭০) এই বৈপরীত্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে এর সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর ধর্মতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর এন সফ আর অগম্য গডহেড নন, বরং জগতের চিন্তা: আদর্শ প্লেটোনিক অবস্থানে তিনি সকল সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে একীভূত; কিন্তু মর্ত্যের ত্রুটিপূর্ণ আকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন: 'যতক্ষণ অস্তিত্বমান সবকিছুই তাঁর অস্তিত্বের মাঝে ততক্ষণ [ঈশ্বর] সকল অস্তিত্বকে আবৃত করেন,' ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, 'তাঁর *সেফিরদে* তাঁর সত্তা উপস্থিত আছেন; তিনি স্বয়ং সবকিছু এবং তাঁর বাইরে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।'[৫] ইবন আল-আরাবী ও মোল্লা সদরার মোনিজমের খুব কাছাকাছি ছিলেন তিনি।

কিন্তু সাফেদ কাব্বালিজমের নায়ক ও সন্ন্যাসী ইসাক লুরিয়া (১৫৩৪-১৫৭২) ঐশী দুর্জ্ঞেয়তা ও সর্বব্যাপীতার বৈপরীত্বকে আরও পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ঈশ্বর সম্পর্কিত সৃষ্ট মতবাদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর। অধিকাংশ ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদী তাদের ঐশী অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নীরবতা পালন করেছে। এটা এই ধরনের আধ্যাত্মিকতার অন্যতম স্ববিরোধিতা যে অতিন্দ্রীয়বাদীরা তাদের অভিজ্ঞতা অনির্বচনীয় বলে কিন্তু তারপরেও সব লিপিবদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে। কাব্বালিস্টরা অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন ছিল। লুরিয়া ছিলেন প্রথম যাদ্দাকিম বা পবিত্র পুরুষ যিনি ব্যক্তিগত ক্যারিশমার বদৌলতে অনুসারীদের দলে টানতে পেরেছিলেন। লেখক ছিলেন না তিনি; তাঁর কাব্বালিস্ট পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে তাঁর অনুসারী হাঈম বাইতাল (১৫৪২-১৬২০) লিখিত কথোপকথন যা তাঁর নিবন্ধ *এরয্ হাইম* (দ্য ট্রি অভ লাইফ) এবং যোজেফ ইবন তাবূল-এর পাণ্ডুলিপি, যা ১৯২১ সালের আগে প্রকাশিত হয়নি।

একেশ্বরবাদীদের শত শত বছর ধরে তাড়া করে আসা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন লুরিয়া: একজন পূর্ণাঙ্গ এবং অসীম ঈশ্বর কীভাবে অশুভে পরিপূর্ণ

AMARBOI.COM

অপূর্ণাঙ্গ বিশ্ব সৃষ্টি করলেন? অশুভ এসেছে কোত্থেকে? *সেফিরদের* উৎসারণের *পূর্ববর্তী* ঘটনার মাঝে জবাব খুঁজে পেয়েছেন লুরিয়া, যখন এন সফ মহান অন্তর্মুখীনতায় নিজের দিকে মনোযোগি হয়েছিলেন। বিশ্বজগতের জন্যে স্থান তৈরি করতে, শিক্ষা দিয়েছেন লুরিয়া, এন সফ, বলা হয়, নিজের মাঝে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেন। এই 'সংকোচন' বা 'প্রত্যাহারে'র (*ত্‌সিম্‌ত্‌সুম*) প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর এমন একটা স্থান সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে তিনি অনুপস্থিত, একটি শূন্যস্থান, যা তিনি আত্মপ্রকাশ ও সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পূর্ণ করতে থাকেন। শূন্য হতে সৃষ্টির মতবাদ ব্যাখ্যার এক দুঃসাহসী প্রয়াস ছিল এটা। এন সফের সর্বপ্রথম কাজ ছিল আপন একটা অংশ হতে স্ব-আরোপিত নির্বাসন; তিনি, যেমন বলা হয়েছে, আপন সত্তায় আরও গভীরভাবে অবতরণ করে নিজের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন। এই ধারণাটি ক্রিশ্চানদের ট্রিনিটি মতবাদে কল্পনা করা আদিম *কেনোসিসের* চেয়ে ভিন্ন নয়, যেখানে ঈশ্বর নিজেকে আপন পুত্রের মাঝে শূন্য করে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর কাব্বালিস্টদের বেলায় প্রাথমিকভাবে *ত্‌সিম্‌ত্‌সুম* নির্বাসনের প্রতীক ছিল, যা সকল সৃষ্ট অস্তিত্বের মূলে নিহিত এবং স্বয়ং এন সফ যার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

ঈশ্বরের প্রত্যাহারের ফলে সৃষ্ট 'শূন্য' স্থানটিকে বৃত্ত হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে, যার চারদিকে রয়েছেন এন সফ। এটা জেনেসিসে বর্ণিত আকার বিহীন আবর্জনা তহু উ-বহু। *ত্‌সিম্‌ত্‌সুম*-এর সঙ্কোচনের আগে ঈশ্বরের বিভিন্ন 'শক্তির' সবগুলো (পরে যা *সেফিরদে* পরিণত হবে) সামঞ্জস্যতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। একটি অপরটি হতে আলাদা ছিল না। বিশেষ করে ঈশ্বরের *হেসেদ* (করুণা) ও *দিন* (কঠোর বিচার) নিখুঁত সামঞ্জস্যতার সঙ্গে ঈশ্বরের মাঝে অস্তিত্বমান ছিল। কিন্তু *ত্‌সিম্‌ত্‌সুম* প্রক্রিয়া চলার সময় এস সফ তাঁর অন্যান্য গুণাবলী হতে *দিন*কে বিচ্ছিন্ন করে ছেড়ে আসা শূন্য স্থানে ঠেলে দেন। এভাবে *ত্‌সিম্‌সুম* কেবল আত্ম-শূন্যকারী প্রেমের ভঙ্গিমা নয়, বরং একে ঐশী পরিশুদ্ধতা হিসাবে দেখা যেতে পারে: ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ বা বিচার *(দ্য যোহার* যাকে অশুভের মূল হিসাবে দেখেছে) আপন অন্তস্থঃ সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। সুতরাং তাঁর আদি কাজটি ছিল নিজের প্রতি দেখানো রূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা। *হেসেদ* ও ঈশ্বরের অন্যান্য গুণাবলী হতে *দিন* বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এটা বিধ্বংসী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু এন সফ শূন্য স্থানটুকু পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করেননি। ঐশী আলোর একটা 'ক্ষীণ রেখা' এই বৃত্তকে ছেদ করে এমন একটা আকার গ্রহণ করেছিল যাকে *দ্য যোহার* আদম কাদমোন বা আদিম পুরুষ আখ্যায়িত করেছে।

এরপর সূচিত হয়েছে *সেফিরদের* উৎসারণ, যদিও তা *দ্য যোহারে* যেভাবে ঘটার কথা বলা হয়েছে সেভাবে ঘটেনি। লুরিয়া শিক্ষা দিয়েছেন যে,

*সেফিরদ* গঠিত হয়েছিল আদম কাদমোনে: সর্বোচ্চ তিনটি *সেফিরদ–কেদার* (মুকুট), *হোখমাহ* (প্রজ্ঞা) ও *বিনাহ* (বুদ্ধিমত্তা)–যথাক্রমে তাঁর 'নাক,' 'কান' এবং 'মুখ' হতে বিকিরিত হয়েছে। কিন্তু এরপর ঘটে এক বিপর্যয়, লুরিয়া যাকে বলেছেন 'পাত্রের ভাঙন' (*শেভিরাদ হা কেলিম*)। *সেফিরদ*সমূহকে আলাদা আবরণ বা 'পাত্রে' রাখার প্রয়োজন ছিল, এগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে আবার যাতে আগের ঐক্যে ফিরে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্যে। এইসব 'পাত্র' বা 'পাইপ' অবশ্যই ধাতব ছিল না, বরং এক ধরনের গাঢ় বা পুরু আলো যা *সেফিরদ*-এর খাঁটি আলোর 'আবরণ' (*কেলিপত*) হিসাবে কাজ করত। সর্বোচ্চ তিনটি *সেফিরদ* আদম কাদমোন হতে ঝিকরিত হওয়ার সময় সেগুলোর পাত্র ঠিকই কাজ করেছিল; কিন্তু পরবর্তী ছয়টি *সেফিরদ* তাঁর 'চোখ' থেকে বের হওয়ার সময় সেগুলোর 'পাত্র'গুলো ঐশী আলো ধরে রাখার মতো যথেষ্ট মজবুত ছিল না বলে দুমড়ে মুঁচড়ে যায়। পরিণামে আলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এর কিছু অংশ ঊর্দ্ধারোহণ করে গডহেডে ফিরে যায়, কিন্তু কিছু ঐশী বা স্বর্গীয় 'স্ফুলিঙ্গ' ফাঁকা আবর্জনায় পতিত হয়ে বিশৃঙ্খলায় আটকা পড়ে। এরপর আর কোনও কিছুই যথাস্থানে থাকেনি। বিপর্যয়ের ফলে এমনকি সর্বোচ্চ তিনটি *সেফিরদ*ও নিম্ন পর্যায়ের বলয়ে পতিত হয়েছিল। আদি সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়েছিল এবং স্বর্গীয় 'স্ফুলিঙ্গ'গুলো গডহেডের কাছ থেকে নির্বাসনে আকারবিহীন *তহু উ-বহুর* আবর্জনায় হারিয়ে গেছে।

এই অদ্ভুত মিথ এক আদিম স্থানচ্যুতির নসটিক মিথেরই স্মৃতিবাহী। এখানে গোটা সৃজনশীল প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট টানাপোড়েন বা টেনশন প্রকাশ পেয়েছে, যা জেনেসিসে বর্ণিত শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল ঘটনার চেয়ে আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের অনুমিত বিগ ব্যাং তত্ত্বের অনেক কাছাকাছি। গুপ্তস্থান হতে বেরিয়ে আসা এন সফের জন্যে সহজ ছিল না: তিনি কেবল–যেমন বলা হয়–অনেকটা 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরার' প্রক্রিয়ায়ই এটা করতে পারতেন। তালমুদে র‍্যাবাইরা একই ধরনের ধারণা পোষণ করেন। তারা বলেছিলেন, ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করার আগে অন্যান্য বিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংস করেছেন। কিন্তু সব আশা তিরোহিত হয়ে যায়নি। কোনও কোনও কাব্বালিস্ট এই 'ভাঙন' (*শেভিরাদ*)কে জন্ম লাভ বা বীজের অঙ্কুরোদগমের সঙ্গে তুলনা করেছে। ধ্বংস ছিল নতুন সৃষ্টির পূর্বাভাস মাত্র। যদিও সমস্ত কিছু বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, এন এফ *তিক্কুন* বা পুর্নগঠনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই আপাত বিশৃঙ্খলা হতে নতুন জীবন বের করে আনবেন।

বিপর্যয়ের পর এন সফ হতে আলোর এক নতুন ধারা বিচ্ছুরিত হয়ে আদম কাদমোনের 'কপাল' ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। এই সময় *সেফিরদ*গুলো

AMARBOI.COM

নতুন বিন্যাসে পুনর্গঠিত হয়: এগুলো আর ঈশ্বরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকেনি। প্রত্যেকটা আলাদা 'অবয়ব'-এ পরিণত হয় যেখানে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়–যেমন বলা হয়–স্পষ্ট বৈশিষ্টসহ, অনেকটা ট্রিনিটির তিনটি *পারসোনার* মতোই। লুরিয়া দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে জন্ম দেওয়ার প্রাচীন কাব্বালিস্ট ধারণাকে ব্যাখ্যা করার নতুন উপায় বের করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। *তিক্কুন* প্রক্রিয়ায় লুরিয়া মানুষের জন্ম ও বেড়ে ওঠাকে ঈশ্বরের একই রকম বিবর্তন বোঝাতে ধারণার প্রতীকী রূপ ব্যবহার করেছেন। ব্যাপারটা জটিল–চিত্রের মাধ্যমেই সম্ভবত সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। *তিক্কুনের* পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর দশটি *সেফিরদের* নিচে বর্ণিত পর্যায়ক্রমে পাঁচটি 'অবয়ব'-এ (*পারযুফিম*) পুনর্বিন্যাস করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন:

১. কেদার (মুকুট), সর্বোচ্চ *সেফিরাহ, দ্য যোহার* যাকে 'কিছু না' বলেছে প্রথম *Purzuf*--এ পরিণত হয়, নাম হয় 'আরিক' আনপিন: পূর্বপুরুষ।
২. হোখমাহ (প্রজ্ঞা) পরিণত হয় দ্বিতীয় *পারযুফ-এ*, নাম আব্বা: পিতা।
৩. বিনাহ (বুদ্ধিমত্তা) পরিণত হয় তৃতীয় *পারযুফ*-এ, নাম হয় ইমা: মা।
৪. দিন (বিচার); হেসেদ (করুণা); রাখামিম (সহানুভূতি); নেতসাখ (ধৈর্য); হোদ (আভিজাত্য); ইয়েসদ (ভিত্তি) সবগুলো পরিণত হয় চতুর্থ পারযুফ-এ; নাম হয় যায়ের আনপিন: অধৈর্য। তাঁর সঙ্গী হচ্ছে :
৫. শেষ *সেফিরাহ* যার নাম মালখুদ: রাজ্য কিংবা শেকিনাহ; এটা পরিণত হয় পঞ্চম *পারযুফ*-এ, নাম হয় নুকরাহ দে যায়ের: যায়েরের রমনী।

AMARBOI.COM

যৌন প্রতীকের ব্যবহার *সেফিরদের* পুনঃএকত্রীকরণ তুলে ধরার এক দুঃসাহসী প্রয়াস, যা পাত্রসমূহ ভেঙে পড়ার সময়ের বেদনা উপশম করে আদি ছন্দ ফিরিয়ে আনবে। দুটি 'দম্পতি' আব্বা ও ইমা, যায়ের ও নুকরাহ *যিউওয়াগে* বা সঙ্গমে লিপ্ত। নারী ও পুরুষের এই মিলন ঈশ্বরের মাঝেই পুনঃস্থাপিত শৃঙ্খলার প্রতীক বহন করে। কাব্বালিস্টরা বারবার একে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করার জন্যে পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছে। স্পষ্ট যৌক্তিক ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না এমন একটি একীভূত করার প্রক্রিয়ার আভাস দান ও ঈশ্বরের প্রবল পৌরুষ রূপকে নিরপেক্ষ করতে এই কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। অতিন্দ্রীয়বাদীরা মুক্তিকে যেভাবে দেখেছে সেখানে মেসায়াহর আগমনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর নির্ভরশীলতার কোনও ব্যাপার নেই, বরং ঈশ্বরকেই একটা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। পাত্রসমূহের ভাঙনের ফলে যেসব স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে বিশৃঙ্খলায় আটকা পড়ে গিয়েছিল সেগুলোর উদ্ধার

প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী হিসাবে পাবার জন্যে মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন ঈশ্বর। কিন্তু স্বর্গোদ্যানে পাপ করছিলেন আদম। তা যদি তিনি না করতেন, আদি শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হতো এবং প্রথম সাব্বাথে স্বর্গীয় নির্বাসন শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আদমের পতন পাত্রসমূহের ভাঙনে আদিম বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সৃষ্ট শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং তাঁর আত্মার স্বর্গীয় আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা বস্তুসমূহে আটকা পড়ে। পরিণামে, আরেকটা পরিকল্পনা সৃষ্টি করেন ঈশ্বর। সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষার সংগ্রামে সাহায্য করার জন্যে ইসরায়েলকে বেছে নিয়েছেন তিনি। যদিও ইসরায়েল সেই স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গসমূহের মতো ডায়াসপোরার নিষ্ঠুর ও ঈশ্বরবিহীন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে, কিন্তু ইহুদিদের এক বিশেষ মিশন রয়েছে। ঐশী স্ফূলিঙ্গ যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বস্তুতে মিশে থাকবে ততক্ষণ ঈশ্বর অসম্পূর্ণ রয়ে যাবেন। তোরাহ্র সযত্ন অনুসরণ ও প্রার্থনার অনুশীলনের ভেতর দিয়ে প্রত্যেক ইহুদি স্বর্গীয় স্ফূলিঙ্গকে ঐশী উৎসে পুনঃস্থাপনে সাহায্য করে জগতকে উদ্ধার করতে পারে। মুক্তির এই দর্শনে ঈশ্বর মানুষের দিকে তাকিয়ে নেই, বরং ইহুদিরা সবসময় যেটা বলে এসেছে, তিনি বরং মানবজাতির ওপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরকে পুনঃআকৃতি দান ও তাঁকে নতুন করে সৃষ্টির অনন্য সুযোগ রয়েছে ইহুদিদের।

লুরিয়া শেকিনাহ্র নির্বাসনের আদি ইমেজের নতুন অর্থ দিয়েছেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, র‍্যাবাইগণ তালমুদে মন্দির ধ্বংসের পর শেকিনাহর স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাবার কথা বলেছেন। *দ্য যোহার* শেকিনাহ্কে সর্বশেষ *সেফিরাহ* আখ্যায়িত করে একে ঐশী সত্তার নারী রূপ হিসাবে দেখেছে। লুরিয়ার মিথে পাত্র ধ্বংস হওয়ার পর অন্যান্য *সেফিরাহ্র* সঙ্গে শেকিনাহ্রও পতন ঘটেছে। *তিক্কুনের* প্রথম পর্যায়ে সে *নুকরাহ্য়* পরিণত হয় এবং যায়েরের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে (ষষ্ঠ 'মধ্য' *সেফিরদ*) স্বর্গীয় জগতের সঙ্গে প্রায় পুনঃর্মিলিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আদম যখন পাপ করলেন, আবার পতন ঘটল শেকিনাহর এবং গডহেডের বাকি অংশ হতে নির্বাসিত হলো। প্রায় অনুরূপ এক ক্রিশ্চান মিথলজির জন্ম দেওয়া নসটিক রচনাবলী লুরিয়া পড়েছেন, এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নির্বাসন ও পতনের মিথ পুনকথন করেছেন তিনি, ষোড়শ শতাব্দীর করুণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। বাইবেলিয় সময়কালে ইহুদিরা একক ঈশ্বরের মতবাদের বিকাশ ঘটানোর সময় স্বর্গীয় মিলন ও নির্বাসিত দেবীদের কাহিনী প্রত্যাখ্যান করেছিল। পৌত্তলিকতা ও বহুঈশ্বরবাদীতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ যুক্তিসঙ্গতভাবেই সেফার্দিমদের বিক্ষুব্ধ করে তোলার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে লুরিয়ার মিথ পারসিয়া থেকে ইংল্যান্ড, জার্মানি থেকে পোল্যান্ড, ইতালি

AMARBOI.COM

থেকে উত্তর আফ্রিকা, হল্যান্ড থেকে ইয়েমেনের ইহুদিরা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। ইহুদি পরিভাষায় বর্ণিত হওয়ায় এটা একটা সুপ্ত তারে টোকা দিতে সক্ষম হয়, প্রবল হতাশার মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করে। এটা ইহুদিদের মাঝে এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে, তাদের অনেকেই ভীতিকর অবস্থায় বাস করা সত্ত্বেও এর একটা পরম অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে।

ইহুদিরা শেকিনাহ্‌র নির্বাসনের অবসান ঘটাতে পারে। *মিত্‌যভোতের* অনুসরণের মাধ্যমে আবার তারা তাদের ঈশ্বরকে গড়ে তুলতে পারবে। প্রায় একই সময়ে ইউরোপে লুথার ও কালভিনের গড়ে তোলা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে এই মিথের মিল লক্ষণীয়। উভয় প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকই ঈশ্বরের পরম সার্বভৌমত্বের প্রচার করেছেন: তাঁদের ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী নিজেদের মুক্তির ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষের কিছুই করার নেই। অবশ্য লুরিয়া কর্মের এক মতবাদ প্রচার করেছেন: ঈশ্বরের মানবজাতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এবং তাদের প্রার্থনা ও সৎকর্ম ছাড়া তিনি এক অর্থে অসম্পূর্ণ রয়ে যাবেন। ইউরোপে ইহুদি জাতির ওপর নেমে আসা ট্র্যাজিডি সত্ত্বেও প্রটেস্ট্যান্টদের তুলনায় মানুষ সম্পর্কে অনেক বেশি আশাবাদী হতে পেরেছিল তারা। লুরিয়া *তিক্কুনের* মিশনকে ধ্যানের বিষয় হিসাবে দেখেছেন। ইউরোপের খ্রিস্টানরা যেখানে–ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয়ই–আরও বেশি মাত্রায় ডগমা প্রণয়ন করছিল, লুরিয়া সেখানে ইহুদিদের এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের উর্ধ্বে ওঠা ও অধিকতর মনোগত সচেতনতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। আব্রাহাম আবুলাফিয়ার অতিন্দ্রীয়বাদী কৌশল পুনরুজ্জীবিত করেন। আবুলাফিয়ার আধ্যাত্মিকতা স্বর্গীয় নাম পুনর্বিন্যাস করে কাব্বালিস্টদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, 'ঈশ্বরে'র অর্থ মানবীয় ভাষায় যথাযথভাবে তুলে ধরা যাবে না। লুরিয়ার মিথলজিতে ঐশী সত্তর পুনর্গঠন ও পুনঃআকৃতিধারণকেও প্রতীকায়িত করা হয়েছে। হাঈম বাইতাল লুরিয়ার অনুশীলনের প্রগাঢ় আবেগজাত প্রভাব বর্ণনা করেছেন, নিজেকে দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনাচার হতে বিচ্ছিন্ন করে—অন্যরা যখন ঘুমে মগ্ন–তখন সজাগ থেকে, অন্যদের খাবার সময় উপাস থেকে, কিছু সময়ের জন্যে নিজেকে আলাদা করে–কাব্বালিস্ট স্বাভাবিক ভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিচিত্র বা অদ্ভূত 'শব্দসমূহে'র প্রতি মনোনিবেশ করতে পারত। নিজেকে অন্য জগতে আছে বলে মনে হয় তার, এমনভাবে সে কাঁপতে থাকে যেন বাইরের কোনও শক্তি তার ওপর ভর করেছে।

কিন্তু এখানে উদ্বেগের কোনও ব্যাপার ছিল না। লুরিয়া জোর দিয়ে বলেছেন, আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করার আগে কাব্বালিস্টকে অবশ্যই চিত্তের স্থিরতা অর্জন করতে হবে। সুখানুভূতি ও আনন্দ জরুরি; বুক চাপড়ানো বা বিষাদের কোনও ব্যাপার থাকতে পারবে না; কাজের ব্যাপারে কেউ উৎকণ্ঠা

AMARBOI.COM

বা অনুতাপ বোধ করতে পারত না। বাইতাল জোর দিয়ে বলেছেন যে দুঃখ ও বেদনায় শেকিনাহ থাকতে পারে না–আমরা দেখেছি, এই ধারণা তালমুদে গভীরভাবে প্রোথিত। দুঃখবোধ আসে জগতের অশুভ শক্তি থেকে, অন্যদিকে সুখ কাব্বালিস্টকে ঈশ্বরকে ভালোবাসায় সক্ষম করে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। কারও প্রতি–এমনকি গোয়িমদের প্রতিও না–কাব্বালিস্টের মনে কোনও রকম ক্রোধ বা আক্রমণাত্মক অনুভূতি থাকতে পারবে না। লুরিয়া ক্রোধ বা রাগকে বহুঈশ্বরবাদীতা হিসাবে দেখেছেন, কেননা ক্রুদ্ধ মানুষ 'অদ্ভুত দেবতা'য় আচ্ছন্ন থাকে। লুরিয়ার অতিন্দ্রীয়বাদের সমালোচনা করা সহজ। গারশ শোলেম যেমন যুক্তি দেখিয়েছেন, ঈশ্বর এন সফের রহস্য *দ্য যোহারে* খুব জোরাল হলেও *ত্সিমত্সুম*, পাত্রের ভাঙন ও *তিক্কুন* এর নাটকীয়তায় যেন শিথিল হয়ে আসে।[৬] পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব, এটা ইহুদিদের ইতিহাসে এক ধংসাত্মক ও বিব্রতকর পর্বের সূচনা করেছিল। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর সম্পর্কে লুরিয়ার ধারণা এমন একটা সময়ে ইহুদিদের মাঝে আনন্দ ও দয়ার চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল ও সেইসাথে মানুষ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে উৎসাহ জুগিয়েছে যখন অপরাধবোধ ও ক্রোধের ফলে বহু ইহুদি হতাশায় ডুবে জীবনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় ছিল।

ইউরোপের ক্রিশ্চানরা এ রকম ইতিবাচক আধ্যাত্মিকতার জন্ম দিতে পারেনি। তারাও ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল যা স্কলাস্টিকদের দার্শনিক ধর্মে প্রশমিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৩৪৮ সালের ব্ল্যাক ডেথ, ১৪৫৩ সালে কন্সতান্তিনোপলের পতন, আভিগনন ক্যাপটিভিটির গির্জা সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি (১৩৩৪-৪২) ও চরম বিবাদ (১৩৭৮-১৪১৭) মানবীয় অবস্থার অক্ষমতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল, বদনাম বয়ে এনেছিল চার্চের। ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে যেন তখন ভীতিকর বিপদ হতে নিস্তার লাভ অসম্ভব ঠেকেছে। তো, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ডের দানস স্কটাস (১২৬৫-১৩০৮)–দানস স্কটাস এরিজেনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না–ও ফরাসি ধর্মাতাত্ত্বিক জা দে গরসন (১৩৬৩-১৪২৯)-এর মতো ধর্মতাত্ত্বিকদের উভয়ই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের ওপর জোর দিয়েছেন, যিনি চরম শাসকের মতোই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। নারী ও পুরুষের পক্ষে মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে কিছুই করণীয় নেই; ভালো কাজের নিজস্ব কোনও মূল্য নেই, ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে এগুলোকে ভালো বলেছেন বলেই ভালো। তবে এই দুই শতকে গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটেছিল। গারসন স্বয়ং অতিন্দ্রীয়বাদী ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'ঈশ্বরের প্রকৃতি বোঝার জন্যে সত্য ধর্মের ওপর ভিত্তি করে যুক্তি দিয়ে খোঁজার চেয়ে উচ্চাভিলাষী অনুসন্ধান ছাড়াই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বজায় রাখাই শ্রেয়তর।'[৭] আমরা যেমন দেখেছি, চতুর্দশ শতাব্দীতে

AMARBOI.COM

ইউরোপে অতিন্দ্রীয়বাদের একটা জোয়ার দেখা দিয়েছিল, মানুষও বুঝতে শুরু করেছিল যে, যে রহস্যকে তারা 'ঈশ্বর' ডাকে তাঁকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যুক্তি যথেষ্ট নয়। টমাস আ কেম্পিস তাঁর *দ্য ইমিটেশন অভ ক্রাইস্ট* -এ যেমন বলেছেন:

> যদি তোমার মাঝে বিনয় না থাকে, সে কারণে ট্রিনিটিকে রুষ্ট কর, তাহলে ট্রিনিটি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মূল্য কী...একে সংজ্ঞায়িত করতে পারার চেয়ে বরং অনেক বেশি মর্মপীড়া রোধ করব আমি। গোটা বাইবেল যদি তোমার মুখস্থ থাকে, সমস্ত দার্শনিকের সকল শিক্ষা জানা যাকে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ভালোবাসা ছাড়া এসব তোমার কী কাজে আসবে?[৮]

*দ্য ইমিটেশন অভ ক্রাইস্ট* রুক্ষ অস্পষ্ট ধার্মিকতা নিয়েই পাশ্চাত্যে সকল আধ্যাত্মিক ক্লাসিকের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই শতাব্দীগুলোয় ধার্মিকতা বর্ধিত হারে মানুষ জেসাসের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ক্রসের অবস্থান তৈরি জেসাসের শারীরিক কষ্ট ও বেদনার বিস্তারিত প্রকাশ নিয়ে কাজ করেছে। চতুর্দশ শতাব্দীর এক অজ্ঞাতনামা লেখকের *মেডিটেশন* আমাদের বলছে, লাস্ট সাপার ও অ্যাগনি ইন গার্ডেনের ওপর রাতের বেশির ভাগ সময় ধ্যান করে সকালে জেগে উঠেও তার চোখজোড়া কান্নার কারণে তখনও লাল হয়ে থাকা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধ্যানের মধ্য দিয়ে ক্যালভেরির দিকে জেসাসের এগিয়ে যাওয়া অনুসরণ করতে হবে ঘন্টায় ঘন্টায়। কর্তৃপক্ষের কাছে জেসাসের প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার কথা কল্পনা করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে পাঠককে, কারাগারে তাঁর পাশে বসে তাঁর হাতকড়া ও শিকলে বাঁধা পায়ে চুমু খেতে বলা হয়েছে।[৯] আনন্দ বর্জিত এই অনুশীলনে পুনরুত্থানের ওপর সামান্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; বরং তার বদলে জেসাসের মানবরূপের অসহায়ত্বের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। প্রবল আবেগ ও আধুনিক পাঠকের কাছে বিকৃত কৌতূহল বলে মনে হওয়া একটা ব্যাপার অধিকাংশ রচনার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি বিখ্যাত অতিন্দ্রীয়বাদী সুইডেনের ব্রিজিত কিংবা নরউইচের জুলিয়ানও জেসাসের শারীরিক অবস্থার ভয়ঙ্কর বিবরণ দিয়েছেন:

> তাঁর প্রিয় মুখ আমি দেখেছি, শুষ্ক, রক্তশূন্য, মড়ার মতো ফ্যাকাশে। আরও মলিন, মৃতবৎ, প্রাণহীন হয়ে উঠল। তারপর মৃত, নীল বর্ণ ধারণ করল, আস্তে আস্তে বাদামী নীল হয়ে এল, ক্রমশ নীল হয়ে আসছিল

AMARBOI.COM

মাংস। আমার জন্যে তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট চেহারার মাঝে আবেগের ছাপ দেখা যাচ্ছিল, বিশেষ করে তাঁর ঠোঁটে। সেখানেও সেই চার রঙ দেখেছি আমি, যদিও আগে যখন দেখেছিলাম তখন তরতাজা, লাল ও চমৎকার ছিল। মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করাটা ছিল খুবই দুঃখজনক। আমার চোখের সামনেই তাঁর নাক কাঁপতে কাঁপতে শুকিয়ে গেল আর মৃত্যুর ছোঁয়ায় শুকিয়ে তাঁর প্রিয় দেহ হয়ে গেল কালো ও বাদামী।[১০]

এই বিবরণ আমাদের জার্মান ক্রুসিফিক্সের কথা মনে করিয়ে দেয়। চতুর্দশ শতাব্দীর সেই ভীতিকর পাঁকানো রক্তাক্ত দেহ ভেসে ওঠে চোখের সামনে, যা অবশ্যই ম্যাথিয়াস গ্রুনওয়াল্ডের (১৪৮০-১৫২৮) রচনায় ক্লাইমেক্সে পৌঁছেছিল। ঈশ্বরের রূপ সম্পর্কে জুলিয়ান অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন: প্রকৃত অতিন্দ্রীয়বাদীর মতো ট্রিনিটিকে বরং আত্মার মাঝে জীবন্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মানুষ ক্রাইস্টের প্রতি পশ্চিমের মনোযোগ এত জোরাল ছিল যে তা ঠেকানো যায়নি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নারী-পুরুষ ক্রমবর্ধমান হারে ঈশ্বরের তুলনায় অন্যান্য মানুষকে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছিল। মানুষ জেসাসের পাশাপাশি মেরি ও সাধুদের মধ্যযুগীয় কাল্ট মতবাদের প্রসার ঘটেছিল। প্রাচীন বস্ত্র ও পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি প্রবল আগ্রহ পশ্চিমা ক্রিশ্চনদের একটা প্রয়োজনীয় জিনিস হতে দূরে ঠেলে দিচ্ছিল: মানুষ যেন ঈশ্বর *ছাড়া* আর সবকিছুর দিকেই মনোনিবেশ করছিল।

AMARBOI.COM

এমনকি রেনেসাঁর সময়ও পাশ্চাত্য চেতনার অন্ধকার দিক প্রকাশ পেয়েছে। রেনেসাঁ যুগের দার্শনিক ও মানবতাবাদীরা মধ্যযুগীয় অধিকাংশ ধর্মানুরাগের ব্যাপারে তীব্র সমালোচনামুখর ছিল। স্কলাস্টিকদের গভীরভাবে অপছন্দ করত তারা, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁদের অনুমান বা ভাবনা ঈশ্বরকে অচেনা ও একঘেয়ে করে তুলেছে বলে মনে হয়েছে তাদের। এর বদলে ধর্ম বিশ্বাসের উৎস, বিশেষ করে সেইন্ট অগাস্তিনের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। মধ্যযুগীয়রা অগাস্তিনকে ধর্মতাত্ত্বিক হিসাবে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু মানবতাবাদীরা *কনফেশন* পুনরাবিষ্কার করে এবং তাঁকে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে রত একজন সতীর্থ মনে করেছে। খৃস্ট ধর্মমত, যুক্তি দেখিয়েছে তারা, একগুচ্ছ মতবাদ নয়, বরং একটা অনুভূতি। লরেনযো ফাল্লা (১৪০৭-৫৭) 'যুক্তির কৌশল' ও 'মেটাফিজিক্সের দ্ব্যার্থবোধক কথাবার্তা'[১১] পবিত্র ডগমার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার অসারতার ওপর জোর দিয়েছেন। সেইন্ট পলও এইসব 'অসারতার' নিন্দা জানিয়েছিলেন। ফ্রান্সেসকো পেত্রাচ (১৩০৪-৭৪) মত প্রকাশ করেছিলেন যে,

'ধর্মতত্ত্ব আসলে কাব্য, ঈশ্বর সংক্রান্ত কাব্য,' এটা কোনও কিছু প্রমাণ করে বলে নয় বরং তা হৃদয়কে ভেদ করে বলে কার্যকর।[১২] মানবতাবাদীরা মানুষের মর্যাদা পুনরাবিষ্কার করেছে, কিন্তু সেটা ঈশ্বরকে ত্যাগ করার কারণ হয়নি। তার বদলে, সে যুগের প্রকৃত মানুষের মতো তারা মানুষে রূপান্তরিত ঈশ্বরের মানবতার ওপর জোর দিয়েছে, কিন্তু পুরোনো নিরাপত্তাহীনতা রয়ে গিয়েছে, রেনেসাঁ ব্যক্তিত্বগণ মানুষের জ্ঞানের নাজুকতার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, আবার অগাস্তিনের প্রকট পাপবোধের সঙ্গেও সমব্যাথী ছিলেন তাঁরা। পেত্রাচ যেমন বলেছেন:

> কতবার নিজের দুঃখ দুর্দশা আর মরণ নিয়ে ভেবেছি আমি; অশ্রুর বানে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছি আমার সকল দাগ যাতে না কেঁদে এনিয়ে কথা বলতে পারি, কিন্তু তারপরেও এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছি। ঈশ্বর প্রকৃতই মহানঃ আর আমি নগণ্য।[১৩]

সুতরাং মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে বিরাট দুরত্ব রয়ে গিয়েছিলঃ কলোচ্চিয়ো স্যালুতাতি (১৩৩১-১৪০৬) এবং লেনার্দো ব্রুনি (১৩৬৯-১৪৪৪) দুজনই পুরোপুরি মানব মনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য হিসাবে দেখেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মান দার্শনিক ও চার্চম্যান নিকোলাস অভ কুসা (১৪০১-৬৪) ঈশ্বরকে বোঝার ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। নতুন বিজ্ঞান সম্পর্কে দারুণ রকম আগ্রহী ছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন এর ফলে ট্রিনিটি রহস্য অনুধাবন সহজ হয়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ, গণিত একেবারেই বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, সুতরাং অন্যান্য বিদ্যায় যেটা অসম্ভব তেমন বিষয়ে এর পক্ষে একটা নিশ্চয়তা দান করা সম্ভব। এভাবে গণিতের 'সর্বোচ্চ' এবং 'সর্বনিম্ন' ধারণা দুটি আপাত বিপরীতমুখী মনে হলেও আসলে এগুলোকে যৌক্তিকতার প্রেক্ষিতে একই রকম বিবেচনা করা যেতে পারে। 'এই বিপরীতের সহাবস্থান' ঈশ্বরের ধারণা ধারণ করেঃ 'সর্বোচ্চ'র ধারণা সবকিছুকে অন্তর্ভূক্ত করে; এখানে একত্ব ও প্রয়োজনের ধারণা প্রকাশ পায় যা সরাসরি ঈশ্বরের দিকে ইঙ্গিত করে। আবার, 'সর্বোচ্চ' রেখা কোনও ত্রিভূজ, বৃত্ত বা বলয় নয়, বরং তিনটির সমন্বয়; বিপরীতের ঐক্যও একটা ট্রিনিটি। তারপরেও নিকোলাসের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনার ধর্মীয় অর্থ ছিল সামান্যই। এ যেন ঈশ্বরকে যুক্তির ধারায় নামিয়ে আনা। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, 'ঈশ্বর সবকিছুকে আলিঙ্গন করেন, এমনকি স্ববিরোধিতাকেও'[১৪] গ্রিক অর্থডক্স ধারণা–সকল সত্যি ধর্মতত্ত্ব প্যারাডিক্সিক্যাল হতে বাধ্য–এর খুব কাছাকাছি। দার্শনিক বা গণিতজ্ঞের বদলে শিক্ষক হিসাবে লেখার সময়

AMARBOI.COM

নিকোলাস ঈশ্বরমুখী হওয়ার জন্যে 'ক্রিশ্চানের সবকিছু পেছনে ফেলে যাওয়ার' ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, এমনকি 'তাকে নিজের বুদ্ধির উর্ধ্বেও উঠতে হবে,' যেতে হবে সকল বোধ আর যুক্তির বাইরে। ঈশ্বরের মুখাবয়ব 'এক গোপন ও অতিন্দ্রীয় নৈঃশব্দ্যে'[১৫] আবৃত্ত রয়ে যাবে।

রেনেসাঁর নতুন দর্শন ঈশ্বরের মতো যুক্তির নাগালের বাইরে অবস্থানকারী গভীর ভয় বা শঙ্কার মোকাবিলা করতে পারেনি। নিকোলাসের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে তাঁর স্বদেশ জার্মানিতে এক বিশেষ ক্ষতিকর আতঙ্ক দেখা দেয় এবং সমগ্র উত্তর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৪৮৪ সালে পোপ অষ্টম ইনোসেন্ট দ্য বুল *সুম্মা দে সিদারেন্তস* প্রকাশ করেন যা এক প্রবল উন্মাদনা সূচিত করেছিল। এটি বিক্ষিপ্তভাবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়কে সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পাশ্চাত্যের অন্ধকার চেতনা উন্মোচিত করেছে এটা। এই ভয়ঙ্কর নিপীড়নের কালে হাজার হাজার নারী-পুরুষের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে তাদের ভয়ঙ্কর সব অপরাধের স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তারা স্বীকার করে নেয় যে, শয়তানের সঙ্গে যৌন মিলনে অংশ নিয়েছে তারা, আকাশ পথে হাজার মাইল দূরে উড়ে গিয়ে অশ্লীল সমাবেশে যোগ দিয়েছে যেখানে ঈশ্বরের বদলে ইবলিশের উপাসনা করা হয়। এখন আমরা জানি, ডাইনী বলে কিছু ছিল না, ঐ উন্মাদনা এক সম্মিলিত ফ্যান্টাসির প্রতিনিধিত্ব করেছে, যেখানে শিক্ষিত ইনকুইজিটরস ও তাঁদের বহু শিকার অংশ নিয়েছিল। এরা এসব স্বপ্ন দেখেছে ও সত্যিই এসব ঘটেছে বলে সহজেই বিশ্বাস করেছে। এই ফ্যান্টাসির সঙ্গে অ্যান্টি-সেমিটিজম ও গভীর যৌন-আতঙ্কের যোগসূত্র ছিল। স্যাটান বা ইবলিশ এক অসম্ভব ভালো ও ক্ষমতাধর ঈশ্বরের ছায়া হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। ঈশ্বরের অন্যান্য ধর্মে এমনটি ঘটেনি। উদাহরণ স্বরূপ, কোরানে স্পষ্ট বলা আছে, শেষ বিচারের দিনে স্যাটানকে (*শয়তান*) মার্জনা করা হবে। কোনও কোনও সুফী দাবি করেছে যে অন্যান্য দেবদূতের চেয়ে ঈশ্বরকে বেশি ভালোবাসার কারণেই সে করুণা হতে বঞ্চিত হয়েছে। সৃষ্টির পর আদমের সামনে আল্লাহ্ নতজানু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে, কিন্তু অস্বীকৃতি জানিয়েছিল শয়তান, কারণ তার বিশ্বাস ছিল, কেবল আল্লাহ'র প্রতিই এরকম আনুগত্য দেখানো যেতে পারে। কিন্তু পশ্চিমে স্যাটান নিয়ন্ত্রণের অতীত এক অশুভ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। বর্ধিত হারে তাকে সীমাহীন যৌনক্ষুধা ও অস্বাভাবিক বড় যৌনাঙ্গ বিশিষ্ট বিশাল জানোয়ার হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছিল। নরমান কন তাঁর *ইউরোপ'স ইনার ডিমনস* গ্রন্থে যেমন বলেছেন, স্যাটানের এই প্রতিকৃতি কেবল এক সুপ্ত আতঙ্ক ও

AMARBOI.COM

উৎকণ্ঠার প্রকাশ ছিল না; এই ডাইনী-উন্মাদনা এক নিপীড়ক ধর্ম এবং আপাত অপ্রতিরোধ্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবচেতন অথচ অনিবার্য বিদ্রোহের প্রতিনিধিত্ব করেছে। টর্চার চেম্বারে ইনকুইজিটর ও 'ডাইনীরা' মিলে এমন এক ফ্যান্টাসির জন্ম দিয়েছে যা খৃস্টধর্মের উল্টোচিত্র। ব্ল্যাক মাস এক ভীতিকর অথচ বিকৃতভাবে সন্তোষ জাগানো অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল যেখানে ঈশ্বরের বদলে শয়তানের উপাসনা চলত, ঈশ্বরকে কর্কশ ও বড় বেশি ভীতিকর মনে হতো।[১৬]

মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) উইচক্র্যাফটে প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ক্রিশ্চানের জীবনকে স্যাটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে দেখেছেন। সংস্কারকে এই উৎকণ্ঠার মোকাবিলার প্রয়াস হিসাবে দেখা যেতে পারে; যদিও অধিকাংশ সংস্কারবাদী ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন কোনও ধারণা বা মতবাদ হাজির করেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ঘটে যাওয়া ধর্মীয় পরিবর্তনের বিরাট চক্রকে 'সংস্কার' হিসাবে আখ্যায়িত করা অবশ্যই সরলীকরণ হয়ে পড়ে। শব্দটি যা ঘটেছে তার চেয়ে আরও সুচিন্তিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বোঝায়। বিভিন্ন সংস্কারক–ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয়ই–এক নতুন ধর্মীয় সচেতনাকে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছিলেন যা প্রবলভাবে অনুভূত হলেও ধারণাগত রূপ বা সচেতনভাবে চিন্তা করা হয়নি। ঠিক কেন 'সংস্কার' ঘটেছিল আমরা জানি না। আজকের দিনে পণ্ডিতগণ আমাদের অতীতের পাঠ্য বইয়ের বিবরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেন। প্রায়শঃ যেমন মনে করা হয়, আসলে কেবল চার্চের দুর্নীতির কারণেই পরিবর্তন ঘটেনি কিংবা ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার হ্রাসের কারণেও নয়। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে ধর্মের প্রতি এক ধরনের আগ্রহের জন্ম হয়েছিল বলেই মনে হয় যা মানুষকে বাড়াবাড়ির প্রতি সমালোচনামুখর করে তুলেছিল এক সময় যা অনিবার্য মনে করা হয়েছিল। সংস্কারবাদীদের সকল ধারণা এসেছে মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব থেকে। ষোড়শ শতাব্দীতে সাধারণ মানুষের নতুন ধর্মানুরাগ ও ধর্মতাত্ত্বিক সচেতনতার মতো সুইটযারল্যান্ড ও জার্মানিতে জাতীয়তাবাদ ও নগরের উত্থানও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ইউরোপের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বোধও চড়া হয়ে উঠেছিল, এটা বরাবরই প্রচলিত ধর্মীয় মনোভাবে তীব্র পরিবর্তন সূচিত করে থাকে। বাহ্যিক ও সমবেতভাবে বিশ্বাসের প্রকাশের বদলে ইউরোপিয়রা ধর্মের অভ্যন্তরীণ রূপ জানতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এইসব উপাদান বেদনাদায়ক ও প্রায়শঃ সহিংস পরিবর্তনে অবদান রেখেছিল ও পশ্চিমকে আধুনিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

দীক্ষিত হবার আগে লুথার যে ঈশ্বরকে ঘৃণা করে এসেছেন তাঁকে খুশি করার সম্ভাবনার ব্যাপারে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন:

AMARBOI.COM

> যদিও আমি সাধুর মতো পাপহীন জীবন যাপন করেছি, তারপরেও ঈশ্বরের সামনে অস্বস্তিতে ভরা বিবেক নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজেকে পাপী মনে হয়েছে। আমিও এও বিশ্বাস করতে পারিনি যে, আমার কাজ দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি। পাপীকে শাস্তিদানকারী ঈশ্বরকে ভালোবাসা দূরে থাক, তাঁকে ঘৃণা করেছি। আমি ভালো সাধু ছিলাম, এত কঠোরভাবে নিয়ম পালন করেছি যে, যদি কোনও সাধু কখনও মনাস্টিক অনুশীলনের মাধ্যমে স্বর্গে যায় তবে মনেস্টারির আমার সতীর্থ সকল এতে সাক্ষী দেবে...তারপরেও আমার বিবেক আমাকে নিশ্চয়তা দেয়নি, বরং আমি সব সময় সন্দেহ করেছি এবং বলেছি, 'এটা ঠিক করোনি। তুমি যথেষ্ট অনুতপ্ত নও। স্বীকারোক্তিতে সেটা বাদ দিয়েছ তুমি।'[১৭]

বর্তমানে বহু ক্রিশ্চান—প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয়ই—এই লক্ষণ শনাক্ত করতে পারবে, সংস্কার যাকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি। লুথারের ঈশ্বর তাঁর ক্রোধে বৈশিষ্টমণ্ডিত। সাধু, পয়গম্বর বা স্যামিস্টদের কেউই এই ঐশী ক্রোধ সহ্য করতে পারেননি। স্রেফ, 'সাধ্যানুযায়ী করার' প্রয়াসই যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিক ঈশ্বর চিরন্তন ও সর্বব্যাপী, সুতরাং 'আত্ম-তৃপ্ত পাপীদের প্রতি তাঁর ক্রোধ বা আক্রোশও তাই অপরিমেয় এবং অসীম।'[১৮] তাঁর ইচ্ছা জানার উপায় নেই। ঈশ্বরের আইন বা ধর্মীয় রীতিনীতি পোষণ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, আইন শুধু অভিযোগ ও ত্রাস আনতে পারে, কারণ এটা আমাদের অপূর্ণাঙ্গতার মাত্রা দেখিয়ে দিয়েছে। আশার বাণী শোনানোর বদলে আইন 'ঈশ্বরের ক্রোধ, পাপ, ঈশ্বর সকাশে মৃত্যু এবং নরকবাসের'[১৯] কথা প্রকাশ করেছে।

ন্যায্যতার মতবাদ প্রণয়নের সময় লুথারের ব্যক্তিগত সাফল্য এসেছিল। মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ঈশ্বর 'ন্যায্যতা'র, পাপী ও ঈশ্বরের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রয়োজনীয় সবকিছুর যোগান দেন। ঈশ্বর সক্রিয়, মানুষ স্রেফ নিষ্ক্রিয়। আমাদের 'সৎকর্ম' ও আইনের অনুসরণ আমাদের ন্যায্যতার কারণ নয় বরং ফল মাত্র। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন বলেই আমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে পারি। সেইন্ট পল 'বিশ্বাসে ন্যায্যতা' বলে একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। লুথারের তত্ত্বের নতুন কিছুই ছিল না: চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপে এর চল ছিল। কিন্তু লুথার একে আবিষ্কার করে আপন করে নেওয়ার ফলে তাঁর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তিরোহিত হয়ে যায়। এরপর আগত প্রত্যাদেশ 'আমার মাঝে এমন বোধ জাগিয়ে তোলে যেন আমার নবজন্ম হয়েছে: আমি যেন উন্মুক্ত তোরণ দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করেছি।'[২০]

তারপরেও মানব প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি নৈরাশ্যবাদী রয়ে যান তিনি। ১৫২০ সালের দিকে তাঁর *থিয়োলজি অভ দ্য ক্রস* প্রণয়ন করেন তিনি। এই

AMARBOI.COM

শব্দগুচ্ছ সেইন্ট পল থেকে নিয়েছিলেন তিনি। সেইন্ট পল করিন্থীয় নবদীক্ষিতদের বলেছিলেন, ক্রাইস্টের ক্রস দেখিয়ে দিয়েছিল যে, 'ঈশ্বরের নির্বুদ্ধিতা মানবীয় প্রজ্ঞার চেয়ে শ্রেয় ও ঈশ্বরের দুর্বলতা মানুষের শক্তির চেয়ে শক্তিমান।'[২১] ঈশ্বর 'পাপী'দের ন্যায্যতা দান করেন, একেবার মানবীয় বিচারে যারা কেবল শাস্তিরই যোগ্য। মানুষের কোছে যা দুর্বলতা সেখানেই ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। লুরিয়া যেখানে কাব্বালিস্টদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে কেবল আনন্দ ও প্রশান্তিতেই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব, লুথার সেখানে দাবি করেছেন, 'একমাত্র কষ্ট ও ক্রসেই ঈশ্বরকে পাওয়া যেতে পারে।'[২২] এই অবস্থান থেকে স্কলাস্টিসিজমের বিরুদ্ধে যুক্তি খাঁড়া করেন তিনি–মানবীয় চাতুরি প্রকাশকারী ও 'যেন স্পষ্ট বোধগম্য এমনভাবে ঈশ্বরের অদৃশ্য ব্যাপার প্রত্যাক্ষকারী' মিথ্যা কষ্ট ও ক্রসের মাধ্যমে'[২৩] অনুধাবণকারী প্রকৃত ধর্মতাত্ত্বিকের পার্থক্য তুলে ধরেন। চার্চের ফাদারগণ যেভাবে ট্রিনিটি ও অবতারের মতবাদ প্রণয়ন করেছিলেন সেদিক থেকে এগুলোকে সন্দেহভাজন মনে হয়, এগুলোর জটিলতা জটিলতা 'প্রতাপের ধর্মতত্ত্বের'[২৪] অসারতার কথাই বলে। তা সত্ত্বেও লুথার নাইসিয়া, এফিসাস এবং চ্যালসেডনদের অর্থডক্সির প্রতি অনুগত রয়ে গিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর ন্যায্যতা তত্ত্ব ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতা ও তাঁর ত্রিত্ববাদী মর্যাদার ওপর নির্ভরশীল ছিল। ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা খৃস্টজগতে এত গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে, লুথার বা কালভিন এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেননি, কিন্তু লুথার অসত্য ধর্মতাত্ত্বিকদের অস্পষ্ট মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'আমার কাছে কী মূল্য আছে এর?' জটিল খৃস্টতত্ত্বীয় মতবাদের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি: ক্রাইস্ট তাঁর ত্রাণকর্তা জানাটাই ছিল সব।[২৫]

লুথার এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের ব্যাপারেও সন্দিহান ছিলেন। তোমাস আকুইনাস ব্যবহৃত যুক্তিভিত্তিক বিতর্কের মাধ্যমে একমাত্র পৌত্তলিক দার্শনিকদের 'ঈশ্বর'কেই জানা যেতে পারে। লুথার 'বিশ্বাস' দ্বারা আমাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের দাবি করে ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য ধারণা গ্রহণ করার কথা বোঝাননি। 'বিশ্বাসের জন্যে তথ্য, জ্ঞান ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন নেই' এক সারমনে প্রচার করেছেন তিনি, 'বরং প্রয়োজন তাঁর অনুভূত, অপ্রয়াস লব্ধ এবং অজ্ঞাত মহত্ত্বের কাছে আনন্দময় বাজি ধরে স্বাধীন আত্মসমর্পণ।'[২৬] বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমস্যাদির সমাধানের বেলায় তিনি পাসকাল ও কিয়ের্কেগার্দের পূর্বগামী ছিলেন। 'বিশ্বাস' কোনও বিশেষ ক্রীডের কতগুলো প্রস্তাবনার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন বোঝায়নি এবং অর্থডক্স মতানুযায়ী এটা আস্থা নয়। বরং বিশ্বাস হচ্ছে আস্থা স্থাপন করে একটা সত্তার উদ্দেশ্যে অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া। এটা 'এক ধরনের জ্ঞান এবং

অন্ধকার যা কিছুই দেখতে পায় না।'[২৭] তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর তাঁর প্রকৃতি বা রূপ নিয়ে অনুমান নির্ভর আলোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। কেবল যুক্তি দিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে, জন্ম দিতে পারে হতাশার–যেহেতু আমরা কেবল ঈশ্বরের ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও বিচার আবিষ্কারেই সক্ষম হব, যা কেবল কঠিন পাপীদের ভয় দেখাতে সক্ষম। ঈশ্বর সম্পর্কে যৌক্তিক আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার বদলে ক্রিশ্চানের উচিত হবে ঐশীগ্রন্থে প্রকাশিত সত্য অনুধাবন করা ও সেগুলোকে আপন করে নেওয়া। লুথার তাঁর *স্মল ক্যাটেশিজম*-এ সংকলিত ক্রীডে সেটা কীভাবে করতে হবে দেখিয়েছেন:

> আমি বিশ্বাস করি, অনন্ত অসীমের পিতার সন্তান ও কুমারী মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানুষ আমার প্রভু; যিনি *আমাকে* উদ্ধার করেছেন, একজন দিশাহারা ঘৃণিত প্রাণী এবং *আমাকে* সকল পাপ, মৃত্যু ও শয়তানের কবল হতে রক্ষা করেছেন; কিন্তু সেটা সোনা-রূপা দিয়ে নয় বরং তাঁর পবিত্র ও মূল্যবান রক্ত দিয়ে, তাঁর পাপহীন কষ্ট ও মৃত্যু দিয়ে, যেন আমি তাঁর হয়ে যাই, তাঁর ছায়াতলে বেঁচে থাকি ও আজীবন ন্যায়ের পথে তাঁর সেবা করি, তাঁর আশীর্বাদ পাই, এমনকি যখন তিনি মৃত হতে পুনরুত্থিত হন এবং অনন্তকাল রাজত্ব করেন।[২৮]

AMARBOI.COM

স্কালাস্টিক ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা পেয়েছিলেন লুথার, কিন্তু পরে বিশ্বাসের অধিকতর সরল ধরণ বেছে নিয়েছেন ও চতুর্দশ শতাব্দীর বিরস ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন যা তাঁর আতঙ্ক প্রশমিত করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ঠিক 'কীভাবে' ন্যায্যতা পেয়েছি ব্যাখ্যা দেওয়ার বেলায় নিজেই অস্পষ্টতার দোষে অভিযুক্ত হয়ে পড়েন তিনি। লুথারের গুরু অগাস্তিন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, পাপীর ওপর অর্পিত ন্যায়নিষ্ঠা তার নয়, ঈশ্বরের। লুথার একে কিঞ্চিৎ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অগাস্তিন বলেছিলেন, এই স্বর্গীয় ন্যায়নিষ্ঠা আমাদের অংশে পরিণত হয়েছে; লুথার জোর দিয়েছেন যে, এটা পাপীর বাইরেই রয়ে গেছে, কিন্তু ঈশ্বর একে এমনভাবে দেখেছেন *যেন* এটা আমাদের একান্ত নিজস্ব হয়ে গেছে। এটা পরিহাসের বিষয় যে, সংস্কার আরও বৃহত্তর মতবাদগত বিভ্রান্তি ও নতুনতর মতবাদের বিস্তার ঘটিয়েছিল, কারণ এগুলো যেসব গোষ্ঠীকে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিল সেগুলোর মতোই কোনও কোনওটা নজীরবিহীন ও নাজুক ছিল।

ন্যায্যতার মতবাদ প্রণয়নের পর নিজের পুর্নজন্মের দাবি করেছিলেন লুথার, কিন্তু আসলে তাঁর সকল উৎকণ্ঠার অবসান ঘটেছে বলে মনে হয় না।

তিনি ক্রুদ্ধ, অস্থির ও সহিংস মানুষই রয়ে গিয়েছিলেন। সকল প্রধান ধর্মীয় প্রথা দাবি করে যে, যেকোনও আধ্যাত্মিকতার অ্যাসিড টেস্ট হচ্ছে ঠিক কোন মাত্রায় সেটা দৈনন্দিন জীবনে আত্মীকৃত হয়েছে। বুদ্ধ যেমন বলেছিলেন আলোকপ্রাপ্তির পর যে কারও 'উচিত হবে বিপণি কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন' করা ও সকল প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের চর্চা করা। এক ধরনের শান্তিবোধ, অচঞ্চলতা ও প্রেমময়-দয়া হচ্ছে সকল সত্য ধর্মদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু লুথার ছিলেন প্রবলভাবে অ্যান্টি-সেমাইট, নারী-বিদ্বেষী, যৌনতার ব্যাপারে ঘৃণা ও আতঙ্ক বোধ করতেন তিনি, এবং বিশ্বাস করতেন যে, বিদ্রোহী সকল কৃষককে হত্যা করা উচিত। প্রতিহিংসা পরায়ণ ঈশ্বরের দর্শন ব্যক্তিগত ক্রোধে ভরিয়ে তুলেছিল তাঁকে। মনে করা হয়, উদ্ধত চরিত্রের কারণে সংস্কার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংস্কারবাদী হিসাবে কাজ শুরুর আগে তাঁর বহু ধারণাই অর্থডক্স ক্যাথলিকরা গ্রহণ করেছিল, সেগুলোর চর্চা নতুন প্রাণশক্তি যোগাতে পারত; কিন্তু লুথারের আগ্রাসী কৌশল সেগুলো অপ্রয়োজনীয় সন্দেহের সঙ্গে দেখার কারণ হয়েছে।[২৯]

দীর্ঘমেয়াদে লুথার জন কালভিনের (১৫০৯-৬৪) চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন; লুথারের চেয়ে বেশি মাত্রায় রেনেসাঁর আদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো, তাঁর সুইস সংস্কার উদীয়মান পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের ওপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ 'কালভিনিজম' আন্তর্জাতিক ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং ভালো বা খারাপ যাই হোক, সমাজকে বদলে দিতে পেরেছিল; জনগণকে তা এই মর্মে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে যে, তারা যা চায় তাই অর্জন করতে পারে। কালভিনিস্টিক ধ্যান-ধারণা ১৬৪৫ সালে অলিভার ক্রমওয়েলের অধীনে ইংল্যান্ডে পিউরিটান বিপ্লবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল আর ১৬২০ এর দশকে নিউ ইংল্যান্ডে উপনিবেশ স্থাপনে সাহায্য করেছে। লুথারের মৃত্যুর পর তাঁর মতবাদ মূলত জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু কালভিনের ধারণা যেন আরও প্রগতিশীল প্রতীয়মান হয়েছে। অনুসারীরা তাঁর শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে সংস্কারের দ্বিতীয় ধারার সূচনা ঘটায়। ইতিহাসবিদ হিউ ট্রেভর রোপার যেমন মন্তব্য করেছেন, অনুসারীরা কালভিনিজমকে রোমান ক্যাথলিসিজমের চেয়ে অনেক সহজে পরিত্যাগ করেছিল–সে কারণেই প্রবাদবাক্য 'একবার যে ক্যাথলিক, সে আজীবন ক্যাথলিক'-এর জন্ম। তা সত্ত্বেও কালভিনিজম এর ছাপ রেখেছে: পরিত্যক্ত হলেও সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে প্রকাশ করা যেতে পারে।[৩০] বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা বেশি সত্যি। বহু আমেরিকান যারা এখন আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় তারা পিউরিটান কর্ম-নীতি মেনে চলে এবং নির্বাচনের কালভিনিস্টিক ধারণা বিশ্বাস করে, নিজেদের তারা 'মনোনীত জাতি' মনে করে যাদের পতাকা ও আদর্শের আধা-

AMARBOI.COM

ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা দেখেছি, সকল প্রধান ধর্মই এক অর্থে সভ্যতার এবং আরও নির্দিষ্টভাবে নগরের সৃষ্টি। ধনী বণিক শ্রেণী যখন প্রাচীন পৌত্তলিক রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান দখল করে নিয়তিকে নিজের হাতে নিতে চেয়েছে তখনই এসব ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। ইউরোপের উন্নয়নশীল শহরগুলোর বুর্জোয়াদের কাছে খৃস্ট ধর্মের কালভিনিস্টিক রূপ বিশেষভাবে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, যার অধিবাসীরা নিপীড়নমূলক ধারাক্রমের শিকল হতে মুক্তি চেয়েছিল।

পূর্বেকার সুইস ধর্মতাত্ত্বিক হুলড্রিচ যিউংগলি, (১৪৮৪-১৫৩১)-এর মতো কালভিন সেভাবে ডগমায় আগ্রহী ছিলেন না: ধর্মের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো ছিল তাঁর বিবেচনার বিষয়। তিনি সরল ধার্মিকতার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন, কিন্তু ট্রিনিটির অ-বাইবেলসুলভ উৎস সত্ত্বেও এই মতবাদ আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। *দ্য ইন্সটিটিউট অভ দ্য ক্রিশ্চান রিলিজিয়ন*-এ তিনি যেমন লিখেছেন, 'ঈশ্বর নিজেকে একক হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি তিনজন ব্যক্তি হিসাবে অস্তিত্ববান।'[৩১] ১৫৫৩ সালে ট্রিনিটি মতিতে অস্বীকৃতি জানানোয় স্প্যানিশ ধর্মতাত্ত্বিক মাইকেল সারবেতাসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়েছিলেন কালভিন। ক্যাথলিক স্পেন ছেড়ে পালিয়ে যিনি সারবেতাস এবং কালভিনের জেনিভায় আশ্রয় নেন, তিনি অ্যাপসল এবং চার্চের আদি পিতাদের ধর্মে ফিরে যাবার দাবি করেন, যারা কখনও এই অসাধারণ মতবাদের কথা শোনেননি। কিছুটা ন্যায়সঙ্গতভাবেই সারবেতাস যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ইহুদি ঐশীগ্রন্থের কঠোর একেশ্বরবাদীতার বিরোধিতা করে এমন কিছুই নিউ টেস্টামেন্টে নেই। ট্রিনিটির মতবাদ মানব সৃষ্ট যা 'মানুষের মনকে প্রকৃত ক্রাইস্ট হতে সরিয়ে ত্রিরূপী ঈশ্বরকে আমাদের সামনে খাড়া করেছে।'[৩২] ইতালির দুজন সংস্কারবাদী–জর্জিয়ো ব্র্যান্দ্রাতা (১৫১৫-১৫৮৮) ও ফস্তাস সোসিনাস (১৫৩৯-১৬০৪)–তাঁর বিশ্বাসে সমর্থন যোগান। এঁরা দুজনই জেনিভায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন যে, তাঁদের ধ্যান-ধারণা সুইস সংস্কারের পক্ষে বেশ রেডিক্যাল। তাঁরা এমনকি প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত পশ্চিমের প্রচল ধারণাও মানতেন না। নারী-পুরুষ ক্রাইস্টের মৃত্যুর ফলে ন্যায্যতা পেয়েছে, এটা তাঁরা বিশ্বাস করতেন না; বরং সেটা কেবল ঈশ্বরে তাদের 'বিশ্বাস' বা আস্থার ফল। *ক্রাইস্ট দ্য সেভিয়র* গ্রন্থে সোসিনাস নাইসিয়ার তথাকথিত অর্থডক্সি প্রত্যাখ্যান করেছেন: 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি জেসাসের স্বর্গীয় রূপ সম্পর্কিত কোনও মন্তব্য নয়, বরং এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁকে বিশেষভাবে ভালোবেসেছিলেন। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে প্রাণ দেননি তিনি, বরং শিক্ষক ছিলেন তিনি,

AMARBOI.COM

আমাদের 'মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন।'[৩২] ট্রিনিটির মতবাদ সম্পর্কে বলা যায়, এটা একেবারেই 'আজগুবী ব্যাপার, যুক্তি বিবর্জিত একটা কাল্পনিক গল্প যা বিশ্বাসীকে তিনজন আলাদা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনে উৎসাহিত করে।'[৩৩] সারবেতাসের মৃত্যুদণ্ডের পর ব্ল্যান্দ্রাতা ও সোসিনাস উভয়ই পোল্যান্ড ও ট্রান্সসিলভিনিয়ায় পালিয়ে যান, সঙ্গে নিয়ে যান তাঁদের 'ইউনিটারিয়ান' ধর্ম।

যিউইংগলি ও কালভিন ঈশ্বর সম্পর্কিত অধিকতর প্রচলিত ধারণায় নির্ভর করেছেন ও লুথারের মতো ঈশ্বরের পরম সার্বভৌমত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা স্রেফ বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাস নয়, বরং গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল ছিল। ১৫১৯ সালের আগস্ট মাসে জুরিখে মিনিস্ট্রির শুরুর অল্প পরেই যিউইংগলি প্লেগে আক্রান্ত হন, যা শেষ পর্যন্ত শহরের এক চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী ধ্বংস করে দিয়েছিল। নিজেকে বাঁচানোর কোনও উপায়ই নেই বুঝতে পেরে পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়েন তিনি। সাহায্যের জন্যে সাধুদের কাছে প্রার্থনা করা বা চার্চকে তাঁর হয়ে অনুকম্পা চাইতে বলার কথা মাথায়ই আসেনি। বরং তার বদলে নিজেকে ঈশ্বরের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাটি রচনা করেছেন তিনি:

তোমার যা ইচ্ছা করো
কারণ আমার কোনও নেই।
আমি তোমার পাত্র
পূর্ণাঙ্গ বা বিচূর্ণ করার জন্যে।[৩৪]

AMARBOI.COM

তাঁর আত্মসমর্পণ ছিল ইসলামের আদর্শের অনুরূপ। ইহুদি ও মুসলিমদের মতো বিকাশের একটা তুলনাযোগ্য পর্যায়ে পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা আর মধ্যস্থতাকারীদের মেনে নিতে রাজি ছিল না, বরং তারা ঈশ্বরের প্রতি নিজেদের অবিচ্ছেদ্য দায়িত্বের বোধ গড়ে তুলছিল। কালভিনও তাঁর সংস্কারকৃত ধর্মকে ঈশ্বরের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন। নিজের পরিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের জন্যে রেখে যাননি তিনি। তাঁর *কমেন্টারি অন দ্য সালমস* গ্রন্থে কেবল এটুকু বলেছেন যে, এটা পুরো ঈশ্বরের কীর্তি। প্রথাগত চার্চ ও 'পাপাসির কুসংস্কারে' পুরোপুরি শৃঙ্খলিত ছিলেন তিনি। মুক্তি অর্জনে যুগপৎ অনিচ্ছুক ও অক্ষম ছিলেন, তাঁকে সরিয়ে আনার বেলায় ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল: 'অবশেষে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতার গুপ্ত লাগাম দিয়ে আমার পথকে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন...বহু বছরের অবাধ্য মনকে আচমকা বশ মানিয়ে নিয়েছেন।'[৩৫]

ঈশ্বর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, কালভিন ছিলেন একেবারে ক্ষমতাহীন, তা সত্ত্বেও আপন ব্যর্থতা ও অক্ষমতার তীব্র অনুভূতির দ্বারাই একটা বিশেষ মিশনের জন্যে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

অগাস্তিনের সময় থেকেই আকস্মিক বিশ্বাস পরিবর্তন পশ্চিমা খৃস্টধর্মের বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ অতীতের সঙ্গে আকস্মিক ও প্রবল সম্পর্কচ্ছেদের প্রথা হিসাবে ক্রিয়াশীল রয়ে যাবে, আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম জেমস যাকে বলেছেন 'অসুস্থ আত্মা সমূহের'[৩৬] জন্যে 'দ্বিতীয় জন্ম নেওয়া' ধর্ম। ক্রিশ্চানরা ঈশ্বরের এক নতুন বিশ্বাসে 'জন্ম' গ্রহণ করছিল; তারা মধ্যযুগীয় চার্চের স্বর্গ এবং তাদের মাঝখানে বিরাজমান অসংখ্য মধ্যস্থতাকারীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কালভিন বলেছেন, উদ্বেগবশতঃ মানুষ সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছিল; তারা একজন ক্রুদ্ধ ঈশ্বরকে তাঁর কাছের মানুষদের তোয়াজ করে প্রসন্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সাধুদের কাল্ট প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও প্রটেস্টান্টরা প্রায়শঃই প্রায় একই মাত্রার উদ্বেগের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সাধুরা অকার্যকর, এ সংবাদ পাওয়ার পর এই নিরাপোস ঈশ্বর সম্পর্কিত আতঙ্ক ও বৈরিতার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যেন এক তীব্র প্রতিক্রিয়াসহ বিস্ফোরিত হয়েছিল। ইংরেজ মানবতাবাদী টমাস মূর সাধু-পুজার বহুঈশ্বরবাদীতার বিরুদ্ধে বহু ভর্ৎসনামূলক রচনায় ব্যক্তিগত ঘৃণার ছাপ আবিষ্কার করেছিলেন।[৩৭] তাদের চরিত্র হননের ভেতর দিয়ে এর প্রকাশ ঘটেছিল। বহু প্রোটেস্ট্যান্ট ও পিউরিটান ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রতিমা বিরোধিতাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে, তারা সাধু এবং ভার্জিন মেরির মূর্তি ধ্বংস করে চার্চ ও ক্যাথেড্রালের ফ্রিসকোগুলোর ওপর চুন লেপ্টে দেয়। তাদের এই তীব্র উন্মাদনা দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা সাধুদের কাছে তাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করার জন্যে প্রার্থনার সময় যেমন ভীত ছিল ঠিক সে রকমভাবেই বিরক্তি উদ্রেককারী ও ঈর্ষাতুর ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে গিয়ে ভীতির শিকার হয়েছে। এটা আরও দেখিয়েছে, কেবল ঈশ্বরকে উপাসনা করার উৎসাহ স্থির বিশ্বাস হতে জন্ম নেয়নি বরং এক উদ্বেগাকুল প্রত্যাখ্যান ছিল এটা যা প্রাচীন ইসরায়েলিদের আশেরাহর খুঁটি ভাঙায় উৎসাহ যুগিয়েছিল ও প্রতিবেশীদের দেবতাদের খিস্তি-খেউড়ে ভাসিয়ে দিতে প্ররোচিত করেছিল।

মূলত পূর্বনির্ধারিত নিয়তি বিশ্বাসের জন্যে কালভিনকে স্মরণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু আসলে এই বিষয়টি তাঁর চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু ছিল না; তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এটা 'কালভিনিজমে'র জন্যে অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা ও সর্বজ্ঞতার সঙ্গে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সমন্বয় সাধনের সমস্যাটি ঈশ্বরের ওপর নরত্ব আরোপের ফলে দেখা দিয়েছিল।

আমরা দেখেছি, নবম শতাব্দীতে মুসলিমরা এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল; তারা কোনও যৌক্তিক সমাধান খুঁজে পায়নি; পরিবর্তে তারা ঈশ্বরের রহস্য ও দুর্বোধ্যতার ওপর জোর দিয়েছে। এটি গ্রিক অর্থডক্স ক্রিশ্চানদের জন্য কখনও সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি, এরা প্যারাডক্সের অনুরাগী ছিল; একে আলো ও উদ্দীপনার উৎস হিসাবে দেখা গেছে; কিন্তু পশ্চিমে এটা বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল, যেখানে ঈশ্বরের অধিকতর ব্যক্তিক ধারণা বজায় ছিল। মানুষ এমনভাবে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'র কথা বলার চেষ্টা করত যেন তিনি কোনও মানবসত্তা; আমাদের মতোই সীমাবদ্ধতার অধীন ও জাগতিক কোনও শাসকের মতো আক্ষরিক অর্থে পৃথিবীকে শাসন করছেন। তা সত্ত্বেও ক্যাথলিক চার্চ ঈশ্বর হতভাগ্যদের চির নরক বাস স্থির করে রেখেছেন, এই ধারণার নিন্দা জানিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, অগাস্তিন 'পূর্ব নির্ধারিত নিয়তি' কথাটিকে মনোনীতদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত বোঝাতে প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য কিছু আত্মার নরক বাস ঘটবে মানতে চাননি। যদিও তাঁর প্রতিপাদ্যের যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত ছিল তাই। *ইনস্টিটিউটে* পূর্ব নির্ধারিত নিয়তি সম্পর্কে খুব বেশি আলোকপাত করেননি কালভিন। আমাদের দিকে যখন তাকাই, স্বীকার গেছেন তিনি, তখন সত্যি মনে হয় ঈশ্বর অন্যদের তুলনায় কিছু সংখ্যক লোককে বেশি সুবিধা দিয়েছেন। কেউ কেউ যখন গস্পেলের প্রতি সাড়া দেয় তখন অন্যরা কেন নিস্পৃহ থাকে? ঈশ্বর কি তবে কোনও খামখেয়ালি বা অন্যায় আচরণ করছেন? কালভিন এটা অস্বীকার করেছেন: কাউকে পছন্দ বা প্রত্যাখ্যানের আপাতঃ চিত্রটি ঈশ্বরের রহস্যের নিদর্শন।[৩৮] এ সমস্যার কোনও যৌক্তিক সমাধান ছিল না, যেখানে বোঝায় যে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও তাঁর বিচার সমন্বয়ের অতীত। কিন্তু এটা ক্যালভিনকে খুব একটা বিচলিত করেনি; কেননা ডগমায় খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না তিনি।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর 'কালভিনিস্টদের' যখন একদিকে লুথারান ও অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিকদের কাছ থেকে আলাদা পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তখন জেনিভায় কালভিনের ডান হাত থিওদোরাস বেযা (১৫১৯-১৬০৫) নেতৃত্ব হাতে তুলে নেন এবং পূর্ব নির্ধারিত নিয়তিবাদকে কালভিনিজম-এর মূল বিষয়ে পরিণত করেন। নিষ্ঠুর যুক্তির সাহায্যে তিনি প্যারাডক্সকে অপসারিত করেন। ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান, এতে বোঝা যায়, আপন ত্রাণ লাভের ক্ষেত্রে মানুষের কিছুই করার নেই। ঈশ্বর অপরিবর্তনীয় এবং তাঁর বিধানমালা যথাযথ ও চিরন্তন: এভাবে তিনি অন্তহীনকাল হতেই কাউকে কাউকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বাকী সবার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন নরকবাস। এই অস্বস্তিকর মতবাদের ব্যাপারে কোনও কোনও কালভিনিস্ট প্রবল শঙ্কা বোধ করেছে। লো ক্যান্ট্রিজে জ্যাকব আরমিনাস যুক্তি

AMARBOI.COM

দেখিয়েছেন যে, এটা বাজে ধর্মতত্ত্বের একটা নজীর, কেননা এখানে এমনভাবে ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে যেন তিনি সাধারণ কোনও মানুষ। কিন্তু কালভিনিস্টরা বিশ্বাস করত যে, আর দশটা বিষয়ের মতোই ঈশ্বর সম্পর্কেও বস্তুগত আলোচনা করা যায়। প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মতো তারাও এক নতুন অ্যারিস্টটলিজম গড়ে তুলছিল যেখানে যুক্তি ও মেটাফিজিক্সের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটা সেইন্ট  তোমাস আকুইনাসের অ্যারিস্টটলিজমের চেয়ে আলাদা ছিল, কেননা নব্য ধর্মতাত্ত্বিকরা অ্যারিস্টটলের যৌক্তিক পদ্ধতির ব্যাপারে আগ্রহী হলেও তাঁর চিন্তার বিষয়বস্তুর প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা খৃস্টধর্মকে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক পদ্ধতি হিসাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, যা পরিচিত নীতিমালা হতে সিলোজিস্টিক যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বের করে আনা সম্ভব। অবশ্যই প্রবল স্ববিরোধী ছিল এটা, কারণ সংস্কারবাদীরা ঈশ্বর সম্পর্কে এ ধরনের যৌক্তিক আলোচনা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরবর্তী সময়ে পূর্ব নির্ধারিত নিয়তির কালভিনিস্ট মতবাদ দেখিয়েছে যে, ঈশ্বরের স্ববিরোধিতা ও রহস্যময়তাকে কাব্য হিসাবে বিবেচনা না করে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু ভীতিকর যুক্তির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে গেলে কী অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। প্রতীকীভাবে ব্যাখ্যা না করে বাইবেল একেবারে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা হলে ঈশ্বর সম্পর্কে এর ধারণা অসম্ভবের পর্যায়ে পর্যবসিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার জন্যে আক্ষরিক অর্থে দায়ী একজন ঈশ্বরসত্তাকে কল্পনা করার সঙ্গে মারাত্মক স্ববিরোধিতা জড়িত। বাইবেলের 'ঈশ্বর' আর দুর্জ্ঞেয় ও একক সত্তা থাকেন না, বরং নিষ্ঠুর ও স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হন। পূর্বনির্ধারিত নিয়তির মতবাদ এরকম ব্যক্তিক ঈশ্বরের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে।

AMARBOI.COM

কালভিনের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পিউরিটানরা ধর্মীয় বোধ গড়ে তুলেছিল এবং ঈশ্বরকে স্পষ্ট এক সংগ্রাম হিসাবে আবিষ্কার করেছে। তিনি যেন সুখ বা সমবেদনায় তাদের সিক্ত করেননি। তাদের জার্নাল ও আত্মজীবনী দেখায়, পূর্ব নির্ধারিত নিয়তির ব্যাপারে বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল তারা; উদ্ধার মিলবে না ভেবে শঙ্কিত ছিল। ধর্মান্তরকরণ এক কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ভয়াবহ নিপীড়নমূলক নাটক, যেখানে 'পাপী' ও তার আধ্যাত্মিক গুরু আত্মার জন্যে 'সংগ্রামে' লিপ্ত। প্রায়শ্চিত্তকারীকে প্রায়শঃ মারাত্মক অপমানের মুখোমুখি বা ঈশ্বরের কৃপার জন্যে প্রকৃত হতাশার বোধে জর্জরিত হতে হতো, যতক্ষণ না ঈশ্বরের ওপর সামগ্রিক নির্ভরতার বিষয়টি তার উপলব্ধিতে আসছে। ধর্মান্তকরণ প্রায়ই মনস্তাত্ত্বিক অ্যাব্রিঅ্যাকশন উপস্থাপিত করত–চরম হতাশা হতে মহাউল্লাসের পর্যায়ে চরম পরিবর্তন। নরক ও শাস্তির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত জোরের সঙ্গে আত্মসমীক্ষার বাড়াবাড়ি যোগ হওয়ায়

অনেকের মাঝেই বিষণ্ণতার রোগ দেখা দিয়েছিল: আত্মহত্যা যেন সাধারণ প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিউরিটানরা এর জন্যে শয়তানকে দায়ী করেছে যে কিনা তাদের জীবনে ঈশ্বরের মতোই ক্ষমতাবান মনে হয়েছে।[৩৯] পিউরিটানিজমের ইতিবাচক দিকও ছিল: কাজের ক্ষেত্রে মানুষকে এটা গৌরব এনে দিয়েছিল: এর আগে পর্যন্ত যাকে দাসত্ব হিসাবে দেখা হতো এবার সেটাই এক 'আহবান' বিবেচিত হয়েছিল। এর জরুরি প্রলয়বাদী আধ্যাত্মিকতা কাউকে কাউকে নয়া বিশ্বে উপনিবেশে স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু এর সবচেয়ে খারাপ দিক ছিল, পিউরিটান ঈশ্বর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছেন ও যারা মনোনীত নয় তাদের প্রতি কঠোর অসহিষ্ণুতার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকরা পরস্পরকে এখন প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখে, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণা ও অনুভূতিতে আশ্চর্যরকম মিল রয়েছে। কাউন্সিল অভ ট্রেন্টের (১৫৪৫-৬১) পর ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিকরাও নিও-অ্যারিস্টটলিয়ান ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরের গবেষণাকে যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আবিষ্কারের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। সোসায়েটি অভ জেসাসের প্রতিষ্ঠাতা লয়োলার ইগনেশিয়াস (১৪৯১-১৫৫৬)-এর মতো সংস্কারকরা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভের প্রটেস্ট্যান্ট গুরুত্ব ও প্রত্যাদেশের উপলব্ধি ও একেবারে আপন করে নেওয়ার ব্যাপারটিকে সমর্থন করেছেন। প্রথম দিকে জেস্যুইটদের জন্যে বিকশিত আধ্যাত্মিক অনুশীলনের (*স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইসেজ)*-এর মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মান্তকরণের প্রেরণা জাগানো, যা কিনা যুগপৎ যন্ত্রণাময় ও আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতা হতে পারে। আত্মমূল্যায়ন ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর গুরুত্বদানকারী নির্দেশকের সঙ্গে একজন একজন করে ত্রিশদিন দীর্ঘ এই সাধনা পিউরিটান আধ্যাত্মিকতার চেয়ে ভিন্ন ছিল না। অনুশীলনগুলো অতিন্দ্রীয়বাদের পদ্ধতিগত ও খুব কার্যকর সাধনা তুলে ধরে। অতিন্দ্রীয়বাদীরা প্রায়শঃই এমন সব অনুশীলনের প্রয়োগ করেছে যার সঙ্গে বর্তমান কালের সাইকোঅ্যানালিস্টদের কৌশলের মিল রয়েছে; সুতরাং, এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে অনুশীলনগুলো আজও ক্যাথলিক ও অ্যাংলিক্যানরা এক ধরনের বিকল্প চিকিৎসা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনুসরণ করে থাকে।

ইগনেশিয়াস অবশ্য ভুয়া অতিন্দ্রীয়বাদের বিপদ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। লুরিয়ার মতো অবিচলতা ও আনন্দের প্রতি জোর দিয়েছিলেন তিনি, তাঁর *রুলস অভ দ্য ডিসারনমেন্ট অভ স্পিরিটস*-এ অনুসারীদের চরম আবেগের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, যা কোনও কোনও পিউরিটানকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অনুশীলনকারী সম্ভাব্য যেসব আবেগের মুখোমুখি হতে পারে সেগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছিলেন তিনি: ধ্যানের সময় কোনগুলো *ঈশ্বরের* কাছ থেকে আসবে আর কোনগুলো আসবে

AMARBOI.COM

শয়তানের তরফ থেকে। ঈশ্বর অনুভূত হবেন শান্তি, আনন্দ ও 'মনের চাঙ্গা ভাব' হিসাবে, অন্যদিকে বিষণ্ণতা, উদ্বিগ্ন ভাব ও বিক্ষিপ্ততা আসে 'অশুভ আত্মা' হতে। ইগনেসিয়াশের নিজস্ব ঈশ্বর অনুভূতি ছিল তীব্র: এটা তাঁকে আনন্দে কাঁদাত। একবার তিনি বলেছিলেন, এর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। কিন্তু আবেগের তীব্র ওঠানামাকে অবিশ্বাস করতেন তিনি; নতুন সত্তায় যাত্রায় শৃঙ্খলার প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কালভিনের মতো খৃস্টধর্মকে তিনি ক্রাইস্টের মুখোমুখি দাঁড়ানো বলে বিবেচনা করেছিলেন, *এক্সারসাইজ*-এ যা উল্লেখ করেছেন: যার পরিণতি ছিল 'ভালোবাসার জন্যে ধ্যান, যা সবকিছুকে ঈশ্বরের মহানুভবতার সৃষ্টি এবং এর প্রতিফলন হিসাবে'[৪০] দেখে। ইগনেসিয়াশের চোখে গোটা জগৎই ঈশ্বরে পরিপূর্ণ। অনুশীলন প্রক্রিয়া চলাকালে তাঁর অনুসারীরা স্মরণ করত:

> আমরা প্রায়ই দেখেছি একেবারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসও কীভাবে তাঁর আত্মাকে ঈশ্বর পানে ধাবিত করতে পারত, যিনি এমনকি তুচ্ছ বস্তুতেও সুমহান। ছোট একটা গাছ, পাতা, ফুল বা ফল, নগণ্য একটা কেঁচো বা ছোট্ট একটা জানোয়ার দেখেই ইগনেসিয়াশ মুক্ত হয়ে স্বর্গে উর্ধ্বোরোহণ করতে পারতেন এবং পৌঁছে যেতেন বোধের অতীত জগতে।[৪১]

পিউরিটানদের মতো জেস্যুইটরাও ঈশ্বরকে এক গতিময় শক্তি হিসাবে অনুভব করেছে যা সর্বোত্তম অবস্থায় তাদের আত্মবিশ্বাস ও শক্তিতে পূর্ণ করে দিতে পারত। পিউরিটানরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নিউ ইংল্যান্ডে বসতি করার সময় জেস্যুইট মিশনাররা সারা বিশ্ব ঘুরে বেরিয়েছে: ফ্রান্সিস বাভিয়র (১৫০৬-১৫৫২) ভারত ও জাপানে খৃস্টধর্ম প্রচার করেন, ম্যাত্তিও রিচি (১৫৫২-১৬১০) গস্পেল পৌঁছে দিয়েছেন চীনে এবং রোবার্তে দে নবিলি (১৫৭৭-১৬৫৬) নিয়ে গেছেন ভারতে। আবার পিউরিটানদের মতোই জেস্যুইটরা প্রায়শঃই উৎসাহী বিজ্ঞানচর্চাকারী ছিল এবং এমন মত প্রকাশ করা হয় যে, রয়াল সোসায়েটি অভ লন্ডন বা অ্যাকাডেমিয়া দেল সিমেন দো নয়, বরং সোসায়েটি অভ জেসাসই ছিল বিশ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী।

তা সত্ত্বেও ক্যাথলিকরা যেন পিউরিটানদের মতোই অস্বস্তিতে ছিল। যেমন ইগনেসিয়াশ নিজেকে এমন মহাপাপী হিসাবে দেখতেন যে, তিনি প্রার্থনা করতেন মৃত্যুর পর যেন লাশ একটা গোবরের স্তূপে ফেলে রাখা হয় যাতে পাখী আর কুকুর তা খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারে। চিকিৎসকরা তাঁকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, প্রার্থনা সভায় এমন প্রবলভাবে কান্না চালিয়ে গেলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। নারীদের জন্যে নগ্নপদ

AMARBOI.COM

সন্ন্যাসীনি কারমেলাইটদের মঠজীবনাচারকে সংস্কারকারী তেরেসা অভ আভিলা নিজের জন্যে নরকে রক্ষিত এক ভয়ঙ্কর জায়গা দর্শন করেছিলেন। এই পর্যায়ের সাধুরা যেন ঈশ্বর ও জগৎসংসারকে সমন্বয়ের অতীত বিপরীতমুখী শক্তি হিসাবে দেখেছেন: ত্রাণ লাভের জন্যে জগৎ ও সকল স্বাভাবিক মায়া ত্যাগ করতে হবে। দান-খয়রাত আর সৎকর্ম করে জীবনযাপনকারী ভিনসেন্ট দ্য পল প্রার্থনা করেছেন, ঈশ্বর যেন বাবা-মায়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কেড়ে নেন; ভিজিটেশন বৃত্তির প্রতিষ্ঠাতার জেন ফ্রাঙ্গিস  দে শ্যানতাল আপন ছেলের নিথর দেহ টপকে কনভেন্টের পথে যাত্রা করেছিলেন; মাকে বাধা দেওয়ার জন্যে দরজার চৌকাঠে শুয়ে পড়েছিল সে। রেনেসাঁ যেখানে স্বর্গ-মর্ত্যের মিলনের প্রয়াস পেয়েছে, ক্যাথলিক সংস্কার সেখানে এদের একেবারে আলাদা করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঈশ্বর পাশ্চাত্যের সংস্কৃত ক্রিশ্চানদের দক্ষ ও ক্ষমতাশালী করেছিলেন হয়তো, কিন্তু তিনি তাদের সুখী করেননি। উভয়পক্ষের জন্যেই সংস্কারের সময়টি একটা মহাআতঙ্কের পর্যায় ছিল; অতীতের প্রতি প্রবল নিন্দা, তিক্ত ভর্ৎসনা ও অভিশাপের প্রাবল্য, ধর্মদ্রোহ ও মতবাদগত বিভক্তির আতঙ্ক, পাপ সম্পর্কে অতিক্রিয়াশীল সচেতনতা এবং নরক সম্পর্কিত বিকার বিরাজ করছিল। ১৬৪০ সালে ডাচ ক্যাথলিক কর্নেলিয়াস জানসেনের বিতর্কিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, যাতে নব্য কালভিনিজমের মতো এক ভীতিকর ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে যিনি নির্বাচিতদের বাদ দিয়ে আর সবার জন্যে অনন্ত নরকবাস নির্ধারিত করে রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বইটি 'ঈশ্বরের কৃপার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার মতবাদ শিক্ষা দিয়েছে যা সত্য এবং সংস্কার মতবাদের অনুসারী'[৪২] আবিষ্কার করে কালভিনিস্টরা এ বইয়ের প্রশংসা করেছে।

ইউরোপের এই ব্যাপক আতঙ্ক আর হতাশাকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? চরম উদ্বেগের একটা কাল ছিল এটা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভরশীল এক নতুন ধরনের সমাজের পত্তন ঘটতে যাচ্ছিল যা কিনা অচিরেই গোটা বিশ্ব অধিকার করে নেবে। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর যেন এসব আতঙ্ক দূর করে সেফার্দিক ইহুদিরা ইসাক লুরিয়ার মিথে যেমন সান্ত্বনার খোঁজ পেয়েছিল সে রকম সান্ত্বনা দিতে পারছিলেন না। পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চানরা যেন সবসময়ই ঈশ্বরকে বাড়তি চাপ হিসাবে দেখে এসেছে ও এই ধর্মীয় উদ্বেগ দূর করার প্রয়াস পাওয়া সংস্কারবাদীরা যেন শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চিরন্তন নরকবাস নির্ধারিত করে রাখা পাশ্চাত্যের ঈশ্বর যেন তারতুলিয়ান বা অগাস্তিনের সবচেয়ে বিমর্ষতম কল্পনার করা উপাস্যের চেয়েও কর্কশ ও রূঢ় হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি হতে পারে যে, ঈশ্বর সম্পর্কে সম্পূর্ণ কল্পনানির্ভর মিথলজি ও অতিন্দ্রীয়বাদ আক্ষরিক অর্থে

AMARBOI.COM

ব্যাখ্যা করা সম্ভব এমন একজন ঈশ্বরের মিথগুলোর চেয়ে মানুষকে দুঃখ কষ্ট অতিক্রমে অধিকতর কার্যকরভাবে সাহস যোগাতে সক্ষম?

প্রকৃতপক্ষেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইউরোপের অনেকেই অনুভব করতে শুরু করেছিল যে, ধর্মের মারাত্মক অমর্যাদা করা হয়েছে। ক্যাথলিকদের হাতে প্রটেস্ট্যান্ট ও প্রটেস্ট্যান্টদের হাতে ক্যাথলিকদের হত্যায় বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল তারা। সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব নয় এমন কিছু ধারণা রক্ষা করতে গিয়ে হাজার হাজার লোক শহীদ হয়েছিল। মুক্তি লাভের জন্যে অপরিহার্য বিবেচিত অসংখ্য মতবাদ প্রচারকারী গোষ্ঠীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধর্মতাত্ত্বিক পছন্দের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল; অসংখ্য ধর্মীয় ব্যাখ্যার ছড়াছড়ি দেখে অনেকেই হতবিহ্বল ও অসহায় বোধ করছিল। কেউ কেউ হয়তো বিশ্বাস স্থাপনে আগের চেয়ে কঠিন বলেও ভেবেছে। সুতরাং, এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে পাশ্চাত্যের ঈশ্বরের ইতিহাসে মানুষ 'নাস্তিক' আবিষ্কার করতে শুরু করে, যাদের সংখ্যা ঈশ্বরের পুরোনো শত্রু এবং শয়তানের মিত্র 'ডাইনীদের' সমানই বলা যায়। বলা হয়ে থাকে, এই 'নাস্তিকরা' ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসে লোকদের আকর্ষণ করে সমাজের বাঁধন শিথিল করে দিচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আজকের পৃথিবীতে আমরা যেমন নাস্তিক্যবাদ দেখি তেমন পূর্ণাঙ্গ নাস্তিকতা তখন ছিল অসম্ভব। লুসিয়েন ফেবব্রে তাঁর *দ্য প্রবলেম অভ আনবিলিফ ইন দ্য সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরীতে* যেমন দেখিয়েছেন, এই সময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করার ধারণাগত অসুবিধা ছিল পাহাড়সম। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু এবং দীক্ষা, চার্চইয়ার্ডে শেষকৃত্য পর্যন্ত নারী-পুরুষের জীবনের সকল পর্যায়ে ছিল ধর্মের প্রাধান্য। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ, যার শুরু হতো গির্জার ঘণ্টা-ধ্বনির মাধ্যমে বিশ্বাসীকে প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার আহবান জানানোর মাধ্যমে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রথায় ছিল পরিপূর্ণ: ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রাধান্য ছিল এগুলোর–এমনকি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ফেবব্রে যেমন তুলে ধরেছেন, ঈশ্বর এবং ধর্ম এমন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত ছিল যে, এই পর্যায়ে কেউ একথা বলার চিন্তা করেনি: 'সুতরাং আমাদের জীবন, আমাদের গোটা জীবন, খৃস্ট ধর্ম শাসন করছে! আমাদের জীবনের কত সামান্য অংশ ইতিমধ্যে সেক্যুলার হয়েছে সেই তুলনায় আর সবকিছু ধর্ম দিয়ে পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত হচ্ছে! ধর্মের প্রকৃতি বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো প্রয়োজনীয় বস্তুনিষ্ঠতা অর্জনকারী ব্যতিক্রমী কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকলেও তার পক্ষে তখনকার বিজ্ঞান বা দর্শন হতে কোনও রকম সাহায্য বা সমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিল না। এক গুচ্ছ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কিছু সংখ্যক

AMARBOI.COM

সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তি অস্তিত্ব লাভ না করা পর্যন্ত কারও পক্ষে এমন একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার সম্ভব ছিল না, যার ধর্ম ইউরোপের নৈতিক, আবেগজাত, সৌন্দর্য সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক জীবনকে আকৃতি দিয়েছে ও নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই সমর্থন ছাড়া এ জাতীয় অস্বীকৃতি কেবল ব্যক্তিগত ঝোঁক বা চকিত খেয়াল মাত্র যা গভীর বিবেচনার যোগ্যতা রাখে। ফেবভ্রে যেমন দেখিয়েছেন, ফরাসি ভাষার মতো স্বদেশী ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বা বাক্য গঠনে সংশয়বাদের প্রতিশব্দ ছিল না। 'পরম,' 'আপেক্ষিক,' 'ধারণা' ও 'সংজ্ঞা'র মতো শব্দগুলোর তখনও চল হয়নি।'[৪৪] আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের কোনও সমাজই তখনও জীবনের এক অপরিহার্য অংশ হিসাবে ধরে নেওয়া ধর্মকে বাদ দেয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যায়ে আসার পরেই কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইউরোপিয়র পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হয়েছিল।

তাহলে পরস্পরের বিরুদ্ধে 'নাস্তিক্যবাদের' অভিযোগ তুলে কী বোঝাতে চাইত লোকে? ফরাসি বৈজ্ঞানিক মারিন মার্সেনে (১৫৮৮-১৬৪৮) ফ্রান্সিস্কান রীতির গোঁড়া সদস্যও ছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কেবল প্যারিসেই প্রায় ৫০,০০০ হাজার নাস্তিক রয়েছে। কিন্তু তাঁর উল্লিখিত অধিকাংশ 'নাস্তিক'ই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। এভাবে মাইকেল মন্টাগের বন্ধু পীয়েরে কারিন তাঁর নিবন্ধ *লেস ত্রয়েস ভেরিতেস* (১৫৯৩)-এ ক্যাথলিসিজমের পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রধান রচনা *দে লা গোসি*-তে তিনি যুক্তির অসারতার ওপর জোর দিয়ে দাবি করেছিলেন যে, মানুষ কেবল বিশ্বাস দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে। মারসেনে এর বিরোধিতা করেন এবং একে 'নাস্তিক্যবাদের' সমার্থক হিসাবে দেখেন। আরেকজন 'অবিশ্বাসী'র নিন্দা করেছিলেন তিনি, তাঁর নাম ইতালিয় যুক্তিবাদি জিয়ার্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০); যদিও ব্রুনো আত্মা এবং বিশ্ব জগতের আদি ও অন্ত স্টোয়িক ধরনের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। মারসেনে এদের দুজনকেই 'নাস্তিক' আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ ঈশ্বর সংক্রান্ত মতবাদে তাঁদের সঙ্গে তিনি দ্বিমত পোষণ করেছেন, তাঁরা পরম সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন বলে নয়। অনেকটা একইভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পৌত্তলিকরা ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের 'নাস্তিক' বলেছে, কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণার সঙ্গে তাঁদের ধারণার মিল ছিল না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 'নাস্তিক' শব্দটি কেবল যুক্তি হিসেবেই তোলা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আপনার যে কোনও শত্রুকেই তখন অনায়াসে 'নাস্তিক' বলে গাল দেওয়া যেত, ঠিক যেমন উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লোকজনকে 'অ্যানারক্রিস্ট' বা 'কমিউনিস্ট' তকমা এঁটে দেয়া হয়েছে।

AMARBOI.COM

সংস্কারের পর মানুষ নতুনভাবে খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। 'ডাইনী' কিংবা বলা যায় 'অ্যানারকিস্ট' বা 'কমিউনিস্ট'-এর মতো। 'নাস্তিক' কথাটি এক সুপ্ত উদ্বেগের অভিক্ষেপ। এটা বিশ্বাস সম্পর্কে এক গোপন উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলেছে এবং স্রষ্টাভীরুদের মনে ভয় জাগিয়ে সৎকাজে উৎসাহ যোগানোর একটা প্রচেষ্টা ছিল। *ল'জ অভ একলেসিয়াস্টিক্যাল*-এ অ্যাংলিক্যান ধর্মবিদ রিচার্ড হুকার (১৫৫৪-১৬০০) তখন দু'ধরনের নাস্তিকের অস্তিত্ব দাবি করেন: একটা ছোট দল ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না এবং অপর একটি বড় গোষ্ঠী এমনভাবে জীবনযাপন করত যেন ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই। মানুষ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য টানতে ভুলে যায় এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বাস্তব ভিত্তিক নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবে *দ্য থিয়েটার অভ গড'স জাজমেন্ট* (১৫৯৭) টমাস বেয়ার্ডের কাল্পনিক 'নাস্তিক' ঈশ্বরের ক্ষমতা, আত্মার অমরত্ব ও পরকালের জীবনকে অস্বীকার করে, কিন্তু দৃশ্যতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। জন উইংফিল্ড্ তাঁর *অ্যাথিজম ক্লোজড অ্যান্ড ওপেন অ্যানাটোমাইযড* (১৬৩৪) শীর্ষক গবেষণামূলক নিবন্ধে দাবি করেছেন: 'কপটাচারী একজন নাস্তিক; দুরাত্মা ধরনের মানুষ প্রকাশ্যে নাস্তিক; নিরাপদ, বেপরোয়া ও অহংকারী চরিত্র নাস্তিক: যাকে শিক্ষা দেওয়া বা সংস্কার করা যাবে না সে-ই নাস্তিক।[৮৫] নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের উপনিবেশের সহায়তা দানকারী ওয়ালশ কবি উইলিয়াম ফনের (১৫৭৭-১৬৪১) চোখে যারা খাজনা আদায় করে ও সাধারণ মানুষকে বন্দি করে তারা সন্দেহাতীতভাবে নাস্তিক। ইংরেজ নাট্যকার টমাস ন্যাশে' (১৫৬৭-১৬০১) ঘোষণা করেছেন যে, উচ্চাভিলাষী, লোভী, অতিভোজী, আত্মশ্লাঘা পোষণকারী ও পতিত, এরা সবাই নাস্তিক।

'নাস্তিক' শব্দটি ছিল অপমানকর। *নিজেকে* 'নাস্তিক' দাবি করার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করত না কেউ। তখনও গর্বের সঙ্গে বহন করার মতো ব্যাজে পরিণত হয়নি এটা। তা সত্ত্বেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের মাঝে এমন একটা মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি জেগে উঠেছিল যা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারের ব্যাপারটি কেবল সম্ভবই করে তোলেনি বরং কাঙ্ক্ষিত করেছে। বিজ্ঞানে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন লাভ করেছে তারা। তা সত্ত্বেও সংস্কারবাদীদের ঈশ্বর যেন নতুন বিজ্ঞানের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। ঈশ্বরের পরম সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বলে লুথার ও কালভিন দুজনই প্রকৃতির নিজস্ব সহজাত ক্ষমতা থাকার অ্যারিস্টটলিয় ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতি ক্রিশ্চানদের মতোই নিষ্ক্রিয়, যার কেবল ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার হিসাবে মুক্তিকে গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কালভিন স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকৃতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসা করেছেন, কেননা প্রকৃতিতে অদৃশ্য ঈশ্বর নিজেকে তুলে ধরেছেন।

AMARBOI.COM

বিজ্ঞান ও ঐশীগ্রন্থের মাঝে কোনও রকম বিরোধ থাকতে পারে না: বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের মানবীয় সীমাবদ্ধতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন, ঠিক যেমন করে একজন সুবক্তা তাঁর চিন্তা ও বক্তব্যকে দর্শকদের ক্ষমতা অনুযায়ী সমন্বিত করে নেন। সৃষ্টির বিবরণ, কালভিন বিশ্বাস করতেন, *বালবুটিভের* (শিশুসুলভ কথাবার্তা) একটা নজীর, যেখানে জটিল ও রহস্যময় বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে সাধারণ মানুষের মানসিকতায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে যাতে ঈশ্বরের উপর সবার বিশ্বাস বজায় থাকে।[৪৬] একে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ অবশ্য আবার সবসময় খোলা মনের পরিচয় দেয়নি। ১৫৩০ সালে পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস তাঁর *দে রিভোলুশনিবাস* রচনা শেষ করেন, যেখানে দাবি করা হয় যে সূর্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্র। ১৫৪৩ সালে তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগে এটি প্রকাশিত হয় এবং চার্চ কর্তৃক নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় সংযোজিত হয়। ১৬১৩ সালে পিসান গণিতবিদ গ্যালিলিও গ্যালিলি দাবি করেন যে, তাঁর আবিস্কৃত টেলিস্কোপ কোপার্নিকাসের পদ্ধতিকে সঠিক প্রমাণ করেছে। তাঁর ব্যাপারটা একটি `*cause ce'le'bre*-এ পরিণত হয়েছে। ইনকুইজিশনের সামনে তলব করা হয় তাঁকে। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয় গ্যালিলিওকে; কারাবন্দি করা হয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে। সকল ক্যাথলিক এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেনি, কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ রক্ষণশীল চেতনার কালে অন্য যে কোনও সংস্থার মতো পরিবর্তনের বেলায় সচেতনভাবে বিরোধী ছিল। চার্চকে যা আলাদা করেছিল সেটা হচ্ছে প্রতিপক্ষের ওপর জোর খাটানোর ক্ষমতা; চমৎকারভাবে চলমান এক যন্ত্র ছিল সেটা, বুদ্ধিবৃত্তিক একতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে মারাত্মক দক্ষ হয়ে উঠেছিল। অনিবার্যভাবে গ্যালিলিওর নিন্দা ক্যাথলিক দেশসমূহে বিজ্ঞানচর্চা রুদ্ধ করে দেয়, যদিও পূর্ববর্তীকালের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, যেমন মারিন মারসেনে, রেনে দেকার্তে ও ব্লেইজ পাসকেল ক্যাথলিক বিশ্বাসে অটল ছিলেন। গ্যালিলিওর ব্যাপারটি জটিল। অবশ্য আমি এর সকল রাজনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে, আমাদের কাহিনীর জন্যে যা গুরুত্বপূর্ণ: রোমান ক্যাথলিক চার্চ স্রষ্টা ঈশ্বরের বিশ্বাসকে বিপদাপন্ন করেছে বলে হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের নিন্দা করেনি, করেছে এর সঙ্গে ঐশী গ্রন্থের বাণী মেলেনি বলেই।

গ্যালিলিওর বিচারের সময় বহু প্রটেস্ট্যান্টকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল ব্যাপারটা। লুথার বা কালভিন কেউই কোপার্নিকাসের নিন্দা করেননি, কিন্তু লুথারের সহযোগী ফিলিপ মেলেঞ্চথন (১৪৯৭-১৫৬০) সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের ধারণা বাতিল করে দেন, কেননা এটা বাইবেলের নির্দিষ্ট

AMARBOI.COM

কয়েকটা অনুচ্ছেদ বিরোধী। এটা প্রোটেস্ট্যান্টদের ব্যাপার ছিল না। কাউন্সিল অভ ট্রেন্টের পর ক্যাথলিকদের মাঝে নিজস্ব ঐশীগ্রন্থ সেইন্ট জেরোম অনূদিত বাইবেলের লাতিন ভাষ্য *দ্য ভালগেট* নিয়ে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৫৭৬ সালে স্প্যানিশ ইনকিউজিটর লিয়ন অভ ক্যাস্ট্রোর ভাষায়: '*দ্য ভালগেটের* লাতিন সংস্করণের সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারী কোনও কিছু সামান্য সময়, কিংবা সামান্য সিদ্ধান্ত, ক্ষুদ্র বিধি, কোনও অভিব্যক্তি প্রকাশক শব্দ, কোনও শব্দাংশ বা কোন কিছু পরিবর্তন করা যাবে না।'[৪৭] অতীতে, আমরা যেনম দেখেছি, কোনও কোনও যুক্তিবাদী ও অতিন্দ্রীয়বাদী প্রতীকী ব্যাখ্যার পক্ষে বাইবেল ও কোরানের আক্ষরিক পাঠ হতে স্বেচ্ছায় সরে এসেছিল। এবার প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকরা ঐশীগ্রন্থের পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থের ওপর বিশ্বাস স্থাপন শুরু করেছিল। গ্যালিলিও ও কোপার্নিকাসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়তো ইসরায়েলি, সুফী, কাব্বালিস্ট বা *হেসিচ্যাস্টদের* অস্বস্তিত্বে ফেলত না, কিন্তু নতুন আক্ষরিক অর্থকে আলিঙ্গনকারী ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরার তত্ত্বটি কীভাবে বাইবেলের পঙক্তির সঙ্গে খাপ খাবে: 'পৃথিবীও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, সুতরাং একে নড়ানো যাবে না,' 'সূর্য উদিত হয়, সূর্য অস্তমিত হয়, এর উদিত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।' 'চন্দ্রকে তিনি ঋতু চক্রের জন্যে নিযুক্ত করেছেন; সূর্য জানে *যে সে অস্তগামী হচ্ছে?*'[৪৮] গ্যালিলিওর কিছু কিছু মন্তব্যের কারণে চার্চের অধিকর্তারা দারুণ বিব্রত ছিলেন। যদি, তিনি যেমন বলেছিলেন, চাঁদে যদি মানুষ থাকে, তাহলে তারা আদমের বংশধর হবে কী করে, কীভাবেই বা তারা নোয়াহর্ আর্ক থেকে অবতরণ করেছিল? পৃথিবীর ঘূর্ণনের তত্ত্বের সঙ্গে ক্রাইস্টের স্বর্গারোহনের ঘটনার খাপ খাবে কীভাবে? ঐশীগ্রন্থে বলা হয়েছে স্বর্গসমূহ ও পৃথিবী মানুষের উপকারের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সেটা কীভাবে সম্ভব, যদি গ্যালিলিও যেমন দাবি করেছেন, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী অন্যান্য গ্রহগুলোর মতো একটা গ্রহ হয়ে থাকে? স্বর্গ ও নরককে বাস্তব স্থান হিসাবে দেখা হতো, কোপার্নিকান ব্যবস্থায় যা নির্দিষ্ট করা কঠিন ছিল। যেমন নরক একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত বলে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল, দান্তে যেখানে দেখিয়েছিলেন। জেস্যুইট পণ্ডিত কার্ডিনাল রবার্ট বারলমাইনের সদ্য প্রতিষ্ঠিত *কংগ্রেনেশন ফর দ্য প্রপাগেশন অভ ফেইথ* গ্যালিলিওর বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন, তিনিও প্রচলিত ধারণার পক্ষাবলম্বন করেছেন: 'নরক কবর হতে আলাদা ভূগর্ভস্থ একটা জায়গা।' উপসংহারে তিনি বলেছিলেন যে, নিশ্চয়ই পৃথিবীর কেন্দ্রে এর অবস্থান। 'স্বাভাবিক যুক্তি'র ভিত্তিতে চূড়ান্ত যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন তিনি।

> শেষটি হচ্ছে স্বাভাবিক যুক্তি। এখানে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে দূরাত্মা ও পাপিষ্ঠদের অবস্থান দেবদূত ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হতে যতটা সম্ভব দূরে হবে। আশীর্বাদপ্রাপ্তদের আবাস হবে (আমাদের প্রতিপক্ষ যা স্বীকার করেন) স্বর্গ; সুতরাং, পৃথিবীর কেন্দ্র ছাড়া স্বর্গের চেয়ে দূরবর্তী স্থান আর কিছু হতে পারে না।[৪৯]

আজকের দিনে বালারমাইনের যুক্তি হাস্যকর ঠেকে। এমনকি পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাসী ক্রিশ্চানও নরকের অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্রে ভাবে না। কিন্তু অনেকেই এক সুসংঘবদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বরেরর কোনও স্থান নেই আবিষ্কারকারী অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মুখোমুখি হয়ে প্রবল ধাক্কা খেয়েছিল।

মোল্লা সদরা যখন মুসলিম শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, স্বর্গ ও নরক প্রত্যেকের অন্তরের কাল্পনিক জগতে অবস্থিত; ঠিক তখন বালারমাইনের মতো বিশিষ্ট গীর্জা অধিকর্তারা প্রবল যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন যে, এগুলোর সত্যিকার ভৌগলিক অবস্থান আছে। কাব্বালিস্টরা যখন সৃষ্টির বাইবেলিয় বিবরণকে একেবারে প্রতীকী অর্থে ব্যাখ্য করছিল আর অনুসারীদের এই মিথলজি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করার জন্যে সতর্ক করেছিল, ঠিক সেই সময় ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টরা দাবি করছিল যে, বাইবেলের প্রতিটি বর্ণনা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এটা নতুন বিজ্ঞানের আলোকে প্রচলিত ধর্মীয় মিথলজি নাজুক করে দেয় ও শেষ পর্যন্ত বহু লোকের পক্ষেই ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মবিদরা আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানুষকে তৈরি করছিলেন না। আর সংস্কারের পরবর্তী প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকের মাঝে অ্যারিস্টটলবাদের প্রতি আগ্রহের কাল থেকে তারা ঈশ্বর সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা শুরু করেছিল যেন তিনি কোনও বস্তুগত বিষয়। শেষ পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সময়টা নতুন 'নাস্তিকদের' পক্ষে ঈশ্বরকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে সক্ষম করে তোলে।

এভাবেই ল্যুভিয়ানের অত্যন্ত প্রভাবশালী জেস্যুইট ধর্মতাত্ত্বিক লেনার্দ লেসিয়াস (১৫৫৪-১৬২৩) তাঁর *দ্য ডিভাইন প্রভিডেন্ট* নিবন্ধে দার্শনিকদের ঈশ্বরের প্রতি যেন আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। এই ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবনের অন্য যে কোনও বাস্তবতার মতো বৈজ্ঞানিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব। বিশ্ব জগতের পরিকল্পনা বা আকস্মিক দুর্ঘটনা হতে পারে না, একজন 'প্রাইম মুভার' বা প্রতিপালকের অস্তিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে। অবশ্য লেসিয়াসের ঈশ্বরের মাঝে ক্রিশ্চানসূচক কিছু ছিল না: তিনি বৈজ্ঞানিক সত্য যাকে যে কোনও যুক্তিবাদী মানুষ আবিষ্কার করতে পারবে। লেসিয়াস কদাচ জেসাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এমন ধারণা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব



AMARBOI.COM

সাধারণ পর্যবেক্ষণ, দর্শন, ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা আর সাধারণ জ্ঞানেই বের করা সম্ভব। পশ্চিমের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আরও যেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করতে যাচ্ছিলেন ঈশ্বর তেমনি একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছিলেন। ফায়লাসুফরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণাদির বৈধতা নিয়ে কখনও সন্দেহ পোষণ করেনি, কিন্তু তাদের সহধর্মবাদীরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে দার্শনিকদের এই ঈশ্বরের খুব সামান্যই ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। তোমাস আকুইনাস হয়তো ধারণা দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর সত্তার ধারাবাহিকতায় আর একটি বস্তু মাত্র–যদিও সর্বোত্তম–কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, এইসব দার্শনিক যুক্তির সঙ্গে প্রার্থনায় তাঁর অনুভূত অতিন্দ্রীয় ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নেতৃস্থানীয় ধর্মতাত্ত্বিক ও গীর্জা-অধিপতিগণ পুরোপুরি যৌক্তিক ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ অব্যাহত রাখেন। আজকের দিনেও অনেকে তা করে আসছে। নতুন বিজ্ঞানের কাছে এসব যুক্তি অসার প্রমাণ হলো। স্বয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্বই আক্রমণের মুখে পড়ল। কেবল কল্পনা নির্ভর অনুশীলন ও প্রার্থনায় আবিষ্কার-যোগ্য ঈশ্বরকে অস্তিত্বের সাধারণ অর্থে অস্তিত্বহীন এক সত্তার প্রতীক হিসাবে দেখার বদলে ক্রমবর্ধমান হারে তাঁকে জীবনের অন্য যে কোনও বাস্তবতার মতো মনে করা হচ্ছিল। লেসিয়াসের মতো ধর্মতাত্ত্বিকদের মাঝে আমরা পাশ্চাত্যকে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যেতে দেখি, খোদ ধর্মবিদরাই ভবিষ্যতের নাস্তিকদের হাতে এমন এক ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যানের অস্ত্র তুলে দিচ্ছিলেন যার ধর্মীয় মূল্য ছিল খুব সামান্য এবং যিনি বহু মানুষের মনে আশা আর বিশ্বাসের পরিবর্তে আতঙ্কের জন্ম দিয়েছিলেন। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মতো সংস্কার-পরবর্তী ক্রিশ্চানরা অতিন্দ্রীয়বাদীদের কাল্পনিক ঈশ্বরকে কার্যকরভাবে বাদ দিয়ে যুক্তির ঈশ্বরের কাছে আলোকন প্রত্যাশা করেছে।

AMARBOI.COM

# ৯.
# আলোকন

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পাশ্চাত্য কারিগরিকরণের এক প্রক্রিয়ায় পা রাখে যা একেবারে ভিন্ন ধরনের সমাজ ও মানবতার জন্যে এক নতুন আদর্শের জন্ম দেবে। অনিবার্যভাবেই এটা ঈশ্বরের ভূমিকা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করবে। সদ্য শিল্প-উন্নত ও দক্ষ পশ্চিমের সাফল্য বিশ্বের ইতিহাসের ধারাকেও বদলে দিয়েছিল। ওইকুমিনের অন্যান্য দেশ ক্রমবর্ধমান হারে পশ্চিমা জগতকে উপেক্ষা করা কঠিন বলে আবিষ্কার করেছিল, অতীতে যেমন অন্যান্য প্রধান সভ্যতার অনেক পেছনে পড়েছিল এরা, কিংবা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিল না। কারণ আর কোনও সমাজ অনুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, পশ্চিম একেবারে নিজস্ব সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, সে কারণে সেগুলোর মোকাবিলাও ছিল অত্যন্ত দুরূহ। যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামি শক্তিই ছিল প্রধান। যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীর রেনেসাঁ পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চান জগতকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইসলামি বিশ্ব হতে অগ্রবর্তী অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল। বিভিন্ন মুসলিম শক্তি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনায়াসে সক্ষম ছিল। অটোমানদের ইউরোপের অভ্যন্তরে অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। মুসলিমরা তাদের পথ অনুসরণকারী পর্তুগীজ অভিযাত্রী ও বণিকদের বিরুদ্ধে নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখতে পারছিল। যা হোক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপ বিশ্বে প্রাধান্য-বিস্তার শুরু করে; এর সাফল্যের প্রকৃতিই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে অবশিষ্ট পৃথিবীর পক্ষে ইউরোপের সঙ্গে তাল মেলানো অসম্ভব। বৃটিশরা ভারতের নিয়ন্ত্রণও করায়ত্ত করেছিল; তারা বিশ্বের যতটা সম্ভব অধিকার করে নেওয়ার জন্য তৈরি ছিল।

AMARBOI.COM

পাশ্চাত্যকরণ এবং এর সঙ্গেই ঈশ্বর হতে মুক্তির দাবিকারী পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজমের কাল্টের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

আধুনিক কারিগরী সমাজের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য কী ছিল? অতীতের সকল সভ্যতা কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। নাম থেকেই যেমন বোঝা যায়, সভ্যতা ছিল নগরেরই সাফল্য বা অর্জন, যেখানে এক অভিজাত গোষ্ঠী কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করত; বিভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দেওয়ার মতো অবকাশ ও সম্পদ তাদের ছিল। অন্যান্য প্রধান ধর্মীয় মতাদর্শের মতো মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের একই সময়ে নগরাঞ্চলে এক ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসের জন্ম নেয়। অবশ্য কৃষি-নির্ভর এইসব সমাজ ছিল নাজুক প্রকৃতির। ফসল, উৎপাদন, আবহাওয়া ও ভূমি ক্ষয়ের মতো বিভিন্ন চলকের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এক একটি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এর অঙ্গীকার ও দায়িত্বসমূহেরও প্রসার ঘটায় শেষ অবধি প্রাপ্ত সম্পদ অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। সমৃদ্ধি ও ক্ষমতার চরম শিখরে ওঠার পর অনিবার্যভাবে শুরু হয়েছে অবক্ষয় বা পতনের। নতুন পশ্চিম কিন্তু কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল না। প্রযুক্তির ওপর এর নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতার অর্থ ছিল পশ্চিম স্থানীয় পরিস্থিতি এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সময়গত পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয়। পুঞ্জীভূত মূলধন অর্থনৈতিক সম্পদে গঠন করা ও—অতিসাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত —অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য মনে হয়েছে। আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পশ্চিম বেশ কিছু গভীর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে: এটা শিল্পায়নের দিকে চালিত করেছে। পরিণতিতে কৃষিক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে পরিবর্তন, বুদ্ধিবৃত্তিক 'আলোকন' ঘটেছে। রাজনৈতিক সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এইসব মোটা দাগের পরিবর্তন নারী-পুরুষকে নিজেদের দেখার ধারণায় প্রভাব ফেলেছে ও ঐতিহ্যগতভাবে যে সত্তাকে তারা 'ঈশ্বর' আখ্যায়িত করত তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে বাধ্য করেছে।

পশ্চিমা কারিগরী জ্ঞানভিত্তিক এই সমাজে বিশেষায়ন অত্যন্ত জরুরি ছিল: অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকল আবিষ্কার বা উদ্ভাবন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের দক্ষতার দাবি করেছে। যেমন, বিজ্ঞানীরা যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারীদের বর্ধিত কর্মদক্ষতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন; শিল্পের জন্যে প্রয়োজন ছিল নতুন মেশিন ও শক্তির উৎসের পাশাপাশি বিজ্ঞানের তরফ থেকে পাওয়া তত্ত্বগত অবদান। বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়ন ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হতে হতে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে: একটি অপরটিকে বিভিন্ন এবং হয়তো ইতিপূর্বে সম্পর্কহীন ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছে। এটা ছিল এক পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষায়ণের সাফল্য অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের ফলে আরও ব্যাপক হয়েছে ও তা ফের এর



AMARBOI.COM

দক্ষতার উপর প্রভাব ফেলেছে। অব্যাহত উন্নয়নের ভিত্তিতে মূলধন পদ্ধতিগতভাবে পুনঃবিনিয়োজিত হয়ে স্পষ্টতই অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ অর্জন করে। ক্রমবর্ধমনে সংখ্যক বলয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষ আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিল। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক সাফল্য আর মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর অধিকারে রইল না, বরং তা কারখানা-শ্রমিক, কয়লার খনির শ্রমিক, ছাপাখানার কর্মচারী ও কেরানী শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, সেটা কেবল তারা শ্রমিক বলে নয় বরং ক্রমবর্ধমান বাজারের ক্রেতা হিসাবেও। শেষ পর্যন্ত দক্ষতার তীব্র প্রয়োজনকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষিত ও একটা মাত্রা পর্যন্ত সমাজের সম্পদের অংশীদার হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে। উৎপাদনশীলতার ব্যাপক বৃদ্ধি, পুঁজির পুঞ্জীভবন, পণ্য বাজারের সম্প্রসারণ ও সেইসঙ্গে বিজ্ঞানের নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি সামাজিক বিপ্লবের সূচনা ঘটিয়েছে। ভূ-স্বামীদের ক্ষমতা হ্রাস পায়; বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক বিশাল শক্তি তাদের স্থান অধিকার করে নেয়। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে নতুন ক্ষমতার ছাপ অনুভূত হয়েছিল—যা ক্রমেই পশ্চিমকে চীন ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের মতো বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মানের কাছাকাছি মানে পৌঁছে দিয়েছে ও পরে তাদের ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম করেছে। ফরাসি বিপ্লবের বছর ১৭৮৯ সালে নাগাদ সরকারি সেবা যাচাই করা হয়েছে দক্ষতা ও উপযোগিতার আলোকে। ইউরোপের বিভিন্ন সরকার আধুনিকতার ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নিজেদের পুনঃসংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আইন-কানুন সংশোধনে ন্যস্ত হয়েছে।

AMARBOI.COM

প্রাচীন কৃষিনির্ভর পরিবেশে এমন কিছু কল্পনাও করা যেত না যখন আইনকে অপরিবর্তনীয় ও স্বর্গীয় মনে করা হতো। এটা ছিল প্রযুক্তিকরণের ফলে পশ্চিমে আসন্ন নয়া স্বায়ত্তশাসনের একটা লক্ষণ: নারী-পুরুষ মনে করেছে, তারাই তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা যা আগে কখনও মনে হয়নি। আমরা দেখেছি, প্রথাগত সমাজে উদ্ভাবন ও পরিবর্তন কেমন আতঙ্কের সৃষ্টি করে, যেখানে সভ্যতাকে নাজুক অর্জন হিসাবে দেখা হয় ও অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতার যে কোনও বিচ্ছেদকে প্রতিহত করা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমে সূচিত আধুনিক যান্ত্রিক সমাজ অব্যাহত উন্নয়ন ও প্রগতির প্রত্যাশার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিবর্তনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষেই লন্ডন রয়্যাল সোসায়েটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাচীন জ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত করার জন্যে নতুন জ্ঞান আহরণে নিজেদের নিবেদিত করেছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্যে তাদের বিভিন্ন আবিষ্কারকে একত্রিত করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

নতুন নতুন আবিষ্কার গোপন রাখার বদলে নতুন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানাসমূহ তাদের নিজস্ব ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। সুতরাং, ওইকুমিনের প্রাচীন রক্ষণশীল চেতনা অব্যাহত উন্নয়ন অনুশীলনযোগ্য এরকম বিশ্বাস ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আগের দিনে প্রবীনরা যেখানে তরুণ প্রজন্ম গোল্লায় যাচ্ছে ভেবে শঙ্কিত বোধ করেছে, সেখানে প্রবীন প্রজন্মের মাঝেও প্রত্যাশা জেগেছে যেন তাদের সন্তানরা আরও উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। ইতিহাস পর্যালোচনা এক নতুন মিথের প্রভাবান্বিত হয়: প্রগতি। এর সাফল্য ব্যাপক, কিন্তু এখন প্রকৃতির যে ক্ষতি এতে হয়েছে তাতে করে আমরা উপলব্ধি করেছি এই জীবন পদ্ধতিও অতীতের জীবন ধারার মতো নাজুক ও সম্ভবত যেন বুঝতে শুরু করেছি, শত শত বছর ধরে মানুষকে অনুপ্রাণিতকারী অন্যান্য মিথলজির মতোই কাল্পনিক।

সম্পদ ও আবিষ্কার একীভূত করার ফলে মানুষ একদিকে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল, তখন নতুন বিশেষায়ন ভিন্ন ও অনিবার্যভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত একজন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম ফায়লাসুফরা পশ্চিমা দর্শন, নন্দনতত্ত্বে বেশ দক্ষ ছিল। প্রকৃতপক্ষেই, ফালসাফাহ্ এর অনুসারীদের এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও [illegible] সামগ্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ পশ্চিমা সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিগণিত হয়ে ওঠা বিশেষায়ন নিজস্ব উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যামিতির অসংখ্য শাস্ত্র ক্রমশঃ স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের আমলে এসে কোনও এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পক্ষে অন্য কোনও বিষয়ে যোগ্যতার পরিচয় রাখাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এখানে বলা যায় যে, প্রত্যেক প্রধান বুদ্ধিজীবী নিজেকে প্রথার রক্ষাকারী হিসাবে না দেখে অগ্রপথিক বিবেচনা করেছেন। তিনি ছিলেন অভিযাত্রী, নাবিকদের মতো বিশ্বের নতুন নতুন অংশে প্রবেশকারী। আপন সমাজের স্বার্থে এতদিন পর্যন্ত অজানা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাফল্যের নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য কল্পনার প্রয়াস নেন ও এই প্রক্রিয়ায় প্রাচীন পবিত্রতার ধারণাকে নাকচ করে তিনি পরিণত হয়েছেন সাংস্কৃতিক নায়কে। এক কালে যে প্রকৃতি মানব জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকে রেখেছিল, তার নিয়ন্ত্রণ প্রবলভাবে আয়ত্তে চলে আসায় নতুন করে মানুষের আশা জেগে উঠেছিল। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, উন্নত শিক্ষা ও উন্নত আইন মানবাত্মাকে আলোকিত করে তুলতে পারে। মানুষের সহজাত ক্ষমতার ওপর এই নতুন আস্থার মানে ছিল তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, তার নিজস্ব

প্রয়াসের সাহায্যেই সে আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে। তাদের মনে আর এই ধারণা থাকেনি যে সত্য আবিষ্কার করার জন্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রথা বা ঐতিহ্য, কোনও প্রতিষ্ঠান বা অভিজাত গোষ্ঠী–বা এমনকি ঈশ্বর হতে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের ওপর নির্ভর করতে হবে।

তা সত্ত্বেও বিশেষায়নের অভিজ্ঞতার অর্থ ছিল বিশেষায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত মানুষ সমগ্রকে প্রত্যক্ষ করায় ক্রমবর্ধমান হারে ব্যর্থ হচ্ছিল। এরই পরিণামে উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা ফের গোড়া থেকে জীবন ও ধর্ম সম্পর্কিত নিজস্ব তত্তব গড়ে তোলার দায়িত্ব অনুভব করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছে বর্ধিত জ্ঞান ও দক্ষতা তাঁদের ওপর বাস্তবতা সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করার ও একে হালনাগাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। নতুন বৈজ্ঞানিক চেতনা ছিল গবেষণামূলক, স্রেফ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল। আমরা দেখেছি, ফালসাফাহ্‌র প্রাচীন যুক্তিবাদ এক যৌক্তিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ওপর প্রাথমিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা এভাবে কোনও কিছু নিশ্চিত ধরে নিতে পারেননি; অগ্রগামীরা ক্রমবর্ধমানহারে ভুলের ঝুঁকি গ্রহণ বা বাইবেল, চার্চ ও ক্রিশ্চান প্রথাদির মতো প্রতিষ্ঠানসমূহকে আঘাত করতে ছিলেন প্রস্তুত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরোনো 'প্রমাণসমূহ' আর পুরোপুরি সন্তোষজনক ছিল না, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ গবেষণামূলক পদ্ধতিতে প্রবল উৎসাহী থাকায় অন্যান্য বিষয় যেভাবে প্রমাণ করেছিলেন সেভাবেই ঈশ্বরের বস্তুগত সত্তা যাচাই করার দায়িত্ব বোধ করলেন।

নাস্তিক্যবাদ তখনও ঘৃণার বিষয় ছিল। আমরা দেখব, আলোকন পর্বের অধিকাংশ *ফিলোসফ* মোটামুটি অবচেতনে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তারপরেও মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি মনে করতে শুরু করেছিল যে, এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বও নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় না। সম্ভবত প্রথম যিনি এ বিষয়টি উপলব্ধি করে নাস্তিক্যবাদকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি ফরাসি পদার্থ বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্লেইজ পাসকাল (১৬২৩-৬২)। অসুস্থ কিন্তু নির্ধারিত বয়সে পৌঁছার আগেই পরিণতিপ্রাপ্ত বালক হিসবে তাঁকে অন্যান্য শিশুদের থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানী পিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁকে, যিনি জানতে পারেন যে ১১ বছর বয়সী ব্লেইজ গোপনে ইউক্লিদের প্রথম তেইশটি প্রতিপাদ্যের সমাধান করে ফেলেছেন। ষোল বছর বয়সে জ্যামিতির উপর একটা রচনাা প্রকাশিত হয় তাঁর, বিজ্ঞানী দেকার্তে যেটাকে এত অল্প বয়সী কারও রচনা বলে বিশ্বাস করতে চাননি। পরবর্তীকালে তিনি গণনাযন্ত্র, ব্যারোমিটার ও হাইড্রোলিক প্রেসের নকশা প্রণয়ন করেছিলেন। পাকজল পরিবার তেমন ধার্মিক ছিল না, কিন্তু ১৬৪৬ সালে তারা

AMARBOI.COM

জানসেনিজমে দীক্ষা নিয়েছিল। ব্লেইজের বোন জ্যাকুলিন দক্ষিণ-পশ্চিম প্যারিসের পোর্ট-রয়্যাল জানসেনিস্ট কনভেন্টে যোগ দিয়ে ক্যাথলিক গোষ্ঠীর তীব্র সমর্থকে পরিণত হন। ২৩ নভেম্বর, ১৬৫৪ তারিখে রাতে স্বয়ং ব্লেইজ 'রাত সাড়ে দশটা থেকে শুরু করে মধ্যরাতের আধঘন্টা পর পর্যন্ত স্থায়ী' এক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যা দেখিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর বিশ্বাস খুবই দূরবর্তী এবং পুঁথিগত। মৃত্যুর পর এই প্রত্যাদেশের 'স্মৃতিচারণ' তাঁর ডাবলেটের সঙ্গে সেলাই করা অবস্থায় পাওয়া যায়:

আগুন

'আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাকের ঈশ্বর, জ্যাকবের ঈশ্বর' দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের ঈশ্বর নয়।
নিশ্চয়তা, নিশ্চয়তা, আন্তরিক, আনন্দ, শান্তি।
জেসাস ক্রাইস্টের ঈশ্বর
জেসাস ক্রাইস্টের ঈশ্বর
*আমার ঈশ্বর ও তোমার ঈশ্বর*
'তোমার ঈশ্বরই হবেন আমার ঈশ্বর।'
জগৎ বিস্মৃত হয়েছে এবং ঈশ্বর ছাড়া সবকিছু।
একমাত্র গস্পেলে প্রদর্শিত পথেই তাঁকে পাওয়া যেতে পারে।'[1]

AMARBOI.COM

অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অতিন্দ্রিয় এই অভিজ্ঞতা বুঝিয়েছে যে, পাসকালের ঈশ্বর বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য অন্যান্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ঈশ্বর হতে আলাদা ছিলেন। এই ঈশ্বর দার্শনিকদের ঈশ্বর নন; প্রত্যাদেশের ঈশ্বর ধর্মান্তরকরণের অদম্য শক্তি পাসকালকে জেস্যুইটদের বিরুদ্ধে তাদের চরম প্রতিপক্ষ জানসেনিস্টদের পক্ষে ঠেলে দিয়েছিল।

ইগনেশিয়াস যেখানে গোটা বিশ্বকে ঈশ্বরময় দেখেছিলেন এবং জেস্যুইটদের মাঝে ঐশী সর্বব্যাপীতা ও সর্বজ্ঞতার বোধের চর্চা করার উৎসাহ জুগিয়েছিলেন, পাসকাল এবং জানসেনিস্টরা সেখানে জগতকে বিষণ্ন ও ফাঁপা হিসাবে দেখেছেন--ঈশ্বরবিহীন মনে করেছেন। প্রত্যাদেশ সত্ত্বেও পাসকালের ঈশ্বর 'গোপন ঈশ্বর' রয়ে গেছেন, যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে যাঁকে আবিষ্কার করা যাবে না। ১৬৬৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে পাসকালের সংকলন *পেনসিস*-এ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে গভীর নৈরাশ্যবাদ প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের 'নীচতা' এক অব্যাহত বিষয়, স্বয়ং ক্রাইস্টও যার অপসারণের অক্ষম, 'যিনি পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত যন্ত্রণায় ভুগবেন।'[2] বিচ্ছিন্নতার

অনুভূতি ও ঈশ্বরের ভীতিকর অনুপস্থিতি নতুন ইউরোপের আধ্যাত্মিকতার বড় ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছিল। *পেনসিস*-এর অব্যাহত জনপ্রিয়তা দেখায় যে, পাসকালের বিষাদময় আধ্যাত্মিকতা ও তাঁর গোপন ঈশ্বর পশ্চিমের ধর্মীয় চেতনার গুরুত্বপূর্ণ কোনও স্থানে টোকা দিয়েছে বা আবেদন সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং পাসকালের বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো তাঁকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে কোনও সান্ত্বনার বাণী শোনায়নি। বিশ্বের বিশালত্বের বিষয়টি চিন্তা করতে গিয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন তিনি:

> আমি যখন মানুষের অন্ধ ও দোমড়ানো অবস্থা দেখি, যখন আমি মুক হয়ে গোটা বিশ্ব ও কোনও আলোক ছাড়াই একাকী পড়ে থাকা মানুষকে জরিপ করি, যেন বিশ্বজগতের এই কোণে হারিয়ে গেছে সে, কে তাকে এখানে এনেছে, কী কারণে এখানে এসেছে সে, মৃত্যুর পর তার কী পরিণতি হবে না জেনেই, কোনও কিছু জানারই ক্ষমতা নেই তার, তখন আতঙ্কে কেঁপে উঠি, যেন কোনও মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় এক ভয়ঙ্কর নির্জন দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারপর সে জেগে উঠেছে উদ্ধার পাওয়ার কোনও উপায় ছাড়াই দিশাহারা অবস্থায়। তারপর আমি এই ভেবে অবাক হয়ে যাই যে এমন করুণ অবস্থায়ও মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হয় না।[৩]

AMARBOI.COM

বৈজ্ঞানিক যুগের অতি আশাবাদকে আমরা যেন সরলীকরণ না করি এটা তার এক অসাধারণ স্মারক। পরম অর্থ বা তাৎপর্যরহিত ফাঁকা মনে হওয়া বিশ্বের অস্তিত্বের আতঙ্ক পুরোপুরি ধারণ করতে পেরেছিলেন পাসকাল। মানুষকে সব সময় তাড়া করে ফেরা অচেনা কোনও জগতে জেগে ওঠার আতঙ্কের খুব কমই এমন চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাসকাল নিজের প্রতি নিষ্ঠুর রকম সৎ ছিলেন; অধিকাংশ সমসাময়িকদের বিপরীতে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার কোনও উপায় নেই। স্বভাবজাতভাবে বিশ্বাসে অক্ষম কারও সঙ্গে তর্ক করার কথা কল্পনা করার সময় তাঁকে বিশ্বাস করানোর মতো যুক্তি খুঁজে পাননি তিনি। একেশ্বরবাদের ইতিহাসে এটা ছিল এক নতুন পর্যায়। এর আগে পর্যন্ত কেউই গুরুত্বের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। পাসকালই প্রথম ব্যক্তি যিনি মেনে নিয়েছিলেন যে, এই বেপরোয়া নতুন বিশ্বে ঈশ্বরে বিশ্বাস কেবল ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রথম আধুনিক।

তাৎপর্যের দিক থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত পাসকালের সমস্যাটি বিপ্লবাত্মক, কিন্তু সরকারিভাবে কোনও চার্চ একে কখনও মেনে নেয়নি। সাধারণভাবে ক্রিশ্চান অ্যাপোলজিস্টরা এই অধ্যায়ের শেষে আলোচিত লেনার্দ

লেসিয়াসের যৌক্তিক পদ্ধতিই পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু এই পদ্ধতি কেবল দার্শনিকদের ঈশ্বরের দিকেই নিয়ে যেতে পারে, পাসকাল অনুভূত প্রত্যাদেশের ঈশ্বর নয়। 'বিশ্বাস', জোর দিয়ে বলেছেন তিনি, 'যৌক্তিক সম্মতি নয় বরং সাধারণ বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। এটা একটা জুয়া। ঈশ্বর আছেন প্রমাণ করা অসম্ভব আবার যুক্তির কারণেই তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করাও সমানভাবে অসম্ভব: 'তিনি (ঈশ্বর) কী বা তিনি আছেন কিনা জানার ক্ষমতা আমাদের নেই... যুক্তি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। অসীম হট্টগোল আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই অসীম দূরত্বের শেষ প্রান্তে একটা মুদ্রাকে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে যেটা কোনও একদিক দিয়ে নেমে আসবে। তুমি কোন দিকে বাজি ধরবে?'[৪] অবশ্য এই বাজি পুরোপুরি অযৌক্তিক নয়। ঈশ্বরের পক্ষে বাজি ধরায় জয় লাভের সম্ভাবনাই বেশি। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন বেছে নেওয়ায় কথা বলেছেন পাসকাল, ঝুঁকি সীমিত, কিন্তু লাভ অসীম। একজন ক্রিশ্চান বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হলে এক অব্যাহত আলোকন, ঈশ্বরের উপস্থিতির সচেতনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে সে, যা কিনা মুক্তির নিশ্চিত লক্ষণ। বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করা অর্থহীন, প্রত্যেক ক্রিশ্চান একা।

পাসকালের নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে *পেনসিস*-এ এক ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি জেগে উঠেছে যে একবার বাজি ধরার পরও গোপন ঈশ্বর তাঁর সন্ধানকারীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। পাসকাল ঈশ্বরকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'আগেই যদি না পেতে তাহলে আমাকে খুঁজতে না তুমি।'[৫] একথা সত্যি যে, যুক্তি ও তর্ক প্রয়োগ করে বা প্রাতিষ্ঠানিক গির্জার শিক্ষা নিয়ে মানুষের পক্ষে দূরবর্তী ঈশ্বরের কাছে পৌঁছার পথ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভেতর দিয়ে বিশ্বাসীদের মনে পরিবর্তনের বোধ জাগে, 'বিশ্বাসী, সৎ বিনয়ী, কৃতজ্ঞ, সৎ কর্মশীল এবং প্রকৃত বন্ধু,'[৬] হয়ে ওঠে সে। কোনওভাবে বিশ্বাস স্থাপন ও অর্থহীনতা আর হতাশার মাঝে ঈশ্বরানুভূতি গঠনের মাধ্যমে একজন ক্রিশ্চান আবিষ্কার করবে যে জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছে। কার্যকর বলেই ঈশ্বর একটি বাস্তবতা। বিশ্বাস বুদ্ধিবৃত্তিক নিশ্চয়তা নয়, বরং অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া ও এমন এক অভিজ্ঞতা লাভ যা নৈতিক আলোকন নিয়ে আসে।

আরেকজন নতুন মানুষ রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) ঈশ্বর আবিষ্কারে মনের ক্ষমতার ওপর আরও বেশি আস্থাবান ছিলেন। প্রকৃতপক্ষেই তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, স্রেফ বুদ্ধিমত্তাই আমরা যে নিশ্চয়তার সন্ধান করি তা দিতে পারে। পাসকালের বাজি ধরার ধারণা অনুমোদন করতেন না তিনি, যেহেতু এটা একেবারেই ভক্তিমূলক অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল ছিল; যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত তাঁর প্রমাণ অন্য ধরনের ভক্তির উপর

AMARBOI.COM

নির্ভরশীল ছিল। ফরাসি প্রবন্ধকার মাইকেল মনতেইনের (১৫৩৩-৯২) সংশয়বাদের বিরোধিতা করতে উদগ্রীব ছিলেন তিনি। মনতেইন কোনও কিছুর নিশ্চয়তা বা সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেছিলেন। গণিতবিদ ও বিশ্বাসী ক্যাথলিক দেকার্তে এ ধরনের সংশয়বাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নয়া গবেষণামূলক যুক্তিবাদ আনার দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন। লেসিয়াসের মতো দেকার্তে ভেবেছিলেন, কেবল যুক্তিই মানুষকে ধর্ম ও নৈতিকতার সত্য গ্রহণে রাজি করাতে পারে যাকে তিনি সভ্যতার ভিত্তি হিসাবে দেখেছেন। বিশ্বাস আমাদের এমন কিছুই বলে না যা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করা যাবে না: সেইন্ট পল স্বয়ং রোমানদের উদ্দেশে রচিত তাঁর *এপিস্‌ল*-এ ঠিক এ রকম মত প্রকাশ করেছিলেন: 'কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানা সম্ভব তা মানুষের কাছে পরিষ্কার, কেননা ঈশ্বরই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকেই ঈশ্বরের চিরন্তন ক্ষমতা ও অলৌকিকত্ব—যত অদৃশ্যই হোক—তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের মনের চোখে দেখার জন্যে বিরাজ করছে।'[৭] দেকার্তে আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অস্তিত্বমান অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে সহজ ও নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরকে জানা সম্ভব (*facilius certius*)। এটা পাসকালের বাজি ধরার মতোই বিপ্লবাত্মক, যেহেতু বিশেষতঃ দেকার্তের প্রমাণ পলের উল্লেখিত বাহ্যিক জগতের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সেইন্ট পল মনের প্রতিক্রিয়াজাত অন্তর্মুখী চিন্তাকে জাগাতে এই প্রমাণ টেনেছিলেন।

AMARBOI.COM

নিজ সর্বজনীন গণিতের প্রয়োগিক পদ্ধতি ব্যবহার করে যৌক্তিকভাবে সরল বা প্রথম নীতিমালার দিকে অগ্রসর দেকার্তে ঈশ্বরের অস্তিত্বের একই রকম বিশ্লেষণমূলক প্রমাণ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু অ্যারিস্টটল, সেইন্ট পল ও অতীতের সকল একেশ্বরবাদী দার্শনিকদের বিপরীতে তিনি সৃষ্টিকে পুরোপুরি ঈশ্বরবিহীন আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃতিতে কোনও পরিকল্পনা নেই। প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব বিশৃঙ্খল, বুদ্ধিমান পরিকল্পনার কোনও চিহ্নই প্রকাশ করে না। সুতরাং, আমাদের পক্ষে প্রকৃতি হতে প্রথম নীতিমালা সম্পর্কে কোনও রকম নিশ্চয়তা বের করা অসম্ভব। সম্ভাব্যতা বা সম্ভাবনার পেছনে নষ্ট করার মতো সময় দেকার্তের ছিল না: তিনি গণিত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় এমন নিশ্চয়তার সন্ধান করতে চেয়েছিলেন। এটা সহজ ও স্বব্যাখ্যাত প্রস্তাবনায়ও পাওয়া যেতে পারে, যেমন: 'যা হয়ে গেছে তা আর বদলানো যাবে না,' অনস্বীকার্যভাবে সত্য। এইভাবে তিনি একটা লাকড়ির চুলোর পাশে বসে ধ্যান করার সময় সেই বিখ্যাত প্রবাদের সন্ধান পেয়েছিলেন: *Cogito, crgo sum;* আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি। প্রায় বার শতাব্দী আগের অগাস্তিনের মতো মানবীয় চেতনায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন দেকার্তে; এমনকি সন্দেহও সন্দেহকারীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে! বাহ্যিক জগতের

কোনও কিছু সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না, কিন্তু আমাদের অন্তরের অনুভূতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। দেকার্তের যুক্তি আনসেল্ম-এর অন্টোলজিক্যাল প্রমাণেরই পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়। আমরা যখন সন্দেহ করি, তখন অহমের সীমাবদ্ধতা ও প্রকৃতি প্রকাশিত হয়। তা সত্ত্বেও 'সম্পূর্ণতা' সম্পর্কে আমাদের পূর্ব ধারণা না থাকলে আমরা 'অসম্পূর্ণতা'র ধারণায় পৌঁছতে পারি না। আনসেল্মের মতো দেকার্তেও উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে, অস্তিত্বহীন সম্পূর্ণতার এক পর্যায়ে স্ববিরোধীতে পরিণত হবে। সুতরাং, আমাদের সন্দেহের অনুভূতি আমাদের বলে যে এক পরম ও সম্পূর্ণ সত্তা–ঈশ্বর–থাকতে বাধ্য।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের এই 'প্রমাণ' থেকে দেকার্তে ঈশ্বরের রূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে সত্য উদ্ধারে অগ্রসর হয়েছেন, ঠিক যেভাবে গাণিতিক প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন। তাঁর *ডিসকোর্স অন মেথড*-এ তিনি যেমন বলেছেন, 'অন্তত এটা নিশ্চিত যে সম্পূর্ণ সত্তা, জ্যামিতির যে কোনও সম্ভাব্য উপস্থাপনের মতোই আছেন।'[৮] ইউক্লিদিয় ত্রিভূজের তিন কোণের সমষ্টি যেমন দুই সমকোণের সমান হতে বাধ্য, ঠিক তেমনি দেকার্তের সম্পূর্ণ সত্তার নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী থাকতে বাধ্য। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, আমাদের এই বিশ্বের একটা বস্তুগত বাস্তবতা ও একজন সম্পূর্ণ ঈশ্বর রয়েছেন, যিনি অবশ্যই সত্যময় এবং আমাদের প্রতারিত করবেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে জগতকে ব্যবহার করার বদলে দেকার্তে বিশ্বের বাস্তবতায় বিশ্বাস অর্জনের জন্যে ঈশ্বরের ধারণাকে ব্যবহার করেছেন। দেকার্তে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে পাসকালের মতো একই মাত্রায় জগৎ হতে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছিলেন। পৃথিবীর দিকে হাত বাড়ানোর বদলে তাঁর মন অন্তরমুখী হয়েছে। যদিও ঈশ্বরের ধারণা মানুষকে তার আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয় ও তা দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্বের জন্যে অত্যাবশ্যক ছিল কিন্তু কার্টেসিয়ান পদ্ধতি এক বিচ্ছিন্নতা ও স্বায়ত্তশাসনের ইমেজ তুলে ধরে আমাদের শতকে যা মানুষের পাশ্চাত্য ভাবমূর্তির কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জগৎ হতে বিচ্ছিন্নতা ও এক গর্বিত সম্পূর্ণতা বহু নারী-পুরুষকে নির্ভরশীল করে তোলা ঈশ্বরের সামগ্রিক ধারণাটিকেই প্রত্যাখ্যানে প্ররোচিত করবে।

একেবারে সূচনা থেকেই ধর্ম মানুষকে পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও এর মাঝে শেকড় বিস্তারে সাহায্য করে এসেছে। পবিত্র স্থানের কাল্ট জগৎ সম্পর্ক সকল ভাবনার পূর্ববর্তী ছিল এবং নারী-পুরুষকে এক ভীতিকর বিশ্বে একটা লক্ষ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর দেবত্ব আরোপ বিস্ময় ও ভয়ের প্রকাশ হিসাবে কাজ করেছে যা জগতের প্রতি মানুষের সাড়া প্রদানের অংশ ছিল। এমনকি অগাস্তিনও বেদনাময়

আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও পৃথিবীকে বিস্ময়কর সৌন্দর্যে ভরপুর আবিষ্কার করেছিলেন। দেকার্তে, যার দর্শন অগাস্তিনের অন্তর্মুখী ট্র্যাডিশনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ ছিল না তাঁর; যে কোনও মূল্যে রহস্যময়তার অনুভূতি এড়িয়ে যেতে হবে, কারণ তা সভ্য মানুষ অতিক্রম করে এসেছে। তাঁর *লেস মেতিওরেস* নিবন্ধের সূচনায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, 'আমাদের সমপর্যায়ের বা নিম্নস্তরের বস্তুর চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের জিনিসের প্রতি বেশি শ্রদ্ধা থাকাটা'[৯] আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং কবি ও শিল্পীগণ মেঘমালাকে ঈশ্বরের আসন হিসাবে তুলে ধরেছেন, কল্পনা করেছেন ঈশ্বর মেঘের ওপর শিশির কণা ঝরাচ্ছেন বা নিজ হাতে পাথরের ওপর বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করেছেন;

> এটা আমার মনে এই আশার সৃষ্টি করেছে যে, আমি যদি এমনভাবে মেঘের প্রকৃতি বর্ণনা করি যেখানে আমাদের ও এগুলোর মাঝে দেখা কোনও কিছুর বা ওগুলো থেকে নেমে আসা কোনও কিছুর প্রতি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকানোর অবকাশ থাকবে না, তাহলে আমরা সহজেই বিশ্বাস করব যে, একইভাবে পৃথিবীর ওপর সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় সবকিছুর মূল কারণ একইভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব।

AMARBOI.COM

মেঘ, বাতাস, কুয়াশা ও বিদ্যুৎকে তুচ্ছ ঘটনা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন দেকার্তে, 'বিস্ময়ের যে কোনও কারণ'[১০] অপসারণ করার জন্যে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। অবশ্য দেকার্তের ঈশ্বর ছিলেন দার্শনিকদের ঈশ্বর যিনি পার্থিব ঘটনাপ্রবাহের কোনও আমল দেননি। ঐশীগ্রন্থে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর মাঝে নয় বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত চিরন্তন বিধির মাঝেই নিজেকে প্রকাশ করেন তিনি: *লেস মেতিওরেস*-এ প্রাচীন ইসরায়েলিরা মরুভূমিতে যে মান্না গেয়েছিল তাঁকে এক ধরনের শিশির বলেও বর্ণনা করেছেন দেকার্তে। এভাবেই জন্ম হয়েছিল বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ও মিথের যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার ভেতর দিয়ে বাইবেলের 'সত্যতা' প্রমাণ করার অসম্ভব ধরনের অ্যাপোলজেটিক্সের। উদাহরণ স্বরূপ, জেসাসের পাঁচ হাজার মানুষকে খাওয়ানোর ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে উপস্থিত জনতাকে গোপনে খাবার নিয়ে আনায় জেসাসের ভর্ৎসনা করে সবার সঙ্গে ভাগ করে খাবার নির্দেশ হিসাবে। এর পেছনের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে বাইবেলিয় বিবরণের মূল সূর–প্রতীকধর্মীতা–ক্ষুণ্ন হয়েছে।

দেকার্তেই সব সময় রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিধি-বিধান মানার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। নিজেকে অর্থডক্স ক্রিশ্চান ভাবতেন তিনি। বিশ্বাস ও যুক্তির

মাঝে কোনও বিরোধ দেখেননি। তিনি তাঁর নিবন্ধ *ডিসকোর্স অন মেথড*-এ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এমন একটা পদ্ধতি আছে যা মানবজাতিকে সকল সত্য খুঁজে পেতে সক্ষম করে তুলবে। কোনও কিছুই এর নাগালের বাইরে নয়। সে জন্যে যা প্রয়োজন–যে কোনও শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই–সেই পদ্ধতি ব্যবহার করলেই জ্ঞানের একটি নির্ভরযোগ্য রূপ গড়ে তোলা সম্ভব হবে যার ফলে সকল বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা দূর হয়ে যাবে। রহস্যময়তা তালগোলে পরিণত হয়েছিল, এবং যে ঈশ্বরকে পূর্ববর্তী যুক্তিবাদীরা অন্য ঘটনাবলী হতে আলাদা হিসাবে দেখার ব্যাপারে যত্নবান ছিল সেগুলোকেই এবার মানবীয় চিন্তাশক্তির অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। সংস্কারের গোঁড়ামিপূর্ণ আলোড়ন সৃষ্টির আগে ইউরোপে রহস্যময়তা শেকড় গেড়ে ওঠার অবসর পায়নি। ফলে রহস্য ও মিথলজির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকা আধ্যাত্মিকতা, নামেই বোঝা যায় এর সঙ্গে রহস্য ও মিথলজি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, পশ্চিমের বহু ক্রিশ্চানের কাছে অচেনা ছিল। এমনকি দেকার্তে চার্চের অতিন্দ্রীয়বীর সংখ্যা ছিল বিরল, তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হতো। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ওপর অস্তিত্ব নির্ভরশীল অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর দেকার্তের মতো ব্যক্তির কাছে একেবারেই অচেনা ছিলেন, যাঁর কাছে ধ্যানের অর্থ ছিল পুরোপুরি বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড।

ঈশ্বরকে নিজস্ব যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সীমিতকারী ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী ইসাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) একইভাবে খ্রিস্টান ধর্মকে রহস্যময়তা হতে মুক্ত করতে উদগ্রীব ছিলেন। গণিত নয়, তাঁর সূচনা বিন্দু ছিল মেকানিক্স, কেননা জ্যামিতিতে দক্ষতা অর্জনের আগে একজন বিজ্ঞানীকে নিখুঁতভাবে বৃত্ত আঁকা শিখতে হয়। দেকার্তে যেখানে সত্তা, ঈশ্বর, এই প্রাকৃতিক জগতের অস্তিত্ব, এই ক্রমানুসারেই প্রমাণ করেছিলেন, সেখানে নিউটন শুরু করেছিলেন ভৌত জগৎ ব্যাখ্যার প্রয়াস দিয়ে যেখানে ঈশ্বর এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ। নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞানে প্রকৃতি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, ঈশ্বরই ছিলেন সকল ক্রিয়াকর্মের একক উৎস। এভাবে অ্যারিস্টটলের মতবাদের মতো ঈশ্বর ভৌত নিয়মনীতির ধারাবাহিকতা মাত্র। নিউটন তাঁর বিখ্যাত রচনা *ফিলোসফিয়া নেচারালিস প্রিন্সিপিয়া (দ্য প্রিন্সিপলস্ অভ ন্যাচারাল ফিলোসফি)* (১৬৮৭)য় গাণিতিক পরিভাষায় এমনভাবে বিভিন্ন মহাজাগতিক ও পার্থিব বস্তুর সম্পর্ক বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন যাতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গঠন করা যায়। নিউটন আবিষ্কৃত মহাকর্ষ বলের ধারণা তাঁর ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ বা উপাদানকে একত্রিত করেছে। মহাকর্ষ বলের ধারণায় কোনও কোনও বিজ্ঞানী রুষ্ট হয়েছিলেন, নিউটনের বিরুদ্ধে অ্যারিস্টটলের বস্তুর আকর্ষণী ক্ষমতার ধারণায় ফিরে যাবার অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁরা। এমন দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত প্রটেস্ট্যান্ট ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। নিউটন এ অভিযোগ

AMARBOI.COM

প্রত্যাখ্যান করেন: এক সার্বভৌম ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর ব্যবস্থার মূল, কেননা এমন একজন স্বর্গীয় মেকানিকের অস্তিত্ব ছাড়া এর অস্তিত্বই থাকত না।

মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করার সময় পাসকাল ও দেকার্তের বিপরীতে নিউটন নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। মহাজাগতিক বস্তুগুলো পারস্পরিক মহাকর্ষ বলের টানে এক বিশাল গোলাকৃতি বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়নি কেন? কারণ এ ব্যাপারটি ঠেকাতেই এগুলোকে অসীম মহাশূন্যে যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে সযত্নে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর বন্ধু সেইন্ট পল-এর ডিন রিচার্ড বেন্টলির কাছে যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, একজন স্বর্গীয় 'তত্ত্বাবধায়ক' ছাড়া এটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত: 'আমার মনে হয় না কেবল প্রাকৃতিক শক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব, বরং আমি এর জন্যে একে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এজেন্টের পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি।'[১১] একমাস পর, বেন্টলিকে আবার লিখেছিলেন তিনি: 'অভিকর্ষ গ্রহগুলোকে চলমান করে থাকতে পারে, কিন্তু একটি ঐশী ক্ষমতা ছাড়া ওগুলো যেভাবে সূর্যের চরদিকে ঘুরছে তেমন ঘূর্ণন অর্জন সম্ভব ছিল না, সুতরাং এ কারণে এবং অন্যান্য যুক্তি দিয়েও আমি এই 'ব্যবস্থা'র জন্যে একজন বুদ্ধিমান এজেন্টের উপস্থিতি মানতে বাধ্য হচ্ছি।'[১২] উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর ঘণ্টায় এক হাজার মাইলের বদলে মাত্র একশ মাইল বেগে ঘুরলে রাতের দৈর্ঘ্য হতো দশগুণ বেশি আর পৃথিবী এত ঠাণ্ডা থাকত যার ফলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না: দীর্ঘ দিনের সময় প্রচণ্ড উত্তাপ সমস্ত খেতখামার পুড়িয়ে দিত। যে সত্তাটি সবকিছু এত নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করেছেন তিনি মহাবুদ্ধিধর একজন মেকানিক হতে বাধ্য। বুদ্ধিমান হওয়া ছাড়াও এই এজেন্টকে এই বিশাল বস্তুসমূহকে সামাল দিতে যথেষ্ট শক্তিমান হতে হয়েছে। নিউটন উপসংহার টেনেছেন: এই অসীম ও জটিল ব্যবস্থাকে গতি দানকারী আদিম শক্তি ছিল *দোমিনেশিও* যা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির জন্যে দায়ী, যা ঈশ্বরকে স্বর্গীয় করেছে। অক্সফোর্ডের আরবী ভাষার প্রথম অধ্যাপক এডওয়ার্ড পোকক নিউটনকে জানিয়েছিলেন যে লাতিন শব্দ *ডিউস* আরবী দু—প্রভু—শব্দ হতে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং ডেমিনিয়ন হচ্ছে ঈশ্বরের অত্যাবশ্যকীয় গুণ, সম্পূর্ণতা নয়, যা দেকার্তের ঈশ্বর আলোচনার সূচনা বিন্দু ছিল। *প্রিন্সিপিয়া*'র উপসংহার 'জেনারেল শোলিয়ামে' নিউটন ঈশ্বরের প্রচলিত গুণাবলীকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতা হতে উদ্ধার করেছেন:

> সূর্য, গ্রহ ও ধূমকেতুসমূহের এই সুন্দরতম ব্যবস্থা কেবল এক বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী সত্তার নির্দেশ ও কর্তৃত্ব হতেই সৃষ্টি হতে পারে...তিনি অনন্ত ও অসীম, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ; অর্থাৎ তাঁর স্থায়িত্ব অনাদি হতে অনন্তকাল

AMARBOI.COM

> পর্যন্ত; তাঁর অস্তিত্ব অসীম হতে অসীমে, তিনি সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, যা কিছু আছে বা থাকতে পারে তার সবই জানেন...আমরা কেবল তাঁর প্রাজ্ঞ ও অনন্য পরিকল্পনা ও চূড়ান্ত কারণ দ্বারাই তাঁকে জানি; আমরা তাঁকে তাঁর সম্পূর্ণতার জন্যে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা তাঁকে তাঁর কর্তৃত্বের জন্যে সম্মান ও মান্য করিঃ কারণ আমরা তাঁর দাস হিসাবে তাঁকে মান্য করি এবং কর্তৃত্ব, দূরদর্শিতা ও চূড়ান্ত কারণ বিহীন একজন ঈশ্বর নিয়তি ও প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নন। অন্ধ মেটাফিজিক্যাল প্রয়োজন, যা অবশ্যই সর্বত্র ও সবসময় এক রকম, বস্তুর মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাকৃতির বস্তুসমূহে আমরা যে বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করি, যা বিভিন্ন কালে ও স্থানের সঙ্গে মানানসই তা কেবল অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অস্তিত্বমান সত্তার ধারণা আর ইচ্ছা হতেই সৃষ্টি হতে পারে।[১৩]

নিউটন বাইবেলের উল্লেখ করেননিঃ আমরা কেবল জগৎ সম্পর্কে ধ্যানের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে জানতে পারি। এতদিন পর্যন্ত সৃষ্টি সংক্রান্ত মতবাদ এক আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করে এসেছিলঃ ইহুদিবাদ ও খৃস্টধর্ম উভয়েই দেরিতে সংযুক্ত হয়েছে এটা এবং বরাবরই কিছুটা সমস্যাসঙ্কুল ছিল। নতুন বিজ্ঞান এবার সৃষ্টিকে মঞ্চের কেন্দ্রে নিয়ে এল এবং ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে মতবাদের আক্ষরিক ও যান্ত্রিক উপলব্ধিকে মূল বিষয়ে পরিণত করল। আজকের দিনে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার সময় প্রায়শঃই নিউটনের বিশ্ব জগতের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক ঈশ্বরকেই প্রত্যাখ্যান করে থাকে। বিজ্ঞানীরা এই ঈশ্বরকে আর মেনে নিতে পারছেন না।

নিজের ব্যবস্থায় ঈশ্বরকে স্থান দেওয়ার জন্যে স্বয়ং নিউটন কিছু বিস্ময়কর সমাধানের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁর ব্যবস্থাটি প্রকৃতির কারণেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। মহাশূন্য অপরিবর্তনীয় ও অসীম হলে—তাঁর ব্যবস্থার দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য—সেখানে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? মহাশূন্যই এক অর্থে স্বর্গীয় নয়, যেহেতু এর অনন্ত ও অসীমতার গুণ আছে? এটা কী তবে দ্বিতীয় স্বর্গীয় সত্তা, সময়ের সূচনা কাল হতেই যা ঈশ্বরের সঙ্গে বিরাজমান ছিল? এই সমস্যা সম্পর্কে আগাগোড়া সচেতন ছিলেন নিউটন। প্রথমদিকের রচনা *দে গ্রাভিতেশনে এত্ অ্যাকিউপন্দিও ফ্লুইদোরাম*-এ তিনি উৎসারণের প্লেটোনিক তত্ত্বে ফিরে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর যেহেতু অসীম, নিশ্চয়ই তিনি সর্বত্র বিরাজমান। মহাশূন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের ফল, ঐশী সর্বব্যাপীতা হতে চিরন্তনভাবে উৎসারিত হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে এর সৃষ্টি হয়নি, বরং তাঁর সর্বব্যাপী সত্তার অনিবার্য পরিণতি বা বিস্তার হিসাবে এটা অস্তিত্বমান ছিল। একইভাবে, স্বয়ং ঈশ্বর সময় ও স্থান গঠন করেছেন যার মাঝে আমরা

বাঁচি, চলাফেরা করি, অস্তিত্ব লাভ করি। অন্যদিকে সৃষ্টির প্রথম দিনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঈশ্বর কর্তৃক বস্তুর সৃষ্টি। কেউ চাইলে, একথা বলতে পারে যে, তিনি মহাশূন্যের কোনও কোনও স্থানকে আকার, ঘনত্ব, স্পর্শবোধ ও সহিষ্ণুতা দিয়ে গুণান্বিত করেছেন। শূন্য হতে সৃষ্টির খৃস্টীয় মতবাদের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব, কেননা ঈশ্বর মহাশূন্য হতে বস্তুগত বিষয়সমূহকে অস্তিত্ব দিয়েছেন: শূন্য হতেই বস্তু উৎপাদন করেছেন তিনি।

দেকার্তের মতো নিউটনেরও রহস্যময়তার প্রতি দুর্বলতা ছিল না, একে তিনি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সমতুল্য বলেছেন। খৃস্টধর্মকে অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করতে উদগ্রীব ছিলেন তিনি, তাতে খৃস্টীয় ঐশ্বরিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ মতবাদসমূহের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হলেও। ১৬৭০ দশকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে ট্রিনিটির মতবাদ নিয়ে ধর্মতত্ত্বীয় গবেষণা শুরু করেছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আথানাসিয়াস প্যাগান ধর্মান্তরিতদের আকৃষ্ট করার জন্যে এটাকে চার্চের ওপর আরোপ করেছিলেন। আরিয়াসই সঠিক ছিলেন: জেসাস ক্রাইস্ট অবশ্যই ঈশ্বর ছিলেন না; ওল্ড টেস্টামেন্টের সেসব অনুচ্ছেদ ট্রিনিট্রির মতবাদ ও অবতারের ধারণা 'প্রমাণে'র জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলো সঠিক নয়। আথানাসিয়াস ও তাঁর সহকর্মীরা এগুলো বানিয়ে ঐশীগ্রন্থে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং এভাবে সাধারণ মানুষের মূল, আদিম কল্পনায় আবেদন সৃষ্টি করেছিলেন: 'মানুষের মনের উত্তপ্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অংশটি ধর্মীয় ব্যাপারে রহস্যময়তার প্রতি চিরদিনই দুর্বল; এ কারণে তারা যা সবচেয়ে কম বোঝে সেটাই বেশি পছন্দ করে।'[১৪] খৃস্টধর্ম থেকে এই বিভ্রান্তি দূর করা নিউটনের এক বিকারে পরিণত হয়েছিল। ১৬৮০ দশকের গোড়ার দিকে *প্রিন্সিপিয়া* প্রকাশের অল্পদিন আগে একটা প্রবন্ধের কাজ শুরু করেছিলেন নিউটন, তিনি যেটার নাম দিয়েছিলেন, *দ্য ফিলোসফিক্যাল অরিজিন্স অভ জেন্টাইল থিওলজি*। এখানে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, নোয়াহ্ আদিম ধর্ম–এক জেন্টাইল ধর্মতত্ত্ব–প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা কুসংস্কারমুক্ত ছিল এবং এক একক ঈশ্বরের যৌক্তিক প্রার্থনার পক্ষে কথা বলেছেন। একমাত্র নির্দেশনা ছিল ঈশ্বরের ভালোবাসা ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের একমাত্র মন্দির প্রকৃতি নিয়ে ভাবার নির্দেশ ছিল। পরবর্তী প্রজন্মগুলো এই অবিমিশ্র ধর্মটিকে অলৌকিক আজগুবি গল্প দিয়ে দুষিত করেছে। কেউ কেউ আবার বহুঈশ্বরবাদীতা ও কুসংস্কারের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর বারবার মানুষকে আবার সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য পয়গম্বরদের প্রেরণ করেছেন। পিথাগোরাস এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে পেরে তা পশ্চিমে নিয়ে আসেন। মানুষকে সত্য পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রেরিত পয়গম্বরদের একজন ছিলেন জেসাস, কিন্তু

AMARBOI.COM

তাঁর খাঁটি ধর্ম আথানাসিয়াস ও তাঁর সহচররা দূষিত করেছেন। বুক অভ রিভেলেশনে ত্রিত্ববাদের উত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে—'তোমাদের পশ্চিমের অদ্ভুত এই ধর্ম,' 'তিনজন সমান ঈশ্বরের কাল্ট'—ধ্বংসের বিভীষিকা হিসাবে।[১৫]

পশ্চিমে ক্রিশ্চানরা ট্রিনিটির মতবাদ বরাবরই জটিল বলে আবিষ্কার করেছে। তাদের নতুন যুক্তিবাদ আলোকন পর্বের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের এটা পরিত্যাগে উদগ্রীব করে তোলে। ধর্মীয় জীবনে রহস্যময়তার ভূমিকা নিউটনের বোধের অতীত ছিল। গ্রিকরা ট্রিনিটিকে মনকে বিস্ময়াভিভূত করে রাখতে এবং মানুষের বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের প্রকৃতি উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব নয়, একথা মনে করিয়ে দিতে ব্যবহার করেছিল। নিউটনের মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অবশ্য এই ধরনের মনোভাব পোষণ করা খুবই কঠিন ছিল। বিজ্ঞানের সুবাদে মানুষ শিখছিল যে, সত্য জানার জন্যে তাদেরকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করার জন্যে অতীতকে বাতিল করতে তৈরি থাকতে হবে। অবশ্য শিল্পকলার মতো ধর্মের ক্ষেত্রেও বর্তমানকে দেখার একটা দৃষ্টিকোণ পাওয়ার জন্যে অতীতের সঙ্গে সংলাপ সংশ্লিষ্ট। ঐতিহ্য বা প্রথা নারী-পুরুষকে একটা সূচনা বিন্দু হতে অগ্রসর হতে সক্ষম করে তোলে যার ফলে সে জীবনের চূড়ান্ত অর্থ সম্পর্কে চিরন্তন জিজ্ঞাসা নিয়ে ভাবতে পরে। সুতরাং, ধর্ম ও শিল্পকলা বিজ্ঞানের মতো কাজ করে না। অবশ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্রিশ্চানরা খৃস্টধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু করে নিউটনের মতো একই সমাধানে পৌঁছে। ইংল্যান্ডের ম্যাথু টিন্ডাল ও জন টোল্যান্ডের মতো চরমপন্থী ধর্মতাত্ত্বিকগণ ফের মূলে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, খৃস্টধর্মকে রহস্যমুক্ত করে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। *ক্রিশ্চানিটি নট মিস্ট্রিয়াস* (১৬৯৬)-এ টোল্যান্ড যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রহস্য কেবল 'স্বেচ্ছাচারিতা ও কুসংস্কারের দিকে'[১৬] চালিত করে। ঈশ্বর নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশে অক্ষম চিন্তা করা হবে আক্রমণাত্মক। ধর্মকে অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে। *ক্রিশ্চানিটি অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ ক্রিয়েশন* (১৭৩০)-এ নিউটনের মতো আদি ধর্ম সৃষ্টি ও পরবর্তীকালের সংযোজনসমূহ বাদ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন টিন্ডাল। যৌক্তিকতাই ছিল সকল সত্য ধর্মের কষ্টিপাথর: 'সৃষ্টির আদি থেকেই আমাদের সবার হৃদয়ে প্রকৃতি ও যুক্তির একটা ধর্ম হয়ে আছে যার মাধ্যমে মানুষকে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে বিচার করে দেখতে হবে।'[১৭] পরিণাম হিসাবে প্রত্যাদেশ অপ্রয়োজনীয়, কেননা আমাদের নিজস্ব যৌক্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য জানা সম্ভব; ট্রিনিটি ও অবতারবাদের মতো রহস্যগুলোর নিখুত যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে; এগুলোকে সাধারণ বিশ্বাসীদের কুসংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক গীর্জার দাস করে রাখার জন্যে ব্যবহার করা উচিত নয়।

AMARBOI.COM

এসব চরম ধারণা গোটা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে একদল নতুন ইতিহাসবিদ বস্তুনিষ্ঠভাবে চার্চের ইতিহাস পর্যালোচনা শুরু করেছিলেন। এভাবে ১৬৯৯ সালে গটফ্রাইড আরনল্ড তাঁর নিরপেক্ষ *হিস্ট্রি অভ দ্য চার্চেস ফ্রম দ্য বিগিনিং অভ দ্য নিউ টেস্টামেন্ট টু সিক্সটিন এইটি এইট* প্রকাশ করেছিলেন। এখানে তিনি যুক্তি দেখান যে, বর্তমানে যাকে অর্থডক্স বিবেচনা করা হচ্ছে আদিম চার্চে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ইয়োহান লরেনয ফন মোশিম (১৬৯৪-১৭৫৫) তাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ রচনা *ইন্সটিটিউশনস অভ এক্লিসিয়েস্টিক্যাল হিস্ট্রি* (১৭২৬)-তে পরিকল্পিতভাবে ইতিহাসকে ধর্মতত্ত্ব হতে আলাদা করে নেন এবং সত্যতা প্রতিপাদন ছাড়াই মতবাদের বিকাশ তুলে ধরেন। জর্জ ওয়ালশ জিওভান্নি বাট ও হেনরি নরিসের মতো ইতিহাসবিদগণ আরিয়ানিজম, *ফিলিওক* বিরোধ এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বিভিন্ন খৃষ্টতত্ত্বীয় বিতর্ক ও জটিল মতবাদগত বিতর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। ঈশ্বর ও ক্রাইস্টের প্রকৃতি সংক্রান্ত মৌলিক ডগমাসমূহ শত শত বছর সময় পরিক্রমায় সৃষ্টি হয়েছে, নিউ টেস্টামেন্টের এগুলো অস্তিত্ব নেই জানতে পেরে বহু বিশ্বাসী অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল; তবে মানে কি এগুলো ভুয়া ছিল? অন্যরা আরও অগ্রসর হয়ে খোদ নিউ টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রেই নতুন বস্তুনিষ্ঠতা প্রয়োগ করেছে। হারমান স্যামুয়েল রিমারুস (১৬৯৪-১৭৬৮) স্বয়ং জেসাসের একটি সমালোচনামূলক জীবনী রচনারই প্রয়াস পেয়েছিলেন: ক্রাইস্টের মানব রূপের প্রশ্নটি আর অতিন্দ্রীয়বাদী বা মতবাদগত বিষয় ছিল না বরং যুক্তির কালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটার পর সত্যিকার অর্থে সংশয়বাদের আধুনিক কাল সুচিত হলো। রিমারাস যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, জেসাস কেবল একটি ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মেসিয়ানিক মিশন ব্যর্থ হলে তিনি হতাশায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, গস্পেলে জেসাস কখনও মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আসার কথা বলেননি যা পাশ্চাত্য খৃস্টধর্মের মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই ধারণা কেবল খৃস্টধর্মের আসল প্রতিষ্ঠাতা সেইন্ট পল পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং, জেসাসকে ঈশ্বর হিসাবে মানা উচিত হবে না আমাদের, বরং তাঁকে একজন 'উল্লেখযোগ্য, সাধারণ, মহান ও ব্যবহারিক ধর্মের'[১৮] শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

এসব বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং এখানে ধর্ম বিশ্বাসের প্রতীকী বা উপমাগত প্রকৃতি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এ ধরনের সমালোচনা শিল্পকলা বা কাব্যের সমালোচনার মতোই অপ্রাসঙ্গিক বলে আপত্তি জানাতে পারেন কেউ। কিন্তু বহু লোকের কাছে বৈজ্ঞানিক চেতনা মানদণ্ডে পরিণত হওয়ার পর অন্য কোনওভাবে গস্পেল পাঠ

তাদের জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের আক্ষরিক উপলব্ধির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে মিথ থেকে অপরিবর্তনীয়ভাবে পিছু হটে আসে: কোনও গল্প বাস্তবিকই সত্য হবে নইলে সেটি বিভ্রান্তি। ধর্মের মূল সম্পর্কিত প্রশ্ন, বলা যায়, বুদ্ধদের চেয়ে ক্রিশ্চানদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্ববহ ছিল, কারণ তাদের একেশ্বরবাদী ট্র্যাডিশন সবসময় দাবি করে এসেছে যে, ঈশ্বর ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে প্রকাশিত হয়েছেন। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক যুগে ক্রিশ্চানদের সংহতি বজায় রাখতে হলে এসব প্রশ্নের মোকাবিলার প্রয়োজন ছিল। টিন্ডাল বা মারসের তুলনায় প্রচলিত বিশ্বাস লালনকারী কোনও কোনও ক্রিশ্চান ঈশ্বর সম্পর্কে পশ্চিমের প্রচলিত উপলব্ধিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করে। লুথারান জন ফ্রাইডম্যান মেয়ার তাঁর *উইটেনবার্গ'স ইনোসেন্স অভ আ ডাবল মার্ডার* (১৬৮১)-এ লেখেন যে, আনসেল্ম বর্ণিত প্রায়শ্চিত্তের প্রচলিত মতাবাদ যেখানে ঈশ্বরকে আপন পুত্রের মৃত্যু কামনাকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি ঐশী সত্তা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা তুলে ধরে। তিনি 'ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর', 'ক্ষুব্ধ ঈশ্বর' ও 'তিক্ত ঈশ্বর' যার কঠিন ক্ষতি পূরণের দাবি বহু ক্রিশ্চানকে আতঙ্কে ভরিয়ে তুলেছে এবং তাদের নিজস্ব 'পাপপূর্ণতা'[১৯] হতে সরে আসার শিক্ষা দিয়েছে। ক্রিশ্চান ইতিহাসের এসব নিষ্ঠুরতা দেখে ক্রিশ্চানরা অধিক হারে বিব্রত বোধ করেছে যে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের নামে ইতিহাসের ভীতিকর ক্রুসেড, ইনকুইজিশন ও অত্যাচার চালানো হয়েছে। অর্থডক্স মতবাদে বিশ্বাস করার জন্যে মানুষের ওপর অত্যাচার চালানোর ব্যাপারটি বিশেষ করে উদারতা ও বিবেকের স্বাধীনতার প্রতি অনুরক্ত একটা সময়ে আতঙ্কজনক মনে হয়েছে। সংস্কারের কারণে সূচিত রক্তপাত ও এর পরবর্তী পরিস্থিতি যেন ছিল শেষ অবলম্বন।

যুক্তিকেই একমাত্র উত্তর মনে হয়েছে। তারপরেও রহস্যময়তাহীন একজন ঈশ্বর যে রহস্য তাঁকে শত শত বছর অন্যান্য ধর্মের কার্যকর ধর্মীয় মূল্যে পরিণত করে করেছে, অধিকতর কল্পনাশক্তির ও সহজাত প্রকৃতির অধিকারী ক্রিশ্চানদের কাছে আবেদন রাখতে পারবেন? পিউরিটান কবি জন মিল্টন (১৬০৮-৭৪) চার্চের অসহিষ্ণুতার রেকর্ড জেনে বিশেষভাবে বিব্রত বোধ করেছিলেন। আপন সময়ের প্রকৃত মানুষ মিল্টন তাঁর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ *অন ক্রিশ্চান ডকট্রিন*-এ সংস্কারকে সংস্কার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন ও নিজের জন্যে এমন একটি ধর্মীয় বিশ্বাস আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যা অন্যদের বিশ্বাস ও বিবেচনার উপর নির্ভরশীল নয়। ট্রিনিটির মতো প্রচলিত মতবাদসমূহ সম্পর্কেও সন্দিহান ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও এটা তাৎপর্যপুর্ণ যে তাঁর মাস্টারপিস *প্যারাডাইস লস্ট*-এর প্রকৃত নায়ক স্বয়ং স্যাটান, ঈশ্বর নন, মানুষের কাছে যার কাজ ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তিনি। ইউরোপের নতুন মানুষের বহু গুণাগুণ রয়েছে

স্যাটানের: সে কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে, অজানার বিরুদ্ধে নিজেকে স্থাপন করে ও নরক হতে নতুন সৃষ্ট পৃথিবীর ভেতর দিয়ে যাত্রার সময় প্রথম অভিযাত্রীতে পরিণত হয়। অবশ্য মিল্টনের ঈশ্বর যেন পশ্চিমের অক্ষরবাদিতার সহজাত অবাস্তবতা প্রকাশ করেন। ট্রিনিটির অতিন্দ্রীয়বাদী উপলব্ধি ছাড়া পুত্রের অবস্থান এই কবিতায় একেবারে দ্ব্যর্থবোধক রয়ে যায়। এটা মোটেই পরিষ্কার নয় যে, তিনি দ্বিতীয় স্বর্গীয় সত্তা নাকি দেবদূতদের মতো সৃষ্টি, যদিও কিছুটা উচ্চ মর্যাদার। যে কোনও অবস্থায় তিনি ও পিতা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা যাদের পরস্পরের উদ্দেশ্য জানতে ক্লান্তিকর দীর্ঘ কথোপথনে লিপ্ত হতেই হবে, যদিও পুত্র পিতার স্বীকৃত বাণী ও প্রজ্ঞা।

তবে পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ঈশ্বরের পূর্ব-ধারণা নিয়ে মিল্টনের ভূমিকা তাঁর স্রষ্টাকে অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। যেহেতু প্রয়োজনের খাতিরেই ঈশ্বর আগে থেকে আদম ও ইভের পতন হবে বলে জানতেন—এমনকি স্যাটান পৃথিবীতে পৌঁছার আগেই—তিনি নিশ্চয়ই সেই ঘটনার আগে নিজের কাজের ন্যায্যতা যাচাইয়ে মন দিয়েছেন। চাপিয়ে দেওয়া আনুগত্যে আনন্দ পাবেন না তিনি, পুত্রের কাছে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি আদম ও ইভকে স্যাটানের মোকাবিলা করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা, আত্মরক্ষামূলক যুক্তি দেখিয়েছেন ঈশ্বর, ন্যায্যত অভিযুক্ত করতে পারবে না:

তাদের স্রষ্টাকে বা তাদের সৃষ্টিকে বা তাদের নিয়তিকে
যেন পূর্ব নির্ধারিত নিয়তি
তাদের ইচ্ছাকে বাতিল করে দিয়েছে,
চূড়ান্ত আদেশ বা উচ্চ পূর্ব-জ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়েছে; তারা নিজেরাই নিজেদের বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়েছে; আমি নই:
যদি আমি আগে জানতাম,

তাদের অপরাধ বা ভুলের ওপর পূর্বজ্ঞানের কোনও প্রভাব ছিল না;
যা নির্দিষ্ট কিছু পূর্বে অজানাকে প্রমাণ করেছে...

আমি তাদের স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছি,
অবশ্যই ওদের মুক্তই থাকতে হবে,
যতক্ষণ না নিজেরাই নিজেদের বন্দি করছে; না হয় আমাকে অবশ্যই তাদের স্বভাব পাল্টে দিতে হবে ও অপরিবর্তনীয় চিরন্তন, পরম নির্দেশকে নাকচ করতে হতো
যা তাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে;
তারা নিজেরাই নিজেদের পতন ডেকে এনেছে।[২০]

এই নিরস ভাবনাকে সম্মান দেখানো শুধু কঠিনই নয়, বরং ঈশ্বর আবির্ভূত হচ্ছেন একজন ঠাণ্ডা, আত্ম-নিরপেক্ষ ও সমবেদনাবিহীন সত্তা হিসাবে অথচ তাঁর ধর্মের সমবেদনাই জাগিয়ে তোলার কথা। ঈশ্বরকে আমাদের কারও মতো করে ভাবতে ও কথা বলতে বাধ্য করার মাঝে ঐশী সত্তাকে মানবরূপ ও ব্যক্তিক ধারণায় উপস্থাপনের ঘটনাও তুলে ধরে। এমন একজন ঈশ্বরের মাঝে এত বেশি স্ববিরোধিতা রয়েছে তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকেন না, তাই তাঁর শ্রদ্ধা পাবারও যোগ্যতা থাকে না।

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার মতো মতবাদসমূহের আক্ষরিক উপলব্ধি কোনও কাজে আসবে না। মিল্টনের ঈশ্বর কেবল শীতল আর আইননিষ্ঠই নন, তিনি ব্যাপকভাবে অনুপযুক্ত। *প্যারাডাইস লস্টের* শেষ দুই পর্বে ঈশ্বর আর্চঅ্যাঞ্জেল মাইকেলকে প্রেরণ করেন আদমকে তাঁর বংশধরদের মুক্তি লাভের ব্যাপারটি দেখিয়ে তাঁকে পাপের সান্ত্বনা দিতে। কতগুলো দৃশ্যের মাধ্যমে আদমের সামনে মুক্তির গোটা ইতিহাস উন্মোচিত হয়, যার ধারা বিবরণী দেন মাইকেল; তিনি কেইনের হাতে আবেলের মৃত্যু দেখেন, প্লাবন ও নোয়াহর কিস্তি, টাওয়ার অভ বাবেল, আব্রাহামের আহবান, মিশর থেকে এক্সোডাস ও সিনাই পর্বতে আইনের অবতরণ দেখতে পান। তোরাহর অসম্পূর্ণতা, যা শত শত বছর ধরে ঈশ্বরের মনোনীত হতভাগ্য জাতিকে নিপীড়ন করেছে, মিকাইল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, আরও আধ্যাত্মিক আইনের আকাঙ্ক্ষা করানোর একটা কৌশল। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মুক্তি লাভের এই বিবরণ অগ্রসর হওয়ার সময়–রাজা ডেভিডের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, বাবিলনে এক্সোডাস, খৃস্টের জন্ম লাভ, ইত্যাদির মাধ্যমে–পাঠকের মনে হয় মানুষকে উদ্ধার করার নির্ঘাৎ আরও সহজ ও অধিকতর প্রত্যক্ষ উপায় ছিল। এই ক্রমাগত ব্যর্থতা ও ভ্রান্তিময় সূচনা সম্বলিত অত্যাচারী পরিকল্পনাটি আগাম নির্ধারিত–এই সত্যটি এর প্রণেতার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে। মিল্টনের ঈশ্বর সামান্য আস্থাই সঞ্চার করেন। এটা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ যে *প্যারাডাইস লস্টের* পর আর কোনও প্রধান ইংরেজ সৃজনশীল লেখক অতিপ্রাকৃত জগত বর্ণনার প্রয়াস পাননি। এরপর আর কোনও স্পেন্সারস বা মিল্টনের দেখা মেলেনি। এরপর অতিপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক বিষয় জর্জ ম্যাকডোনাল্ড এবং সি. এস. লুইসের মতো অধিকতর প্রান্তিক লেখকদের জগতে পরিণত হয়। তারপরেও কল্পনার কাছে আবেদন সৃষ্টিতে অক্ষম ঈশ্বর বিপদাপন্ন হয়ে পড়েন।

*প্যারাডাইস লস্টে*র একেবারে শেষে আদম ও ইভ নিঃসঙ্গভাবে স্বর্গোদ্যান ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন। পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা অধিকতর সেক্যুলার যুগের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল, যদিও তখনও ঈশ্বর বিশ্বাস আঁকড়ে রেখেছিল তারা। যুক্তির নতুন ধর্ম ডেইজম (Deism) নামে পরিচিত

AMARBOI.COM

হবে। অতিন্দ্রীয়বাদ ও মিথের কল্পনা-নির্ভর অনুশীলনের কোনও অবকাশ এর ছিল না। প্রত্যাদেশের মিথ ও ট্রিনিটির মতো প্রচলিত 'রহস্যসমূহে'র দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এই ধর্ম, যা কিনা বহুদিন মানুষকে কুসংস্কারের শৃঙ্খলে বন্দি করে রেখেছিল। তার বদলে এটা নৈর্ব্যক্তিক 'ডিউসে'র প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেয়, যাঁকে নিজের প্রয়াস দিয়েই আবিষ্কার করতে পারে মানুষ। ফ্রাঁসোয়া মেরি দে ভলতেয়ার ছিলেন পরবর্তীকালে আলোকন হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠা এই আন্দোলনের প্রতিমূর্তি: তাঁর *ফিলসফিক্যাল ডিকশনারি* (১৭৬৪) তে এই আদর্শ ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি। এটা সর্বোপরি যথাসম্ভব সহজ হবে।

> যা বেশি নৈতিকতা শিক্ষা দেয় এবং সেটাই কি হওয়া উচিত নয়? যেটা মানুষকে অবাস্তব পরিণত না করেই গড়ে তুলতে চায়? যেটা কাউকে অসম্ভব, স্ববিরোধী ও অলৌকিকের প্রতি অবিবেচক এমন কিছুতে বিশ্বাস করার নির্দেশ দেয় না, যা জাতির জন্যে ক্ষতিকর ও যা সাধারণ জ্ঞান থাকার অপরাধে কাউকে চিরকালীন শাস্তি ও ভয় দেখাতে যায় না? সেটাই হওয়া উচিত নয় যেটি ঘাতকদের দ্বারা বিশ্বাস রক্ষা করে না এবং পৃথিবীকে বুদ্ধিহীন জ্ঞানের জন্যে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেয় না?... যা কেবল একজন ঈশ্বরের উপাসনার ন্যায় বিচার, সহিষ্ণুতা ও মানবতার শিক্ষা দেয়?[২১]

AMARBOI.COM

এই অস্বীকৃতির জন্যে চার্চগুলোর নিজেদের ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ করার উপায় ছিল না, কেননা শত শত বছর ধরে তারা বিশ্বাসীর ওপর হাজারো মতবাদের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এসেছে। প্রতিক্রিয়া ছিল অনিবার্য এবং ইতিবাচকও হতে পারে।

অবশ্য আলোকন পর্বের দার্শনিকরা ঈশ্বরের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁরা মানুষকে চিরন্তন আগুনের ভয় দেখিয়ে হুমকি দানকারী অর্থডক্সদের নিষ্ঠুর ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছিলেন। যুক্তির কাছে পরাজিত ঈশ্বর সংক্রান্ত রহস্যময় মতবাদসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু পরম সত্তায় তাঁদের বিশ্বাস অটুট রয়ে গিয়েছিল। ফারনিতে একটা শ্যাপেল নির্মাণ করেছিলেন ভলতেয়ার যার লিন্টেলে খোদাই করা ছিল *'দেও এরেক্সিত ভলতেয়ার'* এবং তিনি এ পর্যন্ত বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকলে তাঁকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াত।' *ফিলসফিক্যাল ডিকশনারিতে* তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, অসংখ্য উপাস্যে বিশ্বাস করার চেয়ে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে বেশি যৌক্তিক ও স্বাভাবিক ছিল। আদিতে বিচ্ছিন্ন গ্রাম আর সমাজে

জীবনযাপনকারী মানুষ মেনে নিয়েছিল যে একজন দেবতা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন: বহুঈশ্বরবাদীতা পরবর্তীকালের সংযোজন। বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক দর্শন উভয়ই পরম সত্তার অস্তিত্বের কথা বলে: 'এসব থেকে কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা?' *ডিকশনারির* 'নাস্তিকবাদ'—রচনার শেষে প্রশ্ন রেখেছেন ভলতেয়ার। তিনি নিজেই জবাব দিচ্ছেন:

> নাস্তিক্যবাদ যারা শাসন করে তাদের অন্তরের এমনকি শিক্ষিত মানুষের মাঝেও এক অশুভ দানবীয় শক্তি, যদি তাদের জীবন নিষ্পাপও হয়ে থাকে, কেননা তারা তাদের গবেষণা থেকে দায়িত্ববান ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন; এবং এটা ঘৃণিত ধর্মান্ধতা না হলে গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক মারাত্মক আঘাত। সর্বোপরি, আমাকে একথা যোগ করার সুযোগ দিন যে, বর্তমানে নাস্তিকের সংখ্যা সর্বকালের নিম্নতম, কেননা দার্শনিকরা জানতে পেরেছেন যে, জীবাণূ ছাড়া কোনও বর্ধিষ্ণু সত্তা থাকতে পারে না, পরিকল্পনা ছড়া কোনও জীবাণু থাকতে পারে না, ইত্যাদি।[২২]

ভলতেয়ার নাস্তিক্যবাদকে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার সঙ্গে এক কাতারে স্থান দিয়েছেন, দার্শনিকগণ যা দূর করতে উদগ্রীব ছিলেন। ঈশ্বর নন, তাঁর কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল যুক্তির পবিত্র মানকে আক্রমণকারী ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদসমূহ ।

ইউরোপের ইহুদিরাও নতুন ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিল। স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত ডাচ ইহুদি বারুচ স্পিনোযা (১৬৩২-৭৭) তোরাহ্ পাঠ করতে গিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে জেইন্টাইল মুক্ত-চিন্তাবিদদের এক চক্রে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এমন সব ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন যেগুলো প্রচলিত ইহুদিমতবাদ হতে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল এবং যেগুলো দেকার্তের মতো বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদ ও ক্রিশ্চান স্কলাস্টিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ১৬৫৬ সালে চব্বিশ বছর বয়সে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমস্টারডামের সিনাগগ থেকে বহিস্কার করা হয়। বহিষ্কারাদেশ পাঠ করার সময় সিনাগগের বাতিগুলো ক্ষীণ হতে হতে এক সময় গোটা সমাবেশকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়। এভাবে এক ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে স্পিনোযার আত্মার অন্ধকারাচ্ছন্নতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছে তারা:

> দিন ও রাতের অভিশাপ পড়ুক তার ওপর; অভিশপ্ত হোক সে নিদ্রা ও জাগরণে, ঘরে ও বাইরে। ঈশ্বর যেন আর কখনও তাকে ক্ষমা না করেন বা কাছে টেনে না নেন। এখন থেকে যেন ঈশ্বরের কোপানলে দগ্ধ হতে



AMARBOI.COM

হয় তাকে; ঐশীগ্রন্থে লিখিত সকল অভিশাপ পতিত হোক তার ওপর, জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তার নাম।[২৩]

এরপর স্পিনোযা আর ইউরোপের কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীরই সদস্য থাকলেন না। সুতরাং তিনি ছিলেন স্বাধীন, সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির আদিরূপ, যা ইউরোপের সাধারণ ধারায় পরিণত হবে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনেকেই আধুনিকতার নায়ক হিসাবে স্পিনোযাকে তাঁর প্রতীকী নির্বাসন, বিচ্ছিন্নতা ও সেক্যুলার যুক্তির সন্ধানের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে সম্মান করত।

স্পিনোযাকে নাস্তিক হিসাবে দেখা হয়েছে, কিন্তু একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন তিনি, যদিও সে ঈশ্বর বাইবেলের ঈশ্বর নন। ফায়লাসুফদের মতো প্রত্যাদেশের ধর্মকে তিনি দার্শনিকদের আহরিত ঈশ্বর সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের মনে করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের ধরণকে ভুল বোঝা হয়েছে, *আ থিওলজিকো-পলিটিক্যাল ট্রিটিজ*-এ যুক্তি দিয়েছেন তিনি। এটা একেবারে বিশ্বাস আর কুসংস্কারের একটা মিশেলে পরিণত হয়েছে, 'কতগুলো অর্থহীন রহস্যের গুচ্ছ।'[২৪] বাইবেলিয় ইতিহাসের দিকে তীর্যক চোখে তাকিয়েছেন তিনি। ইসরায়েলিরা তাদের বোধের অতীত যে কোনও কিছুকে 'ঈশ্বর' ডেকে বসত। যেমন, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও পবিত্রতা সম্পন্ন মানুষ হওয়ায় পয়গম্বর ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলা হতো। কিন্তু এ ধরনের 'অনুপ্রেরণা' বিশেষ কোনও গোষ্ঠীর ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং স্বাভাবিক যুক্তি দিয়ে প্রত্যেকের নাগালে ছিল: বিশ্বাসের আচার ও প্রতীকসমূহ বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক চিন্তায় অক্ষম সাধারণ মানুষকেই কেবল সাহায্য করতে পারে।

দেকার্তের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের ক্ষেত্রে অন্টোলজিক্যাল প্রমাণের দ্বারস্থ হয়েছেন স্পিনোযা। খোদ 'ঈশ্বরে'র ধারণাটিই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, কেননা অস্তিত্বহীন একটি সম্পূর্ণ সত্তা এক্ষেত্রে স্ববিরোধী হয়ে পড়ত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ বাস্তবতা সম্পর্কিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা ও আস্থা কেবল এখান থেকেই মেলে। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি দেখায় যে, হাজারো নিয়ম-নীতি একে নিয়ন্ত্রণ করছে। স্পিনোযার চোখে ঈশ্বর মৌলিক আইন বা নিয়ম মাত্র, অস্তিত্বমান সকল চিরন্তন আইনের সারৎসার। ঈশ্বর একটি বস্তুগত সত্তা, বিশ্বজগতকে নিয়য়ন্ত্রণকারী নিয়মের সমতুল্য ও অনুরূপ। নিউটনের মতো স্পিনোযাও উৎসারণের প্রাচীন দার্শনিক মতবাদের কাছে ফিরে গেছেন। ঈশ্বর যেহেতু সকল বস্তুতে—বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক—মিশে আছেন এবং পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন, সুতরাং এঁকে এসব বস্তুর অস্তিত্ব

নির্দেশকারী নিয়ম হিসাবে শনাক্ত করা যেতে পারে। জগতে ঈশ্বরের কর্মধারা আলোচনা করার অর্থ অস্তিত্বের গাণিতিক ও কার্যকারণ সংক্রান্ত নীতিমালার বর্ণনা দান। এটা ছিল দুর্জ্ঞেয়তার চরম অস্বীকৃতি।

মতবাদটিকে অনুজ্জ্বল মনে হয়, কিন্তু স্পিনোযার ঈশ্বর প্রকৃত অতিন্দ্রীয়বাদী বিস্ময়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অস্তিত্বমান সকল বিধি-বিধানের সমন্বয় হিসাবে ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিখুঁত, যিনি সবকিছুকে ঐক্য ও ছন্দে সম্পর্কিত করেছেন। মানুষ যখন দেকার্তের নির্দেশিত পথে তাদের মনের কর্মধারা নিয়ে ভাবে, তখন নিজেদের ভেতর ঈশ্বরের চিরন্তন ও অসীম সত্তাকে সক্রিয় হতে উন্মুক্ত করে দেয়। প্লেটোর মতো স্পিনোযা বিশ্বাস করতেন, সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান পরিশ্রম সাপেক্ষ সত্য আহরণের চেয়ে ঢের প্রবলভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে প্রকাশ করে। জ্ঞানে আমাদের আনন্দ ও সুখ ঈশ্বরের ভালোবাসার সমান, এই উপাস্য চিন্তার কোনও বাহ্যিক বস্তু নন বরং প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরে মিশে থাকা চিন্তারই কারণ ও নীতি। প্রত্যাদেশ বা স্বর্গীয় আইনের কোনও প্রয়োজন নেই: এই ঈশ্বর গোটা মানবজাতির জন্যে সহজগম্য আর কেবল তোরাহ্ই প্রকৃতির চিরন্তন আইন। স্পিনোযা প্রাচীন মেটাফিজিক্সকে নতুন বিজ্ঞানের সঙ্গে একই কাতারে নিয়ে এসেছিলেন: তাঁর ঈশ্বর নিওপ্লেটোনিস্টদের ঈশ্বরের মতো অতীত নন বরং আকুইনাসের মতো দার্শনিকদের বর্ণিত পরম সত্তার কাছাকাছি। কিন্তু এই ঈশ্বর আবার অর্থডক্স একেশ্বরবাদীদের অনুভূত অতিন্দ্রীয়বাদী ঈশ্বরেরও নিকটবর্তী। ইহুদি, ক্রিশ্চান ও দার্শনিকরা স্পিনোযাকে নাস্তিক ভাবতে চেয়েছে: এই ঈশ্বরের মাঝে ব্যক্তিক কিছু নেই, যিনি বাকি বাস্তবতা হতে অবিচ্ছেদ্য। প্রকৃতপক্ষে স্পিনোযা 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার কেরছিলেন কেবল ঐতিহাসিক কারণে; তিনি নাস্তিকদেও সাথে একমত প্রকাশ করেছেন, যাদের দাবি ছিল বাস্তবতাকে 'ঈশ্বর' আর 'ঈশ্বর' নন এভাবে ভাগ করা যায় না। ঈশ্বরকে অন্য কিছু থেকে আলাদা করা না গেলে প্রচলিত অর্থে 'তিনি' আছেন বলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্পিনোযা আসলে যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা হলো, আমরা সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করি সেই অর্থের সঙ্গে মানানসই কোনও ঈশ্বর নেই। অবশ্য অতিন্দ্রীয়বাদী ও দার্শনিকরা শত শত বছর ধরে একথাই বলে আসছিলেন। কেউ কেউ বলেছে আমাদের জানা জগতের বাইরে আর 'কিছুই' নেই। দুর্জ্ঞেয় এন সফের অনুপস্থিতি না থাকলে স্পিনোযার সর্বেশ্বরবাদ কাব্বালাহ্র সঙ্গে মিলে যেত; আমরা চরম অতিন্দ্রীয়বাদ ও আসন্ন নতুন নাস্তিক্যবাদের মাঝে সম্পর্ক অনুভব করতে পারতাম।

জার্মান দার্শনিক মোজেস মেন্দেলস্ন (১৭২৯-৮৬) আধুনিক ইউরোপে ইহুদিদের প্রবেশের পথ খুলে দিয়েছিলেন, যদিও গোড়াতে নির্দিষ্ট ইহুদি-দর্শন

AMARBOI.COM

গড়ে তোলার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। ধর্মের মতো মনস্তত্ত্ব ও নন্দনতাত্ত্বে আগ্রহী ছিলেন তিনি; তাঁর প্রথমদিকের রচনা *ফিদন* ও *মর্নিং আওয়ার্স* জার্মান আলোকনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছিল: এগুলোয় যৌক্তিক ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে, ইহুদি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটিকে বিবেচনা করেনি। ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশগুলোয় আলোকনের উদার ধারণাসমূহ মুক্তি আনে ও ইহুদিদের সমাজে যোগ দেওয়ায় সক্ষম করে। এই *মাস্কিলিমদের*—আলোকপ্রাপ্ত ইহুদিদের এভাবে আখ্যায়িত করা হতো—জার্মান আলোকনের ধর্মীয় দর্শন গ্রহণে অসুবিধা ছিল না। ইহুদি মতবাদে খৃস্টধর্মের মতো একই রকম মতবাদ সংক্রান্ত বিকার কখনওই ছিল না। এর মৌল বিষয়গুলো বস্তুত আলোকনের যৌক্তিক ধর্মের অনুরূপই ছিল: জার্মানিতে যা তখনও ঘটনার ধারণা ও মানবীয় কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ মেনে নিয়েছে। *মর্নিং আওয়ার্স*-এ মেন্ডেলসনের দার্শনিক ঈশ্বর বাইবেলের ঈশ্বরের খুবই কাছাকাছি। ইনি মেটাফিজিক্যাল বিমূর্ত কিছু নন, একজন ব্যক্তিক ঈশ্বর। প্রজ্ঞা, মহত্ব, ন্যায়বিচার, প্রেমময় দয়া ও বুদ্ধিমত্তার মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্যবালী সর্বোচ্চ মাত্রায় এই পরমসত্তায় প্রয়োগ করা যায়।

কিন্তু এর ফলে মেন্দেলসনের ঈশ্বর একেবারেই আমাদের মতো হয়ে যান। তাঁর ধর্মটি টিপিক্যাল আলোকনের বিশ্বাস ছিল; শীতল নিরাবেগ এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্যারাডক্স ও দ্ব্যর্থবোধকতাসমূহ যেন উপেক্ষা করতে চায়। মেন্দেলসন ঈশ্বর বিহীন জীবনকে অর্থহীন মনে করেছেন, কিন্তু তাঁর এই ধর্ম আবেগময় ধর্ম নয়: তিনি যুক্তি দিয়ে আহরণযোগ্য ঈশ্বরের জ্ঞানেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। ঈশ্বরের মহত্ত্বের ওপরই ধর্মতত্ত্ব টিকে থাকে। মানুষকে কেবল প্রত্যাদেশের ওপর নির্ভর করে থাকতে হলে, যুক্তি উত্থাপন করেছেন মেন্দেলসন, সেটা ঈশ্বরের মহত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ত, কারণ অসংখ্য মানুষ দৃশ্যতঃ ঐশী পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। সুতরাং তাঁর দর্শন ফালসাফাহ্‌র দাবিকৃত দুর্বোধ্য বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা যা কেবল মুষ্টিমেয়দের পক্ষে অর্জন-সম্ভব—বাদ দিয়ে প্রত্যেকের আয়ত্তাধীন বোধশক্তির ওপর নির্ভর করেছে। অবশ্য, এই ধরনের পদ্ধতির বিপদ রয়েছে, কারণ তা এমন এক ঈশ্বরকে আমাদের নিজস্ব সংস্কারাদির সঙ্গে এক করে সেগুলোকে পরম করে তোলা খুবই সহজ হয়ে যায়।

১৭৬৭ সালে যখন *ফিদন* প্রকাশিত হয়, আত্মার অমরত্বের পক্ষে এর দার্শনিক যুক্তি ইতিবাচকভাবে, আবার কখনও কখনও পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে জেন্টাইল বা ক্রিশ্চান বলয়ে গৃহীত হয়েছিল। এক তরুণ সুইস প্যাস্টর ইয়োহান ক্যাস্পার লেভেতার লেখেন যে, লেখক খৃস্টধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত আছেন: মেন্দেলসনকে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর ইহুদিবাদের পক্ষে যুক্তি তুলে

ধরার জন্যে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। মেন্দেলসন তখন প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইহুদিবাদের পক্ষে যৌক্তিক বিতর্কে অবতীর্ণ হন, যদিও মনোনীত জাতি বা প্রতিশ্রুত ভূমির মতো প্রচলিত বিশ্বাস লালন করতেন না তিনি। তাঁকে একটা সীমারেখা টানতে হয়েছিল: তিনি স্পিনোযার পথে যেতে চাননি বা ইহুদিবাদের পক্ষে তাঁর যুক্তি বেশি সফল হলে ক্রিশ্চানদের আক্রোশ নেমে আসুক, তাও নয়। অন্যান্য ডেইস্টের মতো তিনি যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে, সত্যিসমূহ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা গেলেই কেবল প্রত্যাদেশ গ্রহণ করা যেতে পারে। ট্রিনিটির মতবাদ তাঁর নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করেনি। ইহুদিবাদ প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ছিল না, বরং প্রত্যাদিষ্ট আইন। ঈশ্বর সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণা গোটা মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্মের ঈশ্বরের ধারণায় অনুরূপ, স্বাধীন যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করা যেতে পারে। মেন্দেলসন প্রাচীন সৃষ্টি তত্ত্বীয় ও অন্টোলজিক্যাল প্রমাণের ওপর নির্ভর করেছেন; এই বলে যুক্তি দিয়েছেন যে, আইনের ভূমিকা ছিল ইহুদিদের ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলা ও বহুঈশ্বরবাদীতা এড়াতে সাহায্য করা। সহিষ্ণুতার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেছিলেন তিনি। ইহুদিবাদসহ যুক্তি ভিত্তিক বিশ্বজনীন ধর্ম ঈশ্বরকে জানার অন্যান্য উপায়কে শ্রদ্ধা করতে শেখাবে, এটাই প্রত্যাশিত; ইউরোপের চার্চগুলো শত শত বছর ধরে যার ওপর নিপীড়ন চালিয়ে এসেছে।

ইহুদিরা মেন্দেলসনের চেয়ে ইম্যানুয়েল কান্টের দর্শনে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিল; তাঁর *ক্রিটিক অভ পিউর রিজন* (১৭৮১) মেন্দেলসনের জীবনের শেষ দশকে প্রকাশিত হয়। কান্ট আলোকনের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'মানুষের স্ব-আরোপিত অভিভাবকত্ব হতে এক্সোডাস' বা বাহ্যিক কর্তৃত্বের ওপর আস্থা স্থাপন'[২৫] বলে। স্বায়ত্তশাসিত নৈতিক বিবেকের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই ঈশ্বরকে জানার একমাত্র উপায়, যাকে তিনি বলেছেন 'ব্যবহারিক যুক্তি'। তিনি চার্চের কর্তৃত্ব, প্রার্থনা ও আচারাদির মতো ধর্মের অনেক আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়েছেন, মানুষকে যেগুলো আপন ক্ষমতায় নির্ভর করা হতে বিরত রাখে ও অন্যের ওপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করে। কিন্তু কান্ট ঈশ্বরের ধারণার বিরুদ্ধে ছিলেন না। কয়েক শতাব্দী আগের আল-গাযযালির মতো তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রচলিত যুক্তিগুলো অর্থহীন, কারণ আমাদের মন কেবল স্থান বা কালে অস্তিত্বমান বস্তুকেই বুঝতে পারে; এর বাইরে অবস্থানকারী বস্তুনিচয় বিবেচনা করার যোগ্যতা রাখে না। তবে তিনি একথা মেনে নিয়েছিলেন যে, মানুষের এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে যাবার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে; সে ঐক্যের একটা নীতির সন্ধান করে যা আমাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্র হিসাবে বাস্তবতার একটা দর্শন দেবে। এটাই



AMARBOI.COM

ঈশ্বরের ধারণা। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, আবার উল্টোটিও প্রমাণ করা অসম্ভব। ঈশ্বরের ধারণা আমাদের জন্যে অত্যাবশ্যক ছিল: এটা আদর্শ সীমা প্রকাশ করেছে যা আমাদের জগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভে সক্ষম করে তুলেছে।

সুতরাং, কান্টের ক্ষেত্রে ঈশ্বর একটি সুবিধা বা সুযোগ মাত্র যার অপব্যবহার হতে পারে। প্রাজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে ও *দেউস এক্স মেশিনা (deus ex machina)*র উপর অলস নির্ভরতার দিকে ঠেলে দেবে। এটা অপ্রয়োজনীয় রহস্যময়তার উৎসও হয়ে দাঁড়াতে পারে যা চার্চের ইতিহাসকে ক্ষতবিক্ষতকারী সেই দুঃসহ বিবাদের মতো বিবাদ সৃষ্টি করে। কান্ট হয়তো নিজেকে নাস্তিক মানতেন না। সমসাময়িকেরা তাঁকে ধার্মিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যিনি অশুভের প্রতি মানুষের ক্ষমতার ব্যাপারে গভীরভাবে সজাগ ছিলেন। এটাই তাঁর কাছে ঈশ্বরের ধারণাকে অত্যাবশ্যকীয় করে তুলেছিল। তিনি তাঁর *ক্রিটিক অভ প্র্যাকটিক্যাল রিজন*-এ যুক্তি দিয়েছেন যে, নৈতিক জীবন যাপন করার জন্যে নারী ও পুরুষের একজন পরিচালনাকারী দরকার, যিনি সৎগুণকে সুখ দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। এই দৃষ্টিকোণে, ঈশ্বরকে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় চিন্তা হিসাবে নীতি-ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু এখন আর ঈশ্বরের রহস্য নয়, বরং খোদ মানুষ। ঈশ্বর এক কৌশলে পরিণত হলেন যিনি আমাদের আরও দক্ষতার সঙ্গে ও নৈতিকতা মেনে কাজ করতে সক্ষম করে তোলেন, তিনি আর সকল সত্তার মূল থাকলেন না। অচিরেই কিছু মানুষ তাঁর স্বাধীনতার আদর্শকে আরেক কদম বাড়িয়ে এই প্রায় ক্ষীণকায় ঈশ্বরকে পুরোপুরি বাদ দেবে। কান্ট ছিলেন পশ্চিমের প্রথম কয়েকজনের অন্যতম যাঁরা প্রচলিত প্রমাণের বৈধতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন আসলে এগুলো কিছু প্রমাণ করে না। এসব প্রমাণ আর কখনওই আগের মতো বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হবে না।

অবশ্য, কোনও কোনও ক্রিশ্চানের কাছে একে মুক্তিদায়ী মনে হয়েছিল, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর বিশ্বাসের একটি পথ বন্ধ করেছেন আরেকটি খুলে দেওয়ার জন্যে। *আ প্লেইন অ্যাকাউন্ট অভ জেনুইন ক্রিশ্চানিটি*তে জন ওয়েসলি (১৭০৩-৯১) লিখেছেন:

> কখনও কখনও আমি প্রায় বিশ্বাস করে বসেছি যে, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা অনেক পরবর্তীকালে খৃস্টধর্মের বাহ্যিক প্রমাণকে অধিকতর কম প্রতিবন্ধক বা বাধা হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন যাতে মানুষ (বিশেষ করে চিন্তাশীলরা) এখানেই আটকে না থেকে নিজেদের মাঝেও দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য হয় ও তাদের অন্তরে দেদীপ্যমান আলো খুঁজে পায়।[২৬]

AMARBOI.COM

আলোকন পর্বের যুক্তিবাদের পাশাপাশি এক নতুন ধরনের ধার্মিকতার বিকাশ ঘটেছিল, যাকে প্রায়ই 'হৃদয় বা অন্তরের ধর্ম' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যদিও মগজের চেয়ে অন্তরেই এটার অবস্থান ছিল, কিন্তু এর সঙ্গে ডেইজম-এর অনেক পূর্বশর্তের মিল ছিল। নারী ও পুরুষকে বাহ্যিক প্রমাণ ও কর্তৃত্ব ত্যাগ করে প্রত্যেকের হৃদয় ও ক্ষমতায় বিরাজমান ঈশ্বরকে আবিষ্কারের তাগিদ দিয়েছে এটা। বহু ডেইস্টের মতো ওয়েসলি ভাইরা বা জার্মান পিয়েটিস্ট কাউন্ট নিকোলাস লুদভিগ ফন যিনযেন (১৭০০-৬০)-এর অনুসারীরা শত শত বছরের সংযোজন ঝেড়ে ফেলে ও প্রাথমিক ক্রিশ্চানদের 'সহজ' এবং 'খাঁটি' খৃষ্টধর্মে প্রত্যাবর্তন করছে বলে ভেবেছে।

জন ওয়েলসলি আগাগোড়া আন্তরিক ক্রিশ্চান ছিলেন। অক্সফোর্ডের লিংকন কলেজের তরুণ ফেলো থাকতে ভাই চার্লসকে নিয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েটদের এটা সমিতি গঠন করেছিলেন তিনি, যা হোলি ক্লাব নামে পরিচিত ছিল। পদ্ধতি ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে খুব কঠোর ছিল এই সমিতি, তাই এর সদস্যরা মেথডিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন। ১৭৩৫ সালে জন ও চার্লস মিশনারি হিসাবে আমেরিকার কলোনি জর্জিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন, কিন্তু দু'বছর পর অশান্ত অবস্থায় ফিরে আসেন জন, ডায়েরিতে লেখেন, 'আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম ইন্ডিয়ানদের দীক্ষিত করতে, কিন্তু হায়, আমাকে দেবে কে দীক্ষা?'[২৭] যাত্রাকালীন সময় ওয়েসলি মোরাভিয় গোষ্ঠীর কয়েকজন মিশনারি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এই গোষ্ঠীটি সকল মতবাদ এড়িয়ে ধর্মকে হৃদয়ের ব্যাপার বলে জোর দিয়েছিল। ১৭৩৮ সালে লন্ডনে অ্যাল্ডারগেট স্ট্রীটের চ্যাপেলে মোরাভিয়দের এক সমাবেশ চলাকালীন ধর্মান্তর-এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তিনি যা থেকে তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মে, এই নতুন ধরনের খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য তিনি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন। সেই থেকে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা দেশময় ঘুরে বাজার আর ক্ষেত-খামারের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মাঝে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন।

'আবার জন্মলাভে'র অনুভূতিটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ঈশ্বর *অবিরাম* মানুষের আত্মায়, যেমন বলা হয়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন বোধ করাটা' খুবই দরকার, ক্রিশ্চানকে যা 'ঈশ্বরের প্রতি ধারাবাহিক ও কৃতজ্ঞতাময় ভালোবাসায়' ভরিয়ে দেয় যা সচেতনভাবে অনুভূত হয় ও একে 'স্বাভাবিক ও এক অর্থে ঈশ্বর পুত্রদের প্রত্যেককের জন্যে দয়া, কোমলতা ও দীর্ঘ কষ্টভোগের সাহায্যে ভালোবাসতে শেখায়।'[২৮] ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদসমূহ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশ্বাসীর মনে ক্রাইস্টের বাণীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই ধর্মের খাঁটিত্বের সেরা প্রমাণ। পিউরিটানবাদে যেমন আবেগসঞ্জাত অনুভূতিই প্রকৃত বিশ্বাসের ও সেদিক থেকে মুক্তির একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু





AMARBOI.COM

সর্বজনীন এই অতিন্দ্রীয়বাদ বিপজ্জনক হতে পারে। অতিন্দ্রীয়বাদীরা সব সময় আধ্যাত্মিক পথের বিপদসঙ্কুলতার ওপর জোর দিয়েছে, হিস্টেরিয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে: শান্তি ও স্থিরতা ছিল অতিন্দ্রীয়বাদের চিহ্ন। এবং 'নবজন্ম' খৃস্টবাদ কুয়াকার্স ও শেকার্সদের উন্মত্ত আচরণের মতো উন্মত্ততার জন্ম দিতে পারে। ফলে হতাশারও সৃষ্টি হতে পারে: কবি উইলিয়াম কাউপার উদ্ধার পাননি ভেবে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর অনুভূতির ঘাটতিকে অভিশপ্ত হওয়ার লক্ষণ ভেবেছেন।

হৃদয়ের ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদসমূহ অন্তর্গত আবেগের অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। এইভাবে সাকস্যানিতে নিজস্ব এস্টেটে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক কাউন্ট ফন যিনযেনদর্ফ ওয়েসলির মতো যুক্তি দিয়েছেন যে, 'ধর্মবিশ্বাসের অবস্থান চিন্তায় বা মস্তিষ্কে নয় বরং হৃদয়ের আলোকিত এক প্রদীপে।'[২৯] পণ্ডিতগণ 'ট্রিনিটির রহস্য নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকতে পারেন,' কিন্তু এই মতবাদের অর্থ তিনটি সত্তার পারস্পরিক সম্পর্কে নয়, বরং 'আমাদের কাছে তাঁদের তাৎপর্য।'[৩০] অবতার ব্যক্তি পর্যায়ে ক্রিশ্চানের নবজন্মের প্রকাশ করেছে, ক্রাইস্ট যখন 'হৃদয়ের অধিশ্বরে' পরিণত হয়েছেন। আবেগ-নির্ভর আধ্যাত্মিকতা জেস্যুইট ও প্রশাসনিক যন্ত্রের তীব্র বিরোধিতার মুখে প্রতিষ্ঠা লাভ করা স্যাকরেড হার্ট অভ জেসাসের প্রতি নিবেদিত রোমান ক্যাথলিক চার্চেও দেখা দিয়েছিল। জেস্যুইট ও প্রশাসন এর পৌনঃপৌনিক আবেগপ্রবণ অনুভূতির বাড়াবাড়িকে সন্দেহের চোখে দেখত। আজও তা টিকে আছে: বহু রোমান ক্যাথলিক চার্চে ক্রাইস্টের উন্মুক্ত বুকে অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত কণ্ঠাকৃতি হৃদয় দেখানো মূর্তি আছে। এরকম দৈহিক রূপ নিয়েই তিনি ফ্রান্সের প্যারেয়-লে-মনিয়ালস্থ কনভেন্টে মার্গারিট-মেরি অ্যালাকোক (১৬৪৭-৯০)-এর সামনে দেখা দিয়েছিলেন। এই ক্রাইস্টের সঙ্গে গস্পেলের ক্ষতবিক্ষত চারিত্রের কোনও মিল নেই। আত্ম-করুণার সময় তিনি মস্তিষ্ককে বাদ দিয়ে কেবল হৃদয়ের দিকে মনোনিবেশ করার বিপদকে তুলে ধরেছেন। ১৬৮২ সালে মার্গারিট মেরি লেন্ট-এর সূচনায় জেসাসের আবির্ভাবের প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন:

> সমস্ত শরীর ক্ষত, রক্তাক্ত। তাঁর পবিত্র রক্ত স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছিল চারপাশ থেকে: 'আমাকে কেউই,' বিষণ্ন ও দুঃখভরা কণ্ঠে বলেছেন তিনি, 'করুণা করবে না, দয়া দেখাবে না, আমার দুঃখের সঙ্গী হবে না, যে করুণ অবস্থায় পাপীরা আমাকে নামিয়ে এনেছে, বিশেষ করে এই সময়।'[৩১]

প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত স্নায়ুর মহিলা মার্গারিট-মেরি যৌনতার প্রতি নিজের চরম ঘৃণার কথা স্বীকার গেছেন, খাবারের অসুস্থতায় ভুগেছেন, পবিত্র হৃদয়ের প্রতি নিজের 'ভালোবাসা' দেখাতে মর্ষকামী আচরণ করেছেন, তাঁর আচরণ দেখায়,

AMARBOI.COM

কেবল হৃদয়ের ধর্ম কীভাবে জটিল হয়ে উঠতে পারে। তাঁর ক্রাইস্ট প্রায়শঃই ইচ্ছাপূরণের অতিরিক্ত কিছু নন, যাঁর পবিত্র হৃদয় যে ভালোবাসা তিনি কখনও পাননি তা পুষিয়ে দেয়: 'আজীবন তুমি এর প্রিয় শিষ্য থাকবে, এর আনন্দের সামগ্রী ও ইচ্ছার শিকার বলেছেন তাঁকে জেসাস, 'এটা তোমার দোষ-ত্রুটি শুধরে দেবে, তোমার হয়ে দায়িত্ব পালন করবে।'[৩২] কেবল মানুষ জেসাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপের এরকম ধর্মানুরাগ এক অভিক্ষেপ মাত্র, যা কোনও ক্রিশ্চানকে নিউরোটিক ইগোটিজমে বন্দি করে ফেলে।

আমরা আলোকনের শীতল যুক্তিবাদ ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি, কিন্তু সর্বোত্তম অবস্থায় হৃদয়ের ধর্মের সঙ্গে ডেইজমের একটা যোগসূত্র রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পিয়েটিস্ট হিসাবে কমিগসবার্গে বেড়ে উঠেছিলেন কান্ট, এই লুথারান গোষ্ঠীতে যিনযেনদর্ফেরও মূল প্রোথিত ছিল। কান্টের প্রস্তাবিত স্বাধীন যুক্তির সীমানায় ধর্ম পিয়েটিস্টদের কর্তৃত্ববাদী চার্চের মতবাদসমূহের মাঝে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যাদেশের চেয়ে 'আত্মার একেবারে গভীরভাবে স্থাপিত'[৩৩] ধর্মের অনেক কাছাকাছি। কান্ট যখন তাঁর ধর্ম সম্পর্কে চরম দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত হয়ে উঠলেন, তখন বলা হয়, তিনি তাঁর পিয়েটিস্ট সেবকদের এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, কেবল 'বিশ্বাসের জন্য স্থান তৈরি করতে ডগমাকে ধ্বংস করেছেন'[৩৪] তিনি। জন ওয়েসলি আলোকন মোহিত ছিলেন ও বিশেষভাবে স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন তিনি, শখ বশতঃ বৈদ্যুতিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়েছেন এবং মানুষের প্রকৃতি ও প্রগতির সম্ভাবনা নিয়ে আলোকন পর্বের আশাবাদের অংশীদার ছিলেন। আমেরিকান পণ্ডিত অ্যালবার্ট সি.আউটলার দেখিয়েছেন, নতুন হৃদয়ের ধর্ম ও আলোকন পর্বের যুক্তিবাদ, উভয়ই প্রশাসন বিরোধী ছিল এবং উভয়ই বাহ্যিক কর্তৃত্বকে অবিশ্বাস করেছে; উভয়ই প্রাচীনের বিরুদ্ধে নিজেদের আধুনিকদের কাতারে ফেলেছে, উভয়ই অমানবিকতাকে ঘৃণা করেছে ও জনসেবার প্রতি উৎসাহ দেখিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এমন মনে হয় যেন চরম ধর্মানুরাগ আসলেই ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের মাঝে আলোকন পর্বের আদর্শসমূহের শিকড় গেড়ে বসার পথকে প্রশস্ত করেছিল। এই দুটো চরমপন্থী আন্দোলনের মাঝে লক্ষণীয় মিল রয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলোর অনেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় টাবু বা প্রথা লংঘনের মাধ্যমে সময়ের ব্যাপক পরিবর্তনে সাড়া দিয়েদিল বলে মনে হয়। কেউ কেউ ব্লাসফেমাস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে: কাউকে নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার কারও নেতারা নিজেদের ঈশ্বরের অবতার দাবি করে বসেছেন। এই গোষ্ঠী দুটোর অনেকেরই হাবভাবে মেসিয়ানিক সুর ছিল ও এক সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী আগমন অত্যাসন্ন দাবি করেছে।

AMARBOI.COM

১৬৪৯ সালে রাজা প্রথম চার্লসের হত্যাকাণ্ডের পর বিশেষ করে অলিভার ক্রমওয়েলের পিউরিটান সরকারের শাসনামলে ইংল্যান্ডে এক প্রলয়বাদী উত্তেজনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। পিউরিটান কর্তৃপক্ষের পক্ষে সেনাবাহিনীর সদস্য ও সাধারণ মানুষের মাঝে দেখা দেওয়া ধর্মীয় উন্মাদনাকে বাগ মানানো কঠিন হয়ে দাড়িয়েছিল, এদের অনেকের মাঝেই দৃঢ়বিশ্বাস জেগে উঠেছিল যে, প্রভুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত। বাইবেলে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঈশ্বর তাঁর জাতির ওপর আত্মা অবতীর্ণ করবেন ও খোদ ইংল্যান্ডেই আপন রাজ্য স্থাপন করবেন। ১৬২০-এর দশকে নিউ ইংল্যান্ডে বসতি স্থাপনকারী পিউরিটানদের মতো ক্রমওয়েল স্বয়ং যেন একই ধরনের আশা পোষণ করেছিলেন। ১৬৪৯ সালে জেরার্ড উইন্সট্যানলি সারের কবহ্যামে তাঁর কমিউনিটি অভ 'ডিগার্স' প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি স্বর্গোদ্যানে যখন আদম চাষ করেছেন, মানব জাতিকে সেই আদিম অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন: তাঁর নতুন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী বৈষম্য ও মানবীয় কর্তৃত্ব অস্তিত্ব হারাবে। কোয়াকারস—জর্জ ফক্স ও জেমস নায়লর ও তাঁদের অনুসারীরা-প্রচার করেন যে, সকল নারী-পুরুষ সরাসরি ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করতে পারে। প্রত্যেকের হৃদয়ে এক অন্তস্থঃ আলো আছে, একবার এর সন্ধান পাওয়ার পর পরিচর্যা করা হলে শ্রেণী ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকে এই পার্থিব জগতেই মুক্তি লাভ করতে পারবে। ফক্স স্বয়ং তাঁর *সোসাইটি অভ ফ্রেন্ডস*-এর জন্যে শান্তিবাদ, অহিংসা ও চরম সাম্যতার নীতি প্রচার করেছিলেন। প্যারিসবাসীরা বাস্তিলে হানা দেওয়ার প্রায় ১৪০ বছর আগেই ইংল্যান্ডে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা জন্ম লাভ করেছিল।

এই নতুন ধর্মীয় চেতনার সবচেয়ে চরম রূপটির সঙ্গে মধ্যযুগের শেষ পাদের ব্রেদরেন অভ দ্য স্পিরিট নামে পরিচিত ধর্মদ্রোহীদের অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। বৃটিশ ইতিহাসবিদ নরম্যান কন তাঁর *দ্য পারসুট অভ দ্য মিলেনিয়াম, রেভুলেশনারি মিলেনারিয়ানস অ্যান্ড মিস্টিক্যাল অ্যানারকিস্ট অভ দ্য মিডল এজেস*-এ যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতিপক্ষ ব্রেদরেন-এর বিরুদ্ধে সর্বেশ্বরবাদের অভিযোগ তুলেছিল। তারা 'এটা বলতে দ্বিধা করেনি যে: 'সবকিছুই ঈশ্বর,' প্রতিটি পাথরে ও মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গে ঈশ্বর রয়েছেন, ঠিক ইউক্যারিস্টের রুটির মতো যা সন্দেহাতীত "সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই স্বর্গীয়"।'[৩৫] এটা ছিল প্লাটিনাসের দর্শনের নব ব্যাখ্যা। *দ্য ওয়ান* হতে উৎসাহিত সকল বস্তুও চিরন্তন সত্তা, স্বর্গীয়। অস্তিত্বমান সবকিছুই স্বর্গীয় উৎসে ফিরে যেতে চায় ও শেষ পর্যন্ত আবার ঈশ্বরের মাঝে বিলীন হবে: এমনকি ট্রিনিটি তিনটি সত্তাও শেষ অবধি আদি একত্বে বিলীন হবে। এই পৃথিবীতে আপন স্বর্গীয় প্রকৃতির স্বীকৃতির মাধ্যমে মুক্তি অর্জিত হয়। রাইনের কাছে এক



AMARBOI.COM

কুটিরের সেলে পাওয়া জনৈক ব্রেদরেনের রচিত এক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: 'স্বর্গীয় সত্তা আমার সত্তা আর আমার সত্তাই স্বর্গীয় সত্তা।' ব্রেদরেন বারবার ঘোষণা দিয়েছে: 'প্রতিটি যুক্তিবাদী প্রাণী প্রকৃতি বা স্বভাবগত কারণেই আশীর্বাদ প্রাপ্ত।'[৩৬] এটা যতটা দার্শনিক বিশ্বাস তারচেয়ে বেশি মানবীয় সীমাকে অতিক্রম করার আবেগময় আকাঙ্ক্ষা। স্ট্রাসবর্গের বিশপ যেমন বলেছেন, ব্রেদরেনরা 'বলে স্বভাবগত কারণে তারা ঈশ্বর, কোনওরকম পার্থক্য নেই। তারা বিশ্বাস করে স্বর্গীয় সকল সম্পূর্ণতা রয়েছে তাদের মাঝে, তারা চিরন্তন এবং চিরকালীন।'[৩৭]

কন যুক্তি দেখিয়েছেন, ক্রমওয়েলের ইংল্যান্ডের কোয়াকার্স, লেবেলার্স ও র‍্যান্টার্স এর মতো চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো আসলে চতুর্দশ শতকের ধর্মদ্রোহী ফ্রি স্পিরিট গোষ্ঠীটিরই পুনর্জাগরণ ছিল। অবশ্যই এটা সচেতন পুনর্জাগরণ ছিল না, তবে সপ্তদশ শতকের এই উৎসাহীরা স্বাধীনভাবে এক সর্বেশ্বরবাদী দর্শন অর্জন করেছিল যাকে অচিরেই স্পিনোযা আবিস্কৃত দার্শনিক সর্বেশ্বরবাদের জনপ্রিয় ভাষ্য হিসাবে দেখাটা কঠিন। উইনস্ট্যানলি খুব সম্ভব একজন দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস করতেন না, যদিও তিনি–অন্য চরমপন্থীদের মতো–আপন বিশ্বাসকে ধারণাগতভাবে প্রণয়নে অনিচ্ছুক ছিলেন। এইসব বিপ্লবী গোষ্ঠীর কেউই আসলে তারা তাদের মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক জেসাসের নিবেদিত প্রায়শ্চিত্তের কাছে ঋণী থাকার কথা বিশ্বাস করত না। তাদের কাছে জেসাস এমন একজনের উপস্থিতি বোঝায় যিনি গোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে মিশে আছেন, যাঁকে আসলে পবিত্র আত্মা হতে আলাদা করা যায় না। প্রত্যেকে একথা স্বীকার করেছে, পয়গম্বরত্বই ঈশ্বর লাভের প্রধান উপায় এবং আত্মার কাছে থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলোর শিক্ষার চেয়ে শ্রেয়তর। ফক্স তাঁর অনুসারীদের নীরবতার মাঝে ঈশ্বরের প্রতীক্ষা করার শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা গ্রিক *হেসিচ্যাজম* বা মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের *ভায়া নেগেতিভার* কথা মনে করিয়ে দেয়। ট্রিনিটারি ঈশ্বরের পূর্বতন ধারণা বিলুপ্ত হচ্ছিল: সর্বব্যাপী এই স্বর্গীয় সত্তাকে তিনটি সত্তায় ভাগ করা যায় না। একত্ব ছিল এর মূল সুর, যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর একতা ও সাম্যতার নীতির মাঝে ফুটে উঠেছে। ব্রেদরেনদের মতো র‍্যান্টার্সদের কেউ কেউ নিজেদের স্বর্গীয় ভেবেছে: কেউ কেউ নিজেকে ক্রাইস্ট বা ঈশ্বরের নতুন অবতার দাবি করেছে। মোসায়াহ হিসাবে তারা এক বিপ্লবাত্মক মতবাদ ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার কথা প্রচার করেছে। এভাবে প্রেসবিটেরিয়ান সমালোচক টমাস এডওয়াডর্স তাঁর যুক্তিপূর্ণ রচনা *গ্রাংগ্রায়েনা অর আ ক্যাটালগ অ্যান্ড ডিসকভারি অভ মেনি অভ দ্য এরোউর্স, হেরেসিজ, ব্লাসফেমিজ, অ্যান্ড পারনিশাস প্র্যাকটিসেস অভ দ্য সেক্টারিয়ানস অভ দিস টাইম* (১৬৪০) র‍্যান্টার্সদের বিশ্বাসের সার কথা তুলে ধরেছেন;



AMARBOI.COM

> সৃষ্টির প্রথম প্রত্যেক সৃষ্টিই ঈশ্বর ও প্রতিটি সৃষ্টিই ঈশ্বর, প্রাণ আছে ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, এমন প্রতিটি সৃষ্টিই ঈশ্বরের নিকট হতে নির্গত এবং আবার ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করবে, সাগরের বুকে জলবিন্দুর মতো আবার মিশে যাবে তাঁর সঙ্গে...পবিত্র আত্মায় দীক্ষিত মানুষ ঈশ্বর যেমন সব জানেন, ঠিক সেভাবে সবকিছু জানে, যা এক গভীর রহস্যময় ব্যাপার...মানুষ যদি অন্তর থেকে জানে যে সে আশীর্বাদ পেয়েছে, যদি সে হত্যা করে বা মাতাল হয়ে পড়ে, ঈশ্বর তার মাঝে পাপ দেখেন না... গোটা পৃথিবীই সাধু, ভালো মানুষের একটা সমাজ থাকা প্রয়োজন ও সাধুদের উচিত সজ্জন এবং এ জাতীয় মানুষের সঙ্গে একই স্থানে বসবাস করা।[৩৮]

স্পিনোযার মতো র‍্যান্টার্সদের বিরুদ্ধেও নাস্তিক্যবাদের অভিযোগ উঠেছে। তারা তাদের উদারপন্থী বিশ্বাসে স্বেচ্ছায় ক্রিশ্চান টাবু লঙ্ঘন করে ব্লাসফেমাসের মতো দাবি করেছে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কান্ট বা স্পিনোযার মতো বৈজ্ঞানিক বিমূর্ততা বোঝার ক্ষমতা সবার ছিল না, কিন্তু র‍্যান্টার্সদের আত্ম-পরমানন্দে বা কোয়াকারদের 'অন্তরের আলো'য় বহু শতাব্দী পরে ফরাসি বিপ্লবীদের প্রকাশিত আকাঙ্ক্ষার মিল দেখা যাওয়া সম্ভব। যারা দেবনিচয়ে যুক্তি দেবীকে অধিষ্ঠিত করেছিল।

র‍্যান্টার্সদের বেশ কয়েকজন নিজেদের মেসায়াহ, ঈশ্বরের পুর্ণাবতার দাবি করেছেন–যিনি এক নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাদের জীবনের যে বিবরণ আমাদের কাছে রয়েছে তাতে কারও কারও ক্ষেত্রে মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ দেখা যায়, তা সত্ত্বেও তাঁরা অনুসারীদের একটা দল পেয়েছিলেন, এটা নিঃসন্দেহে সে সময়ের ইংল্যান্ডের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এভাবেই ১৬৪৬ সালে প্লেগে পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে এক সম্মানীয় গৃহস্থ উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নিজেকে ঈশ্বর ও ক্রাইস্ট দাবি করে সতীর্থ ক্রিশ্চানদের হতবিহ্বল করে দেন তিনি, পরে অবশ্য নিজের দাবি প্রত্যাহার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁকে পুরোপুরি সুস্থ মনে হলেও স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য নারীদের শয্যাসঙ্গী হতে শুরু করেছিলেন তিনি, যাপন করছিলেন নিন্দার্হ ভিক্ষুকের জীবন। এইসব নারীদের একজন, মেরি গ্যাডবারি দিব্য দর্শন লাভ এবং কণ্ঠস্বর শুনতে শুরু করে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থার যা সকল শ্রেণী বৈষম্য দূর করে দেবে। ফ্রাঙ্কলিনকে নিজের প্রভু ও ক্রাইস্ট হিসাবে গ্রহণ করে সে। তারা বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী পেয়েছিলেন বলে মনে হয়; কিন্তু ১৬৫০ সালে

AMARBOI.COM

তাদের গ্রেপ্তার, প্রহার ও ব্রিডওয়েলে কারাবন্দি করা হয়। মোটামুটি প্রায় একই সময়ে জনৈক জন রবিনসও ঈশ্বরের মর্যাদা লাভ করেছিল; নিজেকে পিতা ঈশ্বর দাবি করেছিল সে, তার বিশ্বাস ছিল শিগগিরই তাঁর স্ত্রী জগৎ পরিত্রাতার জন্মও দেবে।

ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ রবিনস ও ফ্রাঙ্কলিনদের মতো লোকদের র‍্যান্টার্স হিসাবে মানতে চান না, তাঁরা বলেন, আমরা কেবল প্রতিপক্ষের কাছ থেকেই তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্ক জানতে পারি, যারা হয়তো ধর্মীয় যুক্তির কারণে তাদের বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটিয়েছে। কিন্তু জ্যাকব বথিউমলি, রিচার্ড কপিন এবং লরেন্স ক্লার্কসনের মতো উল্লেখযোগ্য র‍্যান্টার্সদের বিবরণ রক্ষা পেয়েছে যেখানে একই রকম জটিল ধারণা দেখা যায়: তাঁরাও এক বিপ্লবী সামাজিক বিশ্বাসের প্রচার করেছেন। *দ্য লাইট অ্যান্ড দ্য ডার্ক সাইডস অভ গড* (১৬৫০) শীর্ষক নিবন্ধে বথিউমালি এমন ভাষায় ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা ঈশ্বর তাঁকে স্মরণকরী মানুষের চোখ, কান আর হাত হয়ে যান–এই সুফী বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; 'হে ঈশ্বর, তোমাকে কী বলব আমি?' তিনি জানতে চান। 'কারণ যদি বলি আমি তোমাকে দেখি, তাহলে সেটা তোমার নিজেকে দেখা ছাড়া আর কিছু না; কারণ আমার মাঝে নিজেকে দেখা ছাড়া তোমাকে দেখার কোনও ক্ষমতা নেই: যদি বলি তোমাকেই জানি, সেটা নিজেকে জানা ছাড়া আর কিছু না।'[৩৯] যুক্তিবাদীদের মতো ট্রিনিটি মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন বথিউমলি; সুফীর মতো করেই একথা বলে ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতায় নিজের বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে, ক্রাইস্ট স্বর্গীয় হলেও মাত্র একজন ব্যক্তিতে ঈশ্বর প্রকাশিত হতে পারেন না: 'তিনি মানুষ ক্রাইস্টের মাঝে অবস্থানের মতোই প্রকৃত ও বস্তুগতভাবে অন্য মানুষ ও প্রাণীর দেহে অবস্থান করেন।'[৪০] সুস্পষ্ট স্থানীয় কোনও ঈশ্বরের উপাসনা বহুঈশ্বরবাদীতার একটা ধরণ: স্বর্গ কোনও স্থান নয়, বরং ক্রাইস্টের আধ্যাত্মিক উপস্থিতি। বথিউমলি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের বাইবেলিয় ধারণা অপর্যাপ্ত: পাপ কোনও কর্ম নয়, বরং একটা অবস্থা, আমাদের স্বর্গীয় প্রকৃতির ঘাটতি। কিন্তু তারপরেও রহস্যজনকভাবে ঈশ্বর পাপেও উপস্থিত আছেন, যা সোজা কথায় 'ঈশ্বরের অন্ধকার দিক, আলোর কিঞ্চিৎ অভাব মাত্র।'[৪১] প্রতিপক্ষ বথিউমলিকে নাস্তিক বলে নিন্দা জানিয়েছে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ফক্স, ওয়েসলি এবং যিনযেনবার্গ চেতনা হতে দূরবর্তী নয়, যদিও বেশ চাঁছাছোলাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ের পিয়েটিস্ট ও মেথডিস্টদের মতো তিনি দূরবর্তী ও অমানবিকভাবে বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠা এক ঈশ্বরকে অন্তরীকরণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন ও প্রচলিত মতবাদকে ধর্মীয় অনুভূতিতে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আলোকন পর্বের

AMARBOI.COM

দার্শনিক ও হৃদয়ের ধর্মের অনুসারীদের কর্তৃত্বের প্রত্যাখ্যান ও অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মানবতার আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার ছিলেন।

পাপের পবিত্রতার গভীরভাবে উত্তেজক ও বিদ্রোহী মতবাদ নিয়ে কাজ করছিলেন বথিউমলি। ঈশ্বর যদি সবকিছু হন, পাপ কিছুই নয়—লরেন্স ক্লার্কসন এবং অ্যালাস্টেয়ার-এর মতো র‍্যান্টার্সরা প্রচলিত যৌন আচরণ বিধি লঙ্ঘন বা প্রকাশ্যে মুখখিস্তি ও ব্লাসফেমি করে এই বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কপ বিশেষত মাতলামী ও ধূমপানের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। র‍্যান্টার হওয়ার পর তিনি স্পষ্টতই দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন গালিগালাজ আর মুখখিস্তি করে। আমরা শুনতে পাই, তিনি লন্ডনে এক চার্চের পুলপিটে দাঁড়িয়ে টানা এক ঘন্টা গালিগালাজ করেছিলেন এবং এক ট্যাভার্নের হোস্টেসকে এমন জঘন্য মুখ খারাপ করেছিলেন যে বেচারি পরে কয়েক ঘন্টা ধরে আতঙ্কে কেঁপেছে। এটা মানব জাতির পাপময়তার ওপর অস্বাস্থ্যকর মনোযোগ সম্পন্ন নিপীড়ক পিউরিটান নৈতিকতার প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে। ফক্স ও তাঁর কোয়াকাররা জোরের সঙ্গে বলেছেন, পাপ কোনভাবেই অনিবার্য ছিল না। তিনি অবশ্যই বন্ধুদের পাপে উৎসাহ দেননি, র‍্যান্টার্সদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি ঘৃণা করতেন, কিন্তু তারও আশাব্যঞ্জক নৃতত্ত্ব প্রচার এবং ভারসাম্য আনতে চেয়েছিলেন। লরেন্স ক্লার্কসন তাঁর রচনা *সিঙ্গল আই*-তে যুক্তি দিয়েছেন যে, ঈশ্বর যেহেতু সকল বস্তুকে ভালো অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু কেবল মানুষের কল্পনাতেই 'পাপে'র অবস্থান। ঈশ্বর স্বয়ং বাইবেলে দাবি করেছেন যে, তিনি অন্ধকারকে আলোয় পরিণত করবেন। একেশ্বরবাদীরা সবসময় পাপের বাস্তবতাকে মেনে নিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে এসেছে, যদিও অতিন্দ্রীয়বাদীরা আরও অধিকতর হলিস্টিক দর্শন আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছে। নরউইচের জুলিয়ান বিশ্বাস করতেন যে, পাপ 'মানানসই' ও কোনওভাবে প্রয়োজনীয়। কাব্বালিস্টরা মত দিয়েছিল যে, রহস্যজনকভাবে পাপ ঈশ্বরের মাঝে প্রোথিত। ক্লার্কসন ও কপদের মতো র‍্যান্টার্সদের চরম উদারবাদকে একজন ক্রুদ্ধ প্রতিশোধপরায়ণ ঈশ্বরের মাধ্যমে বিশ্বাসীকে আতঙ্কিত করে তোলা নিপীড়ক খৃস্টধর্মকে ঝেড়ে ফেলার প্রয়াস হিসাবে দেখা যেতে পারে। যুক্তিবাদী ও 'আলোকিত' ক্রিশ্চানরাও ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর কর্তৃত্বময় চরিত্র হিসবে উপস্থাপনকারী ধর্মের সংযোজন ঝেড়ে ফেলার প্রয়াস পাচ্ছিল। একজন কোমলতর উপাস্য আবিষ্কার করতে চেয়েছে তারা।

সামাজিক ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, পাশ্চাত্যের খৃস্টবাদ এর সময়ান্তরে নিপীড়ক ও সহনশীল চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের জন্যে বিশ্ব-ধর্মগুলোরা মাঝে অনন্য। তাঁরা আরও উল্লেখ করেছেন, নিপীড়ক পর্যায়গুলো

AMARBOI.COM

সাধারণত ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে মিশে গেছে। আলোকন পর্বের অধিকতর নৈতিক আবহাওয়া পশ্চিমের বহু স্থানে ভিক্টোরিয়ান কালের নিপীড়নের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে, যার সঙ্গে অধিকতর মৌলবাদী ধার্মিকতার জোয়ার যোগ হয়। আমাদের নিজস্বকালে আমরা ১৯৬০-এর দশকের সহনশীল সমাজকে ১৯৮০র দশকের অধিকতর পিউরিটান নৈতিকতার পথ খুলে দিতে দেখেছি যা পশ্চিমে খৃস্টীয় মৌলবাদের উত্থানেরও সমসাময়িক। এটা একটা জটিল ঘটনা, সন্দেহ নেই এর পেছনে একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। অবশ্য এর সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণাকে যুক্ত করার প্রলোভন জাগে, পশ্চিমবাসীরা যাকে অসুবিধাপূর্ণ হিসাবে আবিষ্কার করেছে। মধ্যযুগের ধর্মবিদ ও অতিন্দ্রীয়বাদীরা হয়তো একজন প্রেমময় ঈশ্বরের প্রচারণা চালিয়েছিলেন, কিন্তু ক্যাথেড্রালের দরজায় দরজায় আঁকা আতঙ্ক জাগানো অভিশপ্তদের ওপর অত্যাচারের ছবি ভিন্ন কাহিনী বলে। আমরা যেমন দেখেছি, পাশ্চাত্যে প্রায়শঃই ঈশ্বর অনুভূতি অন্ধকার ও সংগ্রাম দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। ক্লার্কসন ও কপের মতো র‍্যান্টার্সরা যখন ক্রিশ্চান টাবু অস্বীকার করছিলেন, পাপের পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই একই সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উইচক্র্যাফটের উন্মাদনা বয়ে যাচ্ছিল। ক্রমওয়েলের ইংল্যান্ডের চরমপন্থী ক্রিশ্চানরা অতি চাহিদা সম্পন্ন ও ভয় জাগানো একজন ঈশ্বর ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিল।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে পশ্চিমে আবির্ভূত নব-জন্ম লাভের খৃস্টধর্ম প্রায়শঃই অস্বাস্থ্যকর ছিল। এর বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল এবং কখনও কখনও বিপজ্জনক আবেগ ও পরিবর্তন। ১৭৩০-এর দশকে গোটা নিউ ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়া *গ্রেট অ্যাওয়াকেনিং* নামে পরিচিত ধর্মীয় উন্মাদনার মাঝে এ ব্যাপারটি দেখতে পাই আমরা। ওয়েসলির অনুসারী ও সহযোগী জর্জ হুইটফিল্ডের ইভেঞ্জিলিক্যাল প্রচারণা ও ইয়েলে শিক্ষাপ্রাপ্ত জোনাথান এডওয়ার্ডসের (১৭০৩-৫৮) অনলবর্ষী সারমনে এটা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এডওয়ার্ডস তাঁর রচনায় এই জাগরণের বিবরণ দিয়েছেন 'কানেক্টিকাটের নর্দামটনে ঈশ্বরের বিস্ময়কর লীলার বিশ্বস্ত বিবরণ।' সেখানে তিনি তাঁর প্যারিশনারদের সাধারণের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয় বলে উল্লেখ্য করেন; তারা নম্র, সুশৃঙ্খল এবং ভালো; কিন্তু ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন। অন্যান্য কলোনির নারী-পুরুষের তুলনায় ভালো বা খারাপ কোনওটাই নয়। কিন্তু ১৯৩৪ সালে দুই তরুণের আকস্মিক অপমৃত্যু ঘটে। এঘটনায় (পরে মনে হয়েছে স্বয়ং এডওয়ার্ডসের ভয়ঙ্কর কথাবার্তায় উস্কানি পেয়ে) গোটা শহর ধর্মীয় উন্মাদনায় মত্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষ ধর্ম ছাড়া অন্য আর কিছুই আলোচনা করতে পারছিল না। কাজকর্ম ফেলে সারাদিন বাইবেল পড়ে কাটাচ্ছিল তারা।

AMARBOI.COM

মোটামুটি ছয় মাসের মধ্যেই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ভেতর প্রায় তিন শো নবজন্ম-লাভকারী নবদীক্ষিত ক্রিশ্চান দেখা গেছে: কখনও কখনও সপ্তাহে পাঁচজনকেও ধর্মান্তরিত হতে দেখা গেছে। এই উন্মাদনাকে এডওয়ার্ডস স্বয়ং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ভূমিকা হিসাবে দেখেছিলেন; একেবারেই আক্ষরিক অর্থেই কথাটা প্রয়োগ করেছেন তিনি, এটা সামান্য ধার্মিকতার *facon de Parler* ছিল না। বারবার তিনি যেমন বলেছেন, নিউ ইংল্যান্ডে 'ঈশ্বর যেন তাঁর প্রচলিত ভূমিকা ছেড়ে সরে এসে এখানকার মানুষকে অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক উপায়ে পরিচালিত করছেন'। অবশ্য এটা বলা প্রয়োজন, পবিত্র আত্মা কখনও কখনও অনেকটা হিস্টেরিক্যাল লক্ষণের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। অনেক সময়, আমাদের বলছেন এডওয়ার্ডস, তারা ঈশ্বরের ভয়ে একবারে 'ভেঙে' পড়ে আর 'ঈশ্বরের অনুকম্পার অতীত পাপবোধের চাপে অতল গহবরে হারিয়ে যায়।' এরপর আসবে একই রকম পরম উল্লাসের পালা, যখন তাদের মনে আকস্মিক মুক্তি লাভের বোধ জাগে। তারা একই সময় 'প্রবল হাসিতে ভেঙে' পড়ত; প্রায়ই 'বানের জলের মতো অশ্রু বর্ষিত হতো, হাসির সঙ্গে মিশে যেত সশব্দ কান্না। কখনও কখনও নিঃশব্দে কেঁদে ওঠা ঠেকাতে পারত না তারা।'[৪২] সকল প্রধান ধর্মের অতিন্দ্রিয়বাদীরা শান্ত নিয়ন্ত্রণকে প্রকৃত আলোকনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিশ্বাস করেছে, আমরা তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি।

এই প্রবল আবেগগত পরিবর্তনে আমেরিকার ধর্মীয় জাগরণের বৈশিষ্ট্য রয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল যন্ত্রণা আর প্রয়াসের প্রবল খিঁচুনী যুক্ত এক নতুন জন্ম, ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রামের নিজস্ব পাশ্চাত্য রূপ। এই অ্যাওয়াকেনিং সংক্রামক রোগের মতো আশপাশের শহর-গ্রামগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক যেমন বহু শতাব্দী পরে ধর্মীয় উন্মাদনার আঁচে স্বভাবগতভাবে দগ্ধ নিউইয়র্ক রাজ্যকে 'বানর্ড-ওভার ডিস্ট্রিক্ট' বলে অভিহিত করা হবে। এই মহিমান্বিত অবস্থায় এডওয়ার্ডস লক্ষ করেছেন যে, তাঁর নবদীক্ষিতরা সমগ্র দুনিয়াকেই আনন্দময় অনুভব করেছে। নিজেদের তারা বাইবেল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারত না। অনেক সময় নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত। সম্ভবত এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, মোটামুটি দুই বছর পর তাদের আবেগ প্রশমিত হয়ে যায়, যখন এডওয়ার্ডস লক্ষ করেন, 'ঈশ্বরের আত্মার আমাদের ছেড়ে ক্রমশঃ চলে যাওয়াটা বেশ যৌক্তিকভাবেই সূচিত হয়েছে।' তিনি কিন্তু রূপকার্থে বলছিলেন না একথা: ধর্মীয় বিষয়ে এডওয়ার্ডস খাঁটি পশ্চিমা অক্ষরবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন, অ্যাওয়াকেনিং প্রকৃতই তাদের মাঝে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ছিল, প্রথম পেন্টেকস্টে পবিত্র আত্মার বাস্তব কর্মকাণ্ডের মতো। ঈশ্বর যখন আগমনের মতোই আচমকা সরে গেলেন, আবার তাঁর স্থান আক্ষরিক অর্থেই

AMARBOI.COM

স্যাটান দখল করে নিল। পরম আনন্দের পর এল আত্মহননের মতো হতাশা। প্রথম এক বেচারা নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করল। এই ঘটনার পর এ শহর এবং অন্যান্য শহরের জনতার মাঝে যেন প্রবল ধারণার সৃষ্টি হলো, এই লোককে অনুসরণ করার জন্যে কেউ যেন তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছিল। অনেকের মনে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে, যেন কেউ তাদের বলছিল, 'গলা কেটে ফেল, এখনই সুবর্ণ সুযোগ। এখনই!' দুজন লোক 'অদ্ভুত, উদ্দীপনাময় বিভ্রান্তি'র[৪৩] কারণে উন্মাদ হয়ে যায়। এরপর আর কেউ ধর্মান্তরিত হয়নি। তবে যারা এই অভিজ্ঞতার পরে বেঁচে ছিল তারা অ্যাওয়াকেনিংয়ের আগের সময়ের তুলনায় আরও শান্ত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল, কিংবা এডওয়ার্ডস তেমনটিই আমাদের বিশ্বাস করাতে চান। এমন অস্বাভাবিকতা ও দূরবস্থার মধ্যে নিজেকে প্রকাশকারী জোনাথান এডওয়ার্ডস ও তাঁর ধর্মান্তরিতদের ঈশ্বর বরাবরের মতোই ভীতিকর; মানুষের সঙ্গে আচরণে স্বেচ্ছাচারী। আবেগের অস্বাভাবিক পরিবর্তন, উন্মাদময় আনন্দ ও গভীর হতাশা দেখায় যে, আমেরিকার বহু কম সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি 'ঈশ্বরে'র সঙ্গে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এটা নিউটনের বৈজ্ঞানিক ধর্মে আমরা যেমন দেখি পৃথিবীর ঘটনাবলীর জন্যে, তা যত অদ্ভুতই হোক, ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, এই বিশ্বাসকে তুলে ধরে।

এই প্রবল ও অযৌক্তিক ধর্মানুরাগকে ফাউন্ডিং ফাদারদের পরীক্ষিত স্থৈর্যের সঙ্গে মেলানো কঠিন। এডওয়ার্ডসের বহু প্রতিপক্ষ ছিলেন যাঁরা অওয়াকেনিংয়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন। উদারপন্থীদের দাবি মানুষের জীবনে প্রবল আলোড়নের ভেতর দিয়ে নয় ঈশ্বর কেবল যৌক্তিকভাবেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু *রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ্য আমেরিকান মাইন্ড: ফ্রম দ্য গ্রেট অ্যাওয়াকেনিং টু দ্য রিভোল্যুশন*-এ অ্যালান হেইমার্ট যুক্তি দেখিয়েছেন, অ্যাওয়াকেনিং-এর নব-জন্ম সুখ অনুসন্ধানের আলোকন পর্বের আদর্শের ইভেঞ্জিলিক্যালরূপ। এটা 'এমন এক জগৎ হতে অস্তিত্বের মুক্তি' তুলে ধরেছে, যেখানে সবকিছুই শক্তিশালী অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।'[৪৪] দরিদ্র উপনিবেশগুলোয় *অ্যাওয়াকেনিং*-এর ব্যাপারটা ঘটেছিল, যেসব স্থানে অনন্য আলোকনপর্বের আশাবাদ সত্ত্বেও মানুষের মাঝে এ জগতে সুখ লাভের প্রত্যাশা ছিল সামান্যই। পুনর্জন্ম লাভের অনুভূতি, এডওয়ার্ডস যুক্তি দেখিয়েছেন, আনন্দের এক ধরনের অনুভূতি ও সুন্দরের বোধ জাগিয়ে তোলে যা যে কোনও স্বাভাবিক অনুভূতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং *অ্যাওয়াকিং*-এ এক ঈশ্বর-অনুভূতি নতুন বিশ্বের আলোকন উপনিবেশ সমূহের কতিপয় সফল ব্যক্তির চেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আমাদের আরও স্মরণ করা দরকার যে, দার্শনিক আলোকনও আধা-ধর্মীয় মুক্তি হিসাবে অনুভূত

AMARBOI.COM

হয়েছিল। *Eclaircissement* ও *Aufklarung* শব্দ দুটোর সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় দ্যোতনা রয়েছে। জোনাথান এডওয়ার্ডসের ঈশ্বর ১৭৭৫ সালের বিপ্লবী উদ্দীপনায়ও অবদান রেখেছিলেন। পুনর্জাগরণবাদীদের চোখে ব্রিটেন পিউরিটান বিপ্লবের সময় অত্যুজ্জ্বল নতুন আলো হারিয়ে ফেলেছিল, সেটাকে পতনোন্মুখ ও পাশ্চাদগামী মনে হচ্ছিল। এডওয়ার্ডস ও তাঁর সহকর্মীরাই নিম্নশ্রেণীর আমেরিকানদের বিপ্লবের পথে প্রথম পদক্ষেপ নিতে উদ্দীপিত করেছিলেন। এডওয়ার্ডসের ধর্মের অত্যাবশ্যক উপাদান ছিল মেসিয়ানিজম; মানবীয় প্রয়াস নতুন পৃথিবীতে অর্জনযোগ্য ও অত্যাসন্ন ঈশ্বরের রাজত্বের আগমন তরান্বিত করবে। খোদ অ্যাওয়াকেনিং (এর করুণ পরিসমাপ্তি সত্ত্বেও) মানুষকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে, বাইবেলে বর্ণিত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ঈশ্বর এ ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এডওয়ার্ডস ট্রিনিটির মতবাদের একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন: পুত্র হলেন 'ঈশ্বরের উপলব্ধি দ্বারা সৃষ্ট উপাস্য' এবং এভাবে নতুন কমনওয়েলথের নীল নকশা; আত্মা হচ্ছেন উপাস্যের কার্যে বর্তমান থাকা' যিনি যথাসময়ে এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন।[৪৫] আমেরিকার নতুন বিশ্বে এভাবে পৃথিবীর বুকেই ঈশ্বর তাঁর সম্পূর্ণতা চিন্তা করতে পারবেন। খোদ সমাজ ঈশ্বরের মহত্ত্ব (Excellencies) প্রকাশ করবে। নিউ ইংল্যান্ড হবে 'পর্বতচূড়ার শহর', জেন্টাইলদের জন্যে আলোকবর্তিকা, 'জিহোবার প্রতাপ যেখানে জ্বলজ্বল করবে, সবার জন্যে আকর্ষণীয় ও তীব্র হয়ে উঠবে।'[৪৬] সুতরাং, এডওয়ার্ডসের ঈশ্বর এভাবে কমনওয়েলথে মূর্ত হয়ে উঠবেন; ক্রাইস্টকে এক আদর্শ সমাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখা হয়েছে।

AMARBOI.COM

অন্য কালভিনিস্টরা প্রগতির যানে আসীন ছিল: আমেরিকার শিক্ষাক্রমে রসায়ন অর্ন্তভুক্ত করেছিল তারা; এডওয়ার্ডসের দৌহিত্র টিমোথি ডিউইট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মানুষের চরম সম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসাবে দেখেছেন। আমেরিকার উদারপন্থীরা যেমনটি অনেক সময় কল্পনা করেছে, তাদের ঈশ্বর সর্বতোভাবে জ্ঞানার্জনে বাধাদানকারী ছিলেন না। কালভিনিস্টরা নিউটনের সৃষ্টিতত্ত্ব অপছন্দ করত, একবার কর্মধারা শুরু হয়ে যাবার পর এখানে ঈশ্বরের আর তেমন কিছু করণীয় ছিল না। আমরা যেমন দেখেছি, পৃথিবীতে আক্ষরিক অর্থে সক্রিয় একজন ঈশ্বরের পক্ষে ছিল তারা; তাদের পূর্ব নির্ধারিত নিয়তির মতবাদ দেখিয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে মর্ত্যে ভালো-মন্দ যাই ঘটুক সেগুলোর জন্যে ঈশ্বরই আসলে দায়ী। এর অর্থ বিজ্ঞান কেবল সেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে পারবে, সৃষ্ট বস্তুর কর্মকাণ্ডে যাঁকে অনুভব করা যায়—প্রাকৃতিক, সামাজিক, ভৌত ও আধ্যাত্মিক—এমনকি যেসব ঘটনা আকস্মিক বা আপতিক মনে হয় সেসবের ভেতরও। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কালভিনিস্টিরা চিন্তা-

ভাবনার দিক দিয়ে উদারপন্থীদের চেয়ে বেশি এগিয়ে ছিল, যারা তাদের পুনর্জাগরণবাদের বিরোধিতা করত এবং 'অনুমান নির্ভর,' জটিল ধারণার বদলে সহজ বিশ্বাসের পক্ষপাতি ছিল; এ ধরণের ধারণা পুনর্জাগরণবাদী হুইটফিল্ড এডওয়ার্ডসের প্রচারণায় থাকায় তারা অস্বস্তি বোধ করেছে। অ্যালান হেইমার্ট যুক্তি দেখিয়েছেন, আমেরিকার সমাজে অ্যান্টিইন্টেলেকচুয়ালিজমের মূল কালভিনিস্ট ও ইভেঞ্জেলিকালদের সঙ্গে ছিল না হয়তো, বরং অধিকতর যুক্তিবাদী চার্লস চন্সি বা স্যামুয়েল কুইন্সি-র মতো বস্টনিয়দের সঙ্গেই বেশি সম্পর্কিত, যারা ঈশ্বর সম্পর্কিত সেই ধারণা পছন্দ করতেন যেগুলো বেশি সহজ ও স্পষ্ট।'[৪৭]

ইহুদিবাদেও লক্ষণীয়ভাবে একই ধরনের কিছু অগ্রগতি ঘটেছিল যা ইহুদিদের ভেতর যুক্তিবাদী আদর্শের বিস্তার লাভের পথ তৈরি করে ও অনেককেই ইউরোপের জেন্টাইল অধিবাসীদের সাথে মিশে যেতে সক্ষম করে তোলে। প্রলয়ের বছর ১৬৬৬ সালে জনৈক ইহুদি মেসায়াহ ঘোষণা দেন যে মুক্তি একেবারে কাছে এসে পড়েছে। সারা বিশ্বের ইহুদিরা তাঁর দাবি আনন্দের সঙ্গে নেয়। ১৬২৬ সালে মন্দির ধ্বংসের বার্ষিকীতে এশিয়া মাইনরের স্মিরনায় এক সম্পদশালী সেফার্দিক ইহুদি পরিবারে শ্যাব্বেতাই যেভি জন্ম নেন। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভেতর এমন একটা প্রবণতা গড়ে উঠেছিল আজকের দিনে যাকে আমরা হয়তো 'ম্যানিক ডিপ্রেসিভ' হিসাবে শনাক্ত করতাম। মাঝে মাঝে গভীর হতাশায় ডুবে যেতেন তিনি, তখন সংসার ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতেন। বিষণ্ণতার পর আসত এক রকম আনন্দ, যা ছিল মোহাবেশের কাছাকাছি। এইসব 'উন্মাদ'কালীন সময়ে মাঝে মাঝে তিনি স্বেচ্ছায় ও দর্শনীয়ভাবে মোজেসের আইন ভঙ্গ করতেন: প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ খাদ্য খেতেন, ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতেন আর এক বিশেষ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এমনটি করার নির্দেশ পেয়েছেন বলে দাবি করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনিই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মেসায়াহ। র‍্যাবাইরা শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে ১৬৫৬ সালে শ্যাব্বেতাইকে শহর থেকে বহিষ্কার করেন। এরপর অটোমান সাম্রাজ্যে ইহুদি জনগোষ্ঠীর মাঝে ভবঘুরে হয়ে যান তিনি। ইস্তাম্বুলে থাকার সময় এমনি এক উন্মাদনা কালে তোরাহ্ বাতিল ঘোষণা দিয়ে বসেন, চিৎকার করে বলেন, 'হে আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ প্রাপ্ত, যিনি নিষিদ্ধকে সিদ্ধ করেছেন!' কায়রোতে এক মহিলাকে বিয়ে করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন তিনি, এই নারী ১৯৪৮ সালে পোলান্ডে সংঘটিত হত্যালীলা এড়িয়ে পালিয়ে ইস্তাম্বুলে এসে বেশ্যাবৃত্তি করছিল। ১৬৬২ সালে জেরুজালেমের উদ্দেশে যাত্রা করেন শ্যাব্বেতাই: এই সময় বিষণ্ন কাল অতিক্রম করছিলেন তিনি; তঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নির্ঘাৎ দুরাত্মা ভর করেছে তাঁর ওপর।

AMARBOI.COM

প্যালেস্তাইনে নাথান নামে এক তরুণ শিক্ষিত র‍্যাবাইয়ের কথা জানতে পারেন তিনি, এই র‍্যাবাই দক্ষ এক্সরসিস্ট ছিলেন, গাযায় তাঁর বাড়ির খোঁজে বেড়িয়ে পড়েন শ্যাব্বেতাই।

শ্যাব্বেতাইয়ের মতো নাথানও ইসাক লুরিয়ার কাব্বালাহ পাঠ করেছিলেন। স্মিরনা থেকে আগত অসুস্থ ইহুদির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর লক্ষণ দেখে তাঁকে জানালেন, মোটেই দুরাত্মার আসর হয়নিঃ তাঁর গভীর হতাশাই প্রমাণ করে যে তিনি প্রকৃতই মেসায়াহ। যখন তিনি এইসব গভীরতায় অবতরণ করেন, তখন 'অপর দিকে'র অশুভ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ হতে থাকে তাঁর, যার ফলে *কেলিপদের* অঞ্চলে স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, যা কেবল স্বয়ং মেসায়াহ উদ্ধার করতে পারেন। ইসরায়েলের চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের আগে শ্যাব্বেতাইয়ের নরকে নামার এক মিশন রয়েছে। শুরুতে শ্যাব্বেতাইয়ের এসবের প্রতি আগ্রহ ছিল না, কিন্তু নাথানের বাকচাতুর্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরাস্ত করে। ৩১মে ১৬৬৫ তারিখে আকস্মিকভাবে এক উন্মাদ আনন্দে আক্রান্ত হন তিনি এবং নাথানের প্ররোচনায় নিজের মেসিয়ানিক মিশনের ঘোষণা দেন। নেতৃস্থানীয় র‍্যাবাইগণ এসবকে বিপজ্জনক পাগলামি বলে নাকচ করে দেন। কিন্তু বহু ইহুদি শ্যাব্বেতাইয়ের চারপাশে ভিড় জমায়; অচিরেই পুনর্গঠিতব্য ইসরায়েল গোত্রসমূহের বিচারক হবার জন্যে বারজন অনুসারীকে বেছে নেন শ্যাব্বেতাই। এই সুখবর ইতালি, হল্যান্ড, জার্মানি ও পোল্যান্ডের পাশাপাশি অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নগরে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন নাথান। মেসিয়ানিক উত্তেজনা দাবানলের মতো সারা ইহুদি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শত শত বছরের নিপীড়ন-নির্যাতন আর সমাজচ্যুতি ইউরোপের মূল স্রোতধারা হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল ইহুদিদের। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা বহু ইহুদির মনে এ বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কেবল ইহুদিদের ওপর নির্ভর করছে। স্পেনীয় ইহুদিদের উত্তরসূরি সেফার্দিমরা লুরিয়ার কাব্বালাহকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল; অনেকেই প্রলয় দিবস অত্যাসন্ন বলে বিশ্বাস করেছিল। এসবই শ্যাব্বেতাইয়ের কাল্টকে সহযোগিতা যুগিয়েছে। ইহুদিদের ইতিহাস জুড়ে বহু মেসায়াহ্‌র দাবিদার ছিল, কিন্তু তাদের কেউই এরকম সমর্থন আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। শ্যাব্বেতাইয়ের বিপক্ষে যাদের অবস্থান ছিল তাদের পক্ষে মুখ খোলা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। সমাজের সকল স্তরেই তাঁর সমর্থক ছিল; ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-শিক্ষিত। প্ল্যামফ্লেট আর সংবাদপত্র ইংরেজি, ডাচ, জার্মান ও ইতালিয় ভাষায় আনন্দ সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিল। পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ায় তাঁর সম্মানে গণমিছিল বের হয়েছে। অটোমান সাম্রাজ্যে পয়গম্বররা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দিব্যদর্শনে শ্যাব্বেতাইকে সিংহাসনে আসীন দেখার বর্ণনা দিয়ে বেড়িয়েছেন। সকল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল; অশুভ

AMARBOI.COM

লক্ষণের মতো ইহুদিরা সাব্বাথ প্রার্থনা থেকে সুলতানের নাম বাদ দিয়ে শ্যাব্বেতাইয়ের নাম জুড়ে দিল। শেষমেষ ১৬৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে শ্যাব্বেতাই ইস্তাম্বুলে পৌছলে তাঁকে বিদ্রোহী হিসাবে গ্রেপ্তার করে গ্যালিপলির কারাগারে আটক করা হয়।

শত শত বছরের নিপীড়ন, নির্বাসন ও অপমানের পর আশার সঞ্চার হয়েছিল। পৃথিবী জুড়ে ইহুদিরা এমন এক অভ্যন্তরীণ মুক্তি আর স্বাধীনতার বোধে ভরে উঠেছিল যা কাব্বালিস্টরা *সেফিরদের* রহস্যময় জগৎ নিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যে মোহাবিষ্টতার অনুভূতি অর্জন করত তার মতো ছিল। মুক্তির অভিজ্ঞতাটি এখন আর মুষ্টিমেয় সুবিধাপ্রাপ্তদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত রইল না, বরং সাধারণ মানুষের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রথমবারের মতো ইহুদির মনে বোধ জেগেছিল যে, তাদের জীবনের একটা মূল্য আছে; প্রায়শ্চিত্ত বা মুক্তি অর্জন এখন আর ভবিষ্যতের অস্পষ্ট কোনও ব্যাপার নয়, বরং বর্তমানেই তা উপস্থিত ও বাস্তব। মুক্তি এসে গিয়েছিল। আকস্মিক এই পরিবর্তন অনেপনীয় প্রভাব বিস্তার করে। গোটা ইহুদি সম্প্রদায়ের নজর আবদ্ধ হয়েছিল গ্যালিপলির দিকে যেখানে আটককারীর ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন শ্যাব্বেতাই। তুর্কী উযির বেশ আরাম আয়েসেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁকে। শ্যাব্বেতাই তাঁর লেখা চিঠিপত্রে 'আমি তোমাদের প্রভু ঈশ্বর শ্যাব্বেতাই যেভি' লিখে স্বাক্ষর শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে যখন বিচারের জন্যে ফের ইস্তাম্বুলে ফিরিয়ে আনা হলো, ফের বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। সুলতান তাঁকে ইসলাম বা মৃত্যুদণ্ডের যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলেন: শ্যাব্বতাই ইসলাম গ্রহণ করলেন; অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হলো তাঁকে। রাজকীয় ভাতা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে; দৃশ্যতঃ বিশ্বস্ত মুসলিম হিসাবেই ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৬৭৬ তারিখে তিনি মারা যান।

এই ভয়ঙ্কর সংবাদে স্বভাবতই তাঁর সমর্থকরা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, যাদের অনেকেই নিমেষে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। র‍্যাবাইগণ পৃথিবীর বুক থেকে তাঁর স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন: শ্যাব্বেতাই সম্পর্কে যেখানে যত চিঠি, প্যামফ্লেট বা রচনা উদ্ধার করা গেছে সব ধ্বংস করে ফেলেন তারা। আজও বহু ইহুদি এই মেসিয়ানিক বিপর্যয় নিয়ে বিব্রত বোধ করে। এর সঙ্গে মানিয়ে উঠতে কষ্ট বোধ করে। র‍্যাবাই ও যুক্তিবাদী এ দুই দলই সমানভাবে এর তাৎপর্যকে খাটো করে দেখিয়েছেন। অবশ্য সাম্প্রতিককালে পণ্ডিতগণ এই বিচিত্র ঘটনার অর্থ ও অধিকতর তাৎপর্যময় ভবিষ্যৎ ফল উপলব্ধি করার প্রয়াসে প্রয়াত গারশর্ম শোলেমের পথ অনুসরণ করেছেন।[৪৮] বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু শ্যাব্বেতাইয়ের ধর্ম ত্যাগের কেলেঙ্কারী সত্ত্বেও বহু ইহুদি

AMARBOI.COM

মেসায়াহর অনুগত রয়ে গিয়েছিল। মুক্তি লাভের অনুভূতি এতটাই গভীর ছিল যে, তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি ঈশ্বর তাদের বিভ্রান্ত হবার অবকাশ দিতে পারেন। এটা ঘটনা ও যুক্তির অগ্রবর্তী স্থান গ্রহণকারী মুক্তি লাভের ধর্মীয় অনুভূতির অন্যতম চমকপ্রদ উদাহরণ। সদ্য প্রাপ্ত আশা ত্যাগ বা ধর্মত্যাগী মেসায়াহর যে কোনও একটি বেছে নিতে গিয়ে সকল শ্রেণীর অবিশ্বাস্য সংখ্যক ইহুদি ইতিহাসের কঠিন সত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে। গাযার নাথান বাকি জীবন শ্যাব্বেতাইয়ের রহস্য প্রচার করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন; ইসলাম গ্রহণ করে তিনি (শ্যাব্বেতাই) অশুভের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। আবার, *কেলিপদ*কে মুক্ত করতে অন্ধকার জগতে অবতরণের উদ্দেশ্যে আপন জনগণের গভীরতম পবিত্রতা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। তাঁর মিশনের দুঃখজনক ভার বহন করেছেন তিনি; ভেতর থেকেই ঈশ্বরহীনতার জগতকে জয় করতে সর্বনিম্ন গভীরতায় নেমেছেন। তুরস্ক ও গ্রিসে প্রায় দুশো পরিবার শ্যাব্বেতাইয়ের অনুগত রয়ে যায়: তাঁর মৃত্যুর পর অশুভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে তাঁর নজীর অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৬৮৩ সালে গণহারে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা গোপনে ইহুদিবাদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে র‍্যাবাইদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি পরস্পরের বাড়িতে গোপন সিনাগগে জমায়েতে মিলিত হতে থাকে। ১৬৮৯ সালে তাদের নেতা জ্যাকব কুয়েরিতো মক্কায় হজ পালন করেন এবং মেসায়াহর বিধবা স্ত্রী ঘোষণা দেয় যে, কুয়েরিতোই শ্যাব্বেতাই [illegible] অবতার। তুরস্কে তখনও *দনমেহ* (ধর্মত্যাগী) একটা ছোট দল ছিল যারা বাইরে বাইরে খাঁটি ইসলামী আচার-আচরণ দেখালেও গোপনে প্রবলভাবে ইহুদিবাদ আঁকড়ে ছিল।

অন্য শ্যাব্বতায়িরা অবশ্যই এতটা বাড়াবাড়ি না করে মেসায়াহ্ ও সিনাগগের প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে যায়। সময়ে যেমন বিশ্বাস করা হয়েছে, গোপন শ্যাব্বেতায়িদের সংখ্যা তারচেয়ে বেশি বলেই মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহুদিদের অধিকতর উদার রূপ গ্রহণকারী বা যোগদানকারী বহু ইহুদি শ্যাব্বেতিয় পূর্ব-পুরুষ থাকাটাকে লজ্জাকর মনে করেছে, তবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টাদশ শতকের বহু বিশিষ্ট র‍্যাবাই শ্যাব্বেতাইকে প্রকৃত মেসায়াহ হিসাবে বিশ্বাস করেছেন। শোলেম যুক্তি দেখিয়েছেন, এই মেসিয়ানিজম কখনওই ইহুদিবাদে গণআন্দোলনের রূপ না নিলেও এর সংখ্যাকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। ম্যারানোদের কাছে বিশেষ আবেদন ছিল এর, স্প্যানিশরা জোর করে এদের খৃস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করলেও এরা শেষ পর্যন্ত আবার ইহুদিবাদে প্রত্যাবর্তন করেছিল। মরক্কো, বলকান অঞ্চল, ইতালি ও লিথুয়ানিয়ায় সেফার্দিম জনগোষ্ঠীর মাঝে শ্যাব্বতাইবাদ সাড়া জাগিয়েছিল। রেজিওর বেঞ্জামিন কন ও মোদেনার আব্রাহাম রোরিগো'র মতো বিশিষ্ট

AMARBOI.COM

কাব্বালিস্টরা এই আন্দোলনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। বালকান অঞ্চল থেকে মেসিয়ানিক গোষ্ঠী পোল্যান্ডের অ্যাশকেনাজিয় ইহুদিদের মাঝে বিস্তৃত হয়, যারা পূর্ব ইউরোপের ক্রমবর্ধমান অ্যান্টিসেমিটিজমের কারণে মনোবল হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। ১৭৫৯ সালে অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর পয়গম্বর জ্যাকব ফ্রাঙ্কের অনুসারীরা তাদের মেসায়াহর পথ অনুসরণ করে সদলে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে গোপনে ইহুদিবাদের অনুসরণ অব্যাহত রাখে।

শোলেম খৃস্টধর্মের উদ্ভাসিত করা তুলনার কথা বলেছেন। প্রায় ষোল শো বছর আগে ইহুদিদের আরেকটি দল এক কলঙ্কময় মেসায়াহর আশা ছাড়তে পারেনি। এই মেসায়াহ সাধারণ অপরাধীর মতো জেরুজালেমের কারাগারে প্রাণ হারান। সেইন্ট পল যাঁকে 'ক্রসের কেলেঙ্কারি' আখ্যায়িত করেছিলেন সেটা একজন ধর্মত্যাগী মেসায়াহর কেলেঙ্কারির মতোই হতবুদ্ধিকর ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই অনুসারীরা পুরোনো ইহুদিবাদের জায়গায় স্থান করে নেওয়া এক নতুন ধরনের ইহুদিবাদের জন্মের ঘোষণা দিয়েছিল; এক বৈপরীত্যময় বিশ্বাসকে আলিঙ্গন করে তারা। ক্রিশ্চানদের বিশ্বাস, ক্রসের পরাজয় বরণের ভেতর এক নতুন জীবন লাভ ঘটেছে, তেমনি শ্যাব্বেতিয়দেরও বিশ্বাস ছিল, ধর্মত্যাগ এক পবিত্র রহস্য। দুটো গোষ্ঠীই বিশ্বাস করত যে, ফল বহন করার জন্যে গমের বীজকে অবশ্যই মাটিতে পচতে হয়; তাদের বিশ্বাস ছিল, তোরাহ্র মৃত্যু ঘটেছে; আত্মার নতুন নিয়ম সে জায়গা অধিকার করেছে। উভয়ই ঈশ্বরের ত্রিত্ব ও অবতারণবাদের ধারণা গড়ে তুলেছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু ক্রিশ্চানের মতো শ্যাব্বেতিয়রা বিশ্বাস করত, এক নতুন পৃথিবীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে তারা। কাব্বালিস্টরা বারবার বলেছে যে, নির্বাসনকালে অস্পষ্ট রয়ে যাওয়া ঈশ্বরের প্রকৃত রহস্য অন্তিমকালে উন্মোচিত হবে। মেসিয়ানিক যুগে বসবাস করার বিশ্বাস লালনকারী শ্যাব্বেতিয়রা ঈশ্বরের প্রচলিত ধারণা ত্যাগে কোনওই দ্বিধা করেনি, এমনকি তার মানে আপাতঃ ব্লাসফেমাস ধর্মতত্ত্ব বেছে নেওয়া হচ্ছে মনে হলেও। এভাবেই ক্রিশ্চান ধর্মতত্ত্ব পাঠ দিয়ে যাত্রা শুরু করা মারানো বংশোদ্ভূত আব্রাহাম কারদাযো (১৭০৬) বিশ্বাস করতেন, পাপের কারণেই সকল ইহুদির ধর্মত্যাগ পূর্ব নির্ধারিত হয়েছিল। এটাই তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। কিন্তু ঈশ্বর মেসায়াহকে তাদের পক্ষে চরম আত্মত্যাগের সুযোগ দিয়ে তাদের এই ভয়ঙ্কর নিয়তি হতে রক্ষা করেছেন। তিনি ভীতিকর উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, নির্বাসিত থাকা অবস্থায় ইহুদিরা ঈশ্বরের সকল প্রকৃত জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছে।

ক্রিশ্চান ও আলোকন পর্বের ডেইটিস্টদের মতো কারদাযো ধর্ম হতে তাঁর দৃষ্টিতে ভ্রান্ত সংযোজনসমূহ বাদ দিয়ে বাইবেলের খাঁটি ধর্মে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে ক্রিশ্চান

AMARBOI.COM

নাস্তিকরা জেসাস ক্রাইস্টের 'গোপন ঈশ্বর'কে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য সমস্ত ইহুদিদের নিষ্ঠুর ঈশ্বর থেকে আলাদা করে এক ধরনের মেটাফিজিক্যাল অ্যান্টি-সেমিটিজম গড়ে তুলেছিল। কারদাযো এবার সেই প্রাচীন ধারণা পুনরুজ্জীবিত করলেন তবে উল্টে দিয়ে। তিনি এও শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর ছিলেন দুজনঃ এদের যিনি নিজেকে ইসরায়েলের কাছে প্রকাশ করেছেন আর অপরজন সাধারণ জনগণের ঈশ্বর। প্রত্যেক সভ্যতায় মানুষ 'আদি কারণে'র অস্তিত্বের প্রমাণ করেছেঃ এই উপাস্যের কোনও ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল না; তিনি জগৎ সৃষ্টি করেননি, মানব জাতির ব্যাপারে তাঁর কোনও মাথা ব্যাথা ছিল না; সুতরাং তিনি বাইবেলে নিজেকে প্রকাশ করেননি, বাইবেলে কখনও তাঁর নাম উল্লেখ হয়নি। নিজেকে আব্রাহাম, মোজেস ও অন্যান্য পয়গম্বরদের কাছে প্রকাশকারী দ্বিতীয় ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনেরঃ তিনি শূন্য হতে পৃথিবী বা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, ইসরায়েলকে উদ্ধার করেছেন এবং তিনিই এর ঈশ্বর। অবশ্য, নির্বাসিত অবস্থায় সাআ'দিয়া ও মায়মোনিদসের মতো দার্শনিকরা *গোয়িম*দের, ঘেরাওয়ে থাকায় তাদের কিছু কিছু ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। পরিণামে তাঁরা দুই ঈশ্বরকে গুলিয়ে ফেলে ইহুদিদের শিক্ষা দেন যে, তাঁরা দুজন এক ও অভিন্ন। ফলে ইহুদিরা দার্শনিকদের ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করে যেন তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর।

দুজন ঈশ্বর পারস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন কীভাবে? ইহুদি একেশ্বরবাদ বাদ না দিয়েই বস্তুত এই ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কারদাযো একটি ত্রিত্ববাদী ধর্মতত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন। তিনটি *হিপোস্তাসে* (অবয়ব) বা *পারযুফিম* সম্পন্ন একজন গডহেড ছিলেনঃ এগুলোর প্রথমটির নাম ছিল *আতিকা কাদিশা,* পবিত্র প্রাচীনজন। ইনি ছিলেন প্রথম কারণ। প্রথমটি হতে উৎসারিত *দ্বিতীয় পারযুফ, মালকা কাদিশা* নামে আখ্যায়িত; তিনি ছিলেন ইসরায়েলের ঈশ্বর। তৃতীয় *পারযুফটি* শেকিনাহ, যিনি, ইসাক লুরিয়া যেমন বলেছেন, গডহেড হতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। কারদাযো বলেছেন, এই 'ধর্মের তিনটি গেরো,' তিনটি আলাদা ঈশ্বর ছিলেন না, বরং রহস্যজনকভাবে এক, যেহেতু তাঁরা একই গডহেডে প্রকাশিত। মধ্যপন্থী শ্যাব্বেতিয় ছিলেন কারদাযো। ধর্ম পরিবর্তনকে দায়িত্ব ভাবেননি তিনি, কারণ শ্যাব্বেতাই যেভিই তাঁর পক্ষে এই যন্ত্রণাদায়ক কাজটি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু ট্রিনিট্রির প্রস্তাবনা রেখে একটা টাবু ভঙ্গ করছিলেন তিনি। শত শত বছর ধরে ইহুদিরা ট্রিনিটির মতবাদকে ঘৃণা করে এসেছে, তারা একে ব্লাসফেমাস ও বহুঈশ্বরবাদীতা হিসাবে দেখেছে। কিন্তু বিস্ময়কর সংখ্যায় ইহুদি এই নিষিদ্ধ দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিল। পৃথিবীর কোনও পরিবর্তন ছাড়াই বছরের পর বছর পেরিয়ে যাওয়ায় শ্যাব্বেতিয়রা তাদের মেসিয়ানিক প্রত্যাশায়

AMARBOI.COM

পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছিল। নেহেমিয়াহ হায়িম, স্যামুয়েল প্রিমো ও জোনাথান ইবেসশুযদের মতো শ্যাব্বেতিয়রা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, 'গডহেডের রহস্য' (*সদ হা-ইলোহাত*) ১৬৬৬ সালে পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি। লুরিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেকিনাহ 'ধুলি হতে উঠতে' শুরু করেছিল, কিন্তু শেষতক গডহেডে প্রত্যাবর্তন করেনি। মুক্তিলাভ এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া; পরিবর্তনের এই সময়ে পুরাতন নিয়ম অনুসরণ ও সিনাগগে প্রার্থনা অনুমোদিত, পাশাপাশি মেসিয়ানিক মতবাদ গোপনে পালন করে যেতে হবে। পরিবর্তিত এই শ্যাব্বেতিয়বাদ ব্যাখ্যা করে যে, শ্যাব্বেতাইকে মেসায়াহ হিসাবে বিশ্বাস লালনকারী কতজন র‍্যাবাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে পালপিটে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ধর্মান্তরিত চরমপন্থীরা অবতারবাদের এক ধর্মতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং এভাবে আরেকটি ইহুদি টাবু ভঙ্গ করছিল। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, শ্যাব্বেতাই যেভি কেবল মেসায়াহই নয় বরং ঈশ্বরের অবতারও ছিলেন। খৃস্টধর্মের মতো ক্রমে এই বিশ্বাস বিবর্তিত হয়েছে। আব্রাহাম কারদাযো একটি মতবাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যা পুনরুত্থানের পর সেইন্ট পলের জেসাসের মহিমান্বিতকরণের বিশ্বাসের অনুরূপ: ধর্ম ত্যাগের সময় যখন উদ্ধার লাভ পর্বের সূচনা ঘটেছে তখন শ্যাব্বেতাই *পারযুফিমের* ট্রিনিটিতে উন্নীত হয়েছেন; 'পবিত্রজন (*মালকা কাদিশা*) আশীর্বাদপ্রাপ্ত হলেন, নিজেকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শ্যাব্বেতাই স্বীয় ঊর্ধারোহণ করে ঈশ্বরও হওয়ার জন্যে তাঁর স্থান গ্রহণ করেছেন।'[৪৯] সুতরাং, কোনওভাবে তিনি স্বর্গীয় স্তরে উন্নীত হয়েছেন ও ইসরায়েলের ঈশ্বরের অর্থাৎ দ্বিতীয় *পারযুফের* স্থান অধিকার করেছেন। অচিরেই ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী দনমেহরা এ ধারণাটিকে আরেকটু আগে বাড়িয়ে সিদ্ধান্ত পৌঁছে যে, ইসরায়েলের ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে শ্যাব্বেতাইয়ের মাঝে দেহরূপ ধারণ করেছেন। যেহেতু তারা এও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে তাদের সব নেতাই মেসায়াহর একেকজন অবতার, ফলে এটাই দাঁড়ায় যে তারাও অবতারে পরিণত হয়েছে, সম্ভবত ঠিক শিয়াহ্ ইমামদের মতো। সুতরাং ধর্মত্যাগীদের প্রত্যেক প্রজন্মের একজন নেতা ছিলেন যিনি স্বর্গীয় সত্তার অবতার।

১৭৫৯ সালে অ্যাশকেনাযিয় অনুসারীদের ব্যাপ্টিজমে নেতৃত্বদানকারী জ্যাকব ফ্রাঙ্ক (১৭২৬-১৭৯১) বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, গোড়া থেকেই তিনি ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। ইহুদিবাদের গোটা ইতিহাসে তাঁকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চরিত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অশিক্ষিত ছিলেন তিনি এবং এ নিয়ে তাঁর গর্বের শেষ ছিল না; তবে এক রহস্যময় ধর্মতত্ত্ব গড়ে তোলার ক্ষমতা ছিল তাঁর যা এমন একদল ইহুদিকে আকৃষ্ট করেছিল যাদের কাছে ধর্ম বিশ্বাস

AMARBOI.COM

ফাঁকা ও অসন্তোষজনক মনে হয়েছিল। ফ্রাঙ্ক প্রচার করেন, পুরাতন নিয়ম রদ হয়ে গেছে। প্রকতৃপক্ষেই, সকল ধর্মকে ধ্বংস করতে হবে যাতে ঈশ্বর স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারেন। তাঁর *স্লোয়া প্যানস্কিতে* (সদাপ্রভুর বাণী) তিনি শ্যাব্বেতিয়বাদকে নিহিলিজম-এর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। সমস্ত কিছুকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে হবে: 'আদম যেখানে পদচারণা করেছেন, নগর গড়ে উঠেছে: কিন্তু আমি যেখানেই পা রাখব, সেখানকার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, কারণ আমি এ পৃথিবীতে এসেছি কেবল ধ্বংস আর বিনাশ সাধনের জন্যে।'[৫০] ক্রাইস্টের কিছু কিছু বক্তব্যের সঙ্গে অস্বস্তিকর সাযুস্য রয়েছে, তিনিও দাবি করেছিলেন যে শান্তি নয় বরং তরবারি আনার জন্যে তাঁর আগমন ঘটেছে। অবশ্য জেসাস ও সেইন্ট পলের বিপরীতে ফ্রাঙ্ক পুরোনো পবিত্রতার জায়গায় নতুন কিছু স্থাপনের প্রস্তাব রাখেননি। তাঁর নিহিলিস্টিক বিশ্বাসে সমসাময়িক তরুণ মারকিস দে স্যাদের ধারণা হতে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না। কেবল মর্যাদাহানির সর্বনিম্ন স্তরে অবতরণের ভেতর দিয়েই মানুষ শুভ ঈশ্বরের কাছে উর্ধ্বারোহণ করতে পারে। এটা কেবল সকল ধর্মের প্রত্যাখ্যান নয়, বরং 'অদ্ভুত' সূচনা যার পরিণতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মর্যাদাহানি ও চরম নির্লজ্জতা।

ফ্রাঙ্ক কাব্বালিস্ট ছিলেন না, কিন্তু কারদাযোর ধর্মতত্ত্বের রূঢ় ভাষ্য প্রচার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শ্যাব্বেতিয় ট্রিনিটির তিন *পারযুফিমের* প্রত্যেকটি ভিন্ন মেসায়াহ্‌র সারফত পৃথিবীতে উপস্থাপিত হবেন। শ্যাব্বেতাই যেভি, ফ্রাঙ্ক 'প্রথম জন' আখ্যায়িত করেছেন, ছিলেন 'শুভ ঈশ্বরে'র অবতার, যিনি কারদাযোর *আতিকা কাদিশা* (পবিত্র প্রাচীনজন); স্বয়ং তিনি ইসরায়েলের ঈশ্বর দ্বিতীয় *পারযুফের* অবতার ছিলেন। তৃতীয় মেসায়াহ, যিনি শেকিনাহকে ধারণ করবেন, তিনি হবেন একজন মহিলা, ফ্রাঙ্ক যাঁকে 'দ্য ভার্জিন' আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানে অবশ্য পৃথিবী অশুভ শক্তির করায়ত্ত রয়েছে। মানুষ যতক্ষণ না ফ্রাঙ্কের নিহিলিস্টিক গস্পেল মেনে নিচ্ছে ততক্ষণ মুক্তি মিলবে না। জ্যাকবের মই ছিল ইংরেজি 'V' আকৃতির: ঈশ্বরের কাছে আরোহণ করার জন্যে আগে জেসাস ও শ্যাব্বেতাইয়ের মতো অতলে নামতে হবে: 'এটুকু আমি তোমাদের বলি,' ঘোষণা দিয়েছেন ফ্রাঙ্ক, 'তোমরা জান, ক্রাইস্ট বলেছেন, তিনি শয়তানের কবল হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে এসেছেন, কিন্তু আমি এসেছি পৃথিবীকে সব ধরনের নিয়ম ও প্রথা থেকে মুক্তি দিতে। আমার দায়িত্ব এসব কিছুকে ধ্বংস করা যাতে শুভ ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন।'[৫১] ঈশ্বরকে যারা আবিষ্কার করতে চায় ও অশুভ শক্তির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চায় তাদের সেতাকে পবিত্র বিবেচিত সকল নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করে অতলে নামতে হবে: 'আমি তোমাদের বলছি, যোদ্ধাদের অবশ্যই

AMARBOI.COM

ধর্মহীন হতে হবে, যার মানে, তাদের নিজস্ব ক্ষমতায়ই মুক্তি লাভ করতে হবে।'[৫২]

এই শেষ কথাটার ভেতর আমরা ফ্রাঙ্কের রহস্যময় দর্শন ও যুক্তিবাদী আলোকন পর্বের যোগাযোগ বুঝতে পারি। যেসব পোলিশ ইহুদি তাঁর গস্পেল গ্রহণ করেছিল তারা স্পষ্টই ইহুদিদের জন্যে আর নিরাপদ নয় বলে বিবেচিত পৃথিবীর ভীতিকর পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার বেলায় ধর্মের কোনও রকম সাহায্য বা সহযোগিতা পাচ্ছিল না। ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পর ফ্রাঙ্কবাদ এর নৈরাজ্যবাদের সিংহভাগই হারিয়ে ফেলে, রয়ে গিয়েছিল কেবল ঈশ্বরের অবতার হিসাবে ফ্রাঙ্কের ওপর বিশ্বাস ও শোলেম যাকে বলেছেন 'এক প্রবল, আলোকময় মুক্তির অনুভূতি।'[৫৩] ফরাসী বিপ্লবকে তারা তাদের পক্ষে ঈশ্বরের নির্দেশন হিসাবে দেখেছে: রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য নীতিশাস্ত্র বিরোধিতা ত্যাগ করে পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে এমন এক অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখেছে। একইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক বছরগুলোয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী *দনমেহ*দের প্রায়শঃই সক্রিয় তরুণ তুর্কি হতে দেখা গেছে; অনেকেই কামাল আতাতুর্কের সেক্যুলার তুরস্কে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিল। বাহ্যিক অনুসরণের প্রতি সকল শ্যাব্বেতিয়বাদীর অনুভূত বৈরিতা ছিল এক অর্থে গোটা পরিবেশের প্রতি বিদ্রোহ। পশ্চাদপদ ও অস্পষ্ট ধর্ম হিসাবে প্রতীয়মান শ্যাব্বেতিয়বাদ প্রাচীন পন্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নতুন নতুন ধারণা গ্রহণে সক্ষম করে তুলেছিল তাদের। বাহ্যিকভাবে ইহুদিবাদের প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে যাওয়া মধ্যপন্থী শ্যাব্বেতিয়রা প্রায়শঃই ইহুদি আলোকনের অগ্রপথিক ছিল; উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ইহুদিবাদ সৃষ্টিতেও সক্রিয় ছিল তারা। প্রায়শঃই এইসব *মাসকিলিম*দের ধারণা প্রাচীন ও নতুন ধারণার মিশেল হতে দেখা গেছে। এভাবেই প্রাগের জোসেফ ওয়েহ্‌ত, ১৮০০ সালের দিকে লিখছিলেন তিনি, বলেছেন, মোজেস মেন্দেলসন, ইম্যানুয়েল কান্ট, শ্যাব্বেতাই যেভি ও ইসাক লুরিয়া তাঁর আদর্শ ছিলেন। সবার পক্ষে বিজ্ঞান ও দর্শনের কঠিন পথ ধরে আধুনিকতায় উত্তোরণ সম্ভব নয়; চরমপন্থী ক্রিশ্চান ও ইহুদিদের অতিন্দ্রীয়বাদী বিশ্বাস তাদের এক ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম করে তুলবে।

জ্যাকব ফ্রাঙ্ক যখন তাঁর নিহিলিস্টিক গস্পেল প্রণয়ন করছিলেন, ঠিক সেই একই সময়ে অন্য পোলিশ ইহুদিরা একেবারে ভিন্ন এক মেসায়াহ্‌কে আবিষ্কার করেছিল। ১৬৪৮ সালের হত্যালীলার পর থেকে পোলিশ ইহুদিদের ভেতর স্থানচ্যুতি ও মনোবলহীনতার এমন এক বোধ জেগে উঠেছিল যা স্পেন থেকে সেফার্দিমের নির্বাসনের মতোই তীব্র ছিল। পোল্যান্ডের বহু শিক্ষিত ও আধ্যাত্মিক পরিবার হয় নিহত কিংবা পশ্চিম ইউরোপের তুলনামূলকভাবে

AMARBOI.COM

নিরাপদ অঞ্চলে অভিভাসী হয়েছিল। হাজার হাজার ইহুদি উন্মূল, উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই যাযাবরে পরিণত হয়, স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় শহর থেকে শহরে ঘুরে বেরিয়েছে তারা। সেসব র‍্যাবাই রয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিম্নমানের এবং গবেষণা দিয়ে বাইরের জগতের রূঢ় বাস্তবতার থেকে নিজেদের আড়াল করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁরা। ভবঘুরে কাব্বালিস্টরা ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন *আক্রা সিত্রা* বা অপর পক্ষের ভয়ঙ্কর অন্ধকার-এর কথা বলে বেড়িয়েছে। শ্যাব্বেতাই যেভি বিপর্যয়ও সাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি ও বৈষম্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। ইউক্রেনের কিছু সংখ্যক ইহুদি ক্রিশ্চান পিয়েটিস্ট আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছিল, রাশিয়ান অর্থডক্স চার্চেও যার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। ইহুদিরাও একই রকম ক্যারিশমাটিক ধর্ম প্রণয়ন শুরু করেছিল। ইহুদিদের ভেতর মোহাবিষ্টতা বা পরমানন্দের অনুভূতির কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, প্রার্থনার সময় হাততালি দিয়ে গান গাইছিল তারা। ১৭৩০-এর দশকে ঐ মোহাবিষ্টদের একজন এই অন্তরের ইহুদি ধর্মের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন ও হাসিদবাদ নামে পরিচিত দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসরায়েল বেন এলিয়েযার পণ্ডিত ছিলেন না। তালমুদ পাঠের চেয়ে বরং বনে জঙ্গলে হাঁটতে ও বাচ্চাদের গল্প শোনাতেই বেশি পছন্দ করতেন। কার্পেথিয়ান পর্বতের দক্ষিণে পোল্যান্ডে একটা কুটিরে সস্ত্রীক অতি গরীবি হালে থাকতেন তিনি। কিছুদিন চুনাপাথর খুঁড়ে তুলে কাছের শহরে লোকজনের কাছে বিক্রি করেছেন। এরপর স্বামী-স্ত্রী মিলে একটা সরাইখানা দেখাশোনা করেন। অবশেষে মোটামুটি ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি দাবি করে বসেন যে, তিনি ফেইথ হীলার ও একসরসিস্টে পরিণত হয়েছেন। পোল্যান্ডের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কৃষক ও শহরবাসীদের ভেষজ ওষুধ, তাবিজ ও প্রার্থনার মাধ্যমে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন তিনি। সেই সময় এরকম বহু হীলার ঈশ্বরের নামে রোগমুক্তির দাবি করেছিল। এ সময়ে ইসরায়েল এবার 'বাআল শেম তোভ' (শুভ নামের পণ্ডিত)-এ পরিণত হন। নিজে কখনও দাবি না করলেও অনুসারীরা তাকে র‍্যাবাই ইসরায়েল বাআল শেম তোভ বা সোজা কথায় দ্য বেশট ডাকতে করতে শুরু করে। অধিকাংশ হীলার জাদুটোনাতেই সন্তুষ্ট থাকলেও 'বেশট' অতিন্দ্রীয়বাদীও ছিলেন। শ্যাব্বেতাই যেভি ঘটনা তাঁকে অতিন্দ্রীয়বাদের সঙ্গে মেসিয়ানিজমকে মিলিয়ে ফেলার বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিল বলে তিনি কাব্বালাবাদের এমন একটি পুরোনো রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন যা কোনও গোষ্ঠী বিশেষের নয় বরং সবার উপযোগী ছিল। স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গের পৃথিবীতে পতনকে বিপর্যয় হিসাবে না দেখে বেশট তাঁর হাসিদিমদের ইতিবাচক দিকে দৃষ্টি দেওয়ার

AMARBOI.COM

শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই স্ফূলিঙ্গগুলো সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে মিশে আছে; এর মানে গোটা পৃথিবী ঈশ্বরের সত্তায় পরিপূর্ণ। একজন নিবেদিতপ্রাণ ইহুদি দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজে–খাওয়া-দাওয়া, পান করা বা স্ত্রীকে ভালোবাসা–ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারে, কারণ স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ সর্বত্রই বিরাজ করে। সুতরাং, নারী ও পুরুষ দূরাত্মা দিয়ে ঘেরাও হয়ে নেই, বরং ঈশ্বর পরিবেষ্টিত; হাওয়ার প্রতিটি ধাক্কা বা ঘাসের ডগায় যিনি উপস্থিত আছেন; তিনি চান ইহুদিরা আস্থা ও আনন্দের সাথে তাঁর শরণাপন্ন হোক।

বিশ্বের মুক্তির লুরিয়া প্রস্তাবিত মহাপ্রকল্প ত্যাগ করেছেন বেশট। হাসিদ কেবল তার ব্যক্তি জীবনে আটকে পড়া–তার স্ত্রী, দাস, আসবাব ও খাদ্য–ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুতে স্বর্গীয় স্ফূলিঙ্গের পুনর্মিলনের জন্যে দায়ী। বেশটের অন্যতম অনুসারী হিল্লেল যিতলিন যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তার বিশেষ পরিবেশে হাসিদের এক অনন্য দায়িত্ব রয়েছে, যা কেবল সে একাই অনুসরণ করতে পারে: 'প্রত্যেক মানুষ তার আপন জগতের ত্রাণকর্তা। সে কেবল নিজেকেই ধারণ করে ও কেবল সে-ই ব্যক্তিগতভাবে যা ধারণ ও অনুভব করার জন্যে নির্ধারিত হয়েছে তা ধারণ ও অনুভব করতে দায়বদ্ধ।'[৫৪] কাব্বালিস্টরা অতিন্দ্রীয়বাদীকে যেদিকে চোখ ফেরানো যায় সেখানেই ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে সহায়তা করার জন্যে মনোসংযোগের এক অনুশীলন আবিষ্কার করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর এক সেফেদ কাব্বালিস্ট যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, অতিন্দ্রীয়বাদীদের নির্জনে বসে তোরাহ্ পাঠে বিরতি দিয়ে মাথার ওপর শেকিনাহর দ্যুতি কল্পনা করতে হবে, যেন তা চারদিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আর তারা সেই জ্যোতির মাঝখানে বসে আছে।'[৫৫] ঈশ্বর-উপস্থিতির অনুভূতি তাদের মাঝে কম্পমান মোহাবেশময় আনন্দ বয়ে আনত। বেশট অনুসারীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, এই পরমান্দ কেবল সুবিধাপ্রাপ্ত অতিন্দ্রীয়বাদী গোষ্ঠীর জন্যে নির্ধারিত নয়, বরং প্রত্যেক ইহুদির দায়িত্ব রয়েছে *দেভেকুদের* চর্চা করে সর্বত্র ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা: আসলে *দেভেকুদে* ব্যর্থতা বহুঈশ্বরবাদীতারই শামিল, ঈশ্বর ছাড়া যে আর কোনও কিছুর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই তার অস্বীকৃতি। এতে করে প্রশাসনের সঙ্গে বেশটের বিরোধ সৃষ্টি হয়, যাদের ভয় হয়েছিল যে, ইহুদিরা হয়তো কার্যত বিপজ্জনক ও আত্মকেন্দ্রীক এসব ভক্তিবাদে সাড়া দিয়ে তোরাহ্ পাঠ বর্জন করে বসবে।

অবশ্য হাসিদিম দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, কেননা তা আশাহীন ইহুদিদের মাঝে আশার বাণী নিয়ে এসেছিল: এই আদর্শ গ্রহণকারীদের অনেকেই ছিল প্রাক্তন শ্যাব্বেতিয়। বেশট চাননি তাঁর অনুসারীরা তোরাহ্ বর্জন করুক,

AMARBOI.COM

বরং এর এক নতুন অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি: *মিতযভাহ* (নির্দেশনা) একটা বন্ধন বোঝায়। কোনও হাসিদ যখন *দেভেকুদ* অনুশীলনের সময় আইনের একটি নির্দেশনা পালন করে তখন সে সকল সত্তার মূল ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করে, আবার একই সময়ে সে তার জীবন বা বস্তু সামগ্রীতে বিরাজমান স্বর্গীয় স্ফূলিঙ্গকে গডহেডের সঙ্গে পুনর্মিলিত করে। তোরাহ্ বহু আগে হতেই ইহুদিদের *মিতযভোতের* অনুশীলন করে জগতকে পরিশুদ্ধ করায় উৎসাহ দিয়ে এসেছে। বেশট কেবল এর অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। জগতকে রক্ষা করার অতিউৎসাহের কারণে হাসিদিম কখনও কখনও কিছুটা সন্দেহজনক পথেও অগ্রসর হয়েছে: অনেকেই তামাকে অবস্থান করা স্ফূলিঙ্গকে উদ্ধার করতে অতি-ধূমপায়ীতে পরিণত হয়েছিল! বেশটের আরেকজন পৌত্র মেদযিবযের বারুচ (১৭৫৭-১৮১০), আসবাব ও অন্যান্য বস্তুর বিশাল সংগ্রহ ছিল, এসব অসাধারণ জিনিসের স্রেফ স্ফূলিঙ্গের ব্যাপারে নিজেকে আগ্রহী বলে ওসব বিলাস সামগ্রী রাখার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। অ্যাপট-এর আব্রাহাম জোশুয়া হেশেল (মৃ. ১৮২৫) খাবারের স্ফূলিঙ্গকে পুনরুদ্ধার করতে প্রচুর খাবার খেতেন।[৫৬] এই হাসিদিয় প্রয়াসকে নিষ্ঠুর ও বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে পথ খোঁজার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা যেতে পারে। *দেভেকুদের* অনুশীলনসমূহ অভ্যন্তরীণ মহিমা আবিষ্কারের লক্ষ্যে জগতের পরিচয়ের পর্দা সরানোর কল্পনা নির্ভর প্রয়াস ছিল। এই প্রয়াস সমসাময়িক ইংরেজ রোমান্টিক্স উইলিয়াম ওঅর্ডসওঅর্থ (১৭৭০-১৮৫০) ও স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪)-এর কল্পনানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে দূরবর্তী ছিল না যাঁরা দৃশ্যমান সবকিছু একত্রিতকারী 'একক জীবনে'র উপলব্ধি করেছিলেন। নির্বাসন ও নিপীড়ন-নির্যাতনের দুঃখ সত্ত্বেও হাসিদবাদ তাদের প্রত্যক্ষ করা প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্ট জগতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত স্বর্গীয় শক্তি হিসাবে দেখার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিল, যা জগতকে এক মহিমাময় স্থানে পরিণত করেছে। ক্রমশঃ বস্তু জগৎ তাৎপর্যহীনতায় পর্যবসিত হবে; সমস্ত কিছু এপিফ্যানিতে পরিণত হবে। উহ্যালির মোজেস তেইতেলবম (১৭৫৯-১৮৪১) বলেছেন, মোজেস যখন 'জ্বলন্ত ঝোপ' দেখেছিলেন, তিনি কেবল স্বর্গীয় উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন যা প্রতিটি ঝোপকে পুড়িয়ে আবার এর সত্তা টিকিয়ে রাখেন।[৫৭] গোটা পৃথিবী যেন মহাজাগতিক আলোয় ভরে আছে বলে মনে হয়; হাসিদিম মোহাবিষ্টতার আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, হাততালি দেয়, গান গাইতে শুরু করে। কেউ কেউ এমনকি ডিগবাজিও খায়, দেখিয়ে দেয় যে তাদের দিব্য দর্শনের প্রতাপ গোটা পৃথিবীকে উল্টে দিয়েছে।

AMARBOI.COM

সেহেতু একজন হাসিদ তাঁর মাধ্যমে বিশ্ব জগতের প্রভুর কাছে পৌছতে পারে। যাদ্দিক যখন বেশট সম্পর্কে কোনও গল্প বলতেন বা তোরাহ্র কোনও পঙক্তির ব্যাখ্যা দিতেন, চারপাশে ভিড় করে প্রতিটি শব্দ যারপরনাই মনোযোগের সাথে শুনত তারা। অত্যুৎসাহী ক্রিশ্চান গোষ্ঠীগুলোর মতো হাসিদিজম ব্যক্তিগত পর্যায়ের ধর্ম ছিল না, বরং গভীরভাবে সামাজিক ছিল। দলবদ্ধভাবে হাসিদিমরা গুরুর সঙ্গে পরম একত্মতায় আরোহণের জন্যে যাদ্দিককে অনুসরণ করার প্রয়াস পেত। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, পোল্যান্ডের অপেক্ষাকৃত বেশি অর্থডক্স র‍্যাবাইগণ দীর্ঘদিন যাবত তোরাহ্র অবতার হিসেবে বিবেচিত শিক্ষিত র‍্যাবাইদের এড়িয়ে যাওয়া এই ব্যক্তিক কাল্টের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বিরোধী পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন ভিলনা একাডেমি অভ গাওন বা প্রধান র‍্যাবাই এলিযাহ বেন সলোমন  যালমান (১৭২০-১৭৯৭)। শ্যাব্বেতাই বিপর্যয় বহু ইহুদিকে অতিন্দ্রীয়বাদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন করে তুলেছিল। ভিলনার গাওনকে প্রায়শঃই অধিকতর যৌক্তিক ধর্মের প্রবক্তা হিসাবে দেখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন প্রবলভাবে কাব্বালিস্ট ও তালমুদ বিশেষজ্ঞ। তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুসারী ভোলোঝিনের র‍্যাবাই হাঈম 'গোটা *দ্য যোহারের* ওপর পাণ্ডিত্যের' প্রশংসা করেছেন...যা তিনি প্রেমের শিখা ও স্বর্গীয় আভিজাত্যের 'চমৎকার *দেভেকুদ* ও পবিত্রতা এবং নিরুদ্বেজালিত্বের সঙ্গে পাঠ করেছেন।'[৬০] যখনই ইসাক লুরিয়ার কথা বলতেন, সারা দেহ থরথর কেঁপে উঠত তাঁর। অসাধারণ স্বপ্ন ও প্রত্যাদেশের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর, তাসত্ত্বেও জোর দিয়ে বলতেন তোরাহ্ পাঠই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার তাঁর প্রধান উপায় ছিল। অবশ্য সুপ্ত অনুভূতি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে স্বপ্নের উদ্দেশ্যের চমৎকার উপলব্ধি দেখিয়েছিলেন তিনি। র‍্যাবাই হাঈম আরও বলেছেন: 'তিনি বলতেন কেবল এ কারণেই ঈশ্বর নিদ্রার সৃষ্টি করেছেন,' মানুষ যাতে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারে, যা আত্মা দেহের সঙ্গে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় প্রচুর পরিশ্রম ও প্রয়াস সত্ত্বেও অর্জন করতে পারে না, কারণ দেহ হচ্ছে পৃথককারী কোনও পর্দার মতো।'[৬১]

আমরা যেমন ভাবতে চাই আসলে কিন্তু অতিন্দ্রীয়বাদ ও যুক্তিবাদের মধ্যে তেমন বিশাল পার্থক্য নেই। ঘুম সম্পর্কে গাওনের মন্তব্য অবচেতন মনের ভূমিকার পরিষ্কার ধারণা তুলে ধরে: আমরা সবাই আমাদের বন্ধু-বান্ধবকে কাজের সময় সমাধান মেলে না এমন সমস্যার সমাধানের আশায় 'Sleep on'-এর তাগিদ দিই। আমাদের মন গ্রাহী ও প্রসন্ন অবস্থায় থাকলে মনের গভীর  থেকে বিভিন্ন ধারণা উঠে আসে। আর্কিমিদিসের মতো বৈজ্ঞানিকদের বেলায়ও এ ধরনের অভিজ্ঞতা দেখা গেছে, গোসলের চৌবাচ্চায় তাঁর বিখ্যাত সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। একজন সৃজনশীল দার্শনিক বা বিজ্ঞানীকে অতিন্দ্রীয়বাদীর মতো অসৃষ্ট বাস্তবতা ও অজ্ঞাত মেঘ ভেদ করার আশায়

AMARBOI.COM

স্পিনোযা ও অপরাপর কিছু চরমপন্থী ক্রিশ্চানের বিপরীতে বেশট সবকিছুকে ঈশ্বর দাবি করেননি, বরং বলেছেন সকল সত্তা ঈশ্বরে বিরাজমান ছিল, যিনি তাদের প্রাণ ও সত্তা দিয়েছেন। তিনি সকল বস্তুর অস্তিত্ব বজায় রাখা মূল শক্তি। তিনি এটা মনে করতেন না যে *দেভেকুদ* অনুশীলনের মাধ্যমে হাসিদিম স্বর্গীয় হয়ে যাবে বা ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে যাবে–এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা সকল ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদীদের চোখেই বাড়াবাড়ি ঠেকেছে। বরং হাসিদিম ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হবে। বেশিরভাগ মানুষই ছিল সাধারণ, গড়পড়তা; প্রায়শঃই নিজেদের তারা জাঁকের সঙ্গে প্রকাশ করেছে, কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা সচেতন ছিল: তাদের মিথলজিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যাবে না। দার্শনিক বা তালমুদিয় আলোচনার চেয়ে গল্প কাহিনী বেশি পছন্দ করত তারা; গল্প-কাহিনীকে সত্য ও যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিকে বোঝানোর সেরা উপায় হিসেবে দেখেছে। ঈশ্বর ও মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে তুলে ধরার এক কল্পনানির্ভর প্রয়াস ছিল তাদের দর্শন। ঈশ্বর কোনও বাহ্যিক বস্তুগত সত্তা ছিলেন না: প্রকৃতপক্ষে হাসিদিমের বিশ্বাস ছিল যে, তারা ঈশ্বরের বিলুপ্তির পর এক অর্থে তাঁকে আবার নতুন করে গড়ে তুলছে। নিজেদের মাঝে ঈশ্বর-তুল্য স্ফূলিঙ্গের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে তারা আরও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠবে। এই অন্তর্দৃষ্টি কাব্বালাহর পরিভাষায় প্রকাশ করেছে তারা। বেশটের উত্তরসুরি দোব বায়ের বলেছেন, ঈশ্বর ও মানুষ একক সত্তা ছিল; সৃষ্টির সময় ঈশ্বর যেমন ইচ্ছা করেছিলেন, মানুষ কেবল তখনই *আদমে* পরিণত হবে, যেদিন সে অস্তিত্বের বাকি অংশের সঙ্গে বিচ্ছেদের অনুভূতি বিস্মৃত হয়ে 'ইযেকিয়েলের প্রত্যক্ষ করা সিংহাসনে আসীন আদিম মানুষের মহাজাগতিক অবয়বে'[৫৮] পরিণত হবে। এটা ছিল মানুষকে তার নিজস্ব দুর্জ্ঞেয় মাত্রায় সচেতন করে তোলা আলোকনের গ্রিক বা বুদ্ধ বিশ্বাসের পরিপূর্ণ ইহুদি প্রকাশ।

AMARBOI.COM

গ্রিকরা ক্রাইস্টের অবতারবাদ ও দেবতায় পরিণত হবার মতবাদের মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটিয়েছিল। হাসিদিম অবতারদের নিজস্ব ধরণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। হাসিদিয় র‍্যাবাই-যাদ্দিক তাঁর সময়ের অবতারে পরিণত হয়েছেন, স্বর্গ পৃথিবীর একটি যোগসূত্র তিনি, স্বর্গীয় সত্তার প্রতিনিধি। চেরনোবিলের র‍্যাবাই মেনাহিম নাহুম (১৭৩০–১৭৯৭) যেমন লিখেছেন, যাদ্দিক 'প্রকৃতই ঈশ্বরের অংশ এবং যেমন বলা হয়েছে, তাঁর সঙ্গেই অবস্থান করেন।'[৫৯] ক্রিশ্চানরা যেমন ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে ক্রাইস্টকে অনুকরণ করে, তেমনি একজন হাসিদ যাদ্দিককে অনুকরণ করেছে, যিনি ঈশ্বরের কাছে আরোহণ করেছেন ও নিখুঁতভাবে *দেভেকুদ* অনুশীলন করেছেন। আলোকন যে সম্ভব তিনি তার জীবন্ত নজীর বা প্রমাণ। এই যাদ্দিক যেহেতু ঈশ্বরের নিকটবর্তী,

অন্ধকার জগতের মুখোমুখি হতে হয়; যতক্ষণ যুক্তি আর ধারণা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, ততক্ষণ স্বভাবতই প্রতিষ্ঠিত চিন্তার ধরন বা ধারণায় বন্দি হয়ে থাকেন তাঁরা। প্রায়শঃই তাঁদের আবিষ্কারসমূহকে বাইরে থেকে 'প্রদত্ত' মনে হয়। তাঁরা অনুপ্রেরণা ও দিব্যদৃষ্টির কথা বলেন। এভাবেই এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-৯৫) ধর্মীয় উদ্দীপনাকে ঘৃণা করলেও রোমে ক্যাপিটোলের ধ্বংসাবশেষের মাঝে ঘুরে বেড়ানোর সময় মুহূর্তের জন্যে অনেকটা স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়েন যা তাঁকে *দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অভ দ্য রোমান এম্পায়ার* রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এই অনুভূতির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি একে 'কমিউনিয়ন' হিসাবে বর্ণনা করেছেন: 'নিজের মাঝে বয়ে যাওয়া ইতিহাসের জোরাল ধারা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন ছিলেন তিনি; এক বিশাল তরঙ্গের ধারায় নিজের জীবন ফুঁসে ওঠার ব্যাপারেও সজাগ ছিলেন।' এই ধরনের অনুপ্রেরণার মুহূর্ত, উপসংহার টেনেছেন টয়েনিব, 'বিটিফিক ভিশনের বা স্বর্গ সুখ দিব্যদৃষ্টির অভিজ্ঞতা লাভকারীরা যেমন বর্ণনা দিয়েছে তার অনুরূপ।'[৬২] আলবার্ট আইনস্টাইনও বলেছেন, অতিন্দ্রীয়বাদ 'সকল প্রকৃত শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বীজ বপনকারী':

> আমাদের কাছে যা জানা দুঃসাধ্য তার অস্তিত্ব আছে বলে জানা, যা সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও অনন্য সৌন্দর্য হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে, আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ যাকে কেবল একেবারে আদিম অবস্থায় উপলব্ধি করতে পারে–এই জ্ঞান, এই অনুভূতি সকল প্রকৃত ধর্মের মূল কথা। এই অর্থে এবং কেবল এই অর্থে আমি সমস্ত ধার্মিক মানুষের দলভুক্ত।[৬৩]

AMARBOI.COM

এই অর্থে বেশট-এর মতো অতিন্দ্রীয়বাদীদের আবিস্কৃত ধর্মীয় আলোকনকে যুক্তির কালের অন্যান্য অর্জনের অনুরূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে; এটা সাধারণ নারী ও পুরুষকে আধুনিকতার নতুন জগতে কল্পনা নির্ভর পরিবর্তনে সক্ষম করে তুলছিল।

১৭৮০র দশকে লিয়াদে-র র‍্যাবাই শ্নেয়ুর যালমান (১৭৪৫-১৮১৩) হাসিদিজমের আবেগের বাহুল্যকে বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের দূরবর্তী হিসাবে দেখেননি। এক নতুন ধরনের হাসিদিজম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি যা ছিল অতিন্দ্রীয়বাদকে যৌক্তিক ধ্যানের সঙ্গে মেশানোর প্রয়াস। এটা হাবাদ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, ঈশ্বরের তিনটি গুণ: *হোখমাহ* (প্রজ্ঞা) *বিনাহ* (বুদ্ধিমত্তা) এবং *দা'আর্ত* (জ্ঞান)-এর একটি গোলোকধাঁধা বিশেষ। দর্শনকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সংযুক্তকারী পূর্ববর্তী অতিন্দ্রীয়বাদীদের মতো যালমান বিশ্বাস করতেন মেটাফিজিক্যাল অনুমান অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত, কারণ এটা

বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে। সর্ববস্তুতে ঈশ্বর উপস্থিতির মৌল হাসিদিয় দর্শন থেকে সূচিত তাঁর কৌশল এক প্রক্রিয়ায় অতিন্দ্রীয়বাদীকে উপলব্ধি করতে শেখায় যে, ঈশ্বর একমাত্র বাস্তবতা বা সত্তা। যালমান ব্যাখ্যা করেছেন: 'অসীমের অবস্থান থেকে তিনিই আশীর্বাদপ্রাপ্ত, বাকি সমস্ত কিছু যেন আক্ষরিক অর্থেই কিছু না ও অস্তিত্বহীন।'[৬৪] অপরিহার্য শক্তি ঈশ্বর ছাড়া সৃষ্ট জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই। আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণার কারণেই এর আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু এটা একটা মায়া বা বিভ্রান্তি। সুতরাং, ঈশ্বর আসলে বাস্তবতার বিকল্প বলয় অধিকারকারী দুর্জ্ঞেয় সত্তা নন: তিনি জগতের বাইরের কিছু নন। প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তার মতবাদ আমাদের মনের আরেকটি বিভ্রান্তি, যা বোধের অতীতে গমন অসম্ভব মনে করে। হাবাদের অতিন্দ্রীয়বাদী অনুশীলন ইহুদিদের অনুভূতিজাত ধারণা অতিক্রম করে সমস্ত কিছুকে ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করবে। অনালোকিত কারও চোখে বিশ্বকে ঈশ্বর-শূন্য মনে হয়: কাব্বালাহর ধ্যান আমাদের চারপাশের জগতে মিশে থাকা ঈশ্বরকে আবিষ্কারে সাহায্য করার জন্যে যৌক্তিক সীমারেখা ভেঙে দেবে।

ঈশ্বরের নিকটবর্তী হাওয়ার জন্যে মানুষের মনের সামর্থের আলোকনের আস্থার অংশীদার হাবাদ, তবে এক্ষেত্রে প্যারাডক্স ও অতিন্দ্রীয়বাদ মনোসংযোগের প্রাচীন পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়েছে। বেশটের মতো যালমানও বিশ্বাস করতেন, যে-কেউ ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে পারে: হাবাদ বিশেষ অভিজাত অতিন্দ্রীয়বাদী গোষ্ঠীর জন্যে ছিল না। এমনকি মানুষের আধ্যাত্মিক মেধার অভাব আছে মনে হলেও সে আলোকপ্রাপ্ত হতে পারবে। কাজটা অবশ্য কঠিন। যালমানের ছেলে, লুবাভিচের র‍্যাবাই দোভ বায়ের (১৭৭৩-১৮২৭), তাঁর *ট্রাক্ট অন এক্সট্যাসি*-তে যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, শুরু করতে হবে অপূর্ণতার নিষ্ঠুর উপলব্ধি দিয়ে। কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যান যথেষ্ট নয়: এর সঙ্গে আত্ম-বিশ্লেষণ, তোরাহ্ পাঠ ও প্রার্থনা যুক্ত থাকতে হবে। জগৎ সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও কল্পনানির্ভর সংস্কার ত্যাগ করা কষ্টকর, অধিকাংশ মানুষই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগে অনীহ থাকে। একবার এই অহম বোধের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে, হাসিদ উপলব্ধি করতে পারবে যে, ঈশ্বর ছাড়া ভিন্ন কোনও সত্তা নেই। *ফানা*'র অভিজ্ঞতা অর্জনকারী সুফীর মতো হাসিদ পরমানন্দ লাভ করবে। বায়ের ব্যাখ্যা করেছেন, নিজেকে সে অতিক্রম করে যাবে: 'তার গোটা সত্তা এমনভাবে বিলীন হয়ে যায় যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তার আত্ম-সচেতনতা বলতে কিছুই নেই।'[৬৫] হাবাদের অনুশীলন কাব্বালাহকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও আত্ম-জ্ঞানের একটা কৌশলে পরিণত করেছে, হাসিদকে পর্যায়ক্রমে অবতরণের শিক্ষা দিয়েছে যতক্ষণ না সে তার



AMARBOI.COM

সত্তার কেন্দ্রে পৌঁছাচ্ছে। সেখানেই সে একমাত্র সত্য সত্তা ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে। যুক্তি ও কল্পনার অনুশীলন দিয়ে মন ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু সেটা *ফিলোসফস* বা নিউটনের মতো বিজ্ঞানীদের বস্তুগত ঈশ্বর হবেন না, বরং সত্তার অবিচ্ছেদ্য অন্তস্থঃ সত্তা।

সপ্তম ও অষ্টাদশ শতাব্দী দুটি ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপ্লবাত্মক উত্থান-পতনে ফুটে ওঠা যন্ত্রণাময় উগ্রতা ও চৈতন্যের উত্তেজনার একটা পর্যায়। মুসলিম বিশ্বে এসময়ে তুলনাযোগ্য কিছু ছিল না, যদিও কোনও পশ্চিমরা মানুষের পক্ষে এটা নির্ণয় করা কঠিন, কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম চিন্তা-চেতনা নিয়ে তেমন একটা গবেষণা হয়নি। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা একে মামুলি বলে নাকচ করে থাকেন। এমনটি মনে করা হয় যে, ইউরোপে যখন আলোকন পর্ব চলছে তখন পতন শুরু হয়েছিল ইসলামের। অবশ্য সাম্প্রতিককালে এই দৃষ্টিভঙ্গি বড় বেশ সরলীকরণ বলে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ১৭৬৭ সালে ব্রিটিশরা ভারতের নিয়ন্ত্রণ লাভ করলেও মুসলিম বিশ্ব তখনও পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে পুরোপুরি সজাগ হয়ে ওঠেনি। ভারতীয় সুফী দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭০৩-৬২) সম্ভবত প্রথম এই নতুন চেতনা অনুভব করেছিলেন। প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি, সংস্কৃতির বিশ্বজনীনতায় সন্দেহ ছিল তাঁর, তবে বিশ্বাস করতেন যে, ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। শিয়াহ্ মতবাদ পছন্দ না করলেও তিনি শিয়াহ্ ও সুন্নীদের একটা ঐকমত্যে পৌঁছার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করতেন। ভারতের নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তিনি শরীয়াহর সংস্কারের প্রয়াস পেয়েছিলেন। ওয়ালিউল্লাহ্র যেন উপনিবেশবাদের পরিণাম সম্পর্কে পূর্বধারণা ছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে *জিহাদে* তাঁর পুত্র নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর ধর্মীয় চিন্তা অধিকতর রক্ষণশীল ইবন আল-আরাবীর ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিল: ঈশ্বর ছাড়া মানুষ তার পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হতে পারে না। ধর্মীয় বিষয়ে মুসলিমরা তখনও অতীতের সাফল্যের শরণেই তৃপ্ত ছিল, আর সুফীবাদ কতটা শক্তি অনুপ্রাণিত করতে পারে ওয়ালিউল্লাহ্ তার একটা নজীর। অবশ্য বিশ্বের বহু স্থানেই সুফীবাদ খানিকটা লুপ্ত হয়ে এসেছিল; আরবে এক নতুন সংস্কার আলোকন অতিন্দ্রীয়বাদ হতে সরে আসার আভাস দিয়েছে যা উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর সম্পর্কে মুসলিম ধারণার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় ও পশ্চিমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামি সাড়ার আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

ষোড়শ শতাব্দীর ক্রিশ্চান সংস্কারবাদীদের মতো আরবীয় পেনিনসুলার নজদের একজন জুরিস্ট মুহাম্মদ ইবন আল-ওয়াহাব (মৃত্যু. ১৭৮৪) পরবর্তীকালের সকল সংযোজন হতে মুক্ত করে ইসলামকে এর সূচনালগ্নের

AMARBOI.COM

খাঁটি রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে অতিন্দ্রীয়বাদীদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন। সুফী সাধক ও শিয়াহ্ ইমামদের প্রতি ভক্তি প্রকাশসহ অবতারবাদ মূলক ধর্মতত্ত্বের সকল ধারণার নিন্দা করা হয়। এমনকি মদিনায় পয়গম্বরের রওযার কাল্টেরও বিরোধিতা করেন তিনি: একজন মানুষ, তিনি যত মহানই হোক, ঈশ্বর হতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারেন না। আল-ওয়াহাব মধ্য-আরবের এক ক্ষুদে রাজ্যের শাসক মুহাম্মদ ইবন সউদকে কাছে টানতে সক্ষম হন। দুজনে মিলে এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন যা ছিল পয়গম্বর ও তাঁর সহচরদের প্রথম উম্মাহর পুনর্জন্ম দেওয়ার একটা প্রয়াস। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন, বিধবা ও এতিমদের দুর্দশার প্রতি নির্লিপ্ততা, অনৈতিকতা ও বহু-ঈশ্বরবাদীতার বিরুদ্ধে আক্রমণ হানেন তাঁরা। তুর্কীরা নয়, আরবদেরই মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দেওয়া উচিত মনে করে তাঁরা অটোমান সাম্রাজ্যের শাসকদের বিরুদ্ধে *জিহাদ* ঘোষণা করেন। অটোমান নিয়ন্ত্রণ হতে হিজাযের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে নিতে সক্ষম হন তাঁরা, যা ১৮১৮ সালের আগে আর তুর্কীরা পুনর্দখল করতে পারেনি; নতুন গোষ্ঠীটি ইসলামি বিশ্বের বহু মানুষের কল্পনার জগতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মক্কায় আগত তীর্থযাত্রীরা এই নতুন ধর্মানুরাগে মুগ্ধ হয়েছিল, যাকে প্রচলিত সুফীবাদের চেয়ে ঢের সজীব ও অনেক বেশি জোরালো মনে হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াহাবি মতবাদ প্রভাবশালী ইসলামি ভাবধারা হয়ে ওঠে, অন্যদিকে সুফীবাদ ক্রমবর্ধমান হারে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। এর পরিণামে তা আরও বিকৃত ও কুসংস্কারপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের মতো মুসলিমরাও অতিন্দ্রীয়বাদী আদর্শ হতে সরে এসে অধিকতর যুক্তিবাদী ধরনের ধার্মিকতা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

AMARBOI.COM

ইউরোপে অল্পসংখ্যক মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে সরে আসতে শুরু করছিল। ১৭২৯ সালে একজন পল্লী পুরোহিত জ্যাঁ মেসলিয়ার আদর্শ জীবন যাপন করার পর নাস্তিক অবস্থায় মারা যান। ভলতেয়ার তাঁর রেখে যাওয়া স্মৃতিকথা প্রচার করেছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর বিরক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখার অপারগতার কথা বলেছেন তিনি। মেসনিয়ার বিশ্বাস করতেন যে, নিউটনের অসীম মহাশূন্যই একমাত্র চিরন্তন বাস্তবতা: বস্তু ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। দরিদ্রদের ওপর নির্যাতন চালানো ও তাদের ক্ষমতাহীন রাখার জন্য ধনীদের ব্যবহৃত অস্ত্র হচ্ছে ধর্ম। খৃস্টধর্ম ত্রিত্ববাদ ও অবতারবাদের মতো হাস্যকর মতবাদের কারণে আলাদা বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। ঈশ্বরে তাঁর অবিশ্বাস এমনকি *ফিলোসফ*দের কাছেও হজমের অতীত ঠেকেছিল। ভলতেয়ার বিশেষভাবে নাস্তিক্যবাদী অনুচ্ছেদগুলো বাদ দিয়ে আব্বিকে একজন ডেইস্ট-এ রূপান্তরিত করেছিলেন। শতাব্দীর শেষ নাগাদ

অবশ্য কয়েকজন দার্শনিক সগর্বে নিজেদের নাস্তিক দাবি করেছেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা ছিল বেশ কম। এটা ছিল একেবারে নতুন ধরনের একটা ব্যাপার। এতদিন পর্যন্ত 'নাস্তিক' ছিল গালির ভাষা, আপনার শত্রুর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্যে নোংরা কথা বিশেষ। এবার তা গৌরবের তকমায় পরিণত হতে শুরু করছিল। স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) নতুন ধারণাটিকে যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছে দেন। বস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে যাবার কোনওই প্রয়োজন নেই; আমাদের বোধের অতীত কোনও কিছুতে বিশ্বাস স্থাপনেরও দার্শনিক কোনও ভিত্তি নেই। *ডায়ালগস কনসারনিং ন্যাচারাল রিলিজিয়ন*-এ হিউম বিশ্বজগতের নকশা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এটা সাদৃশ্যের যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা অসম্পূর্ণ। যে কেউ বলতে পারে যে, প্রকৃতিতে আমরা যে নিয়ম শৃঙ্খলা অনুভব করি তা একজন বুদ্ধিমান তত্ত্বাবধায়কের দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু তাহলে অশুভ ও প্রকাশিত বিশৃঙ্খলার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে কীভাবে? এর কোনও যুক্তিপূর্ণ জবাব ছিল না; ১৭৫০ সালে *ডায়ালগস*-এর রচনাকারী হিউম বুদ্ধিমানের মতো অপ্রকাশিত রেখে দিয়েছিলেন। এর বছর খানেক আগে সাধারণ মানুষের কাছে পূর্ণাঙ্গ নাস্তিক্যবাদকে তুলে ধরা *আ লেটার টু দ্য ব্লাইন্ড ফর দ্য ইউজ অভ দোজ হু সি*-তে একই প্রশ্ন উত্থাপন করার দায়ে ফরাসি দার্শনিক দেনিস দিদেরো (১৭১৩-৮৪) কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

দিদেরো নিজেকে নাস্তিক হিসাবে স্বীকার করেননি। তিনি কেবল বলেছেন, ঈশ্বর আছেন কি নেই তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। ভলতেয়ার তাঁর সম্পর্কে আপত্তি করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন: 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যদিও, নাস্তিকদের সঙ্গে ভালোভাবেই চলতে পারি... বিষকে সুগন্ধী লতাগুল্ম না ভাবাটা অত্যন্ত জরুরি; তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা না করাটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।' একেবারে নির্ভুলভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন দিদেরো। 'ঈশ্বর' যখন প্রবলভাবে অন্তরের বোধ হিসাবে থাকেন না, তখন আর 'তিনি' অস্তিত্ববান নন। একই চিঠিতে দিদেরো যেমন তুলে ধরেছেন, দার্শনিকদের ঈশ্বর যিনি কখনও পৃথিবীর ব্যাপারে নাক গলান না, তাঁকে বিশ্বাস করা অর্থহীন। গোপন ঈশ্বর *দিউস অতিসাসে* পরিণত হয়েছেন: 'ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, তিনি সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও অপ্রয়োজনীয় সত্যসমূহের সারিতে পৌঁছে গেছেন।'[৬৬] পাসকালের বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তিনি; যিনি বাজি ধরার ব্যাপারটাকে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখেছিলেন, যা অগ্রাহ্য করা পুরোপুরি অসম্ভব। ১৭৪৬ সালে প্রকাশিত *পেনসিস ফিলোসফিকস*-এ দিদেরো পাসকালের ধর্মীয় অনুভূতিকে অতিমাত্রায় ভক্তিমূলক বলে নাকাচ করে দিয়েছিলেন: তিনি ও জেস্যুইটরা প্রবলভাবে ঈশ্বর

নিয়ে ভেবেছেন, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এঁদের মাঝে কাকে বেছে নেওয়া যাবে? এমন একজন 'ঈশ্বর' মর্জির একটা ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নন। এই পর্যায়ে, *আ লেটার টু দ্য ব্লাইন্ড* বেরুনোর তিন বছর আগে দিদেরো বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান–একমাত্র বিজ্ঞান–নাস্তিক্যবাদকে বাতিল করতে পারে। পরিকল্পনা হতে সৃষ্টির যুক্তির এক নতুন মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা খাড়া করেছিলেন তিনি। বিশ্বজগতের গতি পরীক্ষা করার বদলে মানুষের প্রতি তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত কাঠামো পরীক্ষা করার তাগিদ দিয়েছিলেন। একটা বীজ প্রজাপতি বা কোনও পতঙ্গের গঠন এত জটিল যে দুর্ঘটনাবশত এর সৃষ্টি অসম্ভব। *পেনসিস*-এও দিদেরো বিশ্বাস করেছেন, যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারে। নিউটন ধর্মের সকল বোকামি ও কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলেছিলেন: অলৌকিক ঘটনার জন্মদানকারী ঈশ্বর বাচ্চাদের আমরা যেসব দানোর কথা বলে ভয় দেখাই তাদের কাতারের।

অবশ্য তিন বছর পরে নিউটনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন দিদেরো; তিনি বাহ্যিক জগৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কোনওরকম সাক্ষ্য দেয় বলে আর মানতে পারেননি। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, নবলব্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনওই সম্পর্ক নেই। এই বিপ্লবাত্মক ও উত্তেজনাকর চিন্তাকে কেবল গল্পের ঢঙেই তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি। *আ লেটার টু দ্য ব্লাইন্ড*-এ দিদেরো 'মিস্টার হোমস' নামের এক নিউটনবাদীর সঙ্গে ছোট বেলায় দৃষ্টিশক্তি হারানো ক্যামব্রিজের প্রয়াত গণিতজ্ঞ নিকোলাস সন্ডারসনের (১৬৮২-১৭৩৯) বিতর্কের কল্পনা করেছেন। সন্ডারসনের মুখে হোমসকে জিজ্ঞাসা করিয়েছেন দিদেরো, পরিকল্পনার যুক্তিকে কীভাবে তিনি তাঁর মতো (সন্ডারসন) 'দানব' ও দুর্ঘটনার সঙ্গে খাপ খাওয়াবেন, যিনি বুদ্ধি ও উদার পরিকল্পনা ছাড়া আর সবই প্রকাশ করেন;

> এ জগৎ কী, মিস্টার হোমস, জটিল, পরিবর্তনের চক্রের অধীন, যার সবকিছুই ধ্বংসের অবিরাম প্রবণতা দেখায়: একের পর এক আগত বস্তু দ্রুত বিকশিত হয় ও হারিয়ে যায়; এক তুচ্ছ অস্থায়ী সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার ক্ষণস্থায়ী ধারা।[৬৭]

নিউটন ও সত্যি বলতে বহু প্রথাগত ক্রিশ্চানের ঈশ্বর, আক্ষরিকভাবেই যার সমস্ত ঘটনার জন্যে দায়ী হওয়ার কথা, তিনি কেবল অযৌক্তিকই নন বরং এক ভয়ঙ্কর ধারণা। বর্তমানে আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারি না এমন জিনিসের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যে 'ঈশ্বর'-কে উপস্থাপন করা একটি ব্যর্থতা। 'প্রিয় বন্ধু মিস্টার হোমস,' উপসংহার টানছেন দিদেরোর সন্ডারসন, 'তোমার অজ্ঞতা স্বীকার করো।'

দিদেরোর দৃষ্টিতে স্রষ্টার কোনও প্রয়োজন ছিল না। নিউটন ও প্রটেস্ট্যান্টরা যেমন ভেবেছেন বস্তু তেমন নিষ্ক্রিয় তুচ্ছ বিষয় নয়, বরং এর নিজস্ব গতি রয়েছে, যা আপন নিয়ম মেনে চলে। বস্তুর নিয়মই–স্বর্গীয় মেকানিক নন–আমরা যে পরিকল্পনা দেখি বলে মনে করি তার জন্যে দায়ী। বস্তু ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। স্পিনোযাকে আরেক কদম সামনে নিয়ে গেছেন দিদেরো। প্রকৃতি ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই না বলে দিদেরো দাবি করেছেন যে কেবল প্রকৃতিই আছে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। তাঁর এই বিশ্বাসে একা ছিলেন না তিনি। আব্রাহাম ট্রেম্বলি ও জন টার্বেভিল নীডহ্যামের মতো বিজ্ঞানীরা সৃজনী বস্তুর নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, যা জীববিজ্ঞান, অনুবিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, প্রাকৃতির ইতিহাস ও ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রকল্প হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছিল। অবশ্য অল্প সংখ্যকই ঈশ্বরের সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। এমনকি হলবাখের ব্যারন পলা হেইনরিখের (১৭২৩-৮৯) স্যালনে নিয়মিত যাতায়াতকারী দার্শনিকরাও প্রকাশ্যে নাস্তিক্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি, যদিও তাঁরা খোলামেলা আলোচনা উপভোগ করতেন। এসব বিতর্ক হতেই হলবাখের গ্রন্থ *দ্য সিস্টেম অভ নেচার: লজ অভ দ্য মোরাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড* (১৭৭০) বেরিয়ে আসে, যা নাস্তিক্যবাদী বস্তুবাদের বাইবেল হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির কোনও অতিপ্রাকৃত বিকল্প নেই, যা, হলবাখ যুক্তি দেখিয়েছেন, কারণ ও কার্যের এক বিশাল ধারা যা অবিরাম একটি থেকে অন্যটিতে প্রবাহিত হচ্ছে।[৬৮] ঈশ্বরের বিশ্বাস অসততা এবং আমাদের প্রকৃত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এটা হতাশারও পরিচায়ক। ধর্ম দেবতাদের সৃষ্টি করেছে, কারণ এই পৃথিবীর জীবনের দুঃখকষ্টে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যে মানুষ আর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। তারা নিয়ন্ত্রণের এক ভ্রান্ত বোধ সৃষ্টির প্রয়াসে ধর্ম ও দর্শনের কাল্পনিক সান্ত্বনার শরণ নিয়েছে, আতঙ্ক ও বিপর্যয় প্রতিরোধ করার জন্যে নেপথ্যে ক্রিয়াশীল এক কাল্পনিক এজেন্সিকে প্রসন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। অ্যারিস্টটল ভুল করেছিলেন: দর্শন জ্ঞান অর্জনের মহৎ আকাঙ্ক্ষার ফল ছিল না, বরং দুঃখ এড়ানোর ভীরু ইচ্ছার পরিণতি। সুতরাং ধর্মের আশ্রয় হচ্ছে অজ্ঞতা ও আতঙ্ক, একজন পরিণত আলোকিত মানুষকে অবশ্যই একে অতিক্রম করে আসতে হবে।

হলবাখ তাঁর নিজস্ব ঈশ্বরের ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন। আদিম মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করেছে। আদিম অ্যানিমিজম গ্রহণযোগ্য ছিল, কেননা তা এই জগতের ঊর্ধ্বে যাওয়ার কোনও চেষ্টা করেনি। মানুষ যখন নিজেদের ইমেজ ও পছন্দের আদলে ঈশ্বর সৃষ্টির জন্যে সূর্য, সাগর ও বাতাসকে ব্যক্তিরূপ দিতে শুরু করে তখনই পচনের সূচনা ঘটেছিল। শেষে তারা এসব দেবতাকে এক বিশাল উপাস্যে পরিণত করে, যা আসলে একটা

AMARBOI.COM

অভিক্ষেপ ও বৈপরীত্যের স্তূপ বৈ আর কিছুই নয়। শত শত বছর ধরে কবি ও ধর্মবিদরা।

> কেবল সুবিশাল পরিবর্ধিত মানুষ তৈরি করা ছাড়া আর কিছু করেননি। যাকে তারা বেমানান সব গুণাবলী একত্রিত করার মাধ্যমে অনন্য সাধারণ করেছেন মানুষ। যা ঈশ্বরের মাঝে কখনওই দেখবে না, বরং মানবজাতির একটা সত্তার, মাঝে তারা বিভিন্ন অনুপাতকে বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস পাবে, যতক্ষণ না দুর্বোধ্য একটা সত্তা সৃষ্টি হচ্ছে।

ইতিহাস দেখায়, ঈশ্বরের তথাকথিত মহানুভবতাকে তাঁর সর্বশক্তিমানতার সঙ্গে সমন্বিত করা অসম্ভব। কারণ এখানে সঙ্গতির অভাব রয়েছে, তাই ঈশ্বরের ধারণা বিনষ্ট হতে বাধ্য। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা এঁকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কবি ও ধর্মতাত্ত্বিকদের চেয়ে ভালো সাফল্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। দেকার্তে যে *hautes perfections* প্রমাণ করার দাবি করেছিলেন সেটা কেবল তাঁর কল্পনাসঞ্জাত ব্যাপার ছিল। এমনকি মহান নিউটনও তাঁর 'ছোটবেলার সংস্কারের দাস' ছিলেন। তিনি পরম শূন্যতা আবিষ্কার করেছিলেন এবং শূন্য হতে এক জন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন যিনি স্রেফ *un homme Puissant;* এক স্বর্গীয় শাসক যিনি সৃষ্ট মানুষকে ভয় দেখিয়ে দাসের পর্যায়ে নামিয়ে আনেন।[৬৯]

সৌভাগ্যক্রমে আলোকন পর্ব মানুষকে তার এই শিশু অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করে তুলবে। বিজ্ঞান ধর্মের স্থান গ্রহণ করবে। 'প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ঈশ্বরের জন্ম দিয়ে থাকলে তাঁকে ধ্বংস করার জন্যে প্রকৃতির জ্ঞান প্রণয়ন করা হচ্ছে।'[৭০] সর্বোচ্চ সত্য বা গোপন নকশা বলে কিছু নেই, নেই বিশাল কোনও পরিকল্পনা। একমাত্র প্রকৃতি অস্তিত্বমান;

> প্রকৃতি কোনও সৃষ্টি নয়; আগাগোড়াই স্বয়ং-অস্তিত্ববান, তার মাঝেই সমস্ত কিছু পরিচালিত হয়; সমস্ত মালমসলাসহ এক বিশাল পরীক্ষাগার সে, প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেই সকল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে। তার সকল কাজ আপন শক্তির ফলাফল এবং সেইসব এজেন্ট বা কারণের পরিণতি যা সে সৃষ্টি করে, ধারণ করে ও কর্মে প্রয়োগ করে।[৭১]

ঈশ্বর যে কেবল অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, বরং নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর। শতাব্দীর শেষ দিকে পিয়েরে-সাইমন দে লাপ্লেস (১৭৪৯-১৮২৭) পদার্থ বিজ্ঞান হতে ঈশ্বরকে উৎক্ষিপ্ত করেন। সৌরজগৎ ক্রমশঃ শীতল হয়ে আসা সূর্যের বিক্ষিপ্ত

AMARBOI.COM

অংশসমূহে পরিণত হয়েছিল। নেপোলিয়ন যখন তাঁর কাছে জানতে চাইলেন: এ সবের স্রষ্টা কে? লাপ্লেস সোজাসুজি জবাব দিয়েছিলেন: '*Je n'avais pas besoin de cette hypothe'se-la.''*

শত শত বছর ধরে ঈশ্বর ধর্মের একেশ্বরবাদীরা বরাবর বলে এসেছে ঈশ্বর আরেকটি সত্তা মাত্র নন। তিনি আমাদের অনুভূত অন্যান্য বস্তুর মতো অবস্থান করেন নাই। পশ্চিমে অবশ্য খ্রিস্টান ধর্মবিদরা ঈশ্বর সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলেন যেন তিনি প্রকৃতই অন্যান্য অস্তিত্ত্বমান বস্তুর মতো ছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের বস্তুগত সত্যতা প্রমাণের জন্যে নতুন বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, যেন তাঁকে অন্যান্য জিনিসের মতো পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা যাবে। দিদেরো, হলবাখ ও লাপ্লেস এই প্রয়াসকে উল্টে দিয়েছেন এবং অধিকতর চরম অতিন্দ্রীয়বাদীর মতো একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: মহাশূন্যে কিছু নেই। অচিরেই অন্যান্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকও সগর্বে ঘোষণা দিয়েছেন যে ঈশ্বরের প্রয়াণ ঘটেছে।

AMARBOI.COM

# ১০.
# ঈশ্বরের প্রয়াণ?

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় নাস্তিক্যবাদ নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ আলোচনার বিষয় ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা এক নতুন স্বাধীন চেতনার জন্ম দিচ্ছিল যা অনেককে ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীলতা ত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছে। এই শতাব্দীতেই লুদভিগ ফয়েরবাখ, কার্ল মার্ক্স, চার্লস ডারউইন, ফ্রেডেরিখ নিৎশে ও সিগমুন্ড ফ্রয়েড বাস্তবতার দর্শন ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন যেখানে ঈশ্বরের কোনও স্থান ছিল না। প্রকৃতপক্ষেই শতাব্দীর শেষদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল যে, ঈশ্বরের এখনও মৃত্যু না ঘটে থাকলে যৌক্তিক মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে তাঁকে হত্যা করা। ক্রিশ্চান পাশ্চাত্যে শত শত বছর ধরে লালিত ঈশ্বরের ধারণা এ সময় মারাত্মকভাবে অপর্যাপ্ত বোধ হচ্ছিল; যুক্তির কাল যেন শত শত বছরের কুসংস্কার আর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। আসলেই কি তাই? পশ্চিম এবার সূচনা করার সুযোগ করায়ত্ত করেছিল। এর কর্মকাণ্ডের অনিবার্য পরিণাম মুসলিমদেরও প্রভাবিত করবে, যারা নিজেদের অবস্থান যাচাই করতে বাধ্য হবে। ঈশ্বরের ধারণা প্রত্যাখ্যানকারী বহু আদর্শই অর্থপূর্ণ প্রতীয়মান হয়েছে। পাশ্চাত্য খৃস্টজগতের মানবরূপী ব্যক্তি ঈশ্বর ছিলেন নাজুক। তাঁর নামে ভয়াবহ সব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তাঁর প্রয়াণ আনন্দমুখর মুক্তি হিসাবে উদযাপিত হয়নি এবং সন্দেহ, আতঙ্ক আর কোনও কোনও ক্ষেত্রে যন্ত্রণাদায়ক বিরোধ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ গবেষণামূলক চিন্তাধারার প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা হতে মুক্ত করে নতুন ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করে ঈশ্বরকে বাঁচানোর প্রয়াস নিয়েছিল, কিন্তু নাস্তিক্যবাদ বিদায় নেওয়ার জন্যে আসেনি।

যুক্তির কাল্টের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। রোমান্টিক আন্দোলনের কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিকরা উল্লেখ করেছিলেন যে,

AMARBOI.COM

আপাদমস্তক যুক্তিবাদ ক্ষতিকর, কারণ তাতে মানবীয় চেতনার কল্পনা ও সহজাত প্রবৃত্তি নির্ভর কর্মকাণ্ড বাদ পড়ে যায়। কেউ কেউ সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গিতে খৃস্টধর্মের ডগমা ও রহস্যসমূহকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পুনর্নির্মিত ধর্মতত্ত্ব নরক ও স্বর্গ, পুনর্জন্ম ও উদ্ধার লাভের প্রাচীন থিমসমূহকে বাগধারায় রূপান্তরিত করে আলোকন পর্ব পরবর্তী মানুষের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে সেগুলোকে 'মহাশূন্যে' বিরাজিত অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক হতে বঞ্চিত করে। এইসব 'স্বাভাবিক অতিপ্রাকৃতবাদের' অন্যতম মূলসুর ছিল আমেরিকায় সাহিত্য সমালোচক এম. আর. অব্রোমস যেমন আখ্যায়িত করেছেন,[১] সৃজনশীল কল্পনা। একে এমন এক গুণ বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা হয়েছে যা এমনভাবে বাহ্যিক সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে যার ফলে একটি নতুন সত্যের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ কবি জন কীটস (১৭৯৫-১৮২১) অল্প কথায় বলেছেন: 'কল্পনা হচ্ছে আদমের স্বপ্নের মতো—জেগে উঠে তিনি একে সত্য বলে আবিষ্কার করেছেন।' মিল্টনের *প্যারাডাইস লস্টের* ঈভের সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি। সৃষ্টিই হয়নি এমন এক সত্তার স্বপ্ন দেখার পর ঘুম থেকে জেগে উঠে সামনে অবস্থানরত নারীর মাঝে তার দেখা পেয়ে যান আদম। একই চিঠিতে কল্পনাকে পবিত্র গুণ বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন কীটস: 'আমি হৃদয়ের টানের পবিত্রতা ও কল্পনার সত্যতা ছাড়া আর কোনও কিছুর ব্যাপারেই নিশ্চিতই নই—কল্পনা যাকে সুন্দর বলে গ্রহণ করে তা সত্য হতে বাধ্য—তা আগে হতেই থাকুক বা না থাকুক।'[২] সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় যুক্তির ভূমিকা খুবই সীমিত। কীটস মনের একটা অবস্থারও বিবরণ দিয়েছেন যাকে তিনি বলেছেন 'নেতিবাচক ক্ষমতা', 'যখন মানুষ সত্য ও যুক্তির দিকে বিরক্তিকরভাবে অগ্রসর না হয়ে অস্থিরতা, রহস্য, সন্দেহের পর্যায়ে অবস্থান করতে পারে।'[৩] অতিন্দ্রীয়বাদীর মতো কবিকেও যুক্তির উর্ধ্বে উঠে নীরব প্রতীক্ষার মনোভাব নিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে হয়।

মধ্যযুগীয় অতিন্দ্রীয়বাদীরা অনেকটা এভাবেই ঈশ্বরের অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছিল। ইবন আল আরাবী এমনকি আপন সত্তার গভীরে কল্পনা শক্তির ঈশ্বরের সৃষ্টিহীন সত্তার নিজস্ব অনুভূতি সৃষ্টির কথাও বলেছেন। যদিও কীটস স্যামুয়েল কোলরিজের (১৭৭২-১৮৩৪) সঙ্গে মিলিতভাবে রোমান্টিক আন্দোলনের সূচনাকারী উইলিয়াম ওঅডর্সওসঅর্থের (১৭৭০-১৮৫০) সমালোচনামুখর ছিলেন, তাঁরা কল্পনা সম্পর্কে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ওঅর্ডসওর্থের সেরা কবিতাগুলো মানুষের মন ও প্রকৃতি জগতের মৈত্রীর জয়গান গেয়েছে, যারা দৃশ্য ও অর্থ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে।[৪] ওঅর্ডসওঅর্থ স্বয়ং অতিন্দ্রীয়বাদী ছিলেন,

AMARBOI.COM

প্রকৃতি সম্পর্কিত যাঁর বোধ ঈশ্বর অনুভূতির অনুরূপ ছিল। *লাইঙ্গ কম্পোজড আ ফিউ মাইলস অ্যাবাভ টিনটার্ন অ্যাবি*-তে তিনি মনের গ্রাহী অবস্থার বর্ণনাা দিয়েছেন যা বাস্তবতার এক মোহাবেশের রূপ নিয়েছে:

সেই সুখী মন
যখন রহস্যের ভার
যখন জগদ্দল বোঝা
এই দুর্বোধ্য জগতের
হালকা হয়ে আসে, সেই
নিরিবিলি সুখী মন
যখন মমতা ক্রমশঃ আমাদের এগিয়ে নেয়—
যতক্ষণ না মননের এই কাঠামোর শ্বাস
এমনকি আমাদের মানবীয় শোণিতের প্রবাহ
প্রায় থমকে যায়, আমরা ঘুমিয়ে পড়ি,
দৈহিকভাবে হয়ে উঠি জীবন্ত আত্মা
যখন ছন্দের শক্তিতে নীরব হয়ে ওঠা
চোখ দিয়ে আর আনন্দের গভীর
শক্তিতে আমরা সমস্ত কিছুর জীবন দেখতে পাই।[৫]

এই দৃশ্য হৃদয় আর আবেগ থেকে এসেছে, ওঅর্ডসওঅর্থের ভাষ্যে অনধিকার হস্তক্ষেপকারী বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে [illegible]য়, বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা এই ধরনের অনুভবকে নষ্ট করে দিতে পারে। মানুষের জ্ঞানগর্ভ বই ও তত্ত্ব প্রয়োজন নেই। আসলে যা দরকার তা হচ্ছে এক 'প্রাজ্ঞ নিষ্ক্রিয়তা' ও 'দর্শক ও গ্রাহক হৃদয়'।[৬] অন্তরের অনুভূতি থেকে অন্তর্দৃষ্টি সূচিত হয়। যদিও একে 'প্রাজ্ঞ' হতে হবে, অনুপ্রেরণাবিহীন ও আত্মমগ্ন নয়। কীটস যেমন বলতেন, যতক্ষণ আবেগে তাড়িত হয়ে প্রাণবন্ত অবস্থায় হৃদস্পন্দনে অনুভূত হয়ে হৃদয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ সত্য পুরোপুরি সত্যে পরিণত হয় না।

ওঅর্ডসঅর্থ একটি 'চেতনা' উপলব্ধি করেছেন যা যুগপৎ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীতে পরিব্যাপ্ত আবার তা থেকে বিচ্ছিন্ন:

উন্নত চিন্তার আনন্দ আমাকে
অস্বস্তিতে দেখে দেওয়া সত্তা;
ঢের গভীরভাবে জড়িত কোনও কিছুর
একটা বোধ, সূর্যের রশ্মিতে যার

AMARBOI.COM

আবাস, আর পাক খাওয়া সাগর ও নীলাকাশ আর
মানুষের মন: এক সজীবতা ও আত্মা,
যা সমস্ত চিন্তাশীল জিনিসকে
চিন্তার সমস্ত বিষয়ক প্রলুব্ধ করে আর
বয়ে যায় সমস্ত জিনিসে।[৭]

হেগেলের মতো দার্শনিকগণ ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে এ ধরনের চেতনা খুঁজে পাবেন। ওঅর্ডসওঅর্থ তাঁর এই অনুভূতিকে প্রচলিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা না দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, যদিও অন্যান্য উপলক্ষ্যে আনন্দের সঙ্গে 'ঈশ্বর' সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছেন তিনি।[৮] ইংরেজ প্রোটেস্ট্যান্টরা অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, সংস্কারকগণ এই ঈশ্বরকে আগেই বাদ দিয়ে কর্তব্যের আহবানে বিবেকের মাধ্যমে ঈশ্বর কথা বলেছেন; তিনি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে সংশোধন করে দেন, কিন্তু ওঅর্ডসঅর্থ প্রকৃতিতে যে অনুভূতি বোধ করেছেন তাঁর সঙ্গে যেন তেমন মিল নেই। অনুভূতি প্রকাশের সঠিকতা নিয়ে আগাগোড়া সতর্ক ওঅর্ডসঅর্থ একে কেবল 'একটা কিছু' আখ্যায়িত করেছেন যা সাধারণত পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞার বিকল্প হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। ওঅর্ডসওঅর্থ চেতনাকে বর্ণনা করতে এর ব্যবহার করেছেন, কারণ প্রকৃত অতিন্দ্রীয়বাদী অজ্ঞাবাদের কারণে তিনি এর কোনও নাম দিতে চাননি, কেননা এটা তার জানা কোনও শ্রেণীতে খাপ খায়নি।

একই সময়ে আরেক অতিন্দ্রীয়বাদী কবির কণ্ঠে আরও প্রলয়ঙ্করী সুর ধ্বনিত হয়েছে, তিনি ঈশ্বর মৃত ঘোষণা দিয়েছেন। উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭) তাঁর প্রথম দিককার কবিতায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন: 'নিষ্পাপ' ও 'অভিজ্ঞতা'র মতো শব্দগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হওয়া এক অধিকতর জটিল বাস্তবতার অর্ধ-সত্য বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্লেক ইংল্যান্ডে যুক্তির কালে কবিতার ছন্দোবদ্ধ রীতির বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ আন্টিথিসিসকে ব্যক্তিগত ও অন্তর্গত দৃশ্যকল্প সৃষ্টির পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেন। *সংস অভ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স*-এর মানবাত্মার দুটো পরস্পর বিরোধী অবস্থা সংজ্ঞায়িত না হওয়া পর্যন্ত অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে: পাপহীনতাকে অবশ্যই অভিজ্ঞ হতে হবে এবং প্রকৃত নিষ্পাপকে উদ্ধার করার আগে সর্বনিম্ন গভীরতায় পতিত হতে হবে। কবি একজন পয়গম্বরে পরিণত হয়েছেন, 'যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখেন' এবং যিনি আদিম কালে মানুষের উদ্দেশে কথা বলা পবিত্র বাণী শোনেন:

ভ্রষ্ট আত্মাকে আহবান
জানিয়ে,
সন্ধ্যার শিশিরে কেঁদে
যা হয়তো তারা খচিত
মেরুকে নিয়ন্ত্রণ করতে
পারবে,
আর আলো
পড়ছে আর পড়ছে।[৯]

নাস্টিক ও কাব্বালিস্টদের মতো এক পরম পতনোন্মুখতার কল্পনা করেছেন ব্লেক। মানুষ যতক্ষণ না তার পতিত অবস্থাকে স্বীকার করছে ততক্ষণ প্রকৃত দিব্যদর্শন আসতে পারে না। প্রাথমিক যুগের অতিন্দ্রীয়বাদীদের মতো ব্লেক আমাদের চারপাশের জাগতিক বাস্তবতায় অবিরামভাবে উপস্থিত একটি প্রক্রিয়াকে প্রতীকায়িত করার জন্যে আদি পতনের ধারণাকে ব্যবহার করেছেন।

সত্যকে পদ্ধতির অধীন করার প্রয়াস পাওয়া আলোকন পর্বের দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন ব্লেক। তিনি খ্রিস্টধর্মমতের ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছিলেন, যাঁকে নারী-পুরুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ব্যবহার করা হয়েছে। যৌনতা, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে দমন করার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক আইন বা বিধি জারি করার জন্যে এই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। 'দ্য টাইগার'-এ এই অমানবীয় ঈশ্বরের 'ভয়ঙ্কর সামঞ্জস্যতা'র বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন ব্লেক, ঈশ্বরকে তিনি ভাষাতীতভাবে পৃথিবী থেকে 'দূরবর্তী গভীরে এবং আকাশে' বহুদূরের হিসাবে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও, বিশ্ব জগতের স্রষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন ঈশ্বর তাঁর কবিতায় পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। স্বয়ং ঈশ্বরকে পৃথিবীতে পতিত হয়ে ব্যক্তি জেসাসের রূপে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।[১০] তিনি এমনকি মানবজাতির শত্রু স্যাটানে পরিণত হন। নাস্টিক, কাব্বালিস্ট ও আদি ট্রিনিটি মতবাদে বিশ্বাসীদের মতো ব্লেক এক *কেনোসিস* অর্থাৎ, গডহেডের আত্ম-শূন্যকরণের চিন্তা করেছেন যিনি স্বর্গ হতে নিঃসঙ্গ পতিত হয়ে মর্ত্যে অবতারে পরিণত হন। একজন স্বাধীন উপাস্যের আর অস্তিত্ব রইল না, যিনি নারী-পুরুষকে বাহ্যিক সামঞ্জস্যহীন আইনের কাছে মাথা নত করার দাবি জানান। মানুষের এমন কোনও কর্মকাণ্ড নেই যা ঈশ্বরের অজানা; এমনকি গির্জা কর্তৃক অবদমিত যৌনতাও খোদ জেসাসের আবেগে প্রকাশ পেয়েছে। স্বেচ্ছায় জেসাসের মাঝে মৃত্যুবরণ করেছেন ঈশ্বর এবং দুর্জ্ঞেয়

AMARBOI.COM

দূরবর্তী ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বরের মৃত্যু সম্পূর্ণ হওয়ার পর মামবসুখ ঐশীসত্তা 'হিউম্যান ফেস ডিভাইন' আবির্ভূত হবেন:

> জেসাস বললেন; তোমরা কি কখনও তাঁকে ভালোবাসবে যে কখনও তোমাদের জন্যে প্রাণ দেয়নি, কিংবা যে তোমাদের জন্যে প্রাণ দেয়নি তাঁর জন্যে কি প্রাণ দেবে? আর ঈশ্বর যদি মানুষের জন্যে প্রাণ না দিতেন এবং নিজেকে চিরকালের জন্যে মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করতেন, মানুষের অস্তিত্ব থাকত না; কেননা মানুষই প্রেম যেমন ঈশ্বরই প্রেম: পরস্পরের প্রতি প্রতিটি দয়া স্বর্গীয় রূপে-ক্ষুদ্র মৃত্যু বিশেষ। স্বর্গীয় রূপে ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া কোনও মানুষ টিকে থাকতে পারবে না।[১১]

প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন ব্লেক, কিন্তু কিছু কিছু ধর্মবিদ আনুষ্ঠানিক খৃস্টধর্মমতে রোমান্টিক দর্শন অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। তাঁরাও একজন দূরবর্তী দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের ধারণাকে পরিত্যাজ্য ও অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে আবিষ্কার করেছেন; তার বদলে অন্তর্গত ধর্মীয় অনুভূতির ওপর জোর দিয়েছেন। ১৭৯৯ সালে ওঅর্ডসঅর্থ ও কোলরিজ ইংল্যান্ডে *লিরিক্যাল ব্যালাডস* প্রকাশ করার পর এবং জার্মানিতে ফ্রেইডরিখ শ্লেইয়ারম্যাশার (১৭৬৮-১৮৩৪) তাঁর নিজস্ব রোমান্টিক ইশতেহার *অন রিলিজিয়ন, স্পিচেস টু ইটস কালচার্ড ডেসপাইজার্স* বের করেন। ডগমাসমূহ স্বর্গীয় সত্য নয় বরং স্রেফ 'ভাষায় প্রকাশ করা ক্রিশ্চান ধর্মীয় দুর্বলতার বিবরণ।'[১২] ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিভিন্ন ক্রীডের প্রস্তাবনার মাঝে সীমিত রাখা যায় না: এর জন্যে প্রয়োজন আবেগ নির্ভর উপলব্ধি ও অভ্যন্তরীণ আত্মসমর্পণ চিন্তা। যুক্তির নিজস্ব স্থান রয়েছে, কিন্তু এগুলো আমাদের খুব বেশি দূরে নিতে পারে না। আমরা যখন যুক্তির শেষ সীমানায় পৌঁছাই, তখন অনুভব পরমের দিকে আমাদের যাত্রা সম্পূর্ণ করবে। শ্লেইয়ারম্যাশার 'অনুভব'-এর কথা বলে শিথিল আবেগের কথা বোঝাননি বরং এক সজ্ঞার কথা বলেছেন যা নারী ও পুরুষকে অসীমের দিকে চালিত করে। অনুভব মানবীয় যুক্তির বিরোধী নয় বরং এক কল্পনানির্ভর উল্লম্ফন যা আমাদের নির্দিষ্টতাকে অতিক্রম করে সমগ্রের উপলব্ধিতে নিয়ে যায়। এইভাবে অর্জিত ঈশ্বরের অনুভূতি প্রতিটি মানুষের গভীর থেকে উঠে আসে, বস্তুগত কোনও সত্যের সঙ্গে সংঘাত হতে নয়।

তোমাস আকুইনাসের সময় হতেই পাশ্চাত্যের ধর্মতত্ত্ব যুক্তিবাদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়ে আসছিল, সংস্কারের পর এই প্রবণতা আরও বেড়ে ওঠে। শ্লেইয়ারম্যাশারের রোমান্টিক ধর্মতত্ত্ব ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার প্রয়াস ছিল। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, অনুভূতিই শেষ কথা নয়, তা ধর্মের সম্পূর্ণ

AMARBOI.COM

বা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। যুক্তি ও অনুভব উভয়ই তাদের অতীত এক বর্ণনাতীত সত্তার দিকে ইঙ্গিত করে। শ্লেইয়ারম্যাশার ধর্মের মূল সুরকে 'পরম নির্ভরতার অনুভূতি'[১৩] হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এটা, আমরা দেখব, এমন এক মনোভাব যা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের জন্যে অভিশাপে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু শ্লেইয়ারম্যাশার ঈশ্বরের সামনে শোচনীয় বশ্যতার কথা বোঝাননি। বিষয়ের প্রেক্ষিতে বাক্যবন্ধটি আমরা জীবনের রহস্যের কথা চিন্তা করার সময় যে শ্রদ্ধার বোধ জেগে ওঠে তার দিকে ইঙ্গিত করে। ভয়ের এই অনুভূতি *নুমিনাসের* অনুভূতি থেকে জেগে ওঠা মানুষের চিরন্তন বোধ। ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ পবিত্র আত্মার দর্শন গভীর আঘাত হিসাবে এই অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ওঅর্ডসওঅর্থের মতো রোমান্টিকগণ প্রকৃতিতে দেখা পাওয়া আত্মার প্রতি একই রকম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা বোধ করেছেন। শ্লেইয়ারম্যাশারের বিশিষ্ট শিষ্য রুডলফ অটো তাঁর *দ্য আইডিয়া অভ দ্য হোলি* শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে এই অনুভূতির বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষ দুর্জ্ঞেয়র মুখোমুখি হলে তাদের মাঝে আর এই বোধ থাকে না যে, তারা অস্তিত্বের আলফা ও ওমেগা।

জীবনের শেষ দিকে শ্লেইয়ারম্যাশারের ধারণা হয় তিনি সম্ভবত অনুভব ও অন্তর্মূখীতার গুরুত্বের ওপর বেশি জোর দিয়ে ফেলেছেন। খৃস্টধর্মকে অচল বিশ্বাস মনে হওয়ার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন তিনি: কিছু কিছু ক্রিশ্চান মতবাদ ছিল বিভ্রান্তিকর, এগুলো আবার সংশয়বাদের কাছে ধর্ম বিশ্বাস দুর্বল করে তুলেছিল। উদাহরণস্বরূপ ট্রিনিটির মতবাদ যেন বোঝাতে চায় ঈশ্বরের সংখ্যা তিন। শ্লেইয়ারম্যাশারের অনুসারী অ্যালবার্ট রিটশল্ (১৮২২-৮৯) এই মতবাদকে হেলেনাইযেশনের প্রকট নজীর হিসাবে দেখেছেন। এটা 'গ্রিকদের প্রাকৃতিক দর্শন থেকে উদ্ভূত মেটাফিজিক্যাল ধারণার একটা আস্তরণ' যোগ করে খৃস্টীয় বাণীকে দুষিত করেছে, যার সঙ্গে সূক্ষ্ম ক্রিশ্চান অনুভূতির কোনও সম্পর্ক নেই।[১৪] তা সত্ত্বেও শ্লেইয়ারম্যাশার ও রিটশল্ প্রতিটি প্রজন্ম যে ঈশ্বর সংক্রান্ত নিজস্ব কল্পনানির্ভর ধারণা গ্রহণ করেছে তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন, ঠিক যেমন প্রত্যেক রোমান্টিক কবি আপন হৃদস্পন্দনে সত্যকে অনুভব করেছেন। গ্রিক ফাদারগণ আপন সংস্কৃতির পরিভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরের সেমিটিক ধারণাকে নিজেদের জন্যে কার্যকর করার প্রয়াস পেয়েছিলেন মাত্র। পাশ্চাত্য আধুনিক প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করার সময় ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রাচীন ধারণাগুলো অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু তারপরেও শেষ পর্যন্ত শ্লেইয়ারম্যাশার জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, ধর্মীয় আবেগ যুক্তির বিপক্ষে নয়। মৃত্যু শয্যায় তিনি বলেছেন: 'আমাকে অবশ্যই গভীরতম, অনুমান নির্ভর চিন্তা করতে হবে ও আমার কাছে এগুলো সর্বোচ্চ অন্তরঙ্গ

AMARBOI.COM

ধর্মীয় অনুভূতির পুরোপুরি সমার্থক।'[১৫] অনুভব এবং ব্যক্তিগত ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কাল্পনিকভাবে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণাসমূহ অর্থহীন।

উনবিংশ শতাব্দীতে একের পর এক প্রধান দার্শনিক ঈশ্বরের প্রচলিত ধারণা, অন্তত পশ্চিমে বিরাজমান ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁরা বিশেষ করে 'মহশূন্যে' বস্তুগত অস্তিত্ব সম্পন্ন এক অতিপ্রাকৃত উপাস্যের অস্তিত্বের ধারণায় সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমরা দেখেছি, পরম সত্তা হিসাবে ঈশ্বরের ধারণা পশ্চিমে প্রবল হয়ে উঠলেও অন্য একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো নিজেদের এ ধরনের ধর্মতত্ত্ব হতে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভিন্ন দিকে যাত্রা করছিল। ইহুদি, মুসলিম ও অর্থডক্স ক্রিশ্চানদের প্রত্যেকেই তাদের মতো করে বিভিন্নভাবে জোর দিয়ে বলেছে যে, ঈশ্বর সম্পর্কিত মানবীয় ধারণা এটা যে অনিবর্চনীয় সত্তার তুচ্ছ প্রতীক এর সঙ্গে মেলেনি। সবাই বোঝাতে চেয়েছে, কোনও না কোনও সময় ঈশ্বরকে পরম সত্তা না বলে 'কিছু না' হিসাবে বর্ণনা করাই অধিকতর সঠিক, যেহেতু আমাদের বোধগম্য উপায়ে 'তিনি' অস্তিত্বমান নন। শত শত বছরের পরিক্রমায় পাশ্চাত্য ঈশ্বর সংক্রান্ত অধিকতর কল্পনা-নির্ভর এই ধারণাটি হারিয়ে ফেলেছে। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টরা 'তাঁকে' আমাদের চেনা জগতের ওপর আরোপিত আরেকটি বাস্তবতা হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল, যিনি স্বর্গীয় 'বড় ভাইয়ের মতো', আমাদের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করছেন। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বিপ্লবোত্তর বিশ্বের অনেকের কাছেই ঈশ্বরের এই ধারণা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ছিল, কারণ এতে মানুষকে অত্যন্ত হীনভাবে বশ্যতা মানানো হয়েছে বলে মনে হয়, মানুষকে অর্থহীন, নির্ভরশীল করেছে যা মানুষের মর্যাদার সঙ্গে বেমানান। উনবিংশ শতাব্দীর নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা যথার্থ কারণেই এই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁদের সমালোচনার ফলে সমসাময়িক অনেকেই একই পথ অনুসরণে অনুপ্রাণিত হয়েছে; তারা যেন একেবারে নতুন কিছু বলছিলেন, কিন্তু যখন ঈশ্বর প্রসঙ্গে নিজেদের জবাব দিয়েছেন, তখন প্রায়শঃই অবচেতনভাবে অতীতের অন্যান্য একেশ্বরবাদীর দর্শনের পুনরাবৃত্তি করেছেন।

এভাবেই জর্জ উইলহেম হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) এমন এক দর্শনের জন্ম দেন যা লক্ষণীয়ভাবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাব্বালাহর অনুরূপ ছিল। ব্যাপারটি পরিহাসমূলক, কেননা ইহুদিবাদকে হীন ধর্ম বিবেচনা করতেন তিনি, যা মহাভ্রান্তি ঘটানো ঈশ্বরের আদিম ধারণার জন্যে দায়ী। হেগেলের দৃষ্টিতে ইহুদিদের ঈশ্বর ছিলেন স্বৈরাচারী, যিনি অসহনীয় এক আইন বা নিয়মের কাছে প্রশ্নাতীত বশ্যতা দাবি করেছেন। জেসাস নারী ও পুরুষকে এই নীচতা থেকে

AMARBOI.COM

উদ্ধার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রিশ্চানরাও ইহুদিদের মতো একই ফাঁদে আটকা পড়ে স্বর্গীয় শাসকের ধারণাকে সংহত করেছে। এখন সময় হয়েছে এই বর্বর উপাস্যকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে মানবীয় অবস্থার অধিকতর আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। নিউ টেস্টামেন্টের যুক্তির উপর গড়ে ওঠা ইহুদিবাদ সম্পর্কে হেগেলের ভুল ধারণা ছিল: এক নতুন ধরনের মেটাফিজিক্যাল অ্যান্টি-সেমিটিজম। কান্টের মতো হেগেল ইহুদিবাদকে ধর্মের সব রকম ভুল বা ত্রুটির উদাহরণ হিসাবে দেখেছেন। *দ্য ফেনোমেনোলজি অভ মাইন্ড* (১৮০৭)-এ তিনি প্রচলিত উপাস্যের জন্যে পৃথিবীর প্রাণশক্তি আত্মা-র ধারণাকে প্রতিস্থাপিত করেন। তা সত্ত্বেও কাব্বালাহর মতো আত্মা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ও আত্ম-সচেতনা অর্জনের জন্যে সীমাবদ্ধতা ও নির্বাসন ভোগ করতে ইচ্ছুক ছিল। আবার কাব্বালাহ্‌র মতোই আত্মা-এর পূর্ণতার জন্যে পৃথিবী ও মানুষের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে হেগেল প্রাচীন একেশ্বরবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন—যা খৃস্টধর্ম ও ইসলামেরও বৈশিষ্ট্য—যে ঈশ্বর জাগতিক বাস্তবতা হতে বিচ্ছিন্ন নন, তাঁর আপন জগতে ঐচ্ছিক বাড়তি কিছু নন, বরং মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্লেকের মতো দ্বান্দ্বিকতার মাধ্যমে এই দর্শন প্রকাশ করেছেন তিনি, মানুষ ও আত্মা, সসীম ও অসীমকে একই সত্যের দুটি অংশ বিবেচনা করেছেন, যারা পরস্পরের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ও আত্ম-উপলব্ধির একই প্রক্রিয়ার জড়িত। অপরিচিত অনাকাঙ্ক্ষিত বিধি-বিধান পালনের ভেতর দিয়ে দূরবর্তী এক উপাস্যকে প্রসন্ন করার বদলে কার্যতঃ হেগেল ঘোষণা করেছেন, ঈশ্বর আমাদের মনুষ্যত্বেরই একটা মাত্রা। প্রকৃতপক্ষেই, হেগেলের আত্মার *কেনোসিসের* ধারণা—যা পৃথিবীতে সর্বব্যাপী ও রূপ ধারণের জন্যে নিজেকে নিঃশেষে করে—এর সঙ্গে তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মে গড়ে ওঠা অবতারবাদমূলক ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রচুর মিল রয়েছে।

হেগেল অবশ্য একাধারে আলোকন পর্ব ও রোমান্টিক যুগের মানুষ ছিলেন; সে কারণে কল্পনার চেয়ে যুক্তিকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। আবার অনিচ্ছাকৃতভাবেই অতীতের দর্শনের প্রতিধ্বনি করেছেন। ফায়লাসুফদের মতো যুক্তি ও দর্শনকে ধর্মের চেয়ে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন হিসাবে দেখেছেন তিনি, যা চিন্তার প্রতিনিধিত্বমূলক ধারায় প্রোথিত। আবার ফায়লাসুফদের মতো পরম সত্তা সম্পর্কে ব্যক্তির মনোজগতের ক্রিয়া হতে উপসংহার টেনেছেন হেগেল, যাকে তিনি সমগ্রকে তুলে ধরা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বন্দি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর দর্শনকে আর্থার শোপেনহঅর (১৭৮৮-১৮৬০) কাছে হাস্যকরভাবে আশাবাদী ঠেকেছিল। ১৮১৯ সালে বার্লিনে হেগেল নির্ধারিত সময়েই ভাষণ দেওয়ার সময়সূচি নির্ধারণ করেছিলেন তিনি, এ বছরই তাঁর *দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ*

AMARBOI.COM

*উইল অ্যান্ড আইডিয়া* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শোপেনহঅর বিশ্বাস করতেন, পরম সত্তা, ঈশ্বর বা আত্মা বলে কোনও কিছু এই জগতে ক্রিয়াশীল নেই: আছে কেবল বেঁচে থাকার অদম্য আদিম ইচ্ছা। এই বিষণ্ন দর্শন রোমান্টিক আন্দোলনের নেতিবাচক চেতনায় আবেদন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য ধর্মের সকল দর্শন বাতিল করে দেয়নি এটা। শোপেনহর বিশ্বাস করতেন হিন্দুধর্মমত ও বুদ্ধ মতবাদ (এবং ঐসব ক্রিশ্চান যারা সমস্ত কিছুকে অসার বলে মেনে নিয়েছিল) পৃথিবীর সবকিছু মায়া মাত্র দাবি করে বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক ও ন্যায্য ধারণায় পৌঁছেছিল। যেহেতু আমাদের রক্ষা করার জন্যে কোনও 'ঈশ্বর' নেই, কেবল শিল্পকলা, সঙ্গীত এবং আত্মত্যাগ ও সমবেদনার এক অনুশীলনই আমাদের মাঝে অটল অচঞ্চল বোধ জাগাতে পারে। ইহুদিবাদ ও ইসলাম নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ শোপেনহঅর ছিল না, তাঁর দৃষ্টিতে এদুটো ইতিহাসের অসম্ভব সহজ এবং উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে তিনি দূরদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন: আমরা দেখব যে আমাদের দেশে ইহুদি এবং মুসলিমরা আবিষ্কার করেছে যে, থিওফ্যানি হিসাবে ইতিহাসকে দেখার পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি এখন আর আগের মতো ধরে রাখা যাচ্ছে না। অনেকেই এখন আর ইতিহাসের নিয়ন্তা ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। কিন্তু মুক্তি সম্পর্কিত শোপেনহঅর দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদি ও মুসলিম ধারণার কাছাকাছি: প্রত্যেককে যার যার জন্যে পরম অর্থের একটা বোধ সৃষ্টি করতে হবে। এর সঙ্গে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত প্রোটেস্ট্যান্ট ধারণার কোনওই মিল ছিল না, যেখানে বোঝানো হয়েছে যে, মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের কিছুই করার নেই, বরং তারা সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক এক উপাস্যের ওপর নির্ভরশীল।

ঈশ্বর সম্পর্কিত এইসব পুরোনো ধারণা ত্রুটিপূর্ণ ও অপূর্ণ বলে ক্রমবর্ধমান হারে নিন্দিত হচ্ছিল। ডেনিশ দার্শনিক সোরেন কিয়েকেগার্দ (১৮১৩-৫৫) জোর দিয়ে বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রাচীন বিশ্বাস ও মতবাদ প্রতিমায় পরিণত হয়ে ঈশ্বরের অনিরর্বচনীয় সত্তার বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত খৃস্টধর্ম বিশ্বাস এসব ফসিলায়িত মানবীয় ও প্রাচীন ধ্যান-ধারণা হতে দূরবর্তী অজানায় এক উল্লম্ফন। অন্যরা অবশ্য এই পৃথিবীতেই মানুষের শেকড় স্থাপন করতে চেয়ে মহান বিকল্পের ধারণা (Great Aiternative) বাদ দিতে চেষ্টা করেছেন। জার্মান দার্শনিক লুদভিগ আন্দ্রিয়াস ফয়েরবাখ (১৮০৪-৭২) তাঁর প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ *দ্য এসেন্স অভ ক্রিশ্চানিটি* (১৮৪১)-তে যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, ঈশ্বর স্রেফ মানবীয় এক অভিক্ষেপ মাত্র। ঈশ্বরের ধারণা আমাদের মানবীয় অক্ষমতা-দুর্বলতার বিপরীতে এক অসম্ভব সম্পূর্ণতাকে স্থাপন করার ভেতর দিয়ে আমাদের নিজস্ব স্বভাব বা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।

এভাবে ঈশ্বর অসীম, মানুষ সসীম; ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, মানুষ দুর্বল; ঈশ্বর পবিত্র, মানুষ পাপী। ফয়েরবাখ পাশ্চাত্য ট্র্যাডিশনের বিশেষ দুর্বল জায়গায় হাত দিয়েছিলেন, সবসময়ই যাকে একেশ্বরবাদে বিপদজ্জনক বিবেচনা করা হয়েছে। যে অভিক্ষেপে ঈশ্বর মানবীয় অবস্থার বাইরে চলে যান সেখানে পরিণাম স্বরূপ প্রতিমা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যান্য ট্র্যাডিশন এই বিপদ মোকাবিলা করার বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে একথা সত্য যে, পশ্চিমে ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণা ক্রমবর্ধমানহারে বহিরঙ্গের বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং মানব প্রকৃতির অত্যন্ত নেতিবাচক ধারণা বিস্তারে অবদান রেখেছে। অগাস্তিনের সময় থেকেই পশ্চিমে ঈশ্বরের ধর্মে অপরাধ ও পাপ, সংগ্রাম ও চাপের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছিল, যা উদাহরণ স্বরূপ, গ্রিক অর্থডক্স ধর্মতত্ত্বের কাছে অজানা ছিল। এটা বিস্ময়কর নয় যে, ফয়েরবাখ বা অগাস্ত কোতে (১৭৯৮-১৮৫৭)-এর মতো দার্শনিকগণ, যাঁদের মানুষ সম্পর্কে অধিকতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, অতীতে ব্যাপক আস্থাহীনতার কারণ এই ঈশ্বরকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন।

নাস্তিক্যবাদ সবসময়ই ঈশ্বর সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রত্যাখ্যান ছিল। ইহুদি ও ক্রিশ্চানরা 'নাস্তিক' আখ্যা পেয়েছিল, কারণ তারা ঈশ্বর সংক্রান্ত প্যাগান ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে, যদিও ঈশ্বরে তাদের বিশ্বাস ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নব্য-নাস্তিকরা ঈশ্বরের সামগ্রিক ধারণা নয় বরং পশ্চিমে প্রচল ঈশ্বর সম্পর্কিত বিশেষ ধারণার বিরুদ্ধে বাক্যবান হানছিল; এভাবে কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) ধর্মকে 'নিপীড়িত জনের দীর্ঘশ্বাস...জনগণের জন্যে এই দুর্দশাকে সহনীয় করে তোলা আফিম'[১৬] হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তিনি জুদো-ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশনের ওপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল ইতিহাসে মেসিয়ানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরকে অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে নাকচ করে দিয়েছেন। যেহেতু ঐতিহসিক প্রক্রিয়ার বাইরে অন্য কোনও তাৎপর্য মুল্য বা উদ্দেশ্য নেই, সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা মানুষের উপকারে আসতে পারে না। ঈশ্বরের অস্বীকৃতি নাস্তিক্যবাদ সময়ের অপচয়। তবু মার্ক্সীয় সমালোচকের কাছে ঈশ্বর আক্রমণের বিষয় ছিলেন, কেননা শাসক কর্তৃক তিনি প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়েছেন এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা অনুমোদন করার জন্যে যেখানে ধনী প্রাসাদে অবস্থান করে আর দরিদ্রজন তার দরজায় বসে থাকে। অবশ্য সমগ্র একেশ্বরবাদী ধর্মের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ সত্যি ছিল না। সামাজিক অনাচারকে প্রশ্রয় দানকারী ঈশ্বর আমোস, ইসায়াহ কিংবা মুহাম্মদকে (স) শঙ্কিত করে তুলতেন, যাঁরা ঈশ্বরের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, যার সঙ্গে মার্ক্সীয় আদর্শের প্রচুর সাজুয্য ছিল।



AMARBOI.COM

একইভাবে ঈশ্বর ও ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক উপলব্ধি বহু ক্রিশ্চানের ধর্ম বিশ্বাসকে এ সময়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাছে নাজুক করে তুলেছিল। চার্লস লিয়েলের ভূতাত্ত্বিক সময়কালের বিশাল দৃষ্টিকোণ উন্মোচনকারী *প্রিন্সিপালস অভ জিওলজি* (১৮৩০-৩৩) এবং চার্লস ডারউইনের বিবর্তনের ধারণাকে সামনে নিয়ে আসা *দ্য অরিজিন অভ স্পিসিস* (১৮৪৯) সৃষ্টির বাইবেলিয় বিবরণের বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। নিউটনের সময় থেকেই সৃষ্টির প্রসঙ্গটি ঈশ্বর সম্পর্কে পাশ্চাত্যে উপলব্ধির কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল; মানুষ একথা বিস্মৃত হয়েছিল যে, বাইবেলের কাহিনীকে কখনও বিশ্বজগতের ভৌত ইতিহাসের বিবরণ হিসেবে বিবেচনা করার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষেই শূন্য হতে সৃষ্টির মতবাদ বহুকাল আগে থেকেই সমস্যা সঙ্কুল ছিল এবং অপেক্ষাকৃত অনেক পরে ইহুদিবাদ ও খৃস্ট ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছিল; ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ কর্তৃক জগৎ সৃষ্টির ধারণা মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেটা কীভাবে ঘটেছে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। ঈশ্বর সম্পর্কে কোরানের অন্য সব বক্তব্যের মতো সৃষ্টি সম্পর্কিত মতবাদও 'রূপক'—এক নিদর্শন বা প্রতীক মাত্র। তিন একেশ্বরবাদী ধর্মের সবকটাই সৃষ্টিকে মিথ হিসাবে দেখেছে, শব্দটির সবচেয়ে ইতিবাচক অর্থে এটা এক প্রতীকী বিবরণ যা নারী-পুরুষকে একটি বিশেষ ধর্মীয় মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ইহুদি ও মুসলিমদের কেউ কেউ ইচ্ছা করেই সৃষ্টির কাহিনীর কল্পনা-নির্ভর ব্যাখ্যা করেছে যা কোনও আক্ষরিক অর্থ থেকে মারাত্মকভাবে দূরে সরে গেছে। কিন্তু পশ্চিমে বাইবেলের প্রতিটি বিবরণকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলে বিশ্বাস করার একটা প্রবণতা ছিল। বহু মানুষই পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার জন্যে ঈশ্বরকে আক্ষরিক ও শারীরিকভাবে দায়ী বলে বিশ্বাস করতে শিখেছে, যেমন আমরা কোনও কিছু তৈরি করি বা কোনও ঘটনা ঘটিয়ে থাকি।

অবশ্য এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্রিশ্চান অচিরেই বুঝতে পেরেছিল, ডারউইনের আবিষ্কারসমূহ কোনওভাবেই ঈশ্বরের ধারণার প্রতি মারাত্মক হুমকি ছিল না। মূল স্রোতধারার খৃস্টধর্ম বিবর্তন তত্ত্বের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিল, ইহুদি ও মুসলিমরা জীবনের বিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারে কখনই তেমন বিচলিত বোধ করেনি। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমরা দেখব, ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎস থেকে। এটা অবশ্য সত্যি যে, পশ্চিমা সেক্যুলারিজম বিস্তার লাভ করায় তা অনিবার্যভাবে অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের সদস্যদের প্রভাবিত করেছে। ঈশ্বর সম্পর্কে আক্ষরিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বহাল আছে; পশ্চিমের অনেকেই সকল পর্যায়ে ধরেই নিয়েছে যে, আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব ঈশ্বরের ধারণায় মারণ-আঘাত হেনেছে।

AMARBOI.COM

গোটা ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের ধারণা যখনই আর কাজে আসেনি তখনই মানুষ তা ছুঁড়ে ফেলেছে। কখনও এটা প্রতিমা পূজার বিরোধিতার রূপ নিয়েছে, যেমন প্রাচীন ইসরায়েলিরা কানানবাসীদের ভজনালয়গুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল কিংবা পয়গম্বররা যখন তাদের পৌত্তলিক দেবতাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮২ সালে ফ্রেডেরিখ নিৎশে ঈশ্বরের প্রয়াণ ঘটার ঘোষণা দিয়ে অনুরূপ সহিংস কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এক পাগলের কাহিনীর মাধ্যমে বিপ্লবাত্মক ঘটনার প্রকাশ করেছেন তিনি। এই উন্মাদ একদিন সকালে বাজার এলাকার হাজির হয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আমি ঈশ্বরকে চাই! আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি।' উন্নাসিক দর্শকরা যখন জানতে চাইল যে, ঈশ্বর কোথায় গেছেন বলে তার ধারণা–তিনি কি পালিয়েছেন নাকি ভিন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন?–উন্মাদ চোখ রাঙিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঈশ্বর কোথায় গেছে? সেটাই তোমাদের বলতে চাই। আমরা তাঁকে হত্যা করেছি–তোমরা এবং আমি! আমরা সবাই তাঁর হত্যাকারী।' এক অকল্পনীয় অথচ অপরিবর্তনীয় ঘটনা মানব জাতিকে মহাবিশ্বে ছুঁড়ে দিল। এতদিন পর্যন্ত যা মানুষকে একটা দিক নির্দেশনায় অনুভূতি যোগাচ্ছিল তা হারিয়ে গেল। ঈশ্বরের প্রয়াণ নজীরবিহীন হতাশা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করবে। এখনও কি স্বর্গ আর নরক আছে? পাগল লোকটি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমরা কি এক অসীম শূন্যতার মাঝে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাইনি?'[১৭]

AMARBOI.COM

নিৎশে উপলব্ধি করেছিলেন পশ্চিমের মানুষের চেতনায় এক চরম পরিবর্তন ঘটে গেছে যা অধিকাংশ লোকে যে ব্যাপারটিকে 'ঈশ্বর' হিসাবে বিবৃত করে তাতে বিশ্বাস রাখা ক্রমবর্ধমান হারে কঠিন করে তুলবে। আমাদের বিজ্ঞান সৃষ্টির আক্ষরিক অনুধাবনের ধারণাকে কেবল অসম্ভবই করে তোলেনি, বরং আমাদের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা স্বর্গীয় তত্ত্বাবধায়কের ধারণাকেও অগ্রহণযোগ্য করে দিয়েছে। মানুষের মনে হয়েছে, তারা এক নতুন দিন প্রত্যক্ষ করছে। নিৎশের উন্মাদ জোর দিয়ে বলেছে, ঈশ্বরের প্রয়াণ মানুষের ইতিহাসের এক উচ্চতর পর্যায়ের সূচনা করবে। উপাস্য হত্যা ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্যে মানুষকেই দেবতায় পরিণত হতে হবে। *দাস স্পেক যরোথ্রুস্ত্র* (১৮৮৩)-তে এক অতিমানবের জন্মলাভের ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি, যিনি ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করবেন; আলোকিত নতুন মানুষ প্রাচীন ক্রিশ্চান মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, মানুষের মূল রীতিনীতিকে ধ্বংস করে নতুন শক্তিশালী মানবজাতির আগমন ঘটাবেন, ক্রিশ্চানদের দুর্বল ভালোবাসা ও করুণার গুণাবলীর কোনওটিই যার থাকবে না। তিনি বুদ্ধ মতবাদের মৃত ধর্মে দেখা পাওয়া চিরন্তন পুনর্ঘটন ও পুনর্জন্মের প্রাচীন মিথেরও শরণাপন্ন হয়েছেন। এখন ঈশ্বর যেহেতু পরলোকগমন করেছেন, এই

পৃথিবীই পরম মূল হিসাবে তাঁর স্থান অধিকার করতে পারে। যা কিছু বিদায় নেয়, আবার ফিরে আসে; যা কিছু মারা যায়, আবার তা জন্ম নেয়; যা কিছু ভাঙে আবার তা জোড়া লাগে। আমাদের পৃথিবী চিরন্তন ও স্বর্গীয় হিসাবে পূজিত হতে পারে, যে গুণাবলী এক সময় কেবল দূরবর্তী দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হতো।

নিৎশে শিক্ষা দিয়েছেন, ক্রিশ্চান ঈশ্বর ছিলেন করুণার যোগ্য, অবাস্তব এবং 'জীবনের বিরুদ্ধে এক অপরাধ।'[১৮] মানুষকে তিনি আপন দেহ, আবেগ ও যৌনতাকে ভয় করার উৎসাহ দিয়েছেন ও সমবেদনার এক করুণ নৈতিকতার পক্ষে কথা বলেছেন যা আমাদের দুর্বল করে দিয়েছে। পরম অর্থ বা মূল্য বলে কিছু ছিল না এবং 'ঈশ্বরে'র কোনও রকম পরিশ্রম সাপেক্ষ বিকল্প দান করার কোনও প্রয়োজন ছিল না; আবার একথা বলা দরকার যে, পশ্চিমের ঈশ্বর এই সমালোচনার কাছে নাজুক ছিলেন। জীবন অস্বীকারকারী সংযমের মাধ্যমে মানুষকে মনুষ্যত্ব ও যৌন কামনা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে তাঁকে ব্যবহার করা হচ্ছিল। পৃথিবীর এই জীবনের বিকল্প ও সহজ রোগ নিরাময়কারীতেও পরিণত করা হয়েছিল।

সিগমান্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের বিশ্বাসকে ভ্রান্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন, পরিণত নারী-পুরুষের যা একপাশে সরিয়ে রাখা উচিত। ঈশ্বরের ধারণা মিথ্যা, বরং অবচেতন মনের কৌশল, যাকে মনস্তত্ত্ব দিয়ে উৎপাটন করা প্রয়োজন ছিল। একজন ব্যক্তিক ঈশ্বর এক মহিমান্বিত পিতৃপুরুষ ছাড়া আর কিছুই নয়; এমন একজন উপাস্যের আকাঙ্ক্ষা ছোটবেলার শক্তিমান ও যত্নবান পিতার জন্যে কামনা এবং বিচার, নিরপেক্ষতা ও বাধাহীন জীবনযাপনের ইচ্ছা থেকে জেগে ওঠে। ঈশ্বর এসব আকাঙ্ক্ষার অভিক্ষেপ মাত্র, অসহায়ত্বের অনুভূতির কারণে মানুষ এর উপাসনা করে। ধর্ম মানব জাতির শৈশবের ব্যাপার ছিল; ছেলেবেলা থেকে পরিণত বয়সে পৌঁছাতে এর প্রয়োজন ছিল। সমাজের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়েছিল তা। এখন যেহেতু মানব জাতি পরিণত হয়ে উঠেছে, একে এবার ত্যাগ করা উচিত। এটা নয়া *লোগোস*–বিজ্ঞান–ঈশ্বরের স্থান অধিকার করতে পারবে, আমাদের নৈতিকতার নতুন ভিত্তি যোগাবে আমাদের আতঙ্কের মোকাবিলায় সাহায্য করবে। বিজ্ঞানে আপন বিশ্বাসের বেলায় অন্ধ ছিলেন ফ্রয়েড, যাকে প্রায় ধার্মিকতার মতো প্রবল মনে হয়: 'না, আমাদের বিজ্ঞান বিভ্রান্তি নয়। এটা মনে করা ভ্রান্তি হবে যে, বিজ্ঞান যা দিতে পারবে না তা আমরা অন্যত্র পাব।'[১৯]

সকল সাইকোঅ্যানালিস্ট ঈশ্বর সম্পর্কে ফ্রয়েডিয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত পোষণ করেননি। আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭) ঈশ্বরকে অভিক্ষেপ

AMARBOI.COM

হিসাবে মেনে নিলেও বিশ্বাস করতেন যে, এটা মানুষের জন্যে উপকারী ছিল; এটা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠর এক অসাধারণ ও কার্যকর প্রতীক। সি. জি. জাংয়ের (১৮৭৫-১৯৬১) ঈশ্বর অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বরের মতোই এক মনস্তাত্ত্বিক সত্য ছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে যিনি অনুভূত হন। বিখ্যাত *ফেস টু ফেস* সাক্ষাৎকারে জন ফ্রিম্যান যখন জানতে চেয়েছিলেন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা, জাং জোরাল জবাব দিয়েছিলেন: 'আমার বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই, আমি জানি। জাংয়ের বিশ্বাস দেখায় যে, সত্তার গভীরে রহস্যময়ভাবে অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকা একজন অভ্যন্তরীণ ঈশ্বর সাইকোঅ্যানালিস্টিক বিজ্ঞানের মুখেও টিকে যেতে পারেন; অন্যদিকে প্রকৃতই চিরন্তন অপরিপক্কতাকে উৎসাহিতকরী অধিকতর ব্যক্তিক মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন (anthropomorphic) উপাস্য নাও টিকতে পারেন।

মনে হয় অন্যান্য বহু পাশ্চাত্যবাসীর মতো ফ্রয়েড এই অন্তরের ঈশ্বর সম্পর্কে সজাগ বা সচেতন ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি ধর্ম ধ্বংস করার প্রয়াস বিপদজ্জনক হবে বলে এক বৈধ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। মানুষকে যথাসময়ে ঈশ্বরকে অতিক্রম করতে হবে; প্রস্তুত হওয়ার আগেই জোর করে তাদের নাস্তিক্যবাদ বা সেক্যুলারিজমের দিকে ঠেলে দিলে অস্বাস্থ্যকর অস্বীকৃতি ও নিপীড়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। আমরা দেখেছি, সুপ্ত উদ্বেগ ও 'অন্যের' প্রতি আমাদের নিজস্ব শঙ্কা থেকে প্রতিমা বিরোধিতা জন্ম নিতে পারে। ঈশ্বরকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক নাস্তিকদের কেউ কেউ নিঃসন্দেহে এক ধরনের চাপের লক্ষণ প্রকাশ করেছে। এভাবে প্রেমপূর্ণ নীতিবোধের পক্ষে কথা বললেও শোপেনহাওর মানুষের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পেরে নিভৃতচারীতে পরিণত হয়েছিলেন যিনি কেবল পোষা কুকুর আত্মানের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছেন। নিৎশে কোমল হৃদয়, নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন, ভঙ্গ স্বাস্থ্য ছিল তাঁর, অতি মানব থেকে একেবারেই ভিন্ন। শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মহানন্দে ঈশ্বরকে ত্যাগ করেননি তিনি, যদিও তাঁর তাঁর পদ্যের পরমানন্দের ভাবে আমাদের সেরকম মনে হতে পারে। অনেক কম্পন, শিহরণ ও আত্ম-নিপীড়নের মরু পেরিয়ে আসা এক কবিতায় তিনি যরোথ্রুস্টকে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানিয়েছেন:

AMARBOI.COM

না! তোমার সকল নিপীড়নসহ
ফিরো এসো!
হায়, ফিরে এসো,
সকল নৈঃসঙ্গের শেষে!
আমার চোখের সব অশ্রু

তোমার জন্যেই বয়ে যায়!
আমার হৃদয়ের শেষ শিখাটি
তোমার জন্যে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে!
হায়, ফিরে এসো
আমার অচেনা ঈশ্বর! আমার বেদনা! আমার অন্তিম-সুখ।[২০]

হেগেলের মতো নিৎশের মতবাদসমূহও পরবর্তী জার্মান প্রজন্ম ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের নীতিমালার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে কাজে লাগিয়েছে, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নাস্তিক্যবাদী আদর্শও ঈশ্বরের ধারণার মতোই নিষ্ঠুর, নির্দয় ক্রুসেডিয় নীতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

পশ্চিমে ঈশ্বর সব সময়ই এক সংগ্রামের নাম ছিলেন। তাঁর প্রয়াণও মানসিক চাপ, নৈঃসঙ্গ ও আতঙ্ক দিয়েই মোকাবিলা করা হয়েছে। এভাবে *ইন মেমোরিয়াম* কবিতায় মহান ভিক্টোরিয়ান সংশয়বাদী কবি আলফ্রেড লর্ড টেনিসন এক উদ্দেশ্যবিহীন, নির্বিকার, তীক্ষ্ণ নখ-দাঁতঅলা প্রকৃতির সম্ভাবনায় আতঙ্কে কুকড়ে গিয়েছেন। *দ্য অরিজিন অভ স্পিসিজ* প্রকাশের নয় বছর আগে ১৮৫০ সালে প্রকাশিত এই কবিতায় দেখা যাচ্ছে, টেনিসন ইতিমধ্যে অনুভব করেছেন তাঁর বিশ্বাস ভেঙে-চুরে যাচ্ছে আর তিনি স্বয়ং পরিণত হয়েছেন:

রাতে ক্রন্দরত শিশুতে;
আলোর জন্যে ক্রন্দরত শিশু
কান্না বাদে আর কোনও ভাষা নেই যার।[২১]

*ডোভার বীচ*-এ ম্যাথু আরনল্ড মানব জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তারে দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া বিশ্বাসের সাগরের অপ্রতিরোধ্য প্রত্যাহারে বিলাপ করেছেন। সন্দেহ আর মহাশঙ্কা অর্থোডক্স বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, যদিও ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান পাশ্চাত্যের সন্দেহের স্পষ্ট চেহারা ধারণ করেনি, বরং আরও বেশি করে চরম অর্থেরই প্রত্যাখ্যান ছিল। ফিয়দর দস্তয়েভস্কি–যার *দ্য ব্রাদার্স কারামাযোভ* (১৮৮০) কে ঈশ্বরের প্রয়াণের বর্ণনা হিসাবে দেখা যেতে পারে–১৮৫৪ সালের মার্চ মাসে এক চিঠিতে বন্ধুর কাছে বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে আপন টানপড়েনের কথা লিখেছেন:

নিজেকে আমি কালের শিশু মনে করি, অবিশ্বাস আর সন্দেহ ভরা শিশু; এমন হতে পারে, উঁহু, আমি নিশ্চিত, মৃত্যুর দিনেও আমি এমনই রয়ে যাব। বিশ্বাস করার আকাঙ্ক্ষায় আমি নির্যাতিত হয়েছি–এমনকি, সত্যি



AMARBOI.COM

বলতে এখনও হচ্ছি; আর বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা যত বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আকাঙ্ক্ষাও ততই প্রবল রূপ নিচ্ছে।[২২]

তাঁর উপন্যাসটিও একইভাবে দোদূল্যমান। ইভান, অন্য চরিত্রগুলো যাকে নাস্তিক হিসাবে বর্ণনা করেছে, (যে বর্তমানে বিখ্যাত: 'ঈশ্বর না থাকলে সব কিছুই বৈধ' প্রবাদটির জনক) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলছে, সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও এই ঈশ্বরকে গ্রহণযোগ্য মানতে পারছে না। কেননা তিনি জীবনের ট্র্যাজিডির পরম অর্থের যোগান দিতে ব্যর্থ। বিবর্তন তত্ত্বে উদ্বিগ্ন নয় ইভান, বরং ইতিহাসে মানুষের দুঃখ কষ্ট ও বেদনাই তাকে বিচলিত করে: সবকিছু ঠিক হয়ে যাবার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে একমাত্র সন্তানের মৃত্যু মূল্য হিসাবে অনেক চড়া। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখব, ইহুদিরাও একই উপসংহারে পৌঁছাবে। অন্যদিকে সাধু-প্রতীম আলিয়োশা স্বীকার করেছে, সে ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়—এই স্বীকারোক্তি যেন অসচেতন অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে, যেন তার মনের গভীর অচেনা প্রদেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। দোদূল্যমানতা ও বিশ্বাস পরিত্যাগের অস্পষ্ট বোধ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে তাড়া করে বেরিয়েছে এর পরিত্যক্ত ভূমির ইমেজারি আর এক গদোর জন্যে মানুষের প্রতীক্ষা নিয়ে, যিনি কখনও আবির্ভূত হন না।

AMARBOI.COM

মুসলিম বিশ্বেও একই রকম অস্থিরতা ও অশান্তি ছিল, যদিও তার উৎস ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইউরোপের *মিশন সিভিলাইজেস* অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩০ সালে ফরাসিরা আলজিয়ার্সে উপনিবেশ স্থাপন করে; ১৮৩৯ সালে ব্রিটিশরা অডেন উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত করে। নিজেদের মধ্যে তিউনিসিয়া (১৮৮১), মিশর (১৮৮২), সুদান (১৮৯৮) এবং লিবিয়া ও মরক্কো (১৯১২) ভাগ করে নিয়েছিল এরা। ১৯২০ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যকে প্রটেক্টরেট ও ম্যান্ডেট হিসাবে ভাগ করে নেয়। এই উপনিবেশবাদী প্রকল্প পাশ্চাত্যকরণের এক নীরব প্রক্রিয়াকে আনুষ্ঠানিক চেহারা দিয়েছিল, কেননা ইউরোপিয়রা আধুনিকতার নামে উনবিংশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছিল। কারিগরি শক্তিতে বলীয়ান ইউরোপ নেতৃত্বের অবস্থানে এসে গোটা বিশ্ব দখল করে নিচ্ছিল। তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যে ট্রেডিং পোস্ট ও কনসুলার মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়; প্রকৃত পাশ্চাত্য শাসন শুরু হওয়ার আগেই এসব সমাজের ঐতিহ্যগত কাঠামোর ক্ষতি সাধন করেছিল তা। এটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের উপনিবেশিকরণ। মুঘলরা ভারত অধিকার করে নেওয়ার পর হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতিতে বহু মুসলিম উপাদান আত্মস্থ করে নিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বদেশী সংস্কৃতির পুনরুত্থান ঘটেনি। নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে শাসনাধীন জাতির জীবনাচারকে চিরদিনের মতো পাল্টে দিয়েছিল।

উপনিবেশের অধীনস্থ এলাকার পক্ষে তাল মিলিয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। প্রাচীন প্রথাসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; মুসলিম সমাজই 'পাশ্চাত্যকৃত' ও 'অন্য' এই দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিমদের কেউ কেউ হিন্দু ও চীনাদের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে তাদের সম্পর্কে পশ্চিমাদের মূল্যায়ন 'প্রাচ্যবাসী' তকমা মেনে নিয়েছিল নির্বিচারে। কেউ কেউ প্রথাবদ্ধ আপন জাতভাইদের ছোট করে দেখেছে। ইরানে শহ্‌ নাসিরুদ্দিন (১৮৪৮-৯৬) জোরের সঙ্গে প্রজাদের ঘৃণা করার কথা বলেছেন। একসময় নিজস্ব পরিচয় ও ঐক্য নিয়ে জীবন্ত সভ্যতা ক্রমেই অচেনা এক জগতের অসম্পূর্ণ অনুকরণের ছোট ছোট পরাধীন খণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হয়। উদ্ভাবন ছিল ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার মূল সুর: অনুকরণ দিয়ে এটা অর্জন করা যায় না। আজকের দিনে যেসব নৃতাত্ত্বিক আরব বিশ্বের আধুনিকায়িত দেশ বা নগরী যেমন, কায়রো, নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা বলেন, নগরীর স্থাপত্য কলা ও পরিকল্পনা প্রগতির চেয়ে প্রভুত্বকেই বেশি করে প্রকাশ করে।[২৩]

অন্যদিকে ইউরোপিয়দের ভেতর কেবল আজকের দিনেই উন্নত নয়, বরং আগাগোড়াই তাদের সংস্কৃতি প্রগতির বাহন থাকার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। প্রায়শঃই ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায় তারা। নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই ভারতীয়, মিশরিয় ও সিরিয়দের পশ্চিমাকরণের প্রয়োজন হয়েছিল। এই ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত মিশরে নিয়োজিত কনসাল জেনারেল এভলিন ব্যারিং, লর্ড ক্রোমারের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে:

> স্যার আলফ্রেড লায়াল আমাকে একবার বলেছিলেন: 'প্রাচ্য মননে সঠিকতা খাপ খায় না। প্রতিটি অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ানের সব সময় একথা মনে রাখা উচিত': সঠিকতার ঘাটতি, যা সহজেই অবিশ্বাস্যতায় পরিণত হয়, আসলে প্রাচ্য মননের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
>
> ইউরোপিয় কঠোর যুক্তিবাদী: কোনও কিছু সম্পর্কে তার বক্তব্যে কোনওরকম দ্ব্যর্থবোধকতা থাকে না; সে স্বভাব যুক্তিবাদী, যুক্তি বিজ্ঞান পড়াশোনা নাও করে থাকে, জন্মগতভাবেই সে সংশয়বাদী, যে কোনও প্রস্তাবনা সত্য হিসাবে মেনে নেওয়ার আগে প্রমাণ খোঁজে। তাঁর প্রশিক্ষিত বুদ্ধিমত্তা যন্ত্রের মতো কাজ করে। অন্যদিকে প্রাচ্যবাসীর মন তার চিত্রবৎ রাস্তার মতোই সর্বক্ষণ সামঞ্জস্যতার অভাবে ভুগছে। তাঁর যুক্তি প্রয়োগ অগোছালো। যদিও প্রাচীন আরবরা দ্বান্দ্বিকতার জ্ঞানে কিছুটা উচ্চ যোগ্যতা অর্জন করেছিল, কিন্তু তাদের উত্তরসুরিদের ভেতর যৌক্তিক

AMARBOI.COM

জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। প্রায়শঃই তারা কোনও সহজ প্রস্তাবনার ক্ষেত্রেও সবচেয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারে না যা থেকে তারা সত্য স্বীকার করতে পারে।[২৪]

যেসব 'সমস্যা' কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে ইসলাম। ক্রুসেডের সময় খৃস্ট জগতে পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে এক নেতিবাচক ইমেজ গড়ে উঠেছিল যা ইউরোপের অ্যান্টি-সেমিটিজমের সঙ্গে অব্যাহত রয়ে গিয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে ইসলামকে প্রগতির প্রত্যক্ষ অন্তরায় অদৃষ্টবাসী ধর্ম হিসাবে দেখা হয়েছে। যেমন, লর্ড ক্রোমার মিশরিয় সংস্কারক মুহাম্মদ আবদুহর সংস্কার প্রয়াসকে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, 'ইসলাম' নিজেকে সংস্কারের অযোগ্য।

প্রচলিত উপায়ে ঈশ্বরের উপলব্ধির বিকাশ ঘটানোর সময় বা শক্তি কোনওটাই মুসলিমদের ছিল না। পশ্চিমের সঙ্গে তাল মেলানোর সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল তারা। কেউ কেউ পশ্চিমের সেক্যুলারিজমকে সমাধান হিসাবে দেখেছে, কিন্তু ইউরোপে যা ইতিবাচক ও উদ্দীপক হিসাবে কাজ করেছে ইসলামি বিশ্বের কাছে স্রেফ অচেনা ও বিদেশী ঠেকেছে, কেননা এর উৎপত্তি তাদের নিজস্ব ট্র্যাডিশন ও কালে ঘটেনি। পশ্চিমে 'ঈশ্বর'কে দূরত্ব সৃষ্টিকারী স্বর হিসাবে দেখা হয়েছিল; মুসলিম বিশ্বের পক্ষে এটা ছিল ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া। সংস্কৃতির শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিশাহারা ও নিখোঁজ বোধ করেছে। কোনও কোনও মুসলিম সংস্কারক ইসলামের ভূমিকাকে জোরপূর্বক খাটো করে প্রগতির গতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এর ফল মোটেই তাঁদের আশানুরূপ হয়নি। নতুন জাতি-রাষ্ট্র তুরস্কে ১৯১৭ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর পর পরবর্তীকালে কামাল আতাতুর্ক নামে পরিচিত হয়ে ওঠা মুস্তাফা কামাল (১৮৮১-১৯৩৮) নিজ দেশকে পশ্চিমা জাতিতে পরিবর্তিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন; ধর্মকে তিনি নেহাতই ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত করে ইসলামকে হটিয়ে দেন। সুফী বৃত্তি ধ্বংস করা হয়, আত্মগোপনে চলে যায় তা: মাদ্রাসাগুলো বন্ধ ঘোষিত হয়; রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে *উলেমাদের* প্রশিক্ষণের অবসান ঘটে। সেক্যুলারকরণের এই প্রক্রিয়া ধর্মীয় শ্রেণীগুলোর দর্শনযোগ্যতা কমিয়ে দেওয়া ফেয নিষিদ্ধ করার মাঝে প্রতীকায়িত হয়েছে, মানুষকে পাশ্চাত্যের অনুরূপ পোশাক পরতে বাধ্য করার একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রয়াসও ছিল এটা: ফেযের বদলে 'মাথায় হ্যাট চাপানো'র মানে ছিল 'ইউরোপায়িত' হওয়া। ১৯২৫-১৯৪১ মেয়াদে ইরানের শাহ্ রেযা খান আতাতুর্ককে সম্মান করতেন; তিনিও একইরকম নীতি গ্রহণ করার চেষ্টার চালান; বোরখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, মোল্লাদের দাড়ি কামাতে বাধ্য করে ঐতিহ্যবাহী পাগড়ীর বদলে কেপি পরতে

AMARBOI.COM

বাধ্য করা হয়; শিয়াহ্ ইমাম ও শহীদ হুসেইনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রচলিত অনুষ্ঠানও বাতিল করে দেওয়া হয়।

ফ্রয়েড প্রাজ্ঞভাবেই অনুভব করেছিলেন, ধর্মের যে কোনও জবরদস্তিমূলক অবদমন ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। যৌনতার মতো ধর্মও জীবনকে সর্বস্তরে প্রভাবিতকারী একটি মানবিক চাহিদা। অবদমান করা হলে যে কোনও মারাত্মক যৌন অবদমনের মতো বিস্ফোরক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। মুসলিমরা নব্য তুরস্ক ও ইরানকে সন্দেহ ও বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছে। ইরানে আগে থেকেই মোল্লাহদের জনগণের নামে শাহ্দের বিরোধিতা করার একটা ঐতিহ্য ছিল। অনেক সময় অসাধারণ সাফল্যও অর্জন করেছেন তাঁরা। ১৮৭২ সালে শাহ্ তামাকের উৎপাদন, বিক্রি ও রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার ব্রিটিশদের কাছে বিক্রি করে ইরানি উৎপাদক প্রতিষ্ঠাগুলোকে ব্যবসাচ্যুত করলে মোল্লাহরা ইরানি জনগণের জন্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে ফতোয়া জারি করেছিলেন। প্রদত্ত সুবিধা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন শাহ। পবিত্র নগরী কুম তেহরানের স্বৈরাচারী ও ক্রমশঃ নির্মম হয়ে ওঠা শাসকের বিরুদ্ধে এক বিকল্প হয়ে ওঠে। ধর্মের অবদমন মৌলবাদের জন্ম দিতে পারে, যেমন ঈশ্বর বিশ্বাসের অপূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারে ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যানের রূপ। তুরস্কে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়ায় অনিবার্যভাবে *উলেমাদের* কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে পড়েছিল। এর মানে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধিকতর শিক্ষিত, পরিমার্জিত ও দায়িত্বশীল উপাদান কমে গিয়েছে, অন্যদিকে আন্ডাগ্রাউন্ডের সুফীবাদের অধিকতর জাঁকাল রূপ ধর্মের একমাত্র ধরণ রয়ে গিয়েছিল।

অন্য সংস্কারগণও বুঝতে পেরেছিলেন যে, জবরদস্তিমূল অবদমন সমাধান নয়। অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগে ইসলাম সবসময়ই উদ্দীপ্ত হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, সমাজের ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের জন্যে ধর্মের আবশ্যকতা রয়েছে। অনেক কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন ছিল; অনেক কিছুই পশ্চাদপদ চেহারা ধারণ করেছিল; কুসংস্কার ও অজ্ঞতার প্রকোপ ছিল। কিন্তু ইসলাম মানুষের মনে গভীর উপলব্ধি গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছিল: একে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে দেওয়া হলে সারা পৃথিবীর মুসলিমদের আধ্যাত্মিক সুস্থতা ভোগান্তির মুখে পড়বে। মুসলিম সংস্কারকরা পশ্চিমের প্রতি বৈরী ছিলেন না। অনেকেই পাশ্চাত্যের সাম্যতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শকে উপযোগী হিসাবে দেখেছেন, যেহেতু ইসলাম জুদো-ক্রিশ্চানিটির মুল্যবোধের অংশীদার, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যার প্রবল প্রভাব ছিল। পাশ্চাত্য সমাজের আধুনিকায়ন কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের সাম্যের জন্ম দিয়েছিল; সংস্কারকগণ তাঁদের জনগণকে বলেছেন, এই ক্রিশ্চান যেন তাদের চেয়ে ভালোভাবে ইসলামি জীবনযাপন

AMARBOI.COM

করছে বলে মনে হয়। ইউরোপের সঙ্গে এই নতুন যোগাযোগে ব্যাপক উৎসাহ আর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। বিত্তশালী মুসলিমরা ইউরোপে শিক্ষা নিয়ে এখানাকার দর্শন, সাহিত্য ও আদর্শ আত্মস্থ করে নিজেদের শিক্ষা ভাগ করে নেওয়ার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে যার যার দেশে ফিরে গিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু দিকে বলতে গেলে প্রায় সব মুসলিম বুদ্ধিজীবীই পশ্চিমের গভীর ভক্তও হয়ে উঠেছিলেন।

সংস্কারকদের সবারই বুদ্ধিবৃত্তিক পক্ষপাত ছিল, আবার তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামি অতিন্দ্রীয়বাদের কোনও না কোনও ধরনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। সুফীবাদ ও ইশরাকি অতিন্দ্রীয়বাদের অধিকতর কল্পনা-নির্ভর ও বুদ্ধিদীপ্ত রূপ মুসলিমদের অতীত সঙ্কট মোকাবিলায় সাহায্য করেছিল। তাঁরা আবার এগুলোর শরণাপন্ন হয়েছেন। ঈশ্বরের অনুভূতিকে প্রতিবন্ধক মনে করা হয়নি, বরং আধুনিকতায় পদার্পণকে তরান্বিতকারী গভীর স্তরে পরিবর্তনের শক্তি হিসাবে দেখা হয়েছে একে। এভাবেই ইরানি সংস্কারক জামাল আদ-দিন আল-আফগানি (১৮৩৮-৮৭) সুহরাওয়ার্দির ইশরাকি অতিন্দ্রীয়বাদের ব্রতী হয়েও একই সঙ্গে আধুনিকীকরণেরও প্রবল সমর্থক ছিলেন। ইরান, আফগানিস্তান, মিশর ও ভারত ভ্রমণ করার সময় আল-আফগানি সবার কাছে নিজেকে সবকিছু হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন। নিজেকে সুন্নীর কাছে সুন্নী, শিয়াহ্‌র কাছে শিয়াহ্, শহীদ, বিপ্লবী, ধার্মিক, দার্শনিক ও একজন সাংসদ হিসাবে তুলে ধরার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। ইশরাকি অতিন্দ্রীয়বাদের অনুশীলন মুসলিমদের চারপাশের জগতের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে ও সত্তায় বাধা হয়ে থাকা সীমা রেখা অদৃশ্য হওয়ার এবং মুক্তির অনুভূতির স্বাদ পেতে সাহায্য করে। মনে করা হয় যে, আল-আফগানির বেপরোয়া ভাব ও বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ সত্তা সম্পর্কে এর বর্ধিত ধারণাসহ অতিন্দ্রীয়বাদী অনুশীলন প্রভাবিত হয়েছিল।[২৫] ধর্ম আবশ্যক ছিল, যদিও সংস্কার প্রয়োজন ছিল। আল-দ্বারা আফগানি বিশ্বাসী, এমনকি প্রবলভাবে আস্তিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর একমাত্র গ্রন্থ *দ্য রিফিউটেশন অভ দ্য মেটেরিয়ালিস্টস*-এ ঈশ্বর সম্পর্কে তেমন আলোচনা স্থান পায়নি। পশ্চিম যুক্তিকে মূল্য দেয় এবং ইসলাম ও প্রাচ্যবাসীদের অযৌক্তিক হিসাবে দেখে জানতেন বলে আল-আফগানি ইসলামকে এর যুক্তির নির্দয় কাল্ট দিয়ে আলাদা ধর্ম বিশ্বাস হিসাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। আসলে মুতাযিলিদের মতো যুক্তিবাদীরাও তাদের ধর্মেরই এই ব্যাখ্যাকে অদ্ভুত বলে আবিষ্কার করত। আল-আফগানি যত না দার্শনিক তার চেয়ে বেশি ছিলেন কর্মী। সুতরাং, মাত্র একটি সাহিত্য প্রয়াস দিয়ে তাঁর জীবন ও বিশ্বাসকে বিচার না করাটা গুরুত্বপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, পাশ্চাত্য আদর্শ হিসাবে পরিগণিত ব্যবস্থায় মানানসই করার উদ্দেশ্যে



AMARBOI.COM

ইসলামের এ রকম বর্ণনা মুসলিম বিশ্বের এক নতুন আস্থাহীনতা তুলে ধরেছে অচিরেই যা চরম ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠবে।

আল-আফগানির মিশরিয় অনুসারী মুহাম্মদ আবদুহর (১৮৪৯-১৯০৫) ভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কেবল মিশরে কার্যক্রম সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানকার মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেন তিনি। ঐতিহ্যবাহী ইসলামি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি, যা তাঁকে সুফী শেখ দারবীশ এর প্রভাবে নিয়ে আসে, যিনি তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিজ্ঞান ও দর্শন ঈশ্বরের জ্ঞান লাভের সবচেয়ে নিশ্চিত দুটি পথ। পরিণামে আবদুহ্ কায়রোর মর্যাদাপূর্ণ আল-আযহার মসজিদে পড়াশোনা শুরু করার সময় এখানকার প্রাচীন পাঠক্রম দেখে মোহমুক্ত হয়ে পড়েন। এর বদলে তিনি আল-আফগানির প্রতি আকৃষ্ট হন, যিনি তাঁকে যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান ও অতিন্দ্রীয়বাদের শিক্ষা দেন। পশ্চিমের কোনও কোনও ক্রিশ্চান মনে করত বিজ্ঞান ধর্ম বিশ্বাসের শত্রু, কিন্তু মুসলিম অতিন্দ্রীয়বাদীরা প্রায়শঃই ধ্যানের সহায়ক হিসাবে গণিত ও বিজ্ঞান ব্যবহার করেছে। বর্তমানকালে শিয়াহ্দের কিছু চরমপন্থী অতিন্দ্রীয়বাদী গোষ্ঠী—যেমন দ্রুজ বা আলা—বিশেষভাবে আধুনিক বিজ্ঞানে আগ্রহী। ইসলামি বিশ্বে পশ্চিমা রাজনীতির ব্যাপারে অনেক সঙ্কোচ রয়েছে। কিন্তু একে পশ্চিমা বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাসের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে খুব নগণ্য সংখ্যকই সমস্যা হিসাবে আবিষ্কার করেছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উত্তেজনা বোধ করেছেন আবদুহ; বিশেষভাবে কোতে, তলস্তয় ও ব্যক্তিগত বন্ধু হার্বার্ট স্পেন্সার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। পুরোপুরি পশ্চিমি জীবনধারা গ্রহণ করলেও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে নিজেকে সজীব রাখতে নিয়মিত ইউরোপ সফর করতেন আবদুহ্। এর মানে এই নয় যে, তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেছেন বরং বিপরীতে যেকোনও সংস্কারকের মতো আবদুহ্ ধর্মবিশ্বাসের মূলে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। সুতরাং, তিনি পয়গম্বর ও সঠিক পথে পরিচালিত চার খলিফার (*রাশিদুন*) চেতনায় ফিরে যাবার তাগিদ দিয়েছেন। এতে অবশ্য আধুনিকতা ত্যাগ করার মৌলবাদী প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন হয়নি। আবদুহ্ জোর দিয়ে বলেছেন, আধুনিক বিশ্বে স্থান করে নেওয়ার জন্যে মুসলিমদের অবশ্যই বিজ্ঞান, কারিগরি জ্ঞান ও সেক্যুলার দর্শন পাঠ করতে হবে। মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তি অর্জনে সক্ষম করে তোলার জন্যে শরীয়াহ আইনকে অবশ্যই সংস্কার করতে হবে। আল-আফগানির মতো তিনিও ইসলামকে যুক্তিভিত্তিক ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোরানে যুক্তি ও ধর্ম হাতে হাত রেখে অগ্রসর হয়েছে।

AMARBOI.COM

পয়গম্বরের আগে প্রত্যাদেশের সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা, কিংবদন্তী ও অযৌক্তিক বাগাড়ম্বড়তা যুক্ত ছিল, কিন্তু কোরান এইসব সুপ্রাচীন পদ্ধতির আশ্রয় নেয়নি। এটা তুলে ধরেছে প্রমাণ ও প্রকাশ, অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে এবং যুক্তির আলোকে সেগুলোকে আক্রমণ করেছে।'[২৬] ফায়লাসুফদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আল-গাযযালির আক্রমণ শোভন ছিল না। এর ফলে ধর্মপরায়ণতা ও যুক্তিবাদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে, যা *উলেমাদের* বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানকে ক্ষুণ্ন করেছে। আল-আযহারের পুরোনো পাঠ্যক্রমে এটা স্পষ্ট ছিল। সুতরাং, মুসলিমদের কোরানের অধিকতর গ্রাহী ও যৌক্তিক চেতনায় ফিরে যাওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও আবদুহ্ পুরোপুরি বিড়াকশনিস্ট যুক্তিবাদ হতে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। তিনি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন: রহস্যে ঢাকা ঈশ্বরের অত্যাবশ্যকীয় সত্তা যুক্তির নাগালের বাইরে। আমরা কেবল এটাই প্রতিষ্ঠা করতে পারি যে, ঈশ্বর আর কোনও বস্তুর মতো নন। ধর্মতাত্ত্বিকরা অন্য যেসব প্রশ্ন নিয়ে কাজ করেন সেগুলো একেবারে তুচ্ছ; কোরান এগুলোকে *যান্না* বলে নাকচ করে দিয়েছে।

ভারতে স্যার মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) নেতৃস্থানীয় সংস্কারক ছিলেন; ভারতীয় হিন্দুদের গান্ধীর মতো মুসলিমদের নেতায় পরিণত হয়েছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরিটও ছিল তাঁর। বার্গসন, নিৎশে এবং এ. এন. হোয়াইটহেডদের প্রতি প্রবলভাবে আগ্রহী ছিলেন তিনি; নিজেকে প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সেতুবন্ধ কল্পনা করে তাঁদের দর্শনের আলোকে ফালসাফাহকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর চোখে ভারতে ইসলামের অবনতি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ভারতের মুসলিমদের মাঝে এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি কাজ করে আসছিল। ইসলামের উৎসভূমি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ভাইদের মতো আস্থার অভাব ছিল তাদের, এরই পরিণামে ব্রিটিশদের কাছে আরও বেশি হারে আত্মরক্ষামূলক ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল তারা। কবিতা ও দর্শনের মাধ্যমে ইসলামি নীতিমালার সৃজনশীল পুনর্নির্মাণের ভেতর দিয়ে ইকবাল তাঁর জাতির বিব্রতকর অবস্থা দূর করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

নিৎশের মতো পশ্চিমা দার্শনিকদের কাছ থেকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের গুরুত্ব আত্মস্থ করেন ইকবাল। গোটা বিশ্বজগৎ এক পরম সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সর্বোচ্চ রূপ, মানুষ যাকে 'ঈশ্বর' আখ্যায়িত করেছে। নিজস্ব অনন্য স্বভাব অর্জন করার লক্ষ্যে সকল মানুষকে আরও বেশি করে ঈশ্বরের অনুরূপ হয়ে উঠতে হবে। তার মানে প্রত্যেককে অবশ্যই আরও স্বতন্ত্র, আরও সৃজনশীল হয়ে উঠতে হবে; আবার এই সৃজনশীলতার বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে হবে। ভারতীয় মুসলিমদের নিষ্ক্রিয়তা ও কাপুরুষোচিত আত্ম-বিলীনতা

AMARBOI.COM

(ইকবাল যাকে পারস্যের প্রভাব হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন) ত্যাগ করতেই হবে। মুসলিমদের *ইজতিহাদ* (স্বাধীন বিবেচনা) তাদের নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণে উপযোগী করে তোলার কথা: খোদ কোরানে অব্যাহত পরিমার্জনা ও আত্মনীরিক্ষার দাবি জানিয়েছে। আল-আফগানি ও আবদুহ্র মতো ইকবাল দেখতে চেয়েছিলেন যে প্রগতির চাবিকাঠি গবেষণামূলক মনোভাব ইসলামেই জন্ম নিয়েছিল এবং মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞান গণিতের মাধ্যমে পশ্চিমে গেছে। অ্যাক্সিয়াল যুগের মহান স্বীকারোক্তিমূলক ধর্মগুলোর আবির্ভাবের আগে মানবজাতির উন্নতি ছিল অগোছাল, সামঞ্জস্যহীন, বিশেষভাবে মেধাবী ও অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল। মুহাম্মদের (স) পয়গম্বরত্ব ছিল যা পরবর্তী প্রত্যাদেশ অপ্রয়োজনীয় করে দেওয়া এইসব স্বজ্ঞাজাত প্রয়াসাদির সম্মিলন। এরপর থেকে মানুষ বিজ্ঞান ও যুক্তির ওপর নির্ভর করতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ নিজেই লক্ষ্যে পরিণত হওয়ায় পশ্চিমে তা বহুঈশ্বরবাদীতার এক নতুন ধরনের রূপ নিয়েছিল। মানুষ ভুলে গিয়েছিল যে, সব রকম স্বাতন্ত্র্য এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। লাগামহীনভাবে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেলে ব্যক্তির মেধা বিপজ্জনক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। নিজেদের ঈশ্বর বিবেচনাকারী নিৎশের কল্পিত অতিমানবের প্রজন্ম এক ভীতিকর সম্ভাবনা: মানুষের মুহূর্ত বিশেষের খেয়াল ও মর্জির অতীত এক রীতি যে নিয়মের চ্যালেঞ্জ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। পশ্চিমের দূষণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রকৃত রূপকে রক্ষা করা ইসলামের দায়িত্ব। তাদের সম্পূর্ণ মানুষ সম্পর্কিত সুফী আদর্শ, সৃষ্টির পরিণতি ও এর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ছিল। নিজেকে পরম বিবেচনাকারী অতিমানব সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করে; তার বিপরীতে পূর্ণাঙ্গ মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি পরম সত্তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকবেন এবং সাধারণ মানুষকে চালিত করবেন। বিশ্বের বর্তমান অবস্থা বোঝায় যে প্রগতি বা উন্নতি এক অভিজাত গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল, যারা বর্তমান ছাড়িয়ে দেখতে পান ও মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন। শেষ পর্যন্ত সবাই ঈশ্বরের মাঝে প্রকৃত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে অর্জন করতে পারবে। ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের ভূমিকা আংশিক ছিল, কিন্তু খৃস্টধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ইসলামকে অসম্মানকে করার চলমান পশ্চাত্য প্রয়াসের চেয়ে ঢের বেশি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল এটা। অতিমানবের আদর্শের ব্যাপারে তাঁর আশঙ্কা বা সংশয় জীবনের শেষ বছরগুলোয় জার্মানির ঘটনা প্রবাহে চমৎকারভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এ সময় মধ্যপ্রাচ্যের আরব মুসলিমরা পাশ্চাত্যের হুমকি মোকাবিলার ব্যাপারে আর আগের মতো আস্থাশীল ছিল না। ১৯২০ সাল, যে বছর ব্রিটেন ও ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্য অধিকার করে নেয়, *আম-আল-নাখবাহ* বা বিপর্যয়ের বছর

AMARBOI.COM

হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে: শব্দটি মহাজাগতিক বিপর্যয়ের সমার্থক। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর আরবরা স্বাধীনতার আশা করেছিল, কিন্তু এই নতুন দখলদারির ফলে মনে হয়েছে, তারা বুঝি আর কখনওই আপন নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না; এমনকি এমন গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ব্রিটিশরা যায়নিস্টদেও হাতে প্যালেস্তাইনকে তুলে দিতে যাচ্ছে: যেন এর আরব অধিবাসীদের অস্তিত্বই নেই। লজ্জা আর অপমানের অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠেছিল। কানাডিয় পণ্ডিত উইলফ্রেড ক্যান্টয়েল স্মিথ বলেছেন, অতীতের স্বর্ণালি সাফল্যের স্মৃতি তাদের এই বোধ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল; [আধুনিক আরব] এবং, ধরা যাক, আধুনিক আমেরিকানের পার্থক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় যা অতীতের সাফল্যের স্মৃতিবাহী এক সমাজের সঙ্গে বর্তমান সাফল্যের অনুভূতির গভীর পার্থক্য। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। খৃস্টধর্ম প্রধানত দুঃখকষ্ট ও বৈরিতার ধর্ম এবং অন্তত পশ্চিমে, তর্কসাপেক্ষে দুর্যোগকালেই সর্বাধিক সত্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে: ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের ইমেজের সঙ্গে জাগতিক সাফল্য বা মহিমাকে মেলানো সহজ হয়। কিন্তু ইসলাম এক সাফল্যের ধর্ম। কোরান শিক্ষা দিয়েছে, যে সমাজ ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী (ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে, সামঞ্জস্য বিধানে, সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণ করে) পরিচালিত সেটি ব্যর্থ হতে পারে না। মুসলিম ইতিহাস যেন এরই সত্যতা নিশ্চিত করে। ক্রাইস্টের বিপরীতে মুহাম্মদ (স) আপাত ব্যর্থ ছিলেন না বরং বিস্ময়করভাবে সফল। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম সাম্রাজ্যের অবিশ্বাস্য অগ্রযাত্রায় তাঁর সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরের মুসলিম বিশ্বাস প্রমাণিত বলে মনে হয়েছে। ইতিহাসের পরিমণ্ডলে নিজের ওয়াদা রক্ষা করে আল্লাহ চূড়ান্তভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছেন। মুসলিমদের সাফল্য অব্যাহত ছিল। এমনকি মঙ্গোল আগ্রাসনের মতো বিপর্যয়ও কাটিয়ে ওঠা গেছে। শত শত বছরের পরিক্রমায় *উম্মাহ* প্রায় পবিত্র গুরুত্ব অর্জন করেছিল এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি তুলে ধরেছে। কিন্তু এখন মুসলিম ইতিহাসে কি যেন ভয়ানক ওলটপালট হয়ে গেছে আর তা অনিবার্যভাবে ঈশ্বরের ধারণাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এখন থেকে বহু মুসলিম ইসলামি ইতিহাসকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনার ও জগতে কোরানের দর্শনকে কার্যকর করে তোলার দিকে মন দেবে।

ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে পয়গম্বর এবং তাঁর ধর্মের প্রতি পশ্চিমা অসন্তোষ কতটা গভীর  প্রকাশ পেলে লজ্জার অনুভূতি আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। মুসলিম পণ্ডিতগণ ক্রমবর্ধমান হারে অ্যাপোলোজিটিক্স বা অতীতের বিজয় গাথার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিলেন। এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি। ঈশ্বর আর মধ্যমঞ্চে ছিলেন না। মিশরিয় পত্রিকা আল-আযহার-এ

AMARBOI.COM

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সংখ্যার নিবিড় নিরীক্ষায় এই প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন ক্যান্টওয়েল স্মিথ। এই সময়কালে পত্রিকার দুজন সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এটা পরিচালিত হয় সর্বান্ত করণে ট্রাডিশনিস্ট আল-খিজর হুসেইন এর হাতে, ধর্মকে তিনি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সত্তা নয় বরং ধারণা হিসাবে দেখেছেন। ইসলাম ছিল এক নির্দেশনা, ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের আহ্বান; সম্পূর্ণ অর্জিত বাস্তবতা নয়। মানবীয় জীবনে স্বর্গীয় আদর্শের বাস্তবায়ন সবসময়ই কঠিন, এমনকি অসম্ভবও–হুসেইন তাই উন্মাহর অতীত বা বর্তমান ব্যর্থতায় হতাশ ছিলেন না। তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণের সমালোচনা করেছেন, তাঁর কার্যকালে সাময়িকীটি সবগুলোর সংখ্যা 'করতে হবে' ও 'করা উচিত' শব্দে আকীর্ণ ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করতে আগ্রহী হলেও বিশ্বাস করতে পারছে না, এমন একজন ব্যক্তির সমস্যা কল্পনা করতে পারেননি হুসেইন: আল্লাহর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পুরোনো এক সংখ্যায় ইউসুফ আল-দিনি রচিত প্রবন্ধে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিসমূহের রূপরেখা বর্ণিত হয়েছিল। স্মিথ উল্লেখ করেছেন, লেখার ধরণ আবশ্যিকভাবে ভক্তিমূলক এবং এখনও প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমার স্রষ্টার, উচ্ছল প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে যা স্বর্গীয় সত্তার প্রকাশ করে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে আল-দিনির কোনও সন্দেহ ছিল না। তাঁর প্রবন্ধ যতটা না ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ তার চেয়ে বেশি ধ্যান। একথা তার জানা ছিল না যে, পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা বহু আগেই এই 'প্রমাণ' উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই মনোভাব ছিল পুরোনো। সাময়িকীটির প্রচার সংখ্যায় ধস নেমেছিল।

AMARBOI.COM

১৯৩৩ সালে ফরিদ ওয়াজদি দায়িত্ব নেওয়ার পর পর পাঠকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ওয়াজদির প্রাথমিক বিবেচনা ছিল পাঠকদের আশ্বস্ত করা যে, ইসলাম 'ঠিক আছে।' হুসেইনের একথা মনে আসার কথা নয় যে ঈশ্বরের মনের দুর্জ্ঞেয় ধারণা ইসলামের সময়ে সময়ে সাহায্যের হাত প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু ওয়াজদি ইসলামকে হুমকির সম্মুখীন একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখেছেন। প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে যাচাই, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করা। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ যেমন উল্লেখ করেছেন, এক গভীর ধর্মহীনতা ওয়াজদির রচনাবলীকে ঘিরে রেখেছে। পূর্বসুরিদের মতো তিনিও অব্যাহতভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন শত শত বছর আগের ইসলামের আবিষ্কারসমূহই এখন পশ্চিম আবার শিক্ষা দিচ্ছে; কিন্তু তাদের মতো খুব কমই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এনেছেন তিনি। 'ইসলামে'র মানবিক দিকটাই ছিল তাঁর মনোযোগের প্রধান বিষয়; এই পার্থিব মূল্যবোধ এক অর্থে দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে প্রতিস্থাপিত করেছিল। স্মিথ উপসংহার টানছেন:

> ইসলামে-বিশেষ করে ঐতিহাসিক ইসলামে-বিশ্বাসী কেউ প্রকৃত মুসলিম নন; বরং যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ও পয়গম্বরের মাধ্যমে তাঁর প্রত্যাদেশের প্রতি যিনি অঙ্গীকারবদ্ধ তিনিই মুসলিম। শেষোক্তটি আছে এবং যথার্থভাবে শ্রদ্ধা পাচ্ছে, কিন্তু অঙ্গীকার অদৃশ্য হয়েছে। এই পৃষ্ঠাগুলোয় ঈশ্বর লক্ষণীয়ভাবে কদাচিৎ আবির্ভূত হয়েছেন।[২৮]

বরং তার জায়গায় অস্থিতিশীলতা ও আত্ম-মর্যাদাবোধের অভাব রয়েছে: পশ্চিমের মতামত বড় বেশি গুরুত্বহ হয়ে উঠেছে। হুসেইনের মতো ব্যক্তিরা ধর্ম ও ঈশ্বরের কেন্দ্রীকতা উপলব্ধি করলেও আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। আধুনিকতার সংস্পর্শে আসা মানুষ ঈশ্বর বোধ হারিয়ে ফেলেছিল। এই অস্থিতিশীলতা থেকেই জন্ম নেবে আধুনিক মৌলবাদের বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা আবার ঈশ্বর হতে পিছু হটা।

ইউরোপের ইহুদিরাও তাদের ধর্ম বিশ্বাসের বৈরী সমালোচনায় ক্ষতিগস্ত হয়েছিল। জার্মানিতে ইহুদি দার্শনিকগণ তাঁদের ভাষায় 'ইহুদিবাদের বিজ্ঞান' আবিষ্কার করেছিলেন, যেখানে দাসত্বমূলক দূরত্ব সৃষ্টিকারী বিশ্বাস নয় প্রমাণ করার জন্যে হেগেলিয় পরিভাষায় ইহুদিদের ইতিহাস পুনঃলিখিত হয়েছিল। ইসরায়েলের ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যার এই প্রয়াসের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন সলোমন ফর্মস্তেচার (১৮০৮-৮৯)। *দ্য রিলিজিয়ন অভ দ্য স্পিরিট* (১৮৪১)-এ ঈশ্বরকে তিনি সকল বস্তুতে বিরাজমান বিশ্বাত্মা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই আত্মা পৃথিবীর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না, যেমন হেগেল যুক্তি দেখিয়েছেন। ফর্মস্তেচার জোর দিয়ে বলেছেন, এটা যুক্তির নাগালের বাইরে অবস্থান করে। ঈশ্বরের সত্তা ও তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রাচীন পার্থক্যে ফিরে গেছেন তিনি। হেগেল সেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক ভাষা ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন, ফর্মস্তেচার সেখানে যুক্তি দিয়েছেন যে, প্রতীকীবাদ ঈশ্বর আলোচনার যথার্থ বাহন, কেননা তিনি দার্শনিক ধ্যান ধারণার নাগালের বাইরে অবস্থান করেন। এসব সত্ত্বেও ইহুদিবাদই প্রথম ধর্ম যা ঈশ্বরের এক অগ্রসর ধারণায় পৌঁছেছিল এবং অচিরেই গোটা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে একটি প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্ম কেমন হতে পারে।

আদিম পৌত্তলিক ধর্ম ঈশ্বরকে প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত করেছিল, যুক্তি দেখিয়েছেন ফর্মস্তেচার। এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা রহিত কালটি মানব জাতির শিশুকাল তুলে ধরে। মানব জাতি আরও উচুঁ মাত্রায় আত্ম সচেতন হয়ে উঠলে তারা ঈশ্বরের আরও মার্জিত ধারণার দিকে অগ্রসর হতে তৈরি হয়। তারা উপলব্ধি করতে শুরু করে যে 'ঈশ্বর' বা 'আত্মা' প্রকৃতিতে মিশে নেই, বরং এর ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। এই নতুন ধারণা অর্জন করার পয়গম্বরগণ এক

AMARBOI.COM

নীতি ধর্ম প্রচার করেছেন। প্রথম দিকে তাঁরা বিশ্বাস করেছেন যে প্রত্যাদেশসমূহ দেহাতীত কোনও শক্তি থেকে আসছে, কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁরা বুঝতে পারেন, কোনও বহিস্থঃ ঈশ্বরের ওপর পুরোপুরি তাঁরা নির্ভরশীল নন, বরং তাঁদের নিজস্ব আত্মায় পরিপূর্ণ স্বভাবে অনুপ্রাণিত। ইহুদিরাই সবার আগে ঈশ্বরের এই নৈতিক ধারণা অর্জনা করতে পেরেছিল। দীর্ঘ নির্বাসন ও মন্দির ধ্বংস বাহ্যিক বিষয়াদি ও কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীলতা হতে তাদের মুক্ত করেছিল। ফলে এক উন্নতর ধর্মীয় সচেতনতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল তারা যা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হবার সুযোগ করে দিয়েছে। হেগেল এবং কান্ট যেমন যুক্তি দেখিয়েছেন, তারা মধ্যস্থতাকারী পুরোহিতের উপর নির্ভরশীল বা কোন বিদেশী আইনের ভয়ে ভীতও ছিল না। তার বদলে মন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে শিখেছে। খৃস্টধর্ম ও ইসলাম অনুকরণের প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু তেমন সফল হয়নি। যেমন, খৃস্টধর্মের ঈশ্বর বর্ণনায় বহু পৌত্তলিক উপাদান রয়ে গিয়েছিল। ইহুদিরা যেহেতু শৃঙ্খল মুক্ত হয়েছে, অচিরেই তারা সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে; উন্নতির এই চূড়ান্ত পর্বের জন্যে তৈরি হতে তাদের অতীত ইতিহাসের অনুন্নত এক পর্যায়ের এক অবশেষ আনুষ্ঠানিক আইন পরিত্যাগ করতে হবে।

মুসলিম সংস্কারবাদের মতো ইহুদিবাদের বিজ্ঞানের উদ্যোক্তরা তাঁদের ধর্মকে পুরোপুরি যৌক্তিক বিশ্বাস হিসাবে উপস্থাপনে উদগ্রীব ছিলেন। তাঁরা বিশেষভাবে কাব্বালাহ ত্যাগ করতে চেয়েছেন, শ্যাব্বেতাই যেভি বিপর্যয় ও হাসিদবাদ-এর আবির্ভাবের সময় থেকে যা বিব্রতকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরই পরিণতিতে ১৮৪২ সালে *দ্য রিলিজিয়াস ফিলোসফি অভ দ্য জুজ*-এর প্রকাশক স্যামুয়েল হার্শ ইসরায়েলের একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন যেখানে অতিন্দ্রীয়বাদী দিক উপেক্ষা করে স্বাধীনতার ধারণার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে ঈশ্বরের একটি নৈতিক ও যৌক্তিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। একজন মানুষ তার 'আমি' বলার ক্ষমতায় আলাদাভাবে পরিচিত হয়। এই আত্ম-সচেতনতা অবিচ্ছেদ্য ব্যক্তি স্বাধীনতা তুলে ধরে। পৌত্তলিক ধর্ম এই স্বাধীন মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে পারেনি, কেননা মানুষের উন্নতি বা বিকাশের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে আত্ম-সচেতনতার বোধটি স্বর্গ হতে প্রাপ্ত বলে মনে করা হতো। প্যাগানরা প্রকৃতিতে তাদের ব্যক্তিগত মুক্তির উৎস স্থাপন করেছিল, তারা বিশ্বাস করত যে, তাদের কিছু কিছু দোষ বা অপরাধ অনিবার্য। অব্রাহাম অবশ্য এই পৌত্তলিক অদৃষ্টবাদ ও নির্ভরতা অস্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বরের সামনে নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একা দাঁড়িয়েছেন তিনি। এমন একজন মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের দেখা পাবে। বিশ্ব জগতের প্রভু ঈশ্বর এই অন্তস্থঃ স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের সাহায্য করার জন্যেই পৃথিবীকে সৃষ্টি



AMARBOI.COM

করেছেন; স্বয়ং ঈশ্বরই প্রতিটি মানুষকে এই লক্ষ্যে শিক্ষা দান করেছেন। জেন্টাইলরা যেমন মনে করে, ইহুদিবাদ দাসত্বমূলক ধর্ম নয়। এটা সব সময়ই, উদাহরণ হিসাব বলা যায়, খৃস্টধর্মের তুলনায় অগ্রসর ধর্ম ছিল; ইহুদি উৎস ভুলে গিয়ে খৃস্টধর্ম পৌত্তলিকতার যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারে ফিরে গিয়েছিল।

নাখমান ক্রচমাল (১৭৮৫-১৮৪০), যাঁর মৃত্যুর পর ১৮৪১ সালে *গাইড ফর দ্য পারপ্লেক্সড অভ আওয়ার টাইম* প্রকাশিত হয়েছিল, সতীর্থদের মতো অতিন্দ্রীয়বাদ থেকে সরে যাননি। তিনি 'ঈশ্বর' বা 'আত্মা'কে কাব্বালিস্টদের মতো 'কিছু না' বলতে ভালোবাসতেন; ঈশ্বরের আপন সত্তার ক্রমপ্রকাশ বর্ণনা করার জন্যে উৎসারণের কাব্বালিস্ট রূপকল্প ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইহুদিদের সাফল্য ঈশ্বরের ওপর শোচনীয় নির্ভরতার নয় বরং সম্মিলিত সচেতনতার কর্মকাণ্ডের ফল। শত শত বছর ধরে ইহুদিরা ক্রমশঃ ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিশুদ্ধ করেছে। এভাবে নির্বাসনের সময় ঈশ্বরকে অলৌকিক ঘটনা সংগঠনের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতিতে প্রকাশ করতে হয়েছিল। কিন্তু বাবিলন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নাগাদ ইহুদিরা ঈশ্বর সম্পর্কে আরও অগ্রসর ধারণা অর্জন করে, ফলে নিদর্শন ও বিস্ময়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। *গোয়িমে* যেমনটি কল্পনা করে, ঈশ্বর উপাসনার ইহুদি ধারণা মোটেই সে রকম দাসত্বমূলক নির্ভরতা নয়, বরং তা প্রায় হুবহু দার্শনিক আদর্শের অনুরূপ। ধর্ম ও দর্শনের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে শেষোক্তটি নিজেকে ধারণা দিয়ে প্রকাশ করে, আর ধর্ম ব্যবহার করে প্রতীকী ভাষা। তা সত্ত্বেও প্রতীকী ভাষা যথার্থ, কেননা ঈশ্বর তাঁর সম্পর্কে আমাদের সকল ধারণা অতিক্রম করে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা এমনকি এও বলতে পারি না যে তাঁর অস্তিত্ব আছে, কারণ অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই আংশিক এবং সীমাবদ্ধ।

১৮৮১ সালে তৃতীয় জার আলেকজান্দারের অধীন রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে ভয়ানক অ্যান্টি-সেমিটিজমের জোয়ারে মুক্তির মাধ্যমে আগত নতুন আত্মবিশ্বাস কঠিন আঘাত লাভ করে। পশ্চিম ইউরোপেও এটা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৪ সালে ইহুদিদের মুক্তি দানকারী প্রথম দেশ ফ্রান্সে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ভুলবশতঃ ইহুদি কর্মকর্তা আলফ্রেড ড্রেয়ফুস অভিযুক্ত হলে অ্যান্টিসেমিটিজমের এক উন্মাদনাময় স্রোত বয়ে গিয়েছিল। একই বছর উল্লেখযোগ্য অ্যান্টি-সেমাইট কার্ল ল্যুগার ভিয়েনার মেয়র নির্বাচিত হলেও জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত ইহুদিদের ধারণা ছিল যে তারা নিরাপদ। এভাবে হারমান কোহেন (১৮৪২-১৯১৮) যেন কান্ট এবং হেগেলের মেটাফিজিক্যাল অ্যান্টি-সেমিটিজমে আবিষ্ট ছিলেন। সবার উপরে ইহুদিবাদ একটি দাসত্বমূলক ধর্মবিশ্বাস, এই অভিযোগ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন

AMARBOI.COM

কোহেন ঈশ্বরকে বাহ্যিক সত্তা হিসাবে মানতে অস্বীকার করেন। মহাশূন্যে অবস্থান করে আনুগত্য আরোপকারী ঈশ্বর মানুষের মনে সৃষ্টি হওয়া একটা ধারণা মাত্র, নৈতিক আদর্শের একটা প্রতীক। মোজেসের সামনে স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক নিজেকে 'আমি যা আমি তাই' বলে পরিচয় দেওয়ার সময় জ্বলন্ত ঝোপের বাইবেলিয় কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে কোহেন যুক্তি দেখিয়েছেন, এটা আমরাা যাঁকে 'ঈশ্বর' বলি তা যে কেবল সত্তা স্বয়ং সেই সত্য প্রকাশেরই আদিম অভিব্যক্তি। এটা আমাদের বোধের সাধারণ সত্তাসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা কেবল এই আবশ্যক অস্তিত্বে অংশগ্রহণ করতে পারে। *দ্য রিলিজিন অভ রিজন ড্রন ফ্রম দ্য সোর্সেস অভ জুদাইজম* এও (১৯১৯ সালে মৃত্যুর পর প্রকাশিত) কোহেন জোরের সঙ্গে বলেছেন, ঈশ্বর স্রেফ মানুষের একটা ধারণা। তারপরও তিনি মানুষের জীবনে ধর্মের আবেগগত ভূমিকা স্বীকার করেছেন। তুচ্ছ নৈতিক ধারণা আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে না। ধর্ম আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে শিক্ষা দেয়, সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে ধর্মের ঈশ্বরই–নীতি ও দর্শনের ঈশ্বরের বিপরীতে–সেই আবেগময় ভালোবাসা।

এসব ধারণা ফ্রানয রোজেনস্‌ভিগের (১৮৮৬-১৯২৯) হাতে সকল শনাক্তের অতীত বিকাশ লাভ করে; ইহুদিবাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধারণার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তিনি, যা তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় আলাদা স্থান দিয়েছে। তিনি কেবল প্রথম যুগের অস্তিত্ববাদীদের অন্যতম ছিলেন না, এমন সব ধারণাও প্রণয়ন করেছিলেন যা প্রাচ্য ধর্মসমূহের অনেক কাছাকাছি। তাঁর স্বাধীনতাকে সম্ভবত এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, তরুণ বয়সে তিনি ইহুদিবাদ ত্যাগ করে পরিণত হয়েছিলেন অজ্ঞাবাদীতে, তারপর খৃস্টধর্ম গ্রহণের কথা ভেবে শেষে আবার অর্থডক্স ইহুদিবাদে ফিরে এসেছিলেন। স্বেচ্ছাচারী ঈশ্বরের ওপর দাসত্বমূলক কারণ নির্ভরতাকে উৎসাহিতকারী তোরাহ্ অনুসরণের অস্বীকৃতি জানিয়েছেন রোজেন্‌সভিগ। ধর্ম কেবল নৈতিকতার একটা ব্যাপার নয় বরং অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন। সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়া কীভাবে সম্ভব? এই মিলন কেমন ছিল, আমাদের কখনও বলেননি রোজেনসভিগ। এটা তাঁর দর্শনের একটি ত্রুটি। তিনি মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মাকে মিলিয়ে ফেলার হেগেলিয় প্রয়াসকে অবিশ্বাস করেছেন। আমাদের মানবীয় চেতনাকে 'বিশ্বাত্মার' একটা বৈশিষ্ট্য ভাবতে গেলে আমরা আর প্রকৃত স্বতন্ত্র ব্যক্তি থাকি না। একজন খাঁটি অস্তিত্ববাদী রোজেনস্‌ভিগ প্রতিটি মানুষের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার ওপর জোর দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকেই মানুষের বিশাল সমুদ্রে দিশাহারা, আতঙ্কিত। কেবল ঈশ্বর আমাদের দিকে প্রসন্ন হয়ে দৃষ্টি ফেরালেই এই অজ্ঞাতনামা অবস্থা ও আতঙ্ক হতে উদ্ধার লাভ করি। সুতরাং, ঈশ্বর আমাদের



AMARBOI.COM

স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করেন না, বরং আমাদের পরিপূর্ণ আত্মসচেতনতা অর্জনে সক্ষম করে তোলেন।

মানবীয় কোনও রূপে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। ঈশ্বর অস্তিত্বের মূল, সুতরাং আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছেন তিনি, যে আমাদের পক্ষে তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়, যেন তিনি আমাদের মতোই কোনও ব্যক্তি বিশেষ। ঈশ্বরকে বর্ণনা করার মতো কোনও ধারণা বা ভাষা নেই। বরং মানুষ ও তাঁর মাঝের বিশাল ব্যবধান তোরাহ্‌র নির্দেশনাবলীতে দূর হয়। *গোয়িম* যেমন ভাবে, এগুলো স্রেফ বেআইনী বিধি বিধান নয়। এগুলো পবিত্র মূল্য বিশিষ্ট প্রতীকী কর্মকাণ্ড যা নিজেদের অতীতে কোথাও ইঙ্গিত করে ও ইহুদিদের আমাদের সত্তার গভীরস্থ স্বর্গীয় মাত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। র‍্যাবাইদের মতো রোজেনস্‌ভিগ যুক্তি দেখিয়েছেন, নির্দেশনাবলী এত বেশি রকম প্রতীকী যে যেহেতু প্রায়শঃই এগুলোর কোনও নিজস্ব অর্থ থাকে না—এগুলো আমাদের খোদ অনির্বচনীয় সত্তা সম্পর্কে আমাদের সীমিত ভাষা ও ধারণাসমূহের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। এগুলো আমাদের শ্রবণ ও অপেক্ষার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে, ফলে আমরা আমাদের অস্তিত্বের মূল-এর দিকে মনোযোগী ও অবিচল থাকতে পারি। সুতরাং, *মিত্‌যভা* স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে না। ব্যক্তি বিশেষকে এগুলোকে এমনভাবে উপলব্ধিতে নিতে হবে যাতে প্রতিটি *মিত্‌যভা* বাহ্যিক নির্দেশ হিসাবে পরিচয় হারিয়ে কেবল *আমার* অন্তরের মনোভাব প্রকাশ করে *আমার* অন্তরের অবশ্যকরণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোরাহ্ যদিও বিশেষভাবে ইহুদিদের ধর্মীয় অনুশীলন, কিন্তু প্রত্যাদেশ কেবল ইসরায়েলের জনগণের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি, রোজেনস্‌ভিগ, ঐতিহ্যগতভাবে ইহুদি প্রতীকী ভঙ্গিতে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, কিন্তু একজন ক্রিশ্চান অন্যরকম প্রতীক ব্যবহার করবে। ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদসমূহ প্রাথমিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি ছিল না, বরং সেগুলো ছিল অন্তরের মনোভাবের প্রতীক। যেমন সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের মতবাদসমূহ ঈশ্বরের জীবন ও পৃথিবীর প্রকৃত ঘটনাবলীর আক্ষরিক বিবরণ ছিল না। প্রত্যাদেশের কিংবদন্তীগুলো আমাদের ব্যক্তিগত ঈশ্বর অনুভূতি প্রকাশ করে। সৃষ্টি সংক্রান্ত মিথগুলো আমাদের মানবীয় অস্তিত্বের চরম অনিশ্চয়তাকে প্রতীকায়িত করে, অস্তিত্বের ভিত্তির ওপর আমাদের অসীম নির্ভরতার আলোড়ন সৃষ্টিকারী জ্ঞান যা আমাদের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলেছে। স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বর যতক্ষণ না প্রতিটি সৃষ্টির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন ততক্ষণ তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহ নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু তিনি যদি স্রষ্টা অর্থাৎ সকল অস্তিত্বের মূল না হতেন, তাহলে গোটা মানব জাতির জন্যে ধর্মীয় অনুভূতির কোনও মানে থাকত না। এটা কতগুলো আজগুবি ঘটনার

AMARBOI.COM

ক্রমধারা রয়ে যেত। নব্য অ্যান্টি-সেমিটিজমের বিপক্ষে বিকাশমান নতুন রাজনৈতিক ইহুদিবাদের ব্যাপারে ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বজনীনতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন রোজেনসভিগ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। ইসরায়েল, যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, প্রতিশ্রুত ভূমিতে নয়, বরং মিশরেই জাতিতে পরিণত হয়েছিল; এবং চিরন্তন জাতি হিসাবে তখনই এর গন্তব্যে পৌঁছবে যদি সে জাগতিক বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এবং রাজনীতিতে জড়িত না হয়।

কিন্তু ক্রমবর্ধমান অ্যান্টি-সেমিটিজমের শিকারে পরিণত হওয়া ইহুদিরা এই রাজনীতি-বিচ্ছিন্নতা পোষাতে পারবে মনে করেনি। ঈশ্বর বা মেসায়াহ এসে উদ্ধার করবেন ভেবে বসে থাকতে পারেনি তারা। তাদের নিজেদেরই উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ১৮৮২ সালে রাশিয়ায় প্রথম হত্যালীলার এক বছর পর ইহুদিদের একটা দল পূর্ব ইউরোপ ছেড়ে প্যালেস্তাইনে বসতি করতে যায়। তাদের বিশ্বাস ছিল নিজেদের একটা আবাসভূমি না হওয়া পর্যন্ত ইহুদিরা অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন মানুষ রয়ে যাবে। যায়নে (জেরুজালেমের অন্যতম প্রধান পাহাড়) ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষার সূচনা ঘটেছিল এক বিদ্রোহী সেক্যুলার আন্দোলন হিসাবে, কেননা ইতিহাসের উত্থান-পতন যায়োনিস্টদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে, ধর্ম ও তাঁদের ঈশ্বর কাজ করেননি। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে যায়নবাদ ছিল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের একটা শাখা, যার কর্মীরা মার্ক্স-এর তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করেছিল। ইহুদি বিপ্লবীরা সচেতন হয়ে উঠেছিল যে তাদের কমরেডরা জারের মতোই অ্যান্টি-সেমিটিক কমিউনিস্ট শাসনাধীন; তাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না ভেবে শঙ্কিত ছিল ওরা: পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করেছে তাদের আশঙ্কা ঠিক ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডেভিড বেন গুরিয়নের (১৮৮৬-১৯৭৩) মতো উৎসাহী তরুণ সমাজতন্ত্রীরা স্রেফ মালসামান নিয়ে প্যালেস্তাইনে পাড়ি জমিয়েছিলেন এমন একটা আদর্শ সমাজ গঠনের অঙ্গীকারে যা কিনা জেন্টাইলদের জন্যে আলোকবর্তিকা হবে ও সমাজতান্ত্রিক সহস্রাব্দের সূচনা ঘটাবে। অন্যদের এইসব মার্ক্সীয় স্বপ্নে বিভোর হবার অবকাশ ছিল না। ক্যারিশম্যাটিক অস্ট্রিয়ান থিওদর হার্যল (১৮৬০-১৯০৪) নতুন ইহুদি প্রয়াসকে ঔপনিবেশিক উদ্যোগ হিসাবে দেখেছেন: ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কোনও একটির আশ্রয়ে ইহুদি রাষ্ট্রটি ইসলামি বর্বরতার মাঝে প্রগতির ভ্যানগার্ডে পরিণত হবে।

ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সত্ত্বেও যায়নবাদ নিজেকে উৎপত্তিগতভাবেই প্রচলিত ধর্মীয় পরিভাষায় প্রকাশ করেছে; অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এক নিরীশ্বরবাদী ধর্ম ছিল এটা। ভবিষ্যতের জন্যে ভাবাবেশ ও অতিন্দ্রীয়বাদী আশায় ভরপুর ছিল। উদ্ধার লাভ, তীর্থযাত্রা ও পুনর্জন্মের প্রাচীন থিমের ওপর নির্ভরশীল। যায়নবাদীরা এমনকি উদ্ধারপ্রাপ্ত সত্তার চিহ্ন হিসাবে নতুন নাম গ্রহণ করার চর্চাও

AMARBOI.COM

শুরু করেছিল। এভাবেই প্রথমদিকের প্রচারক অ্যাশার গিনযবার্গ নিজেকে আহাদ হা'আম (জনগণের একজন) আখ্যায়িত করেছিলেন। এখন তিনি আপন পরিচয় পেয়েছেন, কারণ নিজেকে তিনি নতুন জাতীয় চেতনার সঙ্গে একীভূত করতে পেরেছেন, যদিও তিনি প্যালেস্তাইনে ইহুদি রাষ্ট্রে সম্ভব বলে ভাবেননি। তিনি কেবল ইসরায়েল জাতির একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সেখানে একটি 'আধ্যাত্মিক কেন্দ্র' চেয়েছিলেন যা ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করবে। এটা 'জীবনের সকল বিষয়ের একটি নির্দেশনায়' পরিণত হবে, 'হৃদয়ের একেবারে গভীরে প্রবেশ করবে' এবং 'প্রত্যেককে প্রত্যেকের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত করবে।' যায়বাদীরা প্রাচীন ধর্মীয় পরিচয় পাল্টে ফেলেছিল। এক দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত হওয়ার বদলে ইহুদিরা পৃথিবীতেই পূর্ণতার খোঁজ করেছে। হিব্রু শব্দ *হাগশামাহ*, আক্ষরিক অর্থে 'নিরেট করণ', মধ্যযুগীয় ইহুদি দর্শনে নেতিবাচক শব্দ ছিল, যা ঈশ্বরে মানবীয় বা ভৌত গুণ আরোপ করার স্বভাবের কথা বোঝাত। যায়নবাদে *হাগশামাহ* সম্পূর্ণতা বোঝাল, পার্থিব জগতে ইসরায়েলের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশ। পবিত্রতা আর স্বর্গে অবস্থান করছে না: প্যালেস্তাইন একটি 'পবিত্র ভূমি'—শব্দটির পূর্ণাঙ্গ অর্থে।

কতটা পবিত্র সেটা বোঝা যাবে প্রথম দিকের পাইওনিয়ার আরন ডেভিড গর্ডনের (মৃ. ১৯২২) লেখায়, যিনি সাতচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রথমে অর্থডক্স ইহুদি ও কাব্বালিস্ট ছিলেন, এরপর যায়নবাদে দীক্ষা নেন। শাদা চুল ও শশ্রুমণ্ডিত দুর্বল ও অসুস্থ মানুষ গর্ডন অপেক্ষাকৃত তরুণ বসতি স্থাপনকারীদের পাশাপাশি মাঠে কাজ করতেন, রাতে মোহবিষ্ট অবস্থায় তাদের সঙ্গে দাপিয়ে বেড়াতেন এবং চেচিয়ে বলতেন, 'আনন্দ।... আনন্দ!' আগেকার দিনে, লিখেছিলেন তিনি, ইসরায়েল ভূমির সঙ্গে পুনর্মিলনের অভিজ্ঞতাকে শেকিনাহ্র প্রকাশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো। পবিত্র ভূমি এক পবিত্র মূল্যে পরিণত হয়েছিল: কেবল ইহুদিদের কাছেই বোধগম্য, এর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল, যা এক অসাধারণ ইহুদি চেতনা জন্ম দিয়েছিল। এই পবিত্রতার বর্ণনা দিতে গিয়ে গর্ডন এক সময় ঈশ্বরের রহস্যময় জগৎ বোঝাতে প্রযুক্ত কাব্বালিস্টিক ভাষা ব্যবহার করেছেন:

> ইহুদির আত্মা হচ্ছে ইসরায়েলের ভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশের উত্তরসুরি। স্পষ্টতা এক অসীম পরিষ্কার আকাশের গভীরতা, এক স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, নির্মলতার কুয়াশা। এমনকি স্বর্গীয় অজানাও যেন এই স্পষ্টতায় অদৃশ্য হয়ে যায়, সীমিত প্রকাশিত আলো হতে অসীম গুপ্ত আলোয় হারিয়ে যায়। এই পৃথিবীর মানুষ ইহুদির আত্মার এই স্পষ্ট দৃষ্টিকোণ বা আলোকিত অজানার কোনওটিই উপলব্ধি করতে পারে না।[২৯]

AMARBOI.COM

প্রথম দিকে মধ্যপ্রাচ্যের এই ল্যান্ডস্কেপ তাঁর পিতৃভূমি রাশিয়া থেকে এত আলাদা ছিল যে গর্ডনের কাছে আতঙ্ক জাগানো এবং অচেনা ঠেকেছে। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছেন, পরিশ্রমের (*আভোদাহ* শব্দটি দিয়ে ধর্মীয় আচারও বুঝিয়ে থাকে) ভেতর দিয়ে একে আপন করতে পারবেন। জমিনের উন্নতি করে, আরবরা যার উপেক্ষা করেছে, যায়নিস্টদের দাবি অধিকার করে নিতে পারবে এবং একই সময়ে নিজেদের নির্বাসনের বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তোরণ ঘটাতে পারবে।

সমাজতন্ত্রী যায়নবাদীরা তাদের অগ্রগামী আন্দোলনকে শ্রমের জয় হিসাবে আখ্যায়িত করে: তাদের *কিবুতযিম* সেক্যুলার মঠে পরিণত হয়েছিল, সেখানে তারা শাদামাটাভাবে বাস করত ও নিজেদের মুক্তি খুঁজে পেত। জমির আবাদ পুনর্জন্ম ও বিশ্বজনীন ভালোবাসার এক অতিন্দ্রীয়বাদী অনুভূতির দিকে ধাবিত করেছিল তাদের। গর্ডন যেমন ব্যাখ্যা করেছেন:

> আমার দুই হাত পরিশ্রমের সাথে যেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, আমার চোখ আর কান যা দেখতে ও শুনতে শিখেছে এবং আমার হৃদয় বুঝতে পেরেছে এর মাঝে কী আছে: আমার আত্মাও পাহাড়ে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে শিখেছে, উড়তে শিখেছে, ভাসিতে শিখেছে–অচেনা বিস্তারে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে চারপাশে সকল জমিনকে আলিঙ্গন করার জন্যে, গোটা জগৎ এবং এতে যা কিছু আছে আর সমগ্র বিশ্বজগতের আলিঙ্গনে নিজেকে আবদ্ধ দেখার জন্যে।[৩০]

AMARBOI.COM

তাদের কাজ ছিল সেক্যুলার প্রার্থনা। ১৯২৭ সালের দিকে অপেক্ষাকৃত তরুণ অগ্রদূত ও পণ্ডিত আব্রাহাম শ্লোনস্কি (১৯০০-৭৩), সড়ক নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি, ইসরায়েল ভূমির উদ্দেশে নিচের কবিতাটি লিখেছেন:

> আমাকে পরিয়ে দাও, লক্ষ্মী মা আমার, বহু রঙা জমকালো পোশাক,
> ভোরে নিয়ে যাও ক্ষেতে।
> প্রার্থনার চাদরের মতো আলোয় মোড়া আমার জমিন।
> কপালের ফিতের মতো দাঁড়িয়ে ঘরগুলো;
> হাতে বিছানো পাথরসারি, ঝর্নাধারা যেন ধর্মগ্রন্থের বাক্স বাঁধার ফিতে।
> এখানে অনিন্দ্য সুন্দর নগরী স্রষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা করে।
> স্রষ্টাদের মাঝে আছে তোমার পুত্র আব্রাহাম,
> ইসরায়েলের সড়ক নির্মাতা কবি।[৩১]

যায়নবাদীর আর ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, সে নিজেই স্রষ্টা।

অন্য যায়নবাদীরা অধিকতর প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে নিষ্ঠ রয়ে গিয়েছিল। প্যালেস্তাইনী ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রবীন র‍্যাবাইর দায়িত্ব পালনকারী কাব্বালিস্ট আব্রাহাম ইসাক কুকের (১৮৬৫–১৯৩৫) ইসরায়েলে পা রাখার আগে জেন্টাইল বিশ্বের সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরের সেবা করার ধারণা যতদিন ধর্মের আদর্শ ও কর্তব্য হতে ভিন্ন একটি নির্দিষ্ট সত্তার সেবা হিসাবে সঙ্গায়িত হবে ততদিন তা 'বিশেষ বস্তুসমূহে মনোযোগী অপরিণতি দৃষ্টিভঙ্গি হতে মুক্ত'[৩২] হবে না। ঈশ্বর ভিন্ন এক সত্তা নন। ব্যক্তিত্ব জাতীয় সকল মানবীয় ধারণার ঊর্ধ্বে এন সফ। ঈশ্বরকে সত্তা বিশেষ হিসাবে কল্পনা করতে যাওয়া বহু ঈশ্বরবাদীতা ও আদিম মানসিকতায় লক্ষণ। ইহুদি ট্র্যাডিশনে সিক্ত ছিলেন কুক, কিন্তু তিনি যায়নিস্ট আদর্শে আতঙ্ক বোধ করেননি। একথা সত্য যে, ধর্মকে ঝেড়ে ফেলার কথা বিশ্বাস করত শ্রমবাদীরা, কিন্তু নাস্তিক্যবাদী যায়নবাদ ছিল একটা পর্যায় মাত্র। অগ্রগামীদের মাঝে তৎপর ছিলেন ঈশ্বর: স্বর্গীয় 'স্ফুলিঙ্গসমূহ' এসব 'খোসার' অন্ধকারে বন্দি হয়ে উদ্ধারের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা ভাবুক বা না ভাবুক, ইহুদিরা মূলত ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল এবং নিজেদের অজান্তেই  ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছিল। নির্বাসনের সময় পবিত্র আত্মা তাঁর জাতিকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। শেকিনাহকে সিনাগগ ও পাঠকক্ষে লুকিয়ে রেখেছিল তারা। কিন্তু ইসরায়েল অচিরেই পৃথিবীর আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পরিণত হবে, জেন্টাইলদের সামনে ঈশ্বরের প্রকৃত ধারণা প্রকাশ করবে।

এ ধরনের আধ্যাত্মিকতা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। পবিত্র ভূমির প্রতি অতিভক্তি আমাদের কালেই ইহুদি মৌলবাদীদের বহুঈশ্বরবাদীতার জন্ম দেবে। ঐতিহাসিক ইসলামের প্রতি ভক্তি মুসলিম বিশ্বে অনুরূপ মৌলবাদ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। ইহুদি ও মুসলিম উভয়ই এক অন্ধকার জগতে অর্থ খুঁজে পাওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। ইতিহাসের ঈশ্বর যেন তাদের হতাশ করেছেন। যায়নবাদীরা তাদের জনগণের চূড়ান্ত বিনাশের ভয় করে ভুল করেনি। বহু ইহুদির কাছেই ঈশ্বরের প্রচলিত ধারণা এক অসম্ভাব্যতার রূপ নেবে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এলি ওয়েইসেল হাঙেরিতে ছেলেবেলায় কেবল ঈশ্বরের জন্যে বেঁচেছিলেন; তালমুদের বিধিবিধান অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবন; একদিন কাব্বালাহর রহস্যে দীক্ষা নেওয়ার আশা ছিল তাঁর। বালক বয়সে তাঁকে প্রথমে অশৎউইয ও পরে বুচেনভল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত্যু শিবিরে প্রথম রাতেই

ক্রিমোটোরিয়াম থেকে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উঠতে দেখে—যেখানে তাঁর মা-বোনের মৃতদেহ নিক্ষেপ করার কথা ছিল—তিনি বুঝে যান যে অগ্নিশিখা তাঁর বিশ্বাসকে গ্রাস করে নিয়েছে। এমন এক জগতে ছিলেন তিনি যা কল্পিত ঈশ্বরবিহীন জগতেরই বাস্তব রূপ। 'রাত্রির সেই নৈঃশব্দ্য কোনওদিনই ভোলা উচিত হবে না আমার, যা চিরদিনের জন্যে আমার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা দূর করে দিয়েছিল,' বহু বছর পর লিখেছেন তিনি, 'আমার ঈশ্বর, আমার আত্মা ও আমার স্বপ্নকে চুরমার দেওয়া এই মুহূর্তগুলোর কথাও কখনও ভুলব না আমি।'[৩৩]

গেস্টাপো একদিন একটা শিশুকে গলায় দড়ি দিয়ে হত্যা করে। হাজার হাজার দর্শকের সামনে একটা বাচ্চা ছেলেকে ফাঁসিতে ঝোলানোয় এমনকি এসএস পর্যন্ত বিব্রত বোধ করেছে। 'শিশুটির,' স্মৃতিচারণ করেছেন ওয়েইসেল 'চেহারা ছিল 'বিষণ্ণ-চোখ দেবদূতের' মতো; ফাঁসির মঞ্চে ওঠার সময় চুপচাপ, একেবারে ফ্যাকাশে আর প্রায় শান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। ওয়েইসেলের পেছন থেকে বন্দিদের কেউ একজন জানতে চেয়েছে: 'ঈশ্বর কোথায়? কোথায় তিনি?' আধঘণ্টা লেগেছিল শিশুটি মারা যেতে। এই সময়ে বন্দিরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। একই লোক আবার জিজ্ঞেস করেছে; 'ঈশ্বর এখন কোথায়?' তখন ভিড়ের ভেতর একটা কণ্ঠস্বরকে জবাব দিতে শুনেছেন ওয়েইসেল: 'কোথায় তিনি? তিনি এখানেই—এখানে ফাঁসিতে ঝুলে আছেন।'[৩৪]

দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন, একটি শিশুর মৃত্যুও ঈশ্বরকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে, কিন্তু এমনকি তিনিও, যার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার পরিচয় ছিল, এ রকম অবস্থায় কোনও শিশুর মৃত্যুর কথা কল্পনা করেননি। অশৎউইয়ের বিভীষিকা ঈশ্বরের প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাসী আরও অনেকের কাছেই প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল। দুর্জ্ঞেয় অ্যাপাথিয়ায় হারিয়ে যাওয়া দার্শনিকদের দূরবর্তী ঈশ্বর অসহনীয় হয়ে উঠেছেন। ইহুদিদের অনেকেই আর ইতিহাসে নিজেকে প্রকাশকারী ঈশ্বরের বাইবেলিয় ধারণায় বিশ্বাস রাখতে পারেনি। যিনি, ওয়েইসেলের সঙ্গে তারাও বলে, অশৎউইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আমাদের বৃহৎরূপ ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে মোকাবিলা করা হয়েছে। এই ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলে হলোকাস্ট ঠেকাতে পারতেন। ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে থাকলে তিনি অক্ষম, অপ্রয়োজনীয়; আর থামানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও না থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তিনি দানব। হলোকাস্ট যে প্রথাগত ধর্মতত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে, এ বিশ্বাস কেবল ইহুদিদের একার নয়।

কিন্তু তারপরেও একথা সত্যি, এমনকি অশৎউইয়েও কিছুসংখ্যক ইহুদি তালমুদ পড়া চালিয়ে গেছে, প্রচলিত উৎসব পালন করেছে, ঈশ্বর তাদের

উদ্ধার করবেন এই আশায় নয়, বরং এর একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে বলে। একটা গল্প চালু আছে যে, অশৎউইযে একদিন একদল ইহুদি ঈশ্বরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাকতার অভিযোগ আনে তারা। জবের মতো তারাও অশুভের সমস্যা ও বর্তমান অশ্লীলতার মাঝে দুর্ভোগের প্রচলিত জবাবে সান্ত্বনা খুঁজে পায়নি। ঈশ্বরের পক্ষে তারা কোনও অজুহাত পায়নি, অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করতে পারে এমন কোনও পরিস্থিতিও দেখেনি তো, তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য বলে ঘোষণা দেয়। র‍্যাব্বাই রায় ঘোষণা করেন। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে বলেন, বিচারের কাজ শেষ; এখন সান্ধ্য প্রার্থনার সময় হয়েছে।

AMARBOI.COM

# ১১.
# ঈশ্বরের কি ভবিষ্যৎ আছে?

আমরা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ দিকে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এখন ধারণা জন্মাচ্ছে যে, আমাদের চেনা পরিচিত পৃথিবী যেন অতীত হয়ে যাচ্ছে। দশকের পর দশক আমরা এই জ্ঞান নিয়ে বসবাস করে এসেছি যে আমাদের আবিষ্কৃত মারণাস্ত্র পৃথিবীর বুকে থেকে মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। ঠাণ্ডা লড়াই হয়তো-বা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা পুরোনোটির চেয়ে কম ভীতিকর ঠেকছে না। আমরা এক প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। এইডস ভাইরাস এক অকল্পনীয় মাত্রার মহামারী ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি সৃষ্টি করেছে। আগামী দুই কি তিন প্রজন্মের ব্যবধানেই জনসংখ্যা গ্রহটির ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষ ও খরায় মারা যাচ্ছে। আমাদের আগের প্রজন্মগুলোও পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন মনে করেছে, কিন্তু তারপরেও যেন মনে হচ্ছে আমরা এক কল্পনাতীত ভবিষ্যতের মোকাবিলা করছি। আসছে বছরগুলোয় ঈশ্বরের ধারণা কীভাবে টিকে থাকবে? বিগত ৪,০০০ বছর ধরে চলমান সময়ের প্রয়োজন মাফিক এই ধারণা অভিযোজিত হয়ে এসেছে, কিন্তু আমাদের শতকে মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে লক্ষ করছে যে, এই ধারণটি এখন আর তাদের কাজে আসছে না। ধর্মীয় ধারণাসমূহ যখন আর কার্যকর থাকে না তখন সেগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। ঈশ্বর হয়তো আসলেই অতীতের ধ্যান-ধারণার অংশ। আমেরিকান পণ্ডিত পিটার বার্জার উল্লেখ করেছেন, আমরা প্রায়শঃ আমাদের সময়ের সঙ্গে অতীতের তুলনা করার সময় দ্বৈতনীতি অনুসরণ করি। অতীতকে যেখানে বিশ্লেষণ করে আপেক্ষিক করে তোলা হয়, বর্তমানকে সেখানে এই প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়; আমাদের বর্তমান অবস্থান

AMARBOI.COM

পরম এক অবস্থায় পরিণত হয়ঃ এভাবেই 'নিউ টেস্টামেন্টের রচয়িতাদের তাঁদের সময়ের ভ্রান্ত সচেতনতায় আক্রান্ত হিসাবে দেখা হয়, কিন্তু বিশ্লেষক তাঁর সময়ের সচেতনতাকে অবিমিশ্র বুদ্ধিবৃত্তিক আশীর্বাদ ধরে নেন।'[১] ঊনবিংশ ও প্রাক-বিংশ শতাব্দীর সেক্যুলারিস্টরা নাস্তিক্যবাদকে বিজ্ঞান যুগে মানুষের অপরিবর্তনীয় অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে বহু যুক্তি আছে। ইউরোপে চার্চগুলো শূন্য হয়ে আসছে; নাস্তিক্যবাদ আর মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী অগ্রপথিকের কষ্টার্জিত আদর্শ নয়, বরং সর্বজনীন এক অনুভূতি। অতীতে এটা সব সময় ঈশ্বর সম্পর্কিত বিশেষ কোনও বিশ্বাস বা ধারণা হতে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এখন যেন তা ঈশ্বরবাদের সঙ্গে অন্তর্গত সম্পর্ক হারিয়ে এক সেক্যুলার সমাজে বাস করার অভিজ্ঞতার সক্রিয় সাড়ায় পরিণত হয়েছে। নিৎশের সেই উন্মাদ ব্যক্তিটিকে ঘিরে রাখা আমোদিত জটলার মতো অনেকেই ঈশ্বরবিহীন জীবনযাপনের সম্ভাবনায় এখন অবিচালিত। অন্যরা তাঁর অনুপস্থিতিকে ইতিবাচক স্বস্তি হিসাবে দেখছে। আমাদের মধ্যে যারা অতীতে ধর্ম নিয়ে সঙ্কটপূর্ণ সময়ের মোকাবিলা করেছে তারা আমাদের ছোটবেলাকে আতঙ্কিতকারী ঈশ্বর হতে মুক্তিলাভকে স্বস্তিকর মনে করছে। এক প্রতিহিংসা পরায়ণ উপাস্যের সামনে আতঙ্কে নত না হওয়াটা সত্যি অসাধারণ সুন্দর, যিনি তাঁর আইন না মেনে চললে অনন্ত নরকবাসের ভয় দেখান। আমাদের এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা এসেছে; আমরা সাহসের সাথে ধর্ম বিশ্বাসের কঠিন বিধি-বিধানের আশপাশে ঘুরঘুর না করে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা নিয়ে সামনে এগুতে পারি—অখণ্ডতা হারানোর অবিরাম ভয় নিয়ে থাকতে হয় না। আমরা মনে করি ভীষণ উপাস্যের যে অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে তিনি ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের প্রকৃত ঈশ্বর; আমরা কখনও উপলব্ধি করি না যে, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক বিভ্রান্তি মাত্র।

নিঃসঙ্গতার বিষয়টিও রয়েছে। জাঁ-পল সার্ত্রে (১৯০৫-৮০) মানুষের চৈতন্যে ঈশ্বরাকার গহ্বরের কথা বলেছেন, যেখানে ঈশ্বর সব সময় ছিলেন। তা সত্ত্বেও, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যদি ঈশ্বর থেকেও থাকেন তবুও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন, কেননা ঈশ্বরের ধারণা আমাদের স্বাধীনতাকে অচল করে দেয়। প্রচলিত ধর্মগুলো আমাদের বলে যে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্যে আমাদের অবশ্যই মানুষ সম্পর্কিত ঈশ্বরের ধারণার একরূপ হতে হবে। এর বদলে মানুষকে অবশ্যই আমাদের মুক্তিকে প্রতিরূপ হিসাবে দেখতে হবে। সার্ত্রের নাস্তিক্যবাদ সান্ত্বনাদায়ক বিশ্বাস ছিল না, তবে অন্য অস্তিত্ববাদীগণ ঈশ্বরের অনুপস্থিতিকে ইতিবাচক মুক্তি হিসাবে দেখেছেন। মরিস মারলঅ-পন্তি (১৯০৮-৬১) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর আমাদের বিস্ময়ের বোধ বৃদ্ধি করার

AMARBOI.COM

৯। জোসেফ ক্যাম্পবেল (বিল মেয়ার্স-এর সঙ্গে) *দ্য পাওয়ার অভ মিথ*, (নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮), পৃ; ৮৫।

১০। অ্যানামেরি শিমেল, *অ্যান্ড মুহাম্মদ ইজ হিজ মেসেঞ্জার: দ্য ভেরেনেশন অভ দ্য প্রফেট ইন ইসলামিক পিয়েটি* (চ্যাপেলহিল লন্ডন, ১৯৮৫) পৃ: ১৬১-৭৫।

১১। *কনফেশনস* IX অনু. চ্যাডউইক, পৃ: ১৭১।

১২। *কনফেশনস* IX ২৫, পৃ: ১৭১-৭২।

১৩। প্রাগুক্ত।

১৪। মোরালস অন জব v. ৬৬।

১৫। প্রাগুক্ত xxiv II

১৬। *ইযেকিয়েল প্রসঙ্গে হোমিলিজ* 1 Iii. i।

১৭। *সঙ অভ সঙস প্রসঙ্গে ধারাভাষ্য* ৬।

১৮। এপিলসল ২৩৪.১।

১৯। *অন প্রেয়ার*, ৬৭।

২০। *প্রাগুক্ত* ৭১।

২১। *অ্যাম্বিগুয়া* PG৯১, ১০৮৮।

২২। সাবিন ম্যাকরম্যাকের সঙ্গে পিটার ব্রাউন, 'আর্টিফিসেস অভ ইন্টারনিটি,' *ব্রাউনের সোসায়েটি অ্যান্ড দ্য হোলি ইন লেইট অ্যান্টি-কুইটিতে* (লন্ডন, ১৯৯২), পৃ: ২১২।

২৩। নিসেফোরাস, *গ্রেটার অ্যাপোলজি ফর দ্য হোলি ইমেজেস*, ৭০।

২৪। *থিওলজিক্যাল ওরেশনস*।

২৫। *এথিক্যাল ওরেশনস*-৫।

২৬। *ওরেশনস* ২৬।

২৭। *এথিক্যাল ওরেশনস* ৫।

২৮। *হাইমস অভ ডিভাইন লাভ* ২৮.১১৪-১৫, ১৬০-২।

২৯। *এনসাইক্লোপিডিয়া অভ ইসলাম* (১ম সংস্করণ, লেইডেন ১৯১৩) 'তাসউফ' শিরোনামোক্ত বিষয়।

৩০। আর. এ. নিকলসন অনূদিত এ. জে. আরবেরির *সুফিজম, অ্যাকাউন্ট অভ দ্য মিস্টিকস* অভ *ইসলাম*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৫০) পৃ: ৪৩।

৩১। আর. এ নিকলসের *দ্য মিস্টিকস* অভ *ইসলাম*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন ১৯৬৩ সংস্ক.) পৃ: ১১৫।

৩২। মার্শাল জি. এ. হজসনের *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম, কনশিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন*, ৩য় খণ্ড-এ উদ্ধৃত *ন্যারেটিভ* (শিকাগো, ১৯৭৪), I পৃ: ৪০৪।

AMARBOI.COM

৩৩। আরবেরির *সুফিজম*-এ উদ্ধৃত পৃ: ৫৯।

৩৪। নিকলসনের *দ্য মিস্টিকস অভ ইসলাম*-এ উদ্ধৃত পৃ: ১৫১।

৩৫। আরবেরি'র *সুফীজম*-এ উদ্ধৃত পৃ: ৬০।

৩৬। কোরান ২: ৩২।

৩৭। *হিকমত আল-ইশরাক*, হেনরি করবিনের *স্পিরিচুয়্যাল বডি অ্যান্ড সেলেস্টিয়াল আর্থ, ফ্রম ম্যাযদিন ইরান টু শিয়াহ্ ইরান*-এ উদ্ধৃত; অনু. ন্যান্সি পিয়ারসন (লন্ডন, ১৯৯০) পৃ: ১৬৮-৬৯।

৩৮। মিরচা এলিয়াদ, *শামানিজম*, পৃ. ৯, ৪০৮।

৩৯। জে. পি. সার্ত্র, *দ্য সাইকোলজি অভ দ্য ইমাজিনেশন* (লন্ডন, ১৯৭২)।

৪০। *ফুতুহাত আল মক্কিয়াহ* II ৩২৬, হেনরি কবরিনের *ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন ইন দ্য সুফিজম অভ ইবন আরাবীতে* উদ্ধৃত; অনু. রালফ ম্যানহেইম (লন্ডন, ১৯৭০), পৃ: ৩৩০।

৪১। *দ্য দিওয়ান, ইন্টারপ্রিটেশন অভ আরডেন্ট ডিজায়ার্স*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৮।

৪২। *লা ভিটা নোউভা*, অনু. রারবারা রেনল্ডস (হারমন্ডসওঅর্থ, ১৯৬৯) পৃ: ২৯-৩০।

৪৩। *পারগেটরি* xv ii, ১৩-১৮, অনু. বারবারা রেনল্ডস (হারমন্ডসওঅর্থ ১৯৬৯) পৃ: ১৯৬।

৪৪। উইলিয়াম চিত্তিক, 'ইবন আল আরাবী অ্যান্ড হিজ স্কুল' সাইয়ীদ হুসেইন নাসর সম্পাদিত *ইসলামিক স্পিরিচ্যুালিটি: ম্যানিফেস্টেশনস*-এ (নিউইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯১), পৃ: ৬১।

AMARBOI.COM

৪৫। কোরান ১৮: ৬৯।

৪৬। হেনরি করবিনের *ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন ইন ইবন আল-আরাবীতে* উদ্ধৃত, পৃ: ১১১।

৪৭। চিত্তিক, *'ইবন আরাবী অ্যান্ড হিজ স্কুল,'* নাসর সম্পাদিত *ইসলামিক স্পিরিচ্যুয়ালিটি*, পৃ: ৫৮।

৪৮। মাজিদ ফাখরি, *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফি* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন), ১৯৭০, পৃ: ২৮২।

৪৯। আর. এ নিকলসন, *দ্য মিস্টিকস অভ ইসলাম*, পৃ: ১০৫।

৫০। আর. এ. নিকলসন সম্পাদিত *ইস্টার্ন পোয়েট্রি অ্যান্ড প্রোস* (ক্যামব্রিজ, ১৯২২), পৃ: ১৪৮।

৫১। *মাসনাবী*। হজসনের *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*-II-এ উদ্ধৃত, পৃ: ২৫০।

৫২। কোলম্যান ব্যাকস্ ও জন ময়ইন অনু. ও সম্পা. *দিস লঙগিঙ, টিচিং স্টোরিজ অ্যান্ড সিলেক্টেড লেটারস* অভ *রুমি*-এ উদ্ধৃত (পুটনি, ১৯৮৮), পৃ: ২০।

বদলে তা নাকচ করে দেন। ঈশ্বর যেহেতু পরম সম্পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করেন, আমাদের আর কিছু করার বা অর্জনের থাকে না। আলবার্ট কামু (১৯১৩-৬০) এক বীরত্ব সূচক নাস্তিক্যবাদের প্রচার করেছেন। মানুষের সকল প্রেমময় অনুভব মানবজাতির ওপর বর্ষণ করার জন্যে ঈশ্বরকে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। বরাবরের মতো নাস্তিকদের একটা যুক্তি রয়েছে। ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষেই অতীতে সৃজনশীলতা রোধ করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি যদি সকল প্রশ্ন ও সমস্যার সামগ্রিক জবাব হয়ে থাকেন তাহলে সত্যিই তিনি আমাদের বিস্ময়ের অনুভূতি বা সাফল্যের বোধকে রুদ্ধ করে দিতে পারেন। এক প্রবল ও অঙ্গিকারবদ্ধ নাস্তিক্যবাদ পরিশ্রান্ত বা অপর্যাপ্ত আস্তিক্যবাদের চেয়েও বেশি ধর্মীয় হয়ে উঠতে পারে।

১৯৫০-এর দশকে এ. জে আয়ারের (১৯১০-৯১) মতো লজিক্যাল পজিটিভিস্টগণ প্রশ্ন তুলেছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখার কোনও অর্থ হয় কিনা। প্রকৃতি বিজ্ঞানসমূহ জ্ঞানের একমাত্র বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য উৎসের যোগান দিয়েছে, কারণ গবেষণাগারে তা পরীক্ষা করা যায়। ঈশ্বর আছেন কি নেই সে প্রশ্ন করতে যাননি আয়ার, বরং তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল ঈশ্বরের ধারণার কোনও অর্থ আছে কি না। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, কোনও বক্তব্যের সত্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করা না গেলে তা অর্থহীন। 'মঙ্গলে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে', বলাটা অর্থহীন নয়, কারণ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর এর যাচাই করার উপায় মিলবে বলে আমরা জানি। একইভাবে 'মহাকাশের বুড়ো মানুষে' বিশ্বাসী একজন সাধারণ মানুষও অর্থহীন কথা বলে না, যখন সে বলছে, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি', যেহেতু মৃত্যুর পর আমরা জানতে পারব কথাটা সত্যি না মিথ্যা। কিন্তু উন্নত ধরনের বিশ্বাসী সমস্যায় পড়ে যায় যখন সে বলে: 'আমরা বুঝতে পারব তেমন কোনও অর্থে ঈশ্বর অস্তিত্ববান নন।' কিংবা 'মানুষ যেভাবে মনে করে ঈশ্বর সেই অর্থে ভালো নন।' এসব বক্তব্য খুবই অস্পষ্ট; এসব পরীক্ষা বা যাচাই করা অসম্ভব, সুতরাং এগুলো অর্থহীন। আয়ার যেমন বলেছেন: 'আস্তিক্যবাদ খুবই বিভ্রান্তিময়, যেসব বাক্যে "ঈশ্বর" আবির্ভূত হন সেগুলো এত সঙ্গতিহীন এবং সত্য বা মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতাবিহীন যে মানা বা না মানা কিংবা বিশ্বাস করা বা না করার কথা বলা যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব।'[২] নাস্তিক্যবাদ আস্তিক্যবাদের মতোই দুর্বোধ্য ও অর্থহীন। ঈশ্বরের ধারণায় অস্বীকার বা সন্দেহ প্রকাশ করার মতো কিছু নেই।

ফ্রয়েডের মতো পজিটিভিস্টরা বিশ্বাস করেছেন, ধর্মীয় বিশ্বাস এক অপরিণত অবস্থার পরিচায়ক যা বিজ্ঞান অতিক্রম করবে। ১৯৫০-এর দশকের পর থেকে ভাষাবিদ্যাগত দার্শনিকরা লজিক্যাল পজিটিভিজমের সমালোচনা করে আসছেন, তাঁরা বলেছেন, আয়ার যাকে 'যাচাইয়ের নীতি' বলছেন সেটার

AMARBOI.COM

যাচাই অসাধ্য। বর্তমান যুগে কেবল ভৌত জগৎ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানে সক্ষম বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা অপেক্ষাকৃত কম আশাবাদী হতে পারি। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ উল্লেখ করেছেন, লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা নিজেদের এমন এক সময়ে বিজ্ঞানী হিসাবে তুলে ধরেছিলেন যখন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিজ্ঞান প্রকৃতিকে মানুষ হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখেছে।[৩] যেসব বক্তব্যের দিকে আয়ার ইঙ্গিত করেছেনা সেগুলো বিজ্ঞানের বস্তুগত সত্যের বেলায় খুবই কার্যকর, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট মানবীয় অনুভূতির পক্ষে মানানসই নয়। কবিতা ও সঙ্গীতের মতো ধর্ম এই ধরনের আলোচনা বা যাচাইয়ের উপযুক্ত নয়। অতি সম্প্রতি অ্যান্টনি ফ্লিউর মতো ভাষাবিজ্ঞানীরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় ব্যাখ্যার চেয়ে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা খোঁজাই বেশি যুক্তিপুর্ণ। প্রাচীন 'প্রমাণ' এখন আর কাজে আসছে নাঃ পরিকল্পনার যুক্তি অচল হয়ে যাচ্ছে, কেননা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী তাদের নিজস্ব নিয়মে নাকি বাহ্যিক কিছু দিয়ে অনুপ্রাণিত সেটা জানার জন্যে আমাদের গোটা ব্যবস্থার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন। আমরা 'অনিশ্চিত' বা 'ত্রুটিপূর্ণ সত্তা, ওই যুক্তি কিছু প্রমাণ করে না, যেহেতু সবসময়ই একটা ব্যাখ্যা থাকতে পারে যেটা পরম কিন্তু অতি প্রাকৃত নয়। ফয়েরবাখ, মার্ক্স বা অস্তিত্ববাদীদের চেয়ে কম আশাবাদী ফ্লিউ। কষ্টকর বা সগর্ব অস্বীকৃতি নয়, সামনে এগোনোর একমাত্র উপায় হচ্ছে যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি সহজ বাস্তব অঙ্গীকার।

AMARBOI.COM

আমরা অবশ্য দেখেছি যে, সকল ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্যে 'ঈশ্বরে'র দিকে তাকিয়ে থাকেনি। অনেকেই প্রমাণকে অবান্তর প্রসঙ্গ হিসাবে দেখেছে। বিজ্ঞান কেবল সেইসব পশ্চিমা ক্রিশ্চানের কাছেই হুমকি হিসাবে অনুভূত হয়েছে যারা ঐশীগ্রন্থকে আক্ষরিক অর্থে পাঠ করার ও বিভিন্ন মতবাদকে বাস্তব সত্য হিসাবে ব্যাখ্যা করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। যেসব বিজ্ঞানী ও দার্শনিক তাঁদের ব্যবস্থায় ঈশ্বরের কোনও স্থান খুঁজে পাননি, তাঁরা সাধারণত ঈশ্বরের ধারণাকে আদি কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন, যা মধ্যযুগে ইহুদি, মুসলিম ও গ্রিক অর্থডক্সরা পরিত্যাগ করেছে। অধিকতর অন্তস্থঃ ঈশ্বর-এর সন্ধান করেছে তারা, যিনি সবার জন্যে এক রকম, তাঁকে কোনও বস্তুগত সত্য হিসাবে প্রমাণ করা যাবে না। তাঁকে বুদ্ধদের নির্বাণের মতোই বিশ্বজগতের ভৌত ব্যবস্থায় চিহ্নিত করা যাবে না।

ভাষাবিদ্যাগত দার্শনিকদের চেয়ে আরও নাটকীয় হচ্ছে ১৯৬০-এর দশকের চরমপন্থী ধর্মবিদ যারা সোৎসাহে নিৎশেকে অনুসরণ করে ঈশ্বরের প্রয়াণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। *দ্য গস্পেল অভ ক্রিশ্চান অ্যাথিজম* (১৯৬৬)-এ টমাস জে. অ্যান্টাইযার দাবি করেন, ঈশ্বরের মৃত্যুর 'শুভ সুসংবাদ' আমাদের এক স্বৈরাচারী দুর্জ্ঞেয় উপাস্যের দাসত্ব হতে মুক্ত করেছে: 'একমাত্র আমাদের

অনুভূতিতে ঈশ্বরের মৃত্যু মেনে নিয়ে, এমনকি কামনা করার মাধ্যমেই আমরা এক দুর্জ্ঞেয় অজানা, এক অজানা অচেনা থেকে মুক্তি পেতে পারি যা ক্রাইস্টের মাঝে ঈশ্বরের আত্মবিচ্ছিন্নতার ফলে শূন্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।'[৪] অ্যাল্টাইযার অতিন্দ্রীয় ভাষায় আত্মার অন্ধকার রাত ও পরিত্যাগের বেদনার কথা বলেছেন। ঈশ্বরের মৃত্যু সেই নীরবতার কথা বলে যা ঈশ্বরের আবার অর্থবহ হয়ে ওঠার আগে প্রয়োজন ছিল। ধর্মতত্ত্বের পুনর্জন্মের জন্যে ঈশ্বর সম্পর্কিত আমাদের সকল ধারণার মৃত্যু ঘটতে হবে। আমরা সবাই এমন এক ভাষা ও ভঙ্গির অপেক্ষায় আছি যেখানে ঈশ্বর আরও একবার এক সম্ভাবনা হয়ে উঠবেন। অ্যাল্টাইযারের ধর্মতত্ত্ব অন্ধকার ঈশ্বরহীন পৃথিবীর প্রতি আঘাত সৃষ্টিকারী এক আবেগময় দাম্ভিকতা, যার প্রত্যাশা যে জগৎ তার গোপনীয়তা ত্যাগ করবে। পল ভ্যান বুরেন ছিলেন আরও স্পষ্ট এবং যৌক্তিক। *দ্য সেক্যুলার মীনিং অভ দ্য গস্পেল* (১৯৬৩)-এ তিনি দাবি করেন, এখন আর পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল ঈশ্বরের কথা বলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রাচীন পুরাণকে অচল করে দিয়েছে। আকাশের বুড়ো মানুষের ওপর সহজ বিশ্বাস একেবারেই অসম্ভব, কিন্তুধর্মবিদদের অধিকতর উন্নত বিশ্বাসও তাই। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নাযারেথের জেসাসকে আঁকড়ে ধরতে হবে। গস্পেল এক মুক্তপুরুষের সুসমাচার যিনি অন্যদেরও মুক্তি দিয়েছিলেন। নাযারেথের জেসাসই ছিলেন মুক্তিদাতা, যিনি মানুষ বলতে যা বোঝায় তার সংজ্ঞা দিয়েছেন।'[৫]

*রেডিক্যাল থিওলজি অ্যান্ড দ্য ডেথ অভ গড* (১৯৬৬)-এ উইলিয়াম হ্যামিল্টন উল্লেখ করেছেন যে, এ ধরনের ধর্মতত্ত্বের শেকড় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে সবসময়ই এক ধরনের ইউটোপিয় ঝোঁক ছিল এবং নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য ছিল না। ঈশ্বরের মৃত্যুর ইমেজারি প্রযুক্তির যুগের বর্বরতা ও উন্মূল অবস্থাকে তুলে ধরে যা পুরোনো কায়দায় বাইবেলের ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব করে তুলেছে। এই ধর্মতাত্ত্বিক ভাবনাকে হ্যামিল্টন বিংশ শতাব্দীতে প্রটেস্ট্যান্ট হবার উপায় হিসাবে দেখেছেন। লুথার মঠ ছেড়ে জগতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একইভাবে তিনি ও অন্য ক্রিশ্চান চরমপন্থীরাও ঘোষিত সেক্যুলার ছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের আবাস পবিত্র স্থান থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রযুক্তি, ক্ষমতা, যৌনতা, অর্থ ও নগরীর পড়শীদের মাঝে মানুষ জেসাসের সন্ধান করেছেন। আধুনিক সেক্যুলার মানুষের ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল না। হ্যামিল্টনের মনে কোনও ঈশ্বর-আকৃতি গহবর ছিল না। এই পৃথিবীতেই তিনি তাঁর সমাধান খুঁজে পাবেন।

ষাটের দশকের এই প্রাণবন্ত আশাবাদে একটা কিছু কিন্তু রয়েছে। অবশ্যই চরমপন্থীরা ঠিকই বলেছিল যে, অনেকের বেলাতেই অতীতের ভাষায়

AMARBOI.COM

ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে এই মুক্তি ও এক নতুন ভোরের সম্ভাবনা অনুভব দুঃখজনকভাবে কঠিন হয়ে পড়েছে। এমনকি সময়ে সময়ে ঈশ্বরের মৃত্যুর সমর্থক ধর্মবিদরা সমালোচিত হয়েছেন, কেননা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছল, মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের। জেমস এইচ. কোনের মতো কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মবিদরা জানতে চেয়েছেন শ্বেতাঙ্গরা যেখানে নিজেরাই ঈশ্বরের নামে আসলে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি করে রেখেছে সেখানে কী করে তারা ঈশ্বরের মৃত্যুর ফলে তাদের মুক্তি নিশ্চিত করার অধিকার আছে মনে করে। ইহুদি ধর্মবিদ রিচার্ড রুবেনস্তাইন নাৎসি হলোকাস্টের পর এত তাড়াতাড়ি কীভাবে তারা ঈশ্বরহীন মানুষ সম্পর্কে এতটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে পারছে বুঝতে পারেননি। তিনি স্বয়ং বিশ্বাস করেছেন যে, ইতিহাসের ঈশ্বর হিসাবে গৃহীত উপাস্য অশৎউইযেই চিরদিনের জন্যে পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু তারপরেও রুবেনস্তাইন ভাবতে পারেননি যে ইহুদিরা ধর্মকে বাদ দিতে পারবে। ইউরোপিয় ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রায় বিলুপ্তির পর অবশ্যই তাদের অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। অবশ্য উদারপন্থী ইহুদিবাদের চমৎকার নীতিবান ঈশ্বর সঠিক ছিলেন না। ইনি বড় বেশি খুঁতহীন, জীবনের দুঃখকষ্টকে অগ্রাহ্য করে করেছেন; ধরে নিয়েছেন জগতের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। রুবেনস্তাইন বরং ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বরকে পছন্দ করতেন। ইসাক লুরিয়ার *তমিসতসুম*–সৃষ্ট জগতকে অস্তিত্ব দানকারী ঈশ্বরের স্বেচ্ছা-আত্মবিচ্ছিন্নকরণের মতবাদ–এ আলোড়িত হয়েছিলেন তিনি। সকল অতিন্দ্রীয়বাদী ঈশ্বরকে 'কিছু না' হিসাবে দেখেছে, যেখান থেকে আমরা এসেছি এবং আবার যেখানে ফিরে যাব। রুবেনস্তাইন সার্ত্রের সঙ্গে সায় দিয়েছেন যে, জীবন শূন্য; অতিন্দ্রীয়বাদী ঈশ্বরকে মানুষের এই শূন্যতার অনুভূতিতে প্রকাশ করার কল্পনানির্ভর উপায় হিসাবে দেখেছেন তিনি।[৬]

অন্য ইহুদি ধর্মবিদরাও লুরিয়ার কাব্বালায় স্বস্তির সন্ধান লাভ করেছেন। হান্স জোনাস বিশ্বাস করেন যে, অশৎউইযের পর আমরা আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারি না। ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় স্বেচ্ছায় নিজেকে সীমিত করেছেন ও মানুষের দুর্বলতার অংশীদার হয়েছেন। এখন আর তাঁর কিছুই করার নেই। মানুষকে অবশ্যই প্রার্থনা ও তোরাহ্‌র মাধ্যমে গডহেড ও পৃথিবীর পূর্ণতা ফিরিয়ে দিতে হবে। অবশ্য ব্রিটিশ ধর্মতাত্ত্বিক লুই জ্যাকবস *তমিসতসুম*-এর ইমেজকে কর্কশ ও মানবরূপী বলে ধারণাটিকে অপছন্দ করেন: এটা বড় বেশি আক্ষরিকভাবে ঈশ্বর *কীভাবে* পৃথিবী সৃষ্টি করলেন সে প্রশ্ন তুলতে উৎসাহিত করে। ঈশ্বর নিজেকে সীমিত করেন না, শ্বাস ত্যাগের আগে, যেমন বলা হয়েছে, শ্বাস বন্ধ করে রাখেন না। একজন অক্ষম ঈশ্বর

অকেজো, তিনি মানুষের অস্তিত্বের অর্থ হতে পারেন না। বরং ঈশ্বর মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তাঁর চিন্তাধারা ও কৌশল আমাদের মতো নয়—এই ধ্রুপদী ব্যাখ্যায় ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। ঈশ্বর বোধের অতীত হতে পারেন, কিন্তু অর্থহীনতার মাঝেও মানুষের সেই অনিবর্চনীয় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার এবং একটা অর্থ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিদ হান্স কুঙ জ্যাকবসের সঙ্গে একমত, *তমিসতসুম*-এর চমকপ্রদ মিথের চেয়ে ট্র্যাজিডির অধিকতর যৌক্তিক ব্যাখ্যা বেছে নিয়েছেন তিনি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, একজন দুর্বল ঈশ্বরে মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারে না, বরং একজন জীবিত ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, যিনি অশৎউইযে মানুষকে প্রার্থনা করার শক্তি যুগিয়েছিলেন।

এখনও কিছু মানুষ ঈশ্বরের ধারণার অর্থ খুঁজে পায়। সুইস ধর্মতাত্ত্বিক কার্ল বার্থ (১৮৮৬-১৯৬৮) শ্লেইয়ারম্যাশারের ধর্মীয় অনুভূতির ওপর গুরুত্ব দানসহ উদার প্রটেস্ট্যানিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তিনি প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বেরও অগ্রণী বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করেছেন, যৌক্তিক ভাষায় ঈশ্বরের ব্যাখ্যা চাওয়া মানব মনের সীমাবদ্ধতার কারণে নয়, বরং 'পতনের' ফলে মানুষ অপবিত্র হয়ে গেছে বলে। সুতরাং আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে যেকোনও প্রাকৃতিক ধারণাই খুঁজে বের করি না কেন তা ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য আর এমন একজন ঈশ্বরের উপাসনা বহু-ঈশ্বরবাদীতারই সামিল। ঈশ্বর-জ্ঞানের একমাত্র বৈধ উৎস হচ্ছে বাইবেল। এটা যেন বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ: অভিজ্ঞতাবাদ, প্রাকৃতিক যুক্তিবাদ; মানুষের মন অপবিত্র ও অবিশ্বস্ত এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাস থেকে শেখার কোনও সম্ভাবনা নেই, কেননা বাইবেল একমাত্র বৈধ প্রত্যাদেশ। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতায় ঐশীগ্রন্থের সত্যতা সম্পর্কে সমালোচনাহীন গ্রহণযোগ্যতাসহ এ রকম চরম সংশয়বাদের সমন্বয় অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়।

AMARBOI.COM

পল টিলিচ (১৮৬৮-১৯৬৫) বিশ্বাস করতেন যে, পাশ্চাত্যের আস্তিক্যবাদের ব্যক্তিক ঈশ্বরকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে, আবার তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মানবজাতির জন্যে ধর্মের প্রয়োজন। গভীর উদ্বেগ মানবীয় অবস্থার অংশ: এটা মানসিক বৈকল্য নয়, কেননা এটা অনেপনীয় ও কোনও চিকিৎসাতেই নিরাময়যোগ্য নয়। আমরা আমাদের দেহকে ক্রমান্বয়ে অথচ অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্ষয়ে যেতে দেখে অবিরাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার আতঙ্ক আর শঙ্কায় থাকি। টিলিচ নিৎশের সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, ব্যক্তিক ঈশ্বর একটি ক্ষতিকর ধারণা এবং মরণই তাঁর প্রাপ্য:

> স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহে হস্তক্ষেপকারী 'ব্যক্তিক ঈশ্বরের' ধারণা, কিংবা 'স্বাভাবিক ঘটনাবলীর স্বাধীন কারণ' হিসাবে ঈশ্বরের ধারণা ঈশ্বরকে

> অন্যান্য বস্তুর পাশাপাশি আরেকটি বস্তুতে, সত্তাসমূহের মাঝে একটা সত্তায় পরিণত করে, হতে পারে সর্বোত্তম, কিন্তু তারপরেও একটি সত্তা। এটা প্রকৃতপক্ষে কেবল ভৌত ব্যবস্থারই বিনাশ নয় বরং ঈশ্বরের কোনও অর্থপূর্ণ ধারণারও বিনাশ।[7]

সারাক্ষণ বিশ্বকে মেরামতে ব্যস্ত একজন ঈশ্বর অসম্ভব; মানুষের স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতায় হস্তক্ষেপকারী একজন ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারী। ঈশ্বরকে যদি তাঁর আপন জগতে একটি সত্তা হিসাবে, একটি সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত অহম, কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি কারণ হিসাবে দেখা হয়, তিনি তাহলে খোদ সত্তা নন। একজন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাত স্বৈরাচারী পার্থিব স্বৈরশাসকদের চেয়ে ভিন্ন কিছু নন তিনি, যারা সমস্ত কিছুকে, সবাইকে তাদের নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের পরিণতি করে থাকেন। এ রকম একজন ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যানকারী নাস্তিক্যবাদ যথার্থই যুক্তিসঙ্গত।

এর বদলে আমাদের এই ব্যক্তিক ঈশ্বরের উর্ধ্বে এক 'ঈশ্বরের' সন্ধান করা উচিত। এখানে নতুন কিছু নেই। বাইবেলের কাল থেকেই আস্তিকরা তাদের উপাস্য ঈশ্বরের বৈপরীত্যমূলক রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিল, তারা জানত অত্যাবশ্যকীয় আন্তব্যক্তিক ঐশ্বরিকতাই ব্যক্তি ঈশ্বরের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। প্রতিটি প্রার্থনাই একেকটি স্ববিরোধিতা, কেননা তা এমন কারও সঙ্গে কথা বলার প্রয়াস যাঁর সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব; এর মাধ্যমে এমন কারও আনুকূল্য চাওয়া হয় যিনি প্রার্থনার আগেই হয় তা দান করেছেন বা করেননি; এটা এমন এক ঈশ্বরকে 'তুমি' বলে, যিনি খোদ সত্তা হিসাবে আমাদের অহমের চেয়েও 'আমি'র অধিক কাছাকাছি। টিলিচ অস্তিত্বের মূল হিসাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞাকে বেছে নিয়েছেন। 'ঈশ্বরে'র উর্ধ্বে এমন ঈশ্বরে অংশগ্রহণ জগৎ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে না, বরং বাস্তবতায় নিমজ্জিত করে। এটা আমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। খোদ-সত্তা সম্পর্কে কথা বলার সময় মানুষকে প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়; এর সম্পর্কে আক্ষরিক বা বাস্তবভিত্তিক কথা বলা ভুল ও অসত্য। শত শত বছর ধরে 'ঈশ্বর, কর্তৃত্ব' 'অমরত্ব' প্রতীকগুলো মানুষকে জীবনের আতঙ্ক ও মৃত্যুর ভয়াবহতা বহনে সক্ষম করে তুলেছে, কিন্তু এসব প্রতীক যখন তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন দেখা দেয় ভয় আর সন্দেহ। যারা এই শঙ্কা ও উদ্বেগের মুখোমুখি হয়েছে তাদের উচিত প্রতীকী শক্তি হারিয়ে ফেলা আস্তিক্যবাদের মর্যাদারহিত 'ঈশ্বরে'র উর্ধ্বের ঈশ্বরের সন্ধান করা।

সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় টিলিচ কৌশলগত পরিভাষা 'অস্তিত্বের মূলকে' 'পরম বিষয়' দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে পছন্দ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এই 'ঈশ্বরের উর্ধ্বে ঈশ্বরে' বিশ্বাস

AMARBOI.COM

রাখার মানবীয় অনুভূতি আমাদের আবেগ বা বুদ্ধিবৃত্তিক বোধের অন্যান্য অবস্থা থেকে পৃথকযোগ্য কোনও বিশেষ অবস্থা নয়। আপনি বলতে পারবেন না যে, 'আমি এখন এক বিশেষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ করছি,' কেননা ঈশ্বর, যিনি সত্তা ও আমাদের সকল সাহস, আশা ও নিরাশার পূর্বগামী  ও মূল ভিত্তি। এটা কোনও নাম বিশিষ্ট সুস্পষ্ট কোনও অবস্থা নয় বরং তা আমাদের স্বাভাবিক মানবীয় অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। শত বৎসর আগে ঈশ্বর স্বাভাবিক মানবীয় মনস্তত্ত্ব হতে অবিচ্ছেদ্য বলে অনুরূপ দাবি করেছিলেন ফয়েরবাখ। এবার এই নাস্তিক্যবাদ এক নতুন আস্তিক্যবাদে পরিণত হয়েছে।

উদারপন্থী ধর্মতাত্ত্বিকরা একাধারে বিশ্বাস রাখা ও আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক পৃথিবীতে বাস সম্ভব কি না আবিষ্কার করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন ধারণা সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা অপরাপর শাস্ত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন: বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান ও অন্যান্য ধর্ম। আবার, এই প্রচেষ্টায় নতুন কিছু ছিল না। আলেকজান্দ্রিয়ার অরিগেন এবং ক্লিমেন্ট এই অর্থে তৃতীয় শতাব্দীর উদারপন্থী ক্রিশ্চান ছিলেন, যখন তাঁরা ইয়াহওয়েহর সেমিটিক ধর্মে প্লেটোনিজম প্রয়োগ করেছেন। এবার জেস্যুইট পিয়েরে তিলহার্দ (১৮৮১-১৯৫১) ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানকে মেশালেন। তিনি প্রাগৈতিহাসিক জীবনে বিশেষভাবে আগ্রহী প্যালিওন্টোলজিস্ট ছিলেন; নিজ বিবর্তনবাদের উপলব্ধিকে এক নতুন ধর্মতত্ত্ব প্রণয়নে ব্যবহার করেছেন। গোটা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে তিনি এক ঐশীশক্তি হিসাবে দেখেছেন যা বিশ্বজগতকে বস্তু থেকে আত্মা, তারপর ব্যক্তি ও সবশেষে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত করেছে। ঈশ্বর পৃথিবীতে সর্বব্যাপী এবং অবতার, যা তাঁর সত্তার স্যাক্রামেন্টে পরিণত হয়েছে। দে শার্দিন মত প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ জেসাসের প্রতি মনোনিবেশ করার বদলে ক্রিশ্চানদের উচিত কলোসিয় ও এফিসিয়দের উদ্দেশে লেখা পলের চিঠির ক্রাইস্টের কসমিক পোর্ট্রেট গড়ে তোলা: এই দৃষ্টিকোণে ক্রাইস্ট ছিলেন বিশ্বজগতের 'ওমেগা পয়েন্ট,' বিবর্তন প্রক্রিয়ার ক্লাইমেক্স, যখন সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন  ঈশ্বর। ঐশীগ্রন্থ আমাদের বলে যে, ঈশ্বরই ভালোবাসা আর বিজ্ঞান দেখায় যে, প্রাকৃতিক জগৎ বৃহৎ জটিলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই বৈচিত্র্যের মাঝেই বৃহৎ ঐক্যের অভিসারী। পার্থক্যের মাঝে এই ঐক্য সমগ্র সৃষ্টিকে সচল করে তোলা ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করার আরেকটি উপায়। ঈশ্বরকে জগতের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিয়ে ফেলায় এর সকল দুর্জ্ঞেয়তার অনুভূতি হারিয়ে যাওয়ায়  দে শার্দিনের সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর এই জাগতিক ধর্মতত্ত্ব ছিল প্রায়শঃ ক্যাথলিক আধ্যাত্মিকতাকে বৈশিষ্ট্যয়িতকারী contemptus mundi হতে এক কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

AMARBOI.COM

১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড্যানিয়েল ডে উইলিয়ামস (জন্ম. ১৯১০) প্রসেস থিওলজি নামে পরিচিত ধর্মতত্ত্বের আবিষ্কার করেন। এখানেও জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি ঈশ্বরকে জাগতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে দেখা ব্রিটিশ দার্শনিক এ. এ. হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭) দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হোয়াইটহেড স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরাসক্ত আরেকটি সত্তা হিসাবে ঈশ্বরের অর্থহীনতা প্রমাণে সফল হয়েছিলেন। তবে ঈশ্বরের গুণাবলী সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন তিনিঃ

> আমি নিশ্চিত যে সত্তার চলমান সমাজে অংশগ্রহণ করার ফলে ঈশ্বর কষ্টভোগ করেন। জাগতিক ভোগান্তিতে তাঁর অংশ গ্রহণ এই পৃথিবীতে সৃষ্ট দুঃখ কষ্টকে জানা, গ্রহণ করা ও তাকে ভালোবাসায় রূপান্তরিত করার সর্বোত্তম উদাহরণ। আমি ঐশী সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করছি। এটা ছাড়া আমি ঈশ্বরের সত্তার কোনও অর্থ খুঁজে পাই না।[৮]

ঈশ্বরকে তিনি 'মহান সঙ্গী, সতীর্থ কষ্টভোগকারী, যিনি বোঝেন' এভাবে বর্ণনা করেছেন। উইলিয়ামস্ হোয়াইটহেডের সংজ্ঞা পছন্দ করেছিলেন; ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলার সময় তাঁকে জগতের 'আচরণ' বা কোনও 'ঘটনা'[৯] হিসাবে বর্ণনা করতে চাইতেন তিনি। আমাদের বোধের প্রাকৃতিক জগতের ঊর্ধ্বে অতিপ্রাকৃত ব্যবস্থাকে স্থাপন করা ভুল। অস্তিত্বের কেবল একটা ব্যবস্থাই ছিল। এটা অবশ্য রিডাকশনিস্ট ধারণা নয়। আমাদের প্রকৃতির ধারণায় এক সময় অলৌকিক বলে মনে হওয়া সকল আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখানে আমাদের 'ধর্মীয় অনুভূতি'কে আনতে হবে, বৌদ্ধরা যেমন সবসময় করে এসেছে। তাঁর ভাবনায় ঈশ্বর প্রকৃতি হতে আলাদা কিনা জানতে চাওয়া হলে উইলিয়ামস্ বলতেন, তিনি নিশ্চিত নন। তিনি অ্যাপাথিয়ার প্রাচীন গ্রিক ধারণাকে ঘৃণা করতেন, একে প্রায় ব্লাসফেমাস মনে করেছেন তিনিঃ এটা ঈশ্বরকে দূরবর্তী, উদাসী ও স্বার্থপর হিসাবে তুলে ধরেছে। সর্বেশ্বরবাদের প্রচারণা করার কথা অস্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর ধর্মতত্ত্ব স্রেফ অৎশউইয ও হিরোশিমার ঘটনার পর অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা এক বিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের ভারসাম্যহীনতা দূর করার প্রয়াস ছিল।

অন্যরা আধুনিক পৃথিবীর সাফল্যের ব্যাপারে কম আশাবাদী রয়ে গিয়েছে এবং নারী-পুরুষের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এক দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে বহাল রাখতে চেয়েছে। জেস্যুইট কার্ল রাহনার অধিকতর দুর্জ্ঞেয়মূলক ধর্মতত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন, যা ঈশ্বরকে চূড়ান্ত রহস্য ও জেসাসকে মানুষের সম্ভাবনার চরম

AMARBOI.COM

প্রকাশ হিসাবে দেখে। বার্নার্ড লনারগানও অনুভূতির বিপরীতে দুর্জ্ঞেয়তা ও চিন্তার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। স্বাধীন বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষিত দর্শন খুঁজে পায় না; এটা ক্রমাগত আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন দাবি করে এমন উপলব্ধির বাধার মুখোমুখি হচ্ছে। সকল সংস্কৃতিতেই মানুষ একই রকম তাগিদে তাড়িত হয়ে আসছেঃ বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল, যুক্তিবান, প্রেমময় ও প্রয়োজনে পরবর্তিত হতে হবে। সুতরাং মানুষের মৌল চরিত্র নিজেকে এবং আমাদের প্রচলিত ধারণাকে ছড়িয়ে যাবার দাবি করে; এই নীতি মানুষের আন্তরিক অনুসন্ধানী প্রকৃতিতে ঐশী হিসাবে আখ্যায়িত সত্তায় ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু তারপরেও সুইস ধর্মতাত্ত্বিক হান্স উরস ফন বালতাসার বিশ্বাস করেন, যুক্তি ও বিমূর্ততায় ঈশ্বরকে খোঁজার বদলে আমাদের শিল্পকলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত; ক্যাথলিক প্রত্যাদেশ আবশ্যিকভাবে অবতারমূলক। দান্তে ও বোনাভেঞ্চারের ওপর অসাধারণ গবেষণায় বালতাসার দেখিয়েছেন, ক্যাথলিকরা ঈশ্বরকে মানবরূপে 'দেখেছে'। ধর্মীয় আচার ও নাটকের অঙ্গভঙ্গিতে সৌন্দর্যের ওপর গুরুত্ব দান ও শ্রেষ্ঠ ক্যাথলিক শিল্পীদের সৌন্দর্য চেতনা ইঙ্গিত দেয় ঈশ্বরকে অনুভূতি দিয়ে পাওয়া যাবে, মানুষের অধিকতর বৌদ্ধিক ও বিমূর্ত অংশ দিয়ে নয়।

মুসলিম এবং ইহুদিরাও বর্তমানের সঙ্গে মানানসই ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা আবিষ্কারের লক্ষ্যে অতীতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য পাকিস্তানি ধর্মতাত্ত্বিক আবু আল কালাম আজাদ (মৃত্যু. ১৯৫৯) এমন এক ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোরানের আশ্রয় নিয়েছেন যিনি এমন দুর্জ্ঞেয় নন যে একেবারে অকার্যকর হয়ে গেছেন বা এতটা ব্যক্তিক নন যে মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। তিনি কোরানের আলোচনার প্রতীকী ধরনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, একদিকে রূপক, মূর্ত এবং নরত্বমূলক বর্ণনার ভারসাম্যের কথা উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে আবার ঈশ্বর যে তুলনার অযোগ্য বারবার সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। অন্যরা জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের ধারণা পেতে সুফীদের কাছে ফিরে গেছে। সুইস সুফী ফ্রিসিয়ক শুয়োন পরবর্তীকালে ইবন আল-আরাবীর নামে খ্যাত সত্তার একত্ব মতবাদের (*ওয়াহ্য়দাত আল উজ্যুদ*) পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে যে যেহেতু ঈশ্বরই *একমাত্র* বাস্তবতা, তিনি ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং খোদ এই জগৎ যথার্থভাবেই ঐশ্বরিক। এটা একটা নিগূঢ় সত্যি এবং সুফীদের অতিন্দ্রীয়বাদী অনুশীলনের পটভূমিতেই অনুধাবন করা যেতে পারে, একথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন।

অন্যরা ঈশ্বরকে মানুষের আরও নিকটবর্তী ও সময়ের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন। ইরানি বিপ্লবের পূর্ববর্তী

বছরগুলোয় তরুণ দার্শনিক ডক্টর আলি শরিয়তি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে ব্যাপক শ্রোতা টানতে সক্ষম হন। তিনিই মূলত শাহর বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ করায় ভূমিকা রেখেছিলেন, যদিও মোল্লাহরা তাঁর ধর্মীয় বাণীর অনেক কিছুই অনুমোদন করেননি। বিক্ষোভের সময় জনতা আয়াতোল্লাহ খোমিনীর ছবির পাশাপাশি তাঁর ছবিও বহন করত, যদিও এটা পরিষ্কার ছিল না যে খোমিনির ইরানে তাঁর অবস্থান কী হবে। শরিয়তি মনে করেছিলেন, পাশ্চাত্যকরণের ফলে মুসলিমরা তাদের সাংস্কৃতিক শেকড় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে: এই অসঙ্গতি দূর করার জন্যে তাদের অবশ্যই ধর্ম বিশ্বাসের প্রাচীন প্রতীকসমূহকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হবে। মুহাম্মদ (স) প্রাচীন পৌত্তলিক আচার হজ্জকে একেশ্বরবাদে প্রাসঙ্গিকতা দেওয়ার সময় ঠিক এ কাজটি করেছিলেন। নিজের লেখা গ্রন্থ *হজ্জ*-এ শরিয়তি তাঁর পাঠককে তীর্থ যাত্রার মাধ্যমে মক্কায় নিয়ে গেছেন, আস্তে আস্তে ঈশ্বরের এক গতিময় ধারণা তুলে ধরেছেন প্রত্যেক তীর্থযাত্রী নারী ও পুরুষকে কাল্পনিকভাবে যাঁকে নিজের জন্যে সৃষ্টি করতে হয়। এভাবেই কাবাহ্য় পৌঁছার পর তীর্থযাত্রীরা উপলব্ধি করতে পারে উপাসনা গৃহ খালি থাকাটা কত মানানসই: 'এটা তোমার চূড়ান্ত গন্তব্য নয়; কাবাহ্ একটি নিদর্শন, এটা কেবল তোমাকে দিক চিনিয়ে দেয় যাতে পথ হারিয়ে না যায়।'[১০] কাবাহ্ ঈশ্বর সম্পর্কে সকল মানবীয় প্রকাশকে অতিক্রম করার গুরুত্বের সাক্ষ্য, যেগুলো অবশ্যই শেষ কথায় পরিণত হতে পারবে না। কাবাগৃহ সাজসজ্জা বা জাঁকজমকহীন একটা সাধারণ বর্গাকৃতি ঘর কেন? কারণ এটা 'বিশ্ব জগতে ঈশ্বরের রহস্য তুলে ধরে: ঈশ্বর নিরাকার, বর্ণহীন, রূপহীন, মানুষ যে রকম আকার বা অবস্থাই বেছে নিক না কেন, দেখুক বা কল্পনা করুক, তা ঈশ্বর নয়।'[১১] খোদ *হজ্জ* উত্তর ঔপনিবেশিক আমলে অসংখ্য ইরানির বিচ্ছিন্নতা বোধে এক অ্যান্টিথিসিস। এটা প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ববাদী যাত্রা তুলে ধরে যারা তাদের জীবনকে ঘুরিয়ে নিয়ে অনির্বচনীয় ঈশ্বরের দিকে স্থাপন করছে। শরিয়তির অ্যাকটিভিস্ট বিশ্বাস বিপজ্জনক ছিল: শাহর গুপ্ত পুলিশ নির্যাতন চালানোর পর তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কার করে; ১৯৭৭ সালে লন্ডনে তাঁর মৃত্যুর জন্যে সম্ভবত তারাই দায়ী।

মার্টিন বুবের (১৮৭৮-১৯৬৫) এরও আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া ও মৌল ঐক্যের প্রয়াস হিসাবে অনুরূপ গতিময় দর্শন ছিল। ধর্ম এক ব্যক্তিক ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটা ব্যাপার যা প্রায় সব সময় অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের সময় ঘটে। দুটো বলয় রয়েছে; একটি হচ্ছে স্থান ও কালের পরিধি যেখানে আমরা বিষয় ও বস্তু হিসাবে–আমি–এটা–অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হই। দ্বিতীয় জগতে আমরা অন্যের সঙ্গে তাদের প্রকৃত সত্তায় সম্পর্কিত হই, তাদেরকে তাদের মাঝেই চূড়ান্তরূপে দেখি। এটা 'আমি-তুমি'র

AMARBOI.COM

জগৎ যা ঈশ্বরের সত্তাকে প্রকাশ করে। জীবন ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তহীন এক সংলাপ, যা আমাদের মুক্তি বা সৃজনশীলতাকে ব্যাহত করে না, যেহেতু ঈশ্বর কখনও আমাদের কাছে তিনি কী চান বলেন না। আমরা তাঁকে কেবল একটা সত্তা ও আজ্ঞা হিসাবে অনুভব করি এবং আমাদের নিজেদের স্বার্থেই অর্থ খুঁজে বের করার প্রয়োজন হয়। এর অর্থ ছিল অধিকাংশ ইহুদি ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ। প্রচলিত টেক্সটের বুবেরের ব্যাখ্যা প্রায়শঃই প্রশ্ন সাপেক্ষ। ক্যান্টিয়ান হিসাবে তোরাহ্ পাঠের অবকাশ ছিল না বুবেরের। একে তিনি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী হিসাবে দেখেছেন: ঈশ্বর কোনও আইন প্রণয়নকারী নন! 'তুমি-আমি' সাক্ষাতের অর্থ মুক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততা, অতীতের কোনও ঐতিহ্যের ভার নয়। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ইহুদি আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে *মিতযভোত* আর এখানেই ইহুদিদের চেয়ে ক্রিশ্চানদের কাছে বুবেরের বেশি জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

বুবের উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'ঈশ্বর' শব্দটি কলঙ্কিত, অবনমিত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁকে বাদ দিতে অস্বীকার গেছেন তিনি। এটার সমান একটা শব্দ কোথায় পাব আমি, একই সত্তাকে বর্ণনা করার জন্যে? এর রয়েছে ব্যাপক এবং জটিল অর্থ ও অসংখ্য পবিত্র সম্পর্ক। যারা 'ঈশ্বর' শব্দটি প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে কেননা এর নামে ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

> 'শেষ বস্তুসমূহ' সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বনের প্রস্তাব রাখার কারণ বোঝাটা সহজ, যাতে অপব্যবহৃত শব্দসমূহ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এটা মুক্তি পাওয়ার উপায় নয়। আমরা 'ঈশ্বর' শব্দটিকে পরিষ্কার করতে পারব না, একে সমগ্রতেও পরিণত করতে পারব না। কিন্তু কলঙ্কিত ও ক্ষতবিক্ষত হলেও একে আমরা আবার মাটি থেকে তুলতে পারব এবং একে প্রবল দুঃখের সময় আকাশে স্থাপন করতে পারব।'[১২]

অন্যান্য যুক্তিবাদীর বিপরীতে বুবের মিথের বিপক্ষে ছিলেন না: স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গের পৃথিবীতে আটকা পড়ে যাওয়ার লুরিয় মিথ তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত মনে হয়েছে। গডহেড হতে স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছেদ মানুষের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তুলে ধরে। আমরা যখন অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত হই, তখন আদি ঐক্য পুনঃস্থাপিত হয়, জগতে বিচ্ছিন্নতা হ্রাস পায়।

বুবের যেখানে বাইবেল ও হাসিদবাদের শরণ নিয়েছেন সেখানে আব্রাহাম জোশুয়া হেশেল (১৯০৭-৭২) ফিরে গেছেন র‍্যাবাই ও তালমুদের চেতনায়।

বুবেরের বিপরীতে তাঁর বিশ্বাস ছিল *মিতযভোত* আধুনিকতর মানুষের মর্যাদা হানিকর দিকগুলোর মোকাবিলায় ইহুদিদের সাহায্য করবে। এসব কর্মকাণ্ড তাদের নয় বরং ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করে। ব্যক্তিত্ব হরণ ও শোষণ আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছেঃ এমনকি ঈশ্বরকে পর্যন্ত এমন একটা বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে যাঁকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায়। আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের উপায়ে পরিণত হয়েছেন তিনি। পরিণামে ধর্ম একঘেয়ে ও নিরস হয়ে গেছে; উপরিকাঠামোর ভেতরে কাজ করার জন্যে আমাদের দরকার এক 'গভীর ধর্মতত্ত্ব' এবং আদি ভীতি, রহস্য আর বিস্ময় ফিরিয়ে আনা। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা চালানো অর্থহীন। ঈশ্বরে বিশ্বাস এমন এক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হতে জাগ্রত হয় যার সঙ্গে ধারণা বা যৌক্তিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। যদি সেই পবিত্রতার অনুভূতি অনুভব করতে হয় তাহলে কবিতার মতো অবশ্যই রূপকার্থে বাইবেল পাঠ করতে হবে। *মিতয্ভোত*কে এক প্রতীকী ভঙ্গি হিসাবে দেখতে হবে যা আমাদের ঈশ্বরের সত্তায় বাস করার তালিম দেয়। প্রতিটি *মিতয্ভোত* জাগতিক জীবনে ছোটখাট পরিসরে সাক্ষাতের একেকটি স্থান; কোনও শিল্পকর্মের মতো *মিতযভোত*-এর জগতের নিজস্ব যুক্তি ও ছন্দ রয়েছে। সর্বোপরি, আমাদের একটা বিষয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন যে, ঈশ্বরের মানবজাতির প্রয়োজন রয়েছে। তিনি দার্শনিকদের দূরবর্তী ঈশ্বর নন, বরং পয়গম্বরদের বর্ণিত করুণাময় ঈশ্বর।

নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরাও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে এসে ঈশ্বরের ধারণায় আকর্ষণ বোধ করেছেন। *বিইং অ্যান্ড টাইম* (১৯২৭)-এ মার্টিন হেইদেগার (১৮৯৯-১৯৭৬) অনেকটা টিলিচের মতো সত্তাকে দেখেছেন, যদিও তাঁকে ক্রিশ্চান অর্থে 'ঈশ্বর' বলে স্বীকার করতে চাননি, এটা সত্তাসমূহ হতে আলাদা ও চিন্তার স্বাভাবিক ধরণ থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন। কোনও কোনও ক্রিশ্চান হেইদেগারের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছে, যদিও নাৎসি শাসকদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এই মতবাদের নৈতিক মূল্য প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। ফ্রেইবার্গে দেওয়া উদ্বোধনী ভাষণ *হোয়াট ইজ মেটাফিজিকস*-এ হেইদেগার বেশ কিছু ধারণার কথা বলেছিলেন যেগুলো আগেই প্লটিনাস, ডেনিস এবং এরিগেনার রচনাবলীতে দেখা গিয়েছিল। 'সত্তা' যেহেতু 'সম্পূর্ণ আলাদা' প্রকৃতপক্ষে তা কিছু না–কিছুই না, কোনও বস্তু যেমন নয়, তেমনি কোনও নির্দিষ্ট সত্তাও নয়। অথচ এটা অন্য সকল অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলেছে। প্রাচীন মানুষেরা বিশ্বাস করত কিছু না থেকে কিছু আসে না, কিন্তু হেইদেগার এই প্রবচনকে পাল্টে দেন; ভাষণের সমাপ্তি টেনেছিলেন তিনি লেইবনিযের উত্থাপিত একট প্রশ্ন দিয়েঃ 'একেবারে কিছু না থেকে কেনইবা সত্তাসমূহ উপস্থিত?' এটা এমন একটা প্রশ্ন যা বিস্ময়ের ধাক্কা সৃষ্টি করে, বিস্ময়

AMARBOI.COM

জাগায়; যা জগতের প্রতি মানুষের এক অব্যাহত প্রতিক্রিয়া হয়ে আছে: কেন কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকবে? হেইদেগার তাঁর *ইন্ট্রোডকশন টু মেটাফিজিক্স* (১৯৫৩) শুরু করেছিলেন একই জিজ্ঞাসা দিয়ে। ধর্মতত্ত্বের বিশ্বাস ছিল এর জবাব জানা আছে এবং সবকিছু মূল খুঁজে পেয়েছে 'ভিন্ন কিছু' ঈশ্বরে। কিন্তু এই ঈশ্বর আরেকটি সত্তা মাত্র, এমন কিছু নন যিনি একেবারেই আলাদা। ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কে হেইদেগারের কিছুট হীন ধারণা ছিল–যদিও বহু ধার্মিক মানুষ একে মানে–কিন্তু প্রায়শঃ অতিন্দ্রীয়বাদী পরিভাষায় সত্তা সম্পর্কে কথা বলেছেন তিনি। তিনি একে এক মহা স্ববিরোধিতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন: চিন্তা প্রক্রিয়াকে সত্তার জন্যে অপেক্ষা করা বা তাঁর কথা শোনা হিসাবে তুলে ধরেছেন এবং সত্তার প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যাহারের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলে মনে হয়, অনেকটা অতিন্দ্রীয়াবাদীরা যেভাবে ঈশ্বরের অনুপস্থিতি বোধ করে থাকে সে রকম। সত্তাকে অস্তিত্ব দেওয়া চিন্তা করার ক্ষমতা নেই মানুষের। গ্রিকদের সময় থেকেই পাশ্চাত্যবাসীরা সত্তাকে বিস্মৃত হয়ে তাঁর বদলে সত্তাসমূহে মনোনিবেশ করেছে, এ প্রক্রিয়া এনে দিয়েছে এর আধুনিক কারিগরি সাফল্য। জীবনের শেষ দিকে রচিত প্রবন্ধ *ওনলি আ গড ক্যান সেইভ আস*-এ হেইদেগার মত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের সময়ে ঈশ্বরের অনুপস্থিতির বোধ আমাদেরকে 'সত্তাসমূহের' সঙ্গে সম্পর্ক হতে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু সত্তাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা কেবল ভবিষ্যতে এক নতুন আবির্ভাবের প্রত্যাশা করতে পারি।

মার্ক্সবাদী দার্শনিক আর্নস্ট ব্লচ (১৮৮৫-১৯৭৭) ঈশ্বরের ধারণাকে মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিবেচনা করেছেন। গোটা মানব জীবন ভবিষ্যতের দিকে নির্দেশিত; আমরা আমাদের জীবনকে অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত হিসাবে অনুভব করি। জন্তু-জানোয়ারের বিপরীতে আমরা কখনও সন্তুষ্ট হই না, বরং সব সময় আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা করি। এ ব্যাপারটি আমাদের ভাবতে ও উন্নতি অর্জনে বাধ্য করে, যেহেতু জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমাদের অবশ্যই নিজেদের পেরিয়ে যেতে হয়, পৌঁছতে হয় পরবর্তী পর্যায়ে; শিশুকে অবশ্যই টডলার হয়ে উঠতে হবে, টডলারকে তার সব অক্ষমতা পেরিয়ে বালক হয়ে উঠতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে। আমাদের সকল স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনকি দর্শনেরও সূচনা ঘটে বিস্ময়ের সঙ্গে, যা অজানার অনুভূতি, এখনও না ঘটার অভিজ্ঞতা। সমাজতন্ত্রও এক ইউটোপিয়া প্রত্যাশী, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মার্ক্সীয় অস্বীকৃতি সত্ত্বেও যেখানে প্রত্যাশা আছে সেখানেই আছে ধর্মও। ফয়েরবাখের মতো ব্লচ ঈশ্বরকে মানবীয় আদর্শ হিসাবে দেখেছেন, এখনও যার বাস্তবায়ন ঘটেনি, কিন্তু একে বিচ্ছিন্নতাকারী হিসাবে না দেখে বরং মানবীয় অবস্থার জন্যে আবশ্যক মনে করেছেন।

AMARBOI.COM

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হর্খেইমার (১৮৯৫-১৯৭৩) 'ঈশ্বর'কে পয়গম্বরদের স্মারক গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হিসাবে দেখেছেন। তিনি ছিলেন কি ছিলেন না, কিংবা আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি কিনা, এসব বাড়াবাড়ি। ঈশ্বরের ধারণা ছাড়া পরম অর্থ, সত্য বা নৈতিকতা বলে কিছু নেই: নৈতিকতা হয়ে পড়ে রুচি, মনোভাব বা ঝোঁকের একটা ব্যাপার। রাজনীতি ও নৈতিকতা যদি কোনওভাবে ঈশ্বরের ধারণা অন্তর্ভূক্ত না করে, তারা প্রাজ্ঞ হওয়ার বদলে বরং একেবারে বাস্তবনিষ্ঠ ও ধূর্ত রয়ে যাবে। পরম বলে কিছুই না থাকলে আমাদের ঘৃণা করার কোনও কারণ থাকবে না কিংবা আমরা বলব না যে যুদ্ধ শান্তির চেয়ে খারাপ। ধর্ম অত্যাবশ্যকভাবে অন্তরের অনুভূতি যে একজন ঈশ্বর আছেন। আমাদের অন্যতম প্রাচীন স্বপ্ন ছিল ন্যায় বিচারের আকাঙ্ক্ষা (আমরা কতবারই না বাচ্চাদের বলতে শুনি: 'এটা ঠিক নয়!')। দুঃখ কষ্ট ও অনাচারের মুখে অগণিত মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে ধর্ম। এটা আমাদের সীমাবদ্ধ প্রকৃতি সম্পর্কে সজাগ করে তোলে; আমরা সবাই আশা করি পৃথিবীর অন্যায়-অবিচারই শেষ কথা হয়ে থাকবে না।

যাদের প্রচলিত কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস নেই, তারাও বারবার ঈশ্বরের ইতিহাসে আমাদের আবিস্কৃত মূল সুরের শরণাপন্ন হচ্ছে, এ বিষয়টি দেখায় যে, আমরা অনেকেই যেমন মনে করি আসলে এ ধারণাটি সে রকম বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমাদের বৃহৎ রূপের মতো ক্রিয়াশীল একজন ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা থেকে সরে যাবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এখানে নতুন কিছু ছিল না। আমরা যেমন দেখেছি, ইহুদি ঐশীগ্রন্থ, ক্রিশ্চানরা যেটাকে তাদের 'ওল্ড' টেস্টামেন্ট বলে, অনুরূপ প্রক্রিয়া দেখায়; কোরান শুরু থেকেই আল্লাহকে জুদো-ক্রিশ্চান ঐতিহ্যের তুলনায় কম ব্যক্তিক রূপে দেখেছে। ট্রিনিটির মতো মতবাদসমূহ এবং মিথ ও অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যবস্থার প্রতীকীবাদ, এসবই বোঝাতে চেয়েছে ঈশ্বর ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে। তবু এটা যেন বিশ্বাসীদের অনেকেই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেনি। উলউইচের বিশপ জন রবিনসন ১৯৬৩ সালে *অনেস্ট টু গড* প্রকাশ করেন, এখানে তিনি উল্লেখ করেন, 'মহাশূন্যে'র প্রাচীন ব্যক্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। ব্রিটেনে তখন মহাশোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ডারহামের বিশপ ডেভিড জেনকিন্স-এর বিভিন্ন মন্তব্যও একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, যদিও শিক্ষিত সমাজে এসব ধারণা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। ক্যামব্রিজের ইম্যানুয়েল কলেজের ডীন ডন কিউপিট 'নাস্তিক পুরোহিত' আখ্যায়িত হয়েছিলেন: তিনি আস্তিক্যবাদের প্রথাগত বাস্তববাদী ঈশ্বরকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে এক ধরনের ক্রিশ্চান-বৌদ্ধ মতবাদের প্রস্তাব রেখেছিলেন যা ধর্মীয় অনুভূতিকে ধর্মতত্ত্বের আগে স্থান দেয়। রবিনসনের মতো কিউপিট বুদ্ধিবৃত্তিক

AMARBOI.COM

উপায়ে এমন এক দর্শনে পৌছেছিলেন যা তিনটি ধর্ম বিশ্বাসের অতিন্দ্রীয়বাদীরা অধিকতর স্বজ্ঞামূলক উপায়ে অর্জন করেছিল। তবুও প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, মহাশূন্যে 'কিছু নেই' এগুলো নতুন কোনও কথা নয়।

পরম সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ইমেজ নিয়ে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা রয়েছে। এটা স্বাস্থ্যকর প্রতিমা বিদ্বেষ, কেননা ঈশ্বরের ধারণাকে অতীতে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৭০ এর দশকের পর থেকে পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক ধরনের ধার্মিকতার উত্থান যাকে আমরা সাধারণভাবে ঈশ্বরের তিনটি ধর্মসহ প্রধান বিশ্ব ধর্মে 'মৌলবাদ' বলি। প্রবলভাবে রাজনৈতিক আধ্যাত্মবাদ দর্শনের দিক থেকে আক্ষরিক এবং অসহিষ্ণু। বরাবরই চরমপন্থী ও প্রলয়বাদী উদ্দীপনার শিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিশ্চান মৌলবাদীরা নিজেদের নিউ রাইট-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। মৌলবাদীরা বৈধ গর্ভপাত বাতিল এবং নৈতিক ও সামাজিক শালীনতার ক্ষেত্রে কট্টরপন্থা অনুসরণের প্রচার করছে। রেগানের আমলে জেরি ফলওয়েলের মরাল মেজরিটি বিস্ময়কর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল। জেসাসের মন্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণকারী মেরিস সেরুলোর মতো অন্য ইভেঞ্জিলিস্টরা বিশ্বাস করে যে, প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসের চিহ্ন অলৌকিক ঘটনাবলী। বিশ্বাসী প্রার্থনায় যা চাইবে ঈশ্বর তাকে তাই দেবেন। ব্রিটেনে কলিন আর্কহার্টের মতো মৌলবাদীরা অনুরূপ দাবি করেছে। ক্রিশ্চান মৌলবাদীদের যেন ক্রাইস্টের প্রেমময় সহানুভূতির প্রতি তেমন একটা নজর নেই। তারা যাদের 'ঈশ্বরের শত্রু' মনে করে তাদের নিন্দা জানাতে দেরি করে না। অধিকাংশই ইহুদি ও মুসলিমদের নরকবাস অবধারিত মনে করে। আর্কহার্ট যুক্তি দেখিয়েছেন, সকল প্রাচ্য ধর্মই শয়তান-অনুপ্রাণিত।

AMARBOI.COM

মুসলিম বিশ্বেও অনুরূপ পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্যে তা প্রবল প্রচারণা পেয়েছে। মুসলিম মৌলবাদীরা সরকারের পতন ঘটিয়েছে, ইসলামের শত্রুদের হত্যা করেছে বা মৃত্যুদণ্ডের হুমকি দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইহুদি মৌলবাদীরা পশ্চিম তীর ও গাযা স্ট্রিপের অধিকৃত লোকালয়ে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে আরব অধিবাসীদের বঞ্চিত করার শপথ নিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। এভাবেই তারা মেসায়াহ্‌র অত্যাসন্ন আবির্ভাবের পথ নির্মাণ করছে বলে বিশ্বাস করে। মৌলবাদ এর সকল রূপে ভয়ঙ্করভাবে হানিকর বিশ্বাস। এভাবে ১৯৯০ সালে নিউ ইয়র্কে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারানোর আগে পর্যন্ত ইসরায়েলের 'ফার রাইটের'র সবচেয়ে চরমপন্থী সদস্য র‍্যাবাই মেয়ার কাহানে বলেছেন:

> ইহুদিবাদে অসংখ্য বাণী নেই। বাণী একটিই। সেটা হচ্ছে ঈশ্বর যা চান সেটা করা। অনেক সময় ঈশ্বর চান আমরা যেন যুদ্ধে যাই, আবার কখনও

> চান আমরা যেন শান্তিতে বাস করি...কিন্তু বাণী মাত্র একটি...ঈশ্বর চেয়েছেন আমরা যেন এদেশে আসি একটি ইহুদি রাষ্ট্র করার জন্যে।[১৩]

এটা শত শত বছর ধরে অর্জিত ইহুদি অগ্রগতিকে মুছে দেয়, ফিরিয়ে নিয়ে যায় বুক অভ জোশুয়ার ডিউটেরোনমিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। এটা বিস্ময়কর নয় যে, মানুষ যখন এ জাতীয় অশালীন বাক্য শোনে, যেখানে 'ঈশ্বর'কে দিয়ে অন্যদের মানবিক অধিকার অস্বীকার করানো হচ্ছে, তখন তারা যত শিগগির এই ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া যায় ততই মঙ্গল মনে করে।

তা সত্ত্বেও, আগের অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছি, এ ধরনের ধর্মপরায়ণতা আসলে ঈশ্বর হতে সরে আসা। ক্রিশ্চান 'পারিবারিক মূল্যবোধ,' 'ইসলাম' বা 'পবিত্র ভূমি'র মতো এ জাতীয় মানবীয়, ঐতিহাসিক ঘটনাকে ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা বহু-ঈশ্বরবাদীতার নতুন ধরণ। ঈশ্বরের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে এ ধরনের যুদ্ধংদেহী ন্যায়পরায়ণতা একেশ্বরবাদীদের কাছে অব্যাহত প্রলোভন হয়েছিল। একে অবশ্যই ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের ঈশ্বরের সূচনা ছিল দুর্ভাগ্যজনক, কেননা গোত্রীয় উপাস্য ইয়াহওয়েহ্ তাঁর আপন জাতির প্রতি ভয়ঙ্করভাবে পক্ষপাতপূর্ণ ছিলেন। পরবর্তীকালের ক্রুসেডাররা যারা এই আদিম বৈশিষ্ট্যে ফিরে গেছে, তারা গোত্রের মূল্যবোধসমূহকে অগ্রহণযোগ্যভাবে মর্যাদায় স্থাপন করেছে ও মানব সৃষ্ট আদর্শের দুর্জ্ঞেয় সত্তায় প্রতিস্থাপিত করেছে যা আমাদের সংস্কারকে চ্যালেঞ্জ করারই কথা। তারা এক গুরুত্বপূর্ণ একশ্বরবাদী থিমও অস্বীকার করছে। ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ ইয়াহওয়েহ্‌র পৌত্তলিক কাল্ট সংস্কার করার পর থেকে একেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর সহানুভূতির আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

আমরা দেখেছি, অ্যাক্সিয়াল যুগে বিকশিত অধিকাংশ আদর্শের ক্ষেত্রে সহানুভূতি একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সমবেদনার আদর্শের কারণে বৌদ্ধরা বুদ্ধ ও *বোধিসত্তা*দের প্রতি ভক্তির সূচনা করে ধর্মীয় দিক নির্দেশনায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছিল। পয়গম্বরগণ জোর দিয়ে গেছেন যে, সমাজ সামগ্রিকভাবে এক অধিকতর ন্যায়বিচার ভিত্তিক ও সমবেদনামূলক নীতিমালা গ্রহণ না করলে কাল্ট ও উপাসনার কোনও অর্থ থাকে না। জেসাস, পল এবং র‍্যাবাইদের হাতে এই দর্শনসমূহের বিকাশ ঘটেছে, যাদের সবাই একই ইহুদি আদর্শ অনুসরণ করেছেন ও এগুলোর প্রয়োগ ঘটানোর জন্যে ইহুদিবাদের গুরুতর পরিবর্তন সাধনের পরামর্শ রেখেছেন। কোরান সহানুভূতিপুর্ণ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলাকে আল্লাহর পরিমার্জিত ধর্মের মূল সুরে পরিণত করেছে। সহানুভূতি বিশেষভাবে কঠিন একটা গুণ। এটা দাবি করে, আমরা যেন আমাদের অহমবোধ, নিরাপত্তাহীনতা ও সহজাত কুসংস্কারের সীমাবদ্ধতা

AMARBOI.COM

অতিক্রম করে যাই। এটা বিস্ময়কর নয় যে, ঈশ্বরের তিনটি ধর্মই কোনও না কোনও সময় এই উঁচু মান অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডেইস্টরা প্রচলিত পাশ্চাত্যে খৃস্টধর্মমত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন প্রধানত তা প্রকটভাবে নিষ্ঠুর ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল বলে। একই কথা আজও প্রযোজ্য। বেশ ঘন ঘন প্রথাগত বিশ্বাসীগণ, যারা মৌলবাদী নয়, তাদের আক্রমণাত্মক ন্যায়পরায়ণতার অংশীদার হয়ে পড়ে। তারা তাদের নিজেদের ভালোবাসা ও ঘৃণাকে তুলে ধরার জন্যে 'ঈশ্বর'কে ব্যবহার করে, স্বয়ং ঈশ্বরের ওপর তা আরোপ করে। কিন্তু যেসব ইহুদি, ক্রিশ্চন এবং মুসলিম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্বর্গীয় উপাসনায় অংশ নেয় এবং বিভিন্ন জাতিগত ও আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত মানুষকে অসম্মান করে থাকে, তারা তাদের ধর্মের অন্যতম মৌল সত্যেরই বিরোধিতা করে। যারা নিজেদের ইহুদি; ক্রিশ্চান ও মুসলিম দাবি করে তাদের পক্ষে এক অসম সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়াটা সমানভাবে অসঙ্গত। ঐতিহাসিক একেশ্বরবাদের ঈশ্বর উৎসর্গ চান না, চান করুণা; জাঁকজমকপূর্ণ আচারের বদলে চান সহানুভূতি।

যারা ধর্মের কাল্টিক ধরণ অনুশীলন করে ও যারা সহানুভূতিময় ঈশ্বরের একটি অনুভূতি গড়ে তুলেছে তাদের মাঝে প্রায়ই পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পয়গম্বরগণ তাঁদের সেসব সমসাময়িকদের ভর্ৎসনা করেছেন যারা মন্দিরের উপাসনাই যথেষ্ট ভেবেছে। জেসাস ও সেইন্ট পল, দুজনেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন, দানবিহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কোনও অর্থ নেই: এটা ঘন্টা-ধ্বনি বা করতালের চেয়ে খুব বেশি ভালো নয়। আরবরা ঈশ্বরের দাবি অনুযায়ী সত্য ধর্মের শর্ত হিসাবে সহানুভূতির গুণাবলী অর্জন ছাড়াই আল্লাহর পাশাপাশি প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাচীন পৌত্তলিক দেবীদেরও উপসানা করতে চেয়েছিল, তাদের সঙ্গে মুহাম্মদের (স) সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। রোমের প্যাগান সম্প্রদায়ের মাঝেও অনুরূপ বিভক্তি দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন কাল্টিক ধর্ম স্থিতাবস্থার পক্ষে ছিল, অন্যদিকে দার্শনিকরা এমন এক বাণী প্রচার করেছেন যা পৃথিবীকে বদলে দেবে। এমন হতে পারে, এক ঈশ্বরের সহানুভূতির ধর্ম হয়তো সংখ্যালঘু একটি দলই অনুসরণ করছে; অধিকাংশ মানুষই আপোসহীন নৈতিক চাহিদাসম্পন্ন ঈশ্বর অনুভূতির চরম অবস্থার মুখোমুখি হওয়া কঠিন মনে করেছে। সিনাই পবর্ত হতে মোজেস আইনের ফলকসমূহ বয়ে আনার পর হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের সৃষ্ট প্রাচীন হুমকিহীন উপাস্যের মূর্তি সোনালি বাছুরের পূজা করতে পছন্দ করেছে। প্রধান পুরোহিত আরন সোনালি বাছুরের সোনালি মূর্তির নির্মাণ কাজে নেতৃত্বে দিয়েছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রায়শঃই পয়গম্বর ও অতিন্দ্রীয়বাদী অনুপ্রেরণার প্রতি বধির হয়ে থাকে, যারা কিনা আরও বেশি চাহিদাসম্পন্ন ঈশ্বরের সংবাদ নিয়ে আসেন।

WWW.AMARBOI.COM

ঈশ্বরকে অস্বাস্থ্যকর মূল্যহীন মহৌষধ, জাগতিক জীবনের বিকল্প কষ্টকল্পনার বিষয়বস্তু হিসাবেও ব্যবহার করা হতে পারে। ঈশ্বরের ধারণাকে প্রায়শঃ মানুষের আফিম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন তাঁকে ঠিক আমাদের মতো-কিন্তু বড় ও উন্নত-আরেকটি সত্তা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, তখন তা বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়: যিনি তাঁর স্বর্গে অবস্থান করেন, খোদ যেটাকে জাগতিক আনন্দের স্বর্গ মনে করা হয়। কিন্তু মূলত মানুষকে এই পৃথিবীর প্রতি মনোযোগী হতে ও অপ্রীতিকর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্যে ঈশ্বরকে ব্যবহার করা হতো। এমনকি সকল প্রকাশিত ক্রুটি সত্ত্বেও ইয়াহওয়েহ্‌র পৌত্তলিক কাল্টও আচার ও পবিত্র কালের বিপরীতে আদি অপবিত্র সময়ের প্রচলিত ঘটনাপ্রবাহে তাঁর অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছে। ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ তাঁদের জনগণকে ঈশ্বরের নামে সামাজিক অপরাধ ও আসন্ন রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য করেছিলেন, যিনি এইসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ক্রিশ্চান অবতারবাদ রক্ত মাংসের পৃথিবীতে স্বর্গীয় পরিব্যাপ্ততার ওপর জোর দিয়েছে। ইসলামে ইহজগতের প্রতি মনোযোগ বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে: মুহাম্মদের (স) চেয়ে বাস্তবাদী আর কেউ হতে পারেন না, যিনি একাধারে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা ছিলেন। আমরা যেমন দেখেছি, মুসলিমদের পরবর্তীকালের প্রজন্মগুলো ন্যায়বিচার ভিত্তিক ও শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে মানব ইতিহাসের স্বর্গীয় ইচ্ছা বাস্তবায়নের তাঁর উদ্বেগে অংশীদার হয়েছে। একেবারে গোড়া থেকেই ঈশ্বরকে কাজের তাগিদ হিসাবে অনুভব করা হয়েছে। ঠিক যেই মুহূর্তে-এল বা ইয়াহওয়েহ্ হিসাবে-ঈশ্বর আব্রাহামকে হারানে তাঁর পরিবার হতে নিয়ে গেছেন, তখন থেকেই এই কাল্টে পৃথিবীর বুকে নিরেট কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন যুক্ত হয়েছে ও প্রায়শঃই প্রাচীন পবিত্রতার কষ্টকর পরিত্যাগও যোগ হয়েছে।

এই স্থানচ্যুতির সঙ্গে বিশাল চাপও জড়িত ছিল। সম্পূর্ণ আলাদা পবিত্র ঈশ্বর পয়গম্বরগণের কাছে গভীর আঘাত হিসাবে অনুভূত হয়েছেন। তিনি তাঁর জাতির পক্ষ হতেও অনুরূপ পবিত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা দাবি করেছেন। তিনি সিনাই পর্বতে মোজেসের সঙ্গে কথা বলার সময় ইসরায়েলিদের পাহাড়ের পাদদেশে যাওয়ার অনুমতি মেলেনি। পৌত্তলিকতার হলিস্টিক দর্শনকে বিদীর্ণ করে মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে সম্পূর্ণ নতুন এক ব্যবধান দেখা দিয়েছিল। সুতরাং, পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদের একটা সম্ভাবনা ছিল যা ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য স্বাধীনতার জেগে ওঠা সচেতনতা প্রতিফলিত করেছে। এটা অঘটন নয় যে, একেশ্বরবাদ শেষ পর্যন্ত ব্যাবিলনে নির্বাসনকালে শেকড় বিস্তার করেছিল, যখন ইসরায়েলিরাও ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের আদর্শ গড়ে তোলে যা ইহুদিবাদ ও

AMARBOI.COM

ইসলাম, উভয় ধর্মেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১৪] আমরা দেখেছি, মানুষের ব্যক্তিত্বের পবিত্র অধিকারের বোধ গড়ে তুলতে ইহুদিদের সাহায্য করার লক্ষ্যে র‍্যাবাইগণ এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের ধারণা ব্যবহার করেছেন। তবু বিচ্ছিন্নতা তিনটি ধর্ম বিশ্বাসেই বিপদ হিসাবে অব্যাহত রয়ে গিয়েছে: পাশ্চাত্যে ঈশ্বরের অনুভূতিতে অব্যাহতভাবে অপরাধবোধ ও এক নৈরাশ্যবাদী নৃতত্ত্ব সঙ্গী হয়েছিল। ইহুদিবাদ ও ইসলামেও, সন্দেহ নেই, তোরাহ্ ও শরিয়াহ্ অনুসরণকে অনেক সময়ই এক বাহ্যিক আইনের পরিপালন হিসাবে দেখা হয়েছে, যদিও আমরা দেখেছি, যারা এইসব আইনী বিধিমালা সংকলিত করে ছেন তাঁদের ইচ্ছার চেয়ে দূরবর্তী আর কিছু হতে পারত না।

যেসব নাস্তিক এরকম দাসত্বমূলক আনুগত্যের দাবিদার একজন ঈশ্বর হতে মুক্তির পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে তারা আসলে এক অসম্পূর্ণ ও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঈশ্বরের চেনা ইমেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আবার, এটা অতিমাত্রায় ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের ধারণা ছিল। ঐশীগ্রন্থে বর্ণিত ইমেজকে বড় বেশি আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করে ধরে নিয়েছে যে, ঈশ্বর আকাশের বুকে 'বড় ভাই' জাতীয় কিছু। অনিচ্ছুক দাসদের ওপর অচেনা আইন চালানো স্বর্গীয় স্বৈরাচারীর ইমেজকে বিদায় নিতেই হবে। আতঙ্ক সৃষ্টি করে জনগোষ্ঠীকে নাগরিক আইন মানতে বাধ্য করা এখন আর গ্রহণযোগ্য, এমনকি অনুসরণযোগ্যও নয়: ১৯৮৯ সালে শরৎকালে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান অত্যন্ত নাটকীয়ভাবেই তা তুলে ধরেছে। উত্তর-আধুনিকতার মেজাজ মর্জির সঙ্গে আইন প্রণেতা ও শাসক স্বরূপ মানবরূপী ঈশ্বর ইমেজ স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তারপরেও যেসব নাস্তিক ঈশ্বরের ধারণা স্বাভাবিক নয় বলে দাবি করেছে তারা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমরা দেখেছি, ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা লক্ষণীয়ভাবে অনুরূপ ঈশ্বরের ধারণা গড়ে তুলেছিল, যা পরম সত্তা সম্পর্কিত অন্যান্য ধারণাার সঙ্গেও মেলে। মানুষ মানব জীবনের পরম অর্থ ও মূল্য খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস পেলে তাদের মনোযোগ যেন একটা নির্দিষ্ট দিকে চালিত হয়। এর জন্যে তাদের বাধ্য করার প্রয়োজন পড়েনি: এটা এমন কিছু যা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

তবুও অনুভূতিকে যদি অসংযত আক্রমণাত্মক বা অস্বাস্থ্যকর আবেগে পর্যবসিত হতে না দিতে চাওয়া হয়, তাহলে সেগুলোকে সমালোচনামূলক বুদ্ধিমত্তায় অনুপ্রাণিত হতে হবে। মনের বিভিন্ন প্রবণতাসহ চলতি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ঈশ্বর অনুভূতিকে তাল রেখে অগ্রসর হতে হবে। ফালসাফাহ্ গবেষণার প্রয়াস ছিল ঈশ্বরে বিশ্বাসকে মুসলিম, ইহুদি ও পরে পাশ্চাত্য-ক্রিশ্চানদের ভেতর জেগে ওঠা নতুন যুক্তিবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করা। শেষ পর্যন্ত মুসলিম ও ইহুদিরা দর্শন থেকে সরে গেছে। তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল

AMARBOI.COM

যে যুক্তিবাদ বিজ্ঞান, ওষুধ ও গণিতের মতো গবেষণামূলক বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু ধারণাতীত একজন ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনার জন্যে পুরোপুরি জুৎসই নয়। গ্রিকরা আগেই এটা বুঝতে পেরে নিজস্ব মেটাফিজিক্সে গোড়ার দিকেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বর আলোচনার দার্শনিক পদ্ধতির অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে এতে করে পরম উপাস্যকে একেবারে ভিন্ন মাত্রার একটা সত্তা না হয়ে সকল অস্তিত্বমান বস্তুর মাঝে সর্বোচ্চ কিন্তু আরেকটি সত্তা বলে মনে হতে পারে। তা সত্ত্বেও ফালসাফাহ্‌র প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেহেতু এটা অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঈশ্বরকে সম্পর্কিত করার প্রয়োজনীয়তাটুকু তুলে ধরতে পেরেছিল, সেটা কেবল এর সম্ভাব্য মাত্রাটুকু বোঝানোর জন্যে হয়ে থাকলেও। ঈশ্বরকে এক পবিত্র বন্দিশালায় বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতায় ঠেলে দেওয়াটা অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিক। এটা মানুষকে একথা ভাবতে প্ররোচিত করতে পারে যে, 'ঈশ্বর'-অনুপ্রাণিত আচরণে শালীনতা ও যুক্তির সাধারণ মান প্রয়োগের কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রথম থেকেই ফালসাফাহ্ বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ওষুধ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আগ্রহ থেকেই প্রথম দিকে মুসলিম ফায়লাসুফরা মেটাফিজিক্যাল পরিভাষায় আল্লাহ সংক্রান্ত আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিল। বিজ্ঞান তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল; তারা বুঝতে পেরেছিল, সতীর্থ মুসলিমদের মতো করে তারা আর ঈশ্বর সম্পর্কে ভাবতে পারছে না। ঈশ্বরের দার্শনিক ধারণা কোরানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লক্ষণীয়ভাবে আলাদা ছিল, কিন্তু ফায়লাসুফরা সেই সময়ে উম্মাহর মাঝে বিলুপ্তির আশঙ্কায় থাকা বেশকিছু দর্শন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই অন্যান্য ধর্মীয় ট্র্যাডিশনের প্রতি কোরানের অসাধারণ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল: মুহাম্মদ (স) একথা মনে করতেন না যে, তিনি একটি নতুন, বিশেষ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করছেন, তিনি বিশ্বাস করতেন সত্য পথে পরিচালিত সকল ধর্ম একজন ঈশ্বর হতে এসেছে। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে *উলেমা*রা এই দর্শন বিস্মৃত হতে শুরু করে ইসলামকেই একমাত্র সত্য ধর্ম হিসাবে ঘোষণা দিতে শুরু করেছিলেন। ফায়সুফরা পুরোনো বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে গিয়েছিল, যদিও ভিন্ন পথে সেখানে পৌঁছেছে তারা। আজকে অনুরূপ একটা সুযোগ আছে আমাদের হাতে। আমাদের বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের পক্ষে পূর্ব পুরুষের মতো করে ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারি না, কিন্তু বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ আমাদের প্রাচীন কিছু সত্য উপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

আমরা দেখেছি, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের অতিন্দ্রীয়বাদী ধর্মের প্রতি আগ্রহ ছিল। 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না,' তাঁর এই বিখ্যাত মন্তব্য সত্ত্বেও তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ঈশ্বরের ধারণাকে প্রভাবিত করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস

AMARBOI.COM

করেননি। ১৯২১ সালে ইংল্যান্ড সফরের সময় আর্চ বিশপ অভ ক্যান্টারবারি আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ধর্মতত্ত্বের উপর এর প্রভাব কী হতে পারে। জবাবে তিনি বলেছেন: 'কিছু না। অপেক্ষিকতা একেবারেই বৈজ্ঞানিক বিষয়, এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই!'[১৫] স্টিফেন হকিংয়ের মতো বৈজ্ঞানিকদের কারণে ক্রিশ্চানরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, কেননা হকিং তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বরকে স্থান দেননি। এই ক্রিশ্চানরা সম্ভবত এখনও ঈশ্বরকে মানবীয় পরিভাষায় সত্তা হিসাবে ভাবে, যিনি আমরা যেভাবে করতাম সেভাবেই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আদিতে সৃষ্টিকে একরকম আক্ষরিকভাবে ধরে নেওয়া হয়নি। বাবিলনে নির্বাসনের আগে ইহুদিবাদে স্রষ্টা হিসাবে ইয়াহওয়েহর প্রতি আগ্রহ প্রবেশ করেনি। এই ধারণাটি গ্রিক জগতে অপরিচিত ছিল: ৩৪১ সালের নাইসার কাউন্সিলের আগে খৃস্টধর্মের আনুষ্ঠানিক মতবাদ ছিল না। সৃষ্টি কোরানের একটি মৌল শিক্ষা, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কিত অন্য সকল উচ্চারণের মতো একেও এক অলৌকিক সত্য সম্পর্কিত 'উদাহরণ' বা 'নিদর্শন'—*আয়া*—বলা হয়েছে। ইহুদি ও মুসলিম যুক্তিবাদীদের কাছে এটা কঠিন ও সমস্যাসঙ্কুল মতবাদ মনে হয়েছে এবং অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। সুফী ও কাব্বালিস্ট সবাই উৎসারণের গ্রিক উপমা পছন্দ করেছে। সে যাই হোক, সৃষ্টিতত্ত্ব পৃথিবীর উৎসের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ছিল না বরং মূলত এটা ছিল আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতীকি-নির্ভর প্রকাশ । মুসলিম বিশ্বে নতুন বিজ্ঞানের ব্যাপারে সামান্য বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে: আমরা যেমন দেখেছি, বিজ্ঞানের চেয়ে সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ঈশ্বরের প্রচলিত ধারণার প্রতি বেশি রকম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশ্চাত্যে অবশ্য ঐশীগ্রন্থের অধিকতর আক্ষরিক উপলব্ধি দীর্ঘদিন ধরে চালু রয়েছে। কোনও কোনও ক্রিশ্চান মনে করে, নতুন বিজ্ঞান তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসকে খাটো করেছে, তারা সম্ভবত ঈশ্বরকে নিউটনের মহাকারিগর হিসাবে কল্পনা করে, ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ ধারণা যেটা ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক উভয় প্রেক্ষিতেই প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ হয়তো বা চার্চগুলোকে ঐশীগ্রন্থের প্রতীকী বর্ণনার ব্যাপারে সজাগ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নাড়া দিতে যাচ্ছে।

নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক নানাবিধ কারণে বর্তমান যুগে ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা যেন অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। নারীবাদীরা ব্যক্তিক উপাস্য—যিনি তাঁর লিঙ্গের কারণে সেই গোত্রীয় পৌত্তলিক আমল থেকেই পুরুষ—তাঁর প্রতি বিকর্ষণ বোধ করছে। কিন্তু তাঁকে 'নারী' হিসাবে উপস্থাপন করাটাও—দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় না হলে—একই রকম সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত হবে, কেননা এটা অসীম ঈশ্বরকে একেবারে মানবীয় মাত্রায় আবদ্ধ করে ফেলে। পাশ্চাত্যে দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রিয় পরম সত্তা হিসাবে ঈশ্বর

AMARBOI.COM

সম্পর্কিত মেটাফিজিক্যাল ধারণাও অসন্তোষজনক বিবেচিত হচ্ছে। দার্শনিকদের ঈশ্বর অধুনা অচল হয়ে যাওয়া এক যুক্তিবাদের ফল, সুতরাং তাঁর অস্তিত্বের প্রচলিত 'প্রমাণগুলো' এখন আর কার্যকর নয়। আলোকন পর্বের ডেইস্টদের ব্যাপক হারে গৃহীত দার্শনিকদের ঈশ্বরকে বর্তমানকালের নাস্তিক্যবাদের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেখা যেতে পারে। প্রাচীন স্কাই গডের মতো এই উপাস্য মানুষ ও ইহজগৎ হতে এত দূরবর্তী যে অনায়াসে তিনি *ডিউস ওতিসৌস*-এ পরিণত হয়ে আমাদের চেতনা থেকে হারিয়ে যান।

অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বরকে সম্ভাব্য বিকল্প হিসবে দেখা যেতে পারে। অতিন্দ্রীয়বাদীরা বহু আগে থেকেই জোর দিয়ে এসেছে যে, ঈশ্বর আরেকটি 'সত্তা' নন, তারা দাবি করেছে, আসলে তাঁর অস্তিত্ব নেই এবং তাঁকে 'কিছু না' বলে ডাকাই শ্রেয়। এই ঈশ্বর আমাদের সেক্যুলার সমাজের পরম সত্তার অসম্পূর্ণ ইমেজের প্রতি অবিশ্বাসের প্রেক্ষিতে নাস্তিক্যবাদী মনোভাবের সঙ্গে মানানসই। ঈশ্বরকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রকাশযোগ্য বস্তুগত সত্য হিসাবে দেখার বদলে অতিন্দ্রীয়বাদীরা দাবি করেছে যে, তিনি সত্তার গভীরে রহস্যজনকভাবে অনুভূত অন্তরের অনুভূতি। কল্পনার মাধ্যমে এই ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং জীবনের রহস্য, সৌন্দর্য ও মূল্য ধরে শিল্পকলার কোনও ধরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। অতিন্দ্রীয়বাদীরা ধারণাতীত এই সত্তাকে প্রকাশ করার জন্যে সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা, কাহিনী, গল্প, চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার ব্যবহার করেছে। অবশ্য সকল শিল্পকর্মের মতো অতিন্দ্রীয়বাদে বুদ্ধিমত্তা, শৃঙ্খলা ও আত্মসমালোচনার প্রয়োজন যা অসংযত আবেগ ও অভিক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রহরা হিসাবে কাজ করে। অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর নারীবাদীদেরও তুষ্ট করতে পারেন, কেননা সুফী ও কাব্বালিস্ট, উভয়ই দীর্ঘদিন ধরে ঈশ্বরে নারী উপাদানের বৈশিষ্ট্য যোগ করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

অবশ্য এর দুর্বলতাও আছে। শ্যাব্বেতাই যেভি বিপর্যয় ও পরবর্তী কালের সুফীবাদের পতনের পর বহু ইহুদি ও মুসলিম অতিন্দ্রীয়বাদকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছে। পশ্চিমে অতিন্দ্রীয়বাদ কখনওই ধর্মীয় উদ্দীপনার প্রধান স্রোতধারা হয়ে ওঠেনি। প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক সংস্কারকগণ হয় একে বেআইনী ঘোষণা করেছেন নয়তো প্রান্তিকায়িত করেছেন; বৈজ্ঞানিক যুক্তির কাল এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত করেনি। ১৯৬০-এর দশকের পর থেকে যোগ মেডিটেশন ও বৌদ্ধধর্ম মতে আগ্রহের ভেতর দিয়ে অতিন্দ্রীয়বাদের প্রতি নতুন করে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতি আমাদের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণামূলক মানসিকতার সঙ্গে সহজে খাপ খায় না। অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর সহজবোধ্য নন। এর জন্যে অভিজ্ঞজনের অধীনে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও যথেষ্ট সময় ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বর নামে পরিচিত সত্তার (অনেককেই এর কোনও

AMARBOI.COM

নাম দিতে অস্বীকার করেছে) বোধ লাভের জন্যে অতিন্দ্রীয়বাদীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। অতিন্দ্রীয়বাদীরা প্রায়শঃই জোর দিয়ে বলেছে, মানুষকে শিল্পকর্মের অন্যান্য ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্যে যেমন মনোনিবেশ প্রয়োজন হয় ঠিক সেরকমভাবে নিজেদের জন্যে ঈশ্বরের অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। এটা আশুতোষ ফাস্ট ফুড ও চকিত যোগাযোগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা একটা সমাজের মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করার মতো নয়। অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর তৈরি অবস্থায় মোড়কায়িত হয়ে হাজির হন না। কোনও রিভাইভালিস্ট প্রীচার সৃষ্ট চকিত আনন্দের মতো তিনি অনুভূত হবেন না, এ ধরনের প্রচারকরা অতি দ্রুত গোটা দর্শকগোষ্ঠীকে হাততালি ও গুঞ্জন শুরু করতে উৎসাহিত করে তোলেন।

কিছু কিছু অতিন্দ্রীয়বাদী প্রবণতা অর্জন সম্ভব; আমরা যদি অতিন্দ্রীয়বাদীর মতো চৈতন্যের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছতে নাও পারি, অন্তত এটা তো শিখতে পারব যে, ঈশ্বর, উদাহরণস্বরূপ, কোনও সাধারণ অর্থে অস্তিত্বমান নন, কিংবা খোদ 'ঈশ্বর' শব্দটি স্রেফ এক সত্তার প্রতীক যিনি অনির্বচনীয়ভাবে একে অতিক্রম করে যান। অতিন্দ্রীয়বাদী অজ্ঞাবাদ আমাদের গোঁড়া নিশ্চয়তার সঙ্গে এসব জটিল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এসব ধারণা যদি হৃদয়ঙ্গম করা না হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করা না হয় তাহলে এগুলোকে অর্থহীন বিমূর্ত মনে হবে। ধার করা অতিন্দ্রীয়বাদ মূল কবিতা পাঠের বদলে সমালোচকের ব্যাখ্যা পড়ার মতো অসন্তোষজনক ঠেকতে পারে। আমরা দেখেছি, অতিন্দ্রীয়বাদকে প্রায়ই নিগূঢ় শাস্ত্র হিসাবে দেখা হয়েছে, সেটা অতিন্দ্রীয়বাদীরা অশ্লীল গোষ্ঠীকে বাদ দিতে চেয়েছে বলে নয় বরং এসব সত্য কেবল বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মনের উপলব্ধির অংশ দিয়েই অনুধাবন করা সম্ভব বলে। এই বিশেষ পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে এগুলোকে ভিন্ন অর্থবোধক বলে মনে হয় যা মনের যৌক্তিক অংশের কাছে বোধগম্য নয়।

ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করতে শুরু করার পর থেকেই একেশ্বরবাদীরা এক অর্থে তাদের নিজস্ব ঈশ্বর সৃষ্টি করে নিয়েছিল। ঈশ্বরকে খুব কমই অন্য যেকোনও বস্তুগত অস্তিত্বমানের মতো অনুভবযোগ্য স্ব-প্রতীয়মান সত্য হিসাবে দেখা হয়েছে। আজ বহু মানুষ যেন এই কল্পনানির্ভর প্রয়াস নেওয়ার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে। এটা কোনও মহা-বিপর্যয় নয়। ধর্মীয় ধারণাসমূহ যখন বৈধতা হারিয়েছে, সাধারণত অলক্ষে হারিয়ে গেছে সেগুলো: যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ঈশ্বর সম্পর্কিত মানুষের ধারণা অকার্যকর হয়ে পড়ে, সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু অতীতে অধিকাংশ মানুষ আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করার জন্যে নতুন নতুন প্রতীকের সৃষ্টি করেছে। মানবজাতি সবসময়

AMARBOI.COM

জীবনের প্রতি বিস্ময়বোধ ও অনির্বচনীয় তাৎপর্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠা লক্ষ্যহীনতা, বিচ্ছিন্নতা, উন্মূলতা ও সন্ত্রাস ইঙ্গিত করছে যে তারা যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই 'ঈশ্বর' বা অন্য কিছুতে বিশ্বাস সৃষ্টি করছে না–কোনওটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়–বহু মানুষ ডুবে যাচ্ছে হতাশায়।

আমরা দেখেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার নিরানব্বই ভাগই ঈশ্বরে বিশ্বাস করার দাবি করে, তা সত্ত্বেও মৌলবাদ, প্রলয়বাদ ও ধর্মপরায়ণতার চকিত ক্যারিশম্যাটিক ধরণ আমেরিকায় আশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারছে না। অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি, মাদকসক্তি ও মৃত্যুদণ্ডের পুনর্বহাল আধ্যাত্মিক দিক থেকে সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। ইউরোপে মানবীয় চেতনায় এক কালে যেখানে ঈশ্বরের অবস্থান ছিল সেখানে আজ ক্রমবর্ধমান শূন্যতা। এই বিরস নৈঃসঙ্গ যারা প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছেন–নিৎশের বীরত্বপূর্ণ নাস্তিক্যবাদ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়–টমাস হার্ডি। বিংশ শতাব্দীর সূচনায়, ১৯০০ সালের ৩০ ডিসেম্বর রচিত *দ্য ডার্কলিং থ্রাশ*-এ তিনি জীবনের অর্থময়তার বিশ্বাস সৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে ওঠা চেতনার মৃত্যুর কথা প্রকাশ করেছেন:

AMARBOI.COM

তুষার যখন ভূতুড়ে ধূসর
আর শীতের শেষ যখন
দিনের দুর্বল চোখকে
অস্থির কম্প্র তোলে,
তখন ঝোপের কোণে ঠেস দিই।
লতাগুল্মের প্যাঁচানো ডাল
ভাঙা তারের মতো উঠে
গেছে আকাশ পানে
এবং মানুষগুলো সব যারা
ভয় পেয়ে গিয়েছিল যার যার
বাড়ির আগুন খুঁজে নিয়েছে।

জমিনের তীক্ষ্ণ চেহারা যেন
শতাব্দীর ঝড়ে থাকা নিঃসর্গ
মেঘলা আকাশ তার
শবাধার, হাওয়া তার
মরণ-বিলাপ।

প্রাচীন ক্রন্দন শুষ্ক
কঠিন, চুপসে গেছে,
আর জগতের প্রতিটি
আত্মা যেন আমারই মতো
অনুকম্পাহীন।

নিমেষে মাথার ওপরের
বিষণ্ন ডালপালায় জেগে ওঠে কণ্ঠস্বর,
অনেকের মনকাড়া
সীমাহীন প্রার্থনা সঙ্গীতের
এক প্রাচীন ধাক্কা, নাজুক, শুষ্ক, ক্ষুদ্র,
হাওয়ায় আলোড়িত জলে,
এমনি করে আমাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

এমন পরমানন্দের শব্দের
জন্যে গান গাইবার সামান্যই কারণ
লিখা আছে পার্থিব বস্তুতে,
বহু দূরে বা খুব কাছে,
তার প্রফুল্ল রাতের হাওয়ায়,
ভেসে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি,
কোনও আশীর্বাদপ্রাপ্ত আশা, যার
কথা সে জানে, কিন্তু
জানি না আমি।

AMARBOI.COM

মানুষ শূন্যতা ও নৈঃসঙ্গ সহ্য করতে পারে না; তারা অর্থবহতার নতুন কেন্দ্র সৃষ্টি করে শূন্যতা পূরণ করবে। মৌলবাদের প্রতিমাসমূহ ঈশ্বরের সঠিক বিকল্প নয়; আমরা একবিংশ শতাব্দীর জন্যে নতুন প্রাণবন্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করতে চাইলে আমাদের সম্ভবত উচিত হবে শিক্ষা ও সতর্কতার স্বার্থে ঈশ্বরের ইতিহাস নিয়ে ভাবা।

# নির্ঘন্ট

*আলম আল-মিথাল* (আরবী): খাঁটি ইমেজের জগৎ: কল্পনার আদি আদর্শ জগৎ যা মুসলিম অতিন্দ্রীয়বাদী ও ধ্যানবাদী দার্শনিকদের ঈশ্বরের দিকে চালিত করে।

*আলেম* (আরবী): মুসলিম যাজক।

*অ্যাপাথিয়া* (গ্রিক): নিস্পৃহতা, অবিচলতা ও অনাক্রান্ত। গ্রিক দার্শনিকদের ঈশ্বরের এসব বৈশিষ্ট্য ক্রিশ্চানদের ঈশ্বর ধারণার মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, যাঁকে কষ্ট ও পরিবর্তনের অতীত মনে করা হতো।

*অ্যাপোফ্যাটিক* (গ্রিক): নীরব। গ্রিক ক্রিশ্চানরা এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিল যে, ঈশ্বরের অনিবর্চনীয়তার রহস্যের প্রতি জোর দেওয়ার জন্যে সকল ধর্মতত্ত্বে নীরবতা, বৈপরীত্য ও সংযম থাকা প্রয়োজন।

*আর্কেটাইপ*: আমাদের জগতের মূল নকশা বা আদি রূপ, যাকে প্রাচীন দেবতাদের ঐশী জগতের অনুরূপ বলে মনে করা হয়েছে। পৌত্তলিক জগতে পৃথিবীতে দৃশ্যমান সমস্ত কিছুকে ঊর্ধ্বাকাশের কোনও বস্তুর প্রতিরূপ হিসাবে দেখা হয়েছে। *আলাম আল-মিথাল*ও দেখুন।

*অ্যাশকেনাযিম* (`Allemagne এর হিব্রু অপভ্রংশ): জার্মানি ও পূর্ব পশ্চিম ইউরোপের কিছু অংশের ইহুদি।

*আত্মা* (হিন্দি): ব্রহ্মার পবিত্র শক্তি, যা প্রত্যেকে নিজের মাঝে অনুভব করে।

*অবতার*: হিন্দু মিথ অনুযায়ী মানবরূপে ঈশ্বরের মর্ত্যে আগমন। সাধারণভাবে ঈশ্বরের মানব রূপধারী বিবেচিত কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

*অ্যাক্সিয়াল এজ*: ৮০০-২০০ বিসিই সময়কালকে বোঝাতে ইতিহাসবিদরা এই শব্দ-বন্ধটি ব্যবহার করেন, এক ক্রান্তিকাল যখন সভ্য জগতে বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলো আবির্ভূত হয়েছিল।

*আয়াত* (বহুবচনে *আয়া*) (আরবী): নিদর্শন, উদাহরণ। কোরানে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রকাশ।



AMARBOI.COM

*বানাত-আল্লাহ* (আরবী): ঈশ্বরের কন্যাগণ; কোরানে এই শব্দ-বন্ধটি তিন প্যাগান দেবী আল-লাত, আল-উযযা ও মানাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

*বাকা* (আরবী): ভাবাবেশে ঈশ্বরে বিলীন (*ফানা*) হওয়ার পর সূফী অতিন্দ্রীয়বাদীর পরিবর্ধিত উন্নত সত্তায় প্রত্যাবর্তন।

*বাতিন* (আরবী): কোরানের অন্তর্গত অর্থ। *বাতিনি* এমন একজন মুসলিম যিনি ধর্মের নিগূঢ় অতিন্দ্রীয়বাদী উপলব্ধির দিকে নিজেকে নিবেদিত করেন।

*ভক্তি* (হিন্দী): ব্যক্তি বুদ্ধ কিংবা মানবরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হিন্দু-দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা

*বোধিসত্তা* (হিন্দী): হবু বুদ্ধ। যাঁরা দুঃখেকষ্টে নিমজ্জিত অনালোকিত মানুষকে পথ দেখানো ও রক্ষার জন্যে ব্যক্তিগত নির্বাণ বিলম্বিত করে থাকেন।

*ব্রহ্মা* : হিন্দু মতে, যে পবিত্র শক্তি সকল বস্তুর অস্তিত্ব নিশ্চিত করে, অস্তিত্বের অন্তর্গত অর্থ।

*ব্রেকিং অভ দ্য ভেসেলস*: ইসাক লুরিয়ার কাব্বালিজমের পরিভাষা, যা আদি বিপর্যয়ের বর্ণনা দেয় যখন স্বর্গীয় আলোর স্ফূলিঙ্গ পৃথিবীতে এসে বস্তুতে আটকা পড়ে গিয়েছিল।

বুদ্ধ (হিন্দী ): আলোকিত জন। এ উপাধিটি নির্বাণপ্রাপ্ত অগণিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তবে প্রধানতঃই বুদ্ধ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ গৌতমের কথা বোঝায়।

AMARBOI.COM

*জিকর* (আরবী): কোরানে নির্দেশিত আল্লাহর 'স্মরণ'। সুফীবাদে *জিকর* আল্লাহর নামোচ্চারণকে মন্ত্রের মতো রূপ দেওয়া হয়।

ডগ*মা* : গির্জার গুপ্ত গোপন ঐতিহ্য বর্ণনার জন্যে গ্রিক ক্রিশ্চানরা ব্যবহার করেছে, যা কেবল অতিন্দ্রীয়ভাবে উপলব্ধিযোগ্য এবং প্রতীকী উপায়ে প্রকাশযোগ্য। এখন পশ্চিমে ডগ*মা* বলতে স্পষ্ট এবং কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে বর্ণিত মতামতের সংগ্রহে বোঝায়।

*ডিনামিজ* (গ্রিক): ঈশ্বরের 'ক্ষমতাদি'। পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্মতৎপরতা বোঝাতে গ্রিকরা ব্যবহার করত যাকে তাঁর অগম্য সত্তা হতে একেবারে আলাদা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

*এক্সটেসি* (গ্রিক): আক্ষরিক অর্থে, 'সত্তার বাইরে গমন।' ঈশ্বরে প্রযুক্ত, এটা এক গোপন ঈশ্বরের *কেনোসিস* ইঙ্গিত করে, যিনি মানুষের কাছে নিজেকে তুলে ধরার জন্যে আপন অন্তর্মুখীতা অতিক্রম করে যান।

*এল*: কানানের প্রাচীন পরম ঈশ্বর, যাঁকে ইসরায়েলের জনগণের পূর্বপুরুষ

আব্রাহাম, ইসাক ও জ্যাকবের ঈশ্বরও মনে করা হয়।

*ইমেনেশন*: একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বস্তু একটি একক আদি উৎস হতে প্রবাহিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, একেশ্বরবাদীরা যাঁকে ঈশ্বর অ্যাখায়িত করেছে। দার্শনিক ও অতিন্দ্রীয়বাদীসহ কিছু সংখ্যক ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিম সময়ের একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে ঈশ্বর কর্তৃক ত্বরিৎ সৃষ্টির প্রচলিত বাইবেলিয় কাহিনীর চেয়ে জীবনের উৎস বর্ণনায় এই রূপকল্পটির ব্যবহার বেশি পছন্দ করে।

এন সফ (হিব্রু): অন্তহীন। ইহুদিদের অতিন্দ্রীয়বাদী কাব্বালাহ ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরের দুর্বোধ্য, অগম্য ও জ্ঞানাতীত মূল সত্তা।

এনার্জিয়াই (গ্রিক: শক্তিসমূহ): পৃথিবীতে ঈশ্বরের 'তৎপরতা', যা আমাদের তাঁর একটা আভাস পেতে সক্ষম করে তোলে। *ডিনামিজের* মতো শব্দটি ঈশ্বরের অনির্বচনীয় ও উপলব্ধির অতীত সত্তার সঙ্গে মানুষের ধারণার পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

*এনুমা এলিশ*: নববর্ষ উৎসবে বর্ণিত পৃথিবী সৃষ্টির বর্ণনা সমৃদ্ধ বাবিলনিয় মহাকাব্য।

*এপিফ্যানি*: মানবরূপে দেব বা দেবীর পৃথিবীতে আবির্ভাব।

AMARBOI.COM

*ফালসাফাহ* (আরবী): দর্শন। প্রাচীন গ্রিক যুক্তিবাদের আলোকে ইসলাম ব্যাখ্যার প্রয়াস।

*ফানা* (আরবী): বিলীন। মোহাবিষ্ট অবস্থায় সুফী অতিন্দ্রীয়বাদীর ঈশ্বরের মাঝে বিলীন হওয়া।

*ফায়লাসুফ* (আরবী): দার্শনিক। ফালসাফাহর যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক আদর্শে নিবেদিত ইসলামি সাম্রাজ্যের ইহুদি ও মুসলিমদের বোঝাতে ব্যবহৃত।

*গেতিক* (পারসি): জাগতিক বিশ্ব, যেখানে আমরা বাস করি, ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারি।

*গডহেড*: যে সত্তাকে আমরা 'ঈশ্বর' হিসাবে জনি তাঁর অগম্য, গোপন উৎস।

*গোয়িম* (বহু বচনে *গায়িম*): অ-ইহুদি বা জেন্টাইল।

*হাদিস*, (বহুবচনে *আহাদিস* :আরবী): পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) বিবরণ বা বাণীর সংগ্রহ।

*হজ্জ* (আরবী): মক্কায় মুসলিমদের তীর্থযাত্রা।

*হেসিচ্যাজম*, *হেসিচ্যাস্ট* (গ্রিক *হেসিচিয়া* হতে): অন্তরের নীরবতা, স্থৈর্য্য, ভাষা

ও ধারণাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। গ্রিক অর্থডক্স অতিন্দ্রীয়বাদীদের নীরব ধ্যান পদ্ধতি।

*হাই গড*: বহু মানুষ কর্তৃক পূজিত একক ঈশ্বর হিসাবে পরম উপাস্য, বিশ্বের স্রষ্টা, শেষ পর্যন্ত আরও প্রত্যক্ষ ও আকর্ষণীয় দেবদেবীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিলেন। স্কাই গড হিসাবেও পরিচিত।

*হিজর* (আরবী): ৬২২ সিইতে মক্কা হতে মদীনায় মুসলিমদের প্রথম অভিবাসন। এ ঘটনা হতেই ইসলামি কাল গণনা শুরু।

হলিনেস (হিব্রুতে *কাদ্দোশ*): ঈশ্বরের পরম ভিন্নতা; তুচ্ছ জগৎ হতে ঈশ্বরের চরম বিচ্ছিন্নতা।

*হোলি স্পিরিট*: পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপস্থিতি বোঝাতে শেকিনাহ্‌র বদলে র‍্যাবাইগণ কর্তৃক ব্যবহৃত পরিভাষা। আমাদের অনুভবের এক জানা ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকাল আমাদের এড়িয়ে যাওয়া একেবারে দুর্জ্ঞেয় সত্তার পার্থক্যকরণের উপায়। খৃস্টধর্মে আত্মা ট্রিনিটির তৃতীয় 'ব্যক্তি' তে পরিণত হয়েছে।

*হমোউশন* (গ্রিক): আক্ষরিক অর্থে, 'একই বস্তু বা উপাদান হতে তৈরি।' বিতর্কিত শব্দটি আথানাসিয়াস ও তাঁর সমর্থকরা জেসাস পিতা ঈশ্বরের মতো একই প্রকৃতির এই বিশ্বাস প্রকাশ করার জন্যে ব্যবহার করেছেন, এদিক দিয়ে তিনিও ঈশ্বরের মতোই ঐশ্বরিক।

*হিপোসতোসিস* (গ্রিক): কোনও ব্যক্তির অন্তস্থঃ প্রকৃতির বাহ্যিক প্রকাশ, মূলসত্তার বিপরীতে, যা ভেতর থেকে প্রত্যক্ষ করা কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে তুলে ধরে, বাইরে থেকে দেখা কোনও ব্যক্তি বা বস্তু। পিতা, পুত্র ও আত্মা, ঈশ্বরের গোপন সত্তার তিনটি প্রকাশ বর্ণনার জন্যে গ্রিকরা শব্দটি প্রয়োগ করেছে।

*আইডলেট্রি*: দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের বদলে মানুষ বা মানুষের তৈরি বস্তুর উপাসনা বা সম্মান প্রদর্শন।

*ইজতিহাদ* (আরবী): স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগ।

*ইলম* (আরবী): ঈশ্বরের গোপন 'জ্ঞান,' শিয়াহ্ মুসলিমরা এটা তাদের ইমামদের একক অধিকারভুক্ত বলে বিশ্বাস করে।

*ইমাম* (আরবী): শিয়াহ্ মতে ইমাম মুহাম্মদ (স) মেয়ে জামাই আলির বংশধর। ইমামদের ঈশ্বরের অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়েছে। সুন্নী মুসলিমরা অবশ্য প্রার্থনায় নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিকে বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহার করে।

*ইনকারনেশন*: মানবরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ।

AMARBOI.COM

*ইশরাক* (আরবী): আলোকন। দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার *ইশরাকি* মতবাদ ইয়াহিয়া সুহরাওয়ার্দি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

*ইসলাম* (আরবী) ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ।

*জাহিলিয়াহ* (আরবী): অজ্ঞতার কাল। আরবের ইসলাম-পূর্ব সময়কালকে বোঝাতে মুসলমানরা ব্যবহার করেন।

*কাবাহ* (আরবী): আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত মক্কার চৌকো আকৃতির গ্রানিট উপাসনালয়।

*কালাম* (আরবী): আক্ষরিক অর্থে 'বিতর্ক'। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব। যৌক্তিক উপায়ে কোরান ব্যাখ্যা করার প্রয়াস।

*কেনোসিস* (গ্রিক): স্বয়ং-শূন্যকরণ।

*কেরিগমা* (গ্রিক): গির্জার স্পষ্ট ও যৌক্তিকভাবে প্রকাশযোগ্য গণশিক্ষা বোঝাতে গ্রিক ক্রিশ্চানরা ব্যবহার করেছেন, ডগমার বিপরীতে, যা প্রকাশ সম্ভব নয়।

AMARBOI.COM

*লগোস* (গ্রিক): যুক্তি; সংজ্ঞা; বাণী। গ্রিক ধর্মতাত্ত্বিকরা ঈশ্বরের লগোসকে ইহুদি ঐশীগ্রন্থের প্রজ্ঞা বা সেইন্ট জনের গস্পেলের ভূমিকায় উল্লিখিত বাণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছেন।

*মাদ্রাসা* (আরবী): ইসলামি শিক্ষার বিদ্যাপীঠ।

*মানা*: দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ভৌত শক্তিকে ঘিরে রাখা পবিত্র বা ঐশী হিসাবে অনুভূত অদৃশ্য শক্তিকে বর্ণনা করার জন্যে ব্যবহৃত।

*মেনোক* (পারসি): সত্তার স্বর্গীয় আদর্শ জগৎ

*মারকাভা* (হিব্রু): রথ। *থ্রোন মিস্টিসিজম* দেখুন।

*মিশনাহ* (হিব্রু): *তান্নাইম* নামে পরিচিত প্রাথমিক কালের র‍্যাবাইগণ কর্তৃক সংকলিত, সম্পাদিত ও পরিমার্জিত ইহুদি আইন। ছয়টি প্রধান খণ্ডে ও তেষট্টি ক্ষুদ্র অংশবিশিষ্ট আইন তালমুদের আইনসঙ্গত আলোচনা ও ধারা বিবরণীর ভিত্তি।

*মিতযভাহ* (বহুবচনে *মিতযভোত*): নির্দেশ।

*মুসলিম* (আরবী): ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণকারী।

*মুতাযিলাহ* (আরবী): কোরানকে যৌক্তিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস গ্রহণকারী মুসলিম গোষ্ঠী।

*নির্বাণ* (হিন্দী): আক্ষরিক অর্থে অগ্নিশিখার মতো 'শীতল' বা 'নিভে যাওয়া,' বিলুপ্তি। বৌদ্ধরা পরম বাস্তবতা, লক্ষ্য এবং মানবজীবনের পরিপূর্ণতা ও বেদনার সমাপ্তি বোঝাতে ব্যবহার করে থাকে। একেশ্বরবাদীদের অনুসন্ধানের ঈশ্বরের মতো এটাও যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বরং অনুভূতির ভিন্ন বলয়ে এর অবস্থান।

*নুমিনাস* (লাতিন *numen* হতে): আত্মা। পবিত্র, দুর্জ্ঞেয় ও হলিনেসের অনুভূতি যা সবসময় বিস্ময় ও আতঙ্কের জন্ম দেয়।

*ওইকুমিন* (গ্রিক): সভ্য জগৎ।

*অর্থডক্স, অর্থডক্সি*: আক্ষরিক অর্থে, 'সঠিক শিক্ষা।' গ্রিক ক্রিশ্চানরা চার্চের সঠিক মতবাদসমূহ অনুসরণকারীদের সঙ্গে ধর্মদ্রোহী আরিয়ান বা নেস্টোরিয়ান ধর্মদ্রোহীদের পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহার করত। এ শব্দটি কড়াকড়িভাবে 'আইন' মান্যকারী প্রথাগত ইহুদিবাদকে বোঝায়।

*ওইসা* (গ্রিক): মূলসত্তা, প্রকৃতি। বস্তুর মূল পরিচয়। ভেতর থেকে দেখা ব্যক্তি বা বস্তু। ঈশ্বরে প্রযুক্ত শব্দটি সেই স্বর্গীয় মূল সত্তাকে বোঝায় যা মানবীয় উপলব্ধি ও বোধের অতীত।

*পারযুফ* (বহু বচনে *পারযুফিম* হিব্রু): মুখায়ব। ট্রিনিটির মতো। কাব্বালাহর কোনও কোনও রূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে বোধের অতীত ঈশ্বর বিভিন্ন 'অবয়বে' নিজেকে মানুষের সামনে প্রকাশ করেন, যেগুলোর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট রয়েছে।

প্যাট্রিয়ার্কস: ইসরায়েলিদের পূর্ব পুরুষ আব্রাহাম, ইসাক ও জ্যাকবকে বোঝাতে ব্যবহৃত।

*পারসোনা*, (বহুবচনে *পারসোনে* লাতিন): অভিনীত চরিত্রকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার জন্যে অভিনেতার পরিহিত মুখোশ। পাশ্চাত্যের ট্রিনিটির তিনটি *হিপোস্তাসে* বোঝাতে এ শব্দ প্রয়োগ পছন্দ করে। তিন 'ব্যক্তি' হলেন পিতা, পুত্র ও আত্মা।

*পির* (আরবী): মুসলিম অতিন্দ্রীয়বাদীদের আধ্যাত্মিক নির্দেশক।

*প্রফেট* : যিনি ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলেন।

*ঋগ-বেদ*: বিসিই ১৫০০-৯০০ সময়ে রচিত ভক্তিমূলক বাণী সংকলন যেখানে সিন্ধু উপত্যকায় আগ্রাসন পরিচালনাকারী ও উপমহাদেশের স্থানীয় লোকদের ওপর নিজেদের ধর্ম চাপানো আর্যদের বিভিন্ন বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে।

AMARBOI.COM

*সেফিরাহ,* (বহুবচনে *সেফিরদ* হিব্রু): 'সংখ্যায় পরিবর্তন'। কাব্বালাহয় ঈশ্বরের স্বপ্রকাশের দশটি পর্যায়। দশটি *সেফিরদ* হচ্ছে:

১. কেদার এলিয়ন; সর্বোত্তম মুকুট।

২. হোখমাহ; প্রজ্ঞা।

৩. বিনাহ: বুদ্ধিমত্তা।

৪. হেসেদ: প্রেমময় দয়া।

৫. তিফারেদ; সৌন্দর্য।

৬. নেতস্যাখ; স্থায়িত্ব।

৭. হদ: অভিজাত্য।

৮. ইয়োসেদ, ভিত্তি।

৯. মালকুদ; রাজত্ব, শেকিনাহ নামেও অভিহিত।

*সেফার্দিম:* স্পেনের ইহুদি।

*শাহাদাহ:* মুসলিম বিশ্বাসের ঘোষণা: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনও প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর বার্তাবাহক।'

*শরিয়াহ:* কোরান ও হাদিসের ভিত্তিতে প্রণীত ইসলামের পবিত্র আইন।

*শেকিনাহ* (হিব্রু *শেকান* থেকে): কারও তাঁবু স্থাপন। পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপস্থিতি বোঝাতে র‍্যাবাইদের ব্যবহৃত পরিভাষা, ইহুদির ঈশ্বর অনুভূতি ও খোদ অলৌকিক সত্তার পার্থক্য বোঝায়। কাব্বালাহয় একে শেষ *সেফিরদ* হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।

*শেমা:* ইহুদিদের বিশ্বাসের ঘোষণা; 'শোন (*শেমা*) ইসরায়েল, ইয়াহওয়েহ আমাদের ঈশ্বর; ইয়াহওয়েহ একক!' (ডিউটেরোনমি ৬:৪)

*শিয়াহ:* (আলির দল)। মুসলিম শিয়াহ্‌দের বিশ্বাস পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) মেয়ে জামাই ও চাচাত ভাই আলি ইবন আবি তালিব এবং ইমামগণ ও তাঁর উত্তরসূরিদেরই ইসলামি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।

*শিউর কোমাহ* (হিব্রু): উচ্চতার পরিমাপ। পঞ্চম শতাব্দীর বিতর্কিত অতিন্দ্রীয়বাদী বিবরণ, যেখানে স্বর্গীয় রথে ইযেকিয়েলের প্রত্যক্ষ করা অবয়বের বর্ণনা রয়েছে।

*স্কাই গড:* হাই গড দেখুন।

*সুফী, সুফীবাদ:* ইসলামের অতিন্দ্রীয়বাদ ও অতিন্দ্রীয়বাদী আধ্যাত্মিকতা। আদি যুগে সুফী ও দরবেশরা মুহাম্মদের (স) প্রিয় উলের তৈরি {(আরবী *সওফ*)} কর্কশ পোশাক পরতে পছন্দ করতেন, শব্দটি সম্ভবত সেখান থেকে এসেছে।

*সুন্নাহ* (আরবী): অনুশীলন। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী স্বীকৃত রেওয়াজ,

AMARBOI.COM

যেখানে পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) আচরণ ও কার্যক্রমের অনুকরণের কথা বলা হয়েছে।

*সুন্নাহ, সুন্নী, আহল আল-সুন্নাহ*: কোরান, হাদিস, সুন্নাহ ও শরিয়াহ অনুসরণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের বোঝাতে ব্যবহৃত; শিয়াহ্‌দের মতো ইমামদের প্রতি ভক্তি এদের ভিত্তি নয়।

*তালমুদ* (হিব্রু): আক্ষরিক অর্থে 'পাঠ' বা 'শিক্ষা'। প্রাচীন ইহুদি বিধিমালার ধ্রুপদী রাব্বিনিক আলোচনা। *মিশনাহ* দেখুন।

*তান্নাইম* (হিব্রু): মিশনাহ নামে পরিচিত ইহুদিদের প্রাচীন কথ্য আইন সংকলন ও সম্পাদনাকারী প্রথম যুগের রাব্বিনিক পণ্ডিত ও আইনপ্রণেতা।

*তাকওয়া* (আরবী): ঈশ্বর-সচেতনতা।

*তুরীকা* (আরবী): সুফী অতিন্দ্রীয়বাদের গোষ্ঠী।

*তাওহীদ* (আরবী): একত্ব। ঈশ্বরের ঐশী একত্ব এবং ঈশ্বরে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রয়াসে লিপ্ত প্রতিটি মুসলিমের প্রয়োজনীয় সংহতি বোঝাতে ব্যবহৃত।

*তাওয়িল*: ইসমায়েলিদের মতো গোপন সম্প্রদায়গুলোর কোরানের প্রতীকী ও অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যাখ্যা।

*তৃফিলিন* (হিব্রু): শেমার বিবরণসহ ফাইলাকট্রিজ নামে পরিচিত কালো বাক্স, যা ইহুদি পুরুষ ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত কিশোরদের ডিউটোরোনমি ৬:৪-৭-এর নির্দেশ মোতাবেক প্রাতঃকালীন প্রার্থনার সময় কপাল ও হৃৎপিণ্ড বরাবর বেঁধে রাখতে থাকে।

*থিওফ্যানি*: নারী ও পুরুষের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ।

*থিওরিয়া* (গ্রিক): ধ্যান।

*থ্রোন মিস্টিসিজম*: ইহুদি অতিন্দ্রীয়বাদের প্রাথমিক ধরণ, যেখানে পয়গম্বর ইযেকিয়েলের প্রত্যক্ষ করা স্বর্গীয় রথের (*মার্কাভা*) বর্ণনার প্রতি মনোনিবেশ করা হয় যা ঈশ্বরের প্রাসাদের হল (*হেকালদ*) হয়ে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে আরোহনের কাল্পনিক যাত্রার রূপ ধারণ করে।

*তিক্কুন* (হিব্রু): পুনঃস্থাপন। ইসাক লুরিয়ার কাব্বালিজম বর্ণিত মুক্তির প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্রেকিং অভ দ্য ভেসেলস-এর সময় বিক্ষিপ্ত স্বর্গীয় স্ফূলিঙ্গসমূহ আবার ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়।

*তোরাহ* (হিব্রু): বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকে-জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভিটিকাস ও ডিউটোরোনমি–বর্ণিত আইন যা সম্মিলতভাবে *তোরাহ্* নামে পরিচিত।

*ট্র্যাডিশনিস্টস*: (*আহল আল-হাদিস*) *হাদিস* অনুসারী গোষ্ঠী। মুতাযিলিদের

AMARBOI.COM

যুক্তিবাদী প্রবণতার বিপরীতে আক্ষরিকভাবে কোরান ও হাদিস ব্যাখ্যাকারী মুসলিম।

*তসিমতসুম*: সংকোচন, প্রত্যাহার। ইসাক লূরিয়ার অতিন্দ্রীয়বাদে ঈশ্বর সৃষ্টির জন্যে স্থান করে দেওয়ার লক্ষ্যে নিজেকে সংকুচিত করেছেন বলে কল্পিত। সুতরাং এটা *কেনোসিস* ও স্বয়ং-সীমাবদ্ধকরণের একটি প্রক্রিয়া।

*উলেমা*: আলেম দেখুন।

*উম্মাহ* (আরবী): মুসলিম সমাজ।

*উপনিষদ*: অ্যাক্সিয়াল যুগের বিসিই অষ্টম হতে দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হিন্দু পবিত্র গ্রন্থসমূহ।

*বেদ: ঋগ বেদ দেখুন*।

প্রজ্ঞা: হিব্রুতে *হোখমাহ* ও গ্রিকে *সোফিয়া*। *ঐশীগ্রন্থে ঈশ্বরের ঐশী* পরিকল্পনার ব্যক্তিকরণ। পৃথিবীতে তাঁর কর্মকাণ্ড বর্ণনার একটি পদ্ধতি, যা খোদ ঈশ্বরের নিজস্ব অগম্য সত্তার বিপরীতে মানুষের ধারণার পরিচায়ক।

*ইয়াহওয়েহ*: ইসরায়েলে ঈশ্বরের নাম। ইয়াহওয়েহ হয়তো অন্য কোনও জাতির ঈশ্বর হয়ে থাকবেন, ইসরায়েলের জন্যে মোজেসের গৃহীত। বিসিই তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সময় থেকে আর ইহুদিরা পবিত্র নাম উচ্চারণ করত না, যা লিখিত হয় YHWH রূপে।

*যোগ*: ভারতীয়দের উদ্ভাবিত অনুশীলন বিশেষ যা মনের শক্তিকে 'একত্রিত' করে। এই অনুশীলনের মনোনিবেশের কৌশল প্রয়োগ করে *যোগি* বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর ও উচ্চতর ধারণা অর্জন করে যা শান্তি আনন্দ ও স্থৈর্য্য এনে দেয়।

*যান্না* (আরবী): অনুমান। যুক্তিহীন ধর্মীয় অনুমান বোঝাতে কোরানে ব্যবহৃত হয়েছে।

*যিগুরাত*: সুমেরিয়দের নির্মিত বিশেষ আকৃতির মন্দির-মিনার যা বিশ্বের অন্য অঞ্চলেও দেখা যায়। *যিগুরাত* বিশালাকার পাথর নির্মিত মই বিশিষ্ট হয় যা বেয়ে উঠে মানুষ তাদের দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

# তথ্যসূত্র

ইহুদি ও ক্রিশ্চান ঐশীগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ *দ্য জেরুজালেম বাইবেল* হতে গৃহীত (বাংলা অনুবাদ 'বাংলাদেশ বাইবেল সোসায়েটি' কর্তৃক প্রকাশিত *পবিত্র বাইবেল: পুরাতন ও নতুন নিয়ম'* হতে নেওয়া হয়েছে–অনুবাদক)। কোরানের উদ্ধৃতিসমূহ নেওয়া হয়েছে মুহাম্মদ আসাদ অণূদিত *দ্য মেসেজ অভ দ্য কোরান*, জিব্রাল্টার ১৯৮০ হতে (বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *কুরআনুল করিম* হতে নেওয়া–অনুবাদক)।

## ১. উদ্ভব ...


১। মিরচা এলিয়াদ, *দ্য মিথ অভ দ্য ইটার্নাল রিটার্ন অর কসমস অ্যান্ড হিস্ট্রি*, অনুবাদ: উইলার্ড আর. ট্রাস্ক, (প্রিন্সটন, ১৯৫৪)।

২। এন. কে. স্যান্ডার্স (অনূদিত) *প্যারাডাইস অভ হেভেন অ্যান্ড হেল ফ্রম অ্যানশেন্ট মেসোপটেমিয়ার* 'দ্য বাবিলোনিয়ান ক্রিয়েশন' হতে (লন্ডন, ১৯৭১), পৃ: ৭৩।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৯।

৪। পিন্ডার, নেমীন, VI, ১-৪ *দ্য ওডেস অভ পিন্ডার* অনু. সি. এম. বাউরা, (হারমন্ডসওঅর্থ, ১৯৬৯) পৃ: ২০৬।

৫। আনাত-বাআল টেক্সট ৪ ৯: ১১:৫, ই. ও. জেমস-এর *দ্য অ্যানশেন্ট গডস*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৬০) পৃ: ৮৮।

৬। জেনেসিস ২: ৫-৭।

৭। জেনেসিস ৪: ২৬; এক্সোডাস ৬: ৩।

৮। জেনেসিস ৩১: ৪২; ৪৯: ২৪।

৯। জেনেসিস ১৭: ১।

১০। *ইলিয়াদ* XXIV, ৩৯৩, অন. ই. ভি, রিউ, (হারমন্ডওসঅর্থ ১৯৫০) পৃ: ৪৪৬।


AMARBOI.COM

১১ অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস্ ১৪: ১১-১৮।

১২। জেনেসিস ২৮: ১৫।

১৩। জেনেসিস ২৬; ১৬-১৭। এই বিবরণে `J'-এর উপাদানসমূহ `E'কর্তৃক যুক্ত হয়েছে, সে জন্যেই ইয়াহওয়েহ নাম ব্যবহার।

১৪। জেনেসিস ৩২: ৩০-৩১। (২৯-৩০ পবিত্র বাইবেল)

১৫। জর্জ ই. মেন্দেলহল, 'দ্য হিব্রু কনকোয়েন্ট অভ প্যালেস্তাইন,' *দ্য বিবলিক্যাল আর্কিওলজিস্ট* ২৫, ১৯৬০; এম. উইপার্ট, *দ্য সেটলমেন্ট অভ দ্য ইসরায়েলাইট ট্রাইবস ইন প্যালেস্তাইন* (লন্ডন, ১৯৭১)।

১৬। ডিউটেরোনমি ২৬: ৫-৮ (৫-১০ পবিত্র বাইবেল)

১৭। এল. ই. বিহু 'মিদিয়ানাইট এলিমেন্টস ইন হিব্রু রিলিজিয়ন' *জিউস থিওজিক্যাল স্টাডিজ* ৩১; স্যালো উইটমেয়ার ব্যারন, *আ সোস্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ*, ১০ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্ক. (নিউইয়র্ক, ১৯৫২-১৯৬৭) পৃ: ৪৬।

১৮। এক্সোডাস ৩: ৫-৬। (৫-৭ পবিত্র বাইবেল)

১৯। এক্সোডাস ৩: ১৪।

২০। এক্সোডাস ১৯:১৬-১৮।

২১। এক্সোডাস ২০: ২।

২২। জোশুয়া ২৪ :১৪-১৫। (৯:২৩-২৫)

২৩। জোশুয়া ২৪: ২৪। (২৩-২৪ পবিত্র বাইবেল)

২৪। জেমস, *দ্য অ্যানশেন্ট গড্‌স*, পৃ: ১৫২; শ্লোক ২৯, ৮৯, ৯৩। অবশ্য এই শ্লোকগুলোর রচনাকাল নির্বাসনের পর।

২৫। ১. কিংস ১৮: ২০-৪০।

২৬। ২. কিংস ১৯: ১১-১৩।

২৭। *ঋগ বেদ:* ১০-২৯ আর, এইচ, যিনার অনূদিত ও সম্পাদিত *হিন্দু স্ক্রিপচারস*—এ (লন্ডন ও নিউইয়র্ক, ১৯৬৬) পৃ: ১২।

২৮। *চান্দোগ্য-উপনিষদ*, VI, ১৩, হুয়ান মাসক্যারো অনূদিত ও সম্পাদিত, *দ্য উপনিষদস* (হারমন্ডসঅর্থ, ১৯৬৫) পৃ: ১১১।

২৯। *কেনা উপনিষদ*, ম্যাসক্যারো অনু. ও সম্পা. *দ্য উপনিষদস* পৃ: ৫১।

৩০। প্রাগুক্ত: ৩ পৃ: ৫২।

৩১। *সাম্যুত্ত-নিকয়া* খণ্ড-২: নিদান ভাগ্য, অনু. ও সম্পা. লিয়ন ফিয়ার (লন্ডন ১৮৮৮) পৃ: ১০৬।

৩২। এডওয়ার্ড কনযে, *বুদ্ধিজম: ইটস এসেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট* (অক্সফোর্ড, ১৯৫৯), পৃ: ৪০।

৩৩। *উদনা* ৮.১৩, পল স্টেইথা'র *উদনান*-এ অনূদিত ও উদ্ধৃত (লন্ডন ১৮৮৫), পৃ: ৮১।

AMARBOI.COM

৩৪। *দ্য সিম্পোজিয়াম*, অনু. ডব্লু. হ্যামিল্টন (হারমন্ডসওঅর্থ ১৯৫১), পৃ: ৯৩-৯৪।
৩৫। *ফিলোসফি*, ফ্রাগমেন্ট ১৫।
৩৬। *পোয়েটিকস* ১৪৬১ b, ৩।

## ২. এক ঈশ্বর

১। ইসায়াহ ৬:৩।
২। রুড়লফ অটো, *দ্য আইডিয়া অভ দ্য হোলি, অ্যান ইনকোয়ারি ইনটু দ্য নন-র‍্যাশনাল ফ্যাক্টর ইন দ্য আইডিয়া অভ দ্য ডিভাইন অ্যান্ড ইটস রিলেশন টু র‍্যাশনাল*, অনু. জন উব্লু, হার্ভে (আক্সফোর্ড, ১৯২৩) পৃ: ২৯-৩০।
৩। ইসায়াহ ৬: ৫।
৪। এক্সোডাস ৪: ১১।
৫। সালমস্ ২৯, ৮৯, ৯৩। দাগন ছিলেন ফিলিস্তাইনিদের দেবতা।
৬। ইসায়াহ ৬: ১০। (৯ পবিত্র বাইবেল)
৭। ম্যাথু ১৩: ১৪-১৫।
৮। চেইম পটোকের *ওয়ান্ডারিংস হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ*-এ উল্লিখিত কিউনিফর্ম ফলকের খোদাই (নিউইয়র্ক, ১৯৭৮), পৃ: ১৮৭।
৯। ইসায়াহ ৬: ১৩।
১০। ইসায়াহ ৬: ১২।
১১। ইসায়াহ ১০: ৫-৬।
১২। ইসায়াহ ১-৩।
১৩। ইসায়াহ ১১-১৫।
১৪। ইসায়াহ: ১: ১৫-১৭।
১৫। আমোস ৭: ১৫-১৭।
১৬। আমোস ৩: ৮।
১৭। আমোস ৮: ৭।
১৮। আমোস ৫: ১৮। (১৮-১৯ পবিত্র বাইবেল)
১৯। আমোস ৩: ১-২।
২০। হোসি ৮: ৫।
২১। হোসি ৬: ৬।
২২। জেনেসিস ৪: ১।
২৩। হোসি ২: ২৩-২৪।
২৪। হোসি ২: ১৮-১৯।
২৫। হোসি ১: ২।

AMARBOI.COM

২৬। হোসি ১: ৯।

২৭। হোসি ১৩: ২।

২৮। জেরেমিয়াহ ১০; সালমস ৩১: ৬, ১১৫: ৪-৮; ১৩৫: ১৫।

২৯। এই পঙক্তিটির অনুবাদ জন বাউকার কৃত *দ্য রিলিজিয়াস ইমাজিনেশন অ্যান্ড দ্য সেন্স অভ গড* (অক্সফোর্ড, ১৯৭৮), পৃ; ৭৩-এ উদ্ধৃত।

৩০। জেনেসিস ১৪: ২০ দেখুন।

৩১। ২ কিংস ৩২:৩-১০; ২ ক্রনিকলস ৩৪: ১৪।

৩২। ডিউটেরোনমি ৬: ৪-৬।

৩৩। ডিউটোরেনমি ৭: ৩।

৩৪। ডিউটেরোনমি ৭: ৫-৬।

৩৫। ডিউটেরোনমি ২৮: ৬৪-৮ (৬৩-৬৮ পবিত্র বাইবেল)।

৩৬। ২ ক্রনিকলস ৩৪: ৫-৭। (৪-৭ পবিত্র বাইবেল)

৩৭। এক্সোডাস ২৩: ৩৩।

৩৮। জোশুয়া ১১: ২১-২।

৩৯। জেরেমিয়াহ ২৫: ৮,৯।

৪০। জেরেমিয়াহ ১৩: ১৫-১৭।

৪১। জেরেমিয়াহ ১: ৬-১০।

৪২। জেরেমিয়াহ ২৩: ৯।

৪৩। জেরেমিয়াহ ২০: ৭,৯। (৭, ৯, ১০ পবিত্র বাইবেল)

AMARBOI.COM

৪৪। চীনে তাও এবং কনফুসিয়ান মতবাদকে বাহ্যিক ও অন্তরের মানুষ সংক্রান্ত একই আধ্যাত্মিকতার দুটি রূপ হিসাবে দেখা হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমত সম্পর্কিত এবং উভয়কে পরিবর্তিত পৌত্তলিকতা হিসাবে দেখা যেতে পারে।

৪৫। জেরেমিয়াহ ২: ৩১, ৩২; ১২: ৭-১১; ১৪: ৭-৯; ৬: ১১।

৪৬। জেরেমিয়াহ ৩২: ১৫।

৪৭। জেরেমিয়াহ ৪৪: ১৫-১৯।

৪৮। জেরেমিয়াহ ৩১: ৩৩।

৪৯। ইযেকিয়েল ১: ৪-২৫

৫০। ইযেকিয়েল ৩: ১৪-১৫।

৫১। ইযেকিয়েল ৮: ১২।

৫২। সালমস ১৩৭।

৫৩। ইসায়াহ ১১: ১৫, ১৬।

৫৪। ইসায়াহ ৫১: ৯, ১০। এটা স্থায়ী থিম হয়ে দাঁড়াবে। দেখুন সালমস ৫: ৭; ৭৪: ১৩-১৪; ৭৭: ১৬; জব ৩:৮; ৭: ১২।

৫৫। ইসায়াহ ৪৬: ১।

৫৬। ইসায়াহ ৪৫: ২১।

৫৭। ইসায়াহ ৪৩: ১১, ১২।

৫৮। ইসায়াহ ৫৫: ৮,৯।

৫৯। ইসায়াহ ১৯: ২৪,২৫।

৬০। এক্সোডাস ৩৩: ১০।

৬১। এক্সোডাস ৩৩: ১৮।

৬২। এক্সোডাস ৩৪: ২৯-৩৫।

৬৩। এক্সোডাস ৪০: ৩৪,৩৫; ইযেকিয়েল ৯:৩।

৬৪। cf. সালমস ৭৪ ও ১০৪।

৬৫। এক্সোডাস ২৫: ৮,৯।

৬৬। এক্সোডাস ২৫: ৩-৫।

৬৭। এক্সোডাস ৩৯: ৩২, ৪৩; ৪০: ৩৩; ৪০: ২, ১৭; ৩১: ৩,১৩।

৬৮। ডিউটেরোনমি ৫:১২-১৭। (৮,৯,১০ পবিত্র বাইবেল)

৬৯। ডিউটেরোনমি ১৪: ১-২১।

৭০। প্রভার্বস ৮: ২২,২৩, ৩০, ৩১।

৭১। বেন সিরাহ ২৪: ৩-৬।

৭২। উইজডম অভ সলোমন ৭: ২৫-২৬।

৭৩। *দে স্পেসিয়ালিবাস লেগিবাস* ১: ৪৩।

৭৪। *গড ইজ ইমুউটেবল*, ৬২; *দ্য লাইফ অভ মোজেস*, ১: ৭৫।

৭৫। আব্রাহাম ১২১-২৩।

৭৬। *দ্য মাইগ্রেশন অভ আব্রাহাম* ৩৪-৩৫।

৭৭। শাব্বাত ৩১।

৭৮। আরোথ দে রাব্বা নাথান, ৬।

৭৯। লুই জ্যাকবস, *ফেইথ* (লন্ডন, ১৯৬৮), পৃ: ৭।

৮০। লেভিটিকাস রাব্বা ৮:২: সোতাহ ৯।

৮১। এক্সোডাস রাব্বা ৩৪: ১; হাগিগাহ ১৩; মেকিলত থেকে এক্সোডাস ১৫: ৩।

৮২। *বাবা মোতযিয়া* ৫৯।

৮৩। *মিশনা সালমস* ২৫,৬; সালমস ১৩৯;১; *তানহুমা* ৩: ৮০।

৮৪। জব প্রসঙ্গে মন্তব্য ১১: ৭; *মিশনাহ সালমস* ২৫: ৬।

৮৫। এভাবেই র‍্যাবাই ইয়োহান্নান বি, নাপপাচা, 'যে অতিরিক্ত ঈশ্বরের কথা বলে বা প্রসঙ্গ উচ্চারণ করে সে এই পৃথিবীটা থেকে উন্মূল হয়ে যাবে।'

৮৬। জেনেসিস রাব্বা ৬৮: ৯।

AMARBOI.COM

৮৭। বি. বারাকোথ ১০; লেভিটিকাস রাব্বা ৪:৮; সালমস বিষয়ে ইয়ালকুত; ৯০: ১; এক্সোডাস রাব্বা।

৮৮। বি. মিগিল্লাহ ২৯a।

৮৯। সঙ অভ সঙস রাব্বা ২; জেরুজালেম সুক্কাহ ৪।

৯০। নাম্বার্স রাব্বা ১১: ২ ডিউটেরোনমি রাব্বা ৭: ২, প্রোভার্বস ৮: ৩৪ এর ভিত্তিতে।

৯১। মেখিলতা দে র‍্যাবাই সিমোন এক্সোডাস ১৯: ৬ cf অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস ৪: ৩২ প্রসঙ্গে।

৯২। সঙ অভ সঙস রাব্বা ৮: ১২।

৯৩। সঙ অব সঙস প্রসঙ্গে ইয়ালকুত ১: ২।

৯৪। ডিউটেরোনমি প্রসঙ্গে সিফর ৩৬।

৯৫। এ. মারমর্স্টেইন, *দ্য ওল্ড রাব্বিনিক ডকট্রিন* অভ গড, *দ্য নেমস অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউস* অভ গড (অক্সফোর্ড, ১৯১৭), পৃ: ১৭১-৭৪।

৯৬। নিদ্দাহ ৩১b।

৯৭। স্যামুয়েল ২২ প্রসঙ্গে ইয়ালকুত; বি. ইয়েবামোত ২২b: এশতার প্রসঙ্গে ইয়ালকুত ৫: ২।

৯৮। জ্যাকব ই. নিউসনার, 'ভ্যারাইটিজ অভ জুদাইজম ইন দা ফরম্যাটিভ এজ', আরথার গ্রিন সম্পাদিত *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*, ২ খণ্ড (লন্ডন ১৯৮৬, ১৯৮৮) পৃ: ১৭২-৭৩।

৯৯। লেভিটিকাস প্রসঙ্গে সিফরা ১৯: ৮।

১০০। এক্সোডাস প্রসঙ্গে মেখিলত ২০: ১৩।

১০১। পারকি অ্যাবথ ৬: ৬; হোরায়োত ১৩a।

১০২। সান হেড্রিন ৪: ৫।

১০৩। বাবা মেতযিয়াহ ৫৮b।

১০৪। আরাকিন ১৫b।

## ৩. জেন্টাইলদের জন্যে আলো

১। মার্ক ১: ১৮, ১১। (১০,১১ পবিত্র বাইবেল)

২। মার্ক ১: ১৫ (১৪,১৫) প্রায়শঃ এর অনুবাদ করা হয়: ঈশ্বরের রাজ্য অত্যাসন্ন; তবে গ্রিক অনেক শক্তিশালী।

৩। দেখুন, গেযা ভার্মস, *জেসাস দ্য জু* (লন্ডন, ১৯৭৩০); পল জনসন, *আ হিস্ট্রি* অভ *দ্য জুজ* (লন্ডন, ১৯৮৭)

৪। ম্যাথু ৫: ১৭-১৯।

AMARBOI.COM

৫। ম্যাথু ৭: ১২।
৬। ম্যাথু ২৩।
৭। টি, সফ ১৩: ২।
৮। ম্যাথু ১৭: ২। (২-৩)
৯। ম্যাথু ১৭: ৫।
১০। ম্যাথু ১৭: ২০; মার্ক ১১: ২২-২৩।
১১।এডওয়ার্ড কনযের *বুদ্ধিজম: ইটস এসেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট* (অক্সফোর্ড, ১৯৫৯)-এর 'অষ্টসহস্রিকা' ১৫: ২৯৩, পৃ:১২৫।
১২। *ভগবদ-গীতা, কৃষ্ণ'জ কাউন্সিল ইন ওঅর* (নিউইয়র্ক, ১৯৮৬) XI, ১৪, পৃ: ৯৭।
১৩। প্রাগুক্ত, XI:২১,পৃ: ১০০।
১৪। প্রাগুক্ত, XI: ১৮, পৃ: ১০০।
১৫। গ্যালাশিয় ১: ১১; ১৪।
১৬। উদাহরণ হিসাবে দেখুন রোমান্স ১২: ৫; ১ করিন্থিয় ৪: ১৫; ২ করিন্থিয় ২: ১৭; ৫:১৭।
১৭। ১ করিন্থিয় ১: ২৪।
১৮। সেইন্ট পলের মুখে অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস-এর রচয়িতা দ্বারা উচ্চারিত সারমনে উদ্ধৃত ১৭: ২৮। উদ্ধৃতিটি সম্ভবত এসেছে এপিম্যানাইডস হতে।
১৯। ১ করিন্থিয় ১৫: ৪।
২০। রোমান্স ৬: ৪; গ্যালাশিয় ৫: ১৬-২৫; করিন্থিয় ৫: ১৭। এফিসিয়ান্স ২: ১৫।
২১। কলোশিয়ান্স ১: ২৪; এফিশিয়ান্স ৩: ১, ১৩; ৯: ৩; ১করিন্থিয় ১: ১৩
২২। রোমানস ১২-১৮।
২৩। ফিলিপ্পিয়ান্স ২: ৬-১১।
২৪। জন ১: ৩। (৩-৪)
২৫। ১ জন ১: ১।
২৬। অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস ২: ২।
২৭। প্রাগুক্ত ২: ৯,১০।
২৮। জোয়েল ৩: ১-৫।
২৯। অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস ২: ২২-৩৬।
৩০। প্রাগুক্ত ৭: ৪৮।
৩১। এ. ডি নক-এর *কনভারশন, দ্য ওল্ড অ্যান্ড দ্য নিউ ইন রিলিজিয়ন ফ্রম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট টু অগাস্টিন অভ হিপ্পোতে* উদ্ধৃত (অক্সফোর্ড, ১৯৯৩), পৃ: ২০৭।

AMARBOI.COM

৩২। *অ্যাড ব্যাপটিযানদোস, হোমিলি* ১৩: ১৪; উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথের *ফেইথ অ্যান্ড বিলিফ*-এ উদ্ধৃত (প্রিন্সটন, ১৯৭৯), পৃ: ২৫৯।

৩৩। ইরেনিউস প্রদত্ত বিবরণ, *হিরোসিস* I.I.I. 'ধর্মদ্রোহী'দের অধিকাংশ রচনাই ধবংস হয়ে গেছে, টিকে আছে কেবল প্রতিপক্ষের অর্থডক্স যুক্তিমালা।

৩৪। হিপ্পোলিতাস হেরেসিস ৭.২১.৪।

৩৫। ইরানিউস, হেরেসিস ১.৫.৩।

৩৬। হিপ্পোলিতাস, হেরেসিস ৮. ১৫. ১-২।

৩৭। ল্যুক ৬: ৪৩।

৩৮। ইরানিউস, হেরেসিস, ১.২৭. ২।

৩৯। তারতুলিয়ান, অ্যাগেইনস্ট মারসিয়ন, ১,৬,১।

৪০। অরিগেন, *অ্যাগেইনস্ট সেলসাস* ১,৯।

৪১। *এক্সোরটেশন টু দ্য গ্রিকস* ৫৯.২।

৪২। প্রাগুক্ত ১০.১০৬.৪।

৪৩। *দ্য টিচার*, ২.৩.৩৮১।

৪৪। *এক্সোরটেশন টুন দ্য গ্রিকস* ১.৮.৪।

৪৫। *হেরোসিস* ৫.১৬.২।

৪৬। এনিয়াডস ৫.৬।

৪৭। প্রাগুক্ত ৫.৩.১১।

৪৮। প্রাগুক্ত ৭.৩.২।

৪৯। প্রাগুক্ত ৫.২.১।

৫০। প্রাগুক্ত ৪.৩.৯।

৫১। প্রাগুক্ত ৪.৩.৯।

৫২। প্রাগুক্ত ৬.৭.৩৭।

৫৩। প্রাগুক্ত ৬.৯.৯।

৫৪। প্রাগুক্ত ৬.৯.৪।

৫৫। জারোস্লাভ পেলিক্যান, *দ্য ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাডিশন, আ হিস্ট্রি অভ দ্য ডেভেলপমেন্ট অভ ডকট্রিন* ৫ খণ্ড I, *দ্য ইমার্জেন্স অভ দ্য ক্যাথলিক ট্র্যাডিশন* (শিকাগো; ১৯৭১), পৃ: ১০৩।

## ৪. ট্রিনিটি: ক্রিশ্চান ঈশ্বর

১। উৎস হচ্ছেন গ্রেগরি অভ নাইসা।

২। বন্ধু ইউসিবিয়াসকে লেখা এক চিঠি ও থালিয়ায় রবার্ট সি. গেগ এবং

AMARBOI.COM

ডেনিস ই. গ্রহ'র *আর্লি অ্যারিয়ানিজম, আ ভিউ অভ স্যালভেশন*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৮১) পৃ: ৬৬।

৩। আরিয়াস, *এপিসল টু আলেকজান্ডার* ২।

৪। প্রোভার্বস ৮: ২২। পৃ: ৮১-৮২তে উদ্ধৃত।

৫। জন ১.৩। (৩-৪)

৬। জন ১.২।

৭। ফিলিপ্পিয়ান্স ২: ৬-১১, পৃ: ১০৫ এ উদ্ধৃত

৮। আরিয়াস, *এপিসল টু আলেকজান্ডার* ৬.২।

৯। আথানাসিয়াস, *অ্যাগেইনস্ট দ্য হীদেন*, ৪১।

১০। আথানাসিয়াস, *অন দ্য ইনকারনেশন* ৫৪।

১১। 'নাইসিন ক্রিড' নামে পরিচিত মতবাদগত ইশতেহারের সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে, যা আসলে ৩৮১ সালে কাউন্সিল অভ কনস্তান্তিনোপলে প্রণীত হয়েছিল।

১২। আথানাসিয়াস, *অন দ্য সিনদস অভ আরিমিনিয়াম অ্যান্ড সেলুসিয়া*, ৪১.১।

১৩। আথানাসিয়াস, *লাইফ অভ অ্যান্টনি*, ৬৭।

১৪। বাসিল, *অন দ্য হোলি স্পিরিট*, ২৮.৬৬।

১৫। প্রাগুক্ত।

১৬। গ্রেগরি অভ নাইসা, *অ্যাগেইনস্ট ইউনোমিউস* ৩।

১৭। গ্রেগরি অভ নাইসা, *অ্যানসার টু ইউনোমিউস*, সেকন্ড বুক।

১৮। গ্রেগরি অভ নাইসা, *লাইফ অভ মোজেস* ২.১৬৪।

১৯। বাসিল, *এপিসল* ২৩৪.১।

২০। *ওরেশন*, ৩১.৮।

২১। গ্রেগরি অভ নাইসা, *নট থ্রি গডস*।

২২। জি, এল, প্রেসটিজ, *গড ইন প্যাট্রিসটিক থট* (লন্ডন, ১৯৫২) পৃ: ৩০০।

২৩। গ্রেগরি অভ নাইসা, *নট থ্রি গডস*।

২৪। গ্রেগরি অভ নাযিয়ানযাস, *ওরেশন*, ৪০: ৪১।

২৫। গ্রেগরি অভ নাযিয়ানযাস, *ওরেশন*, ২৯: ৬-১০।

২৬। বাসিল, এপিসল, ৩৮: ৪।

২৭। *অন দ্য ট্রিনিটি*,vii ৪.৭।

২৮। *কনফেশনস* ১.১, অনু. হেনরি চ্যাডউইক, (অক্সফোর্ড, ১৯৯১)পৃ: ৩।

২৯। প্রাগুক্ত, VII, vii (১৭) পৃ: ১৪৫।

৩০। প্রাগুক্ত VII xii (২৮) পৃ: ১৫২।

৩১। প্রাগুক্ত VII, xii (২৯), পৃ: ১৫২-৫৩। অনুচ্ছেদটি নেওয়া হয়েছে সেইন্ট

AMARBOI.COM

পল, রোমান্স ১৩: ১৩-১৪ হতে।

৩২। প্রাগুক্ত x, xvii (২৬) পৃ: ১৯৪।

৩৩। প্রাগুক্ত x xvii (২৬) পৃ: ২০১।

৩৪। প্রাগুক্ত।

৩৫। *অন দ্য ট্রিনিটি* VIII, ii ৩।

৩৬। প্রাগুক্ত।

৩৭। প্রাগুক্ত X.x. ১৪।

৩৮। প্রাগুক্ত X, xi .১৮।

৩৯। প্রাগুক্ত।

৪০। অ্যান্ড্রু লোউদ, *দ্য অরিজিনস অভ দ্য ক্রিশ্চান মিস্টিকাল ট্র্যাডিশন* (অক্সফোর্ড, ১৯৮৩) পৃ: ৭৯।

৪১। অগাস্টিন, *অন দ্য ট্রিনিটি* xiii।

৪২। প্রাগুক্ত।

৪৩। এনশিরিডিয়ন ২৬,২৭।

৪৪। *অন ফিমেইল ড্রেস*।

৪৫। চিঠি, ২৪৩, ১০।

৪৬। *দ্য লিটারেল মীনিং অভ জেনেসিস*, ii, ৫, ৯।

৪৭। চিঠি, xi,

৪৮। প্রাগুক্ত।

৪৯। *দ্য সেলেস্টিয়াল হায়ারার্কি*।

৫০। *দ্য ডিভাইন নেমস* ১, ৯।

৫১। প্রাগুক্ত, VII ৩।

৫২। প্রাগুক্ত, XIII ৩।

৫৩। প্রাগুক্ত, VII ৩।

৫৪। প্রাগুক্ত।

৫৫। *মিস্টিক্যাল থিওলজি*, ৩।

৫৬। *দ্য ডিভাইন নেমস*, IV, ৩।

৫৭। *অ্যাম্বিগুয়া*, মাইন, PG ৯১, ১০৮৮C।

## ৫. একত্ব: ইসলামের ঈশ্বর

১। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরা* ১৪৫, এ. গিয়োম অনূদিত *দ্য লাইফ অভ মুহাম্মদ*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৫৫) পৃ: ১৬০।

২। কোরান ৯৬: ১। (১-৫) মুহাম্মদ আসাদ তাঁর অনুবাদে বন্ধনীতে শব্দগুচ্ছ

AMARBOI.COM

সংযোজনের মাধ্যমে কোরানের অলৌকিক বাণীতে সম্পূরক দিয়েছেন। (বাংলা অনুবাদ ইসলামি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *কুরআনুল করিম* হতে গৃহীত—অনুবাদক)।

৩। ইবন ইসহাক, *সিরা*, ১৫৩ গিয়োম অনু. *দ্য লাইফ অভ মুহাম্মদ* গ্রন্থে, পৃ: ১০৬।

৪। প্রাগুক্ত।

৫। জালাল আদ-দিন সুয়ূতি, *আল-ইতিক্কান ফি'উলুম আল আক'রান*, রডিনসনের *মোহাম্মদ*-এ, অনু. অ্যান কার্টার (লন্ডন, ১৯৭১), পৃ: ৭৪।

৬। বুখারি, *হাদিস* ১.৩ মার্টিন লিংস-এর *মুহাম্মদ, হিজ লাইফ বেজড অন দ্য আর্লিয়েস্ট সোর্সেস*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৮৩), পৃ: ৪৪-৫৫।

৭। 'একপোসটিলিউলেশন অ্যান্ড রিপ্লাই।'

৮। কোরান ৭৫: ১৭-১৯ (১৬-১৯)।

৯। কোরান ৪২: ৭।

১০। কোরান ৮৮: ২১-২২।

১১। কোরান ২৯: ৬১-৬৩ (৬১,৬৩)

১২। কোরান ৯৬: ৬-৮

১৩। কোরান ৮০: ২৪-৩২ (১৭-৩২)।

১৪। কোরান ৯২: ১৮; ৯: ১০৩; ৬৩: ৯; ১০২: ১।

১৫। কোরান ২৪: ১, ৪৫।

১৬। কোরান ২: ১৫৮-৫৯ (১৫৮)।

১৭। কোরান ২০: ১১৪-১৫ (১১৩-১৪)।

১৮। ইবন ইসহাক, *সিরা* ২২৭, গিয়োম অনু. *দ্য লাইফ অভ মুহাম্মদ*-এ পৃ: ১৫৯।

১৯। প্রাগুক্ত, ২২৮, পৃ: ১৫৮।

২০। জর্জ স্টেইনার, *রিয়েল প্রেজেন্স, ইজ দেয়ার এনিথিং ইন হোয়াট উই সে?* (লন্ডন, ১৯৯১), পৃ: ১০৮-১৭।

২১। কোরান ৫৩: ১৯-২৬ (১৯-২৩)

২২। ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *মুহাম্মদ: আ ওয়েস্টার্ন অ্যাটেম্পট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইসলাম* (লন্ডন, ১৯৯১), পৃ: ১০৮—১৭।

২৩। কোরান ১০৯।

২৪। কোরান ১১২।

২৫। সাইয়ীদ হুসেইন নাসর রচিত, সম্পাদিত *'গড' ইসলামিক স্পিরিচ্যুলিটি: ফাউন্ডেশন*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৮৭), পৃ: ৩২১।

২৬। কোরান ২:১১।

AMARBOI.COM

২৭। কোরান ৫৫: ২৬ (২৬-২৭)

২৮। কোরান ২৪: ৩৫।

২৯। আর্মস্ট্রং, মুহাম্মদ, পৃ: ২১-৪৪; ৮৬-৮৮।

৩০। কোরান ২৯: ৪৬

৩১। ইবন ইসহাক, *সিরা* ৩৬২, গিয়োম অনু. *দ্য লাইফ অভ মুহাম্মদ*-এ পৃ: ২৪৬।

৩২। *আহল আল-কিতাব*, মুহাম্মদ আসাদ অনূদিত, সাধারণভাবে 'ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্ত জতি' বুঝিয়ে থাকে।

৩৩। কোরান ২: ১৩৫-৩৬।

৩৪। আলি শরিয়তি, হজ্জ, অনু. লালেহ বখতিয়ার (তেহরান, ১৯৮৮), পৃ: ৫৪-৫৬।

৩৫। কোরান ৩৩: ৩৫।

৩৬। সাইয়ীদ হুসেইন নাসর'র *দ্য সিগনিফিকেন্স অভ দ্য সুন্নাহ অ্যান্ড হাদিস*, *ইসলামিক স্পিরিচ্যুয়ালিটি*, পৃ: ১০৭-৮।

৩৭। ১ জন ১.১.।

৩৮। ডব্লু. মন্টগোমারি ওয়াট, *ফ্রি উইল অ্যান্ড প্রিডেস্টিনেশন ইন আর্লি ইসলাম* (লন্ডন, ১৯৪৮), পৃ: ১৩৯।

৩৯। আবু আল-হাসান ইবন ইসমাইল আলি আশারি, *মালাকাত* ১-১৯৭, এ জে. উইনা সিঙ্কের *দ্য মুসলিম ক্রীড, ইটস জেনেসিস অ্যান্ড হিস্ট্রিক্যাল ডেভেলপমেন্ট*-এ উদ্ধৃত (কেমব্রিজ, ১৯৩২), পৃ: ৬৭-৬৮।

AMARBOI.COM

## ৬. দার্শনিকদের ঈশ্বর

১। আর, ওঅলযার অনূদিত 'ইসলামিক ফিলোসফি,' এস. এইচ, নাসর-এর 'থিওলজি, ফিলোসফি অ্যান্ড স্পিরিচ্যুয়ালিটি,' *ইসলামিক স্পিরিচ্যুয়ালিটি মেনিফেস্টেশনস* (লন্ডন, ১৯৯১), যা তিনিই সম্পাদনা করেছেন, পৃ: ৪১১।

২। কারণ দুজনই ইরানের রাষ্ট হতে আগত।

৩। এস. এইচ. নাসর-এর *ইসলামিক স্পিরিচুয়ালিটি: ফাউন্ডেশন*-এ উদ্ধৃত আজিম নানজি'র 'ইসমাইলিজম'-এ উদ্ধৃত যা তিনি নিজেই সম্পাদনা করেছেন (লন্ডন ১৯৮৭), পৃ: ১৯৫-৯৬।

৪। দেখুন হেনরি করবিনের *স্পিরিচুয়াল বডি অ্যান্ড সেলেস্টিয়াল আর্থ, ফ্রম ম্যাযদিন ইরান টু শিয়াহ ইরান*, অনু. ন্যান্সি পিয়ারসন, (লন্ডন, ১৯৯০), পৃ: ৫১-৭২।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

৬। রাসাই'ইল I, ৭৬, মাজিদ ফখরির *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফি*তে উদ্ধৃত, (নিউইয়র্ক এবং লন্ডন, ১৯৭০), পৃ: ১৯৩।

৭। রাসাই'ইল IV, ৪২ প্রাগুক্তে, পৃ: ১৮৭।

৮। *মেটাফিজিক্স* XII. ১০৭৪b, ৩২।

৯। *আল-মুনদিখ আল-দালাল*, অনুবাদ. ডব্লু, মন্টগোমারি ওয়াটের *দ্য ফেইথ অ্যান্ড প্র্যাকটিস অভ আল গাযযালি*তে (লন্ডন, ১৯৫৩), পৃ: ২০।

১০। জন বাউকারের *দ্য রিলিজিয়াস ইমাজিশেন অ্যান্ড সেন্স অভ গড*-এ উদ্ধৃত (অক্সফোর্ড ১৯৭৮) পৃ: ২০২।

১১। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ আল-গাযযালির রচনা পাঠের সময় তাঁকে ফায়লাসুফ ভেবেছিলেন।

১২। মুনদিখ, ওয়াটের *দ্য ফেইথ অ্যান্ড প্র্যাকটিস* অভ *আল*-গাযযালি, পৃ: ৫৯।

১৩। বাউকার, *দ্য রিলিজিয়াস ইমাজিনেশন অ্যান্ড দ্য সেন্স অভ গড*, পৃ: ২২২-২৬।

১৪। কোরান ২৪: ৩৫, পৃ: ১৭৬-৭৭-এ উদ্ধৃত।

১৫। *মিশকাত-আল-আনওয়ার* ফখরির *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফি* পৃ: ২৭৮-এ উদ্ধৃত।

১৬। কুযারি, দ্বিতীয় খণ্ড, জে, অ্যাবেলসনের *দ্য ইমেন্যান্স অভ গড ইন রাব্বিনিক লিটারেচার*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন ১৯২২), পৃ: ২৫৭।

১৭। কোরান ৩: ৫।

১৮। ফখরির *আ স্টোরি অভ ইসলামিক ফিলোসফি*তে প্রদত্ত তালিকা; পৃ: ৩১৩-১৪।

১৯। জুলিয়াস গাটমান রচিত ডেভিড ডব্লু সিলভারম্যান অনূদিত *ফিলোসফিজ অভ জুদাইজম, দ্য হিস্ট্রি অভ জুইশ ফিলোসফি ফ্রম বিবলিক্যাল টাইম টু ফ্রানয রোজেনসভিগ*-এ প্রদত্ত তালিকা (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪), পৃ: ১৭৯।

২০। অ্যাবেলসনের *দ্য ইমেন্যান্স অভ গড ইন রাব্বিনিক লিটারেচার*-উদ্ধৃত, পৃ: ২৪৫।

২১। প্রাথমিক ক্রুসেডিয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *হোলি ওঅর, দ্য ক্রুসেডস অ্যান্ড দেয়ার ইমপ্যাক্ট অন টুডেজ ওঅর্ল্ড* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯১; লন্ডন, ১৯৯২), পৃ: ৪৯-৭৫।

২২। *একসপোজিশন অভ দ্য সেলেস্টিয়াল হায়ারার্কি* ২.১।

২৩। *পেরিফসান, মইন* PI,৪২৬ C-D।

AMARBOI.COM

২৪। প্রাগুক্ত ৪২৮৭B।

২৫। প্রাগুক্ত, ৬৮০D-৬৮১-A [।

২৬। প্রাগুক্ত।

২৭। ভ্লাদিমির লস্কি, *দ্য মিস্টিক্যাল থিওলজি অভ দ্য ইস্টার্ন চার্চ* (লন্ডন, ১৯৫৭), পৃ: ৫৭-৬৫।

২৮। *মনোলজিয়ান*।

২৯। *প্রসলজিয়োন*।

৩০। *প্রসলজিয়োন*, ইসায়াহর ওপর মন্তব্য ৭:৯।

৩১। জন ম্যাকুকয়ারি, *ইন সার্চ অভ ডেইটি, অ্যান অ্যাসে ইন ডায়ালেকিটক্যাল থিইজম* (লন্ডন, ১৯৮৫), পৃ: ২০১-২।

৩২। এপিসল ১৯১.১।

৩৩। হেনরি অ্যাডামসের *মন্ট সেইন্ট-মাইকেল অ্যান্ড চার্ট্রেস* (লন্ডন, ১৯৮৬), পৃ: ৯৯৬।

৩৪। আর্মস্ট্রং,*হোলি ওঅর*, পৃ: ১৯৯-২৩৪।

৩৫। তোমাস আকুইনাস, *দে প্রোটেনশিয়া*।

৩৬। *সুম্মা থিওলজিয়া* ১৩, ১১।

৩৭। *দ্য জার্নি অভ দ্য মাইন্ড টু গড*, ৬.২।

৩৮। প্রাগুক্ত, ৩.১।

৩৯। প্রাগুক্ত, ১.৭।

AMARBOI.COM

## ৭. অতিন্দ্রীয়বাদীদের ঈশ্বর

১। জন ম্যাককুয়ারি, *থিংকিং অ্যাবাউট গড* (লন্ডন, ১৯৫৭), পৃ: ৩৪।

২। হ্যাগিগাহ ১৪b সালমস ১০১: ৭; ১১৬: ১৫; ২৫: ২৬-এ উদ্ধৃত।

৩। লুই জ্যাকবস-এর *দ্য জুইশ মিসটিকস*-এ উদ্ধৃত (জেরুজালেম, ১৯৭৬; লন্ডন, ১৯৯০), পৃ: ২৩।

৪। ২ করিন্থিয় ২: ২-৪

৫। দ্য সঙ অভ সঙস, ৫: ১০-১৫।

৬। টি. কারমি অনু. ও সম্পা. *দ্য পেঙ্গুইন বুক অভ হিব্রু ভার্স*-এ অনূদিত (লন্ডন, ১৯৮১) পৃ: ১৯৯।

৭। কোরান ৫৩: ১৩-১৭ (১৩-১৮)।

৮। কনফেশনস IX 24. অনু. হেনরি চ্যাডউইক (অক্সফোর্ড, ১৯৯১), পৃ: ১৭১।

৫৩। গারশম শোলেমের *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*-এ উদ্ধৃত 'সঙ অভ ইউনিটি' দ্বিতীয় সংস্করণ (লন্ডন, ১৯৪৫), পৃ: ১০৮।

৫৪। প্রাগুক্ত পৃ: ১১।

৫৫। গারশম শোলেম অনু. ও সম্পা. *দ্য যোহার, দ্য বুক অভ স্প্লেন্ডর*-এ (নিউইয়র্ক, ১৯৪০) পৃ: ২৭।

৫৬। প্রাগুক্ত।

৫৭। শোলেম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, পৃ: ১৩৬।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।

৫৯। জে. সি. ক্লার্কের মেইস্তার একহার্ত, *অ্যান ইন্ট্রোডিকশন টু দ্য স্টাডি অভ হিজ ওঅর্কস উইদ অ্যান অ্যানথোলজি অভ হিজ সারমনস*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৫৭), পৃ: ২৮।

৬০। লুই দুপ্রে ও ডন ই. সোলিয়ার্স সম্পা. *ক্রিশ্চান স্পিরিচ্যুয়ালিটি*-তে সাইমন টাগওয়েল-এর 'ডোমিনিক্যান স্পিরিচ্যুয়ালিটি' (লন্ডন, ১৯৫৭) পৃ: ২৮।

৬১। ক্লার্কের *মেইস্তার একাহার্ত*-এ উদ্ধৃত।

৬২। আর. বি. ব্ল্যাকেনি অনূদিত মেইস্তার একহার্ত, *আ নিউ ট্রান্সলেশন*-এ সারমন "কুই অদিত মি নন কতফান্দিতুর" (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭) পৃ: ২০৪।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৮।

৬৪। এডমান্ড কলেজ ও বার্নার্ড ম্যাকগিন সম্পা. ও অনু. *মেইস্তার একহার্ত : দ্য এসেনশিয়াল সারমনস, কমেন্টারিজ, ট্রিটাইজ অ্যান্ড ডিফেন্স*-এ 'অন ডিটাচমেন্ট' (লন্ডন, ১৯৮১) পৃ' ৮৭।

৬৫। *থিওফেনস*, ৯৩২ (ইটালিকস আমার)।

৬৬। হোমিলি, ১৬।

৬৭। ট্রাইয়াডস ১.৩–৪৭।

AMARBOI.COM

## ৮. সংস্কারকদের ঈশ্বর

১। মাজিদ ফাখরি'র *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফিতে* উদ্ধৃত *মাজমা' আত আল রা'সাইইল* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৭০) পৃ: ৩৫১।

২। মার্শাল জি. এস., হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম, কনশিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন* ৩ খণ্ড (শিকাগো, ১৯৭৪) II পৃ: ৩৩৪-৬০।

৩। *কিতাব আল হিকমাত আল-আরশিয়া*, হেনরি করবিনের *স্পিরিচ্যুয়াল বডি অ্যান্ড সেলেস্টিয়াল আর্থ, ফ্রম মাযদিন ইরান টু শিয়াহ্ ইরান*, অনু. ন্যান্সি পিয়ারসন (লন্ডন, ১৯৯০), পৃঃ ১৬৬।

৪। এম, এস. রাশচিদ-এ উদ্ধৃত *ইকবাল'স কনসেপ্ট অভ গড* (লন্ডন, ১৯৮১), পৃঃ ১০৩-৪।

৫। গারশেম শোলেমের *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, ২য় সংস্ক-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৫৫) পৃঃ ২৫৩।

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১; লুরিয় কাব্বালাহর জন্যে আরও দেখুন *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুদাইজম অ্যান্ড আদার এইজ ইন জুইশ স্পিরিচ্যুয়ালিটি* (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৭), পৃঃ ৪৩-৪৮; আর. এ. জে. যিউইওয়েবলস্কি, *দ্য সেফেদ রিভাইভাল অ্যান্ড ইটস আফটারমাথ;* আর্থার গ্রিনয সম্পাদিত *জুইশ স্পিরিয়াচুলিটি*, ২য় খণ্ডে, (লন্ডন ১৯৮৬, ১৯৮৮) ।।: জ্যাকব কাটয, 'হানাকাহ্ অ্যান্ড কাব্বালাহ্ অ্যাজ কম্পিটিং ডিসিপ্লিনস অভ স্টাডি' প্রাগুক্তে; লরেন্স ফাইন, 'দ্য কনটেমপ্লেটিভ প্র্যাকটিস অভ ইয়েহুদিম ইন লুরিয়ানিক কাব্বালাহ', প্রাগুক্তে; লুই জ্যাকবস, 'দ্য আপলিফটিং অভ দ্য স্পাকর্স ইন লুরিয়ানিক কাব্বালাহ, 'দ্য আপলিফটিং অভ দ্য স্পার্কস ইন লেটার জুইশ মিস্টিসিজম,' প্রাগুক্তে।

৭। *দ্য মাউন্টেন অভ কনটেমপ্লেশন*, ৪।

৮। টমাস এ, কেমপিস, *দ্য ইমিটেশন অভ ক্রাইস্ট*, অনু. লিও শার্লি পুলে (হারমন্ডসওর্থ, ১৯৫৩), পৃঃ ২৭।

৯। রিচার্ড কিকহাফার, 'মেজর কারেন্টস ইন লেট মোডিয়াভেল ডিভোশন', জিল রাইয়েট সম্পাদিত *ক্রিশ্চান স্পিরিচ্যুয়ালিটি: হাই মিডল এজেস অ্যান্ড রিফরমেশনস*-এ (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৮৯), পৃঃ ৮৭।

১০। জুলিয়ান অভ নরউইচ, *রিভেলেশনস অভ ডিভাইন লাভ*, অনু. ক্লিফটন ভলটার্স (লন্ডন, ১৯৮১), ১৫, পৃঃ ৮৭-৮৮।

১১। উইলিয়াম জে. বাউসমের 'দ্য স্পিরিচ্যুলিটি অভ রেনেইসা হিউম্যানিজম'-এ উদ্ধৃত; *এনকোনিয়াম স্যাঙ্কটি টমা আকুইনাটিস*, রাইয়েট-এর *ক্রিশ্চান স্পিরিচ্যুয়ালিটিতে* পৃঃ ২৪৪।

১২। ডেভিড টম্পসন সম্পাদিত *পেট্রার্চ, আ হিউম্যানিস্ট অ্যামাঙ প্রিন্সেস: অ্যান অ্যানথলজি অভ পেট্রার্চস লেটারস অ্যান্ড ট্রান্সলেশন্স ফ্রম হিজ ওর্কস*-এ ডিসেম্বর ০২, ১৩৪৮ তারিখে ভাই গোরাদোকে লেখা চিঠি (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১), পৃঃ ৯০।

১৩। চার্লস ট্রিস্কোউসের *দ্য পোয়েট অ্যাজ ফিলোসফর: পেট্রার্চ অ্যান্ড দ্য ফরমেশন অভ রেনেইসাঁ কনশসনেস*-এ উদ্ধৃত (নিউ হাভেন, ১৯৭৯০) পৃ; ৮৭।

AMARBOI.COM

১৪। *অভ লার্নেড ইগনোরেন্স*, I, ২২।

১৫। *অন পসিবিলিটি অ্যান্ড বিইং ইন গড*, ১৭.৫।

১৬। নরম্যান কন, *ইউরোপ'স ইনার ডিমনস* (লন্ডন, ১৯৭৬)

১৭। অ্যালিস্টার, ম্যাকগ্রাথ-এর *রিফরমেশন থট, অ্যান ইনট্রোডাকশন*-এ উদ্ধৃত ( অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮), পৃ: ৭৩।

১৮। *কমেন্টারি অন সালমস্* ৯০.৩।

১৯। *কমেন্টারি অন গ্যালিতিয়ানস* ৩.১৯।

২০। ম্যাকগ্রাথ'র *রিফরমেশন থট*-এ উদ্ধৃত, পৃ: ৭৪।

২১। ১ করিন্থিয় ১.২৫।

২২। *হাইডেলবার্গ ডিসপুটেশন*, ২১।

২৩। প্রাগুক্ত, ১৯-২০।

২৪। প্রাগুক্ত।

২৫। জারোস্লাভ পেলিক্যানের *দ্য ক্রিশ্চান ট্রাডিশন, আ হিস্ট্রি অভ দ্য ডেভেলপমেন্ট অভ ডগমা*, ৫ খণ্ড, IV, *রিফরমেশন অভ চার্চ অ্যান্ড ডগমা*-এ উদ্ধৃত (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৮৪) পৃ: ১৫৬।

২৬। *কমেনট্রি অন গ্যালাতিয়ান্স*, ২.১৬।

২৭। *এথিক্যাল ওরেশনস* ৫।

২৮। *স্মল ক্যাটেশিজম* ২.৪। পেলিক্যানের *রিফরমেশন অভ চার্চ*-এ উদ্ধৃত, পৃ: ১৬১ (ইটালিকস আমার)।

২৯। অ্যালিস্টেয়ার ই. ম্যাকগ্রাথ, *আ লাইফ অভ জন কালভিন, আ স্টাডি ইন দ্য শেপিং অভ ওয়েস্টার্ন কালচার* (অক্সফোর্ড ১১৯০) পৃ:৭।

৩০। ম্যাকগ্রাথের প্রাগুক্তে উদ্ধৃত, পৃ: ১৫১।

৩১। *ইন্সটিটিউটস অভ দ্য ক্রিশ্চান রিলিজিয়ন*, I xiii. ২।

৩২। পেলিক্যানের *রিফরমেশন অভ চার্চ*-এ উদ্ধৃত পৃ: ৩২৭।

৩৩। যিনযেনদর্ফ, প্রাগুক্তে উদ্ধৃত, পৃ: ৩২৬।

৩৪। ম্যাকগ্রাথের *রিফরমেশন থট*-এ উদ্ধৃত পৃ: ৮৭।

৩৫ ম্যাকগ্রাথ, *আ লাইফ অভ কালভিন* , পৃ: ৯০।

৩৬। উইলিয়াম জেমস, *দ্য ভ্যারাইটিজ অভ রিলিজিয়াস এক্সপেরিয়েন্স*, সম্পা. মারটিন ই. মারটি (নিউইয়র্ক ও হারমন্ডসওঅর্থ, ১৯৮২), পৃ: ১২৭-৮৫।

৩৭। জন বসি, *ক্রিশ্চানিটি ইন দ্য ওয়েস্ট, ১৪০০-১৭০০* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৫), পৃ: ৯৬।

৩৮। ম্যাকগ্রাথ, *আ লাইফ অভ কালভিন*, পৃ: ২০৯-৪৫।

৩৯। আর, সি, লাভলেস 'পিউরিটান স্পিরিচ্যুয়ালিটি; দ্য সার্চ ফর আ রাইটলি রিফরমড চার্চ,' লুই দুপ্রে ও ডন ই. স্যালিয়ার্স সম্পাদিত *ক্রিশ্চান*

AMARBOI.COM

*স্পিরিচুয়্যালিটি: পোস্ট রিফরমেশন অ্যান্ড মডার্ন*-এ (নিউ ইয়র্ক লন্ডন, ১৯৮৯), পৃ: ৩১৩।

৪০। দ্য স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজেস ২৩০।

৪১। উগো রাহনার এসজের *ইগনেশিয়াস, দ্য থিওলজিয়ান*-এ উদ্ধৃত; অনু. মাইকেল ব্যারি (লন্ডন, ১৯৬৮), পৃ: ২৩।

৪২। পেলিক্যানের *দ্য ক্রিশ্চান ডকট্রিন অ্যান্ড মডার্ন কালচার* (সিন্স ১৭০০)-এ উদ্ধৃত (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৮৯), পৃ: ৩৯।

৪৩। লুসিয়েন ফেভ্রে, *দ্য প্রবলেম অভ আনবিলিফ ইন দ্য সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি, দ্য রিলিজিয়ন অভ রিবেলাইজ* অনু. বিয়েত্রিস গতলিব (ক্যামব্রিজ, ম্যাস ও লন্ডন, ১৯৮২), পৃ: ৩৫১।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫৫-৬।

৪৫। জে. সি. ডেভিস-এর *ফিয়ার, মিথ অ্যান্ড হিস্ট্রি, দ্য র‍্যান্টারস অ্যান্ড দ্য হিস্টোরিয়ান্স*-এ উদ্ধৃত, (ক্যামব্রিজ, ১৯৮৬), পৃ: ১১৪।

৪৬। ম্যাকগ্রাথ, *আ লাইফ অভ জন কালভিন*, পৃ: ১৩১।

৪৭। রবার্ট এস, ওয়েস্টম্যান'র 'দ্য কোপারনিকানস অ্যান্ড দ্য চার্চেস'-এ উদ্ধৃত, ডেভিড সি. লিন্ডবার্গ ও রোনাল্ড এল. নাম্বার্স সম্পা. *গড অ্যান্ড নেচার: হিস্ট্রিক্যাল এসেজ ইন দ্য এনকাউন্টার বিটুইন ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড সায়েন্স*-এ (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলস ও লন্ডন, ১৯৮৬), পৃ: ৮৭।

৪৮। সালমস ৯৩:১; একলেসিয়াসটিকাস ১:৫; সালমস্ ১০৪:১৯।

৪৯। উইলিয়াম আর. শিয়া, 'গ্যালিলিও অ্যান্ড দ্য চার্চ,' লিন্ডবার্গ ও নাম্বার্স সম্পা. *গড অ্যান্ড নেচার*-এ পৃ: ১২৫।

AMARBOI.COM

## ৯. আলোকন

১। ব্লেইজ পাসকালের *পেনসিস* হতে গৃহীত টেক্সট, অনু. ও সম্পা. এ. জে. ক্রেইলশেইমার (লন্ডন, ১৯৬৬) পৃ: ৩০৯।

২। *পেনসিস*, ৯১৯।

৩। প্রাগুক্ত, ১৯৮।

৪। প্রাগুক্ত, ৪১৮।

৫। প্রাগুক্ত, ৯১৯।

৬। প্রাগুক্ত, ৪১৮।

৭। রোমানস ১.১৯-২০।

৮। রেনে দেকার্তে, *আ ডিসকোর্স অন মেথড, এটসেটেরা*, অনু. জে. ভেইচ (লন্ডন ১৯১২) ২.৬.১৯।

৯। রেনে দেকার্তে, *ডিসকোর্স অন মেথড, অপটিকস, জিওমেট্রি অ্যান্ড মেটিওরোলজি*, অনু. পল. জে. ওলসক্যাম্প (ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৬৫) পৃ: ২৬৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬১।

১১। এ. আর. হল ও এল. টিলিং সম্পা. *দ্য করেসপন্ডেন্স অভ ইসাক নিউট*-এ উদ্ধৃত, ৩ খণ্ড (ক্যামব্রিজ ১৯৫৯-৭৭), ডিসেম্বর ১০, ১৬৯২, III, পৃ: ২৩৪-৩৫।

১২। জানুয়ারি ১৭, ১৯৯৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪০।

১৩। ইসাক নিউটন, *ফিলোসোফিয়া নেচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা*, অনু. অ্যান্ড্রু মোটি, সম্পা. ফ্লোরিয়ান কাজভি (বার্কলি, ১৯৩৪), পৃ: ৩৪৪-৪৬।

১৪। 'করাপশন অভ ক্রিপচার্স' রিচার্ড এস. ওয়েস্টফলের *দ্য রাইজ অভ সায়েন্স অ্যান্ড ডিক্লাইন অভ অর্থডক্স ক্রিশ্চানিটি: আ স্টাডি অভ কেপলার, দেকার্তে অ্যান্ড নিউটন*-এ উদ্ধৃত, ডেভিড সি. সিলবার্গ ও এল. নাম্বার্স সম্পা. *গড অ্যান্ড নেচার, হিস্ট্রিক্যাল এসেজ অন দ্য এনাকউন্টার বিটুইন ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড সায়েন্স*-এ (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলেস ও লন্ডন, ১৯৮৬), পৃ: ২৩১।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩১-৩২।

১৬। জারোস্লাভ পেলিক্যানের *দ্য ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশন, আ হিস্ট্রি অভ দ্য ডেভেলপমেন্ট অভ ডকট্রিন*, ৫ খণ্ড, V, *ক্রিশ্চান ডকট্রিন অ্যান্ড মডার্ন কালচার (সিন্স ১৭০০)* (শিকাগো এবং লন্ডন, ১৯৮৯) পৃ: ৬৬।

AMARBOI.COM

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০১।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩।

২০। *প্যারাডাইস লস্ট*, তৃতীয় পুস্তক, লাইন ১১৩-৯, ১২৪-২৮।

২১। ফ্রাঁসোয়া-ম্যারি দে ভলতেয়ার, *ফিলসফিক্যাল ডিকশনারি* অনু. থিওদর বেস্তারমান (লন্ডন, ১৯৭২), পৃ: ৩৫৭।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭।

২৩। পল জনসনের *আ হিস্ট্রি অভ জুজ*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৮৭), পৃ: ২৯০।

২৪। বারুচ স্পিনোযা, *আ থিওলজিকো-পলিটিক্যাল ট্রিটাইজ*, অনু. আর. এইচ. এম. এলওয়েস (নিউইয়র্ক, ১৯৫১), পৃ: ৬।

২৫। পেলিক্যানের *ক্রিশ্চান ডকট্রিন অ্যান্ড মডার্ন কালচার*-এ উদ্ধৃত, পৃ; ৬০

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০।

২৭। শেরউড এলিয়ট ওয়ার্ট সম্পা. *স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়াকেনিং: ক্লাসিক*

*রাইটিংস অভ দ্য এইটিন্থ সেঞ্চুরি ডিভোশনস টু ইন্সপায়ার অ্যান্ড হেল্প দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি রিডার* (ট্রিং, ১৯৮৮), পৃ:৯।

২৮। অ্যালবার্ট সি. আউটলার সম্পা. *জন ওয়েসলি: রাইটিংস* ২ খণ্ড (অক্সফোর্ড ও নিউইয়র্ক, ১৯৬৪), পৃ: ১৯৪-৯৬।

২৯। পেলিক্যান, *ক্রিশ্চান ডকট্রিন অ্যান্ড মডার্ন কালচার*, পৃ: ১২৫।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ; ১২৬।

৩১। জর্জ টিকেল এসজে'র *দ্য লাইফ অভ ব্লেসড মাগারেট ম্যারিতে* উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৮৯০) পৃ; ২৫৮।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২১।

৩৩। স্যামুয়েল শ' *কমিউনিয়ন উইদ গড*, অ্যালবার্ট সি. আউটলারের *পিয়েটিজম অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট অ্যান্টারনেটিভস টু ট্র্যাডিশন*-এ উদ্ধৃত, লুই দুপ্রে ও ডন ই. স্যালিয়ার্স সম্পা. *ক্রিশ্চান স্পিরিচ্যুয়ালিটি, পোস্ট রিফরমেশন অ্যান্ড মডার্ন* (নিউইয়র্ক, লন্ডন, ১৯৮৯), পৃ: ২৪৫।

৩৪। প্রাগুক্ত, ২৪৮।

৩৫। নরম্যান কন, *দ্য পারস্যুট অভ দ্য মিলেনিয়াম, রিভ্যুলুশনারি মিলেনারিয়ানস অ্যান্ড মিস্টিক্যাল অ্যানার্কিস্ট অভ দ্য মিডল এজেস* (লন্ডন, ১৯৭০) পৃ: ১৭২।

AMARBOI.COM

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৩।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৪।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯০।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৩।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৪।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৫।

৪২। ওয়াট সম্পাদিত *স্পিরিচ্যুয়াল অ্যাওয়াকেনিং*-এ উদ্ধৃত পৃ: ১১০।

৪৩। প্রাগুক্তে উদ্ধৃত পৃ: ১১৩।

৪৪। অ্যালান হেইমার্ট, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ্য আমেরিকান মাইন্ড, ফ্রম দ্য গ্রেট অ্যাওয়াকেনিং টু দ্য রিভোল্যুশন* (ক্যামব্রিজ, ম্যাস, ১৯৬৮), পৃ: ৪৩।

৪৫। প্রাগুক্ত-এ উদ্ধৃত, *অ্যান অ্যাসে অন দ্য ট্রিনিটি*, পৃ: ৬২-৬৩।

৪৬। প্রাগুক্তে পৃ: ১০১।

৪৭। আলেকজান্ডার গর্ডন ও স্যামুয়েল কুইনসির মন্তব্য, প্রাগুক্তে উদ্ধৃত, পৃ: ১৬৭।

৪৮। গারশম শোলেম, *স্যাব্বাতি সেভি* (প্রিন্সটন, ১৯৭৩)।

৪৯। গারশম শোলেমের 'রিডেম্পশন থ্রু সিন'-এ উদ্ধৃত, *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুডাইজম অ্যান্ড আদার অ্যাসেজ অন জুইশ স্পিরিচ্যুয়ালিটি*-তে (নিউইয়র্ক, ১৯৭১) পৃ: ১২৪।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।

৫১। প্রাগুক্ত।

৫২। প্রাগুক্ত।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৬।

৫৪। শোলেম-এর 'নিউট্রালাইজেশন অভ মেসিয়ানিজম ইন আর্লি হেসিদিজম' প্রাগুক্ত পৃ; ১৯০।

৫৫। শোলেম, 'দেভেকুদ অর কমিউনিয়ন উইদ গড', প্রাগুক্তে, পৃ: ২০৭।

৫৬। লুই জ্যাকবস, 'দ্য আপলিফটিং অভ দ্য স্পার্কস,' আর্থার গ্রিন সম্পা. *জুইশ স্পিরিচ্যুয়লিটি*-তে ২ খণ্ড (লন্ডন, ১৯৮৬, ১৯৮৮) II পৃ: ১১৮-২১।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

৫৮। শোলেম, 'দেভেকুদ,' *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুদাইজম*-এ, পৃ: ২২৬-২৭।

৫৯। আর্থার গ্রিন, 'টাইপোলজিস অভ লিডারশিপ অ্যান্ড দ্য হেসিদিক যাদ্দিক,' *জুইশ স্পিরিচ্যুয়ালিটি*-তে II, পৃ: ৬২।

৬০। *সিফরা দে যেনিউতা*, অনু. আর. জে. যাওঅরব্লাউস্কি, লুই জ্যাকবস সম্পা. *দ্য জুইশ মিস্টিকস*-এ (জেরুজালেম, ১৯৭৬ এবং লন্ডন, ১৯৯১) পৃ: ১৭১।

AMARBOI.COM

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৪।

৬২। আর্নল্ড এইচ. টয়েনবি, *আ স্টাডি অভ হিস্ট্রি*, ১২ খণ্ড (অক্সফোর্ড, ১৯৩৪-৬১), x পৃ: ১২৮।

৬৩। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন 'স্টেঞ্জ ইজ আওয়ার সিচুয়েশন হিয়ার অন আর্থ,' জারোস্লাভ পেলিক্যান সম্পা. *মডার্ন রিলিজিয়াস থট*-এ (বস্টন, ১৯৯০) পৃ: ২০৪।

৬৪। র‍্যাচেল এলিনের 'HaBaD: দ্য কনটেমপ্লেটিভ অ্যাসেন্ট টু গড', গ্রিন সম্পা. *জুইশ স্পিরিচ্যুয়ালিটি* II-তে পৃ; ১৬১।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৬।

৬৬। মাইকেল জে. বার্কলি'র *অ্যাট দ্য অরিজিন্স অভ মডার্ন অ্যাথিজম*-এ উদ্ধৃত (নিউ হাভেন, লন্ডন, ১৯৮৭), পৃ: ১৬১।

৬৭। 'আ লেটার টু দ্য ব্লাইড ফর দোজ হু সি, মার্গারেট জোউবরদেইন অনু. ও

সম্পা. দিদেরোজ *আর্লি ফিলোসফিক্যাল ওঅর্কস*-এ (শিকাগো, ১৯৬৬), পৃ: ১১৩-১৪।

৬৮। পল হেইনরিখ ডিট্রিচ, ব্যারন দে'হলব্যাখ, *দ্য সিস্টেম অভ নেচার; অর লজ অভ দ্য মরাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওঅর্ল্ড,* অনু. এইচ. ডি. রবিনসন ২ খণ্ড (নিউ ইয়র্ক, ১৮৩৫), I পৃ: ২২।

৬৯। প্রাগুক্ত II পৃ: ২২৭।

৭০। প্রাগুক্ত, I, প:; ১৭৪।

৭১। প্রাগুক্ত, II, পৃ; ২৩২।

## ১০. ঈশ্বরের প্রয়াণ?

১। এম.এইচ.আব্রামস, *নেচারাল সুপারন্যাচারালিজম: ট্রাডিশন অ্যান্ড রিভোলুশন ইন রোমান্টিক লিটারেচার* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১), পৃ: ৬৬।

২। নভেম্বর ২২, ১৮১৭, *লেটারস অভ জন কীটস*-এ, সম্পা. এইচ. ই. রলিনস, ২ খণ্ড (ক্যামব্রিজ, ম্যাস, ১৯৫৮), পৃ: ১৮৪-৮৫।

৩। জর্জ ও টমাস কীটসের উদ্দেশে ডিসেম্বর ২১ (২৭?), ১৮১৭, প্রাগুক্তে, পৃ: ১৯১।

৪। *দ্য প্রিলিউড* II, ২৫৬-৬৪।

৫। 'লাইনস কমপোজড আ ফিউ মাইলস অ্যাবাভ টিনটার্ন অ্যাবি,' ৩৭-৪৯।

৬। 'এক্সপোসাটিউলেশন অ্যান্ড রিপ্লাই; 'দ্য টেবলস টার্নড।'

৭। 'টিনটার্ন অ্যাবি,' ৯৫-১০২।

৮। 'ওডে টু ডিউটি,' *দ্য সঙস অভ এক্সপেরিয়েন্স* ৬-১০।

১০। *জেরুজালেম* ৩৩: ১-২৪।

১১। প্রাগুক্ত, ৯৬: ২৩-২৮।

১২। এফ. ডি. ই. শ্লেইয়ারম্যাশার, *দ্য ক্রিশ্চান ফেইথ,* অনু. এইচ. আর. ম্যাকিনটশ ও জে. এস. স্টুয়ার্ড (এডিনবার্গ, ১৯২৮)।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২।

১৪। অ্যালবার্ট রিটশল, *থিওলজি অ্যান্ড মেটাফিজিক্স,* ২য় সংস্করণ, (বন, ১৯২৯), পৃ: ২৯।

১৫। জন ম্যাককুয়ারি'র *থিংকিং অ্যাবাউট গড*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৭৮), পৃ: ১৬২।

AMARBOI.COM

১৬। 'কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অভ হেগেল'স ফিলোসফি অভ দ্য রাইট', জারোস্লাভ পেলিক্যান সম্পা. *মডার্ন রিলিজিয়াস থট*-এ (বস্টন, ১৯৯০), পৃ: ৮০।

১৭। ফ্রেইডরিখ নিৎশে, *দ্য গে সায়েন্স* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪), ১২৫ নম্বর।

১৮। ফ্রেইডরিখ নিৎশে *দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট, দ্য টুয়েলাইট অভ দ্য গডস অ্যান্ড দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট*-এ অনু. আর. জে. হলিংডেল (লন্ডন, ১৯৬৮), পৃ: ১৬৩।

১৯। সিগমান্ড ফ্রয়েড, *দ্য ফিউচার অভ অ্যান ইল্যুশন* (প্রমিত সংস্ক.), পৃ: ৫৬।

২০। ফ্রেইডরিখ নিৎশে, *দাস স্পেক যারাসথ্রুটো: আ বুক ফর এভরি ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড নো ওয়ান,* অনু. আর.এইচ. হলিংডেল (লন্ডন, ১৯৬১), পৃ: ২১৭।

২১। আলফ্রেড লর্ড টেনিসন, *ইন মেমোরিয়া,* লিভ, ১৮-২০।

২২। উইলিয়াম হ্যামিল্টন কর্তৃক 'দ্য নিউ অপটিজম-ফ্রম প্রুফ্রোক টু রিঙ্গো'-তে উদ্ধৃত, টমাস জে. জে. অ্যাল্টাইযার ও উইলিয়াম হ্যামিল্টন সম্পা. *রেডিক্যাল থিওলজি অ্যান্ড দ্য ডেথ অভ গড*-এ (নিউ ইয়র্ক এবং লন্ডন, ১৯৬৬)।

২৩। মাইকেল জাইলসন্যান, *রিকগনাইজিং ইসলাম, রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোসায়েটি ইন দ্য মডার্ন মিড্‌ল ইস্ট* (লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৫ সংস্ক.) পৃ: ৩৮।

২৪। ইভলিন ব্যারিং, লর্ড ক্রোমার, *মডার্ন ঈজিপ্ট* ২ খণ্ড (নিউ ইয়র্ক, ১৯০৮), II, পৃ: ১৪৬।

২৫। রয় মতাহেদেহ, *দ্য ম্যান্টল অভ দ্য প্রফেট, রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইরান* (লন্ডন, ১৯৮৫), পৃ: ১৮৩-৮৪।

২৬। *রিসালাত আল-তাওহীদ,* মাজিদ ফাখরি'র *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফি*-তে উদ্ধৃত (নিউ ইয়র্ক এবং লন্ডন, ১৯৭১) পৃ: ৩৭৮।

২৭। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *ইসলাম ইন মডার্ন হিস্ট্রি,* (প্রিন্সটন, লন্ডন, ১৯৫৭), পৃ: ৯৫।

২৮। প্রাগুক্ত পৃ: ১৪৬ আল-আযহারের বিশ্লেষণের জন্যে আরও দেখুন পৃ: ১২৩-৬০।

২৯। এলিয়েযার শুইডের *দ্য ল্যান্ড অভ ইসরায়েল; ন্যাশনাল হোম অর ল্যান্ড অভ ডেসটিনি*-তে উদ্ধৃত, অনু. ডেবোরাহ গ্রেনিম্যান (নিউইয়র্ক, ১৯৮৫) পৃ: ১৫৮। কাব্বালিস্টক পরিভাষা ইটালিক্সে।

AMARBOI.COM

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৩।

৩১। 'অভোদাহ' ১-৮ অনু. টি. করমি (সম্পা. ও অনু.), *দ্য পেঙ্গুইন বুক অভ হিব্রু ভার্স* (লন্ডন ১৯৮১), পৃ: ৫৩৪।

৩২। বেন যায়ন বোকসার সম্পা. ও অনু. *দ্য এসেনশিয়াল রাইটিংস অভ আব্রাহাম ইসাক কুক*-এ উদ্ধৃত 'দ্য সার্ভিস অভ গড' (ওয়ারউইক, নিউইয়র্ক, ১৯৮৮) পৃ: ৫০।

৩৩। এলি ওয়েইসেল, *নাইট*, অনু. স্টেলা রডওয়ে (হারমন্ডসওঅর্থ, ১৯৮১), পৃ: ৪৫।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬-৭৭।

## ১১. ঈশ্বরের কি ভবিষ্যৎ আছে?

১। পিটার বার্জার, *আ রিউমার অভ অ্যাঞ্জেলস* (লন্ডন, ১৯৭০), পৃ: ৫৮।

২। এ. জে. আয়ার, *ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রুথ অ্যান্ড লজিক* (হারমন্ডসওঅর্থ, ১৯৭৪), পৃ: ১৫২।

৩। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *বিলিফ অ্যান্ড অভ ক্রিশ্চান অ্যাথিজম* (লন্ডন, ১৯৬৬, পৃ: ১৩৬।

৪। টমাস জে. জে. অ্যাল্টাইযার, *দ্য গস্পেল অভ ক্রিশ্চান অ্যাথিজম* (লন্ডন, ১৯৬৬), পৃ: ১৩৬।

৫। পল ভ্যান বুরেন, *দ্য সেক্যুলার মীনিং অভ দ্য গস্পেল* (লন্ডন, ১৯৬৩) পৃ: ১৩৮।

৬। রিচার্ড এল. রুবেনস্তাইন, *আফটার অশৎউইয, রেডিক্যাল থিওলজি অ্যান্ড কনটেম্পোরারি জুদাইজম* (ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৬৬)।

৭। পল টিলিচ, *থিওলজি অ্যান্ড কালচার* (নিউ ইয়র্ক এবং অক্সফোর্ড, ১৯৬৪), পৃ: ১২৯।

৮। আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড, 'সাফারিং অ্যান বিয়ং,' *অ্যাডভেঞ্চারস অভ আইডিয়াস*-এ (হারমন্ডসঅর্থ, ১৯৪২) পৃ; ১৯১-৯২।

৯। *প্রসেস অ্যান্ড রিয়্যালিটি* (ক্যামব্রিজ ১৯২৯), পৃ: ৪৯৭।

১০। আলি শরিয়তি, হজ্জ, অনু. লালেহ বখতিয়ার (তেহরান, ১৯৮৮), পৃ: ৪৬

১১। প্রাগুক্ত, পৃ; ৪৮।

১২। মার্টিন বুবের, 'গটেসফিন্সটারনিস, বেট্রাচটানজেম যুর বেযিহাং যুইশচেন

AMARBOI.COM

রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফিলোসফি' হান্স কুংয়ের *ডাজ গড একজিস্ট? অ্যান অ্যানসার ফর টুডে*-তে উদ্ধৃত অনু. এডওয়ার্ড কুইন (লন্ডন, ১৯৭৮), পৃ: ৫০৮।

১৩। রাফায়েল মারগি ও ফিলিপ্পা সিমোনট'র 'ইসরায়েল'স আয়াতোল্লাহস' *মেইর কাহানে অ্যান্ড দ্য ফার রাইট ইন ইসরায়েল*-এ উদ্ধৃত (লন্ডন, ১৯৮৭), পৃ: ৪৩।

১৪। ব্যক্তিগত দায়বোধ খৃস্টধর্মেও গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু ইহুদিবাদ ও ইসলাম পুরোহিতের মধ্যস্থতার অনুপস্থিতির কারণে এর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারগণ পুনরুদ্ধার করেছেন।

১৫। ফিলিপ ফ্রাঙ্ক, *আইনস্টাইন: হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস* (নিউ ইয়র্ক ১৯৪৭), পৃ: ১৮৯-৯০।

AMARBOI.COM